বাংলা

হায়াতুল হায়াওয়ান

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী রহ.

ভাষান্তর

হাফেজ মাওঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসাইন



হায়াতুল হায়াওয়ান

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী রহ.

অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন

ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

এম.এ. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

সম্পাদনা

মুফতী নাসির উদ্দীন

ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৬)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১০০৬৮০৬, ০১৭৯৮৫০৪৭০৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৪ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৪ ইং

হায়াতুল হায়াওয়ান
দ্বিতীয় খণ্ড

মূল ❑ আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী রহ.

অনুবাদ ❑ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
সম্পাদনা ❑ মুফতী নাসির উদ্দীন
ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

প্রকাশক ❑ নজরুল ইসলাম
আশরাফিয়া বুক হাউজ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : ৪৪০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-8947-10-17

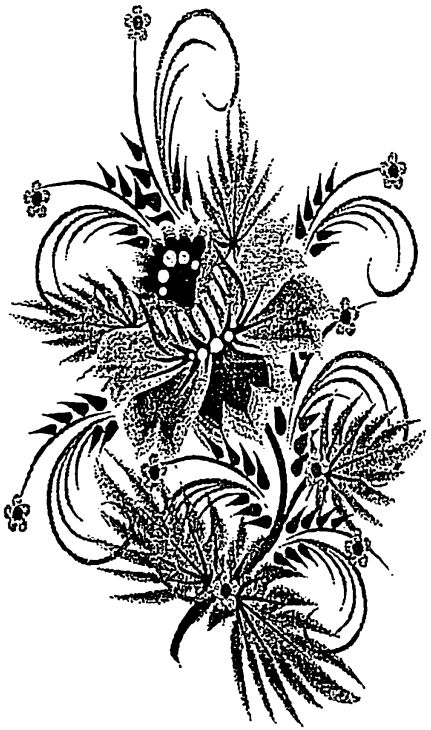
উপহার

"হায়াতুল হায়াওয়ান" বইখানা

আমার শ্রদ্ধার/স্নেহের.....

.....কে

উপহার দিলাম। বইটির আদ্যোপান্ত পাঠ করবে এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়বে বলে আশাবাদী



শুভেচ্ছান্তে

স্বাক্ষর : .....

তারিখ : .....

মোবাইল : .....

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি অন্তর ও জিহ্বার সাহায্যে সকল শ্রেণীর মানব সন্তানকে মর্যাদা এবং কথোপকথন ও বক্তৃতার দুই নেআমতের বদৌলতে সকল প্রাণীর উপর ফযীলত ও বুযুর্গী প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও মনীষার সেই মানদণ্ড দান করেছেন, যার সাহায্যে মানুষ সকল সিদ্ধান্ত ও রায়কে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করতে পারে। আর এটাই হল সেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবত্তা, যার বদৌলতে মানুষ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর মজবুত প্রামাণ্য দলিল কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। আমি সেই মহান স্রষ্টার প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি আমাদের উপর ক্রমাগত অনুগ্রহের সিলসিলা প্রলম্বিত করেছেন। আর আমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, তাঁর পবিত্র সত্তার হাকীকত মানব বুদ্ধির সীমারেখা ও প্রচলিত আচার-আচরণের বাইরে অবস্থিত। আর আমি এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের বান্দা এবং তাঁর রাসূল। যাঁকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ্য দলিলসমূহ প্রদান করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর সর্বদা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন। যতদিন পর্যন্ত আসমান ও যমীন কায়েম থাকবে, কাল ও যুগের আবর্তন অব্যাহত থাকবে।

আম্মা বাদ, এ কিতাবটি লিখার জন্য কোন ব্যক্তি আমার নিকট আবেদন করে নি। এমনকি আমার নিজের স্বভাবের মধ্যেও এর জন্য আহ্বানকারী পয়দা হয় নি বরং মূল ঘটনা এভাবে সামনে এসে হাজির হয়েছে যে, কিছু কিছু বিষয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণের সময় যেগুলোতে কথা লুকিয়ে রাখা এমনভাবেই সম্ভব ছিল না, যেমনভাবে নব বধূর সুগন্ধকে ঢেকে রাখা সম্ভব হয় না। আলোচনা প্রাক্কালে চিন্তার রাজা বক পাখি এবং অভিশপ্ত ও মনহুস হায়েনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল।

এ প্রাণীগুলোর আলোচনা দ্বারা এমন কিছু দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা পয়দা হল, যেমন 'বাসুস' যুদ্ধে হয়েছে। সঠিক রায় দ্রুততার সাথে একত্রিত হতে লাগল। শকুন এবং মেছোরগের পার্থক্য মিটে যেতে লাগল।

বিষধর সাপের মুখে বিচ্ছু পতিত হতে লাগল। দুধ ছাড়ানো বাচ্চা পশুদের সমকক্ষতা করতে লাগল। বন্ধুগণ বকরিগুলোকে উটের সাথে চড়াতে লাগল। মাছ এবং গুঁইসাপকে বরাবর মনে করতে লাগল। প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে হায়েনার চরিত্র গ্রহণ করতে লাগল। নেতৃস্থানীয় লোকগণ চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করতে শুরু করল। আর সাধারণ লোকেরা কবুতরের গলা বন্ধনীর মত জিঞ্জির নিজেদের গর্দানের উপর পরিধান করল। বড় লোকেরা এ কথা বুঝতে লাগল যে, তারা শুক পাখি থেকে অধিক সত্যবাদী এবং তাদের ছোটরা ঘুঘু পাখি থেকেও অধিক বিভ্রান্ত ও অপরাধী। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ দুই মশকধারিণী রমণীর মত বিবেচ্য হতে লাগল। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমানেরা সে গ্রাম্য লোকের তুল্য হয়ে গেল, যে হুনাইনের দুটি মোজা নিয়ে ফিরে এসেছিল। বুদ্ধিমানকে 'আশকার' পাখির মত হয়রান মনে হতে লাগল। শিক্ষার্থীদেরকে 'হুবারা' পাখির মত ব্যস্ত মনে হল। শ্রোতা ব্যক্তি বলছিল যে, বন্য গাধা পাওয়া গেছে তো সকল শিকার মিলে গেছে। আর সত্যের প্রতিচ্ছবি শীষদানকারী পাখির মত বারবার বলছিল– হে নিকৃষ্ট পাখিরা! চুপ থাক। এ ঘটনা যখন আমার সামনে আসল, তখন আমি বললাম ফয়সালাকারীর গৃহে যদি স্বয়ং যাওয়া যায় এবং তীর যদি তার নির্মাণকারীকে দেয়া যায়, তাহলে বহু হেকমত বের হয়ে আসে। অধিকন্তু ঘোড় দৌড়ের সময়ই অগ্রগামী ঘোড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। আর প্রত্যুষেই রাতভর পথচারীর প্রশংসা করা হয়। তারপর আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন একটি কিতাব রচনা করার জন্য এস্তেখারা করলাম, যা পশুপাখি সম্পর্কিত বিষয়াদির বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত হবে। আমি এ কিতাবটির নাম রেখেছি 'হায়াতুল হায়াওয়ান'। আল্লাহ তা'আলা যেন এটাকে আমার জান্নাত লাভের ওয়াসিলা করে দেন এবং কাল পরিক্রমায় মানুষ তা থেকে উপকার পেতে থাকে। নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু এবং মেহেরবান। আর আমি এ কিতাবটি আরবী বর্ণমালা অনুসারে বিন্যাস করেছি, যাতে পশু পাখি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সহজতর হয়।

বান্দা

কামাল উদ্দিন দামেরী

প্রকাশকের আরয

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী রহ. (৭৪২/৭৫০-৮০৮ হিজরী)-এর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'হায়াতুল হায়াওয়ান' লেখার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণভাবে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থটির অনুবাদ ও সার সংকলন এর জনপ্রিয়তাকে আরও উচ্চকিত করে তুলেছে।

'হায়াতুল হায়াওয়ান' সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় ১২৭৫ হি. কায়রোর বলাক প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। তারপর ১২৮৪ ও ১৩০৫ হি. সালে পুনমুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সালের সংস্করণের সাথে এর হাশিয়ায় যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আল কাজবিনীর কিতাব عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات-কে সংযোজন করা হয়। এছাড়া মিসর, লেবানন এবং ইরান থেকেও এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

হায়াতুল হায়াওয়ানের ১০৬৯টি প্রাণীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে যেসকল প্রাণীর বিস্তারিত স্থান লাভ করেছে এর সংখ্যা ৭৩১টি। তবে একই স্বভাব ও ধরনের বিভিন্ন প্রাণীর আলোচনাও তাতে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

'হায়াতুল হায়াওয়ান' গ্রন্থ পাঠকারীদের দুটি বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে।

প্রথমত 'হায়াতুল হায়াওয়ান' কোন এমন কিতাব নয় যার উপর হাদীস, ফিকাহ এবং ইসলামী জ্ঞান শাখার বুনিয়াদ স্থাপন করা যায়। আর এটা থেকে ইলমে শরীআতের প্রমাণাদিও বের করা যায় না। এজন্য রেওয়ায়েত ও মাসআলাসমূহের বিষয়ে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটা শরীআতের দলিলভিত্তিক গ্রন্থ নয়।

দ্বিতীয়ত 'হায়াতুল হায়াওয়ান'-এর লেখনীর ধরন ও প্রকৃতি এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, এ গ্রন্থে নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে যা কিছু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম

হয়েছেন, তা পর্যায়ক্রমে সাজাতে চেয়েছেন। বর্ণিত বিষয়বস্তুর উপর আরও অনেক জানার ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। পরবর্তীতে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করতে চায়, তাদের জন্য পথ খোলা রয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর আলোচনার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা বা না করায় কোন বাধ্য-বাধকতা নেই; বরং এ গ্রন্থকে সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই অধ্যয়ন করা উচিত, যা লেখক উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছে।

সর্বোপরি এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে, 'হায়াতুল হায়াওয়ান' বর্তমান উন্নত প্রাণী বিজ্ঞানের পথ-যাত্রাকে বহুলাংশে মসৃণ ও বিস্তৃত করে তুলেছে। এ জন্য 'হায়াতুল হায়াওয়ান'-কে প্রাণী বিজ্ঞানের আংশিক বিশ্বকোষ বলে অভিহিত করা হলে ভুল বলা হবে না। মূলতঃ মুসলিম মনীষীরাই যে প্রাণীবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে 'হায়াতুল হায়াওয়ান' গ্রন্থটি পশু পাখির জীবনেতিহাসের উপর লিখিত হলেও আরবী সাহিত্যের ফল্গুধারা এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না।

বিনীত
প্রকাশক

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

১৩৫. (আল-জান্ন) চিকন সাদা সাপ ৪১
পবিত্র কুরআনে সাপের আলোচনা ৪১
জ্ঞাতব্য ৪১
১৩৬. الجبهة (আল-জাবহাতুন) ঘোড়া ৪৩
হাদীসে নববীতে ঘোড়ার আলোচনা ৪৩
১৩৭. الجثله (আল-জাসলাহ) কালো পিপিলিকা ৪৩
১৩৮. الجحل (আল-জাহল্) গিরগিটি ৪৩
১৩৯. الجحمرش (আল-জাহমারাশ) দুগ্ধধাত্রী খরগোশ/বন্ধ্যা নারী ৪৪
১৪০. الجحش (আল-জাহশ) গৃহপালিত বা বন্য গাধার বাচ্চা ৪৪
উদাহরণ ৪৪
১৪১. الجخدب (আল-জুখদাব) একপ্রকার টিড্ডি ৪৪
১৪২. الجدجد (আল-জুদজুদ) ঝি ঝি পোকা ৪৫
শরঈ বিধান ৪৫
জ্ঞাতব্য ৪৫
১৪৩. الجدايَة (আল-জাদাইয়াহ) হরিণের বাচ্চা বা শাবক ৪৫
হাদীসে জাদাইয়াহ-এর আলোচনা ৪৫
১৪৪. الجدى (আল-জাদা) বকরির নর শাবক ৪৫
প্রবাদ বাক্য ৪৬
চিকিৎসায় বকরির বাচ্চার উপকারিতা ৪৬
বকরির বাচ্চা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৪৭
১৪৫. اجدل (আজদাল) বাদুড় ৪৭
প্রবাদ বাক্য ৪৭
১৪৬. الجذع (আল-জাযায়ু) ভেড়ার এক বছরের শাবক ৪৭
তারকীব ৫০
হাদীস ৫০

সূচিপত্র

১৩৫. (আল-জানু) চিকন সাদা সাপ ৪১
পবিত্র কুরআনে সাপের আলোচনা ৪১
জ্ঞাতব্য ৪১
১৩৬. الجبهة (আল-জাবহাতুন) ঘোড়া ৪৩
হাদীসে নববীতে ঘোড়ার আলোচনা ৪৩
১৩৭. الجثله (আল-জাসলাহ) কালো পিপিলিকা ৪৩
১৩৮. الجحل (আল-জাহলু) গিরগিটি ৪৩
১৩৯. الجحمرش (আল-জাহমারাশ) দুগ্ধধাত্রী খরগোশ/বন্ধ্যা নারী ৪৪
১৪০. الجحش (আল-জাহশ) গৃহপালিত বা বন্য গাধার বাচ্চা ৪৪
উদাহরণ ৪৪
১৪১. الجخدب (আল-জুখদাব) একপ্রকার টিড্ডি ৪৪
১৪২. الجدجد (আল-জুদজুদ) ঝি ঝি পোকা ৪৫
শরঈ বিধান ৪৫
জ্ঞাতব্য ৪৫
১৪৩. الجدايَة (আল-জাদাইয়াহ) হরিণের বাচ্চা বা শাবক ৪৫
হাদীসে জাদাইয়াহ-এর আলোচনা ৪৫
১৪৪. الجدى (আল-জাদা) বকরির নর শাবক ৪৫
প্রবাদ বাক্য ৪৬
চিকিৎসায় বকরির বাচ্চার উপকারিতা ৪৬
বকরির বাচ্চা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৪৭
১৪৫. اجدل (আজদাল) বাদুড় ৪৭
প্রবাদ বাক্য ৪৭
১৪৬. الجذع (আল-জাযায়ু) ভেড়ার এক বছরের শাবক ৪৭
তারকীব ৫০
হাদীস ৫০

১৪৭. الجراد (আল-জারাদ) টিড্ডি/পঙ্গপাল ৫১
প্রতিদিনের ওয়াযীফা ও আমল ৫২
হাদীসে টিড্ডির উল্লেখ ৫৪
আমল ও ওয়াযীফা ৫৮
(১) টিড্ডি হতে রক্ষা পাওয়ার আমল ৫৮
(২) জীব-জন্তু হতে ফসল রক্ষার জন্য ৫৮
টিড্ডির শরঈ বিধান ৬০
মাসয়ালা ৬৩
প্রবাদ বাক্য ৬৩
চিকিৎসায় টিড্ডির উপকারিতা ৬৪
স্বপ্নে টিড্ডি দেখার ব্যাখ্যা ৬৪
১৪৮. الجراد البحرى (আল-জারাদুল বাহরিয়্যু) ৬৫
সামুদ্রিক টিড্ডি ৬৫
চিকিৎসায় সামুদ্রিক টিড্ডির উপকারিতা ৬৫
১৪৯. الجراره (আল-জারারাহ) একপ্রকার বিচ্ছু ৬৫
১৫০. الجراذ (আল-জুরায) পুরুষ ইঁদুর ৬৫
হাদীসে الجرذ-এর উল্লেখ ৬৬
কৌতুক ৬৭
জ্ঞাতব্য ৬৮
ইঁদুরের শরঈ বিধান ৬৮
ইঁদুর স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৬৯
১৫১. الجرجس (আল-জুরজাস) মশার বাচ্চা ৬৯
১৫২. الجوارس (আল-জাওয়ারিসু) মৌমাছি ৬৯
১৫৩. الجرو (আল-জারবু) কুকুর ছানা ৭০
হাদীস শরীফে কুকুর ছানার আলোচনা ৭০
১৫৪. الجريث (আল-জিরাইস) পানির সাপ ৭৩
জিরাইসের শরঈ বিধান ৭৩
চিকিৎসায় জিরাইসের উপকারিতা ৭৩
১৫৫. الجزور (আল-জাযূর) উট ৭৪
জাহেলী যুগে আরবদের ধর্ম ৭৫

উটনীর শরঈ বিধান ৭৬

১৫৬. الجساسة (আল-জাসসাসাহ) কিয়ামতের
নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিতব্য জন্তু ৭৭
হাদীস শরীফে জাস্‌সাসাহ্‌র উল্লেখ ৭৯
হযরত তামীম দারী (রহ.) ৮০

১৫৭. الجعار (আল-জা'য়ার) হায়েনা ৮০
চিকিৎসায় হায়েনার উপকারিতা ৮১
শরঈ বিধান ৮১
স্বপ্নে হায়েনা দেখার ব্যাখ্যা ৮১

১৫৮. الجعدة (আল-জা'দাহ) বকরি ৮১

১৫৯. الجعل (আল-জু'য়ালু) গোবরের পোকা ৮১
হাদীস শরীফে গোবরে পোকার উল্লেখ ৮২
গোবরে পোকার শরঈ বিধান ৮৩
প্রবাদ বাক্য ৮৩
চিকিৎসায় গোবরে পোকার উপকারিতা ৮৪
স্বপ্নে গোবরে পোকা দেখার ব্যাখ্যা ৮৪

১৬০. الجعول (আল-জাউল) উট পাখির ছানা ৮৪

১৬১. الجفرة (আল-জাফরাহ) ছাগল ছানা ৮৪
জ্ঞাতব্য ৮৪
শরঈ বিধান ৮৫

১৬২. الجلالة (আল জাল্লালাহ) পায়খানা খেকো গাভী ৮৫
হাদীসে 'জাল্লাল্লাহ'-এর আলোচনা ৮৫

১৬৩. الجلم (আল-জালামু) শিকারী পাখি ৮৬

১৬৪. الجمل (আল জামাল) নর উট ৮৬
জ্ঞাতব্য ৮৬
হাদীসে উটের আলোচনা ৯০
কাহিনী ৯৪
মাসয়ালা ৯৪
প্রবাদ বাক্য ৯৬
স্বপ্নে উট দেখার ব্যাখ্যা ৯৬

১৬৫. جمل البحر (জামালুল বাহর) সামুদ্রিক উট ৯৭
১৬৬. جمل الماء (জামালুল মায়ি) একপ্রকার পাখি ৯৭
১৬৭. جمل اليهود (জামালুল ইয়াহূদ) কাকলাইশ বা গিরগিট ৯৭
১৬৮. الجمعليلة (আল-জামাআলীলাহ) বন বিড়াল ৯৭
১৬৯. جميل و جميل (জামীলুন ওয়া জামীলুন) ছোট্ট পাখি ৯৮
১৭০. الجنبر (আল-জিনবার) মাছারাঙ্গার বাচ্চা ৯৮
১৭১. الجندب (আল-জুনদাব) টিড্ডি ৯৮
হাদীস শরীফে জুনদাব-এর উল্লেখ ৯৮
১৭২. الجندع (আল-জানদা) কালো টিড্ডি ৯৮
১৭৩. الجن (আল জিন) জিন জাতি ৯৮
হাদীস শরীফে জিনদের উল্লেখ ১০২
ফায়সালা ১১৮
দার্শনিক আলোচনা ১১৮
নোট ১২২
মাসাইল ১২৮
মাসআলা ১৩০
জিনদের অভ্যাস ১৩৪
স্বপ্নে জিন দেখলে তার ব্যাখ্যা ১৩৫
১৭৪. (জিন্নাতুল বুয়ূত) ১৩৬
ঘরে বসবাসকারী স্বর্প ১৩৬
হাদীসে جان-এর আলোচনা ১৩৫
১৭৫. الجندبادستر (আল-জুনদ বাদিসতার) একটি জলজ প্রাণী ১৩৬
চিকিৎসায় উপকারিতা ১৩৭
১৭৬. الجنين (জানীন) গর্ভস্থ অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা ১৩৭
জানীন তথা অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার শরঈ বিধান ১৩৭
অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার তিন অবস্থা ১৪০
১৭৭. جهبر (তাহবার) বাঘিনী ১৪০
১৭৮. الجواد (আল-জাওয়াদ) উন্নত জাতের ঘোড়া ১৪১

হাদীসে জাওয়াদ-এর ব্যাখ্যা ১৪১
একটি ঘটনা ১৪৩
ভালবাসার সংজ্ঞা ১৫৫
কাহিনী ১৫৭
১৭৯. الجواف (আল-জুওওয়াফ) এক প্রকার মাছ ১৫৭
১৮০. الجوذر (আল-জুযার) বন্য গাভীর বাচ্চা ১৫৭
১৮১. الجوزل (আল-জাওযাল) কবুতরের বাচ্চা ১৫৯
১৮২. جيال (জিয়াল) গোশত খেকো প্রাণী ১৬০
১৮৩. الوجرادة (আল-ওয়াজরাদাহ) পাখি বিশেষ ১৫৯
পরিচ্ছেদ : হা ১৫৯
১৮৪. حائم (হায়িম) কালো কাক (দুষ্ট পাখি) ১৫৯
১৮৫. الحارية (আল -হারিয়াহ) চিত্রল সর্প ১৬০
১৮৬. الحباب (আল-হুবাব) সর্প ১৬০
১৮৭ . الحبتر (আল-হাবতার) শিয়াল ১৬১
১৮৮. الحبث (আল-হুবাস) সাপ ১৬১
১৮৯. حباحب (হাবাহুব) জোনাকি ১৬১
১৯০. الحبارى (আল-হুবারা) মাছরাঙ্গা ১৬১
হাদীস শরীফে মাছরাঙ্গার আলোচনা ১৬২
মাছরাঙ্গার শরঈ বিধান ১৬৩
উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য ১৬৩
চিকিৎসায় মাছরাঙ্গার উপকারিতা ১৬৩
১৯১. الحبرج (আল-হাবরাজ) পুরুষ মাছরাঙ্গা" ১৬৪
১৯২. الحبركى (আল-হাবরাকা) আঠালী পোকা" ১৬৪
১৯৩. حبلق (হাবলাক) বকরীর বাচ্চা ১৬৪
১৯৪. حبيش (হুবাইশ) পাখি বিশেষ ১৬৪
১৯৫. الحجر (আল-হাজ্‌র) ঘোটকী ১৬৪

হাদীসে ঘোটকীর আলোচনা ১৬৫
স্বপ্নে ঘোটকী দেখার ব্যাখ্যা ১৬৫

১৯৬. الحجروف (আল- হাজরূফ) পিপিলিকা সদৃশ প্রাণী ১৬৫

১৯৭. الحجل (আল-হাজল) পুরুষ চাতক ১৬৫
চাতক পাখির শরঈ বিধান ১৬৭
উপমা ও প্রবাদ বাক্য ১৬৮
চিকিৎসায় চাতকের উপকারিতা ১৬৮

১৯৮. الحداة (আল- হিদাত) চিল ১৬৯
হাদীস শরীফে চিলের আলোচনা ১৭০
একটি ঘটনা ১৭১
চিলের শরঈ বিধান ১৭২
প্রবাদ ও উপমা ১৭৩
চিকিৎসায় চিলের উপকারিতা ১৭৩
চিল স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ১৭৩

১৯৯. الحذف (আল-হাযাফ) ভেড়ার বাচ্চা ১৭৪

২০০. الحر (আল-হুররু) ভালো জাতের ঘোড়া ১৭৩

২০১. الحرباء (আল-হারবা) গিরগিটি ১৭৪
গিরগিটির শরঈ বিধান ১৭৬
উপমা ও প্রবাদ বাক্য ১৭৬
চিকিৎসায় গিরগিটির উপকারিতা ১৭৬
স্বপ্নে গিরগিটি দেখার ব্যাখ্যা ১৭৭

২০২. الحرذون (আল-হিরযুন) গুঁইসাপ সদৃশ্য প্রাণী ১৭৭
হারযূনের শরঈ বিধান ১৭৭
চিকিৎসায় উপকারিতা ১৭৭
স্বপ্নে এ প্রাণী দেখার ব্যাখ্যা ১৭৭

২০৩. الحرشوف والحرشاف (হারশাক বা হারশূফ) ১৭৭
হালকা পাতলা পঙ্গপাল ১৭৭

২০৪. الحرقوص (হুরকূস) মশার মত এক প্রকার বিষাক্ত পোকা ১৭৮
নোট-জ্ঞাতব্য বিষয় ১৭৯
হুরকূসের শরঈ বিধান ১৮০

২০৫. الحريش (আল-হারীশ) চেলা ১৭৯
হারীশ-এর শরঈ বিধান ১৮০
চিকিৎসায় হারীশ-এর উপকারিতা ১৮০
২০৬. الحسبان (আল-হাসবান) ছোট ছোট মাছ ১৮০
২০৭. الحساس (আল হাসাস) ছোট মাছ ১৮০
২০৮. الحسل (আল-হাসাল) গুইসাপের বাচ্চা ১৮০
শরঈ বিধান ১৮১
প্রবাদ ১৮১
২০৯. الحسيل (আল-হাসীল) বাছুর ১৮১
২১০. حسون (হুসসূন) মিষ্টি সুরেলা পাখি ১৮১
২১১. الحشرات (আল-হাসারাত) ১৮২
যে সমস্ত প্রাণী যমীনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে ১৮২
নোট-জ্ঞাতব্য বিষয় ১৮২
কীট-পতঙ্গের শরঈ বিধান ১৮২
২১২. الحشو والحاشية (আল-হাশূ ওয়াল হাশিয়াহ) ১৮৪
উটের ছোট বাচ্চা ১৮৪
২১৩. الحصان (আল-হিসান) ঘোড়া ১৮৪
হাদীসে হিসান-এর আলোচনা ১৮৪
বনী ইসরাইলের একটি কাহিনী ১৮৪
আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কিস্‌সা ১৮৭
খলীফা মামুনের ঘটনা ১৮৮
২১৪ الحصور (আল-হাসূর) উটনী ১৮৮
২১৫. حضاجر (হাদাজির) বুনো বিড়াল ১৮৯
ব্যাকারণগত একটি পর্যালোচনা ১৮৯
২১৬. الحضب (আল-হাদাব) অজগর ১৮৯
২১৭. الحفان (আল-হিফান) চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা ১৮৯
২১৮. الحفص (হাফস) বাঘের বাচ্চা ১৯০

২১৯. الحقم (আল-হাকম) কবুতর সদৃশ্য বাচ্চা..... ১৯০
২২০. الحلزون (হালযূন) কীট..... ১৯০
শরীয় বিধান..... ১৯০
২২১. الحلم (আল-হিলমু) রক্ত খেকো কীট (আঠালী)..... ১৯০
হাদীস শরীফে আঠালীয় আলোচনা..... ১৯০
মাসয়ালা..... ১৯১
শরঈ বিধান..... ১৯১
উপমা ও প্রবাদ..... ১৯১
২২২. حمار الاهلية (হিমারুল আহলিউন)..... ১৯২
গৃহ পালিত গাধা..... ১৯২
হাদীস শরীফে গাধার আলোচনা..... ১৯৩
একটি আশ্চর্য ঘটনা..... ১৯৫
তাশীর গাধা..... ১৯৮
দ্বিতীয় কাহিনী..... ১৯৯
শিক্ষণীয় বিষয়..... ১৯৯
দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়..... ২০০
জ্ঞাতব্য বিষয়..... ২০৪
জ্ঞাতব্য বিষয়..... ২১২
কায়সার (রোম সমাট্রের উপাধি)..... ২১৩
মনসুর হাল্লাজের ঘটনা..... ২১৫
হাল্লাজের নামকরণের কারণ..... ২১৮
মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের কাহিনী..... ২১৮
সুফিয়ান সাওরীর ঘটনা..... ২১৯
হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী..... ২২২
মহিলাদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কাহিনী..... ২২২
এক বৃদ্ধের কাহিনী..... ১২৭
এক দর্জির কাহিনী..... ২২৮
(৩) যুনযুন ইবনে মূসার কাহিনী..... ২২৭
(৪) একটি শিশুর কাহিনী..... ২২৯
(৫) ইবনে খাকান-এর কাহিনী..... ২২৯
(৬) এক যুবকের কাহিনী..... ২৩০
(৭) হাকিম উবায়দির কাহিনী..... ২৩০

অন্য একটি কাহিনী ২৩২
পরিশিষ্ট ২৩২
গাধার শরঈ বিধান ২৩৪
উদাহরণ ও উপমা ২৩৫
চিকিৎসায় গাধার উপকারিতা ২৩৭
স্বপ্নে গাধা দেখার ব্যাখ্যা ২৩৭

২২৩. الحمار الوحشى (আল হিমার আল-ওয়াহশী)

জংগলী গাধা দেখার ২৩৯
জংগলী গাধার শরঈ বিধান ২৪১
উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য ২৪৩
চিকিৎসায় বন্য গাধার উপকারিতা ২৪৪
স্বপ্নে বন্য গাধা দেখার ব্যাখ্যা ২৪৪

২২৪. حمار قبان (হিমারু কুববান)

একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু ২৪৫
হিমারু কুব্বান- এর শরঈ বিধান ২৪৭
চিকিৎসায় হিমারু কুব্বান- এর উপকারিতা ২৪৭
হিমারু কুববান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ২৪৭

২২৫. الحمام (আল হামামু) কবুতর ২৪৭

হাদীস শরীফে হামাম—কবুতর এর উল্লেখ ২৪৯
মুস্তারশিদ বিল্লাহর ঘটনা ২৫৩
শেখ আবুল হাসান শাযলী (রঃ)-এর স্বপ্ন ২৫৭
নোট- জ্ঞাতব্য বিষয় ২৫৯
কবুতরের শররী বিধান ২৬০
মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর কাহিনী ২৬২
খলীফা মনসুরের ঘটনা ২৬৩
কবুতরের দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ ২৬৪
চিকিৎসায় কবুতরের উপকারিতা ২৬৬
শিক্ষণীয় ও পরীক্ষিত বিষয় ২৬৭
স্বপ্নে কবুতর দেখার ব্যাখ্যা ২৬৭

২২৬. الحمد (আল-হুমদ্) পর্বত গুহায় বসবাসকারী পাখির বাচ্চা ২৬৯

২২৭. الحمر (আল-হুমমুর) চড়ুই জাতীয় একটি পাখি ২৬৯

ইবনে লিসানের ঘটনা ২৬৯

হুমমার-এর শররী বিধান..... ২৬৯
হাদীসে হুমমার পাখির আলোচনা..... ২৬৯
উহারণ ও প্রবাদ..... ২৭১
২২৮. الحمسة (আল হামসাহ) একটি সামুদ্রিক প্রাণী..... ২৭১
২২৯. الحماط (আল-হিমাত) সব্জির পোকা..... ২৭১
২৩০. الحمك (আল হাম্ক) প্রাণীদের ছোট বাচ্চা..... ২৭১
২৩১. الحمل (আল-হামাল) বকরীর ছয় মাসের ছানা..... ২৭১
হাদীস শরীফে হামাল-এর আলোচনা..... ২৭১
একটি কাহিনী..... ২৭২
একটি আশ্চর্য ঘটনা..... ২৭৩
হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাহিনী..... ২৭৪
২৩২. الحمنان (আল-হামনান) ছোট কীট বিশেষ..... ২৭৫
২৩৩. الحمولة (আল-হামুলাহ) সাওয়ারীর উট..... ২৭৫
২৩৪ الحميق (আল-হামীক) বাজ পাখি..... ২৭৫
২৩৫. حميل حر (হুমীলে হুর) এক ধরণের পাখি..... ২৭৫
২৩৬. الحنش (হানাশ) সাপ..... ২৭৫
হাদীসে ' হানাশ'-এর উল্লেখ..... ২৭৬
২৩৭. الحنظب (আল-হানযাব) টিড্ডি..... ২৭৬
২৩৮. الحوار (আল-হিওয়ার) উটনীর বাচ্চা..... ২৭৭
প্রবাদ ও উদাহরণ..... ২৭৭
২৩৯. الحوت (আল-হুত) মৎস্য..... ২৭৮
দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ..... ২৭৯
হাদীসে মৎস্যের আলোচনা..... ২৭৯
হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী..... ২৮০
শিক্ষণীয় বিষয়..... ২৮০
হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নিমন্ত্রণ..... ২৮২
২৪০. حوت الحيض (হুত আল-হায়েয) এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ..... ২৮৩
হুত আল-হায়েয মাছের শরঈ বিধান..... ২৮৪

চিকিৎসায় উপকারিতা ২৮৩
পরিশিষ্ট ২৮৩
হযরত মুসা ও হযরত ইউশা (আঃ)-এর মাছ ২৮৪
জ্ঞাতব্য ২৮৭
হযরত খিযির (আঃ)-এর নাম ২৮৮
জ্ঞাতব্য ২৯২
হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘটনা ২৯৩
একটি আশ্চর্য ঘটনা ২৯৪
২৪১. الحوشى (আল-হূশী) বন্য উট ২৯৪
২৪২. الحوصل (আল-হুছাল) বৃহৎ এক পাখি ২৯৫
এ পাখির শরঈ বিধান ২৯৫
২৪৩. الحلان (আল-হুলান) বকরির পেটে প্রাপ্ত ছানা ২৯৫
হাদীসে হুলানের উল্লেখ ২৯৫
২৪৪. حيدرة (হায়দারাহ) বাঘ ২৯৫
হাদীসে বাঘের আলোচনা ২৯৬
পরিশিষ্ট ৩০০
২৪৫. الحيرمة (আল-হায়রামা) গাভী ৩০০
২৪৬. الحية (আল-হায়য়াত) সাপ ৩০০
সরন্দ্বীপ (লঙ্কা বা শ্রীলঙ্কা) ৩০১
আলী ইবনে নাসর জাহযামীর ঘটনা ৩০৬
জ্ঞাতব্য ৩১০
হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর ঘটনা ৩১২
একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী ৩১২
খলীফা হারুনুর রশীদের ঘটনা ৩১৩
একটি কাহিনী ৩১৩
হযরত ঈসা (আঃ)- এর ঘটনা ৩১৩
নওশিরওয়ার ঘটনা ৩১৪
একটি বিরল ঘটনা ৩১৪
শিক্ষা ৩১৭
দৈনন্দিন আমল ৩১৮
বিচ্ছুর কামড়ে ঝাড়ফুঁক ৩১৮

সাপে কাটলে বা পাগলা কুকুর কামড়ালে বা
বিষপান করলে পরীক্ষিত ঝাড়ফুঁক ৩১৮
একটি আশ্চর্য কাহিনী ৩২০
একটি অভিনব ঘটনা ৩২১
পরিশিষ্ট ৩২২
উপসংহার ৩২৩
ইমাদুদ্দৌলার কাহিনী ৩২৪
একটি পরীক্ষিত আমল ৩২৬
সাপের শরঈ বিধান ৩২৬
হাদীসে সাপের উল্লেখ ৩২৭
মাসয়ালা ৩২৯
প্রবাদ ও উদাহরণ ৩৩১
চিকিৎসায় সাপের উপকারিতা ৩৩২
ফায়দা ৩৩২
স্বপ্নে সাপ দেখার ব্যাখ্যা ৩৩২
২৪৭. الحيوت (আল-হায়ওয়াত) নর সাপ ৩৩৩
২৪৮. الحيدوان (আল-হায়দাওয়ান) ঘুঘু পাখি ৩৩৩
২৪৯. الحيقطان (আল-হায়কুতান) মোরগ ৩৩৩
২৫০. الحيوان (আল-হায়ওয়ান) প্রাণের অধিকারী ৩৩৩
হাদীসে শরীফে প্রাণীর আলোচনা ৩৩৫
পরিশিষ্ট ৩৩৫
প্রাণীর শরঈ বিধান ৩৩৫
চিকিৎসায় প্রাণীর উপকারিতা ৩৩৭
হাইওয়ান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৩৩৮
২৫১. ام حبين (উম্মে হুবাইন) গিরগিট ৩৩৯
হাদীসে গিরগিটির আলোচনা ৩৪০
গিরগিটির শরঈ বিধান ৩৪০
২৫২. ام حسان (উম্মে হাস্‌সান) ৩৪১
অঞ্জলির মত একধরনের জন্তু ৩৪১
২৫৩. ام احسين (উম্মে হুসাইন) একটি জলজ প্রাণী ৩৪১

২৫৪. ام حفصه (উম্মে হাফসাহ) গৃহপালিত মুরগি..... ৩৪১

২৫৫. ام حمارس (উম্মে হুমারিস) হরিণ..... ৩৪১

باب الخاء

পরিচ্ছেদ : 'খা'..... ৩৪১

২৫৬. الخاذباذ (আল-খাযিবায) মশা-মাছি..... ৩৪১

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৩৪২

২৫৭. خاطف ظله (খাতিফা যিল্লাহ) একধরনের চড়ুই পাখি..... ৩৪৩

২৫৮. الخبهقى (আল-খাবহাকয়ী) কুকুর ছানা..... ৩৪৩

২৫৯. الخثق (আল-খাছাক) একধরনের বড় পাখি..... ৩৪৩

২৬০. الخدرنق (আল-খাদারনাক) মাকড়শা..... ৩৪৩

২৬১. الخرطين (আল-খারাতীন) কেঁচো..... ৩৪৩

চিকিৎসায় কেঁচো..... ৩৪৪

২৬২. الخرب (আল-খারাব) নর মাছরাঙা..... ৩৪৪

কৌতুক..... ৩৪৪

উপর্যুক্ত কবিতার অর্থ..... ৩৪৫

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৩৪৬

২৬৩. الخرشة (আল-খারাশাহ) মশা..... ৩৪৬

২৬৪. الخرشقلا (আল খারশকালা) বুলতী মাছ..... ৩৪৬

২৬৫. الخرشنة (আল-খারশনাতু)..... ৩৪৬

কবুতরের চেয়ে আকারে বড় এক পাখি..... ৩৪৬

২৬৬. الخرق (আল-খুরুক্ব) এক জাতীয়..... ৩৪৬

২৬৭. الخرنق (আল-খিরনাক) এক জাতীয় চড়ুই..... ৩৪৭

২৬৮. الخدارية (আল-খাদারিয়াহ) খরগোসের শাবক..... ৩৫০

২৬৯. الخروف (আল-খুরুফ) ছাগলের শাবক..... ৩৫০

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৩৫০

স্বপ্নে ছাগল ছানা দেখার ব্যাখ্যা..... ৩৫০

২৭০. الخزز (আল-খুযায) নর খরগোস.....৩৫০

২৭১. الخشاش (আল খাশাশ) পোকা-মাকড়.....৩৫১
হাদীসে পোকা-মাকড়ের বর্ণনা.....৩৫১

২৭২. الخفاش (আল-খাশাফ) চামচিকা/ বাদুড়.....৩৫২

২৭৩. الخشرم (আল খাশরাম) ভিমরুল ঝাঁক.....৩৫৩

২৭৪. الخشف (আল খিশফ্) হরিণের বাচ্চা.....৩৫২
ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা.....৩৫৩

২৭৫. الخضارى (আল খাদারা) এক জাতীয় পাখি.....৩৫৪

২৭৬. الخضرم (আল খাদরাম) গুইসাপের বাচ্চা.....৩৫৪

২৭৭. الخضيرا (আল খাদীরা) পাখি.....৩৫৪

২৭৮. الخطاف (আল খাত্তাফ) আবাবীল.....৩৫৪
আবাবীলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা.....৩৫৫
আবাবীলের কৌশল.....৩৫৬
চোখের জন্য সুস্থতা.....৩৫৬
ফায়েদা.....৩৫৭
আবাবীলের শ্রেণীবিন্যাস.....৩৫৭
আবাবীলের শরঈ বিধান.....৩৫৯
'চিকিৎসায় আবাবীল'.....৩৫৯
স্বপ্নে আবাবীল দেখার ব্যাখ্যা.....৩৬০

২৭৯. الخطاف (আল খাত্তাফ) সামুদ্রিক মাছ.....৩৬১

২৮০. الخفاش (আল খুফফাশ) বাঁদুড়.....৩৬১
জ্ঞাতব্য.....৩৬১
ফিকহী মাসআলা.....৩৬৩
শরীয়তে বাদুড়ের হুকুম.....৩৬৪
পরিশিষ্ট.....৩৬৪
চিকিৎসায় বাদুড়.....৩৬৫
স্বপ্নে বাদুড় দেখার তাবীর.....৩৬৫

২৮১. الخنان (আল খান্নান) টিকটিকি.....৩৬৫

২৮২. الخنوس (আল খানাম্বুছ) একধরনের পাখি ৩৬৬
২৮৩. الخلد (আল খুলদ) ছুঁচো ৩৬৬
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা পরীক্ষার ঘটনা ৩৬৬
ইরাম নদীর বাঁধ ৩৬৯
পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ৩৭১
আরেকটি আমল ৩৭১
ছুঁচোর শরঈ বিধান ৩৭১
উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য ৩৭২
চিকিৎসায় ছুঁচোর উপকারিতা ৩৭২
স্বপ্নে ছুঁচোর ব্যাখ্যা ৩৭৩
২৮৪. الخلفة (আল খিলফাতু) গর্ভবর্তী উটনী ৩৭৩
হাদীস শরীফে গর্ভবর্তী উটনীর আলোচনা ৩৭৩
জ্ঞাতব্য ৩৭৪
হযরত ইবনে উমরের হাদীস ৩৭৪
জ্ঞাতব্য ৩৭৫
ইচ্ছাকৃত সন্দেহ ৩৭৫
নিরেট প্রতিজ্ঞা ৩৭৫
মাসআলা ৩৭৬
পরিশিষ্ট ৩৭৭
২৮৫. الخمل (আল খামলু) একপ্রকার মৎস্য ৩৭৯
২৮৬. الخنتعة (আল খানতাআতু) শিয়ালিনী ৩৭৯
২৮৭. الخندع (আল খানদাউ) ছোট টিড্ডি ৩৭৯
২৮৮. الخنزير البرسى (আল খিনযিরুল বারছী) ৩৮০
স্থলজ শূকর, খিনজীর ৩৮০
খিনযিরের স্বভাব ৩৮০
হাদীস শরীফে খিনযিরের আলোচনা ৩৮১
জ্ঞাতব্য ৩৮২
দুনিয়া অন্বেষণকারীর জন্য শিক্ষনীয় ঘটনা ৩৮৩
শরীয়তে শূকরের হুকুম ৩৮৫
ফায়েদা ৩৮৬
খিনজিরের উদাহরণ ৩৮৭

ইবনে দূরাইদ.....৩৮৭
চিকিৎসায় খিনজিরের উপকারিতা.....৩৮৯
স্বপ্নে শূকর দেখার ব্যাখ্যা.....৩৯০
২৮৯, الخنزير البحرى (আল খিনযিরুল বাহরী).....৩৯০
সামুদ্রিক শূকর.....৩৯০
২৯০. الخنفساء (আল খিনফাছা) গোবরে পোকা.....৩৯১
একটি আশ্চর্য ঘটনা.....৩৯২
একটি ঘটন.....৩৯৩
গোবরে পোকার শরয়ী বিধান.....৩৯৩
প্রবাদ বাক্য.....৩৯৩
চিকিৎসায় গোবরে পোকা.....৩৯৪
স্বপ্নে গোবরে পোকার তাবীর.....৩৯৪
২৯১. الخنوص (আল খিনুছ) শূকর শাবক.....৩৯৪
শূকর ছানার শরয়ী বিধান.....৩৯৫
চিকিৎসায় উপকারীতা.....৩৯৫
১৯২. الخيتعور (আল খাইতাউর) বাঘ.....৩৯৫
১৯৩. الخيدع (আল খিদা) বিড়াল.....৩৯৫
২৯৩. الاخيل (আল আখিল) সবুজ পাখি.....৩৯৫
১৯৪. الخيل (আল খাইল) ঘোড়া.....৩৯৬
ঘোড়ার মর্যাদা.....৩৯৬
হাদীসে ঘোড়ার আলোচনা.....৩৯৬
ফায়েদা.....৪০২
নবী করীম (সঃ) এর ঘোড়াসমূহ এবং তাদের নাম.....৪০৫
ইলম-এর সম্মান.....৪০৫
মাসয়ালা.....৪০৭
তৃতীয় দলীল আকলী.....৪০৮
ঘোড়ার শরয়ী হুকুম.....৪১১
ঘোড়া সম্পর্কে প্রবাদ.....৪১৩
চিকিৎসায় ঘোড়ার উপকারিতা.....৪১৩
স্বপ্নে ঘোড়া দেখার তাবীর.....৪১৩
কার্যকরী চিকিৎসা.....৪১৪

২৯৫. ام خنور (উম্মু খুন্নুর) বেজী ৪১৪

باب الدال

পরিচ্ছেদ : দাল ৪১৪

২৯৬. الدابة (আদ্ দাব্বাহ) ভূ-পৃষ্ঠে বিবরচণকারী প্রাণী ৪১৪
একটি আশ্চর্যজক ঘটনা ৪১৭
একটি ঘটনা ৪১৮
মাসআলা ৪২৬
ফায়েদা ৪২৭
বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ ৪৩২
ফায়েদা ৪৩৩
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্ন ৪৩৩
"দাব্বাহ"-এর আকৃতি ৪৩৬
মাসয়ালা ৪৩৬
মাসআলা ৪৩৭

২৯৭. الداجن (আদ্ দাজিন্) গৃহপালিত বকরী ৪৪০
হাদীসে দাজেন শব্দের উল্লেখ ৪৪০
পরিশিষ্ট ৪৪১

جحا শব্দের ভাষাগত বিশ্লেষণ ৪৪২

২৯৮. الدارم (আদ-দারেম) সজারু ৪৪২

২৯৯. الدباء (আদ-দাব্বাউ) টিড্ডি ৪৪৩
হাদীসে দাবা তথা টিড্ডির উল্লেখ ৪৪৩

৩০০. الدب (আদ দুব) ভাল্লুক ৪৪৩
ভাল্লুকের শরয়ী বিধান ৪৪৪
চিকিৎসায় ভাল্লুকের উপকারিতা ৪৪৬
স্বপ্নে ভাল্লুক দেখার তাবীর ৪৪৬

৩০১. আদ- দাবদাব (الدبدب) বন্য গাধা ৪৪৭

৩০২. আদ-দাবারু (الدبر) মৌমাছি ৪৪৭
একটি ঘটনা ৪৪৮

৩০৩. الدبسى (আদ্-দাবুসী) বন্য কবুতর ৪৪৯

হাদীসে দুবুসীর উল্লেখ ৪৪৯
দুবুসীর শরঈ বিধান ৪৫০
দুবুসীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে ৪৫১
দুবুসী স্বপ্নে দেখার তা'বীর ৪৫১
৩০৪. الدجاج (আদ-দুজাজ) মুরগি ৪৫১
ডিমের ভিতরকার বাচ্চার প্রজাতি নির্বাচনের পদ্ধতি ৪৫২
মোরগ মুরগি চেনার উপায় ৪৫৩
একটি ঘটনা ৪৫৩
জ্ঞাতব্য ৪৫৪
শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাযি.-এর ঘটনা ৪৫৬
হেকায়েত ৪৫৭
মুরগির শরঈ বিধান ৪৫৯
প্রবাদ প্রবচন ৪৬১
মুরগির ঔষধি গুণ ৪৬১
আমলসমূহ ৪৬২
৩০৫. الدجاجة الحبشية (আদ-দাজাজাতুল হাবশীয়াহ) চীনা মুরগি ৪৬৪
৩০৬. الدج (আদ্‌দাজ্জু) সামুদ্রিক পাখি ৪৬৫
৩০৭. الدحرج (আদ্‌দাহরাজ) একধরনের ছোট চতুষ্পদ প্রাণী ৪৬৫
৩০৮. الدخاس (আদ্‌দুখাস)একধরনের ছোট পাখি ৪৬৫
৩০৯. الدخس (আদ্‌দুখখাসু) একধরনের সামুদ্রিক প্রাণী ৪৬৫
৩১০. الدخيل (আদ্‌দুখখালু) মেটে রঙের একধরনের ছোট পাখি ৪৬৫
৩১১. الدرج (আদ্‌দূরাজু) তিতির ৪৬৫
তিতিরের শরঈ বিধান ৪৬৬
প্রবাদ প্রবচন ৪৬৬
তিতিরের ঔষধি গুণ ৪৬৬
তিতির স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৪৬৭
৩১২. الدراج (আদ্‌দারাজ) সজারু ৪৬৭
জ্ঞাতব্য ৪৬৭
৩১৩. الدرباب (আদ্‌দারবাব) বাজ ৪৬৮

৩১৪. الدرحرج (আদ্‌দারহারাজ) একধরনের ছোট পাখি ৪৬৮
৩১৫. الدرص (আদ-দিরছ) ইঁদুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদির ছানা..... ৪৬৯
প্রবাদ প্রবচন ৪৬৯
৩১৬. الدرة (আদ-দূরাতু) তোতা..... ৪৬৯
৩১৭. الدساسة (আদ-দাসাসাতু) সাপ..... ৪৬৯
৩১৮. الدعسوقة (আদ-দা'ছুকাতু)..... ৪৭০
গোররে পোকার মত একটি প্রাণী..... ৪৭০
৩১৯. الدعموس (আদ্দু'মুছুন) পানির কালো পোকা..... ৪৭০
হাদীসে দু'মুছুনের উল্লেখ ৪৭০
মাসআলা..... ৪৭১
প্রবাদ প্রবচন ৪৭১
৩২০. الدغفل (আদ্‌দাগফাল) হাতীর বাচ্চা ৪৭১
৩২১. الدغناش (আদ্‌দাগনাশ) একধরনের চড়ুই পাখি..... ৪৭২
৩২২. الدقيش (আদ্ দুকাইশ) একধরনের চড়ুই পাখি ৪৭২
৩২৩. الدلدل (দুলদুল) দুলদুল ৪৭৩
দুলদুলের শরঈ বিধান..... ৪৭৩
প্রবাদ প্রবচন ৪৭৪
৩২৪. الدلفين (আদ্‌দালফিন) ঘড়িয়াল মাছ..... ৪৭৪
ডলফিনের শরঈ বিধান..... ৪৭৪
ডলফিনের ঔষধি গুণ..... ৪৭৪
ডলফিন স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা..... ৪৭৫
৩২৫. الدلق (আদ্‌দালক্ব) ছামুরের মত একধরনের প্রাণী ৪৭৫
দালকের ঔষধী গুণ..... ৪৭৬
৩২৬. الدلم (আদ্‌দালামু) একধরনের কীট ৪৭৬
৩২৭. الدلهما (আদ্‌দালহামা) মানুষের অনুরূপ একধরনের প্রাণী..... ৪৭৬
৩২৮. الدم (আদ্‌দিমু) সুসজ্জিতকরণ..... ৪৭৬
৩২৯. الدنة (আদ্‌দিন্নাতু) পিপিলিকার মতএকধরনের প্রাণী ৪৭৬

৩৩০. الدنيلس (আদন্দুনাইলিস) পানিতে বসবাসকারী এক ধরণের প্রাণী .৪৭৬
৩৩১. الدهانج (আদ্‌দাহানিজ) উট ৪৭৮
৩৩২. الدوبل (আদ্‌দুবাল) ছোট গাধা.....৪৭৮
৩৩৩. الدود (আদ্‌দুদ) কীট ৪৭৮
৩৩৪. دود القز (দুদুল কায) রেশম পোকা.....৪৮১
মাসড়াসা ও রেশম পোকার বাক্যলাপ.....৪৮৪
পরিশিষ্ট ৪৮৩
পোকার শরঈ বিধান.....৪৮৪
রেশম পোকার ঔষধী গুণ.....৪৮৪
রেশম পোকা স্বপ্নে দেখার তাবীর.....৪৮৫
৩৩৫. الدوالة (দাওয়ালাতুন) খেঁকশিয়াল.....৪৮৫
৩৩৬. الدودمس (আদ্‌ দাওদামছুন) সাপ.....৪৮৫
৩৩৭. الدوسر (আদ্‌ দাওছারু) মোটা উট ৪৮৫
৩৩৮. الديسم (আদ্‌দুয়াইছিম) ভাল্লুকের বাচ্চা.....৪৮৫
৩৩৯. الديك (আদ্‌দিক) মোরগ.....৪৮৬
মোরগের শরঈ বিধান ৪৯০
প্রবাদ প্রবচন.....৪৯০
ফায়েদা.....৪৯০
মোরগের ঔষধি গুণ ৪৯৪
স্বপ্নে মোরগ দেখার ব্যাখ্যা.....৪৯৫
৩৪০. ديك الجن (দিকুল জিন্ন) একটি ছোট প্রাণী ৪৯৬
৩৪১. الديلم (আদ্‌-দীলাম) তিতির পাখি.....৪৯৭
৩৪২. ابن داية (ইবনু দাইয়া) সাদা-কালো রেখাবিশিষ্ট কাক.....৪৯৭
ফায়েদা.....৪৯৭
উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের ঘটনা ৪৯৭
৩৪৩. الدئل (আদ্‌ দুইলি) বেজী সদৃশ একটি প্রাণী ৪৯৮
ইলমে নাহুর নামকরণ ৪৯৯
ঘটনাবলি.....৪৯৯

আবু জাহাম আদভীর ঘটনা..... ৫০০

باب الذال

পরিচ্ছেদ : যাল..... ৫০২

৩৪৪. ذوالة (জোয়ালাতুন) নেকেড়ে বাঘ..... ৫০২

হাদীসে নেকড়ের উল্লেখ..... ৫০২

৩৪৫. الذراح (আজ্জার্‌রাহ) উড়ন্ত কীট..... ৫০২

আজ্জার্‌রাহ-এর শরঈ বিধান..... ৫০২

জার্‌রাহ-এর ঔষধি গুণ..... ৫০২

৩৪৬. الذراح (আজ্জার্‌বাহ) নীল গাই-এর বাচ্চা..... ৫০৩

৩৪৭. الذعلب (আজ্জা'লাব) দ্রুতগামী উটনী..... ৫০৩

৩৪৮. الذباب (আজ্জুবাব) মাছি-মক্ষী..... ৫০৩

হাদীস শরীফে মাছির উল্লেখ..... ৫০৪

ইমাম ইউসুফ ইবনে আইউব হামদানীর ঘটনা..... ৫০৬

ইমাম শাফেয়ী ও মামুনুর রশীদের ঘটনা..... ৫০৭

মাছির শরয়ী বিধান..... ৫০৮

শাখা মাসআলা..... ৫০৮

শাখা মাসআলা..... ৫০৯

প্রবাদ-প্রবচন..... ৫০৯

মাছির চিকিৎসা সেবা..... ৫১১

মাছির প্রকোপ দূর করার উপায়..... ৫১১

স্বপ্নে মাছি দেখা..... ৫১২

৩৪৯. الذر (আয্-যার) লাল পিঁপড়া..... ৫১২

হাদীসে ذرة পিপিলিকার উল্লেখ..... ৫১৪

স্বপ্নে পিপিলিকা দেখিবার ব্যাখ্যা..... ৫১৮

৩৫০. الذئب (আয-যি'বু) নেকড়ে বাঘ..... ৫১৮

মৃতআ সম্পর্কে ইবনে যুবায়েরের বক্তব্য..... ৫১৯

মহিলাদের সতর্কতার একটি ঘটনা..... ৫২২

ফায়েদা..... ৫২৭

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর ন্যায় বিচারের প্রভাব..... ৫৩০

শরীতে বাঘের হুকুম..... ৫৩১

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য.....৫৩০
চিকিৎসায় বাঘের উপকারিতা.....৫৩২
বাঘদের একত্র করার ম্যাজিক.....৫৩৩
বাঘদের তাড়ানোর ম্যাজিক.....৫৩৩
স্বপ্নে বাঘ দেখার ব্যাখ্যা.....৫৩৪
৩৫১. الزيخ (আয-যি'খু) বেজী.....৫৩৪
হাদীসে বেজীর উল্লেখ.....৫৩৪
পরিচ্ছেদ : 'রা'.....৫৩৬
৩৫২. الراحلة (আররাহিলাতু) সাওয়ারী উট.....৫৩৬
হাদীসে রাহিলার উল্লেখ.....৫৩৭
৩৫৩. الرال (আর-রায়ালা) উট পাখির শাবক.....৫৩৮
৩৫৪. الراعى (আররায়ী) ঘুঘু ও কবুতরের বাচ্চা.....৫৩৯
৩৫৫. الربى (আররুবী) ছাগল শাবক.....৫৩৯
৩৫৬. الرباح (আর-রাবাহ) বিড়াল সাদৃশ্য এক প্রাণী.....৫৩৯
৩৫৭. الرباح (আর-রুবাহ) নর বানর.....৫৪০
৩৫৮. الربع (আর-রুবহু) উষ্ট্রীর শাবক.....৫৪১
৩৫৯. الربيبة (আর-রুবাইতু) জমিনের পোকা-মাকড়.....৫৪০
জাতীয় এক প্রাণী.....৫৪০
৩৬০. الرتوت (আর-রাতুতু) নর শুকর.....৫৪০
৩৬১. الرثيلا (আর-রুছাইলা) বিষাক্ত প্রাণী.....৫৪১
চিকিৎসায় রুছাইলা.....৫৪১
স্বপ্নে রুছাইলার ব্যাখ্যা.....৪৪১
৩৬২. الرخل (আর-রাখলু) ভেড়ার নারী শাবক.....৪৪১
৩৬৩. الرخ (আর-রুখ্খু) সামুদ্রিক পাখি.....৪৪২
স্বপ্নে রুখ-এর ব্যাখ্যা.....৪৪৩
৩৬৪. الرخمة (আর-রাখমাতু) শুকনি সাদৃশ্য পাখি.....৫৪৪
রখমাতুর শরয়ী হুকুম.....৫৪৫
উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য.....৫৪৫

চিকিৎসায় রাখামাহ ৫৪৬
স্বপ্নে রুখামাহর ব্যাখ্যা ৫৪৫
৩৬৫. الرشاء (আর-রাশায়ু) হরিণ শাবক ৫৪৫
২৬৬. الرشك (আর-রুশক) বিচ্ছু ৫৪৭
৩৬৭. الرفراف (আর-রাফরাফ) এক পাখি ৫৪৮
৩৬৮. الرق (আর-রিক্কি) কুমীর সাদৃশ্য সামুদ্রিক প্রাণী ৫৪৮
৩৬৯. الركاب (আর রিকাব) সাওয়ারী উট ৫৪৮
হাদীসে রিকাবের উল্লেখ ৫৪৯
৩৭০. الركن (আর-রাক্‌নু) ইদুঁর ৫৪৯
৩৭১. الرمكة (আর-রামাকাতু) তুর্কি ঘুড়ি ৫৪৯
মাসয়ালা ৫৪৯
৩৭২. الرهدون (আর-রাহদুন) চড়ুই পাখির সাদৃশ্য পাখি ৫৪৯
৩৭৩. الروبيان (আর-রুবিয়ান) ক্ষুদ্র লাল রঙের মাছ ৫৪৯
চিকিৎসায় রুবিয়ান ৫৪৯
৩৭৪. الريم (আর-রাইমু) হরিণ শাবক ৫৫০
৩৭৫. ام رباح (উম্মি রাবাহ) বাজ পাখি সাদৃশ্য পাখি ৫৫০
৩৭৬. ابو رباح (আবু- রিবাহ) একপ্রকার পাখি ৫৫১
৩৭৭. ذورميح (যাওরামিহ) ইঁদুর সাদৃশ্য এক প্রাণী ৫৫১

باب الزاء
পরিচ্ছেদে : 'যা' ৫৫১
৩৭৮. الزاغ (আয-যাগ) শুরাব কাক ৫৫১
আশ্চার্য কাহিনী ৫৫১
সার কথা ৫৫২
কাফের শরয়ী হুকুম ৫৫৫
চিকিৎসায় কাক ৫৫৫
স্বপ্নে কাকের ব্যাখ্যা ৫৫৫
৩৭৯. الزق (আযযাকী) মোগর ৫৫৫

৩৮০. الزامور (আযযামুর) মানবদেহ প্রাণী মাছ.....৫৫৬
৩৮১. الزبابة (আয-যাবাবাতু) বন্য ইঁদুর ৫৫৬
বন্য ইঁদুরের উদাহরণ ৫৫৭
৩৮২. الزبذب (আয-যাবযাব) বিড়াল সাদৃশ্য এক প্রাণী.....৫৫৭
৩৮৩. الزخارف (আয-যুখারুফ) পানির উপর উড়ন্ত কেন্নো ৫৫৮
৩৮৪. الزرزور (আয-যুরযুর) চড়ুই সাদৃশ্য এক পাখি ৫৫৮
ফায়েদা.....৫৫৮
শরীয়তে যুরযুর.....৫৫৯
চিকিৎসায় যুরযুর.....৫৫৯
স্বপ্নে যুযযুরের ব্যাখ্যা.....৫৫৯
৩৮৫. الزرق (আয-যুরাক) শিকারী পাখি ৫৬০
শরীয়তে যুররাক ৫৬০
৩৮৬. الزرافة (আয-যারাফফাত) উট সাদৃশ্য এক প্রাণী.....৫৬০
শরীয়তে যুরাফফা.....৫৬১
স্বপ্নে যুরাফফার ব্যাখ্যা ৫৬৩
৩৮৭. الزرياب (আয যারয়াব) চড়ুই পাখি ৫৬৩
৩৮৮. الزغبة (আয্-যুগবাতু) ইঁদুর সাদৃশ্য এক প্রাণী.....৫৬৪
৩৮৯. الزغلول (আয-যুগলুল) কবুতরে বাচ্চা.....৫৬৪
৩৯০. الزغيم (আয্-যাগীম) একপ্রকার পাখি.....৫৬৪
৩৯১. الزقة (আয-যুক্কাতু) সামুদ্রিক পাখি.....৫৬৪
৩৯২. الزلال (আয্-যুলাল) বরফের এক পোকা ৫৬৬
শরীয়তে যুলাল.....৫৬৬
৩৯৩. الزماج (আয-যুমাজ) এক পাখি.....৫৬৭
৩৯৪. الزمج (আল যুম্মাজ) এক শিকারী পাখি.....৫৬৭
শরীয়তে যুম্মাজ ৫৬৭
চিকিৎসা. যুম্মাজ ৫৬৭
৩৯৫. زمج الماء (যুম্মাজুল মাআ) কবুতর সাদৃশ্য পাখি ৫৬৭

শরীয়তে যম্মাজুল মাঅ ৫৬৭
৩৯৬. الزنبور (আল জুম্বুর) ভিমরুল ৫৬৮
শরীয়তে ভিমরুল ৫৭০
চিকিৎসায় ভিমরুল ৫৭১
স্বপ্নে ভিমরুলের ব্যাখ্যা ৫৭১
৩৯৭. الزندبيل (আল যানদাবীল) বড় হস্তী ৫৭১
৩৯৮. الزهدم (আয-যাহাদাম্) বাজ পাখির বাচ্চা ৫৭১
৩৯৯. ابو زريق (আবু যুরাইক) চড়ুই সাদৃশ্য পাখি ৫৭২
শরীয়তে আবু যুরাইক ৫৭২
৪০০. ابو زيدان (আবু যাইদান) এক জাতীয় পাখি বিশেষ ৫৭২
৪০১. ابو زياد (আবু যিয়াদ) গাধা ৫৭২
باب السين
পরিচ্ছেদ : 'সীন' ৫৭৩
৪০২. سابوط (ছাবুত) সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষ ৫৭৩
৪০৩. ساق حر (ছাকিহির) পুং ঘুঘু পাখি ৫৭৩
৪০৪. السالخ (আছ ছালিখ্) কালো সর্প ৫৭৩
৪০৫. سام ابرص (ছাম্মু আবরাছ) বড় টিকটিকি ৫৭৪
ছাম্মু আবরাসের শরয়ী বিধান ৫৭৪
চিকিৎসায় ছাম্মু আবরাসের উপকারিতা ৫৭৪
ছাম্মু আবরাসে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৫৭৫
৪০৬. السانح (আছ ছানিহ) এক জাতীয় পাখি ৫৭৫
৪০৭. السبد (আছ-ছুবাদু) অধিক চুল বিশিষ্ট পাখি ৫৭৫
৪০৮. السبع (আছ-ছুবউ) হিংস্র জন্তু ৫৭৬
হাদীসে ছুবউ-এর উল্লেখ ৫৭৬
আওলিয়াদের ঘটনাবলী ৫৮০
হিংস্র প্রাণীর শরয়ী বিধান ৫৮৭
৮০৯. السبنتى والسبندى (আছ-ছিবানতী ওয়াছ ছিবানদী) ৫৮৭

চিতা বাঘ.....৫৮৭
৪১০. السبيطر (আছ-ছুবাইতর) একটি পাখির নাম.....৫৮৮
৪১১. السحلة (আছ-ছাহলাহ) খরগোস-এর বাচ্চা.....৫৮৮
৪১২. السحلية (আছ-ছুহলাইয়াহ).....৫৮৮
টিকটিকির সাদৃশ্য একটি প্রাণী.....৫৮৯
৪১৩. السحا (আছ-ছাহা) বাদুড়.....৫৮৯
৪১৪. سحنون (ছাহনুন) একটি পাখির নাম.....৫৮৯
৪১৫. السخله (আছ-ছাখলাহ) বকরীর বাচ্চা.....৫৮৯
বকরীর শরয়ী বিধান.....৫৯২
মাসয়ালা.....৫৯৩
৪১৬. السرحان (আছ-ছারহান) নেকড়ে বাঘ.....৫৯৪
নেকড়ে বাঘের দৃষ্টান্ত এবং প্রবাদসমূহ.....৫৯৪
৪১৭. আছ-ছারতান (السرطان) কাঁকড়া.....৫৯৫
কাকড়ার শরয়ী বিধান.....৫৯৭
কাকড়ার ডাক্তারী উপকারিতা.....৫৯৭
কাকড়া স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা.....৫৯৭
৪১৯. আছ-চারফুত (السرفوت) এক প্রকারের কীট পতঙ্গ.....৫৯৮
৪২০. আছ-ছুরফাহ (السرفة) এক প্রকারের কীট-পতঙ্গ.....৫৯৮
ছুরফাহ-এর শরয়ী হুকুম.....৫৯৮
দৃষ্টান্ত উপস্থাপন.....৫৯৮
৪২১. আছ-ছারমান (السرمان) ভিমরুল.....৫৯৮
৪২২. আছ-ছারমাহ (السردة) স্ত্রী টিড্ডি.....৫৯৯
৪২৩. আছ-ছারমাহ (السرماح) পুরুষ ডিড্ডি.....৫৯৯
৪২৪. আছ-চুইদানাহ (السعدانة) কবুতর.....৫৯৯
৪২৫. ছি'লাত (السعلاة) জঙ্গলের ভূত.....৫৯৯
* ৪২৬. আছ-ছাফনাজ (السفنج) এক প্রকার পাখি.....৬০৪

৪২৭. আছ-ছাকবু (السقب) উষ্ট্রী শাবক ৬০৪

৪২৮. আছ-ছাকর (السقر) শকুনী সাদৃশ্য এক পাখি..... ৬০৪

৪২৯. আছ-ছাকানকুর (السقوقر) এক প্রাণী বিশেষ..... ৬০৪
ছাকানকুরের শরয়ী বিধান..... ৬০৫
চিকিৎসায় চাকানকুরের উপকারিতা..... ৬০৫
স্বপ্নে চাকানকুর দেখার ব্যাখ্যা..... ৬০৬

৪৩০. আছ-ছুলাহফাতুল বারিয়্যাহ (السلحفة البرية) স্থলের কচ্ছপ..... ৬০৬
কচ্ছপের শরয়ী বিধান..... ৬০৭
প্রবাদ বাক্য..... ৬০৭
চিকিৎসায় কচ্ছপের উপকারিতা..... ৬০৭
কচ্ছপ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা..... ৬০৮

৪৩১. ছুলাহফাতুল বাহরিয়্যা (السلحفاة البحرية) সামুদ্রিক কচ্ছব ৬০৮
ফায়েদা..... ৬০৮

৪৩২. আছ-ছিলফান (السلفان) চকোর পাখির শাবক ৬০৯

৪৩৩. আছ-ছিলকু (السلق) বাঘ..... ৬০৯

৪৩৪. আছ-ছিলকু (السلك) চকোর পাখির শাবব..... ৬০৯

৪৩৫. আছ-ছিলকুত (السلكوت) এক জাতীয় পাখি..... ৬০৯

৪৩৬. আছ-ছালওয়া (السلوى) এক বিখ্যাত ক্ষুদ্র লড়াইবাজ
পাখির মত একটি পাখি..... ৬০৯
চিকিৎসায় সালওয়া ৬১১
স্বপ্নে সালওয়া দেখার ব্যাখ্যা ৬১১

৪৩৭. আছ-ছুমানী (السمانى) ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখি..... ৬১২
ক্ষুদ্র রড়াইবাজ পাখির শরয়ী বিধান ৬১২
চিকিৎসায় ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখি..... ৬১২
স্বপ্নে ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির ব্যাখ্যা..... ৬১২

৪৩৮. আছ-ছামহাজ (السمحج) মাদী গাধা..... ৬১২

৪৩৯. আছ-ছিময়ু (السمع) নেকড়ে বাঘের শাবক ৬১৩
শরীয়তে নেকড়ে বাঘের শাবক ৬১৫

উদাহররন ও প্রবাদ বাক্য ৬১৫
৪৪০. আস-সামায়িম (السمائم) আবাবিল সাদৃশ্য এক প্রকার পাখি ৬১৫
৪৪১. আছ-ছিমছাম (السمسم) খেঁকশিয়াল ৬১৫
৪৪২. আছ-ছিমছুমাহ (السمسمة) লাল পিপিলিকা ৬১৫
৪৪৩. আছ-চামাক (السمك) মৎস্য ৬১৬
একটি আশ্চর্য কাহিনী ৬১৮
মৎস্যের শরয়ী বিধান ৬২১
ফেকায় মৎসের মাসয়ালা ৬২২
মাসয়ালা ৬২২
চিকিৎসায় মৎস্য ৬২৪
মৎস্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ৬২৪
৪৪৪. আছ-চামানদাল (السمندل) অগ্নিপ্রাণী ৬২৭
চিকিৎসায় চামানদাল ৬২৮
৪৪৫. আছ-ছাম্মুর (السمور) বিড়াল সাদৃশ্য প্রাণী ৬২৮
ছাম্মুর শরয়ী বিধান ৬২৯
স্বপ্নে ছাম্মুরের ব্যাখ্যা ৬২৯
৪৪৬. আছ-ছামাইতর (السميط) এক শ্রেণীর পাখি ৬২৯
৪৪৭. আছ-ছামানদর ও চামাইদর (السمندر والسميدر)
এক শ্রেণীর প্রাণী ৬২৯
৪৪৮. সিনাদ (سناد) গণ্ডার ৬২৯
৪৪৯. আছ-ছানজাব (السنجاب) ইঁদুর সাদৃশ্য প্রাণী ৬৩০
ছানজাবের শরয়ী বিধান ৬৩০
চিকিৎসায় চানজাবের উপকারিতা ৬৩১
৪৫০. সানদাওয়াতু সিন্নাহ (السندواةالسنة) মাদী বাঘ ৬৩১
৪৫১. আছ-ছানদাল (السندل) অগ্নি প্রাণী ৬৩১
৪৫২. আছ-ছিন্নাউর (السنور) বিড়াল ৬৩১
হাদীসে বিড়ালের উল্লেখ ৬৩২
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৬৩৩

বিড়ালের শরয়ী বিধান..... ৬৩৫
বিড়ালের উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৬৩৫
চিকিৎসায় বিড়াল..... ৬৩৬
স্বপ্নে বিড়ালের ব্যাখ্যা..... ৬৩৭
ছিন্নাউরের শরয়ী বিধান..... ৬৩৭

৪৫৩. আছ-ছুনুনু (السنونو) আবাবীল পাখি..... ৬৩৮

(৪৫৪ সাওদানিয়াহ ও সাওয়াদিয়া (السودانية والسوادية)
এক শ্রেণীর চড়ুই পাখি..... ৬৩৮
ঘটনা..... ৬৩৮
চিকিৎসায় সাওদানিয়া..... ৬৩৮

৪৫৫. সাওযানিক (السوذنيق) বাজ পাখি..... ৬৩৯

৪৫৬. সাওয়াসা (السوس) কীট বিশেষ..... ৬৩৯
ফায়েদা, আশ্চর্য ও বিরল..... ৬৪০
আমল–২ : কীটের শরয়ী বিধান..... ৬৪২
কীটের উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৬৪২

৪৫৭. আছ-ছীদ (السيد) বাঘ..... ৬৪২

৪৫৮. আছ-ছিদাহ (السيدة) মাদী বাঘ..... ৬৪২

৪৫৯. সাইফানাতু (سيفنة) এক পাখি বিশেষ..... ৬৪৩

৪৬০. আবু সিরাস (ابو سيراس) এক ধরনের প্রাণী বিশেষ..... ৬৪৩

باب الشين
পরিচ্ছেদ : 'শীন'..... ৬৪৩

৪৬১. আশ-শাদিন (الشادن) হরেণ..... ৬৪৩

৪৬২. শাদ হাওয়ার (شادهوار) এক ধরনের প্রাণী বিশেষ..... ৬৪৩

৪৬৩. আশ-শারিফ (الشارف) উট..... ৬৪৪

৪৬৪. আশ-শাত্তু (الشاة) ছাগল..... ৬৪৫
আশ্চর্য ঘটনাবলি..... ৬৫৩
হেফাজতের জন্য আমল..... ৬৫৩
দ্বিতীয় আমল :..... ৬৫৪

একটি আশ্চর্য ঘটনা..... ৬৫৫
ধনী হওয়া, ঋণ আদায়, শত্রুর উপর জয়লাভ এবং মসিবত
হতে হেফাজত থাকার আমল..... ৬৫৫
ইসমে আজম..... ৬৫৫
প্রসব বেদনায় আমল..... ৬৫৭
প্রসব বেদনার ২য় আমল..... ৬৫৭
সহজ প্রসবের প্রেসক্রিপশন..... ৬৫৭
হাদীসে চাগলের উল্লেখ..... ৬৫৮
শরীয়তে ছাগলের হুকুম..... ৬৫৮
মাসয়ালা..... ৬৫৮
সারকথা..... ৬৫৯
ফায়েদা..... ৬৫৯
মাসয়ালা..... ৬৬০
মাসয়ালা..... ৬৬০
মাসয়ালা..... ৬৬০
মাসয়াল..... ৬৬১
মাসয়ালা..... ৬৬১
মাসয়ালা..... ৬৬২
উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য..... ৬৬২
চিকৎসায় চাগলের উপকারিত..... ৬৬২

৪৬৫. আশ-শামুরক (الشامرك) একপ্রকার মুরগি..... ৬৬২

৪৬৬. আশ-শাহিন (الشاهين) বাজপাখি..... ৬৬২
শাহীনের প্রশ্রংসিত গুণ..... ৬৬৩
সর্বপ্রথম বাজপাখি দ্বারা শিকারকারী..... ৬৬৩
শরীয়তে বাজপাখির হুকুম..... ৬৬৪
আল্লামা দামেরী রহ.-এর একটি ছন্দময় চিঠি..... ৬৬৪
স্বপ্নে শাহীন দেখার ব্যাখ্যা..... ৬৬৫

৪৬৭. আশ-শাবাবু (الشبب) বৃদ্ধ গাভী..... ৬৬৫

৪৬৮. আশ-শাবাছু (الشبث) মাকড়শা..... ৬৬৫
শরীয়তে শাবছুনের হুকুম..... ৬৬৫

৪৬৯. আশ-শিবছান (الشبثان) একটি সরীসৃপ..... ৬৬৫
শরীয়ত শিবছানের বিধান..... ৬৬৫

৪৭০. আশ-শিবদি (الشبدع) বিচ্ছু..... ৬৬৫
হাদীসে শিবদির উল্লেখ ৬৬৫
৪৭১. আশ-শাবারবাছু (الشبربص) ছোট উট..... ৬৬৬
৪৭২. আশ-শাবলু (الشبل) সিংহ শাবক ৬৬৬
৪৭৩. আশ-শাবওয়াতু (الشبوة) বিচ্ছু..... ৬৬৬
৪৭৪. আশ-শাবুত (الشبوط) একপ্রকার মাছ..... ৬৬৬
৪৭৫. আশ-শিজা' (الشجاع) অজগর সাপ ৬৬৬
মালেক ইবনে আদহামের ঘটনা..... ৬৬৬
হাদীসে অজগর সাপের উল্লেখ ৬৬৭
অজগর স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা..... ৬৬৯
৪৭৬. আশ-শাহরুর (الشحرور) সুরেলা পাখি..... ৬৬৯
শরীয়তে শাহরুরের হুকুম..... ৬৭০
স্বপ্নে শাহরুরের ব্যাখ্যা..... ৬৭০
৪৭৭. শাহমাতুল আরদ (شحمة الارض) কেঁচো..... ৬৭০
চিকিৎসায় কেঁচোর উপকারিতা..... ৬৭০
৪৭৮. আশ-শিযা (الشذا) কুকুরের মশা ৬৭১
৪৭৯. আশ-শারান (اشران) মশা সদৃশ প্রাণী..... ৬৭১
৪৮০. আশ-শারশাক, শাকরাক, শারশুর/ চড়ুই সদৃশ এক পাখি ৬৭১
৪৮১. আশ-শারগু (الشرغ) ব্যাঙ..... ৬৭১ الشرشور - الشرشق - الشقراق
৪৮২. আশ-শারনবী (الشرنبى) এক প্রসিদ্ধ পাখি..... ৬৭১
৪৮৩. আশ-শাছারু (الشصر) হরিণের শাবক ৬৭১
৪৮৪. আশ-শা'রাউ (الشعراء) নীল/ লাল মশা বিশেষ ৬৭১
হাদীসে নীল/ লাল মশার উল্লেখ ৬৭১
৪৮৫. আশ-শাগওয়া (الشعواء) ঈগল পাখি..... ৬৭৬
৪৮৬. আশ-শিফদা' (الشفداع) ব্যাঙ ৬৭৬
৪৮৭. আশ-শিফনীন (الشفنين) বন্য কবুতর..... ৬৭৬

الشفنينيشنين শরীয়তে শিফনীনের হুকুম.....৬৭৬
চিকিৎসায় শিফনীন.....৬৭৭
৪৮৮. আশ-শাক (الشاق) মানুষ সদৃশ.....৬৭৭
আরবের প্রসিদ্ধ দুই গণক.....৬৭৭
ইয়ামানের বাদশার দুঃস্বপ্ন এবং শেষ নবীর পূর্বাবাস.....৬৭৮
রাসূল সা.-এর শুভজন্মে কেসরার প্রাসাদে কম্পন.....৬৮০
কেছরার নিজ ঘাতক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ.....৬৮২
৪৮৯.আশ-শাকাহতাব (الشقحطب) ভেড়া.....৬৮২
৪৯০. আশ-শাকযান (الشقذان) টিকটিকি.....৬৮২
৪৯১. আশ-শিকরাক (الشقراق) একটি অমঙ্গলে পাখি.....৬৮৩
শরিয়তে শিকরাকের হুকুম.....৬৮৩
শিকরাকের উদাহরণ.....৬৮৪
চিকিৎসায় শিকরাক.....৬৮৪
স্বপ্নে শিকরাক দেখার ব্যাখ্যা.....৬৮৪
৪৯২. আশ-শামছিয়াতু (الشمسية) লাল.চকচকে সাপ.....৬৮৪
৪৯৩. আশ্-শানকাব () এ) একশ্রেণীর পাখি.....৬৮৪
৪৯৪. শাহ (شه) একপ্রকার পাখি.....৬৮৪
৪৯৫. আশ-শাহাম (الشهام) তূত-পেত্নী.....৬৮৫
৪৯৬. আশ-শাহরুমান (الشهرمان) একটি সামুদ্রিক পাখি.....৬৮৫
৪৯৭. আশ-শাওহাতু (الشوحة) চিল.....৬৮৫
৪৯৮. আশ-শাওফু (الشوف) শজারু.....৬৮৫
৪৯৯. আশ-শাওশাব (الشوشب) উকুন, বিচ্ছু, পিপিলিকা.....৬৮৫
৫০০. আশ-শাওতু (الشوط) একশ্রেণীর মাছ.....৬৮৫
৫০১. শাওতু বারাহ (شوط براح) শৃগাল.....৬৮৫
৫০২. আশ-শাওয়ালু (الشول) দুধহীন উষ্ট্রী.....৬৮৫
শাওয়ালুর উদাহরণ.....৬৮৫
৫০৩. শাওলাহ (شولة) বিচ্ছু.....৫৮৫

৫০৪. আশ-শাইখুল ইয়াহুদী (মানুষ সদৃশ এক প্রাণী) ৫৮৬
الشيخ اليهودى শায়খে ইয়াহুদীর শররী হুকুম ৫৮৬
চিকিৎসায় শায়খে ইয়াহুদী ৫৮৬
৫০৫. আশ-শিযমান (الشزمان) বাঘ ৫৮৬
৫০৬. আশ-শিছবান (الشيصبان) নর পিপিলিকা ৫৮৬
৫০৭. আশ-শাইহ (الشيح) সিংহ শাবক ৫৮৬
৫০৮. আশ-শীম (الشيم) মাছ ৫৮৬
৫০৯. আশ-শায়হাম (الشيهم) নর শজারু ৫৮৬
৫১০. আবু শাবকুনাহ (ابو شبقولة) একটি পাখি বিশেষ ৫৮৮

https://t.me/islaMic_fdf

১৩৫. الجان (আল-জান্ন) চিকন সাদা সাপ

একপ্রকার সাপকে 'আল-জান্ন' বলে। এ সাপগুলী ছোট ও হালকা-পাতলা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে সাপের আলোচনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا

এরপর যখন সে ওটাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল (হালকা পাতলা সাপ দ্রুত ছুটাছুটি করতে পারে) তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল।

–সূরা নাম্‌ল : ১০

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وما تلك بيمينك يا موسى * قال هى عصاى اتوكؤ عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مارب اخرى * قال القها يا موسى * فالقها فاذا هى حية تسعى۔

হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? সে বলল, ওটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দিই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি এটা নিক্ষেপ কর। এরপর সে ওটা নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে ওটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। –সূরা ত্বাহা : ১৭-২০

জ্ঞাতব্য

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে যে লাঠি ছিল, সেটা নিক্ষেপ করাতে আল্লাহর হুকুমে সাপে পরিণত হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠিটা হলদে রংয়ের সাপে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে একস্থানে বলা হয়েছে– جان | كانها جان শব্দটি আরবী অভিধানে ছোট ও হালকা পাতলা সাপকে বলে। অন্য স্থানে এসেছে– ثعبان | فاذا هى ثعبان (ছু'বানুন) হল বৃহৎ, মোটাতাজা ও অজগর সাপ। উপরিউক্ত সূরা ত্বাহার আয়াতে বলা হয়েছে– حية। এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ছোট, বড়, হালকা, পাতলা, মোটাতাজা সব ধরনের সাপকেই حية বলে।

উপরিউক্ত শব্দাবলীর (حية، ثعبان، جان) এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কল্পে বলা যায়, প্রথমে সেই সাপটি হালকা পাতলা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা মোটাতাজা ও বড় হয়ে যায়। অথবা সাপটি বিরাট অজগর ছিল। কিন্তু তাকে

جان (হালকা পাতলা) এজন্য বলা হয়েছে যে, সেটি প্রকাণ্ড অজগর হওয়ার সত্ত্বেও অতি দ্রুত তার মাথা নড়াচড়া ও সঞ্চালন বা ছুটাছুটিতে সাপের মতই ছিল। অর্থাৎ বড় অজগরের বিপরীত ছোট হালকা পাতলা সাপের মতই ছিল তার গতিবেগ বা ছুটাছুটি।

কোন কোন তাফসীরকারক হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠিকে তিনটি গুণে ভূষিত করেছেন। (১) حية (২) جان (৩) ثعبان। এ লাঠি দুশমনের জন্য حية (সাপ) মোটাতাজা হওয়ার কারণে ثعبان (অজগর), দ্রুত গতিতে চলাফেরা ও ছুটাছুটির কারণে جان (হালকা পাতলা সর্প) ছিল।

ফারকাদ আস-সুল্‌জী (রহ.) বলেন, এ সাপের উভয় চোয়ালের মাঝখানের ফাঁক ছিল ৪০ গজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, তখন তা হলুদ লাল রঙের সাপে পরিণত হল। তার মুখ ছিল উন্মুক্ত, উভয় চোয়ালের মাঝে ব্যবধান ছিল ৮০ গজ এবং সাপটি মাটি হতে প্রায় এক মাইল দূরে নিজের লেজের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল। সাপটির নিচের ঠোঁট ছিল মাটিতে আর উপরের ঠোঁট ছিল ফিরাউনের মহলের দেওয়ালের ওপর।

"হায়াতুল হায়াওয়ান"-এর রচয়িতা অর্থাৎ এ গ্রন্থের লেখক বলেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন তার লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন আর দ্রুত সেটি অজগরে পরিণত হয়ে গেল, তখন সে সমবেত লোকদের উপর আক্রমণ করল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে ফিরাউনের উপর আক্রমণ করেছিল। যার কারণে ফিরাউন সিংহাসন হতে উঠে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। সাপটি যখন সমবেত লোকদের উপর আক্রমণ শুরু করল, তখন লোকজন ঘাবড়ে গেল এবং চিৎকার করতে লাগল। এর মধ্যে ভয়ভীতি ও ভয়াবহতার কারণে প্রায় পনের হাজার লোক মারা গিয়েছিল।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের وما تلك بيمينك يا موسى (তোমার ডান হাতে এটা কী হে মূসা?) জবাবে বলেছিলেন : আমি এতে ঠেস দিই, বকরীর জন্য বৃক্ষের পাতা পাড়ি। আর তার তৃতীয় কথা ছিল– ولى فيها مارب اخرى অর্থাৎ এতে আমার আরও অনেক কাজ আছে। যেমন, কাঁধে রেখে তাতে জিনিসপত্র, খানাদানা ঝুলিয়ে রাখা, ক্ষতিকারক প্রাণীকে প্রতিহতকরণ ইত্যাদি। হযরত ইবনে আব্বাস (রহ.) বলেন : হযরত মূসা (আঃ) এ লাঠির সাহায্যে অনেক কাজ করতেন। যেমন : ক্ষতিকারক প্রাণী হতে নিরাপদ থাকা। কোন শত্রু সম্মুখে এলে লাঠিটি কাজে লাগত। কোন কূপ হতে পানি বের

করতে। তাছাড়া হযরত মূসা (আঃ)-এর কোন ফল-ফলাদি খাওয়ার ইচ্ছা হলে তিনি মাটিতে পুঁতে দেয়ার সাথে সাথে তাতে ডাল-পালা হয়ে যেত এবং ফল ধরতে শুরু করত। তিনি এ লাঠির সাহায্যে রাত্রের বেলা মশালের কাজ করতেন।

১৩৬. الجبهة (আল-জাবহাতুন) ঘোড়া

ঘোড়া একটি অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ প্রাণী।

হাদীসে নববীতে ঘোড়ার আলোচনা

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

ليس فى الجبهة ولا فى النخة ولا فى الكسعة صدقة

"ঘোড়া, গাধা এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত গরুর উপর যাকাত নাই।"

ঘোড়াকে جبهة বলা হয়। 'জাবহাতুন' অর্থ, উত্তম বা দামি বস্তু। চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়াই শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই ঘোড়াকে 'জাবহা' বলা হয়। যেমন, গোত্রের নেতা বা মহান ব্যক্তিকে جبهة القوم বলা হয়। কেননা তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি। النخة শব্দটি النخ হতে উৎসারিত। অর্থ, দ্রুত চলা। আর الكسعة শব্দটি كسع হতে উদ্ভূত। এর অর্থ, কাজের বলদ বা গাধা।

১৩৭. الجثله (আল-জাসলাহ)[১] কালো পিপীলিকা

আল-জাসলাহ অর্থ, কালো পিপীলিকা বা পিঁপড়া। এর বিস্তারিত আলোচনা 'নূন' অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ করা হবে।

১৩৮. الجحل (আল-জাহ্‌লু) গিরগিটি

'জাহ্‌লু' অর্থ সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন : গিরগিটি। কেউ বলেছেন, বয়স্ক বৃদ্ধ গুইসাপ। কেউ বলেছেন, মৌমাছির রাণী;

---

১ কালো লম্বা পিপীলিকাকে 'জুসলাহ' বলা হয়। ওমানে একে الجارف (আল-জারিফ) বলে। কারও ঘরে বা কোন স্থানে যদি পিপীলিকা খুব বেশি হয় বা পিপীলিকার খুব উপদ্রব দেখা যায়, তাহলে কাগজের তিনটি টুকরাতে-

يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون-

লিখে পিপীলিকার গর্তের কাছে রেখে দিবে। পিপীলিকার উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

حتى اذا اتوا على واد শেষ পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে দম করে ওই পানি পিপীলিকার গর্তে ঢেলে দিলেও পিপীলিকার উপদ্রব থাকবে না।

পিপীলিকা, মশা ও বিচ্ছু (ছোট একধরনের বিষাক্ত পোকা) হতে বাঁচার জন্য কাগজের ৪টি টুকরাতে নিম্নের দু'আটি লিখে ঘরের চার কোণে ৪টি টুকরা পুঁতে দিলে এর উপদ্রব থাকবে না।

يس والقران، ص والقران، ق والقران، لو انزلنا هذا القران لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. اذهب ايها البق والبرغوث والنمل بأذن الملك الحق بألف لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم-

অনেকটা টিড্ডির মত। এ প্রাণী নিচে পড়ে গেলে তার দুই ডানা পরস্পর মিলিত হয় না। এর বহুবচন حجول (হাজুল) এবং حجلان (হাজলান) ব্যবহৃত হয়।

১৩৯. الجحمرش (আল-জাহমারাশ) দুগ্ধধাত্রী খরগোশ/ বন্ধ্যা নারী

'আল-জাহমারাশ'-এর কয়েকটি অর্থ আছে। দুগ্ধধাত্রী খরগোশ ও অতি বৃদ্ধা বন্ধ্যা নারী। এর বহুবচন حجامر (হাজামির) এবং ক্ষুদ্রতা বাচক বিশেষ্য হিসেবে حجيمر (হুজায়মির) হয়।

১৪০. الجحش (আল-জাহশ) গৃহপালিত বা বন্য গাধার বাচ্চা

'আল-জাহশ' বন্য বা গৃহপালিত গাধার ছোট ছোট বাচ্চাকে বলে। এর বহুবচন جحائش (জাহাইশ) এবং স্ত্রীলিঙ্গ جحشة (জুহশাহ)।

কেউ কেউ গরুর বাছুরকেও 'জাহশ' বলেছেন। তবে আরবের হুযাইল গোত্রের অভিধানে হরিণের শাবককে 'জাহশ' বলে।

উদাহরণ

جحيش و حدء আরবগণ এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলে থাকেন, যিনি নিজ অভিমতের উপর কঠোরভাবে আমল করেন। নিজ মত প্রকাশে অনন্য ও বুদ্ধিমান। আরবগণ নির্বোধের ব্যাপারে বলে থাকেন– اعيبوا وحدء "অমুক ব্যক্তি গাধা, বোকা"।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের পিতার নাম ছিল বাররাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নবকে বললেন : তোমার পিতা যদি মুসলমান হতেন, তাহলে আমি তার কোন একটি ভাল নাম রেখে দিতাম। কিন্তু তার নাম জাহাশ রাখা হয়।

১৪১. الجخدب (আল-জুখদাব) একপ্রকার টিড্ডি

الجخدب জীম অক্ষরে পেশ, খা অক্ষরে সাকীন আর দাল অক্ষরে যবর। টিড্ডির মতই একধরনের পাখির নাম। এর বহুবচন جخادب (জুখাদাব) এটা সবুজ রঙের এবং লম্বা ঠ্যাং বিশিষ্ট। কোন কোন প্রাণী বিশেষজ্ঞের মতে এ পাখি টিকটিকির মত হয়ে থাকে। একে আবু জুখাদেব বলে।

১৪২. الجد جد (আল-জুদজুদ) ঝি ঝি পোকা

ইমাম জাওহারী (রহ.) বলেন, এর টিড্ডির মতই একধরনের পাখি। এর বহুবচন جداجد (জুদাজুদ) হয়। মায়দানী বলেন, এক রকম বাঘ, সে সারা রাত্র আওয়াজ করে বেড়ায়। কিন্তু একে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শরঈ বিধান

জুদজুদ যদি অযূর পানিতে পতিত হয়ে মারা যায়, তাহলে সেই পানি পবিত্র থাকবে এবং এটা দ্বারা অযূ করা জায়েয। এ বিষয়ে ছোয়াদ অধ্যায়ে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞাতব্য

وضو (অযূ واو-এর উপর যবর) সেই পানিকে বলে যা দ্বারা অযূ করা হয়। আর واو অক্ষর পেশ দ্বারা وضو অযূ কর্মকে বুঝায়।

১৪৩. الجدالية (আল-জাদাইয়াহ) হরিণের বাচ্চা বা শাবক

আল-জাদাইয়াহ হরিণের ৬ বা ৭ মাসের বাচ্চাকে বলে। চাই তা নর বা মাদী হোক না কেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন : হরিণের নর শাবককে জাদাইয়াহ বলে। ইমাম আসমাঈ (রহ.) বলেন, জাদাইয়াহ হরিণের শাবক عناق ইনাক-এর মতই হয়। ইনাক হল বকরীর এক বছরের কম বয়সের বাচ্চা।

হাদীসে জাদাইয়াহ-এর আলোচনা

হযরত কালদাহ ইবনে হাম্বল বলেন, আমাকে আকায়ে নামদার সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান দরবারে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) দুধ, হরিণের বাচ্চা ও ক্ষীরা বা শসা দিয়ে প্রেরণ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক দরবারে এগুলো নিয়ে উপস্থিত হলাম, কিন্তু তাঁকে সালাম করতে ভুলে গেলাম। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে ভিতরে আস। এ ঘটনাটি সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের পরে ঘটেছিল।

দাখাবীস (ضخابيس) খিরা বা শসাকে বলে। জাদাইয়াহ হরিণের ছোট ছোট শাবককে বলে। চাই তা নর বা মাদী হোক।

১৪৪. الجدى (আল-জাদা) বকরীর নর শাবক

আল-জাদা বকরীর নর শাবককে বলে। আরবী ব্যাকরণ মতে বকরীর তিনটি বাচ্চার জন্য اجد ثلاثة এর বেশি হলে الجداء (আল-জিদায়া) বলা হয়ে থাকে।

হাদীসে উল্লেখ আছে–

'ইমাম আবু দাউদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার নামায পড়ছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাচ্ছিল। তিনি এটা তাড়িয়ে দিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনে আ'স (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বকরীর বাচ্চার ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : "বকরীর পালে একটি বাচ্চা ছিল। যাকে তার মা দুধ খাওয়াইয়া পেট ভরে দিত। মা তাকে লালন-পালন করছিল। একবার বাচ্চাটি তার মায়ের নিকট হতে পৃথক হয়ে গেল। (ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিল) বাচ্চাটি অন্যান্য বকরীর দুধ পান করল বটে; কিন্তু তার পেট ভরল না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ দৃষ্টান্তটি হল পরে আগমনকারী লোকদের জন্য। এদের মধ্যে একজনের কাছে এত ধন-সম্পদ হবে যে, তা একটি গোত্রের জন্য অথবা একদল লোকের জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও সেই লোকটি বলবে, তা আমার জন্য ভাল কিছু না।

'সাফওয়াতুস সাফওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, হযরত মুজাহিদ হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন : হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন– যদি কোথাও একটি বকরীর বাচ্চাও মারা যায়, তাহলে এটাতে আমার ভয় হয় যে, কিয়ামতের দিন না জানি আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনা করার জন্য তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। তুমি কেন উত্তমরূপে দেখাশুনা বা তত্ত্বাবধান কর নি? الطف (আত-তফ) কূফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। ফোরাত নদীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

প্রবাদ বাক্য

আরবগণ চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী দিয়ে বলে থাকেন–

تغدى بالجدى قبل ان يتعشى بك

বকরীর বাচ্চাকে রাত্রে ব্যবহার করার পূর্বে নাস্তায় ব্যবহার করে দেখ।

চিকিৎসায় বকরীর বাচ্চার উপকারিতা

বকরীর বাচ্চার গোশত ঠাণ্ডা, শুষ্ক এবং দ্রুত পরিপাক হওয়ার মত। লাল রঙের বকরীর বাচ্চার গোশত দ্রুত হজম হয়। অধিকন্তু তা একটি শ্রেষ্ঠ খাবারও বটে। যদিও শূলবেদনা বা 'কোলস্টোরাল'-এর জন্য ক্ষতিকারক। আবার অধিক মোটাতাজা বকরীর বাচ্চার গোশত দেরিতে হজম হয় এবং এতে কিছু ক্ষতিও

আছে। সার্বিকভাবে বকরীর গোশত ফোড়া, বাগী রোগের জন্য উপকারী। বকরীর বাচ্চার গোশত ঠাণ্ডার ঋতুতে ক্ষতিকারক এবং গরমে উপকারী। অন্যান্য ঋতুতে মধ্যম মানের উপকারী।

বকরীর বাচ্চা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

জবাইকৃত বকরী দেখা নিজ সন্তানের মৃত্যুর লক্ষণ। বকরীর বাচ্চার ভুনা গোশত দেখলে শিশু পুত্রের মৃত্যুর লক্ষণ। বকরীর বাচ্চার পা খেয়েছে দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টা বিপদ হতে অচিরেই মুক্তি পাবে। বাম পাজর খেতে দেখলে চিন্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বকরীর বাচ্চার সামনের অংশ খেতে দেখা মহিলা ও বালিকাদের দিকে ইঙ্গিত। আর পিছনের অংশ খেতে দেখা পুরুষদের দিকে ইঙ্গিত। বকরীর বাচ্চার ভুনা করা নরম নলা খাচ্ছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে পুরুষ ও মহিলাকে ধোঁকা দিচ্ছে। আর শক্ত দেখলে গীবত ও চোগলখোরীর দিকে ইঙ্গিত। বিস্তারিত আলোচনা 'খা' অধ্যায়ে الخروف (আল-খুরূফ)-এ আসবে।

১৪৫. اجدل (আজদাল) বাদুড়

'আজদাল' বাজ জাতীয় একপ্রকার শিকারি পাখি। আভিধানিক অর্থ, কঠোরতা। এ শব্দটি اجدل (আজদাল) اعجم (আ'জাম) আর اجدلى (আজদালী) اعجمى (আ'জামি)-এর ওযনে আসে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একে গায়রে মুনসারিফ পড়েছেন।

প্রবাদ বাক্য

بيض القطا يحضنه الاجدل 'চিলের ডিমে বাদুড়ে তা দেয়।' আরবগণ এ প্রবাদটি তখনই ব্যবহার করেন, যখন কোন সম্মানিত ও ভদ্র লোক তার বাসস্থান কোন অসম্মানিত লোককে দিয়ে দেন।

১৪৬. الجذع (আল-জাযায়ু) ভেড়ার এক বছরের শাবক

আল-জাযায়ু জীম ও যাল অক্ষরে যবর। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়েছে। কেউ বলেন, ৬ মাসের ভেড়ার বাচ্চাকে 'জাযায়ু' বলে। কেউ বলেন, ৭ মাসের বাচ্চাকে। এমনকি ৮ বা ১০ মাসের বাচ্চাকেও 'জাযায়ু' বলে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও উত্তম অভিমত হল, ভেড়ার এক বছরের বাচ্চাকে 'জাযায়ু' বলে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ও ভাষাবিদগণ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা কাজী আয়ায (রহ.) বলেন, বাচ্চার মাতাপিতাকে দেখতে হবে। তারা উভয়ে জোয়ান ও শক্তিশালী হলে ৬ মাসের বাচ্চার উপর 'জাযায়ু' প্রযোজ্য হবে। (কেননা এ অবস্থায় বাচ্চাও সবল হবে) কিন্তু বাচ্চার মা-বাবা কৃশ ও

দুর্বল হলে ৮ মাসের বাচ্চাকে জাযায়ু বলা হবে।

কোন কোন প্রাণীদের মতে যদি কোন বাচ্চার কোমরে পশম জমা হয়ে থাকলে ওই অবস্থায় তাকে জাযায়া বলে। বকরীর দুই বছরের বাচ্চাকে জাযায়া বলে। বিশুদ্ধ মতে এক বছরের বাচ্চাকে জাযায়া বলে। ইমাম জাওহারী (রহ.) বলেন, দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাকে 'জাযায়' বলে। এর বহুবচন جذعان (জাযায়ান) অথবা جذاع (জাযায়) আসে। আর স্ত্রীলিঙ্গের জন্য جذعة (জাযয়াতুন) এবং বহুবচনের জন্য جذعات (জাযায়াতুন) হয়।

মোটকথা, দুই বছরের বকরীর বাচ্চা, তিন বছরের ভেড়া দুম্বার বাচ্চা এবং ৫ বছরের উটের বাচ্চাকে 'জাযায়া' বলে।

সারকথা, উট, বকরী ও ভেড়া ইত্যাদির বাচ্চার একটি নির্দিষ্ট বয়স হলে একে جذع (জাযায়া) বলে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : যৌবন কালে আমি উকবা ইবনে আবু মুইতের বকরী চরাতাম। (একদিন) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। আসলে তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার কাফিরদের (ষড়যন্ত্র হতে) আত্মরক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে বালক! আমাদেরকে পান করানোর মত কোন দুধ কি তোমার নিকট আছে? আমি নিবেদন করলাম আমি এ বকরীর রাখাল মাত্র; মালিক নই। তাই আপনাদেরকে দুধ পান করাতে আমি অপারগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এমন একটি বকরী আন, যার সাথে বকরা বা পাঠার সঙ্গম হয় নি। আমি দ্রুত এমন একটি বকরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দোহনের জন্য তার পেছনের দুই পা বেঁধে ওলানে হাত বুলাতে লাগলেন। তারপর দুআ পড়লেন।

নবীজীর দুআর বরকতে ওলানে দুধ জমা হতে লাগল। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একটি বড় পেয়ালা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুবারক খেদমতে এলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ দোহন করলেন। এরপর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করলেন। তারপর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) দুধ পান করলেন আর সর্বশেষ অবশিষ্ট দুধ আমি পান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওলানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, পূর্বের মত হয়ে যাও। সুতরাং ওলানটি পূর্বের মত হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ মু'জিযা দেখে তার কাছে আসলাম এবং নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আপনি এরূপ কোন পন্থা শিখিয়ে দিন। তিনি বললে : তুমি শিখতে চাইলে শিখতে পার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে ৭০ প্রকার পন্থা (মু'জিযা) শিখলাম। তাতে কেউ আমার অংশীদার নেই।

আর মাবআস তথা নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেরণ সম্পর্কিত হাদীসে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল[১]-এর কথা বর্ণিত আছে– قال يا ليتنى فيها جذعا অর্থাৎ ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল বলেন, হায়! আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের প্রকাশকালীন সময়ে যুবক হতাম এবং তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতাম।[২]

---

১ ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি তার সময়ে তাওরাত ও ইনজিলের অতি উঁচুমানের আলেম ছিলেন। সুরইয়ানী ভাষা হতে আরবী ভাষায় ইনজিলের অনুবাদ করতেন। জাহিলিয়াতের জামানায় মূর্তিপূজা হতে বিমুখ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রকাশকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

২ এ বাক্যটি ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল সে সময় বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল। হঠাৎ ওহী নাযিল এবং ফেরেশতা জিবরাইলের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাশারিয়্যাত (মানবিক বৈশিষ্ট)-এর উপর অকস্মাৎ অবতরণ এবং নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব অর্পণের কারণে তিনি চিন্তিত হয়ে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন এবং হেরা গুহায় যে ঘটনা ঘটেছিল, তা তিনি খাদীজার নিকট বর্ণনা করলেন : আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার জীবনপাত হয়ে যাবে। (ওহীর মহত্ত্ব ও মহিমায় তাঁর ধারণা হল, ওহীর এ ভার আমার মানবিকতায় সহ্য হবে না অথবা নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে পরাভূত আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।) হযরত খাদীজা (রাঃ) সকল ঘটনা শুনে তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল-এর নিকট গমন করলেন। বললেন, হে আমার চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজা (রাসূলুল্লাহ (সাঃ))-এর অবস্থা তার নিজ মুখেই শুনুন। ওয়ারাকা নবীজী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে প্রিয় ভাতিজা! বল কী দেখেছ? তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল তাঁর (রাসূলুল্লাহ (সাঃ))-এর সকল অবস্থা শুনে বললেন : এ তো সেই বিখ্যাত ফেরেশতা। যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদি আমি তোমার নবুওয়াতের যামানায় শক্তিশালী ও যুবক হতাম, যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে দেশ হতে বের করে দিবে অথবা আমি কমপক্ষে যদি সেই সময় জীবিত থাকতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাজ্জব হয়ে বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন, এ ব্যাপারটি শুধু আপনার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। যে ব্যক্তিই নবী হয়ে আল্লাহর বাণী ও পয়গাম নিয়ে এসেছেন, জনগণ তার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আমি যদি আপনার সেই সংকটময় সময় জীবিত থাকি, তাহলে আমি আপনাকে বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করব। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং দাওয়াতী কাজের ঘোষণার পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন; কিন্তু ফাতহুল বারীর (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ) সূরা ইকরার তাফসীর অধ্যায় মুসনাদে বাযযার ও মুসতাদরাকে হাকিম-এ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তোমরা ওয়ারাকাকে মন্দ বল না, আমি জান্নাতে তার একটি বা দুটি বাগান দেখেছি।

তারকীব

উপরিউক্ত বাক্য جذعا শব্দটি حال-এর ভিত্তিতে منصوب হয়েছে এবং فيها-এর মাঝে যে যমীর (সর্বনাম) রয়েছে, তা যুল-হাল। মূল ইবারত يالیتنی مستقر فيها جذعا ছিল।

কেউ কেউ فيها এর পূর্বে فعل كان যা উহ্য মনে করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা كان হল فعل ناقص যা উহ্য ধরা যায় না। তবে কোন শাব্দিক কারণ থাকলে তখন উহ্য মানা যায়। কেননা ان خيرا فخير বাক্যে ان শব্দটি شرطيه (শরতিয়া)। আর তা-ই প্রমাণ করে এখানে কোন فعل উহ্য আছে। কেননা শব্দ ان শরতিয়ায় প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু ইসমে প্রবিষ্ট হয় না। আর এখানে ইসম-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই বুঝা গেল, এখানে একটি উহ্য فعل রয়েছে।

আলী ইবনে সালেহ বলেন, আবদুল মুত্তালিবের ১০ জন পুত্র ছিল। তাদের প্রত্যেকেই جذع (বকরীর বাচ্চা) খেতে পছন্দ করতেন।

হাদীস

আবু উমর ইবনে আবদুল বারব 'তামহীদ' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শাজারাহ তূবা[৩] (شجرة طوبٰی—পবিত্র বৃক্ষ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সিরিয়াতে একধরনের বৃক্ষ হয়, যাকে জাওযায়া (جوزاء—বাদাম গাছ) বলা হয় (সেই গাছটি শাজারা তূবা সদৃশ)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাওযায়া বৃক্ষের সার্বিক অবস্থা বেদুইনের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর বেদুইন 'শাজারা তূবা'-এর মূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল—সেটি কত মোটা হয়?

তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি ওয়ারাকাকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি সাদা পোশাক পরিধাণ করে আছেন। যদি তিনি জাহান্নামী হতেন, তবে অন্য পোশাক পরিধান করতেন।

[৩] বিভিন্ন হাদীসের সূত্রে জানা যায়, উর্ধাকাশে বৃক্ষ রয়েছে। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী রহ. তাঁর 'মাদারিজুন নবুওয়াত গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।' বর্তমানে প্রত্যেক পবিত্র সিলসিলার মানুষকে অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পবিত্র বংশকেও 'শাজারা তূবা'য় ব্যাখ্যা করা হয়। তূবা শব্দটি طيب-এর ইসমে তাফযীল স্ত্রীলিঙ্গের সীগাহ। যার অর্থ, অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি একটি জোয়ান উটের উপর আরোহণ করে ওই বৃক্ষের চারদিকে চক্কর দিতে চাও, তাহলে পারবে না। সেই জোয়ান উটটিও ক্লান্ত হয়ে মারা যাবে।

ইমাম সুহাইলী (রহ.) তার 'আত-তারীফ ওয়াল ইলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'শাজারা তূবা'-এর মূল জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাসাদ মুবারকে থাকবে এবং এর শাখা-প্রশাখা প্রত্যেক জান্নাতী লোকের ঘরেও বিস্তৃত থাকবে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা হতে ইলম ও ঈমান সমগ্র জগতে প্রসার ও বিস্তার ঘটেছে। অধিকন্তু ইমাম সুহাইলী (রাঃ) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'শাজারা তূবা' শাজারা জাওযায়া—বাদাম বৃক্ষ সদৃশ্য।

১৪৭. الجراد (আল-জারাদ) টিড্ডি/পঙ্গপাল

জারাদ—টিড্ডি একটি প্রসিদ্ধ পাখি। একবচনের জন্য جرادة (জারাদাহ) ব্যবহৃত হয়। অবশ্য 'জারাদাহ' স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা جرادة (জারাদাহ)-এর মধ্যকার ة টি স্ত্রীলিঙ্গের জন্য নয়, একবচনের জন্য । যেমনিভাবে نملة (নামলাতুন—পিঁপড়া) حمامة (হামামাতুন—কবুতর) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। জারাদাতুন ইসমে জিনস আর তা جرد থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ– চমকদার, উত্তম, বেকার, পুরাতন উভয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, توب جرد ছিঁড়া কাপড়। অবশ্য অভিধানবিদগণ বলেন, اسماء اشتقاق (আসমায়ে ইসতিকাক) খুবই কম হয়ে থাকে। টিড্ডি দুই প্রকার– ১) স্থলজ টিড্ডি, ২) জলজ টিড্ডি। এখানে স্থলের টিড্ডি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

কিয়ামতের দিন মৃত ব্যক্তিদেরকে নিজ নিজ কবর হতে উঠান হলে সকলেই 'নাফসী নাফসী' বলতে থাকবে। মানবজাতি গভীর পেরেশানী ও বিপদের কারণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সেই অবস্থাকে মহান আল্লাহ তাআলা 'জারাদ'-এর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر

সেদিন তারা (মানুষ) কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত।

–সূরা কামার : ৭

অর্থাৎ সেদিন মানুষ সমুদ্রে পরিণত হবে। যা সমগ্র ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে। সেই অবস্থাকে মহান আল্লাহ আরেক আয়াতে অন্য আঙ্গিকে ইরশাদ করেছেন–

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

সেদিন মানুষ হবে পাতা বিছানার মত। –সূরা কারিয়াহ : ৪

উপরিউক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা যায়, কবর হতে হঠাৎ উঠার পর তারা كالفراش المبثوث (পাতানো বিছানার মত) হবে। তারপর মানুষ হাশরের ময়দানে গেলে অবস্থা হবে كانهم جراد منتشر বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত।

নর 'জারাদাহ'কে আবু আওফ এবং মাদী জারাদাকে উম্মে আওফ বলা হয়। আবু আতা সিন্ধি নিম্নলিখিত কবিতায় এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন–

ما صفوا تكنى ام عوب كان رجليها منجلان

মাদী টিড্ডির উপনাম উম্মু আওফ, তার দুটি পা যেন মিলিত।

টিড্ডি বা পঙ্গপাল নানা প্রকার হয়ে থাকে। কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি লাল, কোনটি হলুদ, আবার কোনটি হয় সাদা রঙের।

মুসলিমা ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ছিলেন বুদ্ধিমান, বীর পুরুষ ও সাহসী ব্যক্তি। তার উপাধি ছিল جراد الصفراء (জারাদুস সাফরা—হলুদ বর্ণের টিড্ডি)। তাকে কয়েকবার আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের গর্ভনর বানানো হয়েছিল। তিনি তাঁর ভাই সুলাইমানের শাসনামলে কুসতুনতুনিয়া আক্রমণ করেছিলেন। উমর ইবনে আদুল আযীয (রহ.) বলেন, তার মৃত্যু হয়েছিল ১২১ হিজরীতে।

প্রতিদিনের ওয়াযীফা ও আমল

বুকের ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য–

১. মুসলিমা ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার সৈন্যবাহিনীসহ যখন উমুরিয়াতে প্রবেশ করেন, তখন তার বুকে ব্যথা হয়। তাই তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। উমুরিয়াবাসী মুসলমানগণকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেনাপতি যুদ্ধের মাঠে কেন আগমণ করেন নি? মুসলমানগণ জবাব দিলেন, তার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। তাই উমুরিয়াবাসী মুসলমানদের একটি পোশাক দিয়ে বলল, এটা আপনাদের নেতাকে পরিধান করিয়ে দিন। তাহলে তিনি অতি সত্বর বুকের ব্যথা হতে আরোগ্য লাভ করবেন। পোশাকটি পরিধান করতেই মুসলিমার বুকের ব্যথা সর্ম্পূণ ভাল হয়ে গেল। মুসলমানগণ খুবই বিস্মিত হলেন– এতে এমন কি আছে, যে কারণে ব্যথা দূর হয়ে গেল? মুসলমাগণ তা অনুসন্ধান করে একটি চিরকুট পেলেন। ওটাতে নিম্নলিখিত আয়াত লেখা ছিল–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم ـ يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ـ بسم الله الرحمن

الرحيم ـ واذا سالك عبادى عنى فانى قريب، اجيب دعوة الداع اذا دعان ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

মুসলমানগণ খ্রিষ্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সমস্ত কুরআনী আয়াত তোমরা কোথায় পেলে? এটা তো আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর নাযিল হয়েছে। উমুরিয়াবাসীগণ বলল, এ সমস্ত আয়াত আপনাদের নবীর আগমনের ৭০০ বছর পূর্বে গির্জার শিলালিপি থেকে পাওয়া গিয়েছে।

২. হাফিয ইবনে আসাকীর (রাঃ) বলেন, বক্ষ ব্যথার জন্য নিম্নের আয়াতটি লিখে বেঁধে রাখলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এটা পরীক্ষিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

كهيعص ـ ذكر رحمة ربك عبده زكريا ـ اذ نادى ربه نداء خفيا ـ قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الراس شيبا ـ ولم اكن بدعائك رب شقيا ـ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا ـ كهيعص ـ حم ـ عسق ـ كم لله من نعمة فى كل عبد شاكر وغير شاكر وكم لله من نعمة فى كل عرق ساكن وغير ساكن اذهب ايها الصداع بعز عز الله وبنور وجه الله وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم ـ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ـ

৩. কার মাথা ব্যথা হলে নিম্নের অক্ষরগুলী কোন কাঠের উপর লিখে একটার পর একটা অক্ষরে লোহার পেরেক দিয়ে চেপে ধরবে এবং আয়াতটি পড়তে থাকবে–

ولوشاء لجعله ساكنا وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم

আর অক্ষরগুলী হল :

ا ح ا ك ك ح ع ح ا م ح

ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্র তার বেদনা উপশম হবে। আল্লামা কামালউদ্দীন দামেরী (রহ.) বলেন, আমলটি অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মাথা ব্যথায় অত্যন্ত উপকার পাওয়া গিয়েছে।

টিড্ডির বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন : তার জন্মের সময় নাম হয় আয-যুবা (الزبى)। কিছু বড় হলে এবং পাখা গজালে তার নাম হয় গুগা (غوغا)। যখন টিড্ডি হলুদ রং ধারণ করে আর স্ত্রী টিড্ডি কালো রং ধারণ করে, তখন এর নাম হয় জারাদাহ।

এ প্রাণীর ডিম পাড়ার পদ্ধতিটা আশ্চর্য ধরনের। যখন এদের ডিম পাড়ার সময় হয়, তখন এরা এমন শক্ত ও অনাবাদী ভূমিকে নির্বাচন করে, যেখানে কোন মানুষের পদচারণা হয় না। এরপর সেই ভূমিতে লেজ দ্বারা ছিদ্র করে, সেই ছিদ্রে ডিম পাড়ে তারপর ওই মাটির উষ্ণতায় কয়েকদিন পরই বাচ্চা ফুটে। টিড্ডির ৬টি নাল বা ঠ্যাং দুটি বক্ষে, দুটি মধ্যখানে আর দুটি সর্বপিছনে। টিড্ডি সৈন্য দলের মত এক সঙ্গে দল বেঁধে উড়ে চলে এবং দলনেতার অনুসরণ ও আনুগত্য করে। সুতরাং টিড্ডির দলনেতা আকাশে উড়াল দিলে সাথীরাও উড়াল দেয়। কোন স্থানে বসলে সাথীরাও বসে যায়।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, টিড্ডির লালা উদ্ভিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। এর লালা কোন উদ্ভিদের উপর পড়লে ওই উদ্ভিদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কারণে শস্যক্ষেত ও কোন জঙ্গলে টিড্ডি বা পঙ্গপালের আক্রমণ হলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। মরে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টিড্ডির ধ্বংসের জন্য দুআ করেছেন।

হাদীসে টিড্ডির উল্লেখ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার হযরত আইয়ূব (আঃ)[১] উন্মুক্ত অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর টিড্ডি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সেগুলী তিনি তাঁর আঁচলে ভরতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা তখন

---

১ হযরত আইয়ূব (আঃ) একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। কোন কারণে পরীক্ষামূলকভাবে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগের কারণে তিনি অনন্য সাধারণ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পবিত্র কুরআনে তার ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এর বিশদ বর্ণনা হল, হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বামী আইয়ূবের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করেন। একদিন স্ত্রী আইয়ূব (আঃ)-কে অসুস্থতার বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন। এতে আইয়ূব (আঃ) তাকে সতর্ক করতে মারার কসম করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একদিকে আইয়ূব (আঃ)-এর কসম পূর্ণ করা অপরদিকে স্ত্রীর আন্তরিক সেবার প্রতি লক্ষ্য করে বলে দিলেন, তুমি একশত খড়কুটা একত্র করে তা দ্বারা তোমার স্ত্রীকে মারবে, এতে তোমার কসমও পূর্ণ হবে এবং স্ত্রীর মনও রক্ষা হবে।
হযরত আইয়ূব (আঃ) দীর্ঘ অসুস্থতার পর একবার মাত্র দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ! আমি অসুস্থ আর আপনি রাহমানুর রাহীম (অতিব দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান)। এরপর একটি ঝর্ণাধারা প্রকাশিত হল, যাতে তাকে গোসল করতে ও পান করতে আদেশ দেয়া হল। সুতরাং তিনি গোসল করলেন এবং পান করলেন। এতে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অসুস্থতা শেষ হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে আইয়ূব (আঃ)-এর ধৈর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি সুস্থতা লাভের পর আল্লাহর নির্দেশ মত কসম পূর্ণ করেন।

বললেন, হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে এসব হতে অমুখাপেক্ষী করে নি? হযরত আইয়ূব (আঃ) বললেন, অবশ্যই হে মহান আল্লাহ! তবে আমি তো আপনার রহমতের কাঙাল অর্থাৎ রহমতের মুখাপেক্ষী। -বুখারী শরীফ

ইমাম তাবারানী ও বায়হাকী যুহাইর সূত্রে ইমাম শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা টিড্ডিকে ধ্বংস কর না। কেননা তারা আল্লাহ তাআলার সেনাদল।

এ গ্রন্থের লেখক আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরিউক্ত হাদীসে টিড্ডি ধ্বংস না করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা ওই টিড্ডি কোন ফসল ইত্যাদি ধ্বংস না করা অবস্থায় প্রযোজ্য। হ্যাঁ, ফসলাদি বিনষ্ট করলে ধ্বংস করা জায়িয।

جند অর্থ, সৈন্য। এর বহুবচন جنود সেনাদল এবং আরওয়াহ-এর হাদীসে جنود مجندة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ, সৈন্যদল। যেমন- الوف مؤلفة، قناطير مقنطرة

ইবনে ইমরান বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে এ টিড্ডি এসে বসে পড়ল। তার পালকে লেখা ছিল- আমরা আল্লাহ তাআলার সৈন্যদল। আমাদের ৯৯ টি ডিম হয়। পূর্ণ ১০০ টি ডিম হলে আমরা সমগ্র দুনিয়াকে টুকরা টুকরা করে দিতাম। টিড্ডি পালকের লেখা পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন :

اللهم اهلك الجراد واقتل كبارها وامت صغارها وافسد بيضها وسد افواهها عن مزارع للمسلمين۔

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ শেষ করলেন মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে নিবেদন করলেন : আপনার এ দুআর কিছু অংশ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন : আমি, আমার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যা, আমার চাচার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে কাশুম ও ফযল খাবার খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে দস্তর খানায় একটি টিড্ডি এসে বসল। একে আবদুল্লাহ ইবনে কাশুম ধরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর পালকে কী লেখা আছে? আমি তখন আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে এ ব্যাপারে শুনেছি, তিনি বলেন, এর পালকে লেখা আছে-

انا الله لا اله الا انا رب الجراد ورزاقها ان شئت بعثتها رزقا لقوم وان شئت بعثتها بلاء على قوم۔

আমি আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি টিড্ডির প্রতিপালক। আমি তদেরকে জীবিকা প্রদান করি। আমি চাইলে এদেরকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করতে পারি। আবার আমি ইচ্ছে করলে কোন সম্প্রদায়ের জন্য তাকদীরে লিখা থাকলে এদেরকে পরীক্ষার কারণ বানিয়ে দিই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী তো অপ্রকাশ্য ইলমের অর্ন্তভুক্ত বলে মনে হয়। –তারীখে নিশাপুরী, সূত্র তাবারানী

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে এক বছর টিড্ডি হারিয়ে যায়। এতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি টিড্ডির সন্ধানে চারদিকে লোক প্রেরণ করলেন। কাউকে সিরিয়ার দিকে, কাউকে ইরাকের দিকে আবার কাউকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করলেন। ইয়ামানের দিকে গমনকারী ব্যক্তি টিড্ডির সন্ধান দিলেন। এতে খলীফা ফারুকে আযম চিন্তামুক্ত হলেন। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তাআলা এক হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে ছয় শত পানিতে আর চার শত স্থলে। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন সর্বপ্রথম টিড্ডিকে ধ্বংস করবেন। এরপর অন্যান্য সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন।

হযরত ইবনে আদী (রাঃ) মুহাম্মাদ ইবনে ঈসার তরজমায় এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'নাওয়াদেরাত'-এ উল্লেখ করেছেন, সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বপ্রথম টিড্ডিকে ধ্বংস করা হবে। কেননা এ টিড্ডিকে সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর অবশিষ্ট মাটি দ্বারা।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন : আমাকে হাসসান বলেছেন : শয়তানের দৃষ্টান্ত অধিক সংখ্যার দিক হতে সেই বিরানভূমির মতই, যাতে প্রচুর টিড্ডি রয়েছে। সেখানে কোন মানুষের আগমন ঘটলে তার চারদিকে টিড্ডি উড়তে থাকবে অর্থাৎ দুনিয়াতে অসংখ্য অগণিত মানুষ শয়তান রয়েছে। এ কথার সমর্থনে হাদীসও রয়েছে। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি শিশুর সঙ্গে একটি শয়তান এবং একটি করে ফেরেশতা তৈরি হয়। হাসসান আরও বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে মানুষ হতে আড়াল না করলে দুনিয়ার সর্বত্র শয়তান আর শয়তানই দেখা যেত।

ইবনে মায়সারা (রহ.) বলেন : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ) অধিকাংশ টিড্ডির গোশত, বাহু ও কলিজা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন এবং নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, হে ইয়াহইয়া! তোমার কেমন সৌভাগ্য! তুমি অধিকাংশ টিড্ডির গোশত, বাহু ও কলিজা খাও। গ্রন্থকার আল্লামা দামেরী

(রহ.) বলেন, টিড্ডির মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর ১০ টি বৈশিষ্ট পাওয়া যায়। (১) ঘোড়ার চেহারা, (২) হাতির চক্ষু, (৩) গরুর গর্দান, (৪) বাঘের বক্ষ, (৫) বিচ্ছুর পেট, (৬) হরিণের শিং, (৭) শকূনের পাখা, (৮) উটের রান, (৯) উটপাখির গলা, (১০) সাপের লেজ।

টিড্ডি সম্পর্কে কাযী মহীউদ্দীন শাহরযুরী চমৎকার কবিতা বলেছেন–

لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمتا نسر وجرجر ضيغم

جبتها افاعى الارض بطنا وانعمت عليها جياد الخيل بالراس والغم

"টিড্ডির রান বকরীর রানের মত, তার পায়ের নালী উট পাখির মত, তার দুই পা শকূনের মত, গলা বাঘের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। পোকা-মাকড় তার খাদ্য, উত্তম ঘোড়ার মাথা এবং মুখাকৃতি বানিয়ে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।"

কাযী মহীউদ্দীন শাহরযুরীর নিম্নের কবিতাও অতি উত্তম ও পছন্দনীয়-

ولما شاب راس الدهر غيظا لما قاماه من فقد الكرام

اقام يميط عند الشيب غيظا وينشر ما اماته على الانام

"যখন যুগের মধ্যে রাগ ও ক্রোধের বহ্নিশিখা হয়ে উঠে এবং দুনিয়া ভদ্রলোক শূন্য হয়ে পড়ে, তখন বার্ধক্য এসে পড়ে। তখন বার্ধক্যকে ক্রোধের মাধ্যমে দূর করার জন্য চেষ্টা করা হয় আর মানুষের উপর সে জিনিসই বর্ষণ করা হয়, যা সাদা আর সাদা অর্থাৎ বার্ধক্য।"

৫৮৬ হিজরীতে কাযী মুহিউদ্দীন শহরযুরী ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় টিড্ডি এদের মধ্যে অসুস্থতার মূল।

ইমাম আসমায়ী (রহ.) বলেন, আমি এক গ্রামে গিয়ে দেখলাম এক কৃষক গম চাষ করছে। তখন গম ক্ষেতে বাতাসে চিত্তাকর্ষক আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ করে টিড্ডির পাল এসে পড়ল। এতে কৃষক চিন্তিত হয়ে পড়ল। এখন কী করবে বুঝতে না পেরে সে কবিতা পড়তে আরম্ভ করল :

مر الجراد على زرعى ثقلت له لا تاكلن ولا تشغل يا فساد

فقام منهم خطيب فوق سنبلة اتا على سفر لا جد من زاد

"আমার শস্য ক্ষেতে টিড্ডি আক্রমণ করলে আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা ফসল খেও না এবং আমার কোন অমঙ্গল সৃষ্টি কর না। তখন একটি খোসাতে বসে টিড্ডির ভাষ্যকার জবাব দিল, আমরা ভ্রমণে আছি আর ভ্রমণে পাথেয় প্রয়োজন।"

আমল ও ওয়াযীফা

(১) টিড্ডি হতে রক্ষা পাওয়ার আমল

নিম্নলিখিত শব্দগুলী লিখে বাঁশের চুঙ্গায় ভরে বন্ধ করে জমি বা আঙ্গুরের বাগানে পুতে রাখলে টিড্ডির ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। এটা অত্যন্ত পরীক্ষিত।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهلك صغارهم واقتل كبارهم وافسد بيضهم وخذ بافواههم عن معايشنا وارزقنا انك سميع الدعاء انى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واستجب منا يا ارحم الراحمين ـ

টিড্ডি হতে রক্ষা পাওয়া এবং টিড্ডি তাড়ানোর জন্য এ আমলটি ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ কারশী বহুবার পরীক্ষা করেছেন। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, একজন উঁচু মানের আলেমও এর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে তার নাম আমার স্মরণে নেই। এ ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি এ আমলের দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

কোন শহর বা গ্রামে টিড্ডির প্রবল আক্রমণ হলে এবং এলাকাবাসী তাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে ৪টি টিড্ডি ধরে ওদের পায়ে নিম্নলিখিত আয়াতে কুরআনী লিখে যেই দিকের নাম উল্লেখ করা হবে সেই সকল টিড্ডি সেই দিকে চলে যাবে।

প্রথম টিড্ডিতে লিখবে– فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

দ্বিতীয় টিড্ডিতে লিখবে– وحيل بينهم وبين ما يشتهون

তৃতীয় টিড্ডিতে লিখবে– ثم انصدفوا صرف الله قلوبهم

চতুর্থ টিড্ডিতে লিখবে– فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين

(২) জীব-জন্তু হতে ফসল রক্ষার জন্য

কাগজের চারটি টুকরাতে এ আয়াত লিখতে হবে–

صم بكم عمى فهم لا يرجعون

লিখার পর প্রতিটি টুকরাকে একটি মাটির পাত্রে রেখে জমির চার কোণায় ঝুলাবে। এরপর সেখান থেকে একটি টুকরা নিয়ে ক্ষতিকারক প্রাণীর নাম লিখে একটি পাতিলে ভরে মাঝখানে পুতে রাখলে আল্লাহর রহমতে ক্ষতিকারক কোন প্রাণী জমিতে আসতে পারবে না।

(৩) ইঁদুর জমির ফসল নষ্ট করলে নিচের তাবিজটি লিখে বাঁশের ছিপে বেঁধে জমির চারদিকে ঘুরিয়ে ওই তাবিজসহ বাঁশের ছিপটি জমির এক কোণায় পুতে রাখবে। তাহলে ইঁদুর আর আক্রমণ করতে পারবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم۔ الهى بحرمة يا يزيد عثمانى

(৪) যদি ইঁদুর ফসলের জমিতে বাসা বাঁধলে নিচের নকশা ব্যবহার করবে।

بسم الله الرحمن الرحيم
الهى بحرمة يا يزيد عثمانى ازشرمو
شهائى نگهدار
بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن — بسم الله الرحمن

(৫) ফসলের জমি ও বাগানের উন্নতির আমল

ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ذلكم الله فانى توفكون۔

কোন পবিত্র পাত্রে জাফরান ও কর্পুর দ্বারা লিখে গোলাপজল দ্বারা ধৌত করে ওই পানি বীজে মিশ্রিত করে বপন করবে এবং গাছের মূলে ঢেলে দিবে।

(৬) ধন-সম্পদ, ফসলের ক্ষেত ও গৃহ-পালিত পশু-পাখিতে বরকত লাভের আমল :

الله الذى خلق السموات لظلوم كفار

সকাল সন্ধ্যা এবং শুক্রবার সময় পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ জল ও স্থলের সকল প্রকার বালা-মুসিবত হতে ফসলাদি, ধন-সম্পদ ও পশু-পাখি নিরাপদ থাকবে।

(৭) বৃষ্টি বর্ষণের আমলে নিচের নকশাটি লিখে কোন উঁচু স্থানে কিবলামুখী করে ঝুলিয়ে দিবে :

١٢٥	١٢٨	١٣٢	١١٨
١٣١	١١٩	١٢٤	١٢٩
١٢٠	١٣٤	١٢٦	١٢٣
١٢٧	١٢٣	١٣١	١٣٣

টিড্ডির শরঈ বিধান

টিড্ডির গোশত মুবাহ। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সেসময় আমরা টিড্ডির গোশত আহার করেছি।"

উপরিউক্ত হাদীসখানা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু নাঈম (রহ.) বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সঙ্গে টিড্ডির গোশত ভক্ষণ করেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণ তাঁর খেদমতে টিড্ডির গোশত পেশ করতেন।

মুয়াত্তা গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-কে টিড্ডির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, টিড্ডি আমার পছন্দ হয়।

হযরত মরিয়াম বিনতে ইমরান (রহ.) দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন গোশত খাওয়ান যাতে কোন রক্ত নাই। এতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য টিড্ডি প্রেরণ করেন। হযরত মরিয়াম আবার দুআ করলেন : হে আল্লাহ! এ মাখলূক (সৃষ্টি)-কে তুমি দুধ বিহীন জীবিত রাখ এবং তাদের ভ্রমণ কর শোরগোল মুক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবুল ফযল شِبَاع (শিবা')-এর অর্থ, কী? তিনি বললেন : আওয়াজ করা, হট্টগোল করা।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) টিড্ডির গোশত ও ফুলের মজ্জা খেতেন। চার ইমামের মতে টিড্ডির গোশত পবিত্র এবং খাওয়া জায়েয। চাই তার স্বাভাবিক মৃত্যু হোক বা জবাই করা হোক। এমনকি কোন অমুসলিমও এটি শিকার করলে হালাল। সব অবস্থায়ই এর গোশত খাওয়া জায়েয।

অধিকন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, অধিক শীতের কারণে তা মারা গেলে না খাওয়া উত্তম। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব মতে টিড্ডির মাথা দেহ হতে আলাদা করা হলে তা খাওয়া জায়েয হবে না।

অধিকন্তু হাদীস হতেও টিড্ডি হালাল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "আমাদের জন্য দু'টি (মাছ ও টিড্ডি) এবং দুই রক্ত (কলিজা ও প্লীহা) হালাল করা হয়েছে"।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, উপরিউক্ত নির্দেশ জলজ প্রাণীর বিষয়ে না স্থলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্থলজ শিকার

না জলজ শিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ টিড্ডিকে স্থলজ শিকার গণ্য করেন এবং কেউ কেউ জলজ শিকার। যারা জলজ শিকার বা সামুদ্রিক শিকার বলে গণ্য করেন তাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদীস :

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদুআ করে বলেছেন, হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলী ধ্বংস করে দিন, ছোটগুলী খতম করে দিন। এদের আধিক্য কমিয়ে দিন এবং এদের মুখ বন্ধ করে দিন। তাহলে আমাদের জীবনোপকরণ (ফসল ও বাড়ি) এদের ক্ষতি হতে বেঁচে যাবে। আপনি দুআ শ্রবণকারী। দু'আ শ্রবণকারীদের মধ্যে একজন আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তাআলার সৈন্যদের ব্যাপারে এদের বংশ নিপাতের জন্য বদদুআ করছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "টিড্ডি সামুদ্রিক মাছের হাঁচি হতে জন্মগ্রহণ করেছে"।

একথার মর্ম হল, টিড্ডি সামুদ্রিক মাছ। এদের ইহরাম অবস্থায় শিকার করা যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হজ্জ বা উমরাহ করার জন্য বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা টিড্ডির এক বিরাট বাহিনী পেলাম। আমরা জুতা ও লাঠির সাহায্যে মারতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের ধরে ধরে খাও। এরা সামুদ্রিক শিকার।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে টিড্ডি স্থলজ শিকারের মধ্যে গণ্য। এজন্য ইহরাম অবস্থায় একে হত্যা করলে তার উপর শরীয়াতের বিধান মতে ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য হবে। এতে বুঝা গেল, টিড্ডি স্থলজ শিকারের মধ্যে গণ্য। অন্যথায় জলজ শিকার হলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হত না। টিড্ডির ব্যাপারে উপরোক্ত আলোচনা ও অভিমত বিখ্যাত ফকীহগণের। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান গণী (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ইহরাম অবস্থায় টিড্ডি হত্যা করলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা সামুদ্রিক শিকার। তিনি তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন :

যে ব্যক্তি টিড্ডিকে সামুদ্রিক শিকার মনে করেন, তিনি আবুল মাহযাম-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন– আমরা টিড্ডির একটি বিরাট বাহিনী পেলাম। আমাদের মধ্যে একজন যিনি ইহরাম

অবস্থায় ছিলেন তিনি চাকুর দ্বারা টিড্ডি মারতে লাগলেন। ওই লোকটিকে তখন সাবধান করে দেয়া হল, ইহরাম অবস্থায় টিড্ডি শিকার করা জায়েয নয়। –আবু দাউদ ও তিরমিযী

এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতেও পেশ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন ক্ষতি নাই। কেননা টিড্ডি সামুদ্রিক শিকার।

জমহুর উলামায়ে কেরামের দলীল হল, এ হাদীস হতে যাকে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার হতে বর্ণনা করে বলেন– আমি ও হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত কা'ব (রাঃ) একদল লোকের সাথে ছিলাম। যারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার নিয়তে আসতে ছিলেন। আমরা মাত্র সামান্য রাস্তা অতিক্রম করলাম। এমন সময় টিড্ডির এক বিশাল বাহিনী আসতে দেখা গেল। তখন হযরত কা'ব (রাঃ) যিনি অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন, তিনি এদের মধ্য হতে দুটি টিড্ডি ধরে হত্যা করে ফেললেন। তাঁর খেয়াল ছিল না যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় আছেন। তা স্মরণ করে দেয়া মাত্রই তিনি টিড্ডিদ্বয় ছুড়ে ফেলে দিলেন। হযরত আবু আম্মার (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় হযরত উমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন হযরত কা'ব (রাঃ) তাঁর টিড্ডির ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, এ অপরাধের জন্য আপনি কি কোন সদাকা বা দান-খয়রাত করেছেন? হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন, জ্বি! করেছি। দুই দিরহাম খরচ করেছি। হযরত উমর (রাঃ) খুশি হয়ে বললেন, বেশ! বেশ! দুই দেরহাম তো কয়েক শত টিড্ডির তুলনায় বেশি। আপনি শুধু এ পরিমাণ দিলেই হত, যতটুকু আপনি অপরাধ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, হযরত কাশেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেছেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় টিড্ডি হত্যা করে, তাহলে তার উপর কী ওয়াজিব হবে? জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, এক মুষ্টি পরিমাণ খাদ্যশস্য দান করে দিন। আর এক মুষ্টিতে আপনি অগণিত টিড্ডি পেয়ে যাবেন। হযরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যর মর্ম হল, যদি আপনি এক মুষ্টি খাদ্যশস্য দ্বারা টিড্ডি খরিদ করতে চান, তবে অনেক টিড্ডি খরিদ করতে পারবেন।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, এ হাদীস হতে বুঝা যায়, টিড্ডিরও মূল্য আছে। অর্থাৎ ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে উপরিউক্ত হাদীস হতে বুঝা যায়, টিড্ডি ও মূল্যবান সম্পদ।

মাসয়ালা

কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছা করে বা ভুলবশত টিড্ডি হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব। তবে যদি টিড্ডিদল পথ রোধ করে ফেলে এবং পদদলিত না করে চলার কোন উপায় না থাকে, এমতাবস্থায় টিড্ডি ধ্বংস করলে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, টিড্ডি কোথাও বেশি পরিমাণে হলে বেচা-কেনায় 'সালাম' পদ্ধতি গ্রহণ অর্থাৎ আগে এর মূল্য দেয়া এবং পরে তা গ্রহণ করা জায়েয।

ইমাম রাফিয়ী (রহ.) বাবুর রিয়া (باب الربا)-তে টিড্ডি সম্পর্কে ৩টি অভিমত উল্লেখ করেছেন :

(১) টিড্ডি গোশত বিশিষ্ট প্রাণীর অর্ন্তভুক্ত নয়।

(২) গোশত বিশিষ্ট ডাঙ্গার প্রাণীর অর্ন্তভুক্ত।

(৩) গোশত বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণীর অর্ন্তভুক্ত।

টিড্ডির ব্যাপারে মুওয়াফ্ফিক ইবনে তাহিরের একটি মতে এটি সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে গণ্য। কেননা টিড্ডি মাছের উচ্ছিষ্ট হতে সৃষ্টি হয়।

প্রবাদ বাক্য

(১) আরবগণ বলেন—

تمرة خير من جرادة واطيبيت من جرادة

"একটি খেজুর টিড্ডি হতে উত্তম এবং অধিকতর পবিত্র" অর্থাৎ উভয়টিই নগণ্য বস্তু বটে, তবুও খেজুর উত্তম।

(২) আরবগণ বলেন :

وجاء القوم كالجراد المنتشر اى متفرقين

আগমনকারী দল বিক্ষিপ্ত টিড্ডির মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসল।

(৩) واجرد من الجراد واغوى من غوغاء الجراد

অমুক ব্যক্তি টিড্ডির চাইতেও বেশি হট্টগোলকারী।

(৪) كالجراد لا يبقى ولا يذر

সে টিড্ডির মত সবকিছু চেটে সাবাড় করেছে। এ উদাহরণটি তখনই বলা হয়, যখন কঠিন বিবাদ হয়ে যায় এবং একে অপরের মূলোৎপাটন করতে চায়।

(৫) احمى من مجير الجراد

টিড্ডিকে আশ্রয়দাতার চাইতেও অধিক কার্যকরী।

এ উদাহরণটি মুদলিজ ইবনে আত-তাঈ হতে প্রচলিত। কালবী লিখেছেন,

একদিন মুদলিজ একা একা তার তাবুতে পৌঁছলেন। সেখানে তাঈ গোত্রের কতিপয় লোক বসেছিল। তাদের হাতে ছিল পাত্র। মুদলিজ বলল, কী ব্যাপার? তারা বলল, তোমার ফসলের ক্ষেতে টিড্ডি পড়েছে আর আমরা এ পাত্র নিয়ে এসেছি যাতে তাদের ধরে নিয়ে যেতে পারি। মুদলিজ একথা শুনে বল্লম হাতে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল এবং বলল, তোমরা যদি টিড্ডি ধরতে হাত বাড়াও তবে আমার চাইতে খারাপ কেউ হবে না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, কেউ আমার আশ্রয়ে আসবে, তোমরা তাকে ধরে নিয়ে যাবে। এরপর মুদলিজ প্রতিনিয়ত নিজের ফসলের ক্ষেত পাহারা দিতে থাকে। এমনকি রৌদ্রের তাপ বেড়ে গেল এবং টিড্ডি উড়ে গেল। তখন মুদলিজ তার গোত্রের লোকদেরকে বলল, এখন তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার; টিড্ডিগুলো আমার আশ্রয় হতে চলে গিয়েছে।

চিকিৎসায় টিড্ডির উপকারিতা

থেমে থেমে যার প্রস্রাব হয় এমন রোগীর জন্য টিড্ডির ধোপ দেয়া অত্যন্ত উপকারী। কার বারবার পিপাসা লাগলে সে ১২টি টিড্ডির পা, হাত ও মাথা এবং রায়হান বৃক্ষের ছালের রস নিয়ে পান করবে। ইনশাআল্লাহ রোগ হতে মুক্ত হয়ে যাবে। লম্বা গর্দান বিশিষ্ট টিড্ডিকে তাবীজ হিসেবে গলায় পরলে জ্বর আর আসবে না। কার চেহারায় কালো দাগ পড়লে টিড্ডির ডিম চেহারায় মালিশ করবে কালো দাগ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

স্বপ্নে টিড্ডি দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে টিড্ডি দেখা আল্লাহর আযাব আসার লক্ষণ। ছোট ছোট টিড্ডি দেখা দুশ্চরিত্র হওয়ার লক্ষণ। কেউ স্বপ্নে টিড্ডি ধরে কোন মাটির পাত্রে ভরে ফেলেছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে অনেক বিত্ত-বৈভবের মালিক হবে। একবার জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইবনে সিরীন (রহ.)-এর নিকট গিয়ে বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, টিড্ডি ধরে বড় মটকায় ভরেছি। তিনি এর ব্যাখ্যায় বললেন, তুমি অনেক ধন-সম্পদের মালিক হবে এবং বিবাহ করবে। পরবর্তী সময়ে তাই হল। স্বপ্নে কেউ নিজের উপর স্বর্ণের টিড্ডি বৃষ্টি হচ্ছে দেখলে ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহ তাআলা তার ক্ষতিপূরণ করে দিবেন। আবার কখনও হতে পারে সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। কেউ স্বপ্নে পছন্দনীয় জমিতে এবং অপছন্দনীয় গ্রামে ঘোরাফেরা করছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সেখানে টিড্ডি বাহিনী আসবে।

১৪৮. الجراد البحرى (আল-জারাদুল বাহরিয়্যু[১]) সামুদ্রিক টিড্ডি

শরীফ (আব্বাসীয় খেলাফতে শাহ ইবনে মালিক) বলেন, এটা চৌকোণা মাথা বিশিষ্ট একধরনের প্রাণী। এর উভয় পার্শ্বে মাকড়সার মত লম্বা ১০টি হাত থাকে। এগুলো উত্তর আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশের সমুদ্র এলাকাতে পাওয়া যায়। মানুষ একে সাধারণত ভুনা করে খেয়ে থাকে।

এর চিকন চিকন হালকা লাল রঙের শিং হয়। শিং-এর পার্শ্বে আবার দুটি উজ্জ্বল চোখ হয়। এগুলো তন্দুরে (বড় চুল্লা) ভুনা করে খেলে বেশ স্বাদ পাওয়া যায়।

চিকিৎসায় সামুদ্রিক টিড্ডির উপকারিতা

সামুদ্রিক টিড্ডি গরম ও শুকনা ধরনের হয়। এর গোশত কুষ্ঠরোগে বেশ উপকার হয়।

১৪৯. الجراره (আল-জারারাহ) একপ্রকার বিচ্ছু

এ প্রাণীগুলো মাটিতে নিজের লেজ ছেচঁড়িয়ে চলে। (এর বিস্তারিত আলোচনা 'আইন' অধ্যায়ে আসবে।) এরা আবখাযান বৃক্ষের পাতার মত ছোট ও হলুদ রঙের হয়ে থাকে।

এরা গর্তে জন্মগ্রহণ করে। অধিকাংশ সময় এদের লবণাক্ত এলাকাতে পাওয়া যায়।

মূসা ইবনে আবদুল্লাহ ইস্রাঈলী বলেন, الجراره একপ্রকার বিচ্ছু। এদের অবয়ব হয় হালকা পাতলা। এরা নিজের লেজ শরীরে রাখতে পারে না। যেমন, অন্যান্য বিচ্ছুরা করে থাকে বরং এরা লেজ ভূমিতে হেচড়িয়ে চলে। এগুলো সাধারণত পশ্চিমা দেশগুলোতে পাওয়া যায়।

আল্লামা জাহিয বলেন, এরা কাউকেও দংশন করে শেষ করে দেয়। এদের দংশনের ফলে গোশতে পচন ধরে ও দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। দুর্গন্ধের কারণে তখন কেউ কাছে যেতে পারে না। এ ধরনের বিচ্ছু তৃণলতার ঝোপ এলাকাতে বাস করতে ভালবাসে। এদের বিষ গরম ও মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। ইবনুল জামি তার আল-ইরশাদ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, আল-জারারাহ একপ্রকার বিষধর বিচ্ছু। এদের বিষ অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে থাকে।

১৫০. الجراذ (আল-জুরায) পুরুষ ইঁদুর

ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, এটা মেটে রঙের একপ্রকার ইঁদুর। এদের সামনের পায়ের নলী ছোট আর পিছনের পায়ের নলী বড় হয়ে থাকে। এদের লেজ হয় কালো।

---

[১] কোন কোন দেশে এটাকে উড়ন্ত মাছ (Flying Fish) বলে।

জাহিয বলেন, এ ইঁদুর এবং সাধারণ ইঁদুরের মধ্যে পার্থক্য ঠিক মহিষ ও গাভীর মধ্যকার পার্থক্যের মত। এরা বড় উট ও আরবী উটের মাঝামাঝি ধরনের হয়ে থাকে। ইরাকের ইন্তাকিয়া ও ইরানের খুরাসান শহরের ইঁদুর অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে থাকে। কয়েকটি বিড়াল একত্রে হয়েও এদের মোকাবেলা করতে পারে না।

জাহিয বলেন, একদিন আমি বিড়ালের সঙ্গে আল-জুরায ইঁদুরকে ঝগড়া করতে দেখেছি। সাহসিকতার সাথে ইঁদুর বিড়ালের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। হঠাৎ করে সে বিড়ালের উপর আক্রমণ করে তার চোখ ফুটো করে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়ল।

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন, এদেরকে খাসী করে দেয়া হলে সমস্ত ইঁদুরকে এরা গ্রাস বানিয়ে ফেলে অর্থাৎ সমস্ত ইঁদুরকে চর্বণ ব্যতীত গিলে খায়। খাসী হওয়ার কারণে এদের মধ্যে শক্তিমত্তা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীকে খাসী করা হলে এদের মধ্যে দুর্বলতা আসে।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, الجرذ-এর বহুবচন হল جرذان। যেমন صود-এর বহুবচন صردان আসে। যেমন, ارض جرذة اى ذات جرذان ارض অনেক ইঁদুর বিশিষ্ট ভূমি অর্থাৎ যেখানে অধিক পরিমাণে ইঁদুর রয়েছে। الجرذ-এর উপনাম হল ابو جوال (আবূ জাওয়াল), ابو راشد (আবু রাশেদ) ابو العدرج (আবুল আদরাজ)। এর বিস্তারিত বিবরণ 'ফা' অধ্যায়ে আসবে।

হাদীসে الجرذ-এর উল্লেখ

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম মাজাহ (রহ.) প্রমুখ হযরত দাবাআহ বিনতে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) তার কোন জুরুরী কাজে মদীনা শরীফের নিকটবর্তী 'বাকি খাবখিয়া' স্থানে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন একটি বিজন ভূমির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, কী আশ্চর্য একটি ইঁদুর গর্ত হতে একটি করে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করছে। এভাবে ইঁদুরটি ১৭টি দীনার বের করল। এরপর গর্ত হতে একটি সবুজ রঙের কাপড়ের কিনারা বের করল। তা হতে আরেকটি দিনার বের হল। সর্বসাকুল্যে ১৮টি দীনার হল।

হযরত দাবায়াহ বিনতে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত মিকদাদ (রাঃ) ওই দীনারগুলীসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো আমি আপনার খেদমতে বরকতস্বরূপ হাদিয়া হিসেবে পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মিকদাদের কাছে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এগুলো গর্ত হতে তোমার হাতের সাহায্যে বের করেছ? তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন! এগুলো আমি আমার হাতে বের করি নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদ (রাঃ)-কে বললেন, এগুলো তুমি নিজেই ব্যবহার কর। এগুলোতে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ রেখেছেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মিকদাদ (রাঃ)-কে বললেন, এ রিযিক আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য প্রেরণ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে সাঈদ ইবনে আরুবাহ (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন : আবদে কাইস গোত্রের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করল, হে আল্লাহর নবী! আমরা রাবিয়াহ গোত্রের লোক। (আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন) তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন পাত্রে পানি পান করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চামড়ার পেয়ালাতে। তারা আরজ করল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের বস্তিতে ইঁদুর অনেক বেশি। এজন্য চামড়ার পেয়ালা নিরাপদ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হোক ইঁদুর বেশি, তোমরা তাই ব্যবহার কর। যদিও ইঁদুর খেয়ে ফেলে। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বললেন।

কৌতুক

কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ ইবনে ওয়ালীম– তিনি ধৈর্য ও দানশীলতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার নিকট একজন মহিলা আসল। মহিলাটি তার নিকট নিজের অবস্থা বর্ণনা করল যে, তার ঘরে ইঁদুর লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করে। (অর্থাৎ আমার ঘরে এমন কোন খাদ্য বস্তু নেই, যা ইঁদুর পেট ভরে খেতে পারবে। দুর্বলতার কারণে ইঁদুরগুলীও লাঠির সাহায্যে চলে)। কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ ইবনে ওয়ালীম মেয়েলোকটিকে বললেন : আমি ইঁদুরগুলীকে এমন করে দিব যে, তারা কালো সাপের মত নর্তন-কুর্দন করতে থাকবে। অর্থাৎ আমি এমন করে দিব, যাতে তোমার সচ্ছলতা এসে যায়। আর ইঁদুরগুলীও পেট ভরে খেয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করতে পারে। এরপর কায়েস মহিলার ঘরটি মাল-সামগ্রী দ্বারা ভরে দিলেন।

বর্ণিত আছে, কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ ইবনে ওয়ালীম মানুষের নিকট অনেক পরিমাণ পাওনা ছিলেন অর্থাৎ বহু লোক তার নিকট হতে ঋণ

নিয়েছিল। হঠাৎ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর তার আরোগ্য লাভে বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন একবার তাকে বলা হল, মানুষ শুধু তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য জীবন কাটাচ্ছে। (অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের দুরবস্থায় আছে।) এ কথা শুনে কায়েস ইবনে সা'দ এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে বললেন– যার কাছে কায়েস ইবনে সা'দ-এর ঋণ রয়েছে, সে ঋণ হতে মুক্ত। একথা শুনে ঋণী লোকেরা খুশিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফলে তার কাছে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত সিড়িটি পর্যন্ত তারা ফেলে দিল।

উরওয়াহ বলেন, কায়েস-এর পিতা সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) এভাবে দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ধন-সম্পদ দিন। কেননা পুণ্য হয় ভাল কাজের দ্বারা আর ভাল কাজ ধন-সম্পদ ব্যতীত হয় না। হে আল্লাহ! সামান্য বস্তু আমাকে ভাল করতে পারে না আর আমিও এতে ভাল করতে পারি না।

ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর (রহ.) বলেন, কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) ফরয নামায আদায় করে অবসর হয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন ধন-সম্পদ দান করুন, যা দ্বারা আমি নেক কাজে সাহায্য করতে পারি। কেননা ধন-সম্পদ ব্যতীত নেক কাজ ভালভাবে সম্পাদন করা যায় না।

জ্ঞাতব্য

আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, فعل ফা অক্ষরে যবরের সঙ্গে فعل يفعل-এর মাসদার আর 'ফা' অক্ষরে যের দিয়ে হয় ইস্‌ম। যেমন, واوحينا اليهم فعل الخيرات আর فعل-এর বহুবচন আসে فعال। যেমন, قدم -এর বহুবচন قدام এবং بشر-এর বহুবচন بشار আসে। আর فعال যবরযোগে হলে 'দয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কবি সাদবা বলেন–

ضروبا بلحييه على عظم زوده اذا القوم عشوا للفعال تفنعا

সে তার উভয় চোয়াল দ্বারা শক্ত হাড় ভেঙ্গে ফেলে, যখন জাতি তার দয়া ও বদান্যতায় উপকার গ্রহণ করে।

ইবনে সাইয়িদা বলেন, فعال (যবরযোগে) ভাল ও কল্যাণমূলক কাজকে বলে। কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) ৬০ হিজরী ইন্তেকাল করেন। আবার কেউ কেউ ৫৯ হিজরীর কথাও বলেছেন।

ইঁদুরের শরঈ বিধান

এর শরঈ বিধান ও চিকিসায় উপকারিতা ইঁদুরের মতই। এর বিস্তারিত বিবরণ 'ফা' অনুচ্ছেদে আসবে।

এ ইঁদুর স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে এরূপ ইঁদুর দেখা অবাধ্য, পাপী, দুঃখ, ক্লেশ, বালা-মুসিবত ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিতবহ। কোন কোন সময় এর দ্বারা অসম্মান, অপমান ও হিংসা-বিদ্বেষ-এর দিকেও ইঙ্গিতবহ। আবার কোন কোন সময় এর দ্বারা চরিত্রহীনা মহিলার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। স্বপ্নে এর গোশত খেতে দেখলে হারাম মাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ স্বপ্নে এটি ধরছে বা তার ঘরে প্রবেশ করছে দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্থানান্তর হওয়ার দিকে ইঙ্গিতবহ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি সেই জাতির উপর 'সাইলে ইরাম'[১] প্রেরণ করেছি।

সাইলে ইরাম-এর মূল কারণ ইঁদুর। (এ সকল ইঁদুর পুল ও পানির নালাগুলীতে বড় বড় ছিদ্র তৈরি করে। ফলে পুল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বন্যা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না।) তখন এলাকা হতে সকল লোকজন চলে যায়। স্বপ্নে এর গোশত খাওয়া গীবত ও অবাধ্যের লক্ষণ। স্বপ্নে ইঁদুর শিকার করেছে দেখলে বুঝবে লোকটি কোন ঝগড়াটে মহিলাকে বিবাহ করবে।

১৫১. الجرجس (আল-জুরজাস) মশার বাচ্চা

মশার ছোট ছোট বাচ্চাকে 'জুরজাস' বলা হয়। ইনশাআল্লাহ 'ক্বাফ' অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

১৫২. الجوارس (আল-জাওয়ারিসু) মৌমাছি

মৌমাছি বা মধুমক্ষিকাকে আরবীতে 'জাওয়ারিসু' বলা হয়। মৌমাছি যখন বাবুল গাছকে খেয়ে ফেলে তখন বলা হয়—

جرست النحل العرفط

মৌমাছি বাবুল বৃক্ষে গুনগুন করে।

মূলত জারাস (جرس) অর্থ, মৃদুমন্দ আওয়াজ করা বা গুনগুন করা। আর غرفط (গারাফাতু) বলা হয় বাবুল বৃক্ষকে। এ গাছে দুর্গন্ধ হয়।

---

[১] সাইলে ইরাম একটি সম্প্রদায় ছিল, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদ ও ভোগের উপকরণ দিয়েছিলেন। এ সম্প্রদায় হাজার হাজার বছর পূর্বেই তাদের জমিতে সেচের জন্য এক বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেছিল। যেমন : বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তারপর এ সম্প্রদায় আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের সংরক্ষিত পানি ভাণ্ডার নিয়ে অযথা গর্ব-অহংকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এমন (ইঁদুর সদৃশ) এক প্রাণী প্রেরণ করেন, যে প্রাণী বাঁধকে খুঁদতে থাকে। ফলে ওই বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং পুরো জাতি পানিতে তলিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে একেই سيل عرم বলা হয়েছে।

১৫৩. الجرو (আল-জারবু) কুকুর ছানা

الجرو (জীম অক্ষরে পেশ, যবর ও যের এ তিন ইরাব) কুকুরের ছোট ছানাকে বলে। অবশ্য সকল হিংস্র প্রাণীর ছোট ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

জনৈক কবি বলেন–

ولو ولدت فقيرة جرو كلب · لسب بذلك الجرو الكلاب

কোন অপদস্ত নারী কুকুর ছানা দিলে নিঃসন্দেহে সমস্ত কুকুর ছানারই বদনাম হয়।

ইবনে সাইয়িদা বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্র অংশকে আল-জারবু বলে। চাই তা প্রাণীদের মধ্যে হোক বা না হোক। এমনকি মাকাল ফল, তরমুজ, শসা, কাঁকড়, ডালিম ইত্যাদির ছোট অংশকেও জারবু বলা হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে কুকুর ছানার আলোচনা

হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত ছিলেন। হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি চিন্তিত কেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হযরত জিবরাইল (আঃ) রাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ করেন নাই। দেখ! আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আমার সাথে ওয়াদা খেলাফ করেন নাই। হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থায়ই কাটালেন। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেয়াল হল আমার তাবুর নিচে একটি কুকুর ছানা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে বের করার আদেশ করলে সেটি বের করে দেয়া হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি নিলেন এবং সেই স্থান ধৌত করলেন। এরপর সন্ধ্যাকালে হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললে : আপনি তো গত রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু কেন সাক্ষাৎ করলেন না? হযরত জিবরাইল (আঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্মানিত ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর নিধনের আদেশ জারি করলেন। এমনকি ছোট ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও মেরে ফেলার আদেশ জারি করলেন। আর বড় বড় বাগানের কুকুর ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।

ইমাম তাবারানী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাদেমাহ খাওলাহ (রাঃ)-এর সূত্রে এতে সামান্য অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দাবলি

হল : একটি কুকুর ছানা ঘরে প্রবেশ করে খাটের নিচে গিয়ে মরে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে খাওলাহ! আল্লাহর নবীর ঘরে কি হল যে, জিবরাইল (আঃ) আগমণ করেন না? তাহলে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘরে কোন নতুন কথার আগমন ঘটল? যে কারণে জিবরাইল (আঃ) আগমন করেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে চলে গেলেন। হযরত খাওলাহ (রাঃ) বলেন, আমি দাঁড়ালাম এবং ঘর ঝাড়ু দিতে শুরু করলাম। সুতরাং খাটের নিচে ঝাড়ু দেওয়ার ইচ্ছে করলাম। তখন ঝাড়ুর নিচে কী যেন একটি ভারি বস্তু অনুভব হল। আমি সেটা বের করে দেখলাম, একটি মৃত কুকুর ছানা। আমি একে হাতে ধরে দেওয়ালের বাইরে ফেলে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাড়ি মুবারক থর থর করে কাঁপছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলছিলেন, হে খাওলাহ! আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে দাও। এরপর আল্লাহ তাআলা সূরা দোহা অবতীর্ণ করলেন।

ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, এ হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না। কেননা এ হাদীসের সনদে এমন সব রাবী রয়েছেন, যারা নির্ভরযোগ্য নয়।

বিশুদ্ধ মতে এ সূরা কুরআন নাযিলের প্রথম দিকেই অবতীর্ণ হয়েছিল। ওহীর ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার কারণে কাফিররা যখন বলাবলি করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর প্রভু ছেড়ে দিয়েছে। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) তার কিতাবের ৪৭নং অনুচ্ছেদের শেষে এ ঘটনা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে ছিল ভবঘুরে। একদিন লোকটি বনী ইসরাইলের অলঙ্কার পরিহিত এক ছেলেকে দেখল। এরপর লোকটি ছেলেটিকে ধোঁকা দিয়ে নিজ ঘরে নিয়ে আসল এবং ছেলেটিকে হত্যা করে জমিতে পুতে রাখল। লোকটি সর্বদাই এ কাজে লিপ্ত থাকত। এমনিভাবে সে অলংকার পরিহিত দুই ভাইকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করে নিজ জমিতে ফেলে দিল। লোকটির স্ত্রী ছিল অত্যন্ত ভদ্র। সে নিজ স্বামীকে এমন সব বদ কাজ থেকে বিরত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় দেখাত। স্ত্রী তাকে বুঝাত আর বলত, আমি তোমাকে আল্লাহর আযাবের এবং তাঁর পাকড়াওয়ের ভয় প্রদর্শন করছি।

লোকটি তখন বলত, আল্লাহ্ আমাকে পাকড়াও করলে তো তখনই আমার উপর আযাব নাযিল করত, যখন আমি এসব কাজ করি। তার স্ত্রী বলত, যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন। এখনও তোমার অনাচারের পরিমাণ সীমা অতিক্রম করে নাই। যেদিন তোমার অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করবে, সেদিন ঠিকই তোমার উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। যা থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এরপর নিহত ছেলে দুটির তালাশ আরম্ভ হয়। হত্যাকারী কে তা তদন্ত শুরু হয়। এদের পিতা ছেলেদের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তখন সে বনী ইসরাঈলের তৎকালীন নবীর নিকট এসে তাঁকে তার পুত্রদ্বয় নিখোঁজ হওয়া সংবাদ অবহিত করে।

নবী (আঃ) নিখোঁজ ও নিহত ছেলেদ্বয়ের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি একা ছিল, না তাদের সাথে কেউ ছিল? বলল, তাদের সঙ্গে একটি কুকুর ছানাও ছিল। কুকুর ছানাটি বাড়িতে ফিরে এসেছে। নবী (আঃ)-এর নিকট কুকুর ছানাটিকে নিয়ে আসা হল এবং তার চোখের সামনে আংটি রাখা হল। এরপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হল, সর্বপ্রথম যে ঘরে প্রবেশ করবে সেখানে তোমার পুত্রদ্বয়ের খোঁজ করবে। সুতরাং কুকুর ছানাটি সেই ঘরেই প্রবেশ করল, যেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। লোকজন খোঁজ করতে আরম্ভ করল। তখন সেই জমিতে বালক ব্যতীত আরও অনেক যুবকদের মৃত দেহ পাওয়া গেল। লোকজন তাকে ধরে নবী (আঃ)-এর কাছে নিয়ে গেল। নবী (আঃ) তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

তখন লোকটির স্ত্রী এসে তাকে বলল, আমি এ দিনের জন্য তোমাকে ভয় দেখাতাম। আর বলতাম, আল্লাহর আযাব হতে বাঁচ। কিন্তু তুমি আমার একটি কথাও শুন নাই। আজ আমি তোমাকে বলতে চাই, তোমার অত্যাচার সীমালঙ্ঘন করেছে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার হাতের মুঠায় নিয়ে নিয়েছেন।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এ বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'কাফ' অনুচ্ছেদে আসবে।

হযরত আবু যার (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কিয়ামত নিকটে আসার নির্দশন সম্পর্কে) ইরশাদ করেন: যখন কিয়ামত নিকটে আসবে, তখন লোকেরা তায়ালিসা-খ্রিষ্টানদের টুপি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি বেশি করবে। ধন-সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। সম্পদশালী তার সম্পদের কারণে বড় লোক হয়ে যাবে। (ছোট-বড়) অন্যায়-অবিচার বেশি বেশি হবে। নারীর সংখ্যা বিপুল হবে। লোকদের দালান-কোঠা হবে। বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান অত্যাচার-অবিচার করবে। মাপে-ওযনে কম দেয়া হবে। নিজের সন্তানের চাইতে কুকুর ছানা লালন-পালন করা ভাল মনে হবে। বড়দের সম্মান করা হবে না। ছোটদের প্রতি দয়া ও

ভালবাসা দেখানো হবে না। যিনা-ব্যভিচারের আধিক্য হবে; পথে ঘাটে নারীর সাথে ব্যভিচার করা হবে। পুণ্যবান লোকেরা বলবে, সম্ভব হলে তোমরা রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এ কাজ কর। তারা ভেড়ার পোশাক পরিধান করে ভেড়া সাজবে। সেই যুগে তাকেই উত্তম মনে করা হবে, যে হবে চাটুকার অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়ত গর্হিত কাজকর্ম দেখেও চুপ করে থাকবে।

উপরিউক্ত বর্ণনায় ইমাম তাবারানী (রহ.) 'আল-মু'জামুল আওসাত' নামক গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসের সনদে যে রাবী (বর্ণনাকারী) সাইফ ইবনে মিসকীন আছেন, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

১৫৪. الجريث (আল-জিরাইস) পানির সাপ

সাপের সদৃশ্য একপ্রকার মাছ আছে। সম্ভবত একে বাইন মাছ বলা হয়, এর বহুবচন جراثى (জারাসা), ফার্সি ভাষায় একে مارماهى (মারেমাহী) বলা হয়। জাহিয বলেন : এটা পানির সাপ, যা টিড্ডি খায়।

জিরাইসের শরঈ বিধান

ইমাম বাগাভী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের احل لكم صيد البحر আয়াত মতে তা খাওয়া হালাল। আর এ অভিমত হযরত আবু বকর, উমর, ইবনে আব্বাস, যায়িদ ইবনে সাবিত ও আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর। আর এ অভিমত সমর্থন করেছেন কাযী শুরাইহ, হাসান ও আতা প্রমুখ ফকীহগণ। অধিকন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ (রহ.)-ও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এ ধরনের সাপ দ্বারা শুধু সমুদ্রেই বা পানিতেই বাসকারী সাপগুলোই উদ্দেশ্য। কিন্তু জলে ও স্থলে উভচর সাপ খাওয়া হারাম। কেননা ওরা বিষাক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একবার পানির সর্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, এটা হালাল না কি হারাম? তিনি জবাব দিলেন, ইয়াহুদীরা একে হারাম মনে করে, কিন্তু আমরা হারাম মনে করি না।

চিকিৎসায় জিরাইসের উপকারিতা

পানির সর্পের বিষ কোন পাগলা ঘোড়ার নাকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হলে এর পাগলামী দূর হয়ে যাবে। এর গোশত খাইলে আওয়াজ সুন্দর হয়। পানির সাপের বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে যে আলোচনা করেছেন তা ইনশাআল্লাহ "সাইদ অনুচ্ছেদে" আলোচনা করা হবে।

১৫৫. الجزور (আল-জাযূর) উট

জাওহারী (রহ.) বলেন, স্ত্রী-পুরুষ উভয় উটের ক্ষেত্রেই 'আল-জাযূর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইবনে সাইয়িদা বলেন : জাযূর এমন উটকে বলা হয় যাকে জবাই

করা হয়। এর বহুবচন جزائر (জাযাইর) ও جزراء (জাযরা) আসে। আর এর চূড়ান্ত বহুবচন جزرات (জাযরাত)। যেমন, طرق (তুরক)-এর বহুবচন طرقات। খিরবাক বিনতে হিফান বলেন :

لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وافاة الجزر

কস্মিনকালেও আমার গোত্র পৃথক হবে না, যারা দুশমনদের জন্য বিষ এবং উটের জন্য বিপদ অর্থাৎ আমার গোত্র অনেক উপরে আরোহণ করে অথবা তাদের জবাই করে মেহমানদারী করে। এমনিভাবে উটের জন্য যেন প্রাণ বিসর্জনকারীতে পরিণত হয়।

النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الازر

(আমার গোত্র) প্রতিটি যুদ্ধ ময়দানে অবতরণকারী এবং আচার অত্যন্ত পবিত্র।

আর এটা হতে مجزرة (মিজযারাহ) এমন স্থানকে বলে যেখানে জবাই করা হয় অর্থাৎ কসাইখানা। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, الجزور অর্থ উট। এমতাবস্থায় الجزور من الابل থেকে শব্দটির উৎপত্তি। যদি الجزور من الضان থেকে হয়, তাহলে الجزر থেকে উৎপত্তি মানতে হবে। যার অর্থ– কাটা, কর্তন করা।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবদুর রহমান ইবনে শামাশাহ-এর হাদীস, যা আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) মৃত্যুকালীন সময়ে লোকদের বলেছেন : তোমরা যখন আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবরের উপর পানি ছিটাবে। আর আমার কবরের পাশে ততক্ষণই অপেক্ষা করবে, একটি উটনী জবাই করে গোশত বণ্টন করতে যতক্ষণ সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে পারি এবং আপন প্রতিপালকের ফেরেশতাগণ প্রশ্নের জবাবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি।

উটনী জবাই এবং এর গোশত বণ্টনের উদাহরণ দেওয়ার কারণ হল, আমর ইবনে আস (রাঃ) প্রাথমিক জীবনে মক্কাতে কসাই ছিলেন। তাই তিনি উট জবাই করতে ভালবাসতেন। এ কারণে তিনি এ উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর কসাই হওয়ার প্রমাণ ইবনে কুতাইবা (ইতিহাসবিদ) 'মায়ারিফ' নামক গ্রন্থে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে ওয়ারিদ তার 'কিতাবুল বিশাহ' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন এবং ইবনে জাওযীও তার 'তালকীহ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যুবাইর ইবনে আওয়াম ও আমীর ইবনে কারীর ও কসাই (جزار ও قصاب) ছিলেন।

বাসাইরুল কুদামা ও সারাইরুল হুকামা গ্রন্থে কুরাইশ হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যক্তির শিক্ষা ও কারিগরির বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তাতে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দকী (রাঃ) ছিলেন কাপড় বিক্রেতা। হযরত উসমান, তালহা, আবদুর রহমার ইবনে আওফ (রাঃ)-ও কাপড় বিক্রেতা ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন এজেন্ট অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে মধ্যস্থতাকারী। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন তীর নির্মাণকারী। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, আবুল আ'স এবং আবু জেহেলের ভাই ছিলেন কর্মকার। ওকবাহ ইবনে মুঈত ছিলেন শরাব বিক্রেতা। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ছিলেন যায়তুন ও চামড়া বিক্রেতা। আবদুল্লাহ ইবনে জিদয়ান ছিলেন দাস ও পশু বিক্রেতা। নসর ইবনে হারেস ছিলেন সারিন্দ বাদক। হাকাম ইবনে আবুল আ'স ছাগলের পাঠাকে খাসী করাতেন। ইবনে উমর, দাহহাক ইবনে কায়েস ও ইবনে সিরীনও খাসী করাতেন। আ'স ইবনে ওয়ায়েল ছিলেন পশু চিকিৎসক। বিশেষত তিনি ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার। তাঁর পুত্র আমর ইবনুল আ'সও ছিলেন কসাই। এমনিভাবে ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। যুবাইর ইবনে আওয়াম ছিলেন দর্জী। উসমান ইবনে তালহা (রাঃ)—যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফের চাবি দিয়েছিলেন, তিনি—কায়েস ইবনে মাখরামাও দর্জী ছিলেন। মালেক ইবনে দীনার কাগজ তৈরিকারক ও বিক্রেতা বা লেখক ছিলেন। মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরাহ মালি ছিলেন। কুতাইবা ইবনে মুসলিম যিনি অনারব শহরসমূহের বিজেতা, তিনি ছিলেন ভারবাহী অর্থাৎ উট চালক। আর ইউসুফ ইবনে ওয়াইনাহ ছিলেন শিক্ষক। এমনিভাবে দাহ্হাক ইবনে মুযাহিম, আতা ইবনে আবু রাবাহ, কুনিয়াতে শাইর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফী, আবদুল হামীদ ইবনে ইয়াহইয়া, আবু আবদুল্লাহ কাসেম ইবনে সালাম ও কাসায়ী প্রমুখ ছিলেন উত্তম পেশাদার ব্যক্তিত্ব।

জাহেলী যুগে আরবদের ধর্ম

গাসসান, রাবীয়া ও কাযা গোত্রের লোকেরা ছিল খ্রিষ্টান। হিমিয়ার, কিনানাহ, কিন্দাহ, বানী হারিস ইবনে কা'ব গোত্রের লোকেরা ছিল ইয়াহুদী। (পারস্যদের) বনু তামীম, হাজিব ইবনে যারারাহ, যারা তাদের কামান কাসরাদের নিকট বন্ধক রেখেছিল, তারা ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক। তারা কাসরা-পারস্য রাজের সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছিল। এতদসম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হল, اوفى من قوس حاجب "সে বনী হাজিব-এর কামানের চাইতে অধিক বেশি ওয়াদা পূরণকারী।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সেই কামান উদ্ধার করা হয়েছিল এবং সেই কামান তার নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল। কুরাইশদের মধ্যে নাস্তিকতা প্রসারতা লাভ করেছিল।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, উপরিউক্ত গ্রন্থে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) যে দর্জী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে তিনি ছিলেন কসাই। ইবনে জাওযীও তাই উল্লেখ করেছেন। কেননা হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) একসময় মিসরের গভর্নর ছিলেন। তিনি একজন অভিজাত শ্রেণীর লোক। সে-সময় তিনি নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর কসাই-এর সঙ্গে তুলনা করতেন। উটনী জবাইকে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এবং গোশত বণ্টন তাঁর পরিবার-পরিজনের ভাগ-বাটোয়ারার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল ৯ আরদাব স্বর্ণ। ১ আরদাব =২৪ সা', ১ সা=সাড়ে তিন সের।

উটনীর শরঈ বিধান

উটের গোশত খাওয়ার পর দ্বিতীয়াবার অযূ করতে হবে কি না? এ বিষয়ে 'হামযা' অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করতে হবে, না কি করলে চলবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ ব্যাপারে উভয় প্রকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একদল আলেম বলেন, উটের গোশত খাওয়ার পর অযূ করার প্রয়োজন নাই; তাদের দলীল হল মুসলিম শরীফের এ হাদীস–

"হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জানতে চাইলেন, বকরীর গোশত খাওয়ার পর আমরা অযু করব কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এতে তোমাদের স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে অযু করতে পার আবার নাও করতে পার। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উটের গোশত খাওয়া এবং অযূ সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, উটের গোশত খাওয়ার পর অযূ কর।"

আহমাদ ইবনে আবু দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উটের গোশত খাওয়ার পর অযূ করতে হবে কি-না জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, উটের গোশত খাওয়ার পর অযূ কর। আবার বকরীর গোশত খাওয়ার পর অযূ করতে হবে কি-না জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : অযূ করতে হবে না।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় ইমাম নববী (রহ.) তাঁর কিতাব সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। দলীল হিসেবে হাদীসদ্বয় এতই সুদৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ যে, এর কোন বুদ্ধিগত জবাব চলে না। আর এ অভিমতই বিজ্ঞ আলেম গ্রহণ করেছেন।

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ করে উকবা ইবনে আবু মুঈত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোমরের উপর পঁচা উটের নাড়ীভুঁড়ি রেখে দিল। এর ভারের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে পারছিলেন না। এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) সেখানে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোমরের উপর থেকে তা সরিয়ে দিলেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের জন্য বদদুআ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদের জন্য বদদুআ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! কুরাইশদের একদল লোকদের আপনি পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ! আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উকবা ইবনে রাবীয়াহ, শাইবা ইবনে বারীরাহ, উকবা ইবনে আবু মুঈত, উমাইয়া ইবনে আবু খালফ অথবা ইবনে খালফকে আপনি পাকড়াও করুন।

হাদীস বর্ণনাকারী রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নাম নিয়ে বদদুআ করেছিলেন : বদর যুদ্ধে তাদের সবাই নিহত হয়েছিল এবং তাদের সবাইকে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তবে উমাইয়া ইবনে আবু খালফ অথবা উবাই ইবনে খালফকে হত্যার পর কূপে নিক্ষেপের জন্য উত্তোলন করা হয়েছিল; কিন্তু তার দেহ অত্যন্ত ভারি হওয়ার কারণে তার গ্রন্থী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। (যার কারণে তাকে কূপে নিক্ষেপ করা যায়নি।)

১৫৬. الجساسة (আল-জাসসাসাহ) কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিতব্য জন্তু

আল্-জাস্সাসা (জীমে যবর, প্রথম সীনে তাশদীদ)। ইবনে সাইয়িদা বলেন, এ প্রাণীটি দ্বীপে বাস করে। দ্বীপের তত্ত্ব তালাশে ঘুরাফিরা করে। দাজ্জাল একে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানীও এ অভিমত ব্যক্ত

করেছেন। এর নাম জাস্‌সাসাহ্ রাখার কারণ হল, সে দাজ্জালের জন্য সংবাদ সংগ্রহের কাজ করবে। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এটি হল 'দাব্বাতুল আরদ'[১]।

---

১ جساسة (জাসসাসাহ) সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-এর মতে জাস্‌সাসাহ্ হল দাব্বাতুল আরদ; কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিতব্য একটি প্রাণী। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন–

واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بايتنا يوقنون.

আর যখন তাদের উপর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, তখন আমি তাদের জন্য যমীন হতে একটি প্রাণী বের করব। সে তাদের সাথে কথা বলবে। সে-সময় লোকেরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। অর্থাৎ তাদের উপর আযাব যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে এবং কিয়ামত অতি নিকটবর্তী হবে, তখনই এ প্রাণীর প্রকাশ ঘটবে। –তাফসীরে খাযিন

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ৬টি বস্তু আসার পূর্বে নেক আমল করে নাও–

(১) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বে, (২) ধূম্র প্রকাশের পূর্বে, (৩) দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পূর্বে, (৪) এ প্রাণীটি বের হওয়ার পূর্বে, (৫-৬) তোমাদের মধ্যে আম ও খাস লেনদেনের পূর্বে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– কিয়ামতের সর্বপ্রথম যে নিদর্শন প্রকাশ পাবে, তার মধ্যে সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া এবং দ্বিতীয় নিদর্শন দিনের বেলায় সেই প্রাণীর মানুষের উপর বিজয়ী হওয়া। এ দুটির মধ্যে যেটিই আগে প্রকাশিত হবে, দ্বিতীয়টি এর পর পরই প্রকাশিত হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন : যখন এ প্রাণীটির প্রকাশ ঘটবে তখন তার কাছে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি থাকবে। প্রাণীটি এ লাঠির সাহায্যে মুমিন লোকদের মুখমণ্ডল নূরানী করে দিবে এবং আংটি দ্বারা কাফিরদের নাকে সীল মেরে দিবে, যাতে মুমিন ও কাফিরদের সহজে চেনা যায় বা সনাক্ত করা যায়। যখন মুমিন বলবে তখন সকল মুমিন একত্রিত হয়ে যাবে এবং 'কাফের' বলে আওয়াজ দিলে সকল কাফির একত্রিত হবে। অর্থাৎ স্পষ্ট হয়ে যাবে কে মুমিন আর কে কাফের। কেননা মুমিনদের চেহারা হবে আলোকিত ও উজ্জ্বল এবং কাফেরদের নাকে থাকবে আংটির মোহরাঙ্কিত।

আল্লামা সা'লাবী রহ. এর সনদে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! প্রাণীটি কোন স্থান হতে বের হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে মসজিদটি আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও পবিত্র সেখান হতে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) (দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে পদার্পণ করে) কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে থাকবেন। তাঁর সাথে মুসলমানগণও থাকবে। এমন সময় হঠাৎ করে যমীন দুলতে থাকবে। সাফা পাহাড় ফেটে যাবে। সে-সময় সাফা পাহাড় হতে এ প্রাণীটি বের হবে। সর্বপ্রথম তার আলোকিত মাথা বের হবে, যা ধুলাবালি ও দাড়িতে আবৃত থাকবে। কিন্তু কোন অন্বেষণকারী একে খুঁজে পাবে না। আর কোন পলায়নকারী এর থেকে বাঁচতে পারবে না অর্থাৎ তার গতি এতই ক্ষিপ্র হবে যে, কেউ একে একস্থানে আবদ্ধ থাকতে দেখবে না। কেউ তার নিকট হতে অগ্রেও যেতে পারবে না। সে মুমিন ও কাফিরদেরকে নাম ধরে ডাকবে। সে মুমিনদের চেহারা এমন আলোকিত করে দিবে, যেন আলোকজ্জ্বল তারকা। কাফিরদের চেহারাতে তার দুই চোখের মাঝে একটি কালো চিহ্ন এঁকে দিবে আর তার কপালে 'কাফির' লিখে দিবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই বা তিনবার বলেছেন : আজইয়াদের ঘাটি অত্যন্ত খারাপ ঘাটি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কেন হবে? তিনি জবাব দিলেন, এ ঘাটি হতে সেই প্রাণী বের হবে এবং তিনবার এত জোরে চিৎকার দিবে যে, পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত শোনা যাবে।

পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ আছে। এ প্রাণীটি লোহিত সাগরের দ্বীপে বসবাস করে।

হাদীস শরীফে জাস্‌সাসাহ্‌র উল্লেখ

মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, ইবনে মাজাহ শরীফে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করলেন এবং তিনি ভাষণ দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। এরপর বললেন, আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে প্রলুব্ধ বা উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত করার জন্য একত্রিত করি নাই, বরং একটি কথা আমাকে তামীম দারী বলেছে। তা বলার জন্যই আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীম দারী আমাকে বলেছে, আমরা তেইশজন

কতিপয় বর্ণনা ও উলামায়ে কেরামের মতে 'দাব্বাতুল আরদ' মূলত ওই প্রাণী, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে (নবুওয়াতের পূর্বে) কা'বা ঘরের ধনাগার ও কা'বার হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কুরাইশরা যখন কা'বা ঘর সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা করল, তখন প্রতিবারই সাপটি তার মুখমণ্ডল খুলে তাদের সম্মুখে বের হত। আর প্রতিবারই কুরাইশরা এর ভয়ে কা'বা ঘরের সংস্কারের ইচ্ছা হতে পিছু হটে যেত। কিন্তু একদিন সাপটি যখন তার অভ্যাস মত কা'বার দেওয়ালে বসে ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা ঈগলের চেয়ে সামান্য বড় একটি পাখি প্রেরণ করলেন। পাখিটি এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে 'হাজুন' এলাকাতে ফেলে দিল। সেখানের মাটি তাকে গ্রাস করে নিল। হাদীসে আছে, এ সাপটি এমন প্রাণী, যা কিয়ামতের দিন লোকদের সাথে কথা বলবে।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সেই প্রাণীটির আকার-আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এর মাথা হবে গরুর মাথার মত, চোখ হবে শূকরের চোখের মত, কান হবে হাতির কানের মত, শিং হবে হরিনের শিং এর মত, আর বক্ষ হবে বাঘের বক্ষের মত। তার চামড়া হবে চিতা বাঘের মত। কোমর হবে বিড়ালের মত, লেজ হবে বিচ্ছুর লেজের মত। পায়ের নলী হবে উটের নলীর মত। এর শরীরের একটি জোড়া হতে অপর জোড়ার দূরত্ব হবে বার গজ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এ প্রাণীটি 'আজইয়াদ' নামক ঘাটি হতে বের হবে। এর মাথা মেঘমালাকে স্পর্শ করবে। তখন তার পায়ের নলী মাটিতে থাকবে। ওহাব বলেন, তার মাথা হবে মানুষের মাথার মত, বাকি শরীর হবে পাখির শরীরের মত।

আল্লামা হালাবী রহ. লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কা'বা ঘরের ধনাগারের সাপটিই কতিপয় আলেমের মতানুসারে সেই প্রাণী, যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে। যে ব্যক্তি একে দেখবে, তাকে বলা হবে– মক্কাবাসী মুহাম্মাদ ও কুরআনকে বিশ্বাস করত না। অপর এক বর্ণনা মতে সেই প্রাণীটি বলবে, "এই ব্যক্তি মুমিন এবং এ ব্যক্তি কাফির"। আরেক বর্ণনা মতে সে বলবে– যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "মানুষ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না"।

একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

একটি বর্ণনা মতে সেই প্রাণীটি মানুষকে আহত করবে। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত ...لا واذا وقع القول يوقنون (সূরা নমল) এ تكلمهم রয়েছে। যদি এ শব্দকে تكلمهم পড়া হয় (যেমন, কোন এক ক্বিরাতে রয়েছে) তবে এর অর্থ হবে– সে মানুষকে আহত করবে।

تكلمهم ও تكلمهم এর বিষয়ে যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এ ক্বিরাত কী ভাবে? (অর্থাৎ সেই প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলবে অথবা তাদেরকে আহত করবে) তখন তিনি বললেন, এ প্রাণীটি উভয় কাজ করবে। মুমিনের সাথে কথা বলবে আর কাফিরদেরকে আহত করবে।

–তাফসীরে খাযিন : ৪৬৬-৬৭

ব্যক্তি একটি নৌকাতে আরোহন করলাম। এদের মধ্যে কিছু লোক সুস্থ আর কিছু লোক অসুস্থ। এরপর প্রবল বাতাসের কারণে নৌকাটি একটি দ্বীপে যেতে বাধ্য হল। হঠাৎ করে একটি প্রাণী তাদের সামনে আসল। তারা প্রাণীটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুই কে? প্রাণীটি জবাব দিল, আমি জাসসাসাহ (جساسه)। তারা বললেন, আমাদেরকে কিছু বল তো? সে বলল, তোমরা কোন সংবাদ জানতে চাইলে ওই ইবাদতখানাতে যাও। কেননা সেখানে তোমাদের সাক্ষাতের অনুরাগী একজন লোক পাবে। সে বলল, আমরা তার কাছে গেলাম। এরপর হাদীস শুনলাম অর্থাৎ কিছু কথা শুনলাম।

হযরত তামীম দারী (রহ.)

তাঁর নাম তামীম ইবনে আউস ইবনে খারিজাহ ইবনে সুয়াইদ আবু রাকিবাহ। তিনি নবম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বেশ কিছু অনন্য গুনাবলী আছে। তাতে আর কার অংশীদারিত্ব নাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট থেকে জাস্‌সাসাহ-এর ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট হতে একদল সাহাবা যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস, আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ এবং তাবীঈদের একদল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করতেন। হযরত. উসমান রাঃ-এর শাহাদাতের পর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যান।

হযরত তামীম দারী (রাঃ) তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। হাফেয আবু নাঈম বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের সম্মুখে কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করতেন এবং মসজিদে বাতি জ্বালাতেন। এমনিভাবে আবু দাউদ তায়ালিয়ী (রহ.) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত করেন : সর্বপ্রথম মসজিদে বাতি প্রজ্বলনকারী তিনিই। তিনি ৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে কুযান বলেন, তামীম যার বর্ণনা সহীহ বুখারীর পানপাত্রের আলোচনায় রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান।

১৫৭. الجعار (আল-জা'য়ার) হায়েনা

الجعار একে ফার্সি ভাষায় كفتار (কাফতার) আর আররীতে الضبع (দাবা') বলা হয়। আবার عرجا (আরজা) নামেও ডাকা হয়। হায়েনা অনেকটা শিয়ালের মতই। চলার সময় সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। হায়েনা গোরস্থানে বসবাস করে। সেখানে এরা মৃত্য মানুষের গোশত এবং অন্যান্য আহার্য খায়। এরা খুব শক্ত মাটি খুঁড়ে মৃত্য মানুষের লাশ বের করে আনতে পারে। এরা খুব চালাক,

সাহসী ও ঝগড়াটে প্রকৃতির। লোকেরা উদাহরণ হিসেবে বলে— اعبث من جعار "অমুক লোক হায়েনার চেয়েও অধিক ঝগড়াটে।"

কবি বলেন–

فقلت لها عبثى جعار جررى بلحم امرى لم يشهد النوم ناظره

আমি প্রেমিকাকে বললাম, আমার ব্যস্ততা হায়েনার চাইতে ও বেড়ে গেছে। আমার গোশত হায়েনার মত খেয়ে ফেলেছে। এমনকি শয়নকারীর চোখ পর্যন্ত দেখে নি।

চিকিৎসায় হায়েনার উপকারিতা

হায়েনা লালিমা মিশ্রিত কালো রঙের হয়ে থাকে। কিন্তু এর গোশত অনেকটা কালো, বিস্বাদ ও পুঁতিগন্ধময়। হায়েনার গোশত পাকস্থলির শীতলতা, শ্লেষ্মা ও সর্দি জ্বরে বেশ উপকারী। এর রক্ত পাগলামী প্রতিরোধ করে এবং এর পিত্ত কফ ও থুথু বের করে দেয়।

শরঈ বিধান

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে হায়েনার গোশত হারাম। তবে কেউ কেউ একে হালালও বলেছেন।

স্বপ্নে হায়েনা দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কেউ হায়েনা দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে মন্দ ও বিশ্রী মহিলা। কেউ স্বপ্নে হায়েনার দুধ পান করছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে তার স্ত্রী তার সাথে গাদ্দারী ও খেয়ানত করবে। পুরুষ হায়েনা স্বপ্নে দেখলে এর ব্যাখ্যা হল, তার নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত শত্রু।

১৫৮. الجعدة (আল-জা'দাহ) বকরী

الجعدة (আল-জা'দাহ)-এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ ذال অনুচ্ছেদে ভেড়ার উপনামে আসবে।

১৫৯. الجعل (আল-জু'য়ালু) গোবরের পোকা

الجعل (আল-জু'য়ালু) বহুবচনে جعلان (জি'লান) আসে। (জীমে যের এবং আইন সাকীন) মানুষ একে ابو جعران (আবু জি'রান) বলে। কেননা এ প্রাণী শুকনা পায়খানা একত্র করে স্তুপ দেয়। جعر (জা'য়ার) অর্থ, পায়খানা ও মল।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছোট প্রাণী। চতুষ্পদ জন্তুর লজ্জাস্থানে দংশন করে উড়ে যায়। গোবরে পোকা কালো রঙের,

পেটের নিচের অংশে লাল ডোরা কাটা। পুরুষ গোবরে পোকার ২টি শিং থাকে। এদেরকে বেশিরভাগ গাভী ও মহিষের বাথানে বা গোবরের মধ্যে পাওয়া যায়। এর বৈশিষ্ট্য হল, এটি নাপাক বস্তুকে একত্র করে স্তূপ দেয়। গোলাপ ফুলের ঘ্রাণে এটি মারা যায়। একে গোবরে ফেলে দেওয়া হলে আবার জীবিত হয়ে যায়। আবু তাইয়িব এর অবস্থা বর্ণনা সম্পর্কে কবিতায় বলেছেন :

كما تضر رياح الورد بالجعل "যেমন গোলাপের সুঘ্রাণ গোবরের কীটকে ক্ষতি করে"।

গোবরে পোকার দুটি ডানা আছে। উড়ার সময়ই শুধু ডানা দেখা যায়। ৬টি হাত পা আছে। এটি উল্টো দিকে চলে। তথাপি সঠিকভাবে গর্তে পৌঁছাতে পারে। সে তার ডানা ঝাড়া দিলেই তার ডানা প্রকাশ পায় এবং উড়ে যায়। কোন ব্যক্তি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে সে ওই ব্যক্তির পিছনে পিছনে চলতে থাকে। কেননা সে পায়খানা পছন্দ করে। এটি তার খাদ্য।

হাদীস শরীফে গোবরে পোকার উল্লেখ

তাবারানী ও আবুদ দুনিয়া 'কিতাবুল উকূবাত' গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমান' এ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আদম সন্তানের গুনাহ গোবরে পোকাকে তার গর্তে মেরে ফেলে।

হাকিম (রহ.) আবুল আহওয়াস হতে তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত–

ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم الى اجل مسمى-

পড়ে বললেন, "হতে পারে গোবরে পোকাকে আদম সন্তানদের গুনাহের কারণে এর গর্তেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে"।

ইমাম হাকিম (রহ.) এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ বলেছেন, তবে তিনি এটি বর্ণনা করেন নাই। মুজাহিদ (রহ.) মহান আল্লাহর বাণী– ويلعنهم اللاعنون-এর ব্যাখ্যায় বলেন, الاعنون এর উদ্দেশ্য হল স্থলজ প্রাণী গোবরে পোকা এবং পায়খানা ভক্ষক। পাপের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে বিধায় সে অভিসম্পাত করে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– "আল্লাহ তাআলা তোমাদের হতে জাহেলি যুগের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পূর্বপুরুষের গর্ব-অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মুমিন পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী। তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছ। মানুষকে তার বংশগৌরব ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা জাহান্নামের

কয়লাসমূহের একটি কয়লা। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার নিকট গোবরে পোকার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট ও অপমানিত হবে, যে তার নাক দ্বারা ময়লা দুর্গন্ধ ছড়ায় (সরায়)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলার নিকট গোবরে পোকার চেয়েও অধিক ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট যে নাক দ্বারা পায়খানা সরায়।

ইমাম আবু দাউদ তায়ালেসী (রহ.)-এর মুসনাদে 'শু'আবুল ঈমান'-এ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার তথা পূর্বপুরুষদের বংশগৌরব কর না, যারা জাহেলী যুগে মরে গিয়েছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যখন গোবরে পোকা তার নাক দ্বারা ময়লা সরিয়ে দেয়, এটা তোমাদের পূর্বপুরুষদের চাইতেও উত্তম, যারা অন্ধকার যুগে মরে গিয়েছে।"

বাযযাব (রহ.) তাঁর মুসনাদে হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান আর আদম মাটির সৃষ্টি। কওমকে তার বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষদের অহমিকা হতে অবশ্যই বাঁচতে হবে। নয়তো সে আল্লাহ তাআলার নিকট গোবরে পোকার চাইতেও অধিক অসম্মানের পাত্র হবে।

আমীর ইবনে মাসউদ (রাঃ) গোবরে পোকার নাক দ্বারা সরানোকে ছোট ও নিকৃষ্ট হওয়ার কারণে উপাধি দিয়েছেন। আর ওনি الصوم الشتاء الغنيمة الباردة-র হাদীসখানা বর্ণনাকারী।

ইমাম রিয়াদী ইমাম আসমাঈ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট এক বেদুইন তার ছেলের ব্যাপারে আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে বললাম, তার কিছু গুণাগুণ বর্ণনা কর। সে বলল, মনে হয় যেন সে ছোট্ট একটি দীনার। আমরা তাকে বললাম, আমরা কিছু দেখি নাই। এরপর অনতিবিলম্বে বেদুইন একটি কালো বাচ্চা উঠিয়ে নিয়ে আসল। মনে হল তা একটি গোবরে পোকা। তার গর্দান বিষ্ঠা ছিল। আমরা বললাম, যদি তুমি তার ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু বলতে তাহলে অবশ্যই আমরা তার ব্যাপারে কিছু বলে দিতে পারতাম। কেননা সে পুরো দিনই আমাদের কবযায় ছিল। এরপর আসমায়ী এ কবিতা পড়লেন–زينها الله فى الفواد كما زين فى عين والد ولده

আল্লাহ তাআলা সকলের অন্তরে তার ভালবাসা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেমনি পিতার অন্তরে পুত্রের ভালবাসা বাসা বাধে।

গোবরে পোকার শরঈ বিধান

নোংরা স্থানে থাকার কারণে গোবরে পোকা খাওয়া হারাম।

প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলে থাকেন– الصق من جعل তথা অমুক ব্যক্তি গোবরে পোকার চাইতে বেশি সংলগ্ন অর্থাৎ নিকটবর্তী। কেননা গোবরে পোকা মানুষের পায়খানার পিছনে লেগে থাকে।

কবি বলেন–

ان اتيت سليمى شب لى جعل ان الشقى الذى يغرى به الجعل

"যখন তুমি সুলাইমার নিকট পৌঁছাবে তখন তাকে বলবে– দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির জন্য, যে গোবরে পোকা দেখে ভয় পায়।"

এ উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্যটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে ব্যক্তি তাকে অপছন্দকারী লোকের নিকট থেকে পালায়।

চিকিৎসায় গোবরে পোকার উপকারিতা

গোবরে পোকা আগুনে না সেকে এবং লবণ না মিশিয়ে শুকাবে। এরপর তাতে কোন কিছু না মিশিয়ে বিচ্ছু কাটা ব্যক্তিকে পান করাবে। অনেক উপকার পাবে।

স্বপ্নে গোবর পোকা দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে গোবরে পোকা দেখলে ক্রোধান্বিত দুশমন হওয়ার লক্ষণ। অবশ্য কোন কোন সময় এটা মুসাফির হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে; যে ব্যক্তি নিজের হারাম সম্পদকে এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করে।

১৬০. الجعول (আল-জাউল) উট পাখির ছানা

ইয়ামানী ভাষায় উট পাখির ছানাকে আল-জাউল বলে। এর বিস্তারিত আলোচনা 'নুন অনুচ্ছেদে' نعامه (নুয়ামা) শব্দে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৬১. الجفرة (আল-জাফরাহ) ছাগল ছানা

'জাফরাহ' চার মাসের এমন ছাগল ছানাকে বলে, যে তার মায়ের দুধ পান করা ছেড়ে দিয়েছে। পুরুষ ছাগল ছানার ক্ষেত্রে 'জাফর' আসে।

'আল-জাফরাহ' নামকরণ করার কারণ হল, 'জাফর' অর্থ– বড় হওয়া, প্রশস্ত হওয়া। কেননা এ বয়সে ছাগল ছানার গ্রন্থিসমূহ বড় হতে থাকে। এ জন্য একে 'জাফরাহ' বলা হয়।

এর বহুবচন اجفار (আজফার) ও جفارة (জাফরাহ) আসে।

জ্ঞাতব্য

ইমাম মুতায়বাহ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'কিতাবুল জাফার'-এ ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ সাদিক (রহ.) এ বিদ্যার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস আহলে বাইতের বংশধরের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল বস্তু হবে, তাও সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি আবুল আলা মুয়াররা তার কবিতায় সেই বিদ্যাকে ইমাম জাফর-এর দিকেই সম্বন্ধিত করে বলেছেন–

لقد عجبوا لاهل البيت لما اتاهم علمهم فى مسك جفر

আহলে বাইতের জন্য অতি আশ্চর্যের বিষয় হল, যখন তাদের নিকট এ বিদ্যা পৌঁছাল যে, মেশক জাফর কী বস্তু।

ومراة المنجم وهى صغرى ارته كل عامرة وقفر

জ্যোতিষের আয়না অতীব ছোট তা সত্ত্বেও সেই জ্যোতিষী সকল আবাদ ও অনাবাদী এলাকার খবর অবহিত করে।

শরঈ বিধান

বকরীর ছানা খাওয়া হালাল। ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি ইঁদুর হত্যা করে, তবে তাকে বকরীর ছানা ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে।

১৬২. الجلالة (আল জাল্লালাহ) পায়খানা খেকো গাভী

'জাল্লাল্লাহ' অর্থ, শুধু নাজাসাত ও গালাযাত তথা অপবিত্র স্থানে বাসকারী ও তা আহারকারী প্রাণী। جلا (জাল্লা) মূলত جلل (জালালা) ضرب; ও باب نصر (জাল্লা ও জাল্লাতা) অর্থ, বিষ্ঠা দিল। جلت الدابة الجلة—প্রাণী বিষ্ঠা দিয়েছে। এটা হতে جلالة (পায়খানাখেকো গাভী) শব্দটি গৃহিত।

হাদীসে 'জাল্লাল্লাহ'-এর আলোচনা

ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ নাফি (রহ.)-এর বরাতে হযরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মলমূত্র খেকো (জাল্লাল্লাহ) গাভীতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম হাকেম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাল্লাল্লাহ গোশত ও উহার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি এ প্রাণী দ্বারা বোঝা বহন ও তাতে আরোহণ করতেও নিষেধ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত একে ৪০ দিন ঘরে বেঁধে রাখা এবং কোন প্রকার দানা-পানি না দেওয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানকারী এবং মলমূত্রখেকো প্রাণীতে সওয়ার হতে

নিষেধ করেছেন। এছাড়া তিনি মুজাসসানা অর্থাৎ যেই পাখিকে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হয়েছে এবং সেই অবস্থায় মারা গিয়েছে, তা খেতে নিষেধ করেছেন।

১৬৩. الجلم (আল-জালামু) শিকারী পাখি

'জালাম' বাজপাখির মতই একটি শিকারি পাখি। এটা বাজ হতে আকারে ছোট। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'ইয়া' অনুচ্ছেদে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

'জিম' পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ

১৬৪. الجمل (আল জামাল) নর উট

জামাল (উট) একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত প্রাণী। কররা বলেন, এটা উটনীর স্বামী। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে একবার উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি ওই প্রশ্নকারী লোকটিকে মূর্খ ভাবলেন। কারণ, লোকটি এমন জিনিস সম্পর্কে জানে না, যার নাম সবাই জানে।

جمل (জামাল)-এর বহুবচন جمال (জামাল), اجمال (আজমাল), جمائل و جمالات (জামাইল ও আমালাত) আসে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন– كأنهم جمالات صفر অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ বলেন, এটা جمال-এর বিশুদ্ধ বহুবচন। যেমন– رجال (রিজাল)-এর বহুবচন رجالات (রিজালাত)।

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন– নৌকা ও জাহাজের বড় বড় রশিকেও جمالات (জামালাত) বলে। ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, ৪ বৎসর বয়সের উটকে جمل (জামাল) বলে।

জ্ঞাতব্য

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন যে উটের উপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সওয়ার ছিলেন, তাকে ইযালা ইবনে উনাইয়া চারশত দিরহাম অন্য মতে দুইশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। ইতিহাসবিদ ইবনে আসীর (রহ.) বলেন, আশতার নাখয়ী নামে প্রসিদ্ধ মালেক ইবনে হারেস জঙ্গে জামালে হযরত আলী (রাঃ)-এর একজন বড় সেনাপতি ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মুকাবিলায় বের হলেন। যুবাইর (রাঃ) ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে। তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী বীর। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হল। কখনও তিনি আশতার নাখয়ী তাকে পরাজিত করে বুকের উপর বসে যেতেন আবার কখনও যুবাইর (রাঃ) তাকে পরাজিত করে মারাত্মক বসে যেতেন। বেশ কয়েকবার এমনটি হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) খুব জোরে

চিৎকার করে বলেন : আমাকে ও মালেককে হত্যা কর এবং একই সাথে হত্যা কর। মালেক হল আশতার নাখয়ী। ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, জঙ্গে জামালের দিন আমার সন্ধ্যা হল এমতাবস্থায় যে, বল্লম ও তলোয়ারের আঘাতে ৩৭জন নিহত হলেন। উভয় দলের কেউ পরাজয় স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। উষ্ট্রির নাকের রশি একের পর এক ধরে যাচ্ছিলেন এবং শহীদ হয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি শত শত লোক উষ্ট্রির লাগামেই শহীদ হয়ে গেলেন। আমি উষ্ট্রির রশি ধরলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, কে তুমি? আমি জবাব দিলাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। ইত্যোবসরে আমাতার নাখঈ এল। আমি তার উপর আক্রমণ করলাম। তিনিও আমার উপর শক্ত প্রতিরোধমূলক হামলা করলেন। আমি তখন বলতে লাগলাম, আমাকে এবং মালেককে হত্যা কর এবং একই সাথে হত্যা কর। হঠাৎ আমার হাত থেকে উষ্ট্রির রশি ছুটে গেল। এ সুযোগে আশতার আমাকে উঠিয়ে নিয়ে একটি গর্তে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যদি তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত, তাহলে তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পৃথক করে দিতাম। এক বর্ণনায় আছে, উভয়পক্ষের লোকেরা একত্রিত হলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমার হাত হতে উষ্ট্রির রশি পড়ে গেল। আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনলাম, উটের কুঁজ কেটে দাও। একে হত্যা করলে মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ হবে হালকা। এমন সময় এক লোক এসে উষ্ট্রিকে আক্রমণ করল। এতে উষ্ট্রি মাটিতে বসে গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, ওই আক্রমণের কারণে উষ্ট্রিটি এমন জোরে চিৎকার করল, এমন ভয়ানক চিৎকার আমার জীবনে আর কখনও শুনিনি। এরপর হযরত আলী (রাঃ) আমর ইবনে ইয়াসার এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ)-কে শহীদদের মাঝখান হতে হাওদায় উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাশরীফ এনেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) হাওদায় হাত প্রবেশ করালেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এহই হেরেমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আগুনে জ্বালাবেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) তখন বললেন, হে আমার সম্মানিতা ভগ্নি! বলুন দুনিয়ার আগুনে জ্বালাবেন। এরপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, দুনিয়ার আগুনে। হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি এ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু উমর ইবনে জারমুয (রাঃ) সিবা উপত্যকায় তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শহীদ করে দিলেন এবং তার তলোয়ার নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। হযরত আলী (রাঃ) সেই

তলোয়ার দেখে বললেন, হে জালিম! এ তো সেই তলোয়ার, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহুবার হেফাজত করেছিলেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) বসরায় চলে গেলেন এবং বসরাবাসী হতে বাইআত গ্রহণ করেন। উসমান ইবনে হুনাইনকে ছেড়ে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সফরের আসবাবপত্র তৈরি করা হল এবং তাকে তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের সাথে মক্কাতে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রাঃ)-স্বয়ং কয়েক মাইল পর্যন্ত সাথে গমন করেন এবং হযরত হাসান (রাঃ)-কে আরও কয়েক মনযিল পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ যুদ্ধে ৮ হাজার আসহাবে জামাল (উটের সাথী) শাহাদাতবরণ করেন। অন্য এক মতে সতের হাজার। হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষেও প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি শহীদ হলেন। আর সেদিন উষ্ট্রীর লাগাম ধরা অবস্থায় প্রায় আশিটি হাত কাটা পড়েছিল, এর মধ্যে সম্মানিত যুবা গোত্রের লোকই বেশি। যখন কার হাত কাটা পড়ত, তখন একের পর আরেকজন উষ্ট্রীর রশি ধরতেন। এ প্রেক্ষিতে কবি যুবিয়া নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

আমরা যুবা গোত্রের লোক এবং উটের মালিক, আমরা মৃত্যু মুকাবিলা করি, যখন মৃত্যু এসে সামনে উপস্থিত হয়। আর মৃত্যু আমাদের নিকট মধুর চেয়ে বেশি প্রিয়। আমরা হলাম সেই লোক, যারা যুদ্ধ বর্ম পরিধান করে এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়।

জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ ৩২ হিজরী জমাদিউল আউয়াল অথবা জমাদিউস সানী মাসের বৃহস্পতিবার দিন সংঘটিত হয়। কেউ কেউ ১৫ তারিখের কথাও বলেছেন। এ যুদ্ধ সকাল হতে শুরু হয়ে আসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, আশতারের সাথে মোকাবেলার পর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিরাপদ থাকার সুসংবাদদাতাকে হযরত আয়েশা (রাঃ) দশ সহস্র দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেন, যুদ্ধের পর আশতার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বলেন, হে আশতার ! তুমি এমন ব্যক্তি যে আমার ভগ্নি পুত্রকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলে। আশতার তখন এ কবিতা পড়লেন–

হে আয়েশা যদি আমি আবর্তনকারী না হতাম, তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার বোন পুত্রকে শবদেহরূপে পেতেন। খুব প্রভাতেই প্রচার হয়ে যেত আর বল্লম গোশতের মধ্যে বিঁধে যেত। শোনা যেত– আমাকে ও মালেককে হত্যা করে দাও। সুতারাং সে আমার (হাত) হতে মুক্তি পেল। তার শবদেহ ভক্ষণ হতে এবং তার জোয়ানী হতে। আর যখন পেট খালি হয়, তখন কোন জিনিসই তাকে থামাতে পারে না। বর্ণিত আছে আশতারের সাথে মোকাবিলার সময় হযরত ইবনে যুবাইয়ের মাথায় মারাত্মক আঘাত লেগেছিল। ওই ক্ষতস্থানে বোতল পরিমাণ তেল না ভরলে তা পূর্ণ হত না। হাকিম কায়েস ইবনে হাযিম

হতে এবং ইবনে আবু শায়বা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সহধর্মিনীগণকে বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম তোমাদের মধ্যে কে পশমওয়ালা উটের মালিক? কে তার উপর আরোহণ করে বের হবে এবং হাওয়াব ঝর্ণার কুকরগুলী হতে ঘেউ ঘেউ করবে। হাওয়াব বসরার নিকটবর্তী একটি ঝর্ণার নাম। ইবনে ওহিয়াহ বলেন, ইবনুল আরাবীর জন্য আমার বড় আশ্চর্য লাগে। আমি খুব পেরেশান যে, তিনি তার কিতাব আল-গাওয়ামিসুতে কী করে এই হাদীস অস্বীকার করেছেন এবং বলেছিলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। অথচ হাদীসটি সূর্যোদয়ের চাইতে অধিক প্রসিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন বসরার দিকে বের হন এবং হাওয়াব নামক ঝর্ণার পাশ দিয়ে যান, তখন কুকুরগুলী ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমাকে ফিরে নিয়ে চল। কেননা আমি নবী কররীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এমন এক মহিলা হবে, যাকে দেখে হাওয়াব ঝর্ণার কুকুরগুলী ঘেউ ঘেউ করবে। কায়েস ইবনে হাযিমও এ হাদীস অস্বীকার করেছেন। জনৈক কবি বলেন : আমার উট দীর্ঘ পথ চলার অভিযোগ করল। কিন্তু হে উট! অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। কেননা "আমরা সবাই পরীক্ষায় পড়েছি। সুতরাং অভিযোগ করে লাভ কী? সবর করাই উচিত।" আর উমর ইবনে কুলসুম কবিতায় বলেন :

আমাদের সাথে কেউ মূর্খতাসুলভ আচরণ কর না। অন্যথায় আমরাও মূর্খ সাজব। এমনি আরেকটি কবিতা :

আমার নিকট একটি ধৈর্যশীল ঘোড়া রয়েছে, যাতে ধৈর্যের লাগাম রয়েছে আমার নিকট আরও রয়েছে মূর্খের একটি ঘোড়া, যার উপর মূর্খতার গদি লাগানো রয়েছে।

অর্থাৎ আমি ধৈর্যশীলের সাথে ধৈর্য প্রদর্শন করে থাকি আর মূর্খের সাথে মূর্খের মত আচরণ করে থাকি।

যে আমাকে সোজা ও সঠিক রাখতে চায়, তখন আমি সরল সঠিক থাকি। আর যদি কেউ আমাকে বক্র বানাতে চায় তবে আমি বক্র হয়ে যাই।

যখন উট জ্ঞান ব্যতীত বড় হয়ে যায়, তখন উটের অনিষ্ট হতে নিরাপদ হওয়া যায় না।

বিষাক্ত প্রাণী আমাকে ছোবল মেরেছে এবং তার কুপ্রভাব রেখে গিয়েছে। এখন বিষ হতে বিমুক্তকারী একমাত্র আল্লাহ।

কায়সার তুবা এবং কিসরা সকলকেই শাহী পোশাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মফল তাদের পোশাক খুলে নিয়েছে। সুতরাং তারা সবাই এখন উলঙ্গ।

উটের উপাধি হল আবু আইয়ূব এবং আবু সাফওয়ান।

হাদীসে উটের আলোচনা

উম্মে যারা এর হাদীস– "আমার স্বামী উটের গোশতের মত। যেমন কোন অনাবাদী পাহাড়ের উপর খড়কুটার স্তূপ।" সুনানে আবু দাউদ-এ মুজাহিদ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একখানা হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসর হাদী (কুরবানীর পশু) হিসেবে উট প্রেরণ করেন। মূলত উটটি ছিল আবু জেহেলের। এর নাকে রূপার নথ পরানো ছিল। এ কাজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদেরকে চিন্তান্বিত করতে চেয়েছিলেন। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এতে একটি ফিকহী মাসয়ালাও বের হয়, হাদী হিসেবে নর উট দেওয়া জায়িয। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদী হিসেবে নর উট দেওয়া মাকরূহ মনে করতেন। তার ধারণা হাদী হিসেবে মাদী উট দেওয়া উচিত। অধিকন্তু এ হাদীস হতে বুঝা যায়, সামান্য পরিমাণ রূপা সওয়ারীর জন্য ব্যবহার জায়িয। বাকি হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদেরকে চিন্তায় ফেলতে চেয়েছিলেন" তার ব্যাখ্যা হবে, সাধারণ লোকজন জানত উটটি আবু জেহেলের; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ক্রয় করেছিলেন। এখন আবু জেহেল ও অন্যান্য মুশরিকদের জন্য এতে কষ্ট ছিল যে, আবু জেহেলের উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উৎসর্গে মারা যাচ্ছে এবং তার ধন-সম্পদ মুজাহিদগণের কাজে লাগছে। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (রহ.) ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ভাষণ দিলেন। তাতে আমাদের অশ্রু প্রবাহিত হল অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হল। তখন আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতটুকু ভাষণই যথেষ্ট, নাকি এ ছাড়া আর কোন নসীহত আমাদের জন্য আছে? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে দিনের মত উজ্জ্বল ও আলোকিত রাত্রের উপর রেখে যাচ্ছি। যে ব্যক্তি তা পরিবর্তন করবে, সে ধ্বংসে পতিত হবে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তা-ই অনুসরণ করা তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য, যা তোমরা আমার সুন্নাতে আর আমার পর আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতে পাবে তার উপর তোমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুহদাসাত-নব আবিস্কৃত বস্তু হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রতিটি নব বস্তুই বিদয়াত। আর প্রতিটি বিদয়াতই গোমরাহী-পথভ্রষ্টতা। তদ্রূপ আমীরের আনগত্যকে অত্যাবশ্যক মেনে নিবে যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। কারণ, মুমিন হল লাগামওয়ালা উটের মত। যদি তার লাগাম টানা হয়, তবে সে অনুসরণ ও অনুকরণ করে।

'জামালে আনফ' এমন উটকে বলে, যার নাকে নথ লাগানো বিধায় সে চালকের অবাধ্য হতে পারে না। আবার 'আনফ' বলা হয় এমন উটকে যে সহজেই অনুগত হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় হামযাটি দীর্ঘ স্বরে এসেছে। তবে অর্থ একই। 'নাওয়াজেয' চোয়ালের মাড়ির কাছাকাছি দাঁত। হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সুন্নাতের উপর এমন শক্তভাবে আমল করে, যাও যেমনিভাবে কোন জিনিস দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরা হয়। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসি দিতেন। এতে তাঁর দন্ত মোবারক প্রকাশ হয়ে পড়ত। এ হাদীসে নাওয়াজেয দ্বারা দাওয়াহিক উদ্দেশ্য। আর হাসি দেওয়ার সময় যে দাঁতসমূহ প্রকাশ পায়, তাকে দাওয়াহিক বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি ছিল মুচকি হাসি। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : তোমাদের কেউ যখন সিজদা করে, তখন যেন সে উটের মত উপবেশন না করে বরং প্রথমে উভয় হাত ভূমিতে ঠেকাবে। এরপর উভয় হাঁটু। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এ হাদীসে দ্বারা ওয়াইল ইবনে হুজর-এর হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। আর সে হাদীসখানা চার ইমাম তথা আবু হানিফা, শাফিয়ী, মালেক ও হাম্বল বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁর হস্ত মোবারকের আগে প্রথমে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থাপন করতেন। আর যখন তিনি সিজদা হতে উঠতেন, তখন হস্ত মোবারক হাঁটুর উপর স্থাপন করতেন।" ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী প্রমুখ হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: হযরত জাবির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে একবার উটের উপর সওয়ার ছিলেন। উটটি থেমে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে আঘাত করলেন এবং তার জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর সওয়ার হওয়ার আদেশ করলেন। হযরত জাবির (রাঃ) তাতে সওয়ার হলেন এবং সর্বাগ্রে চলে গেলেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জাবির! এখন তোমার উট কেমন? আমি বললাম, আপনার বরকতে তাকে ঠিক করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটি কি আমার নিকট বিক্রয় করবে? হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। আমার নিকট এ উটটি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, বিক্রয় করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাম বাড়াতে লাগলেন এবং বললেন, তোমার মাগফিরাত করবে। শেষ পর্যন্ত সেটি আমি এক উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। তবে শর্ত হল, আমি এর উপর সওয়ার হয়ে মদীনা শরীফ

পর্যন্ত যাব। সুতরাং আমি মদীনায় পৌঁছালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলালকে আদেশ করলেন, এর মূল্য দিয়ে দাও এবং কিছু বেশি দিয়ে দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উটটি ফেরত দিলেন অর্থাৎ আমাকে দান করলেন। ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর গ্রন্থে হাম্মাদ ইবনে সালমা (রাঃ)-এর একটি হাদীস উল্লেখ আছে। হযরত আবু যুবাইর (রাঃ) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লাইতাতুল বাইর'-এ আমার জন্য ২৫বার মাগফিরাত কামনা করেন।" শর্তে বেচাকেনা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে উপরিউক্ত হাদীসখানা ফুকাহায়ে কেরাম দলীল হিসেবে উদ্ধৃত করেন। অধিকন্তু এ ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য ফিকাহের কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম সুহাইলী (রহ.) বলেন : এ বেচাকেনা নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি প্রদান ও উট ফেরত দান ইত্যাদির যৌক্তিকতা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে জানাতে চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর আত্মা তাকে ফেরত দান করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাবির (রাঃ)-এর নিকট হতে উট ক্রয় করলেন। মানুষের প্রাণকে তিনি জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। এরপর তাকে অতিরিক্ত পুণ্য দান করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : পুণ্যবানকে আল্লাহ তাআলা পুণ্য দেওয়া ব্যতীতও অতিরিক্ত অনুগ্রহ করে থাকেন অর্থাৎ অতিরিক্ত সওয়াবও দিয়ে থাকেন। –সূরা ইউনুস : ২৬

এরপর আল্লাহ তাআলা শহীদগণের আত্মা ফেরত দেন, যা তিনি জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন। সুতরাং তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণকে তোমরা মৃত মনে কর না বরং তাঁরা জীবিত। তাঁদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে জীবিত। তাদেরকে জীবিকা প্রদান করা হয়। –সূরা আলে ইমরান : ১৬৯

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট খরিদ এবং অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে তারপর উটটি ফেরত দিয়ে উপরিউক্ত সুসংবাদের উপর আমলের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) ও ইমাম হাকেম (রহ.) তার মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আনসারীর বাগানে গিয়ে দেখলেন, সেখানে একটি উট। উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কুঁজে ভালবাসার হাত মোবারকের পরশ দিলে উটটি চুপ হয়ে গেল। অর্থাৎ আর কাঁদল না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ উটের মালিক কে? তখন এক আনসারী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলে তিনি তাকে বললেন, তুমি এ

চতুস্পদ জন্তুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন। কারণ, সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি তাকে অনাহারে রাখ। আর তাকে দিয়ে অনবরত কাজ করাও।"

ইমাম তাবারানী (রহ.) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন : আমরা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। আমরা যখন 'বাহরা ওয়াকিম' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ করে একটি উট দৌড়ে এসে আনচান করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন, উটটি তার মালিকের বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ দিয়েছে। সে বলেছে, তার মালিক অনেক দিন যাবত তাকে দিয়ে কৃষিকাজ করাচ্ছে। এমনকি বৃদ্ধ এবং কৃশ করে ফেলেছে। তার জীবন নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন তাকে জবাই করার ইচ্ছে করেছে। হে জাবির! তুমি এখনই তার মালিকের নিকট গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আস। হযরত জাবির (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো তার মালিককে চিনি না। তিনি বললেন, উটই তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিবে। তারপর উটটি আমার আগে আগে খুব দ্রুত গতিতে চলতে লাগল এবং আমাকে 'হতামা' গোত্রের নিকট পৌঁছে দিল। উপস্থিত লোকদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ উটটির মালিক কে? তারা বলল, অমুকের পুত্র অমুক। এরপর আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তখন সে আমাদের সাথে চলল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসে হাজির হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার উট আমার কাছে অভিযোগ দিয়েছে, তুমি অনেক দিন যাবত তাকে দিয়ে কৃষি কাজ করাচ্ছ, আর তাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছ, তাকে দুর্বল ও কৃশ করে দিয়েছ। এখন সে কবরোপযোগী হয়েছে। তুমি কি তাকে জবাই করতে চাও? এ কথা শুনে লোকটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল– সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন : ঘটনা তাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ কী উত্তম গোলামের প্রতিদান? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে জবাই করতে চাও? সে জবাব দিল, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটিকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সে মোটা তাজা ও শক্তিশালী হয়ে গেল এবং তার কুঁজও মোটা হল। মুহাজির ও আনসারগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাদিয়া দিতেন, তখন তা হতে সেই উটের জন্য একটি অংশ ঘাস পানির নিমিত্ত রেখে দিতেন। বেশ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ নীতি প্রচলিত ছিল।

কাহিনী

আল্লামা কুশাইরী (রহ.) তার রিসালায় এবং ইবনে জাওযী (রহ.) "মাশীরুল গাডয়ামিস সাকিন" গ্রন্থে আহমাদ ইবনে আতা দরবারীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আতা বলেন, আমি একদিন একটি উটের উপর সওয়ার ছিলাম। হঠাৎ উটের পা মাটির ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। তখন আমি 'জাল্লাল্লাহ' বললাম এবং উটটিও 'জাল্লাল্লাহ' বলল।

তার আরেকটি ঘটনা আল্লামা কুশইরী (রহ.) 'কারামতে আউলিয়ার' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, মক্কার কোন এক গলিতে এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করল, আমি একটি উটের বাথান দেখলাম, যাদের দিয়ে বোঝা টানানো হয়েছিল। যাদের গর্দান ছিল লম্বা লম্বা। আমি বললাম, আল্লাহর সত্তাই পূতঃপবিত্র, যিনি তাদেরকে শক্তি দান করেছেন। এরপর আমি উটগুলীর কাছাকাছি গেলাম তখন একটি উট বলল, 'জাল্লাল্লাহ'। আমিও তখন 'জাল্লাল্লাহ' বললাম।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি পূর্ববর্তী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কিতাবে পড়েছি– খোরাসান শহরে এক বদনযরের লোক ছিল। একদিন লোকটি এক মজলিসে বসে ছিল। তার সম্মুখ দিয়ে একটি উটের বাথান চলে যাচ্ছিল। বদনযরী লোকটি উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করল, বলত কে উটের গোশত খাবে? এ কথা বলেই লোকটি একটি ভাল উটের প্রতি তার বদনযর ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে উটটি মাটিতে পড়ে গেল। উটের মালিক ছিল সাবধানী। সে বলল, আমার উটের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। লোকটি নিচের দুআ পড়ে বদনযর ধ্বংস করতে চেষ্টা করল : এ দুআ পড়ার পর অল্প কিছুক্ষণ পরই উটটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল তার কিছুই হয়নি।

মাসয়ালা

কুদৃষ্টিকারীর কুদৃষ্টির কারণে যদি কোন কিছু মারা যায় এবং সে তা স্বীকার করে, তবুও ওই লোকের উপর কোন প্রকার জরিমানা, কেসাস ও কাফ্ফারা ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। কেননা কুদৃষ্টি বা বদনযর প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর কারণ হয় না। বদনযরী ব্যক্তির প্রভাব হতে বাঁচার জন্য নিম্নলিখিত দুআ অত্যন্ত কার্যকরী :

কাযী হুসাইন বর্ণনা করেন, নবী (আঃ) তাঁর উম্মতকে অনেক বুঝালেন। আল্লাহ তাআলা এক রাত্রেই এক সহস্র ব্যক্তিকে মৃত্যু দিলেন। সকালবেলা নবী (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযোগ করলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি যখন তাদের সংখ্যা অধিক মনে করলে, তখন কেন তাদের হেফাজত করলে না। তিনি বললেন, আমি কীভাবে হেফাজত করব? আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি এই দুআ পড়তে–

حضينتكم بالحى القيوم الذى لا يموت ابدا و دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوت الا بالله العلى العظيم

কাযী সাহেব বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রাণ নিরাপদ রাখতে চায় সে যেন এ দুআ পাঠ করে। স্বয়ং কাযী সাহেবও যখন তার ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করতেন, তখন তিনিও এ আমল করতেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) তাঁর এক কিতাবে লিখেছেন : বদনযর ভাল মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। অবশ্য কাযী হুসাইন এর বিপরীত বলেন। আল্লামা কুশাইরী (রহ.) সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ বসরীর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বসরার রাস্তায় আমি এক বেদুইনকে উট নিয়ে যেতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম উটটি মৃত এবং তার রক্ষিত মালামাল ও পালান মাটিতে পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর আমি তার দিকে ফিরে আসলাম। তখন বেদুইন লোকটি বললেন- হে সকল কার্যকারণের স্রষ্টা এবং সকলের মনোবাঞ্চনা পূরণকারী। তুমি আমার উটটি আমায় ফিরিয়ে দাও। সুতরাং কিছুক্ষণ পর উটটি জীবিত হয়ে গেল এবং বেদুইন তার পিঠের উপর হাওদা ও মালামাল ইত্যাদি রেখে দিল। মৃতকে জীবিত করা একটি কারামত। যদিও কাজটি বিরাট। তথাপি এটা প্রমাণিত এবং বিশ্বাসযোগ্য ও মুহাক্কিক আলেমগণের পছন্দনীয় অভিমত। কেননা যা কিছু নবীর পক্ষ হতে মু'জিযা হিসেবে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা অলিয়ে কামিলদের থেকে কারামত হিসেবে নিশ্চয় প্রকাশ পেতে পারে। তবে অলী নবীর মত চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। মৃতকে জীবিত করার কারামত অলিদের অসংখ্য প্রমাণিত। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থে এর আলোচনা আসবে।

শেখ ইয়াফী (রহ.) বলেন, কোন অলীর পক্ষ হতে কারামত প্রকাশ পাওয়া শ্রেষ্ঠত্বের দলীল নয়। কারণ, কারামত এজন্য প্রকাশ পায় যাতে বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয় এবং আল্লাহ তাআলার সত্তার সঠিক পরিচিতি দৃশ্যমান হয়। কুতুবুল উলূম ও তাজুল আরেফীন আবুল কাসেম আল-জুনাইদ (রহ.) বলেন, বিশ্বাস বা ইয়াকীন অদৃশ্যের অবলোকনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূতকারী এবং তা এমন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা পরিবর্তন-পতিবর্ধন সম্ভব নয়।

শেখ ইয়াফী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ সময় কারামত প্রকাশ পায় প্রেমিক এবং যাহিদ লোকের পক্ষ হতে, তবে আরেফীনদের পক্ষ হতে কম হয়ে থাকে। কেননা মারেফাত মুহাব্বত হতে উত্তম। আর এটা মুহাক্কিক আলেমগণের অভিমত।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে যুফার (রহ.) তার 'খাইরুল বাশার বি খাইরিল বাশার' ছিল। যার উপর আরবী ভঙ্গিতে একজন বর্ম পরিহিত সৈন্য ছিল। মাথায় পাগড়ি ও পায়ের জুতা পর্যন্ত ছিল তামার। ইসকান্দারিয়াতে দুই ব্যক্তির মধ্যে

বিবাদ হলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসার জন্য সেই মূর্তির নিকট আসত আর মজলুম-অত্যাচারিত ব্যক্তি জালিম-অত্যাচারীকে বলত, এ উষ্ট্রারোহী অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বে আমার পাওনা দিয়ে দাও। কেননা যখন সে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন তোমার নিকট হতে আমার পাওনা পূর্ণ মাত্রায় আদায় করা হবে, তুমি চাও বা না চাও। এ মূর্তিটি হযরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ)-এর মিসর বিজয় পর্যন্ত বহাল ছিল।

প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন, "উট নিজ পেট হতে বের হয়ে স্থান করে নেয়।" প্রবাদটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, যে তার অর্জিত ধন-সম্পদ হতে ফায়দা হাসিল করে। আখলাফ হালফ হতে উদ্ভূত। যার অর্থ, পিছনে বা পশ্চাতে। কেননা উট পিছনের দিক দিয়ে পেশাব করে। তাছাড়া কোন ব্যক্তি সংকটে পড়ে গেলেও এ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। বলা হয়– গোত্রটি উটের ঝুলিতে ফেঁসে গিয়েছে। 'সালা' এমন ঝুলি, যাতে শিশুকে শোয়ানো হয়ে থাকে। যদি সে পেটেই ফেটে যায়, তাহলে শিশু ও মা উভয়ই মারা যায়। যেমন, আরবগণ বলে থাকে– অমুক কাজটি অসম্ভব কাজ হতেও অধিক কঠিন। এ উদাহরণটির মূল কথা হল, জাহিলী যুগে যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের সফলতা লাভ করত অথবা শেষ পরিণতি লাভ করত তখন মদীনার পাহাড়ে চড়ে উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদান করে চিৎকার করত অর্থাৎ যে ব্যক্তি উটের সাহায্যে কূপের পানি দ্বারা পরিতৃপ্তি হয়, তাহলে তার পরিতৃপ্তি হওয়ার ফলাফল খুব দ্রুত অর্জন করে। আর অনুরূপ কবির কবিতা নিম্নরূপ– "যদি তুমি শস্যক্ষেতে পরিশ্রম না কর, অথচ তুমি ফসল কাটার ইচ্ছে কর, তবে অবশ্যই তোমার অলসতার জন্য তোমাকে লজ্জিত হতে হবে। কেননা যথাসময়ে শস্যক্ষেতের জন্য পরিশ্রম করতে হয়।" দাসীর সন্তান আমার কাছে উট চায়, সে হালকা পাতলা দ্রুত চলার কারণে সবার অগ্রে থাকে।

স্বপ্নে উট দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কেউ উট দেখলে হজ্জ করার আলামত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "স্বপ্নে আরবী উট দেখলে হজ্জ করার আলামত।" স্বপ্নে কেউ নিজের উপর উট আক্রমণ করেছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, স্বপ্নদ্রষ্টা কোন বোকা লোকের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। আর যদি উটের লাগাম ধরতে চায়, এমন দেখলে কোন পথভ্রষ্ট লোককে সোজা রাস্তায় ফিরে নেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। স্বপ্নে উটের মাথা খেতে দেখা কোন নেতার মৃত্যুর লক্ষণ। অধিক পরিমাণে আরবী উট দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, স্বপ্নদ্রষ্টা আরবের নেতা হবে। দুটি উটের মধ্যে ঝগড়া হতে দেখা দুই বাদশাহর মধ্যে বিবাদ হওয়ার আলামত। স্বপ্নে উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখার ব্যাখ্যা, সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। কেউ স্বপ্নে উটের উপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছে দেখা

দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়ার আলামত। স্বপ্নে কাউকেও উট লাথি মারতে দেখলে সে অসুস্থ হবে। উটের বাথান দেখলে বৃষ্টি হবে। কেননা বৃষ্টির ফোঁটা একটার পর একটা পড়তে থাকে। আর উট যেভাবে এক স্থান হতে বোঝা বহন করে এমনিভাবে মেঘও পানিকে বহন করে নিয়ে যায়। নিজে উট হয়ে যেতে দেখলে সে অন্যের বোঝা বহন করার লক্ষণ। বড় উটে সওয়ার হতে দেখলে দীর্ঘ ভ্রমণের আলামত অথবা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণ করবে। কখনও কখনও উট দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ঘর বা নৌকা। কেননা উট ডাঙ্গার নৌকা। উটের স্বপ্ন মৃত্যুর সঙ্গেও জড়িত। কেননা সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দূর দূরান্তে ভ্রমন করে। কখনও এটা স্ত্রীর প্রতি কখনও হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের প্রতি, কখনও ধৈর্যশীল ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিতবহ হয়। আবার দ্রষ্টার দ্রুততার কাজে দেরি হওয়ারও আলামত।

উট স্বপ্নে দেখলে সুন্দর হওয়ার আলামত। কেননা 'জামাল' অর্থ, সুন্দর। আবার কোন কোন সময় সাপও উদ্দেশ্য হয়। কেননা সাপের চামড়া হতে উট সৃষ্টি করা হয়েছে। উটের মালিক স্বপ্নে উট দেখা অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত।

ইবনুল মুকরী (রহ.) বলেন, স্বপ্নে উট দেখলে প্রবাস জীবন বা জল-স্থলে একা একা ভ্রমণের লক্ষণ। কখনও কখনও অনারবী ও দরিদ্র লোকের লক্ষণ। আবার ধন-সম্পদ ধ্বংস এবং জেল খাটার প্রতিও ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকে।

১৬৫. جمل البحر (জামালুল বাহর) সামুদ্রিক উট

মূলত এটা একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ। অনেকটা উট সদৃশ্য। এটা তিন হাত দীর্ঘ। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

১৬৬. جمل الماء (জামালুল মায়ি) একপ্রকার পাখি

এসব পাখির ঠোঁট লম্বা। এর আরেক নাম হাওকাল। এর বিস্তারিত আলোচনা 'হা' অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৬৭. جمل اليهود (জামালুল ইয়াহুদ) কাকলাইশ বা গিরগিট

এর আলোচনা 'হা' অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৬৮. الجمعليلة (আল-জামাআলীলাহ) বন বিড়াল

এর বিস্তারিত আলোচনা 'ছোয়াদ' অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৬৯. جميل و جميل (জামীলুন ওয়া জামীলুন) ছোট্ট পাখি

ক্ষুদ্র ধরনের একপ্রকার পাখিকে جميل و جميل বলে। এর বহুবচন جملان (জামালানে) আসে। সীবওয়াই বলেন, এটা বুলবুল নামে একধরনের পাখি।

১৭০. الجنبر (আল-জিনবার) মাছরাঙ্গার বাচ্চা

جنبر (জিনবার) مقعد (মিক'আদ) ওযনে। মাছরাঙ্গার বাচ্চা।

১৭১. الجندب (আল-জুনদাব) টিড্ডি

আল-জুনদাব, জুনদুব, জুনদিব অর্থাৎ 'দাল' অক্ষরে যবর, যের, পেশ তিনটি হরকতই ব্যবহার করা যায়। এটা টিড্ডিরই একপ্রকার। কেউ কেউ বলেন, পুরুষ টিড্ডিকে জুনদুব বলে। এর বহুবচন জুনদূব হয়।

সীবওয়াই বলেন : জুনদুব-এ নুন অক্ষরটি অতিরিক্ত। জাহিয বলেন, এটা তার ডানার সাহায্যে মাটি খুঁড়ে এবং তীব্র গরমের সময় সেখানে আশ্রয় নেয়।

হাদীস শরীফে জুনদাব-এর উল্লেখ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে দাওয়াতসহ প্রেরণ করেছেন, এর দৃষ্টান্ত হল কোন ব্যক্তি আগুন প্রজ্জ্বলিত করল এবং তাতে কীট পতঙ্গ উড়ে এসে পড়ে। –মুসলিম ও তিরমিযী

وفى حديث ابن مسعود كان يصلى الظهر ه والجنادب ينقذن من الرمضاء اى تثب من شدة حرارة الارض

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যোহরের নামায পড়ছিলেন। তখন পাথুরে যমীনের গরমে কীট-পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়তে লাগল।

১৭২. الجندع (আল-জানদা) কালো টিড্ডি

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, এটা ছোট ধরনের টিড্ডি। ইবনে সাইয়িদাহ (রাঃ) বলেন, জুনদা কুনকুয ওজনে ছোট টিড্ডিকে বলে। এর লম্বা লম্বা শিং হয়। এটা খাওয়া জায়িয নয়।

১৭৩. الجن (আল জিন) জিন জাতি

জিন বায়বীয় সৃষ্টি। এটা মানব জাতির বিপরীত এক সৃষ্টি। জিনরা মূলত বায়বীয় সৃষ্টি।[১] আল্লাহ তাআলা এদেরকে যেকোন প্রাণীর আকৃতি ধারণের

---

[১] আরবী অভিধানে এমন প্রত্যেক বস্তু যা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাকে জিন বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত সৃষ্টি ফিরিশতাগণও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ কারণে ফিরিশতাগণকেও আরবী অভিধানে 'জিন' বলা হয়। এমনিভাবে জিনরাও মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকে। এ কারণে আরবী

অভিধানে বেহেশতের নাম জান্নাত। কিন্তু পরিভাষায় জিন এমন সব প্রাণী, যাদের শরীর আগুন ও বায়ু দ্বারা গঠিত। শরীর গঠনের উপাদানের সূক্ষ্মতার কারণে এ সৃষ্টি যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারে। এ সৃষ্টি তাদের খেয়াল ও ধারণা শক্তির সূক্ষ্মতার কারণে সূক্ষ্ম ও ভারি শরীর ধারণ পূর্বক বিভিন্ন ভয়ানক হতে ভয়ানকতর এবং অতীব সুন্দর আকৃতি ধারণ করতে পারে। এদের মধ্যে যারা মানুষকে কষ্ট দেয় এবং আল্লাহর নাফরমানি করে, তারা হল শয়তান। যারা পুণ্যবান ও মানুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়, তারা হল জিন। যেহেতু তাদের মধ্যে ভালোমন্দ বুঝার এবং খানাপিনা, স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ এবং অপরাপর প্রাণীর স্বভাব পাওয়া যায়, সেহেতু এ সৃষ্টি বিধিবদ্ধভাবে 'আহকামে ইলাহী' তথা আল্লাহর বিধান পালনে বাধ্য।

আজাইবুল কাসাস গ্রন্থে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মুফতী লিপিবদ্ধ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা তার পরিপূর্ণ কুদরত দ্বারা একটি অগ্নি তৈরি করলেন। সেই আগুনে নূরও ছিল এবং অন্ধকারও। তখন আল্লাহ তা'আলা সেই নূর হতে ফিরিশতা তৈরি করলেন এবং আগুন দ্বারা জিন এবং অবশিষ্ট ধোঁয়া দ্বারা শয়তান (দৈত্য-দানব) সৃষ্টি করলেন। কাযী মজীদ উদ্দীন যাবতী রহ. "তারীখুল কুদস ওয়াল খালীল" গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াত-এর তাফসীরে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা 'নারে সামূম'(ধূম্রবিহীন অগ্নি) সৃষ্টি করলেন। এটা এমন আগুন, যাতে ধোঁয়া ছিল না। সেই আগুন হতেই আল্লাহ তা'আলা জিন সৃষ্টি করলেন। মহান আল্লাহর বাণী– এর অর্থই হল, আল্লাহ তা'আলা এ 'জান্ন' হতে একটি মহান মাখলুক সৃষ্টি করেন, সেই যুগল হতে 'জিন'-এর বংশ তৈরি হল এবং তারা গোত্রে বিভক্ত হল। হযরত কা'ব আহবাব (রাঃ) বলেন, যখন এ জিন্নান ও শয়তানের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হয়ে গেল এবং তারা যমীনে ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়াতের জন্য একজন নবী প্রেরণ করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবী, যার নাম ছিল আমির ইবনে উমায়র ইবনুল জান্ন। কিন্তু জিনেরা তাঁকে হত্যা করল। তারপর আরেকজন নবী যার নাম যায়িক ইবনে মায়িক ইবনুল জান্নকে প্রেরণ করেন। তাঁকেও জিনেরা শহীদ করে দেয়। এমনিভাবে পরপর ৮০০ জিন নবী প্রেরণ করা হয়। তাঁরা সকলেই জিনদের হাতে শহীদ হন। এ ৮০০ নবী ৮০০ বৎসরে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর আল্লাহ তা'আলা একজন নবী প্রেরণ করেন। কিন্তু জিনদের বিদ্রোহ পাপাচারের সমাপ্তি ঘটেনি। –আল-আনজাবিউল জালীল

সুদীর্ঘ ৮০০ বৎসর যখন জীনরা বিদ্রোহ ও পাপাচার হতে বিরত হল না, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে বসবাসকারী জিনদেরকে যমীনে বসবাসকারী জিনদের নির্বিচারে হত্যার জন্য প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর নেতা ছিল ইবলিস। হযরত কাব আহবার (রাঃ) বলেন—

জিনেরা যখন নবীগণের আহকামের বিরোধিতা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে বসবাসকারী জিনদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা যমীনে গিয়ে সেখানে বসবাসরত জিনদের হত্যা করে ফেল। এ বাহিনীর নেতা মনোনিত করেন ইবলিসকে। ইবলিস বাহিনী যমীনে এসে নির্বিচারে হত্যা আরম্ভ করল। জিনরা পলায়ন করল এবং অন্য স্থানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু সেখানে আগুন এসে তাদের সবাইকে জ্বালিয়ে দিল। এমনিভাবে যমীনে ইবলিস ও তার বাহিনী আবাদ হয়ে গেল।

এখন ইবলিসের বাসস্থান হল যমীন। এখানে ইবলিস আল্লাহ তা'আলার এমন ইবাদতবন্দেগী করতে লাগল যে, এক খণ্ড যমীনও বাকি রইল না যেখানে ইবলিস সিজদা করেনি। তার এ ধরনের ইবাদত ও সাধনা দেখে ফেরেশতাগণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এরপর ফেরশতাগণের সুপারিশে ইবলিসকে আসমানে ডেকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের মধ্যে শামিল করে দিলেন। এরপর ফেরেশতাগণের সুপারিশে ইবলিস জান্নাতেও প্রবেশ করল।

ইবলিসের হাতে যমীনে জিনদের নির্বিচারে হত্যার পর কতিপয় আত্মগোপন করে বেঁচে যায়। দীর্ঘদিন পর তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশেষে তাদের সংখ্যা হাজার হাজার হয়ে পড়ে এবং তারা পুনরায় যমীনে ফিতনা-ফাসাদ শুরু করে। ফেরেশতা ও ইবলিস জিনদের এ অবস্থা সম্পর্কে জানত। ইবলিস আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করল, আমাকে এসব দুষ্ট জিনদের হেদায়াতের জন্য যমীনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ইবলিস ফেরেশতাগণের এক দলসহ

আবার যমীনে আসল। এবার ইবলিস কঠোর হস্তে জিনদেরকে হত্যা করল, এতে জিন হতে যমীন পবিত্র হয়ে গেল এবং অতি অল্প সংখ্যক জিন পাহাড় ও অন্যান্য স্থানে আত্মগোপন করে ইবলিস ও তার বাহিনী হতে জীবন বাচাঁল। 'আজাইবুল কাসাস' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একবার ইবলিস লাওহে মাহফুজে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম (আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান হতে) লিখা দেখতে পেল। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জানতে চাইল, হে আল্লাহ! শায়ত্বানির রাজীম কে? আল্লাহর নির্দেশ হল, আমার এক বান্দা আছে এবং অচিরেই সে নিজের অহংকার ও বড়াইয়ের কারণে চরম হীন হয়ে যাবে। ইবলিস বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার চেহারা দেখিয়ে দিন। যাতে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। আল্লাহ বললেন, অচিরেই তুমি তাকে দেখতে পাবে।

এরপর শয়তানের অভ্যাস হয়ে গেল, প্রত্যেক ইবাদতের পর শয়তানকে অভিশাপ দেওয়া। কিন্তু ধীরে ধীরে তার অন্তর এ অহংকার ও গর্ব বোধ হতে লাগল যে, সে সারা বিশ্বকে জিন হতে পবিত্র করে দিয়েছে। ক্রমেই তার এ অহংকার বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইবলিস সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সবার উর্ধে মনে করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা 'আলিমুল গায়েব'—অদৃশ্য জ্ঞান। এদিকে ইবলিসের মনে এমন ধারণার উদ্রেক হল, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন—

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

"আমি মাটি দ্বারা একটি মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাতে প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।"

'মা' আরিজুন নাবুওয়াত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়ার পর যমীনকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করলেন, হে যমীন! আমি তোমার দ্বারা নতুন এক সৃষ্টি তৈরি করব। তাদের মধ্যে কতেক হবে আমার অনুগত আর কতেক অবাধ্য। আমি অনুগতদেরকে জান্নাতে স্থান দিব আর অবাধ্যদেরকে দিব জাহান্নামে।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আদমকে সিজদা কর। সকল ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে আদমকে সিজদা করল।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে মুহাম্মাদ মুফতী রহ. 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, ফেরেশতাগণ একশত বৎসর অথবা পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকলেন। এত দীর্ঘ সময়ের পর ফেরেশতাগণ সিজদা হতে মাথা তুলে দেখতে পেলেন, ইবলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন সিজদা করলে না? শয়তান বলল, خلقتنى من نار وخلقته من طين তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছ। তা কি হয়, উত্তম অধমকে সিজদা করবে? সুতরাং শয়তান দুনিয়ায় সর্বপ্রথম আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করল। এ কারণে সকল ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দিলেন। তার গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর সান্নিধ্য হতে বহিষ্কার করলেন। ইবলিসের প্রকৃত নাম আযাযীল, কিন্তু চিরস্থায়ী শাস্তির কারণে তার নাম 'আযাযীল' হতে ইবলিস করা হল। এখন শয়তান আল্লাহর নিকট নিবেদন করল, আমার আয়ু দীর্ঘ করে দিন। আল্লাহর নির্দেশ হল, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে না। এরপর শয়তান পুনরায় দরখাস্ত করল, হে আল্লাহ ! আমি আদমের কারণে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হলাম। তোমার অনুকম্পা ব্যতীত আমি তার কোন ক্ষতি করতে পারব না। আল্লাহর নির্দেশ হল, যাও! আমি তোমাকে আদমের উপর ক্ষমতা প্রদান করলাম। আদমের প্রত্যেক বাচ্চার সাথে তোমারও একটা বাচ্চা জন্ম নিবে এবং বনী আদমের অন্তরে তোমার জন্য বাসস্থান বানালাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। তারপর বললেন, কখনো শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না। আদম (আঃ)-এর জান্নাতে প্রবেশে শয়তান নিরাশ হয়ে গেল এবং হযরত আদমের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কৌশল অন্বেষণ করতে লাগল।

হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে একাই ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একাকিত্ব দূরীভূত করতে আদমের বাম পাঁজর থেকে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। হযরত আদমের নিঃসঙ্গতার সমাপ্তি হল। মানুষের প্রথম জোড়া জান্নাতে আরাম-আয়শে বসবাস করতে লাগল। এদিকে অভিশপ্ত শয়তান আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা দেওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকল। সুতরাং একদিন সে সুযোগ পেয়ে জান্নাতে দরজায় বসে গেল। অপেক্ষা করতে লাগল তার কোন পুরানো বন্ধু দৃষ্টিগোচর হয় কিনা। যাতে তার দ্বারা কোন কুকর্ম

ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং কঠিন হতে কঠিনতর কর্ম সম্পাদনের শক্তি দান করেছেন। জানুনান ও জান্না এর অর্থ মস্তিস্ক বিকৃতি হওয়া, পাগল হওয়া, অদৃশ্য হওয়া ইত্যাদি। জিনরাও দৃষ্টির আড়ালে থাকে তাই এদেরকে জিন বলে।

করতে পারে। হঠাৎ একটি ময়ূর ঘুরতে ঘুরতে দরজায় নিকট আসল। শয়তান সাথে সাথে শয়তান পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বলল, যেভাবেই হোক আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ময়ূর অস্বীকার করল। বলল, আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, সাপ এ কাজটি করতে পারে। আমি তাকে পাঠাচ্ছি।

মোটকথা, শয়তান কোন উপায়ে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং আদম-হাওয়াকে প্রলুব্ধ করতে লাগল, তোমাদেরকে অচিরেই জান্নাতের এসব নিয়ামত ও আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত করা হবে। এসব তোমাদের জন্য সাময়িক। কেননা তোমাদের মৃত্যু আসবে এবং তোমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমার মৃত্যুর পূর্বেই স্থায়িত্বের উপায় জেনে নেও। ওই বৃক্ষের (নিষিদ্ধ বৃক্ষ) একটি ফল সংগ্রহ করে অর্ধেক অর্ধেক করে খেয়ে নাও। হযরত আদম (আঃ) শয়তানের এ কথা শুনে উঠে চলে গেল। কিন্তু হাওয়া বসে থাকলেন। অবশেষে হাওয়া (আঃ) শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেলেন। শয়তান নিষিদ্ধ বৃক্ষের একটি ফল ছিঁড়ে দুই ভাগ করল এবং হযরত হাওয়াকে বলল, তুমি এ অর্ধেক খাও আর বাকি অর্ধেক আদমকে খাওয়াও। হযরত হাওয়া ফল নিয়ে আদমের নিকট গেল এবং অর্ধেক নিজে খেল আর বাকি অর্ধেক হযরত আদমকে খাওয়াল। আদম ফল খাওয়ার সাথে সাথে তার দেহ হতে জান্নাতী পোশাক খুলে পড়ে গেল। তিনি বিবস্ত্র হয়ে গেলেন। বাধ্য হয়ে তিনি ডুমূর গাছের পাতা দ্বারা সতর ঢাকলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আদম, হাওয়া, ময়ূর ও সাপকে পৃথিবীতে ফেলে দিলেন। তাদের সবাইকে নানা ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন করলেন। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার আদেশের নাফরমানি করেছে। এমনিভাবে আদম ও আদম সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত শয়তানের কব্জায় এসে গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কতিপয় বিশেষ বান্দা এবং নেককার বান্দাগণ অতীতে এবং আজও শয়তানের ধোঁকা ও ফিতনা-ফাসাদ হতে নিরাপদ রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর বাণী—

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين

আমার অনুগত ও নিষ্পাপ বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না। তোমার ধোঁকায় তারাই পড়বে, যারা তোমার অনুগত ও পথভ্রষ্ট।' –সূরা হিজর : ৪২

শয়তান ও তার বাহিনী সর্বদাই চিন্তায় থাকে, কীভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা যায়? এ কারণে শয়তানের অনিষ্ট হতে এক মুহূর্তের গাফলতীও মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। শয়তান কোন কোন গোপন পথ ও দরজা দিয়ে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তা জানা অত্যন্ত জরুরি। শয়তানের অনবরত হামলার অনেকগুলি দরজা রয়েছে। তন্মেধ্যে কয়েকটি বৃহৎ ও বিশেষ দরজা হল :

(১) ঈর্ষা ও লোভ। এ দুটি মানুষকে একদম অন্ধ ও বধির করে দেয়।
(২) রাগ-ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তি এ দুটি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।
(৩) অধিক পানাহার—অধিক ভক্ষণে অন্তর হতে আল্লাহর ভীতি চলে যায়। পেট পূজারী হয়ে যায়, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়ামায়া হ্রাস পায়। পেট পূজার কারণে ইবাদতে অলসতা আসে।
(৪) বিলাম সামগ্রী—
(৫) উচ্চ পদমর্যদার খায়েশ বা কামনা- এটা মানুষকে কঠিন বিপদে ফেলে দেয়। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যায়।
(৬) অধিক ধন-সম্পদের মোহ ও অন্বেষণ—

শয়তানকে প্রতিরোধ করতে হলে সদা সর্বদা আল্লাহর যিকরে মগ্ন থাকতে হবে। এতে উল্লেখিত বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। যিকরুল্লাহ শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্গ হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ও اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (লা হাওলা ওয়া লা- কুওওয়াতা আল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যুল আযীম ও আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম) নিয়মিত পড়তে হবে। আরো অনেক দু'আ আছে, যা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

হাদীস শরীফে জিনদের উল্লেখ

ইমাম তাবারানী (রহ.) সহীহ সনদে হযরত সায়ালাবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : জিন তিন প্রকার। (১) যাদের ডানা রয়েছে এবং ডানার সাহায্যে তারা উড়তে পারে, (২) সাপের মত, (৩) এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে এমন অর্থাৎ তারা স্থানান্তরিত হয়।

ইবনে দারদা (রাঃ)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তাআলা জিনকে তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। (১) সাপ, বিচ্ছু ও পোকা-মাকড়ের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (২) বাতাসের মত যা শূন্যে বসবাস করে। (৩) মানুষের মত করে তারা হিসাব-নিকাশের আওতাধীন। তাদের বিস্তারিত আলোচনা 'খা' অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষকেও আল্লাহ তাআলা তিন প্রকার সৃষ্টি করেছেন। প্রথম প্রকার হল চতুষ্পদ জন্তুর মত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا

তার চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান)

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

তাদের এমন অন্তর রয়েছে, যা কিছুই বুঝে না, তাদের এমন চক্ষু রয়েছে, যা দেখতে পায় না, তাদের এমন কর্ণ রয়েছে, যা শুনতে পায় না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। –সূরা আরাফ : ১৭৯

আরেক প্রকার হবে তাদের শরীর মানুষের শরীরের মত, কিন্তু তাদের আত্মা শয়তানের আত্মার মত। আরেক প্রকার আছে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার ছায়াতে থাকবে। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনি মানুষের জন্য প্রেরিত, তেমনি জীনদের জন্যও তিনি প্রেরিত হয়েছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত স্বাক্ষ্য। ইরশাদ হয়েছে—

واوحى الى هذا القران لانذركم به ومن بلغ

এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে। যেন তোমাদেরকে যার নিকট পৌছবে তাদেরকে এরদ্বারা আমি সর্তক করি। –সূরা আন'আম : ১৯

এ আয়াতে ومن بلغ দ্বারা জিন জাতিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াত–

واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران

স্মরণ কর! আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। –সূরা আহকাফ : ২৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا

কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ফুরকান (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। –সূরা ফুরকান : ১

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين

অমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। –সূরা অম্বিয়া : ১০৭

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا

আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। –সূরা সাবা : ২৮

আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, জিন ও ইন্‌স এর জন্য 'নাস' শব্দও আসে। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তাআলা জিন ও ইনসানকে উদ্দেশ্য করে সাকালান শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

سنفرغ لكم ايها الثقلان فبای الاء ربكما تكذبان

হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব হিসাব-নিকাশের জন্য। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। –সূরা রাহমান : ৩১-৩২

জিন ও ইনসানকে ثقلان বলার কারণ, তারা পাপের বোঝা বহন করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ولمن خاف مقام ربه جنتان

আর যে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত– উদ্যান। –সূরা রাহমান : ৪৬

এই কারণে কতিপয় উলামায়ে কেরাম বলেন,জিনদের মধ্যেও একদল এমন

হবে যারা আল্লাহর নিকট পূণ্যবান এবং জান্নাতী, যেমনিভাবে মানুষের মধ্যে এইরকম দল আছে মানুষের মধ্যে যেমন দুইটি দল-মু'মিন আল্লাহভীরু এবং কাফির মুশরিক। এমনিভাবে জিনদের মধ্যেও দুই দল। একটি মুমিন অপরটি কাফির ও মুশরিক। মানুষের মধ্যে মু'মিন নেককারগণ জান্নাতে যাবে। অনুরূপ জিনদের মধ্যেও মুমিনরা জান্নাতে যাবে।

মুমিন জিনেরা জান্নাতে যাবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত হল, মুমিন স্তরের জিনেরা জান্নাতে যাবে এবং মানুষের মত সওয়াব পাবে। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম লাইস (রহ.) বলেন, এদের জান্নাত শুধু আগুন হতে রক্ষা পাওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন– ويجركم من عذاب اليم এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদিগকে রক্ষা করবেন। –সূরা আহকাফ : ৩১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশঙ্কা থাকবে না। –সূরা জিন : ১৩

জমহূর উলামায়ে কেরামের জবাব হল, এ আয়াতদ্বয়ে শুধু এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুমিনকে শাস্তি হতে নিরাপদ রাখা হবে। বাকি জিন জাতি জান্নাতে যাবে কিনা? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হল, হয়তো আল্লাহ তাআলা পুণ্যকে তাদের অদৃশ্য রাখবেন। কোন কোন আলেম বলেছেন : জিনরা জান্নাতে প্রবেশের পর মানুষের সাথে থাকবে না বরং জান্নাতে এক কোণে বসবাস করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মাখলুক চার প্রকার।

(১) এমন সৃষ্টি, যারা সকলেই জান্নাতে যাবে। যেমন, ফেরেশতাগণ।

(২) এমন সৃষ্টি, যারা সকলেই জাহান্নামে যাবে। যেমন, ইবলিস ও তার দল।

(৩) এমন সৃষ্টি যাদের কতেক যাবে জান্নাতে আর কিছু যাবে জাহান্নামে। অর্থাৎ মানুষ ও জিন। তবে ফেরেশতাগণ মানুষ ও জিনদের মত জান্নাতের নিয়ামত উপভোগ করতে পারবে না।

হযরত মুজাহিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মুমিন জিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তারা জান্নাতে যাবে কি না ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা তো জান্নাতে যাবে; কিন্তু মানুষের মত জান্নাতের নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে না বরং তারা আল্লাহর গুণগানে লিপ্ত থেকেই স্বাদ অনুভব করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকলের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত। যেমন, ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে হাদীসে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে সর্ববিদ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে সাদা কালো সবার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে যুফার (রহ.)-এর গ্রন্থে 'খাইরুল বাশার বি খাইরি বাশার' হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের যারা 'লাইতাতুল জিন' -এ আমার সাথে যেতে চাও, যেতে পার। (রাবী বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে চললাম এবং আমরা মক্কার একটি উচ্চস্থানে পৌঁছলাম। সেখানে নবী আমার জন্য একটি কাগজ নিয়ে একটি নকশা এঁকে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে কুরআন তিলওয়াত করতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অত্যাধিক লোকের ভিড় জমে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমার মাঝে একটি আড়াল হয়ে গেল। এমনকি ভিড়ের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। এরপর তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যেতে লাগল। যেমন মেঘমালা চলার সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সবাই চলে যাওয়ার পর মাত্র একটি দল সেখানে থাকল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন এবং বললেন, দলটি কোথায়? আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! অমুক স্থানে। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাড় ও গোবর নিয়ে আস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হাড় ও গোবর দিয়ে বললেন– কেউ যেন হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। (কারণ, হাড় ও গোবর মুসলিম জিনদের খাদ্য)।

উক্ত গ্রন্থে হযরত বিলাল ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা আমরা এক স্থানে এসে পৌঁছলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে শোরগোল এবং ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এ ধরনের আওয়াজ ইতোপূর্বে আর কখনও শুনিনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন এবং মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, মুসলিম ও মুশরিক জিনেরা তাদের মামলা নিয়ে আমার নিকট এসেছিল। তাদের থাকার জায়গার ব্যাপারে মীমাংসা চেয়েছিল। আমি মুসলিম

জিনদেরকে 'হুবস'-এ এবং মুশরিক জিনদেরকে 'গাওর'-এ থাকার কথা বলে দিলাম। হুবস হল উঁচু এবং ভাল স্থান আর গাওর হল নিম্ন ও বিরানভূমি।

এ গ্রন্থেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের একটি দল নিয়ে ওকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এটা তখনকার কথা, যখন জিনেরা আকাশে পৌঁছে খবরাদি সংগ্রহ করতে পারত না। যখন শয়তানরা তাদের হলের কিনট আসত, তখন তাদের সাথীরা জিজ্ঞাসা করত, তোমরা আসমানের খবরাদি নিয়ে আস না কেন? তারা বলত, অপ্রতিরোধ্য বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়েছে। (আমরা কোন অবস্থাতেই আকাশের দিকে যেতে পারি না)। এ কথা শুনে তারা বলল, মনে হয় নূতন বিরাট কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা উদ্ঘাটন করতে হবে। সুতরাং জিনেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। তাদের একটি দল তিহামার (মক্কার একটি স্থানের নাম) দিকে ঘুরে ঘুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসল। তিনি সেসময় সাহাবীদের নিয়ে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামায আদায় করছিলেন।

জিনের দলটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে কুরআন শরীফ শুনে তাঁর প্রতি মনোযোগী হল। তারা বলতে লাগল– আল্লাহর কসম! এ বস্তুটা তোমাদেরকে আসমানের তথ্য সংগ্রহে বাঁধা প্রদান করছে। এরপর তাকে নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলতে বলতে লাগল, হে জিন সম্প্রদায়! আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। তাই এতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন শরীক স্থাপন করব না। এ প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের সম্মুখীন হলেন। এর পূর্বে তিনি কখনও জিনদের দেখেননি। অবশ্য ওহী মারফত জিনদের ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত। এক রাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে ছিলাম। রাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনুপস্থিত পেলাম। আমরা তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ভাবতে লাগলাম, তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, নাকি কোথায়ও চলে গিয়েছেন। আমরা সারারাত্র অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশানীর মধ্যে কাটালাম। সকাল বেলা হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাররা-এর দিক হতে তাশরীফ আনলেন। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রে আমরা আপনাকে না পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। বিধায় আমরা সারা রাত্র অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে কাটিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে জিনেরা ডেকে

নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে কুরআন নিদর্শন দেখালেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, যে হাড়ে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা তোমার জন্য গোশত হতে উত্তম। আর গোবর ও বিষ্ঠা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এ দুটি বস্তু দ্বারা তোমরা ইস্তিঞ্জা কর না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

ইমাম তাবারানী (রহ.) হাসান সনদে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে মসজিদে নববীতে ফজরের নামায পড়ছিলেন। সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রাত্রে জিন প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার সাথী কে হতে চাও? সবাই চুপ করে রইল। কেউই কোন উত্তর দিচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা তিনবার বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যেতে থাকলাম। আমরা মদীনার সমস্ত পাহাড় ছেড়ে বহুদূরে একটি ধু ধু মরু ও প্রশস্ত মাঠে পৌছে গেলাম। হঠাৎ করে বল্লমের মত লম্বা লম্বা লোক আমার নযরে পড়ল। আমি তাদেরকে দেখা মাত্র ভয়ে কেঁপে উঠলাম। এমনকি কম্পনের কারণে আমার পা টলমল করতে লাগল। তারপর আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি তাঁর পা মোবারকের আঙ্গলের সাহায্যে আমার জন্য একটি বৃত্ত এঁকে দিয়ে তার ভিতরে বসে থাকতে আদেশ করলেন। তার ভিতর বসে যাওয়ার পর আমার চোখে যত জিনিসই পড়ত সবই চোখ হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন এবং তিনি জিনদের নিকট গিয়ে জোরে জোরে কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এমনকি ভোরের আলো ফুটে উঠল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান হতে চলে আসলেন এবং আমাকে নিয়ে রওয়ানা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমার কাছাকাছি থাক। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছাকাছি হয়ে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, একটু লক্ষ্য করে দেখ তো! তাদেরকে দৃষ্টিগোচর হয় কি না? আমি মনোযোগসহকারে দেখে বললাম, হে আল্লাহর নবী আমি একটি বিরাট দল দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুবারক ঝুঁকিয়ে মাটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন তো হাড় ও গোবর দেখছি। তিনি এ দুটি বস্তু তাদের দিকে নিক্ষেপ করে আমাকে বললেন, জিনদেরকে আমি হাড় ও গোবর তাদের খাদ্য বলে ঘোষণা করলাম।

হযরত যোবাইর (রাঃ) বললেন, এ হাদীসের আলোকে হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা না জায়িয প্রমাণিত হল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– মুহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রে আমাকে তাঁর সাথে যাওযার আদেশ করলেন এবং বললেন, পনের জন জিনের একটি দল আজ রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি তাদেরকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে শুনাব অথবা তাদের সম্মুখে আল্লাহর কালাম পেশ করব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গী হয়ে তিনি যে দিকে যাচ্ছিলেন, আমিও চলতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রেখা টেনে তার ভিতর আমাকে বসে দিলেন এবং বলে দিলেন, ওই রেখার ভিতর হতে বের হবে না। আমি সমস্ত রাত্রই এটার ভিতর রইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা তাঁর হাতে হাড় ও গোবর নিয়ে আগমন করলেন এবং বললেন : তোমরা যখন ইস্তিঞ্জা করবে, এ দুটির একটি ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার করবে না। দিবস আগমন করল, আমি ভাবতে লাগলাম, আমার দেখা দরকার যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গমন করেছিলেন। এরপর আমি সেই স্থানটি দেখলাম। তা এতই বৃহৎ যে, সেখানে ৭০টি উট বসতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও বায়হাকী (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী ইশার নামাযের জন্য ঘর হতে বের হলেন। তাকে জিনেরা অপহরণ করে ফেলল এবং বেশ কয়েক বৎসর নিখোঁজ রাখল। এদিকে তার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসে গেল। এরপর লোকটি মদীনাতে গেলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমাকে জিনে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানে তাদের সাথে এক যুগ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলাম। এরপর মুমিন জিনেরা জিহাদ করল এবং তাদের অনেকের সাথে আমাকে বন্ধি করা হয়। তারা বলল, লোকটি মুসলিম তাকে বন্দি করা উচিত নয়। তারা আমাকে স্বাধীনতা দিল, ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পার অথবা পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যেতে পার। আমি বাড়িতে চলে যাওয়া পছন্দ করলাম। তারা আমাকে মদীনায় নিয়ে আসল।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাদের খাদ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আনসারী ব্যক্তি বললেন : তারা এক প্রকার তরকরি খায় এবং এমন জিনিস যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি। এরপর হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাদের পানীয় বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আনসারী বললেন, তারা তলানী বা গাদ পান করে। কেউ বলেন, এটা একপ্রকার ঘাস আবার জাদফও বলে। জাদফ এমন পাত্রকে বলে, যার মধ্যে কোন পানাহারের বস্তু তৈরি থাকে। কিন্তু সেগুলোতে কোন ঢাকনা থাকে না।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিন ও ইনসান-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এতে কোন কোন আলেম আপত্তি করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের প্রতিও প্রেরিত হতেন, তাহলে শরী'আতের যাবতীয় বিধানবলীও জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতেও তারা অবশ্যই উপস্থিত হত। অথচ জিনেরা মক্কায় মাত্র দু'বার আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার আসার পর ইসলামের অনেক নিয়ম-নীতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।

এর জবাব হচ্ছে, বর্ণনা না থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে জিনদের হাজির না হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। কেননা জিনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হওয়া এবং তাঁর কথা শ্রবণ করা সম্ভব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে দেখতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দেখতেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমার জিনদেরকে দেখতে পাও না, অথচ তারা তোমাদেরকে দেখছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদেরকে দেখতেন। সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন না। তাছাড়া কোন কোন সাহাবী জিনদেরকে দেখেছেন। যেমন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কতিপয় জিন শয়তানকে দেখেছেন, যারা যাকাতের মাল চুরি করতে এসেছিল। বর্ণনাটি বুখারী শরীফে রয়েছে।

বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "একটি অবাধ্য জিন গত রাত্রে আমার নামাযে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে। আমি তাকে ধরে ফেললাম। ইচ্ছা করলাম খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখি। কিন্তু হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ আমার স্মরণ হয়ে যায়, তিনি দুআ করেন, আল্লাহ! আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কাউকেও দান করা হবে না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মদীনাতে জিন বসবাস করে এবং ইনসানদের কেউ যদি মুয়াযযিনের আযান শ্রবণ করে তাহলে সে তার (মুয়াযযিনের) জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে'।

ইমাম মুসলিম (রহ.) সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জা'দার হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, জগতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার পিছনে শয়তান লাগে নি। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। তাই সে আমাকে ভাল ব্যতীত মন্দের প্রতি উৎসাহিত করে না।

হাদীসে যে فاسلم শব্দ এসেছে, এর মীমে পেশ ও যবর উভয় কেরাতই পড়া যায়। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) পেশকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর কাযী আয়ায এবং ইমাম নববী (রহ.) যবরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর কাযী সাহেবের মতামতই অধিক গ্রহণযোগ্য। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা হতে নিরাপদ ছিলেন।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসরণ শয়তানের প্রতারণা ও তার বিভ্রান্তির দিকে পরিচালনা হতে সর্তক করা। উলামায়ে কেরাম একমত যে, সকল নবী-রাসূলগণ কবীরা ও সগীরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

জিন ও শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। অধিকন্তু আরবদের কবিতা ও নানা ঘটনাবলী দ্বারা এর বাস্তবতা প্রমাণিত। সুতরাং এ ব্যাপারে আলোচনা করা সত্যের অলাপ মাত্র।

দ্বিতীয়ত তা সঠিক জ্ঞানের বিরোধী নয় ও সিদ্ধ উপলব্ধি ও অনুভূতির অনুকূল।

হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে, জনগণ যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে খিলাফতে বাইআত গ্রহণ করেন, তখন তিন মনের দুঃখে সিরিয়ার দিকে চলে যান এবং হাওরানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৫ হিজরীতে তিনি হাওরানের গোসলখানাতে ইন্তেকাল করেন। শহরবাসী তার ইন্তেকালের সংবাদ অবগত হল যখন লোকেরা একটি কূপের ভিতর এ আওয়াজ শুনল–

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

আমরা খাযরাজ গোত্রের নেতাকে হত্যা করেছি।

فرميناه بسهميه ولم نخط فؤاده

আমরা দূর হতে তার উপর তীর নিক্ষেপ করলাম, যা তার বক্ষে লাগল এবং তীরের নিশানা ভুল হয় নি।

এ কবিতা শুনে লোকেরা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করল, সত্যিই সেদিন তার ইন্তেকাল হয়েছিল। কিন্তু সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। হাফেয ফাতহুদ্দীন ইবনে সাইদুল্লা বলেন, সঠিক কথা হল তিনি বদর যুদ্ধে অর্ন্তভুক্ত নন। তাবারানী মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন ও কাতাদাহ (রহ.) এ মত সমর্থন করেছেন।

হাজ্জাজ ইবনে আলাত সুলামী এ ঘটনাটি বর্ণিত আছে, (তিনি নাসর ইবনে হাজ্জাজের পিতা) কয়েকজন ঘোড় সওয়ার সাথে করে মক্কার উদ্দেশ্য বের

হলাম। পথিমধ্যে একটি অপরিচিত ও ভীতিময় স্থানে রাত্র হয়ে গেল। কাফেলার লোকেরা বলল, এখানেই তাবু ফেল এবং কাফেলার জন্য নিরাপত্তা বিধান কর। সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শক্রমে যে সমগ্র কাফেলার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল এবং এ কবিতা পড়তে লাগল—

اعيذ نفسى واعيذ صحبى من كل جنى بهذا النقب حتى اعوذ سالما وركبى-

আমি আমার নিজের জন্য এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের জন্য সেই জিনদের হতে আশ্রয় চাই, যারা উপত্যকায় রয়েছে। যাতে আমি ও আমার ও আমার সাথীবর্গ নিরাপদে ফিরে যেতে পারব। হঠাৎ তারা এ আয়াত শুনতে পেলেন

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ-

হে জিন ও মুনষ্য সম্প্রদায়! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যতিরেকে। (সূরা আর রহমান : ৩৩)

মক্কাতে পৌঁছে তারা মক্কার কাফিরদেরকে এ সংবাদ দিল। বলতে লাগল, আবু কালাব! মনে হয় তুমি তোমার মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা, তুমি যা বলছ এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বলছেন যে, এ আয়াত তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমি ও আমার সফর সঙ্গীগণ সকলেই শুনেছে। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনাতে হিজরত করেন। সেখানে তার নামে একটি মসজিদ নির্মান করা হয়। ইবনে সাদ তাবারানী ও হাফেয আবু মূসা প্রমুখ বলেন, সাহাবাগণের মধ্যে আমার ইবনে জাবের নামক একজন জিন সাহাবী ছিলেন। তারা সকলেই তাদের অভিমতের স্বপক্ষে সাফওয়ান ইবনে মুযাত্তাল আস-সুলামীর এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি সিরিয়ার দিকে যাওয়ার সময় দেখলেন একটি সাপ ছটফট করছে। এরপর সেই সাপটি সহসাই মরে গেল। সুতরাং এক লোক একটি কাপড় নিয়ে সেই মৃত সাপের গায়ে জড়াল এবং একটি গর্ত খুঁড়ে দাফন করে দিল। মক্কাতে গিয়ে এ লোকটি মসজিদে হারামে বসে ছিল। হঠাৎ করে একজন লোক তার কাছে আসল এবং জানতে চাইল যে আমর ইবনে জাবির (রাঃ)-কে কে দাফন করেছে? সে বলল, আমি তা জানি না। এরপর বলল, সাপ দাফ করেছে কে? তিনি জবাব দিলেন, এ লোকটি। এতে সেই অপরিচিত লোকটি, তাঁর দুআতে এমন কিছু শব্দ বলল, আমর ইবনে জাবির (রাঃ) সেসব জিনদের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কুরআন শ্রবণ করেছিলেন। এ ঘটনাটি হামি মুস্তাদরাকে 'সাফওয়ান'-এর জীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদ দুনিয়া (রহ.) বর্ণনা করেন, একটি সাপ

অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে ছটফট করতে করতে এক তাবেয়ীর তাবুতে চলে গেল। তাবেয়ী সাপটিকে পানি পান করাল। এরপর সাপটি মারা গেল। তিনি একে দাফন করে দিলেন। রাত্রে কেউ এসে তাকে সালাম করল এবং ধন্যবাদ দিয়ে বলতে লাগল, যে সাপটি আপনি দাফন করেছেন তিনি যুইয়াহ নামক একজন নেককার জিন ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) একদা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি একটি মৃত সাপ দেখতে পেয়ে তাকে কাফন পরিয়ে দাফন করে দিলেন। হঠাৎ করে একটি আওয়াজ আসল, ওহে সুরাক! তোমার কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার ব্যাপারে বলেছেন, এক জঙ্গলে তোমার মৃত্যু হবে এবং একজন সৎ ও পুণ্যবান লোক তোমাকে দাফন করবে। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি সেই সব জিনদের অন্তর্ভূক্ত, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবানে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করেছিল। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে শুধু আমরা দুজনই জীবিত ছিলাম। এখন সুরাক মারা গিয়েছে।

'খাইরুল বাশার লি খাইরিল বাশার' (خير البشر لخير البشر) নামক কিতাবে উবায়দ কিলাব ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের গোষ্ঠির একদল লোক হজ্জ করার ইচ্ছা নিয়ে বের হল। অমিও তাদের সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি সাদা প্যাঁচ খেয়ে বসে থাকতে দেখলাম। সাপটির দেহ হতে মিশকের সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। আমি আমার সাথীদেরকে সামনে যেতে বললাম এবং সাপটির ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলাম। আমি স্থির করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত সাপটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। কিছুক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। আমি তাকে রাস্তার এক পাশে দাফন করলাম। ইশার সময় আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে পৌছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসা ছিলাম।

এমন সময় পশ্চিম দিক হতে চারজন মহিলা আসল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমরকে কে দাফন করেছে। আমি বললাম, আমর কে? স্ত্রী লোকটি বলল, সাপ দাফন করছ কে? আমি বললাল, আমি। স্ত্রী লোকটি বলল, সে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখত। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর বিশ্বাস রাখত। যাঁর আগমনের ৪০০ বৎসর পূর্বেই আসমানে শোনা গিয়েছিল। রাবী বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম। হজ্জ শেষে আমি এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেন, মহিলাটি সত্যই বলেছে। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শুনেছি। এ কিতাবেই ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গণী

(রাঃ)-এর দরবারে ছিলাম। হঠাৎ করে এক ব্যক্তির আগমন ঘটল। লোকটি দরবারে খেলাফতে নিবেদন করল, হে আমীরুল মুমীনীন! আমি কি আপনাকে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা শুনাব না। হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, অবশ্যই শুনাবে। সে বলল, আমি জঙ্গলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমি সাপের মধ্যে যুদ্ধ দেখলাম। একে অপরের উপর আক্রমণ করে পৃথক হয়ে গেল। আমি যখন সেখান গেলাম যেখানে তারা যুদ্ধরত ছিল, সেখানে একটি সাপ এমন দেখলাম, যা ইতোপূর্বে অমি আর কখনও দেখিনি। হালকা পাতলা সবুজ রঙের। তা হতে মিশক আম্বরের সুঘ্রাণ আসছিল। অমি ভাবলাম, এ সুগন্ধি আমার কাছে আসবে। তাই আমি কিছু আমার পাগড়িতে রেখে দিলাম। এরপর সাপটি দাফন করে দিলাম। রাবী বলেন, দাফন সেরে আমি চলে যাওয়ার ইচ্ছা করা মাত্রই অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল, এ দুটি সাপ জিন ছিল। এদের মধ্যে যে শহীদ হল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করেছিল। এ কিতাবেই বর্ণিত রয়েছে, ফাতিমা বিনতে বুখারিয়া বলেন, একটি জিন আমার উপর প্রেমাসক্ত ছিল। সে যখন আমার নিকট আসত। তখন অতি দ্রুত অন্দর মহলে চলে আসত। একদিন সে এসে দেওয়ালে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, আজ তুমি অন্দর মহলে কেন আসছ না ? জবাব দিল, আজ একজন মহামানবের আগমন ঘটেছে, যিনি ব্যভিচারকে হারাম বলেন। ইমাম বায়হাকী তার 'দালাইল' গ্রন্থে হাসান হতে বর্ণনা করেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে জিন ও ইনসান উভয়ের সাথেই জিহাদ করেছি। তার নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, জিনের সাথে কখনও জিহাদ করা হয়? হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ কূপ হতে পানি আনয়ন করতে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে আমি শয়তানকে তার প্রকৃতরূপে দেখলাম। সে আমাকে ফাঁসাতে চাইলে আমি তাকে চিৎ করে ফেললাম। তখন আমার নিকট একটি ছুরি ছিল (অথবা তিনি পাথর বলেছিলেন) আমি তার সাহায্যে তার নাকের মধ্যে আঘাত করলাম। আমি জিতে যেতে পারিনি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সংবাদটি দিয়ে দিলেন। আমি ফিরে গেলে আমার বন্ধুরা আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি তাদের নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। তারপর হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত,. যিনি শয়তানের অনিষ্ট হতে হেফাজতের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বুখারী শরীফের হাদীসেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি ইব্রাহীম নাখয়ী (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলকামা (রহ.) যখন সিরিয়াতে পৌঁছেন তখন তিনি

মসজিদে গিয়ে দুআ করেন– হে আল্লাহ! আমাকে একজন উত্তম ও পুণ্যবান সাথী মিলিয়ে দিন। সুতরাং হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর মত সাহাবী তাঁর সাথী জুটে গেল। হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থাকেন? তিনি জবাব দিলেন, কূফাতে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বললেন, কূফাতে কি সেই ব্যক্তি নেই, যার নিকট এমন সব গোপন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, যা কেউই জানে না ? অর্থাৎ হুযায়ফা (রাঃ)। আমি বললাম, জি হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নেই, যাকে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবানের মাধ্যমে শয়তানের অনিষ্ট হতে হেফাজত করেছেন? অর্থাৎ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার। আমি বললাম, জি হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি নেই, যিনি ভ্রমণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিসওয়াক ও বালিশ মোবারক নিয়ে চলতেন? অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

'রিয়াইয়াত' নামক গ্রন্থে কাযী আবুল আলা এবং আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে হাসানী মাসীসী থেকে বর্ণিত। রাবী বর্ণনা করেন, একবার আমি তারতূস গেলাম। আমাকে জানানো হল, এখানে একজন মহিলা আছে যাকে 'নাহূস' বলা হয়। যিনি সেই সব জিনদের দেখেছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। একথা শুনে আমি তার নিকট গেলাম এবং দেখলাম তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাদের মধ্যে কোন জিন দেখেছ? সে জবাব দিল, আমার নিকট সামহাজ নামক জিন বলেছে, যার নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ রেখেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলার কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দ্যুতিময় একটি মাছের উপর। মহিলা বলল, আমি সামহাজ নাম জিন থেকে এও শুনেছি যে, সে বলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যদি মুমূর্ষ রোগীর পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয়, তাহলে অতি সহজে তার আত্মা বের হয়। তার থেকে কবের কঠোরতা দূরীভুত করা হয় এবং হাশর ময়দানে সে উৎফুল্ল থাকে।

এর চেয়েও অতি আশ্চর্য ঘটনা হল– হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথীবর্গসহ মক্কার এক জঙ্গলে চলছিলেন। হঠাৎ একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করলেন। লোকটি তার লাঠির উপর ভর করে চলছিলেন। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এই বৃদ্ধ লোকটির

চাল-চলন ও আওয়াজে বুঝা যায়, সে জিন হবে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি হ্যাঁ। তার জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন জিন? সে বলল, আমার নাম হামাহ ইবনে হাইস ইবনে আকিস ইবনে ইবলিস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমার এবং ইবলীসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুই পুরুষ। সে জবাব দিল, জি হ্যাঁ জনাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বয়স কত? সে জবাব দিল আমি জগতের অধিকাংশ যুগই দেখেছি। যে রাত্রে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে তখন আমার বয়স মাত্র কয়েক বৎসর ছিল। আমি টিলার উপর লম্ফ ঝম্ফ করছিলাম এবং আনন্দ পেয়েছিলাম আর লোকদেরকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তো খুবই খারাপ কাজ ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর প্রিয় নবী! আপনার উপর দরুদ ও সালম বর্ষিত হউক। রাগ করবেন না। কেননা, আমি সেই লোকদের মধ্যে একজন যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন। আর আমি তার পবিত্র হাতে তাওবা করেছিলাম। দাওয়াতী কাজে আমি তাঁকে সহয়তা দিয়েছিলাম এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম। এরপর সে এতই কাঁদল যে আমি নিজেই কাঁদতে লাগলাম।

অতঃপর জিনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করল, আল্লাহর কসম! আমি একথা বলার জন্য খুবই লজ্জিত, না জানি আমি কাফির হয়ে যাই। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। আর আমি হযরত হূদ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে ঈমান গ্রহণ করেছি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। যে সময় তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় আমি সে সময় তাঁর সাথে ছিলাম। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে নিক্ষেপ করা হয় আমি সে সময় তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর পূর্বেই আমি কূপে পৌঁছে গিয়েছিলাম। হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। হয়রত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছিলেন, তুমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ কর, তাহল তাঁর নিকট আমার সালাম দিবে। তাই তাঁর বার্তা আমি আপনার নিকট পৌঁছলাম এবং তিনি বলেছেন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ঈমান গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আঃ) ও তোমার উপর শান্তি বর্ষন করুন। এখন বল তুমি কী চাও? সে নিবেদন করল, হয়রত মূসা (আঃ) আমাকে

তাওরাত শিক্ষা দিয়েছেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) শিক্ষা দিয়েছে ইঞ্জিল। এখন আপনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাত্র দশটি সূরা শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আমাদের নিকট তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয় নি; আর না আমরা তাঁকে দেখেছি। আল্লাহ তাআলা জানেন সে কি জীবিত না মৃত্যুবরণ করেছে।

আমীরুল মু'মিনীন হয়রত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট বললেন, আমাকে কোন নতুন কথা শুনান তো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট আবু খুজাইল ইবনে কানিক আসাদী তার গল্প বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলী যুগে একদিন তার উট হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি খুঁজতে খুঁজতে 'আবরাকে গোরাক' নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। (আবরাকে গোরাক একটি উপত্যকার নাম যেখানে জিনদের বসবাস) সেখানে পৌঁছে তিনি তার সওয়ারীর পা বেঁধে দিলেন এবং সেই উপত্যকার টিলাতে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে এই শব্দগুলো বলছিলেন।

اعوذ بعظيم المكان

আমি এখানকার মহান ব্যক্তিত্বের নিকট পানাহ চাই। হঠাৎ করে একজন আওয়াজদানকারী তাকে আওয়াজ দিয়ে বলল

ويعد عد بالله ذى الجلال منزل الحرام الحلال

ওহে! মহান প্রতাপশালী আল্লাহর নিকট পানাহ চাও, যিনি হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিধান অবতীর্ণকারী।

ووحد الله ولا تبال ما هول ذا الجن من الاهوال

মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা কর; অতঃপর কোন প্রকার সন্দেহ কর না এবং জিনদের ক্ষতি ও ফিতনা থেকে নিশ্চিন্ত হও।

আমি তাকে বললাম

يايها الداعى فما تخيل ارشد عندك ام تضليل

ওহে আহ্বানকারী! কী তোমার উদ্দেশ্য? তোমার কাছে কি উত্তম আহ্বান আছে? না কি বিভ্রান্তিকর?

আমার জবাবে সে বলল

هذا رسول الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات

তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মঙ্গলকামী, যার উপর (সূরা) ইয়াসীন অবতীর্ণ হয়েছে। আর অনেক সূরা আছে যার প্রথমে প্রশংসা।

وسور بعد مفصلات يدعوا الى الجنة والنجاة

আর রয়েছে দীর্ঘ ও ছোট উভয় প্রকার সূরা। তিনি লোকদেরকে জান্নাত ও নাজাতের দিকে আহ্বান করেন।

يأمر بالصلوة وبالصوم يزجر الناس عن الهنات

যিনি নামার রোযার আদেশ করেন এবং মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আওয়াজদাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? জবাব দিল, আমি মালেক ইবনে মালেক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নজদের জিনদের নিকট প্রেরণ করেছেন। আমি তাকে বললাম, কেউ যদি আমার উটের রক্ষাকারী হত তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতাম। সে আমাকে আশ্বস্ত করল, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমার উট নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেব। রাবী বলেন, আমি আমার সওয়ারীকে মদীনার দিকে চলালাম। জুমার দিন সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম এবং মসজিদে নববীতে হাজির হলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন। আমি আমার সওয়ারীকে মসজিদের দরজার সামনে বসিয়ে দিলাম। ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেওয়া সমাপ্ত করলেন। তখন হযরত আবু যর (রাঃ) আমার পাশে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে খোশ আমদেদ বলেছেন। আপনার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত হয়েছেন। আপনি মসজিদে আসুন এবং লোকদের সাথে নামায আদায় করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি গোসল করলাম এবং মসজিদে নামায আদায় করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, যে বৃদ্ধকে তুমি যিম্মাদার বানিয়েছ সে কি তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ পৌঁছিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং দয়া অনুগ্রহ দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে অনুগ্রহ করবেন।

মসনদে দারেমীতে ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একজন সাহাবী জিনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং

উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। সাহাবী জিনকে চিৎ করে ফেললেন। এরপর সাহাবী জিনকে বললেন, তুমি দেখি খুবই হালকা পাতলা। সব জিন কি তাহলে এরকমই? জিনটি বলল, এমন নয়। আপনি দ্বিতীয়বার লড়ে দেখুন। দ্বিতীয়াবারও যদি আপনি আমাকে চিৎ করে ফেলতে পারেন তাহলে অনেক কল্যাণমূলক কথা বলব। দ্বিতীয় বারও জিনটি পরাভূত হল; তখন সে বলল, সম্ভবত তুমি আয়াতুল কুরসী الله لا اله الا هو الحى القيوم পড়েছ। যদি তুমি তা তোমার ঘরে পড় তাহলে সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। বের হওয়ার সময় তার আওয়াজ হবে গাধার আওয়াজের মত।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, الضئيل (আদ-দাইল) অর্থ হালকা পাতলা এবং আশ-শাখীত অর্থ ক্ষীণ, কৃশ। ضليع (দালী) উত্তম কোমর বিশিষ্ট শক্তীশালী ব্যক্তি। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন, جج (জাজ) অর্থ গাধার বায়ু ছাড়া। (এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'গাইন' পরিচ্ছেদের غول (গাওল)-এর বর্ণনায় আসবে)।

ফায়সালা

যদি কোন স্থানে চল্লিশজন লোক একত্রিত হয়, চাই মানুষ কিংবা জিন—তাহলে সেইখানে জুমুআর নামায আদায় করা যাবে।

শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন (রহ.) তাঁর 'মানাকিবে শাফেয়ী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : হযরত রাবী (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-কে বলতে শুনিছি, যদি কোন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি বলেন, আমি জিন দেখেছি, তাহলে তার সাক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তার বক্তব্য انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم—এই আয়াত বিরোধী। (আয়াতের অর্থ সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।

–সূরা আ'রাফ : ২৭

অবশ্য নবী-রাসূলগণ এর ব্যতিক্রম। তাঁরা জিন ও শয়তানদেরকে তাদের অবিকল আকৃতিতে দেখতে পান।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমতই প্রাধান্য পাবে। জিনদের আসল সুরতে দেখার দাবি করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণভাবে তাদেরকে তাদের অবিকল আকৃতিতে দেখা যাবে না।

দার্শনিক আলোচনা

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, সমস্ত জিন ইবলীসের বংশধর। ফেরেশতাগণের বংশ ও জাতি থেকে তারা হয় না। কেননা ফেরেশতাদের মধ্যে

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কারণ, ফেরেশতাদের মধ্যে পুরষ-স্ত্রী নেই। কেউ কেউ বলেন, জিনেরা এক জাতি এবং ইবলীস তাদের বংশধর। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, ইবলীস ও শয়তানের বংশধরই জিন জাতি। কেননা পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। জিনদের মধ্যে যারা নাফরমানী আল্লাহদ্রোহী তারাই শয়তান। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যখন শয়তানের বংশ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তার উপর ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের থেকে থাকে। আর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতে ইবলীসের স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়।

ইবনে খাল্লিকান তাঁর 'তরজমায়' শাব'বী' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন : একদিন ইমাম শা'বী (রহ.) বসেছিলেন, এমন সময় একজন শ্রমিক আমার নিকট আসল, যার কাছে একটি বিরাট মটকা ছিল। শ্রমিক মটকাটি নিজের সম্মুখে রেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ইমাম শা'বী? আমি বললাম, ব্যাপার কী? সে বলল, ইবলীসের ব্যাপারে আপনি আমাকে কিছু বলুন। তার স্ত্রী ছিল কি না? শা'বী বললেন, এই ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। শুধু এতটুকু আমার জানা আছে যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي

তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? –সূরা কাহ্ফ : ৫০

আর বংশধর স্ত্রী ব্যতিত হয় না। একথা শুনে লোকটি মটকা নিয়ে চলে গেল। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা ইবলীসকে বলেছেন, যেভাবে আদম-এর বংশধর সৃষ্টি করব সেভাবেই তোর বংশধরও সৃষ্টি করব। সুতরাং যখন কোন আদম সন্তানের জন্ম হয় তখনই একজন শয়তানও সৃষ্টি করা হয়। হাদীস দ্বারা এ মর্মটির সত্যতা মিলে।

কোন কোন আলেম বলেন, শয়তানের মধ্যেও নারী ও পুরুষ রয়েছে। যার দ্বারা সন্তান-সন্ততি জন্ম হয় এবং বংশ বিস্তারও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা শয়তানের ডান উরুতে পুরুষাঙ্গ ও বাম উরুতে মাতৃ লিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। সে যখন সঙ্গম করে তখন ১০টি ডিম সৃষ্টি হয় এবং ডিম থেকে ৭০টি করে শয়তান জন্ম গ্রহণ করে।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ইবলীসের কয়েক প্রকার সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। একপ্রকারের নাম হল, উলহান। তাদের দায়িত্ব হল তাহারাত—পবিত্রতা ও নামাযের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা। (২) হাফান তারা বনে-জঙ্গলে বাস করে। (৩) মুররা এটা ইবলীসের উপাধিও বটে। (৪) যালানবূর তারা হাটে-বাজারে থাকে এবং অহেতুক কথা ও মিথ্যা কসমের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে।

শয়তানের মধ্যে 'সাব্বা' নামক একটি দল রয়েছে, যারা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেয়। আরেক দল 'আবীদ', তারা নবীগণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করত। আরেক প্রকার নারীকে অসহায় করে দেয়। আরেক দল ওয়াসিম। এই দলের কাজ হল, পুরুষ যখন বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করে, প্রবেশকালে যদি সালাম না করে এবং আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ না করে তখন তারা ঘরে প্রবেশ করে পবিবার-পরিজনের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি যদি খানা শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলে তখন তারা তার সাথে খেতে শুরু করে। কেউ যদি সালাম ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘরে কোন অসহনীয় কাজ দেখে তখন সে নিম্নলিখিত শব্দগুলো পড়বে—

واسم واسم اعوذ بالله منه

আরেক প্রকার হল মাতূস, তারা মিথ্যা গুজব ছড়ায় যার কোন ভিত্তি নেই। আরেক দল আকনাস, তার মায়ের নাম 'তারতাবাহ'। নাক্কাশ বলেন, এদের হায়েযও হয়। তাদের বিষয়ে প্রসিদ্ধ হল– তারা ৩০টি ডিম দেয়, ১০টি পশ্চিমে, ১০টি পূর্বে আর ১০টি ভূ-পৃষ্ঠে। তার মাঝখানে প্রতিটি ডিম থেকে একটি করে শয়তান জাতির জন্ম হয়। যারা গাযলাব, আকায়িব, ফুতারিব, জাল ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। এগুলো ব্যতীত অন্য একটি প্রকার আছে, যারা সমস্ত আদম সন্তানের শত্রু। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ الخ

তবে কি তোমরা তাকে (শয়তানকে) এবং তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু। –সূরা কাহাফ : ৫০

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ইবলীসের উপাধি হল আবু মুররা। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবলীসের গোত্র ফেরেশতাদের মধ্যে কি না? এর নাম আরবী না অনারবী এ ব্যাপারেও মত পার্থক্য বিদ্যমান। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে মুসাইয়াব, কাতাদাহ, ইবনে জাবির, যুজাজ ও ইবনে আম্মারী (রহ.) বলেন, এরা ফেরেশতাদেরই গোষ্ঠি। এদেরকে জিন বলা হয়। ইবরানী ভাষায় এদেরকে আযাযীল বলা হয়। আরবীতে حرث। সে ফেরেশতাদের নেতা। সে ছিল যমীনের সবচেয়ে বড় বাদশাহ। ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুজার ও বড় আলেম। আকাশ ও যমীনে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। যে কারণে তার মধ্যে অহংকার ও অহমিকা জন্ম নেয় এবং সে নিজেকে বড় মনে করতে থাকে। এ অহংকারের কারণে সে আল্লাহর সান্নিধ্য থেতে বহিস্কৃত ও বিতাড়িত হয়। আর আল্লাহ তাআলা তাকে "শায়তানির রাজীম" বলে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত ঘোষণা করেন।

نعوذ بالله من خذلانه ومقته ونساله العافية والسلامة فى الدنيا والاخرة

আলেমগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পাপে জড়িয়ে পড়ে, তখন তার কাছে আশা করা যায় যে, সে পাপের পথ ছেড়ে সরল ও সঠিক পথ অবলম্বন করবে; কিন্তু কার মধ্যে যদি অহংকার বাসা বাঁধে তার সরল পথে ফিরে আসা একেবারেই অসম্ভব।

ইবলীস ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে হওয়ার প্রমান স্বরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী كان من الجن অর্থাৎ শয়তান ফেরেশতাগণের সেই গোত্রভুক্ত যাদেরকে জিন বলা হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর, হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ইবলীস শয়তান ফেরেশতাগণের গোষ্ঠিভুক্ত নয়। কেননা, তারা প্রকৃত জিন। যেমন ছিলেন হযরত আদম (আঃ) প্রকৃত মানুষ আবদুর রহমান ইবনে যায়িদ, শাহর ইবনে হাওশাব বলেন, ইবলীস ফেরেশতাগণের গোষ্ঠিভুক্ত নয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত-

كلهم الا ابليس

(সুতরাং সকল ফেরেশতাই (আদমকে) সিজদা করল কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। এইখানে الا শব্দটি ইস্তিসনায়ে মুনকাতি। শাহর ইবনে হাওশাব আরও বলেন, ইবলীস সেসব জিনদের অন্তর্ভূক্ত, যারা ফেরেশতাগণের মধ্যে বেশী সফলতা লাভ করেছিল।

অভিধানবেত্তা ও মুফাস্সিরগণ বলেন : 'ইবলীস'-কে এজন্য ইবলীস বলা হয় যে, সে আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ ও বহু দূরে চলে গিয়েছিল। সেহেতু ইবলীস অর্থ নিরাশও ব্যবহৃত। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হল যা ইমাম নববী (রহ.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন– সে হল ফেরেশতা জাতীয়। এটা তার অনারবী নাম। এই অবস্থায় পবিত্র কুরআন الا এ শব্দটি ইস্তিসনায়ে মুনকাতি না হয়ে মুত্তাসিল হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা শুধু ফেরেশতাগণকেই সিজদার আদেশ করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা ইস্তিসা (ব্যতিক্রম) করে বললেন যে, সবাই সিজদা করল কিন্তু ইবলীস সিদজা করল না। এতে বুঝা যায় মুস্তাসনা মুস্তাসনা মিনহুর সমগোষ্ঠি।

আল্লামা কাযী আয়ায (রহ.) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হল ইবলীস হল 'আবুল জিন'। যেমন হযরত আদম (আঃ) হলেন আবুল বাশার। ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) অপর গোষ্ঠির মধ্যে হওয়াটা আরবী ভাষায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ما لهم به من علم الا اتباع

الظن (ধারণা ব্যতীত এই বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই) এই আয়াতে 'ইস্তিসনা' সম গোষ্ঠির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি বরং অগোষ্ঠির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ মত তা যা ইমাম নববী (রহ.) ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কুরাযী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনরা মু'মিন শয়তান, কাফির।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জিনরা কি পানাহার ও বিয়ে-শাদি করে? তিনি জবাবে বলেন– তারা একটি গোষ্ঠি, তাদের মধ্যে প্রকৃত জিন হল শুধু বাতাস। যারা খানা খায় না, পানও করে না। তাদের কোন সন্তান হয় না। আরেক প্রকার হল যারা পানাহার করে, বিয়ে-শাদিও করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

নোট

আল্লামা কিনারী (রহ.) বলেন, ইবলীস যে কাফির এই ব্যাপারে সকল আলেমই একমত পোষণ করেন। সাইয়্যেদেনা হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে সংঘটিত ঘটনার ভিত্তিতেই এই বিষয়ে কার দ্বিমত নেই। তবে কথা হল কুফরের কারণ কী? সিজদা না করা তো কুফরীর কারণ হতে পারে না। যদি তা হত তবে যাকে সিজদা করার আদেশ করা হয়েছে সিজদা না করার কারণে কাফির হয়ে যেত। অথচ বাস্তবতা তা নয়। ইবলীস আদমের প্রতি হিংসা করার কারণেও কাফির হয় নি। কেননা এমনটি হলে প্রত্যেক হিংসুক কাফির হয়ে যেত। অথচ বাস্তবতা তা নয়। পাপ ও অন্যায়ও ইবলীসের কাফির হওয়ার কারণ হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেক পাপাচারী ও গুনাহগার কাফির হয় না। এসব কারণে পরবর্তী কালের ফকীহগণের একদল ইবলীসের কাফির হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, সম্ভবত ইবলীসের কাফির হওয়ার কারণ হল সে আল্লাহ তাআলার নিকট জুলুমের অভিযোগ করা। আর এই মর্মটি এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, (ইবলীস বলেছিল)

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ-

আমি (ইবলীস) তার (আদমের) চেয়ে উত্তম, আমাকে অগ্নি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাকে (আদমকে) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় আয়াতের মর্ম হল যা মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছে যে, ইবলীস বলেছিল, আল্লাহ তাআলা আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার স্বভাবজাত ধর্ম হল উর্ধ ও উচ্চ। আর আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি দ্বারা, যার স্বভাবজাত ধর্ম নিম্ন ও নীচুতা। তাই উর্ধ ও উচ্চ জিনিস কীভাবে নিম্ন ও নিচু

জিনিসের নিকট মাথা নথ করবে? (নাউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম) সম্ভবত তার কুফরীর কারণ।

আলেমগণের ঐক্যমত সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি জুলুমের সম্বন্ধ স্থাপন করবে বা জুলুমের অভিযোগ করবে সেই ব্যক্তি ঈমানের বলয় থেকে বের হয়ে যাবে। এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, ইবলীসের পূর্বে কেউ কাফির ছিল কি ছিল না? কেউ কেউ বলেছেন- ছিল না। এ ব্যক্তিকে (ইবলীস) প্রথম যে কাফির হয়েছে। আবার কোন কোন আলেম বলেন, ইবলীসের পূর্বেও একটি গোষ্ঠি কাফির ছিল। আর তারা ছিল জিন দল। যারা ধরাপৃষ্ঠে বসবাস করত। যাদের ব্যাপারে আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতাগণ ইঙ্গিত করেছিলেন

قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

তারা বলেছিলেন আপনি কি ধরাপৃষ্ঠে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ফিতনা-ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে?

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, ইবলীস অভিশপ্ত ও বিতাড়ির হয়েছিল অজ্ঞতার কারণে না কোন আত্মম্ভরিতার কারণে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও আহলে হাদীসের মধ্যে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। ইবলীস তো মহান আল্লাহকে ভাল করে জানতো ও চিনতো। যারা বলেন যে, অজ্ঞতার কারণেই ইবলীস অভিশপ্ত হয়েছে, তারা বলের কাফির হওয়ার সময় ইবলীসের 'ইল্‌ম' ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর যারা বলেন-ইবলীসের আত্মম্ভরিতা কুফরীর কারণ। তাদের মতে স্পষ্টত সে জানত আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এরপর জেনে শুনে সিজদা না করা আত্মম্ভরিতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইবনে আতিয়্যা (রহ.) বলেন, কাফির হয়ে যাওয়ার পরও ইল্‌ম অবশিষ্ট থাকা মেনে নেওযা কঠিন ব্যাপার।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'আল-আসমাউল হুসনা'-এর শরাহ এর বর্ণনায় বলেছেন : উমর ইবনে যার বলেন, আমি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-কে বলতে শুনিছি, "যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করতেন যে, আমার নাফরমানী কেউ করবে না, তাহলে ইবলীসকে সৃষ্টি করতেন না।" মহান আল্লাহ এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ-

তোমরা কাউকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না, কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফ্‌ফাত : ১৬২-৬৩)

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেন : হে আবু বকর! "যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করতেন যে জগতে কেউ তাঁর নাফরমানী না করুক, তাহলে ইবলীসকে সৃষ্টি করতেন না।"

এক ব্যক্তি হাসানকে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু সাঈদ! ইবলীস কি ঘুমায়? তিনি বললেন, যদি ইবলীস ঘুমাত তাহলে আমাদের প্রশান্তি মিলত। তার (শয়তানের বিভ্রান্তি) থেকে মু'মিনদের মুক্তি নেই; একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভয় ব্যতীত।

বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি যদি এক সেকেন্ড পরিমাণ সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, তাহলে শয়তান তার সাথী হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান তারপর সেই হয় তার সহচর। –সূরা যুখরুফ : ৩৬

হাদীস শরীফেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে—

"আল্লাহ তাআলা নিস্কর্মা যুবকদেরকে (যারা আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল) পছন্দ করেন না।" কেননা, যুবক ব্যক্তি যখন দ্বীন-ধর্ম তথা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে বে-খবর তথা উদাসীন হয়ে যায় তখন শয়তান তার অন্তরে ঘর বানায় এবং বাচ্চা দিতে শুরু করে। যার ফলে শয়তানের বংশধর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার দ্বারা শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। কেননা শয়তানের ফিতরাত—স্বভাব হল আগুন। আর আগুন যখন শুকনা ঘাস পায় তখন দ্রুত প্রজ্বলিত থেকে থাকে। এমনিভাবে যুবকের কাছে শয়তানের প্ররোচনা শুকনা ঘাসের মতই।

হোসাইন হাল্লাজ নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন- "তুমি যদি সত্য কথার মধ্যে তোমার সময় অতিবাহিত না কর, তাহলে তোমার সময় বেকার ও অনর্থক কথায় ব্যয় করবে।"

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম। إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন- সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দুটি কথার প্রতি আদেশ করেছেন। যা থেকে আল্লাহর মাখলুক গাফিল। কেউ জানতে চাইল যে, এই দুটি কথা কী? জবাবে বলা হল– (১) শয়তান তোমাদের দুশমন-শত্রু। (২) তোমরা তাকে তোমাদের দুশমন মনে করবে। কেউ প্রশ্ন করল, শয়তানকে আমরা কীভাবে দুশমন মনে করব আর কীভাবে তার থেকে আমরা নিরাপদ থাকব? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মু'মিনকে ৭টি দুর্গে সুরক্ষিত করেছেন। প্রথম দুর্গ মা'রেফাত, যা স্বর্ণের তৈরি। তারপর রৌপ্যের দুর্গ– এটা হল ঈমান। এরপর লোহার দুর্গ– এটা হল তাওয়াক্কাল—আল্লাহর উপর নির্ভরতা। তারপর আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। আর যমরুদের চারি

দেওয়াল, তাহল সাদকা ও ইখলাস। সর্বশেষ মুতির দেওয়াল। তাহল শিষ্টাচার আত্মা। মু'মিনগণ এ সমস্ত দুর্গ ও দেওয়ালে সুরক্ষিত থাকে এবং ইবলীস দেওয়াল ও দুর্গের বাইরে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে থাকে। মু'মিন লোক তাতে কোন পরওয়া করে না। কেননা সে সুরক্ষিত দুর্গ ও দেয়ালের ভিতরে। তাই মুমিনের কর্তব্য হল কোন অবস্থাতেই সে শিষ্টাচার ত্যাগ করতে পারে না। অভিশপ্ত ইবলিস সব সময় চেষ্টা করে যে, সে এ সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে মুমিনের ঈমানের উপর হামলা করে তাকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।

ইতিপূর্বে যে আয়াতে কারীমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে- তাতে আল্লাহ তাআলা দুটি কথার আদেশ করেছেন। এই সম্পর্কে ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এ দুটি কথা নির্ধারণ করা অতীব কঠিন। অন্যান্য আলেমগণ এ আয়াতে একই কারণের কথা ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا অর্থাৎ আমরের (নির্দেশ) সীগা দ্বারা খেতাব করা হয়েছে। আমর (নির্দেশ) ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত। তবে শর্ত হল তার বিপরীত কোন কারণ না থাকা।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি আমার উস্তাদ ইমাম ইয়াফয়ী (রহ.)-এর নিকট জানতে চাইলাম যে, উল্লেখিত আয়াতে দ্বিতীয় ফরয কী? তিনি জবাব দিলেন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি কথার আদেশ করেছেন। একটি ইল্‌ম (জ্ঞান) সংক্রান্ত আর দ্বিতীয়টি হল আমল সংক্রান্ত। ইল্‌ম এর মর্ম হল, শয়তানকে দুশমন মনে করা আর আমলের মর্ম হল পূর্বে যে দুর্গের বা দেয়ালের কথা বলা হয়েছে মু'মিনরা এর ভিতর নিরাপদে থাকা। ইবলীস সেখানে পৌঁছতে পারে না। তবে কোন এক সময় (সুযোগ পেয়ে) ইবলীস এই সমস্ত দুর্গের কোন একটির উপর দখল নিয়ে নেয় এবং মু'মিনকে পাপে লিপ্ত করে এবং জাহান্নামের উপযোগী করে। ইবলিস কোন কোন মু'মিনকে পাপাচারে লিপ্ত করতে সমর্থ না হলেও তার ঈমানে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার ঈমানের উপর নির্ভরশীল। যার ঈমান যত শক্তিশালী ও মজবুত হবে সে ব্যক্তি শয়তানের ধোকা থেকে ততটুকু সুরক্ষিত থাকবে। যদি কার মাঝে মা'রেফাত ও ঈমান দুর্বল হয় তবে ইবলীস সহজেই সে দুর্গে প্রবেশ করতে পারে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বিভ্রান্ত করে দেয়। কিন্তু মা'রেফাত ও ঈমানের দুর্গ অন্য দুর্গের মত নয় বরং এর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং সদকা ও ইখলাস (সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা)-এর দুর্গ আদেশ ও নিষেধ (আমর ও নাহী)-এর মত নয়। যদি ঈমানের দুর্গ দুর্ভেদ্য হয় তাহলে শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

নিশ্চয় তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। –সূরা নাহল : ৯৯

কেননা এ সকল ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের গুণে গুণান্বিত। এ ধরনের ব্যক্তিদের বিষয়ে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

মু'মিন তো তারা যাদের হৃদয় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হয় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। –সূরা আনফাল : ২

এসব দুর্গের মধ্যে কোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে যদি কোনটিতে শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে, তবে তা কুফরীর কারণ হয়ে যায়।

ঈমান যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যদি তাতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এবং ইবলীস যদি তাতে নিজের আধিপত্য গাড়তে পারে, তাহলে তার ঠিকানা জাহান্নাম ভিন্ন আর কী থেকে পারে? নাউযুবিল্লাহিমিন যালিকা। আল্লাহর নিকট এসব থেকে পানাহ চাচ্ছি।

জেনে রাখা কর্তব্য যে, সবচেয়ে বেশি জরুরী হল আল্লাহর মা'রিফাত অর্থাৎ আল্লাহকে চেনা। গ্রন্থকার বলেন, আমার উস্তাদ বলেন, النظر بالله ابن فورك অর্থাৎ প্রথম প্রয়োজন হল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বক আল্লাহর পরিচিতি লাভ করা। ইমামুল হারামাইন বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম প্রয়োজন সাধারণ মানুষের উপর প্রত্যাবর্তনকারী القصد الى النظر।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা جوهر الفريد فى علم التوحيد এর ৭ম অধ্যায়ে করেছি। জিন জাতির মধ্যে নবী রাসূর ছিলেন কি না এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

যাহহাক বলেন, জিন জাতির মধ্য থেকেও নবী আগমন করেছিলেণন। প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পেশ করেছেন–

يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم

হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নি? (সূরা আনআম : ১৩০)

কিন্তু মুহাক্কিক ও (বিজ্ঞ) উলামায়ে কেরাম বলেন, জিন জাতির মধ্য থেকে কাউকেও নবী করে প্রেরণ করা হয় নি বরং মানব জাতির মধ্যে থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। জিনদের মধ্য থেকে শুধু ভীতি প্রদর্শক আগমন করেছেন। তাদেরকে নবীর মর্যদা দেওয়া হয় নি। এখন রইল এ আয়াতের মর্ম যা যাহহাক তার অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল আয়াতে منكم দ্বারা احد الفريقين অর্থাৎ দুই দল বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী– يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা রাহমান : ২২)

উক্ত আয়াতে উভয় দরিয়ার পানি মর্ম হলেও কিন্তু মুক্তা ও প্রবাল শুধুমাত্র লবনাক্ত পানি থেকেই বের হয়। অর্থাৎ আয়াতে উভয়কে বুঝানো হলে দু'টি একটির মর্ম নেওয়া হয়েছে। মুনযির ইবনে সাঈদ বালূতী (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন জিনদের মধ্যে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন তারা সবাই নবী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিনদের বিগত উম্মতরাও শরীয়তের বিধানবলীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। যেমনিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর শরীয়তের বিধান অবশ্য পালনীয়। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

اولئك الذين عليهم القول فى امم قد خلت من قبلهم من الجن والجن انهم خاسرين-

তাদের পূর্বে যে জিন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আহকাফ : ১৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون-

আর আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যাবিয়াত : ৫৬)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হল উভয় অর্থাৎ জিন ও ইনসানের মু'মিনগণ। আল্লাহ তাআলা শুধু তাঁর ইবাদতের জন্যই অনুগতদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এবং পাপাচারীদেরকে শুধু পাপের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য ব্যাপক উদ্দেশ্য গ্রহণে কোন বাধা নেই। কোন কোন আলেম বলেন, এর উদ্দেশ্য হল স্বীয় ইবাদতের আদেশ দিচ্ছি এবং স্বীয় রহমতের প্রতি আহ্বান করছি, যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করে। যদি কেউ এ আয়াতের বিষয়ে আপত্তি করে যে, আয়াতে কেন জিন ইনসানকে নির্দিষ্ট করা হল, আরও মাখলুক তো ছিল।

যেমন, ফেরেশতাগণের উল্লেখ কেন করা হল না? তারাও তো আল্লাহ তাআলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। এর জবাব হল, এ দুই জাতির মধ্যে পাপ ও অবাধ্যতা বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু ফেরেশতাগণ পাপাচারে নিমগ্ন হন না। তারা পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় আরেকটি আপত্তি হতে পারে যে, মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু আয়াতে জিনদেরকে কেন আগে আনা হয়েছে; মানুষকে আগে আনা প্রয়োজন ছিল। এর উত্তর হল 'ইনসান' শব্দটি নূনে খফীফা হওয়ার কারণে অধিকতর হালকা, আর জিন শব্দটি অধিকতর ভারী। বক্তার প্রশান্তির জন্য ভারী শব্দটিকে হালকা শব্দটি আগে আনা হয়েছে।

মাসাইল

শেখ ইমাদুদ্দীন ইবনে ইউনুস (রহ.) জিন ও মানবজাতির মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, কোন মানবজাতির জন্য জিন বিবাহ করা জায়িয নয়। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ভিত্তিতে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا-

আল্লাহ তোমাদের স্বজাতির মধ্যেই তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة-

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা (সহবাস) ও দয়া (সন্তান) সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম : ২১)

এ আয়াতে মাওয়াদ্দাতান অর্থ সহবাস আর রাহমান অর্থ সন্তান-সন্ততি। হাম্বলী মাযহাবের একদল আলেমও জিনদের সাথে বিবাহের পক্ষে নন। 'ফাতাওয়া সিরাজিয়া'-তে উল্লেখ আছে, জাতিগত পার্থক্যের কারণে বিবাহ জায়িয নয়। 'কুনিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হয়রত হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ জায়িয। হাসান ও কাতাদাহ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা দলীল হিসেবে এ হাদীস পেশ করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করেছেন।" হযরত যায়িদ (রাঃ)

থেকে বর্ণিত, তিনি সব সময় দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে মহিলা জিন দ্বারা সহায়তা করুন, যাকে আমি বিবাহ করতে পারি।

ইবনে আদ্দী, নাঈম ইবনে সালিম, কানবার মাওলা ইবনে আবু তালেব-এর জীবনীতে ইমাম তাহাবী (রহ.) থেকে এটা বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট ইউনুস ইবনে আবুল আ'লা বর্ণনা করেন, নাঈম ইবনে সালাম আমাদের নিকট আগমন করেন। তাকে আমি বলতে শুনিছি যে, আমি জিন মলিহাকে বিবাহ করতে চাই।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- বিলকিসের মাতা-পিতার মধ্যে কোন একজন ছিল জিন। শেখ নাজমুদ্দিন কুমুলী বলেন, মানুষ কোন মহিলা জিনকে বিবাহ করা হারাম বলা এতে আপত্তি রয়েছে। কেননা যেই পন্থায় মানুষের জন্য হারাম সেই পন্থায় জিনদের জন্য হারাম হওয়া চাই। কিন্তু আমাকে একজন দ্বীনদার শেখ বলেছেন : তিনি এক মহিলা জিনকে বিবাহ করেছেন।

আল্লামী দামেরী (রহ.) বলেন, আমি একজন আলেম ব্যক্তিকে জানি যিনি এক এক করে চারজন জিনকে বিবাহ করেছেন। কিন্তু এই ধারাবাহিক বিবাহের মধ্যে তালাক লি'আন, ইলা, ইদ্দত, ভরণপোষণ, বাসস্থান ও পোশাক-আশাক এবং এই চারজন জিন স্ত্রী ব্যতীত আরও চারজন (মানুষ) মহিলাকে বিবাহ ব্যাপারে মাসয়ালার প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া জরুরী। আর এসব অবস্থায় অবশ্যই আপত্তি উত্থাপিত থেকেই পারে, যেই বিষয়টি বুদ্ধিমানের নিকট গোপন থাকতে পারে না। শাইখুল ইসলাম শামসুদ্দিন যাহাবী (রহ.) বলেন, আমি ফাতহুদ্দীন ইয়ামারী (রহ.)-এর লেখায় দেখেছি, তিনি বলেছেন : আমাকে উসমান মুকাতেলী বর্ণনা করেছেন, আমি আবুল ফাতাহ কুশাইরী (রহ.)-কে ইয়াযউদ্দীন ইবনে আবদুস সালামকে বলতে শুনিছি যে, ইবনে আরাবির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, সে মিথ্যুক ছিল। তিনি বললেন, একদিন আমরা জিনদের সাথে বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, জিনদের দেহ অতি সুক্ষ্ম আর মানুষের শরীর মোটা। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কীভাবে মিলন হতে পারে? এরপর তিনি আমাদের নিকট একটি সময় অদৃশ্যও থাকেন। তারপর আমাদের নিকট এ অবস্থায় আসলেন যে, তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখা দিল। এই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আমাদেরকে অবহিত করলেন যে, আমি এক জিন মহিলাকে বিবাহ করেছিলাম। তারপর কোন কথায় তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি হল, যার কারণে সে আমাকে আঘাত করেছিল।

শেখ যাহাবী (রহ.) বলেন, আমি ইবনে আরাবির বিষয়ে এই আশা করতে পারি না যে, তিনি ইচ্ছাকৃত এমন মিথ্যা বলবেন। কেননা এটা তো বাচালতা মাত্র।

মাসয়ালা

আবু উবায়দা তার 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে এবং বায়হাকী (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের জবাইকৃত (পশু ভক্ষণ করতে) নিষেধ করেছেন। জিনদের জবাইয়ের মর্ম হল জাহেলী যুগে কোন ব্যক্তি যদি কোন জমি বা ঘরবাড়ি ক্রয় করত তাহলে একটি পাখি জবাই করত। আর নিজের ধারণা মত মনে করত যে, এ ঘরটি জিন থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের জবাই নিষেধ করেছেন এবং তা নির্থক বলেছেন।

শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর কাছে বাগদাদের এক লোক এসে নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করল যে, আমার এক যুবতী কন্যাকে ঘরের ছাদ থেকে কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। অনুগ্রহ পূর্বক আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। যাতে আমার মেয়েকে পেতে পারি। আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) লোকটিকে বললেন, তুমি অমুক স্থানে যাও এবং بسم الله نيت عبد القادر পাঠ করে তোমার পাশের দেওয়াল টেনে ধরে বসে যাও। ইশার নামাযের পরে জিনেরা বিভিন্ন আকৃতিতে তোমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করবে। তুমি এদেরকে দেখে ভয় পেও না। এরপর আসবে জিনদের বাদশাহ। সে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, কী প্রয়োজনে এসেছ? তখন তার কাছে সমস্ত ঘটনা বলবে এবং আরও বলবে যে, আমাকে আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) পাঠিয়েছেন।

লোকটি বলল, আমি তাই করলাম। দেখা গেল জিনদের একজনের পর আরেক জন বিভিন্ন আকৃতিতে আমার সম্মুখে আসলে লাগল। অথচ আমি যেখানে বসেছিলাম সেই বৃত্ত থেকে তারা দূরে থাকল। সবশেষে জিনদের বাদশাহ আসল। সে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে গেল এবং আমাকে বলল, ওহে মানুষ কী খবর! আমি বললাম, আমাকে আপনার নিকট শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) পাঠিয়েছেন। শেষের কথা শুনে সে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দেওয়ালের বাহিরে বসে গেল এবং তার সাথে তার সাথীরাও বসে গেল।

অতঃপর জিনের বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে? আমি আমার মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তার কাছে বললাম। একথা শুনে বাদশাহ তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান তার এক সঙ্গীকে আদেশ করল তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আস যে এই বেয়াদবী করেছে। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কুতুবে আলম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর এলাকাতে এই ধরনের কাজ কেন করলে? সে জবাব দিল, আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি। এই কারণে আমি

তাকে নিয়ে গেয়েছিলাম। একথা শুনে বাদশাহ তার গর্দান কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হল। আর আমার মেয়েকে ফেরত দেওয়া হল। আমি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর আদেশের এ ধরনের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আর দেখি নি। সে বলল, সত্যিই আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) স্বীয় বাসস্থান থেকেই জিনদের সব দেখতেন। যদিও তারা দেওয়াল বেষ্টিত স্থানে থাকুক না কেন? এ জন্য জিনরা তাঁকে ভয় পায়। কেননা আল্লাহ তাআলা যাকে 'কুতুব'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তখন জিন ও ইনসানকে তাঁর অনুগামী করে দেন।

আবুল কাশেম জুনাইদ (রহ.)-এর বর্ণনা মতে হযরত সিররী সাক্তী (রহ.) বলেন, একবার আমি এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলিমাম। আমি একটি পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় নিলাম। মধ্য রাত্রের দিকে কেউ আওয়াজ দিল এই বলে যে,

لا تدور القلوب فى الغيوب حتى تذوب النفوس من مخافة المحبوب

তা শুনে বিস্মিত হলাম। প্রশ্ন করলাম, যে বলছে সে কি মানুষ? জবাব পাওয়া গেল, আমি জিন। আমি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান রাখি আর আমার সাথে আমার বন্ধুবান্ধব ও সহচরগণ রয়েছে। আমি বললাম, তাদের নিকটও কি এ ধরনের উচ্চাঙ্গের ও বিদগ্ধ কথা আছে? জবাব আসল– এর চেয়ে উত্তম কথা রয়েছে। অপর একজন বলল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মে গভীরভাবে নিমগ্নতায় শারীরিক অলসতা বিদূরীত হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, তাদের কথা কতই না উত্তম। এ মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তি আওয়াজ করল–

من انس به فى الظلام نشرت له غد الاعلام

যেই ব্যক্তি অন্ধকারের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখে তার জন্য আগামী দিনের চিহ্নসমূহ পরিস্ফুট হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা শুনে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম, হুঁশ আসার পর আমি দেখলাম আমার বুকের উপর একটি নার্গিস ফুল। এটা শুকার পর আমার চিন্তা-ক্লেশ বিদূরীত হয়ে গেল এবং প্রশান্তি ও স্বস্তি পেলাম। আমি তাদের নিকট থেকে আমার আশা-আকাঙ্খার উপদেশ কামনা করলাম। তারা আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহর যিকর তথা স্মরণে কোন লোকলজ্জা অনুভব কর না। কেননা আল্লাহর যিকরে মুত্তাকীদের অন্তর প্রশান্তি লাভ কের এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি তাঁকে ছাড়া অন্য কারও নিকট কিছু কামনা করে সে যেন উদ্দেশ্যহীন বস্তুর দিকেই দৌড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ও আমাকে এর শক্তি সামর্থ্য দান করুন। (আমিন) এই কথা বলে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আজও আমি তার কথায় অন্তরে শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করি।

শেখ ইয়াফী (রহ.) তার 'কিফায়াতুল মু'তাকিদ ওয়া ফিকায়াতুল গ্রন্থে শেখ সিররী (রহ.)-এর এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একটি ময়দানে আমি আমার বন্ধুর তালাশে পেরেশানে ছিলাম। আমি তখন একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি এমন কতগুলো লোক দেখলাম, যাদের মধ্যে অন্ধ, লেংড়াসহ অন্যান্য রোগী ছিল। আমি এ বিষয়ে জানতে চাইলাম। তারা আমাকে বলল, এখানে এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি বৎসরে মাত্র একবার বাহিরে আসেন। মানুষ তাকে দিয়ে দুআ করায় এবং রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। কাঙ্খিত লোকটি আসার পর মানুষ তার কাছে দুআর আবেদন করল। সুতরাং তিনি লোকদের জন্য দুআ করতে লাগলেন এবং লোকেরা ভাল হয়ে চলে যেতে লাগল। আমি তাঁর পিছনে পিছনে যেতে থাকলাম। তার কাছে গিয়ে আমি তাঁকে চিমটি কাটলাম এবং বললাম, আমি এক অদৃশ্য রোগে ভুগছি। এর চিকিৎসা আমাকে বলে দিন। লোকটি বলল, হে সিররী! আমার নিকট থেকে চলে যাও। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন। সাবধান! এমন যেন না হয় যে, তোমাকে যদি তিনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কার সাথে সম্পর্ক গড়তে দেখেন তাহলে তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে যাবে। একথা বলে তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রহ.)-এর কিতাব 'তাওহীদ'-এ হযরত জুনাইদ (রহ.)-এর সূত্রে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি বলেন– আমি শেখ সিররী (রহ.)-এর নিকট শুনেছি, মানুষ তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মনুষ্যত্বের কারণে এমন স্থানে পৌঁয়ে যায় যে, যদি তাকে তরবারীর সাহায্যে হত্যা করা হয় তুবও তা অনুভূত হয় না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় আমার অন্তরে ভীতি এসে গেল যে, তা কী করে হয়? অবশেষে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ণনাকারী এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, প্রভাব ও মনুষ্যত্ব আয়ত্ত করার মত সুক্ষ্ম বস্তু থেকে উন্নত দরজার বস্তু। আয়ত্ত ও সূক্ষ্মতা ভয় ও আশা থেকেই বড় হয়। প্রভাবের জন্য অদৃশ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা, প্রতিটি প্রভাব বিস্তারকারী বস্তু অদৃশ্য হয়। এমনকি যদি তাকে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হয় তবুও সে তার অদৃশ্যতা থেকে মুক্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রভাব শেষ না হয়। ভালবাসার দাবি হল সুস্থতা (সুস্থ বুদ্ধি)। উলামায়ে কেরাম ভালবাসা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মানের পার্থক্য বর্ণনা করে থাকেন। কেননা মনুষত্বের দরজা সর্বোচ্চ। যদি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তবু মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটে না। কেননা তার দৃষ্টি শুধু উদ্দেশ্যের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। তার কাঙ্খিত বা অভিষ্ট দৃষ্টি শুধু তার প্রকৃত প্রেমিকের দিকেই।

শেখ সিররী (রহ.)-এর বক্তব্য يبلغ العبد من الهيبة والانس الى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر به (বান্দা ঈমানদার ব্যক্তি প্রভাব ও ভালবাসা দ্বারা এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, যদি তাকে তরবারী দ্বারাও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করা হয় সে তা অনুভব করে না।) এরই দিকে ইঙ্গিত। কেননা ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি (আল্লাহর ভালবাসা) আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপনে সৃষ্টি হয়। আর যে ব্যক্তির মাঝে আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তার নিকট যাবতীয় বস্তু বেকার ও অপ্রয়োজনীয় অনুভূত হয়। কেননা যে ব্যক্তি প্রতিটি বস্তু থেকে বিমুখ হয়েছে আল্লাহর জন্যই জীবিত, সে আল্লাহকে ভিন্ন আর কিছুই দেখে না। আর না সে কার জন্য কোন কাজ করে। সে উভয় জগতে তাঁর আনুগত্য করে আর তার দৃষ্টি শুধু তাঁহারই (প্রেমিকের) দিকে নিবদ্ধ থাকে। তার চোখ শুধু তার (প্রেমিকের) কাজ ও তাঁর সৃষ্টি অবলোকন করে থাকে। কেননা, আরেক আধ্যাত্মিক সাধক শিল্পকে শিল্পী থেকে চিনে নেয়। শিল্পী শিল্প থেকে চিনে না। এ জন্য সে তার কাজ ব্যতীত অন্য কিছুই অবলোকন করে না।

এরই ভিত্তিতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি সকল বস্তুর পূর্বে আল্লাহকে দেখেছি। আর এ হল তাওহীদের সর্বচ্চ মাকাম। স্মর্তব্য যে, মানুষ (আবদ) যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টির কার্যাদি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সুক্ষ্মতার বাস্তবতা পর্যন্ত না পৌঁছবে, এ পদ্ধতিতে যে সুক্ষ্ম বিষয়সমূহ থেকে অবহিত থেকে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ভালবাসার স্বাদ অর্জন করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু যদিও ভালবাসা ও প্রভাবের অবস্থা স্পষ্ট, তবুও আহলে হাকীকত (আল্লাহর স্বরূপ উপলব্ধিকারী তত্ত্বদিবগণ) তাকে পরিবর্তনশীলতার কারণে অসম্পূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তাওহীদপন্থীগণ তাদের বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তাদের পরিপূর্ণতা আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহর ভালবাসা ও প্রেমে এককার হয়ে যাওয়া। তাদের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী ভয়, কোন বস্তুই নয়; না ভালবাসা, না জ্ঞান, না কোন অনুভূতি। তার লক্ষ্য হল উচ্চতর মাকাম—মহান আল্লাহর রহমতে অভিষিক্ত হওয়া। কারণ, আল্লাহর রহমত অনেক উর্ধে। আল্লাহর শান হল তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাঁর রহমত দ্বারা অভিষিক্ত করেন।

শেখ সিররী (রহ.) বলেন, আমি ওয়াদ্দা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ণ এক বৎসর ছিলাম। কিন্তু কোন দিন আমি তার কাছে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি নি। একদিন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে, মা'রিফাতের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ধাপ কী? জবাবে তিনি বলেন, মা'রিফাতের শ্রেষ্ঠতম ধারা হল আল্লাহ তাআলাকে সব চেয়ে প্রিয়তর মনে করতে থাক, এতে তোমার প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ

তাআলা ব্যতীত যা কিছু রয়েছে সকল বস্তুর হাকীকত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও আল্লাহ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড তোমাকে এই স্তরে পৌছাবে। শেখ সিররী (রহ.) বলেন, তার এই কথায় এ ব্যাপারে আমার উপকারের মাধ্যম হল। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, শেখ সিররী (রহ.) ৬ রামাযানুল মুবারক, ২৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

জিনদের অভ্যাস

যে ঘরে কাগজী লেবু থাকে সে ঘরে জিন প্রবেশ করতে পারে না। ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে হাসান। ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ খুলয়ী শাফিয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত : (তিনি কাযিউল জিন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফুরাকাতে তাঁর করব। মানুষের ধারণা তাঁর মাজারে দুআ করলে দুআ কবুল হয়)। জিনেরা আমার কাছে এসে লেখাপড়া করত। একবার তাদের আসতে বিলম্ব হল। তিনি তাদের কাছে কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, আপনার ঘরে কাগজী লেবু ছিল। যে ঘরে কাগজী লেবু থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

হাফেয আবু তাহের সালাফী (রহ.) বর্ণনা করেন, খুলয়ী যখন একথা শুনলেন তখন তিনি এ দুআর মাধ্যমে তার মজলিসকে সমাপ্ত করে দেন।

اللهم ما مننت به فتممه وما انعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره

৪৪৮ হিজরীর শাউয়াল মাসে কাযী আবু তাহের সালাফী ইন্তেকাল করেন।

আল্লাম দামেরী (রহ.) বলেন, জিনদের এ ধরনের অভ্যাস থাকার কারণে কুরআন পাঠকারী মু'মিনদের দৃষ্টান্ত কাগজী লেবু দ্বারা দিতেন। কেননা কুরআন পাঠকারী মু'মিনের অন্তর থেকে শয়তান এভাবে পালায় যেভাবে সে স্থানে থেকে জিন পালিয়ে যায় যেখানে কাগজি লেবু রয়েছে। সুতরাং সমস্ত ফল ব্যতীত কাগজি লেবু দ্বারা উদাহরণ দেওয়াই উপযোগী।

মুস্তাদরাকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেন : একবার আমি মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর খেদমতে গেলাম, তখন তাঁর পাশে একজন অন্ধ ব্যক্তি বসা ছিল। তিনি তাকে বড় কাগজী লেবু কেটে কেটে মধুর সাথে খাওয়াচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি হলেন উম্মে মাকতুম (রাঃ), যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভর্ৎসনা করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য সূরা আবাসা) আলে মুহাম্মাদ অর্থাৎ আহলে বাইত-এর স্ত্রীগণ সদা-সর্বদা হযরত উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে সেবা যত্ন করতেন।

মু'জাম তারারানী-তে হাবীব ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) আবু কাবশা সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল কবুতর ও কাগজী লেবু দেখতে ভালবাসতেন। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'ফা' পরিচ্ছেদে সুলাইমান ইবনে মূসা-এর হাদীসে আসবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ঘরে স্বাধীন ঘোড়া রয়েছে সে ঘরে জিন প্রবেশ করে না।

স্বপ্নে জিন দেখলে তার ব্যাখ্যা

স্বপ্ন জিন দেখলে চালাক চতুর লোকের আলামত। কেননা, তারা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে চালাকি ও ধোকাবাজি করেছিল। কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, সে জিনদের সাথে কাজ করছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে লোক চালাক ও ধোকাবাজ লোকের সাথে ঝগড়া করবে। কেউ স্বপ্নে জিনকে কুরআন শরীফ পড়াতে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে অত্যন্ত সম্মানী ও ধন দৌলতের মালিক হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن

আবার জিনের ব্যাখ্যা চোর ডাকাত দ্বারাও দেওয়া হয়ে থাকে। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার ঘরে জিন প্রবেশ করেছে, তাহল তার উচিত সে যেন চোর থেকে নিজেকে হেফাযত করে। স্বপ্নে পাগল দেখলে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যদি দেখে সে নিজেই পাগল হয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে ধনী হবে। যেমন কোন কবি বলেন

جن له الدهر فتا الغنى يا ويحه ان عقل الدهر

"যামানা তাকে পাগল করে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতীতে তার ধন-সম্পদ মিলেছে। যদি যামানা কাকে জ্ঞান দিতে চাই তাহলে তা ভাল হবে না।"

কেউ কেউ বলেন, স্বপ্নে পাগল দেখলে সুদখোর হওয়ার লক্ষণ। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

الذين يأكلون الربو لا يقومون الا يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس

"যারা সুদ খায় তারা এমনভাবে দাঁড়াবে যেমন শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা যাদেরকে পাগল করে দিয়েছে।"

আবার কখনও কখনও জান্নাতে প্রবেশের দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী "কোন মহিলা দেখল সে পাগল হয়ে গিয়েছে এবং তাকে তাবীজের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়েছে– এর ব্যাখ্যা হবে সে গর্ভবতী হবে এবং তার গর্ভে যে সন্তান হবে সে চালাক চতুর হবে।

১৭৪. جنان البيوت (জিন্নাতুল বুয়ূত) ঘরে বসবাসকারী স্বর্প

جنان (জিন্নান) جان (জান্ন)-এর বহুবচন। ছোট হালকা পাতলা সাপ।

হাদীসে جان-এর আলোচনা

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ-এ হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। তবে যে সাপ লেজ কাটা এবং যার উপরের অংশে সাদা ডোরা এগুলো মারতে নিষেধ করেন নি। কেননা এসব সাপ চোখের জ্যোতি বিনষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।

ابتر (আবতার) ছোট লেজবিশিষ্ট সাপ। طفتيان (তাফতিয়ান) যার পিঠে দুটি ডোরা আছে। নজর বিন শামাইল বর্ণনা করেন : এটা হলুদ বর্ণের সাপ, এদের লেজ কাটা থাকে।

কিতাবুল হাশারাত গ্রন্থে ইবনে খালওয়াই লিখেছেন : আমি ইবনে আরফাহকে বলতে শুনেছি, জান্ন এমন সাপকে বলে যে চলার সময় মাথা উত্তোলন করে চলে। যেমন আরবী কবিতায় রয়েছে–

رفعن باليل اذا ما اسدفا اعناق جنان وهاما رجفا

রাতের বেলা যখন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সাপ তার গর্দান লম্বা করেছে।

১৭৫. الجند بادستر (আল-জুনদ বাদিসতার) একটি জলজ প্রাণী

কুকুরের মত এক ধরনের জলজ প্রাণী। শুধু শহর এলাকাতেই পাওয়া যাই। এটাকে قندر (কুনদার) সামুদ্রিক কুকুর এবং سمور (সামুর) (খেকশিয়ালের মত বরফা'লের এক প্রকার প্রাণী)-ও বলা হয়। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'ক্বাফ' পরিচ্ছেদে আসবে।

মোটামুটি আলোচনা হল, এটা শিয়ালের মত কাজল রঙ্গের হয়ে থাকে। এর মোটেই হাত নেই; তবে পায়ের নলি আছে। লম্বা লেজ বিশিষ্ট। এর মাথা মানুষের মত ও মুখমণ্ডল গোলাকার। হাত না থাকায় বুকের সাহায্যে ছেচড়িয়ে চলা ফেরা করে। এতে বুঝা যায়, সাধারণত এ প্রাণী চতুস্পদ জন্তুর মত চার হাত পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করে। সবচাইতে মজার বিষয় হল, এ প্রাণীর চারটি অণ্ডকোষ চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভুত উপকারী। শিকারীরা এ অণ্ডকোষের জন্যই এটাকে শিকার করে। সে যখন বুঝতে পারে যে, শিকারী তাকে জালে আটকানোর চেষ্টা করছে, তখনই সে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যখন বুঝতে

পারে যে, শিকারী তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং এখন পালানো কঠিন এবং শিকারীর জালে আটক হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই, তখন সে প্রকাশমান দুটি অণ্ডকোষ দাঁতের সাহায্যে কেটে শিকারীর দিকে নিক্ষেপ করে এবং তার প্রাণ বাঁচায়। কেননা, শিকারীর শুধু এ দুটি অণ্ডকোষের প্রয়োজন। কিন্তু যদি শিকারীর দৃষ্টি কর্তিত অণ্ডকোষের দিকে না পড়ে প্রাণীটির দিকেই পড়ে তাহলে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। যাতে শিকারী তাকে ছেড়ে দেয়। অতঃপর সে প্রকাশ্য দুইটি কর্তিত অণ্ডকোষের স্থানে লুকায়িত অণ্ডকোষ দুটি নিয়ে আসে। কর্তিত অণ্ডকোষের ভিতরের অংশ রক্তের মত অথবা মধুর মত। এটাকে শুকিয়ে নিলে এর ভিতর থেকে সুঘ্রাণ বের হয়। এ জলজ প্রাণীটি পানিতে ডুবে গিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করতে পারে। আবার কিছুক্ষণ পর বের হয়ে আসে। সে এতই শক্তিশালী যে, সমস্ত জীবনই পানিতে কাটাতে পারে আবার ডাঙ্গাতেও পারে। তবে সাধারণত পানিতেই বসবাস করে। মাছ ও কাঁকড়া তার খাদ্য।

চিকিৎসায় উপকারিতা

এর অণ্ডকোষ অতীব উপকারী। বাঘের কামড়ানোর ফলে মানুষের শরীরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এ ক্ষত ভাল হওয়ার জন্য এর অণ্ডকোষ অত্যন্ত উপকারী। অন্যান্য রোগের জন্যও বেশ ফলদায়ক। যেমন শারীরিক শীতলতাকে উষ্ণ করে। আর্দ্রতাকে শুকনা করে। মোটকথা, সকল রোগের জন্যই এটা মহৌষধ। বড় কথা হল, মানুষের কোন অঙ্গের জন্য এটা ক্ষতিকারক নয়। বিচ্ছু কাটার স্থানে ঘষলে উপকার পাওয়া যায়। মৃগি রোগীর জন্য এ অণ্ডকোষ তৈলের সাথে মিশিয়ে মাথায় ঘষলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থানে এ অণ্ডকোষ ঘষলে নিঃসন্দেহে এর দ্বারা উপকার হয়। যেকোন ধরনের কফ, কাশি হোক না কোন তা শেষ করে দেয়। এর চামড়া মোটা চুল বিশিষ্ট হয়। এর সাহায্যে পালক যুক্ত পোশাক তৈরি হয়। অভিজাত ব্যক্তিগণ তা ব্যবহার করে। পক্ষাঘাত রোগীর জন্য এর গোশত বেশ উপকারী এবং আদ্র রোগীর জন্যও।

১৭৬. الجنين (জানীন) গর্ভস্থ অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা

যবেহকৃত পশুর পেটে যে বাচ্চা পাওয়া যায় তাকে 'জানীন' বলে।

জানীন তথা অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার শরঈ বিধান

যবেহকৃত হালাল প্রাণীর পেটের বাচ্চা যদি মৃত বের হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে তা হালাল ও পবিত্র এবং খাওয়া জায়িয। যেমন ইমাম মাদরেদী (রহ.) ওই মাসয়ালা 'আল-হাভী' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর এ মত একদল ফকীহ যেমন- ইমাম মালেক, আওযায়ী, সাওরী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ

ইসহাক এবং ইমাম আহমাদ (রহ.) প্রমুখ সমর্থন করেছেন। শুধু ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) এই মাসয়ালার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, এটা খাওয়া হারাম। তাঁর অভিমতের পক্ষে দলীল আল্লাহর বাণী :

حرمت عليكم الميتة والدم

"হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী ও রক্ত।" (সূরা মায়িদা : ৩)

এছাড়া হাদীস শরীফে রয়েছে–

احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال

"আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে দুটি মৃত প্রাণী এবং দুটি রক্ত। মৃত দুটি হল, মাছ ও পঙ্গপাল; রক্ত দুটি যকৃত ও প্লীহা।

হাদীসে দুটি মৃত হালাল করা হয়েছে তাহল মাছ ও টিড্ডি। সুতরাং তৃতীয়টি কীভাবে হালাল হবে? জমহূর উলামায়ে কেরামের দলিল হল পবিত্র কুরআনে এ আয়াতে–

احلت لكم بهيمة الانعام

"তোমাদের জন্য হালাল করা হল চতুষ্পদ জন্তু।" (সূরা মায়িদা : ১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : 'বাহীমাতুল আন'আম' এমন বাচ্চাকে বলা হয়, যাদেরকে মায়ের পেটেই মৃত পাওয়া যায়। এদের মায়ের হালাল হওয়ার কারণেই এদের খাওয়া জায়িয। জমহুর উলামায়ে কেরামের দলীল নিম্নের হাদীস– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "মায়ের গর্ভস্থ বাচ্চার পবিত্রতা মায়ের পবিত্রতা ও হালালের কারণ।" যদি কেউ এ বিষয়ে আপত্তি করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল সাদৃশ্যতা আলোচনা করা, আর হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মও তাই অর্থাৎ মায়ের জবাই-ই বাচ্চার জবাই। কেননা বাচ্চার জবাই মায়ের জবাইর পূর্বগামী। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হয় স্থলাভিত্তিক জবাই বর্ণনা করা তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের জবাইকে বাচ্চা জবাইর উপর প্রাধান্য দিতেন।

ইমাম মাদরিদী (রহ.) এ আপত্তির তিনটি জবাব দিয়েছেন–

(১) 'জানীন' শব্দের সম্পর্ক শুধু তখন পর্যন্তই হবে, যখন মায়ের জঠরে অবস্থান করে। জঠর থেকে পৃথক হওয়ার পর এই নাম আর থাকবে না; এর নাম হবে ওয়ালাদ—সন্তান। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী : واذ انتم اجنة فى بطون

امهتكم "আর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ রূপে ছিলে" (সূরা নাজম : ৩২) মায়ের জঠরে থাকা বাচ্চারর উপর ক্ষমতা থাকে না। তাহলে বুঝা গেলে, উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য স্থলাভিত্তিক বর্ণনা করা; সাদৃশ্য উদ্দেশ্য নয়।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য যদি সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়, তাহলে মা ও বাচ্চা সবই এক সমান হয়ে যায়। মায়ের সাথে সাদৃশ্য নির্দিষ্ট করতে কোন উপকার হবে না।

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য যদি সাদৃশ্যই বর্ণনা করা হত, তাহলে তিনি امّ ؛ ؛ ؛

অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার তিন অবস্থা

প্রথমত পূর্ণাঙ্গ হবে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয়ত রক্তের পিণ্ড, এটা অখাদ্য। কেননা রক্ত হারাম। তৃতীয়ত গোশতের পিণ্ড, যা এখনও আকৃতি ধারণ করে নি। তা হালাল হওয়ার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তার দুই অবস্থা–

(১) যদি এর ভিতর আত্মা থাকে, তাহলে হালাল, অন্যথায় হারাম। দেখতে হবে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার মধ্যে আত্মা আছে কি না। অবশ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যদি তা জীবিত থাকে, তাহলে তা জবাই করা ব্যতীত খাওয়া জায়িয নয়। যদি বাচ্চার শুধু মাথা হয়েছে এমন অবস্থায় মাকে জবাই করা হয়েছে, তাহলে কাযী ও বাগাভী (রহ.) বলেন, জবাই ব্যতীত তা হালাল হবে না। কাফাল বলেন, জবাই ব্যতীত খাওয়া জায়িয। কেননা বাচ্চার কোন অংশের জন্মের সময় বের হয়ে এমনই যে, তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। 'রাওয়া' নামক কিতাবে আছে, কাফাল এর অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য।

ইবনে খাল্লিকান তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন : ইমাম আবু বকর কুরতুবী (রহ.) অধিকাংশ সময় এই কবিতা পড়তেন—

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

ভাগ্যের লিখনী চলল, এ বিষয়ে যা অবশ্য ঘটবে। আর অবস্থা যখন এমনই তাহলে নড়াচড়া ও স্থির থাকা একই কথা অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করি বা না করি ফলাফল নিশ্চিতভাবে ভাগ্যের অনুগামী হয়।

جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق فى غشاوته الجنين

এটা তোমার নির্বুদ্ধিতা যে, তুমি এটা অনুধাবন করেছ যে, জীবিকা অর্জন মেহনত ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। অথচ দেখ আল্লাহ্ তাআলা মায়ের জঠরে স্থিত গর্ভকেও জীবিকা দিয়ে থাকেন। অথচ সে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার কোন চেষ্টা তদবীরই ছিল না।

১৭৭. جهبر (তাহবার) বাঘিনী

جهبر (জাহবার) جعفر (জা'ফর) ওযনে। এর বিস্ময়কর গুণ হল, বাঘিনীর যখন বাচ্চা প্রসবের সময় হয় তখন সে ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে নেয়, যার ফলে তার প্রসব সহজতর হয়। যখন বাঘিনী বাচ্চা প্রসব করে তখন সে একটি গোশতের টুকরা প্রসব করে। সে তার বাচ্চাকে পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এদিক-সেদিক নিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কখনও কখনও পিঁপড়ার ভয়ে তার বাচ্চাকেও ভুলে যায়। এ সময়ে হায়েনা বাচ্চাগুলোকে দুধ পান করায়। এ কারণে তার নির্বুদ্ধিতা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। আরবগণ বলেন– احمق

من جهير "অমুক ব্যক্তি বাঘিনীর চেয়েও বোকা।" نباش نعش الكبرى "সাত তারকা যা উত্তর দিগন্তে উদিত হয় এবং এগুলোর নিকটবর্তী আরও সাতটি তারকা রয়েছে যাদেরকে نباش نعش الكبرى বলা হয়।

১৭৮. الجواد (আল-জাওয়াদ) উন্নত জাতের ঘোড়া

আল-জাওয়াদ তীব্র গতি সম্পন্ন উন্নত জাতের ঘোড়াকে বলে। জাওয়াদ অর্থ হল উন্নত, উত্তম। যেহেতু এ ধরনের ঘোড়ার চলার গতি অতি তীব্র তাই তাকে জাওয়াদ বলা হয়। কবি বলেন : نمته جواد لا يباع جنية এমন এক উন্নত জাতের ঘোরা যার সুন্দর জাতের কারণে বাচ্চা বিক্রয় করা যায় না।

جواد-এর বহুবচন جود ও جياد হয়ে থাকে। যেমন, ثوب ও ثياب এবং اجياد (আজইয়াদ) মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। যেহেতু পাহাড়টি ঘোড়া আকারের স্থান। এ ভিত্তিতে এটাকে 'আজইয়াদ' বলা হয়। ইহার অপর নাম قعيقعان (কায়ীকায়ান)।

হাদীসে জাওয়াদ-এর ব্যাখ্যা

জাফর গুরইয়ানী (রহ.) তার কিতাব 'ফাযলুয যিকর'-এ হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : "আমি ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিকর করি। আমার এই আমল আল্লাহর রাস্তায় শ্রেষ্ঠ জাতের ঘোড়ায় ভ্রমণের চেয়ে প্রিয়তর।"

নাসাঈ, হাকেম, ইবনে সুন্নী ও বুখারী সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি (মসজিদে নববীতে) নামায পড়তে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও নামায পড়ছিলেন। লোকটি প্রথম কাতারে গিয়ে এই দুআ করতে লাগল যে, হে আল্লাহ! আপনি যা আপনার নেক বান্দাদেরকে দাঁন করেন তার মম্যে উত্তম বস্তু আমাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায সমাপ্তিতে বললেন : এই দুআ কে করেছিল? লোকটি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তোমার উত্তম ঘোরা মেরে ফেলা হয় এবং তুমিও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে অর্থাৎ জিহাদের পরই তুমি শ্রেষ্ঠ মালের অধিকারী হতে পার।

সুনানে ইবনে মাজায় আমর ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রেষ্ঠ জিহাদ কোনটি? তিনি

বললেন, যে যুদ্ধে মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং তার বাহন ধ্বংস করা হয়েছে।

ইবনে যু'ফারের 'নাসইহ' নামক গ্রন্থে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর দাসী থেকে বর্ণিত : (যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হে যায়িদাহ!—তোমার ভাগ্য ভাল' বলে ডাকতেন) একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে হাজির হয়ে বললাম, আমি আমার মালিকের জন্য আটা পিষে জ্বালানি কাঠ আনতে যাই। এমন সময় আমি উত্তম চেহারার এবং উত্তম পোশাকের একজন ঘোড় সওয়ার দেখলাম। ইতোপূর্বে অমি এমন সুন্দর, সুশ্রী লোক আর কখনও দেখি নি। আর না তার চেয়ে উন্নত মানের সুগন্ধিময় ব্যক্তি আমার পাশে এসেছে। তিনি আমাকে সালাম করেন। তার মন মেজাজ অতি নিকট জনের মত। আমি বললাম, সব ঠিকঠাক আছে। লোকটি আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ, তিনি ভাল আছেন। তিনি লোকদের আল্লাহর আযাব থেকে ভয় দেখান। লোকটি বলে, হে যায়েদা! তুমি যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাবে, তখন তাঁকে বলবে যে, জান্নাতের কোষাধক্ষ রিজওয়ান আপনাকে সালাম দিয়েছে। আর এ সংবাদটুকু দিও যে, আপনার আগমনে আমি যত আনন্দিত হয়েছি অন্য কারও ব্যাপারে এত আনন্দিত হয় নি। আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতকে তিনটি দলে বিভক্ত করেছেন। একদল বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। দ্বিতীয় দল হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে যাবে। আর তৃতীয় দলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ প্রয়োজন হবে। এরপর তারা জান্নাতে যাবে।

লোকটি চলে যেতে লাগলেন এবং আমি আমার লাকড়ীর বোঝা উঠাতে লাগলাম। আমার কাছে বোঝাটি খুব ভারী মনে হল। লোকটি তা দেখে আমাকে বলতে লাগলেন, কি খুব ভারী মনে হচ্ছে বুঝি? অমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, বোঝাটি আসলেই একটু ভারি মনে হচ্ছে। এরপর তার হাতে থাকা একটি লাল ছড়ি দ্বারা বোঝাটিতে টোকা দিলেন এবং তা উঠিয়ে পাশে থাকা একটি পাথরের উপর রেখে পাথরকে আদেশ করলেন, হে পাথর, এ বোঝাটি নিয়ে চল তো। সুতরাং আদেশ মত পাথরটি বোঝা নিয়ে আমার আগে আগে যেতে লাগল। অবশেষে আমি আপনার নিকট আসলাম।

এ ঘটনা এবং জান্নাতের কোষাধক্ষ রিদওয়ানের সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুকরিয়ার সিজদাহ আদায় করলেন এবং আল্লাহ তাআলার অশেষ গুণকীর্তন করলেন। হামদ ও সানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, চল পাথরটি দেখে আসি।

এ মর্মে আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন। তিনি বলেন, একজন ইয়ামানী লোক হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, অমুক ইয়াহুদী আলেম আমাকে আপনার কাছে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেছেন। হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) পত্রটি গ্রহণ করলেন। ইয়ামানী লোকটি তার কাছে বলল, ইয়াহুদী আলেম লোকটি এও জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক নেই বা ছিল না, যাকে তোমরা অনুসরণ করতে? তোমরা পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্ম গ্রহণ করেছ? হযরত কাব আহবার (রাঃ) তাকে বললেন, আমাকে কি আমার পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরাতে চাও নাকি? লোকটি হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। কা'ব আহবার তাকে বলল, তুমি যখন তার কাছে যাবে তখন বলবে, সে সত্তার কসম দিয়ে তোমার নিকট জানতে চায় যে সত্তা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাগর শুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে সত্তার কসম দিয়ে যিনি হযরত মূসা ইবনে ইমরানকে মসনদে বসিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে কি তা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে তিন দল হবে। এক দল বিনা হিসেবে জান্নাতে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় দল থেকে স্বাভাবিক হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পরে জান্নাতে পাঠানো হবে। তৃতীয় দল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশে জান্নাতে যাবে? যখন তুমি তাকে এ প্রশ্ন করবে, তখন সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিবে। তাকে বলবে যে, কা'ব বলেছেন, আমাকে এ তিন দলের যেকোন এক দলের অন্তর্ভূক্ত করে দিতে।

একটি ঘটনা

মুহাম্মাদ বিন যু'কার "খাইরিল বাশার বি খাইরিল বাশার" নামক গ্রন্থে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে। বাদশাহ মারসাদ ইবনে আবদ কালাল যুদ্ধে জয়লাভ করে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সে বিজয়ের মোবরকবাদ জানানোর জন্য আরবের জ্ঞানী-গুণী, অভিজাত ও কবি-সাহিত্যিকগণ প্রতিনিধি আকারে তার দরবারে আগমন করেন। এতে বাদশাহ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে অশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে অনেক উপহারও প্রদান করলেন। এমনকি প্রতিনিধি দল ও তাঁর মধ্যে পর্দাও উঠিয়ে দেন অর্থাৎ তাদেরকে বাদশাহের দরবারে স্থান দেন।

এমতাবস্থায় বাদশাহ একদিন এক ভীতিজনকে স্বপ্ন দেখলেন। যেই কারণে বাদশাহ অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে গেলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর বাদশাহ স্বপ্নটি ভুলে গেলেন। এতে বাদশাহ খুব অনুশোচনা করলেন। তার হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি হয়ে গেল। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ চিন্তায় পরিবর্তিত হল। চিন্তার কারণে বাদশাহ এতই ভেঙ্গে পড়লেন যে, আগত

প্রতিনিধি দল থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। বাদশাহর এ আচরণ প্রতিনিধি দলের কাছে ভাল লাগে নি এবং আরবের অভিজাত লোকেরা এ অমনোযোগে অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হলেন। বাদশাহ সকল গণকদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কী স্বপ্ন দেখেছি তা বর্ণনা কর। তারা সকলেই অপরাগতা প্রকাশ করল। গণকদের এ অপারাগতায় বাদশাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তার রাত্রের ঘুম উড়ে গেল। বাদশাহর মা ছিলেন একজন গণক মহিলা। তিনি বাদশাহকে বললেন, হে বাদশাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ ধরনের পরিণতি থেকে রক্ষা করুন যা ধ্বংসের উপযোগী। গণক মহিলাদেরকে ডেকে তাদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার। তাদের অনুগত শয়তান নিপুন সমঝদার হয়ে থাকে। মনে হয় তারা তোমার অন্তরের রোগের চিকিৎসা করতে পারে। মায়ের কথা মত বাদশাহ সকল গণক মহিলাদের একত্রিত করলেন। তাদের নিকট সেই একই প্রশ্ন যা পুরুষ গণকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তারা অপারগতা প্রকাশ করলে বাদশাহ সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেলেন।

এরপর বাদশাহ একদিন শিকারের জন্য বের হলেন। বাদশাহ শিকারে এতই নিমগ্ন হয়ে পড়লেন যে তিনি তার সঙ্গী সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন। জঙ্গলে বাদশাহ যখন প্রচণ্ড গরমে ঝলসে যেতে লাগলেন এবং শাহী মহলে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন তখন হঠাৎ করে এক বৃদ্ধা বাদশাহকে স্বাগতম জানালেন এবং সব ধরনের শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিল। বাদশাহ ঘোড়া থেকে অবতরণ করে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঝলসে যাওয়া গরম থেকে এমনই প্রশান্তি পাইলেন যে, বাদশাহ শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বাদশাহ তার পাশে একজন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী মহিলা দেখলেন। যুবতীটি ছিল রূপ-লাবণ্যে অনন্যা। যুবতী যথারীতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসা করল, হে বাদশাহ নামদার! সারাদিন ভ্রমণানন্দের কারণে সম্ভবত আপনার ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খেয়ে নিন। অপরিচিতা যুবতীর এ অন্তরঙ্গ কথা শুরে বাদশার অন্তরে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মহিলা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বাদশাহ সালামত! আপনার উপর ও আপনার মহান ব্যক্তিত্বে সমগ্র দুনিয়া উৎসর্গ হোক। আপনার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে। একথা বলে মহিলা যা নিয়ে এসেছিল তা বাদশাহ সম্মুখে উপস্থিত করল। যাতে ছিল সারীদ, শুকনা গোশতের টুকরা এবং লেবু ইত্যাদি। সে নিজে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে গেল। বাদশার তৃপ্তিসহকারে খেলেন। এরপর মহিলা বাদশাহর সম্মুখে উত্তম দুধ পরিবেশন করলে বাদশার তার অভ্যাস মত দুধ পান করলেন এবং মহিলাটির বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে এই যুবতী মহিলার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য বাদশাহর হৃদয়ে বসে গেল। বাদশাহ

তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী? বালিকা জবাব দিল- আমার নাম আফিরা। বাদশাহ বললেন, হে আফিরা! তুমি যেই বাদশাহর কথা বললে সে কোন বাদশাহ? বালিকা বলল, আমার উদ্দেশ্য মারসাদ ইবনে আবদ কালাল। যিনি আমার সামনে সসম্মানে সগৌরবে রয়েছেন। যিনি আমার নিকট অতি সুন্দর ও মোহনীয়। যিনি একটি অতি জটিল ব্যাপারে গণকদেরকে আহ্বান করেছেন। আর গণকেরা এর সমধানে অপারগতা প্রকাশ করে। বাদশাহ বললেন, তুমি কি সে ক্ষুদ্র বিষয়টি জান? বালিকা হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে বলল, তা একটি স্বপ্ন। বাদশাহ বালিকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি সত্যই বলেছ। বলত স্বপ্নে আমি কী দেখেছিলাম? বালিকা বাদশাহর পূর্ণ স্বপ্ন বর্ণনা করল। আপনি এ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, অন্ধকার দ্রুত বেগে চলছে এবং ঘূর্ণিবায়ু একটির পশ্চাতে আরেকটি দৌড়াচ্ছে। পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে একটি নদী। কেউ একজন দাঁড়িয়ে ঘণ্টার আওয়াজের মত বলছে : নদীর ঘাটে চলে আস। যে ব্যক্তি নদী থেকে পানি পান করল সে পরিতৃপ্ত হল, আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করল সে ডুবে মারা গেল।

তা শুনে বাদশাহ বললেন, এটা ছিল আমার স্বপ্ন। এটাই তো আমি দেখেছিলাম হে আফিরাহ! এখন এর ব্যাখ্যা কর। বালিকা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে আরম্ভ করল। ঘূর্ণিঝড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইয়ামানের বাদশাহ। নদী দ্বারা উদ্দেশ্য জ্ঞান, আর সাহায্যকারী হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নদী থেকে পানকারীগণ হলেন নেককার লোক। অস্বীকারকারীরা হল ঝগড়াটে দুশমন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ আফিরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ নবী কি নিরাপত্তা ও শান্তি সম্প্রসারিত করবে নাকি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকবে? আফিরা জবাব দিল, আল্লাহর কসম! এই নবী শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ নিয়ে আগমন করবেন এবং দুনিয়া থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-ফাসাদ উৎখাত করবেন এবং দাসদাসীদের মুক্ত করবেন।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি মানুষকে কোন জিনিসের প্রতি আহ্বান করবেন? আফিরা বলল, তিনি মানুষকে নামায, রোযার দাওয়াত দেবেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে উৎসাহিত করবেন। তিনি মূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দেবেন এবং তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয়কে নিরর্থক সাব্যস্ত করবেন। বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন গোত্রে জন্ম গ্রহণ করবেন? আফিরা বলল, তিনি মুযার ইবনে নযর-এর গোত্রে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর সে গোত্রের সুনাম ও সুখ্যাতি তার কারণেই হবে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তার গোত্র যখন আক্রান্ত হবে তখন কে তার সাহায্য করবে। আফিরা জবাব দিল তাদের সাহায্যকারী হবে পাখি আর তারা উন্নতমানের জিহাদ করবে। আর এদের দ্বারাই

কুফরের মাঝে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে এবং নবীর পক্ষকে পূর্ণ সাহায্য করা হবে। আফিরার এসব জবাব শুনে বাদশাহ তাকে বিবাহ করার চিন্তা করতে লাগলেন। আফিরা বলল, আমি আপনাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নই। কারণ আমার অনুগত ব্যক্তিকে অতি লজ্জাশীল হওয়া চাই এবং আমার বিষয়ে চূড়ান্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। আমাকে যে ব্যক্তি ভালবাসবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথা শুনে বাদশা দাঁড়িয়ে আরোহণ করার জন্য তার বাহনের দিকে চললেন এবং আরোহণ করে নিজ মহলে ফিরে আসলেন। মহলে আসার পর বাদশাহ আফিরার জন্য একশত উট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রেরণ করলেন।

বখতে নসরের ব্যাপারে অনুরূপ একটি ঘটনা আছে যে, তিনি স্বপ্ন দেখে ভুলে যান, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সুসংবাদ ছিল। বখতে নসর সে সময় স্বপ্ন দেখেন যে, যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে বনী ইসরাঈলের অনেক লোক বন্দী করেছিলেন এবং বন্দীদের মধ্য থেকে তিনি তার সেবার জন্য ১০০০ (এক হাজার) শিশুকে রেখে দেন। এদের মধ্যে হযরত দানিয়াল (আঃ)-ও ছিলেন।

বখতে নসর স্বপ্ন দেখে ভুলে যান। এর ব্যাখ্যার জন্য তিনি গণক ও জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তারা বলল, স্বপ্নটি আপনি বললেই কেবল আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারি। বখতে নসর বলল, আমি তো স্বপ্ন ভুলে গিয়েছি। যদি তোমরা আমার স্বপ্নের কথা বলতে না পার তবে আমি ধরে নিব যে, মৃত্যু তোমাদের মাথার উপর।

বখতে নসরের ধমকিতে গণক ও জ্যোতিষীগণ ভীত হয়ে গেল। ভয়ে তারা সেখান থেকে সরে পড়ল। পরবর্তীতে তাদের মধ্যকার একজন বখতে নসরকে সংবাদ দিল যে, আমাদের জানা মতে ইসরাঈলী বালকদের মধ্যে দানিয়াল নামক এক বালক রয়েছে, যে বালক আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে বলে দিতে পারে। বখতে নসর দানিয়েল (আঃ)-কে হাজির করার নির্দেশ দিলেন এবং তার কাছে স্বপ্নটি জানতে চাইলেন। দানিয়াল বলল, বাদশাহ! আমাকে তিন দিনের সুযোগ দিলে আমি আমার প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে জেনে আপনাকে বলতে পারি। বখতে নসর হযরত দানিয়াল (আঃ)-কে সুযোগ দিলেন। হযরত দানিয়াল (আঃ) নামাযান্তে দুআয় নিমগ্ন হলেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাকে স্বপ্নটি এবং তার ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন।

হযরত দানিয়াল (আঃ) বখতে নসরের দরবারে আসলেন এবং এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন। হযরত বললেন, বাদশাহ নামদার! আপনি স্বপ্নে দেখেছেন একটি পাথর মূর্তি এবং তার হাত পা মাটির তৈরি। তাতে পিতলও আছে। এর পেট রৌপ্যের এবং বক্ষ স্বর্ণের। মূর্তির ঘাড় ও মাথা লৌহ নির্মিত। হে বাদশাহ!

আপনি সে মূর্তিটি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যান। বখতে নসর বললেন আপনি সত্যই বলেছেন। হযরত দানিয়াল (আঃ) বললেন, এ মূর্তিটির উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। এরপর পাথরটি এত বড় হয়ে যায় যে, সমগ্র জগতে তার প্রসার ঘটে। হযরত দানিয়াল (আঃ) বললেন-হে বাদশাহ! এই ছিল আপনার স্বপ্ন যা আপনি ভুলে গিয়েছেন। বখতে নসর বললেন, এর ব্যাখ্যা কী? হযরত দানিয়াল (আঃ) বললেন, পাথরের মূর্তি যা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন তা দুনিয়ার বাদশাহ। দুনিয়ার কতিপয় বাদশাহ ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী আর কতেক হয় দুর্বল। মূর্তিটির হস্তপদ যা মাটি দ্বারা নির্মিত দেখেছেন তা দুর্বল বাদশাহ। আর যে অংশ পিতল ও লোহার দেখেছেন তা শক্তিশালী বাদশাহ। আর স্বর্ণের যে অংশ দেখেছেন তাহল শক্তিশালী সম্মানিত বাদশাহর মর্ম।

তারপর সেই মূর্তিটির উপর যে পাথরটি এসে পড়েছে তা হচ্ছে শেষ যুগের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি সমস্ত পৃথিবীকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে আহ্বান করবেন। যার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনিত দ্বীনে সারা বিশ্বময় আলোকিত হয়ে যাবে। আর জগতের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। আর দুনিয়ার স্থায়ীত্ব পর্যন্ত তাঁর শরীয়তের উপর মানুষ আমল করতে থাকবে। এইসব শুনে বখতে নসর অতি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং দানিয়াল (আঃ)-এর মান-সম্মান তার অন্তরে অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান ইবনে কারইয়ার জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন, (যার প্রকৃত নাম আইয়ূব ইবনে যায়েদ ইবনে কারিয়া ছিল এবং বেদুইন হওয়ায় হাজ্জাজের দরবারে অতি নিকট জনদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন)। হাজ্জাজ ইবনে কারিয়াকে আবদুর রহমান ইবনে আশয়াস ইবনে কিন্দির নিকট প্রেরণ করেন। যখন আবদুর রহমান ইবনে আশয়াস খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের বিরুদ্ধে বের হয়েছিলেন এবং খলীফাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি জনগণকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। সুতরা ইবনে কারিয়া তার কাছে পৌছলেন এবং তিনি বললেন, তুমি খলীফা আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিবে এবং তার কর্তৃত্ব অস্বীকার করবে এবং হাজ্জাজকে হত্যা করবে। অন্যথায় আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।

সুতরাং ইবনে কারিয়া আবদুর রহমান এর নির্দেশ মোতাবেক তাই করল। এতে আবদুর রহমান আশয়াছের প্রিয়পাত্র হয়ে গেল। যখন আবদুর রহমান ইবনে আশয়াস হাজ্জাজের মুকাবিলায় যুদ্ধে নিহত হল, তখন ইবনে কারিয়াকে হাজ্জাজের কাছে বন্দী অবস্থায় নেওয়া হল। হাজ্জাজ তখন তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল যার সংক্ষিপ্তকারে জবাব দিয়েছিলেন যে, ইরাকীরা সত্য-মিথ্যা খুব ভাল

করে বুঝে। হেজাজবাসীরা ফিতনা-ফাসাদে অগ্রগামী। আর তারা ফিতনা ফাসাদে সিদ্ধহস্ত। ইয়ামানবাসীরা নিজেদের শাসকবর্গের অত্যন্ত আনুগত্য করে। আর মিসরীয়রা শক্তির গোলাম। ইয়ামানবাসীরা আনুগত্যশীল হয়। ভারত ভূমির দরিয়াতে রয়েছে মূতি এবং তার পাহাড়ে রয়েছে ইয়াকুত পাথর। ভারতে আরও রয়েছে মূল্যবান 'উদ' বৃক্ষ। বৃক্ষের পত্রসমূহ আতর। ইয়ামান দেশ হল আরবের উৎকৃষ্ট অংশ এবং তারাই হল আরবের মূল বংশধর। মক্কা মুয়াযযমা হল উৎকৃষ্ট আলেমগণের আবাসভূমি, আর সেখানকার রমণীগণ উৎকৃষ্ট পোশাকধারিণী। আর মদিনা মুনাওয়ারা হল জ্ঞানের উৎসস্থল ও প্রস্রবণ। বসরার ঠাণ্ডা গরমে কঠোরতা বিদ্যমান। সেখানকার পানি লবণাক্ত এবং যুদ্ধ মীমাংসামূলক। কূফা সাগর উষ্ণতার জন্য প্রসিদ্ধ এবং শীতলতার জন্য বদনামযুক্ত। আর সিরিয়া হামাহ ও নিকতাহ-এর মধ্যবর্তী দরজা।

হাজ্জাজ ইবনে কারিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, হামাহ ও কিনতাহ-এর মর্ম কী? আবদুর রহমান ইবনে আশয়াস বলল, বসরা ও কুফা পরস্পরের দুশমন। এ দু' দেশের মাঝখানে দজলা ও ফোরাত নদী প্রবাহিত যা মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতীক। ইবনে কারিয়াহ তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে বলল : প্রত্যেক উন্নত ও উত্তম জিনিসের মুকাবেলায় নিস্ফল ও কর্মহীন জিনিস রয়েছে। যেমন, বীরত্বের তুলনায় ভীরুতা, জ্ঞানের মুকাবেলায় অজ্ঞতা।

হাজ্জাজ বলল, আরবগণ বলে থাকে প্রত্যেক বস্তুর জন্যই বিপদ ও ধ্বংস রয়েছে। ইবনে কারিয়াহ বলল, তারা সঠিক বলেছে। সহনশীলতার বিপদ হল ক্রোধ। আকল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিপদ হল অহংকার। বীরত্বের বিপদ হল বিদ্রোহ করা। ধন-সম্পদের বিপদ হল, নিকৃষ্ট প্রচেষ্টা। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিপদ হল, পৌরষত্বের অভাব। ভদ্র লোকের বিপদ হল, নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিবেশী। জ্ঞানের বিপদ হল ভুলে যাওয়া। দানশীলতার বিপদ হল, অপব্যয়।

এরপর হাজ্জাজ ইবনে কারিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, হাজ্জাজের বিপদ কী? ইবনে কারিয়া বলল, যার বংশকুল ভাল তার কোন বিপদ নেই। যার সন্তান-সন্ত তি ভাল তারও কোন বিপদ নেই। হাজ্জাজ বলল, এখন তোমার কুকর্মের খতিয়ান প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং তোমার মুনাফিকী প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। যখন হাজ্জাজ ইবনে কারিয়াকে নিহত দেখল, তখন তার কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, ৮৪ হিজরীতে ইবনে কারিয়াকে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ 'গায়াতুল আদব ফী কালামে হুকামায়িল আরব' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

"ইবতিলায়িল আখইয়ার বিন-নিসায়িল আশরার" গ্রন্থের রচয়িতা একটি উত্তম ঘোড়া আবু মুসলিম খুরাসানীর খেদমতে পেশ করেন। আবু মুসলিম তার

বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘোড়া কী কাজে ব্যবহৃত হয়? তারা বলল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কাজে। আবু মুসলিম বললেন, না তা নয়। সাথীরা বলল, তাহলে শত্রুকে অন্বেষণে সহায়তার জন্য। এবারও আবু মুসলিম অস্বীকার করলেন। তখন সাথীরা বলল, তাহলে আপনিই বলুন ঘোড়া কী কাজে ব্যবহৃত হয়? তিনি জবাব দিলেন, চরিত্রহীন নারী ও প্রতিবেশীর কবল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কাজে।

লেখক বলেন, শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্পন্ন ঘোড়া হল সাফিনাত। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর গুণাবলীর বর্ণনা করে বলেছেন– اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد "যখন অপরাহ্নে তার (সুলাইমানের) সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩১)

মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন : হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর এক হাজার ঘোড়াকে শুধু নামায হারানোর কারণে জবাই করেছিলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন অর্থাৎ উদ্যম বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন, যা সকাল ও সন্ধ্যায় এক মাসের সফরের রাস্তা অতিক্রম করত।

হযরত আবু কাতাদা ও আবু দাহমা (রাঃ) যারা বেশি বেশি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতেন, তারা বলেন, আমাদের নিকট একজন মরুচারী বেদুইন এসে এ হাদীস বর্ণনা করলে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। এগুলোর মধ্যে একটি হল, আল্লাহকে ভয় করে যদি কোন জিনিস ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেন।"

আল্লামা নু'মানী (রহ.) এ হাদীসের সঠিক তথ্য বের করেছেন। হযরত আবু দাহমার প্রকৃত নাম কুরফা ইবনে বুহাইস। ইমাম বুখারী (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ঘোড়াগুলো বধ করেছিলেন।

ইমাম সা'লাবী (রহ.) বলেন, ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। হযরত আবু তালহা (রাঃ) নামায ফওত হওয়ার ক্ষতিপূরণস্বরূপ স্বীয় বাগান সদকা করেছিলেন। তিনি একটি পাখি দেখার কাজে নিমগ্ন হয়েছিলেন যে কারণে তার নামায ফওত হয়ে গিয়েছিল। সাফিনাত এমন ঘোড়াকে বলে, যে ঘোড়া তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং চতুর্থ পা শুধু মাটিতে স্পর্শ করে থাকে।

কবি বলেন : "উত্তম জাতের ঘোড়া যা বাঁধা অবস্থায় তিন পায়ের উপর ভর করে ঠায় দাঁড়িযে থাকে, যা তার উন্নত জাতের লক্ষণ।" আরবগণ ঘোড়াকে তার শিষ্টতা ও সৌজন্য কারণে খাইর বলে সম্বোধন করে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়িদ (রাঃ)-কে (যাকে লোকেরা

সাধারণত 'যাইদুল খাইল' বলে ডাকত) যাইদুল খাইর বলতেন। হযরত যায়িদ (রাঃ) যখন ঘোড়ায় সওয়ার থেকেন, তখন তাঁর উভয় পা মাটির দিকে ঝুলে থাকত। তিনি হলেন যায়িদ ইবনে মুহালহাল ইবনে যায়িদ তায়ী। তাঁর কাছে অনেক ঘোড়া থাকত। সব ধরনের ঘোড়াই তাঁর নিকট থাকত। যেমন হাতাল, লাহিক, দামূক ইত্যাদি।

হযরত যায়িদ ইবনে মুহালহাল (রাঃ) ত্বাঈ গোত্রের সাথে ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস আছে, যে কারণে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তোমাকে ভালবাসেন। একটি লজ্জাশীলতা আর দ্বিতীয়টি হল ধৈর্যশীলতা ও কোমলতা। হযরত যায়িদ (রাঃ) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ—সকল প্রশংসা ও সৌন্দর্য আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন যার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ভালবাসেন। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হে যায়িদ আল খাইর! জ্বর তোমাকে শেষ করবে। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবার থেকে উঠে বাড়িতে চলে যান। তারপর তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং জ্বর অবস্থায় তার ইন্তেকাল হয়।

مسحا بالسوق الاعناق-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন : এর অর্থ তরবারীর সাহায্যে গর্দান ও পা কেটে ফেলা নয় বরং ভালবাসা ও স্নেহ মমতার কারণে হাত বুলানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত সুলাইমান (আঃ) ঘোড়ার ভালবাসায় তাদের পিঠে ও পায়ে হাত বুলিয়েছিলেন।

কোন কোন তাফসীরকারক লিখেছেন : এর অর্থ হল, গোসল করানো। ইমাম সা'লাবী (রহ.) বলেন, গর্দান ও পায়ে হাত বুলানো সেই দিকে ইঙ্গিত করে যে, এই ঘোড়াগুলো জিহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আবার কোন কোন আলেম বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘোড়ার মধ্যে বয়স্ক ঘোড়া ছিল মাত্র ১০০টি, আর অবশিষ্টগুলো ছিল বাচ্চা। এগুলো থেকেই অদ্যাবধি বংশ বিস্তার ঘটেছে।

আল্লামা দামেরী (রহ.) এ কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন তা অবাস্তব ও অসম্ভব। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সর্বমোট ঘোড়া ছিল মাত্র ২০টি, যেগুলোকে সাগর থেকে শয়তানরা বের করেছিল আর এগুলোর ডানা ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) নিজের ব্যাপারে দুআ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বাদশাহী দান করুন যা অন্য কাউকে না দেওয়া হয়। এর অর্থ হল

মানুষের মধো আমাকে স্বতন্ত্র ও উত্তম স্থান দান করুন যা আমার মু'জিয়া হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বাবুল আইন-এ আসবে।

ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার সমীপে দুআ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন প্রজ্ঞা দান করুন যা আপনার প্রজ্ঞার সাথে মিলে এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কাউকেও দান করা না হয়। আর যে ব্যক্তি এ মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাসে) প্রবেশ করবে এবং তার উদ্দেশ্য নামায ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এমন ব্যক্তিকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিস্কার করে দিন যেমন সে তার মায়ের পেট থেকে (এইমাত্র) জন্মগ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রথম দুইটি দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন আর তৃতীয় দুআটির বিষয়ে আমার ধারণা যে তাও কবুল করা হয়েছে।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এক নবী দুআ করেছেন আর অন্য নবী তা কবুল হওয়ার আশা করছেন। তাহলে তা কবুল হবে না কেন? বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর জন্য ছয়শত কুরসী বিছানো হত। এগুলোর উপর সভাসদসহ বসে তিনি বিচার কার্য সমাধা করতেন। জিন ও ইনসানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর দরবারে আগমন করতেন। মানুষের সারি জিনদের সামনে থাকত, অর্থাৎ সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আসন গ্রহণ করতেন। তারা বসতেন মানুষের কাছকাছি। পাখিরা এসে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করত। বায়বীয় ইঞ্জিন যার গতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন– غدوها شهر ورواحها "সকাল বেলা তা এক মাসের পথ অতিক্রম করত আবার সন্ধ্যা বেলা এক মাসের পথ।" হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাঁকে বাদশাহী দান করলে তিনি এমন একটি কুরসী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার উপর উপবিষ্ট হয়ে তিনি মানুষ, জিন ও পশুপাখির ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতে পারেন। যা দেখে বাতিল পূজারী ও মিথ্যা সাক্ষ্যদাতারা ভীত ও হতভম্ব হয়ে যায় এবং শুধু সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং তিনি আদেশ করলেন যে, আসনটি নির্মাণ করতে হবে হাতির দাঁত দ্বারা, যা মুতি, ইয়াকুত, যমরুদ দ্বারা মোজাইক করা হবে। আসনটির চারপাশে ৪টি খেজুর গাজ লাগানো হবে। বৃক্ষের শাখা হবে লাল মূল্যবান পাথরের এবং সবুজ যমরুদ পাথরের। দুটি বৃক্ষে স্বর্ণের ময়ূরের

প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে। আর অপর দুটি বৃক্ষের উপর স্বর্ণের শকুন নির্মাণ করা হবে, যার একটি অপরটি মুখোমুখি হবে। সুতরাং তাই করা হল। দুটি স্বর্ণের সিংহ আসনের দুইপাশের বাহুতে নির্মাণ করা হল। এদের মাথায় সবুজ যমরুদ পাথরের খাম স্থাপন করা হল। খেজুর বৃক্ষের স্বর্ণের আঙ্গুরের থোকা ঝুলানো হল। ইহার খোসা ছিল ইয়াকুত পাথরের এবং এই লাতানো গাছ খেজুর এবং আসনটি স্বীয় ছায়ায় নিয়েছিল।

হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন এ আসনে বসার ইচ্ছা করতেন এবং আসনের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেন তখন আসনটি চাকার মত খুব দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করত এবং লেজ মাটিতে রাখত, ডানা বিস্তার করে দিত, সিংহ তার হস্ত প্রসারিত করত এবং তার লেজ মাটিতে রাখত। হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন আসনে বসে যেতেন তখন স্বর্ণের দুইটি শকুন যেগুলো খেজুর পরিয়ে দিত। এরপর আসনটি ঘুরতে আরম্ভ করত। এর সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর, শকুন ও সিংহও ঘুরতে থাকত। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাওরাত পাঠ করে বিচারকার্য আরম্ভ করতেন।

তাঁর ডান পার্শ্বে এক হাজার স্বর্ণের চেয়ার বিছানো থাকত। বনী ইসরাঈলের ভদ্র ও জ্ঞানী-গুণীজনেরা সেগুলোতে বসতেন। তাঁর বাম পার্শ্বেও এক হাজার রৌপ্যের কুরসী বিছানো থাকত। তাতে জিনদের ভদ্র ও জ্ঞানী-গুণীজনেরা বসতেন। সবার উপরই পাখিরা ছায়া বিস্তার করত। এরপর লোকজন নিজ নিজ অভিযোগ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট পেশ করতেন। তিনি সাক্ষী তলব করতেন। যে সময় সাক্ষী তার সাক্ষ্য হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সম্মুখে দিত সে সময় তাঁর আসনটি চাকার মত ঘুরতে থাকত আর সিংহ তার হস্ত প্রসারিত করত এবং তার লেজ মাটিতে আঘাত করতে থাকত। ময়ূর ও শকুন তাদের ডানা বিস্তার করত। এ সবের নড়া-চড়ার কারণে সাক্ষীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হত। যে কারণে সে সত্য কথাই বলতে বাধ্য হত; মিথ্যা বলার হিম্মত তার হত না।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করলেন। তিনি সে সময় এই আসনটি ইরাকের ইস্তাকিয়া শহরে নিয়ে যান এবং তিনি তাতে বসতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু বসতে সক্ষম হলেন না। বখতে নসরের পর সিংহাসনটি বাইতুল মুকাদ্দাসে আবার নিয়ে যাওয়া হয়। কোন বাদশাহই তাতে বসতে সক্ষম হন নি। এরপর সিংহাসনটি কোথায় চলে যায় তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নি।

বখতে নসরের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সেই চারজন বাদশাহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যারা সারা বিশ্ব শাসন করেছিলেন। গুবী বলেন, এ কথা সত্য নয়। ঐতিহাসিকগণ এবং জীবনীকারকগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের এক

বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা লিখেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে ইসহাক নামক এক ব্যক্তি ছিল। তার এক চাচাত বোন যে রূপে গুণে অতুলনীয় ছিল। লোকটি তার চাচাত বোনের প্রেমে আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করেন। কয়েকদিন পরে সে মেয়েটি মারা যায়। স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার উপর কঠিন বিপদে পরিণত হয়। লোকটি প্রেমিকার সমাধিতে গিয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে। বেশ কয়েক বৎসর যাবত সে এ রকম কান্নাকাটি করল।

একদিন হযরত ঈসা (আঃ) এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইসহাক! তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, হে রুহুল্লাহ! এটা আমার প্রেমীকা স্ত্রীর কবর। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। তার বিরহ ব্যাথ্যা আমাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমার কি ধারণা হয় যে, আমি আল্লাহির আদেশে তাকে জীবিত করে দিতে পারব? লোকটি হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। তারপর হযরত ঈসা (আঃ) কবরের পাশে আসলেন এবং বললেন, قم يا صاحب القبر باذن الله হে কবরের বাসিন্দা! আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। সুতরাং কবর ফেটে গেল এবং তা থেকে একজন হাবশী গোলাম যার চোখ, নাখ ও মুখ থেকে আগুন বের হচ্ছিল। সে لا اله الا الله عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسوله বলতে বলতে বের হয়ে আসল। ইসহাক বলল, হে আল্লাহর নবী! এটা আমার স্ত্রীর কবর নয় বরং অমুক স্থানে লোকটি অন্য একটি কবর দেখিয়ে বলল, (এটা আমার স্ত্রীর কবর) হযরত ঈসা (আঃ) সে হাবশীকে বলল, ফিরে যাও। সুতরাং সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এরপর তিনি দ্বিতীয় কবরের পাশে এসে বলল, হে কবরবাসী! আল্লাহর আদেশে জীবিত হয়ে যাও। তখন একজন মহিলা শরীরের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর থেকে বের হয়ে এল। হযরত ঈসা (আঃ) বলল, এই কি তোমার প্রেমিকা স্ত্রী? লোকটি হ্যাঁ সূচক জবাব দিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে বলল তাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। সুতরাং তাকে নিয়ে গেল। সে তার স্ত্রীকে বলল, তোমার বিরহে আমি অনেক দিন পর্যন্ত একাধারে জেগে কাটিয়েছি। এখন আমি একটু আরাম করতে চাই। সে তার স্ত্রীর রানের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন সময় সে মহিলার পাশ দিয়ে শাহজাদা যাচ্ছিলেন। রূপে-লাবণ্যে অতুলনীয় সে শাহাজাদা। মহিলা তাকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল। শাহাজাদাও তাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল। মেয়েটি বলল, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। শাহাজাদা তাকে ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে ইসহাক ঘুম থেকে জেগে তার স্ত্রীকে না পেয়ে পেরেশান হয়ে তার খোঁজে বের হয়ে পড়ল। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে পিছনে পিছনে

যেতে লাগল। একস্থানে গিয়ে সে তাদেরকে ধরে ফেলল। শাহজাদাকে বলল, তাকে আমার কাছে ফেরত দাও। কেননা, সে আমার স্ত্রী। আবার চাচাতো বোনও বটে। কিন্তু মেয়েটি তার সাথে যেতে অস্বীকার করল। সে বলল, আমি শাহজাদার দাসী। ইসহাক অত্যন্ত কঠোরভাবে বলল, তুমি আমার স্ত্রী ও চাচাতো বোন। মেয়েটি বলল, আমি তোমাকে চিনি না। আমি শুধু এতটুকুই জানি যে, আমি শাহজাদার দাসী। শাহজাদা ইসহাকের উদ্দেশ্যে বলল, তুমি আমার দাসীর সাথে কেন বিবাদ করছ?

ইসহাক জবাব দিল, সে তোমার দাসী নয়; আমার স্ত্রী। তাকে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করেছেন। তাদের এ কথা কাটা কাটি চলছিল। হঠাৎ করে হযরত ঈসা (আ:) আগমন করলেন এবং বললেন, হে ইসহাক! এই তো তোমার স্ত্রী, তাকে আমি আল্লাহর হুকুমে জীবিত করেছিলাম। ইসহাক বলল, জ্বি হ্যাঁ আল্লাহর নবী, এই সে। তার স্ত্রী বলল হে আল্লাহর নবী! সে মিথ্যা বলছে, আমি কখনই তার স্ত্রী নই; বরং আমি শাহজাদার দাসী। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে জীবিত করি নি। মেয়েটি অস্বীকার করল।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তা ফেরত দাও। এ কথা শুনা মাত্রই মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) বললেন : যে ব্যক্তি আশা করে যে, আমি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাই যে কুফর অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে এরপর আল্লাহ তাআলা জীবিত করে ঈমানদার অবস্থায় উত্তোলন করেন। সে ব্যক্তি যেন হাবশীকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি দেখতে চায় যে, সে ঈমানদার অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে জীবিত করে দিলেন; এরপর সে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। সে যেন এ মেয়েটিকে দেখে।

এরপর ইসহাক আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাজির করে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কখনও বিবাহ করবে না।

আল্লাম দামেরী (রহ.) বলেন, এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করছি। ঘটনাটি হল, একবার হযরত ঈসা (আঃ) পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সেখানে তিনি একটি গির্জা দেখতে পেলেন। সে গির্জায় এক পাদ্রী ইবাদত করছিলেন। অধিক ইবাদত ও সাধনার ফলে তার দেহ কৃশ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ গির্জায় কত দিন যাবৎ আছ। পাদ্রী বলল, এখানে আমি সত্তর বৎসর যাবৎ আছি। কিন্তু মনের একটি আশা এখনও পূর্ণ হয় নি। আপনি দুআ করলে আমার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি তোমার মনের আশা? পাদ্রী বলল, আমার মনের আশা হল আল্লাহ তাআলা আমাকে সামান্য পরিমাণ তার বিশেষ ভালবাসা দান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি দুআ করব। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) রাতে তার জন্য দুআ করলেন। তাড়াতাড়ি ওহী নাযিল হল যে, হে ঈসা আমি আল্লাহ তোমার দুআ কবুল করে নিলাম।

কয়েকদিন পর হযরত ঈসা (আঃ) সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, সে গির্জাটি একটা পোড়া বাড়িতে পরিণত হয়েছে। আর যেখানে গির্জাটি ছিল সে স্থানটি চৌচির হয়ে রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) সেখানে অবতরণ করে দেখলেন, সে আবেদ (পাদ্রী) লোকটি দাড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ ফেটে গিয়েছে এবং তার মুখমণ্ডল ছিল খোলা। তিনি (ঈসা (আঃ) তাকে সালাম করলেন; কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, হে ঈসা! সে আমার কাছে সামান্য পরিমাণ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা করেছিল, আমি জানতাম সে তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আপনার সুপারিশ ও দুআর কারণে আমি সামান্য ভালবাসার ৭০ হাজারের এক ভাগ দান করি মাত্র। যে কারণে তার এই অবস্থা যা তুমি দেখছ। আর যদি আমি এর বেশি দিতাম, তাহলে কী অবস্থা হত।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, বিশেষ ভালবাসা এ ঘটনা থেকে প্রকাশ পায়। ফানাফিল্লাহর জন্য ভালবাসা সর্বপ্রথম সিঁড়ী আর এ স্থান থেকে মানুষ মোহিনী শক্তির স্তরে গিয়ে পৌঁছে। যদিও এ বিষয়ে বিজ্ঞজনের কথা ভিন্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব রুচি মতে বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে বিভিন্ন অভিমত ও ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা করা সমীচীন নয়। আর না তার অবকাশ রয়েছে। এই বিষয়ে আমি আমার গ্রন্থ 'জাওহারুল ফারীদ'-এর অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তবুও আমি এখানে স্বল্পকারে উল্লেখ করছি। এতে পাঠক সমাজ উপকৃত হবে।

ভালবাসার সংজ্ঞা

সর্বাবস্থায় প্রেমিকের ইচ্ছার সম্মুখে মস্তক অবনত করে দেওয়ার নাম ভালবাসা। হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ, উপকার ও ক্ষতি বা সর্বাবস্থায় নিজের ইচ্ছাকে বিনাশ করে প্রেমিকের ইচ্ছার গোলাম হয়ে যাওয়ার নামই ভালবাসা। এ মর্মে কবি স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন

وقف الهوى بى حيث انت فليس لى متاخر عنه ولا متقدم

"ভালবাসা আমাকে একদম দাঁড় করে দিয়েছে, যেখানে তুমি রয়েছে। এখন আমি সে স্থান থেকে না সামনে যেতে পারি, না পিছনে যেতে পারি।"

اجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمنى اللوم

"তোমার ভালবাসায় তিরস্কারও আমার ভাল লাগে। এটা তোমার স্মরণকে প্রিয় করে রাখার ভিত্তিতে। সুতরাং ভর্ৎসনাকারী এখন যত পারে ভর্ৎসনা করুক।"

اشبهت اعدائی فصرت احبهم اذا کان حظی منك حظی منهم

প্রহরী আমার দুশমন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি তার বন্ধু হয়ে গেলাম। যখন তোমার পক্ষ থেকে আমার কোন উপকার হয়, তবে সেও তোমার পক্ষ থেকে নিশ্চয় উপকার পাচ্ছে।

فامنتنی فاهنت نفسی صاغرا ما من یهون علیك ممن یکرم

তুমি আমাকে নিকৃষ্ট ভাবছ, আমিও আমাকে নিকৃষ্ট বানিয়ে নিলাম। কেননা তুমি যখন কাউকে অবজ্ঞার পাত্র মনে কর, তাহলে সে কী করে সম্মানের পাত্র হবে?

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আত্মমর্যাবোধ ভালবাসা গুণাবলীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আত্মমর্যাদা ভিন্ন ভালবাসাকে গোপন রাখা সম্ভব নয়। কেননা যার কথাবার্তা এ বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনার প্রত্যাশী এবং গোপনীয় রহস্য উন্মোচন অনমনীয় হয়ে যায়, তখন ভালবাসার স্বাদ তার ভাগ্যে জোটে না। শুধু তার অন্তরে প্রশান্তির চর্চা করে। যদি প্রকৃত ভালবাসার স্বাদ তার ভাগ্যে জোটে তাহলে সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হত না। কারণ, প্রকৃত ভালবাসা শব্দমালা দ্বারা প্রতীয়মান করা যায় না; তা ভাবভঙ্গিতেই ধরা যায়। প্রেমিক ব্যতীত কেউ তা বুঝতে পারে না। কেননা প্রেমাস্পদ আমাকে ইঙ্গিত করে, আমি তার নয়ন কোণের ইশারা খুব তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করি। এর জবাবে আমি চোখ বন্ধ করি, আমার এ জবাব প্রেমিকার জন্য উপযুক্ত উপলব্ধি। আমরা উভয়ে যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করি তখন আমাদের মুখ বন্ধ এবং চোখ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেন আমরা নিশ্চুপ ভালবাসা গভীর আলাপে নিমগ্ন।

এখন বাকি থাকল সাধারণ ভালবাসা । তা তো হল অনুগ্রহ ও দয়ার ফসল এবং বন্ধুর পথে চলার মজবুত হাতিয়ার এবং বন্ধুর নির্দেশিত গন্তব্যের পান অগ্রসর হওয়ার শক্তি। এ মহব্বত সন্দেহ ও সংশয়ের মূলসমূহ কেটে দেয়। তাতে প্রেমাস্পদের দেহমনে অতীব মনোলোভা হয় এবং মানুষের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের পন্থা নসীব হয়। সাধারণ লোকজন একে ঈমানের সিঁড়ি মনে করে। সুফীদের নিকট বান্দার যা কিছু প্রকাশ পায় তা ইবাদতের প্রকাশমানতা বলে একমাত্র লক্ষ্যই হল আল্লাহ তাআলার হুকুম ও অধিকারসমূহ আদায়ে নিমগ্ন থাকে। তার একমাত্র লক্ষ্যই হল আল্লাহকে প্রাপ্তি। এমতাবস্থায় সে তার গন্তবের প্রত্যাশী হয়। এমতাবস্থায় তার প্রকৃত মাবুদের পরিচিতির জন্য দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। মনে হয় যেন সে নিজের অনুভূতির দ্বারা রুদ্ধ করা ইবাদতের প্রকাশ করে আল্লাহর দরবারে সদ্য উপস্থিত হয়।

কাহিনী

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহ.) ভ্রমণে ছিলেন। সফরে তাঁর পিপাসা অনুভূত হলে তিনি চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু পানির কোন সন্ধান পেলেন না। পিপাসা যখন তীব্র হল, তখন তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তার মুখমণ্ডলে কী যেন ঠাণ্ডা অনুভব করলেন। তিনি চোখ খুলে দেখলেন এক যুবক উত্তম ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আছেন। সবুজ রঙ্গের পোশাকে সজ্জিত এবং হলুদ রঙ্গের পাগড়ী বাঁধা, পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি আমার সম্মুখে পানি এনে ধরল এবং আমাকে বলল, আমার ঘোড়ার উপর আরোহণ করুন। এরপর আমি তার পিছনে বসে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন?। আমি বললাম, মদীনা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা। তিনি বললেন, এই তো মদিনা, অবতরণ করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে অনুগ্রহ করে বলবেন, জান্নাতের কোষাধ্যক্ষ রিদওয়ান আপনাকে সালাম করেছেন।

١٧٩. الجواف (আল-জুওওয়াফ) এক প্রকার মাছ

আল-জুওওয়াফ (জীম অক্ষরে পেশ) অর্থ এক প্রকার মাছ। হযরত মালিক ইবনে দীনার বলেন اكلت رغيفا وراس جوافة وفعلى الدنيا العفاء

١٨٠. الجوذر (আল-জুযার) বন্য গাভীর বাচ্চা

الجوذر (যাল অক্ষরে পেশ ও যবর) বন্য গাভীর বাচ্চা। কবি বলেন :

ان من يدخل الكينسة يوما يلق فيها جاذرا وظباء

যে লোক প্রতিদিন গির্জাতে প্রবেশ করবে, তবে একদিন এমন হবে যে, যেখানে সুন্দর হরিণ এবং বন্য গাভীর বাচ্চা পাওয়া যাবে।

এই বিষয়ে আলী ইবনে ইসহাক যাহী কতই না উত্তম কবিতা আবৃত্তি করেছেন :

وبيض بالحاظ العيون كانما هزون سيوفا واستللن خناجرا

✪ সে এক গুচ্ছ চুল বিশিষ্ট পার্বতী, তার চোখ ভীতিপ্রদ। সে তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা প্রসারিত করে রেখেছে এবং তার চোখের খঞ্জর বিস্ফোরিত করে রেখেছে।

تصديق لى يوما بمنعرض اللوى فغادرن قلبى بالتصبر غادرا

✪ হঠাৎ একদিন আমার অন্তর সামনের টিলার উপর পড়ল, তখন সে আমার হৃদয় চুরি করল এবং আমার ধৈর্যের সামগ্রী নিয়ে উড়ে গেল।

سفرن بدورا وانتقين اهلة ومسن غصونا والتفتن جاذرا

✪ সে সম্মুখে আসলে মনে যেন পূর্ণিমার শশী। আর যখন দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত তখন মনে হত যেন প্রথম দিবসের শশী।

واطلعن فى الاجياد بالدر انحما جعلن لحبات القلوب خرائرا

✪ উন্নত জাতের অশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যেমন তারার মধ্যে কুতি। আর যে তার প্রেম-প্রীতি দ্বারা অন্তরে স্পন্দন সৃষ্টি করে উড়াল দেয়।

الريح تعصف والاغصان تعتنق والمزن باكية والزهر مغتبق

✪ বাতাসে উড়ার সময় পত্র-পল্লব একে অপরকে আলিঙ্গন করে। মেঘমালা ক্রন্দন করতে থাকে এবং কলিসমূহ ঝরে পড়ে যায়।

كانما الليل جفن والبروق له عين من الشمس تبدو ثم تنطلق

✪ মনে হয় রাত্র তার চোখের আবরণ, আর দৃষ্টির চমক যেন সূর্যের কিরণ। কখনও দৃশ্যমান আবার কখনও অদৃশ্য।

تبدت فهذا البدر من خجل بها وحقك مثلى فى دجى الليل حائر

✪ প্রেমিকা যখন সম্মুখে আসল তখন ১৪ তারিখের চন্দ্র তারিখের চন্দ্র পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে গেল। তার সৌন্দর্য অন্ধকারও প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে।

وماست فشق الغصن غيظا جيوبه الست ترى اورقه تتناثر

✪ সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন ক্রোধান্বিত হয়ে আমার গ্রীবাদেশে ফেড়ে ফেলে। তুমি কি দেখছ না যে, সে রাগ ও ক্রোধের অগ্নি কয়লা ছড়ায়ে দিয়েছে?

وفاحت فالقى العود فى النار جسمه كذا نقلت عنه الحديث المجامر

✪ তার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে মনে হয় যেন সুগন্ধি কাঠের লাকড়ী আগুনে ফেলে রং রূপ সম্মুখে চলে আসে।

وقالت فغار الدر واصفر لونه كذالك ماز التتغار الضرائر

✪ এমনিভাবে সতীন একে অপরের উপর ঈর্ষা করতে থাকে।

بادر اذا حاجة فى وقتها عرضت فللحوائج اوقات وساغات

✪ প্রয়োজনে তাকে তুলে ধর; কেননা প্রয়োজনের সময় নির্ধারিত ক্ষণও প্রয়োজন।

ان امكنت فرصة فانهض لها عجلا ولا تؤخر فللتاخير افات

✪ সুযোগ যখন হাতে এসে গেল, তখন দ্রুত তা থেকে ফায়দা হাসিল কর। দেরিতে সমূহ ক্ষতি থেকে পারে।

اما ترى الغيث كلما ضحكت كمائم الزهر فى الرياض بكى

✪ তুমি কি মেঘ দেখ নি? যখন সে হাসে তখন বাগানের কলির ভিতর চাপা কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়।

كالحب يبكى لديه عاشقة وكلما فاض دمعه ضحكا

✪ প্রেমিক যেমন প্রেমের জ্বালায় ক্রন্দন করে, আর সে যখন ক্রন্দন করে তখন প্রেম তাকে দেখে হাসে।

لحى الله امرا اولاك سرا فبحت به وفض الله فاه

✪ আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে অসংখ্য নিয়ামত দান করুন, কেননা তুমি কবির প্রয়াসকে অবশিষ্ট রেখেছ।

لا انك بالذى استودعت منه انعم من الزجاج بما وعاء

✪ তুমি কবিকে টইটুম্বর করে রেখছ, অতঃপর তা উপচাইতে লাগল।

ينم بسر مستر عليه سرا كما فم الظلام بسر نار

✪ রহস্যকে রহস্যাবৃত করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছ, যেমন অন্ধকারে আগুনে প্রবেশ করে।

انم من النصول على مشيب ومن صافى الزجاج على عقار

✪ তীরের চেয়ে বেশী কারিগর আর প্রকৃত শরাবের পিয়ালা থেকেও যমীন বেশি দাতা ও দানশীল।

কবি আলী ইবনে ইসহাক ৩৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১৮১. الجوزل (আল-জাওযাল) কবুতরের বাচ্চা

জাওযাল (পেশসহ) কবুতরের বাচ্চা। এর বহুবচন الجوازل বিস্তারিত আলোচনা فظا-এর বর্ণনায় আসবে। কবি বলেন :

يا ابنة عمى لا احب الجوزلاء ولا احب قرصك المفلفلاء

ওহে আমার চাচাত বোন! আমি তো কবুতরের বাচ্চা পছন্দ করি না। এমনিভাবে আমি তোমার প্রেমের ছলনা পছন্দ করি না।

وانما احب ظبيا اعملا وربما سمى الشاب جوزلاء

আমি পছন্দ করি হরিণের যে বাচ্চা লাফালাফি করে, আবার কোন কোন সময় যুবকের নামও জাওযাল রাখা হয়।

১৮২. جيال (জিয়াল) গোশত খেকো প্রাণী

গোশত খেকো প্রাণী হায়েনা। এর বিস্তারিত আলোচনা باب الصاد এ আসবে।

১৮৩. الوجرادة (আল-ওয়াজরাদাহ) পাখি বিশেষ

এটা এক ধরনের পাখি বিশেষ। ইরানীগণ একে 'বাযানজান' বলে। আর সিরিয়াবাসী 'বাসীর' বলে। এর গোশত অশ্ব রোগীর জন্য বেশ উপকারী।

باب الحاء

পরিচ্ছেদ : হা

১৮৪. حائم (হায়িম) কালো কাক (দুষ্ট পাখি)

কালো রঙ্গের কাককে হায়িম বলে। কবি বলেন :

ولقد غدوت وكنت لا اغدو على واق وحائم

আমি খুব প্রত্যুষেই বের হলাম অথচ সে সময় আমার বের হওয়ার কথা নয। তাই আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ঘুরতে লাগলাম।

فاذا لا شائم كالايا من والايا من كا الاشائم

আমি আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য দৃষ্টিগোচর হল। দুভার্গ্য ও সৌভাগ্য দেখা দিল।

وكذالك لا خير ولا شر على احد بدائم

এতে আমি বুঝে নিলাম যে, ভালমন্দ স্থায়ী বস্তু নয়। (এজন্য মানুষকে দুঃসময়ে প্রভাবিত ও সুসময়ে বেপরওয়া হওয়া উচিত নয়।)

এই সংক্রান্ত কবিতা গাইন পরিচ্ছেদে আরও আসবে।

১৮৫. الحارية (আল -হারিয়াহ) চিত্রল সর্প

এর আলোচনা হামযা পরিচ্ছেদে তে করা হয়েছে।

১৮৬. الحباب (আল-হুবাব) সর্প

'আল হুবাব' প্রকৃতপক্ষে একটি সাপের নাম। কেননা সাপকেও শয়তান বলা হয়ে থাকে। এ কারণে তার নাম 'হুবাব' রাখা হয়েছে' '

হাদীস শরীফে 'হুবাব'-এর আলোচনা

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম حباب নামক এক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন حباب হল শয়তানের নাম।

আবূ দাউদের باب تغير اسم القبيح অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম পরিবর্তন করেছেন। যেসব লোকের নাম আস, আযীয, আকলাহ, শয়তান, হিকাম, গোরাব, শিহাব, হুবাব ইত্যাদি রয়েছে তাদের নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবর্তন করেছেন। এদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল যার নাম হুবাব ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ নামে ভূষিত করেন। তার পিতাকে আবূ হুবাব নামেই ডাকা হত।

১৮৭ . الحبتر (আল-হাবতার) শিয়াল

এর বিস্তারিত আলোচনা তা পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

১৮৮. الحبث (আল-হুবাস) সাপ

এ সাপ ছোবল মারতে অত্যন্ত পারদর্শী এবং তার বিষ অত্যন্ত বিনাশকারী। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে করা হবে।

১৮৯. حباحب (হাবাহুব) জোনাকি

মাছির মত এক ধরনের প্রাণী। এর দুটি পাখা আছে। রাতে চমকায়। মনে হয় যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। আরবরা এ প্রাণীকে প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন—

اضعف من نار الحباحب -

'অমুক বস্তু জোনাকির আলো থেকেও অধিক দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু '। এ আলো জোনাকির পাখায় থাকে।

জাওহারী বলেন, জোনাকির আলো অনুপকারী। প্রবাদ বাক্যটি রূপকার্থে ব্যবহৃত। জোনাকির অপর নাম কুতরাব। যেমন ইবনে বায়তার প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। জোনাকি পোকা খাওয়া হারাম। কারণ এটা পোকা-মাকড়ের অন্তর্ভূক্ত। .

১৯০. الحبارى (আল-হুবারা) মাছরাঙ্গা

এটা একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত পাখি। 'হুবারা' ইসমে জিনস। স্ত্রী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত। একবচন ও বহুবচনেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয। কিয়াসের ভিত্তিতে এর বহুবচন حباريات (হুবারিয়াত) হতে পারে। জাওহারী বলেন, নাহুর (আরবী ব্যকরণ) দৃষ্টিকোণ থেকে হুবারা-তে যে 'আলিফ' রয়েছে তা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য নয়। আর না সংযোজনের জন্য। কেননা কলমার ভিত্তি এর উপর রাখা হয়েছে। এজন্য শব্দটি কলমার অংশ হয়েছে। জাওহারীর মতে حبارى শব্দটি নাকেরা ও মারেফা উভয় অবস্থায়ই غير منصرف। দামেরী বলেন,

জাওহারীর এই কথা যে, এতে الف স্ত্রীলিঙ্গের জন্য নয় আর না সংযোজনের জন্য তার এ কথা মারাত্মক ভুল। প্রকৃতপক্ষে الف টি যদি স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত না হয়, তাহলে منصرف পড়তে হবে।

মিসরীগণ 'হুবারা'-কে জুরজ বলে। এ পাখি খুব দ্রুত গতিতে উড়তে পারে। এ ধরনের পাখি নদী ভাঙ্গন এলাকাতে পাওয়া যায়। এর পালক উপড়িয়ে ফেললে বা স্বেচ্ছায় ফেলে দিলে এর সৌন্দর্য কমে যায়। এরা কোন আঘাত বা চিন্তার কারণে মারা যায়। মাছরাঙ্গার গর্দান বা গলা দীর্ঘ ও বক্ষ অত্যন্ত মনোলভা হয়। এর পেটে একটি মূল্যবান মূতি থাকে। যদি মূতিটি বের হয়ে যায় তাহলে সে নিজেই তার সমস্ত পালক ছিড়ে ফেলে দেয়। এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। কবি বলেন :

وهم تركوك اسلح من حبارى رأت صقرا واشرد من نعام

আর তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে মাছরাঙ্গার চেয়েও পেরেশান অবস্থায় যে, একদিকে সে দেখছে বাজপাখি তার উপর আক্রমণে উন্মুখ, অন্যদিকে সে ভীত-সন্ত্রস্ত তিতর পাখি।

আল্লাম দামেরী (রহ.) বলেন মাছরাঙ্গার বৈশিষ্ট্য হল, সে শিকার করে বটে তবে নিজে শিকারে পরিণত হয় না।

হাদীস শরীফে মাছরাঙ্গার আলোচনা

মাছরাঙ্গার ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কোন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন– অত্যাচারীর অত্যাচার তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর হয়। হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বিরোধীতা করে বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মাছরাঙ্গা আদম সন্তানের পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন যমীনে অধিক হারে পাপাচার থেকে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বাদল বন্ধ করে দেন, যার ফলে ফসলাদি কম উৎপন্ন হয়। কবি বলেন :

يسقط الطير حيث يلتقط الحبة وتغشى منازل اكرماء

"পাখিরা সেখানেই অবতরণ করে যেখানে তাদের খাদ্য দেখা যায়। এরপর তারা ভদ্র লোকের বাসস্থানকে ঢেকে নেয়।"

মাছরাঙ্গা অত্যন্ত চতুর। তারা নানা ধরনের ধোকা ও প্রতারণা করে খাদ্য সংগ্রহ করে। তা সত্ত্বেও ক্ষুধায় তাদের মৃত্যু হয়। মাছরাঙ্গার বাচ্চাকে লাইল ও নাহার (রাত্র ও দিন) বলা হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেন :

ونهارا رأيت منتصف الليل وليلا رأيت ربط النهار

আমি অর্ধ রজনীতে দিবস দেখেছি আর দিবসের মধ্যভাগে রজনী।

মাছরাঙ্গার শরঈ বিধান

মাছরাঙ্গা খাওয়া জায়িয। কেননা, তা হালাল ও পবিত্র। ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোলাম ইয়াযিদ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তার দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মাছরাঙ্গার গোশত খেয়েছেন। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) বলেন, হাদীসটি গরীব।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন : اكمد من حبارى অমুক ব্যক্তি মাছরাঙ্গার চেয়ে বেশি চিন্তিত ও বিষণ্ন। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক প্রাণীই তার সন্তানকে ভালবাসে, এমনকি মাছরাঙ্গাও। যার বোকামি উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান। অর্থাৎ তার বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও সে তার সন্তানকে ভালবাসে।

আরবগণ ভয় ও ক্রোধের সময় বলে থাকে اصلح من الحبارى "মাছরাঙ্গার চেয়ে অধিক কাপুরুষ" এবং নিরাপত্তার সময় বলে থাকে اصلح من الدجاج "মোরগের চেয়ে অধিক কাপুরুষ।" অধিকন্তু এ উদাহরণও দিয়ে থাকে الحبارى خالة الكروان "মাছরাঙ্গা মাটির ঘটির বন্ধু।" তারা এও বলে থাকে اكثر من ابهام الحبارى ومن ابهام القطاة "মাছরাঙ্গা রাজহাঁসের চেয়ে অধিক পশ্চাতপদ।"

চিকিৎসায় মাছরাঙ্গার উপকারিতা

মাছরাঙ্গার গোশত মধ্যম ও সংযত। মোরগের গোশতের মত দ্রুত হজম হয় না আর না হাঁসের গোশতের মত তাড়াতাড়ি। এর প্রভাব কিছুটা উষ্ণ। পিছগাম বায়ু (পাদ) রোগের দমনে বেশ উপকারী। কিন্তু যাবতীয় ব্যাথা-বেদনা ও শূলবেদনার জন্য ক্ষতিকর। অধিকন্তু এর গোশত কফ সৃষ্টি করে। দারুচিনি, যায়তুন সিরকা, ইত্যাদি মিশ্রিত করলে এটার ক্ষতির প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায়। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকদের জন্য এটা বেশ উপকারী। বিশেষত শীত প্রধান এলাকাতে বসবাসকারী লোকদের জন্য এটা অত্যন্ত উপকারী।

আল্লামা কাযবিনী (রহ.) বলেন, মাছরাঙ্গার পাকস্থলিতে একটি ছোট্ট পাথর থাকে। কারও যদি অধিক পরিমাণ স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সেই পাথর নিজের কাছে রাখলে তা দূর হয়ে যাবে। পেট পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি এই পাথর শরীরে বাঁধলে দাস্ত বন্ধ হয়ে যাবে। যার ঘুম বেশী সে এটা বুক বরাবর বেঁধে রাখলে তার ঘুম

কম হবে।

বিশিষ্ট চিকিৎসক এরিস্টটল লিখেছেন : মাছরাঙ্গার ডিম যার মধ্যে পুং জীবাণু রয়েছে তা যদি চুলে লাগায় তাহলে সাদা চুল কালো হয়ে যাবে। এ রং এক বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আর যদি স্ত্রী জীবাণু থাকে তাহলে তা কালো হবে না। পুং না স্ত্রী বুঝতে হলে সুঁইয়ের অগ্রভাগ এটার ভিতর প্রবেশ করলে যদি তা কালো হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটার ভিতর পুং জীবাণু রয়েছে, অন্যথায় স্ত্রী। স্বপ্নে মাছরাঙ্গা দেখলে দানশীল হওয়ার লক্ষণ মনে করা হয়।

১৯১. الحبرج (আল-হাবরাজ) পুরুষ মাছরাঙ্গা

মাছরাঙ্গার বাচ্চাকে 'ইয়াহুবুর' বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, ইহাজবুর হল এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি।

১৯২. الحبرى (আল-হাবরাকা) আঠালী পোকা

এ ব্যাপারে কবি বলেন :

فلست بمرضع ثدي حبرى ابوه من بنى جشم بن بكر

"আমি আঠালী পোকাকে দুধ পান করাবো না, কারণ তার পিতা বনী জশম ইবনে বকরের বংশধর।" حبرى (হাবরাকা)-এর স্ত্রীলিঙ্গে حبرٰت (হাবরাকাত) হয়। আবু উমর বলেন, জর অবস্থায় 'আলিফ' স্ত্রীর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার কারণে গায়রে মুনসারিফ পড়তে হবে। ছোট হাত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'হাবরাকা' দ্বারা উপমা দেওয়া হয়।

১৯৩. حبلق (হাবলাক) বকরীর বাচ্চা

হাবলাক্ব বকরীর বাচ্চাকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, দুর্বল কৃশ দেহ বিশিষ্ট ছাগল উদ্দেশ্য।

১৯৪. حبيش (হুবাইশ) পাখি বিশেষ

জাওহারী বলেন এটা বুলবুলির মত এক ধরনের পাখি। এটাকে হাবশী মোরগ বলা হয়।

১৯৫. الحجر (আল-হাজ্‌র) ঘোটকী

الحجر (হাজর) শব্দটি যেহেতু স্ত্রী লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত, তাই এ শব্দের সাথে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন সংযুক্ত করা হয় নি। এর বহুবচন احجار (আহজার) ও حجور (হুজুর)। বংশ বিস্তারের জন্য যে ঘোটকী রাখা হয় তাকে আহজারুল খাইল বলে।

হাদীসে ঘোটকীর আলোচনা

আল হাজর সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। উমর ইবনে শোয়াইব স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : ঘোটকী ও খচ্চরে কোন যাকাত নেই।

উক্ত হাদীসে হাজর শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্নের সাথে এসেছে। এতে বুঝা যায়, تاء تانيث সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু মুসতাদরাক-এ আবু যারআহ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, ঘোড়ার জন্য فرس শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ঘোটকীর শরঈ হুকুম ও চিকিৎসা উপকারিতা ঘোড়ার মতই। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ باب الخيل-এ আসবে।

স্বপ্নে ঘোটকী দেখার ব্যাখ্যা

ঘোটকীর ব্যাখ্যা নেককার ও ভদ্র মহিলা দ্বারা করা হয়। কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, সে ঘোটকীর উপর আরোহণ করেছে। তবে এর ব্যাখ্যা হবে সে সৎ ও ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করবে। আর যদি ঘোটকীর উপর বসার গদি লাগানো থাকে তবে তার ব্যাখ্যা হবে ঐ মহিলার পবিত্রতা সংরক্ষিত নয় অথবা সে এমন কাজের সাথে জড়িত যার সাথে সংশ্লিষ্ট মর্ম হবে সুন্দরী ও রূপবতী রমণী। হলুদ বর্ণের ঘোটকী দেখলে রুগ্ন রমণীর লক্ষণ। কালো রঙ্গের ঘোটকী ধনবতী ও সম্পদশালী মহিলার লক্ষণ। কখনও কখনও ঘোটকী দ্বারা মৌসুম ও বৎসরও বুঝা যায়। সুতরাং মোটাসোটা ঘোটকী দেখলে সুবজ ও শ্যামলের দিকে ইঙ্গিতবহ। আব কৃশ ও দুর্বল ঘোটকী স্বপ্নে দেখলে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের লক্ষণ।

১৯৬. الحجروف (আল- হাজরূফ) পিপীলিকা সদৃশ প্রাণী

ইবনে সাঈদ বলেন : এটা এমন এক প্রাণী, যার পায়ের নলা লম্বা হয় এবং দেহের গঠন পিপীলিকার মত।

১৯৭. الحجل (আল-হাজল) পুরুষ চাতক

হা বর্ণের উপর যবর হবে। حجلة একবচন বহুবচন حجل (হাজলা)। فعل এর ওজনে। অবশ্য উভয় শব্দই বহুবচন থেকে পারে। হাজল কবুতরের সমান এবং তিতর পাখির মত একপ্রকার পাখি। এর ঠোঁট লাল। একে সামুদ্রিক মোরগও বলা হয়। এটা দুই প্রকার : (১) নাজদী (২) তেহামী। নাজদী সবুজ রঙের এবং লাল নলা বিশিষ্ট। আর তেহামী সবুজ সাদা উভয় রঙের থেকে পারে। এদের বাচ্চা পালকসহ জন্মগ্রহণ করে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট হল, এরা যখন ডিম পাড়ার ইচ্ছা করে তখন মাটিতে বসে যায়। এতেই তারা ডিম দেওয়ার উপযোগী হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, এদের স্ত্রী পাখিরা পুরুষ পাখির

আওয়াজ পেলেই ডিম দেওয়ার উপযোগী হয়ে যায়। তারা যখন ডিম দিয়ে অবসর গ্রহণ করে তখন পুরুষ ডিমটি পুরুষে ও স্ত্রী ডিমটি স্ত্রী পাখিটি পৃথকভাবে তা দেয়। বাচ্চা লালনের ব্যাপারেও তারা এই নিয়ম মেনে চলে।

তাওহীদী বলেন, তারা বিশ বৎসর জীবিত থাকে। তারা বাসাও পৃথকভাবে তৈরি করে। পুরুষের জন্য পৃথক ও স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসা তৈরি করা হয়। তাদের অভ্যাস হল নিজ আকৃতির অন্যান্য পাখির বাসায় প্রবেশ করে সে পাখির ডিমে তা দেয়। যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে উড়ে যাওয়ার উপযোগী হয় তখন বাচ্চারা তাদের প্রকৃত মায়ের কাছে চলে যায়। তারা খুব ক্ষীপ্র গতিতে উড়তে পারে। মানুষ তাদের কোন সন্ধান করতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা গোপন স্থান থেকে বের হয়। তাদের পুরুষটিও স্ত্রীর মত অতি লজ্জাশীল হয়। তাদের দুইটি পুরুষ প্রাণী একত্র হলে স্ত্রীকে নিজ দখলে নেওয়ার জন্য লড়াই করতে থাকে। বিজয়ী বিজিতকে হত্যা করে। এ প্রাণী তার অনুরূপ আওয়াজে ধোঁকা দেয়। এজন্য শিকারিরা তাদেরকে নিজেদের সাথে রাখে। তাদের আওয়াজে অন্য পাখিরা ধোঁকা খেয়ে শিকারীর হাতে ধরা পড়ে। এ পাখিরা নিজেদের ডিম তা দেওয়া শেষ হলে অন্য পাখির বাসায় চুরি করে প্রবেশ করে সে পাখির ডিমে তা দেয়।

কিতাবুন নাশওয়ান ও তারীখে ইবনে নাজ্জার-এ আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান জা'দী এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এক কুর্দীর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। দস্তরখানায় নানা ধরনের খাদ্য সাজানো ছিল। এগুলোর মধ্যে দুটি ভুনা চাতক পাখি ছিল। কুর্দী লোকটি এগুলো হাতে নিয়ে হাসতে আরম্ভ করল। আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে জবাব দিল, আমি যুবক বয়স থেকে চুরি করতাম। একদিন আমি একজন বণিককে টার্গেট করলাম এবং তাকে হত্যা করার সংকল্প করলাম। এতে সে ওযর-আপত্তি ও কাকুতি-মিনতী করতে লাগল। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং তাকে হত্যা থেকে বিরত রইলাম। কিন্তু এখনও আমি আমার কবজা থেকে মুক্ত করি নি। সে যখন দেখল, আমি তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হঠাৎ করে সে পাহাড়ের উপর দুটি চাতকের দিকে মনোযোগ দিল। লোকটি বলছিল, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখলাম যে, এই লোকটি আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে। এ কথা যখন সে বলল, তখনই আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। তাই এ চাতক পাখিগুলো দেখে ওই বণিকের নির্বুদ্ধিতায় হাসি পেল। ইবনে মারওয়ান এ ঘটনা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার ডাকাতির ব্যাপারে আমি নিজে সাক্ষী। তার গর্দানে আঘাত করার আদেশ করেন।

চাতক পাখির শরঈ বিধান

চাতক পাখি খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। নুন পরিচ্ছেদে এক হাদীসে এসেছে যে, ভুনা করা একটি পাখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করা হল। সেটা ছিল চাতক পাখি, যাকে নুহাম-ও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুই স্কন্ধের মাঝখানে যে মোহরে নবুওয়াত ছিল তাও চাতকের ডিমের মতই ছিল।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'দালাইলুন নুবুওয়াত'-এ ওয়াকিদী (রহ.)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলেন তখন কেউ কেউ বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়েছেন। কেউ কেউ তা অস্বীকার করলেন। তখন আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুই স্কন্ধ মোবারকের মাঝখানে হাত দিলেন এবং বললেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেননা, তাঁর মুহরে নবুওয়াত উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের সংবাদ বুঝা যায়। আসমা বিনতে উমাইস হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) উমাইস (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। সেই ঘরেই হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। সে সময়ে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) ছোট ছিলেন। হযরত আবু বকরকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পোষ্য বলা হয়।

মুস্তাদরাকে উল্লেখ আছে যে, দুনিয়াতে যত নবীর আগমন ঘটেছে সকলেরই নবুওয়াতী চিহ্ন ডান হাতে ছিল। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতী চিহ্ন বাম হাতে ছিল। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতী চিহ্ন দুই স্কন্ধের মাঝখানে।

হযরত আলী (রাঃ) ইরাকীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন হে আহমকের দল! তোমরা মানুষরূপী হলেও তোমাদের মধ্যে কোন বুদ্ধি-বিবেক নেই। তিনি কবিতা পাঠ করতেন :

وانت الذى حببت كل قصيرة الى فلاتدرك نداك القصائر

আর তুমিই তো সেই লোক যে সবধরনের পাপ পছন্দ কর আর আমার সাথে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বৈধ মনে কর।

عنيت قصيرات الحجال ولم ارد قصار الخطاشر النساء البحائر

আমার উদ্দেশ্য হল দুষ্টামী করা যা তুমি আমার সাথে করছ। তবে যে দুষ্টামী মেয়ে লোকের মধ্যে পাওয়া যায়।

মুহরে নবুওয়াতের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ 'কাফ' পরিচ্ছেদে کرکی শিরোনামে আসবে।

উপমা ও প্রবাদ বাক্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপমা হিসেবে বলতেন :

اللهم انى ادعوا قريشا وقد جعلوا طعامى طعام الحجل

আল্লামা আযহারী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ উপমার উদ্দেশ্য হল কুরাইশরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করছে না এবং খুব অল্প লোকই ইসলামে প্রবেশ করছে।

আল্লামা আবুল কাশেম ইস্পাহানী (রহ.) কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব -এ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তার নামায সঠিক হলে সব কাজই সঠিক। আর যার নামায অসম্পূর্ণ ও পরিত্যাক্ত তার সব কর্ম নিস্ফল ও মূল্যহীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন-নামাযের কাতারে শয়তান প্রবেশ করে। যেভাবে চাতক পাখি প্রবেশ করে। আর ডান দিকের কাতার বাম দিকের কাতারের চেয়ে উত্তম।

চিকিৎসায় চাতকের উপকারিতা

চাতকের গোশত নাতিশীতোষ্ণ, মজাদার ও দ্রুত পরিপাক হয়। তার গোশত কিছুটা উষ্ণ স্বভাবের তবে ভয়ভীতি দূর করে। চাতকের পিত্ত দ্বারা সুরমা তৈরি করে চোখে ব্যবহার করলে চোখের ঝাপসা ভাব দূর হয়। প্রতি মাসে একবার তার পিত্ত নাকে ব্যবহার করলে স্মৃতিশক্তি বর্ধিত হয় এবং ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দূর হয়। আর শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

মুখতাত ইবনে আবদুন বলেন, চাতকের ডিম মুরগির ডিমের চেয়ে মজাদার। কেননা এ ডিম থেকে সুষম খাদ্য তৈরি হয় এবং স্বাভাবিক মন মেজাজ তৈরি হয়। মুরগির ডিমের তুলনায় তা দ্রুত হজম হয়। সবচেয়ে মজাদার হয় তার ডিম পানিতে সিদ্ধ করে এর মধ্যে সামান্য সিরকা মিশিয়ে খেলে। ভুনা করা ডিম ক্ষতির কারণ হতে পারে। চাতকের ডিম জিরা অথবা লবণ বা জংলী পিঁয়াজের আরকে মিশিয়ে ব্যবহার করলে নাড়ীর তিক্ততা এবং পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। স্বপ্নে চাতক দেখলে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসার লক্ষণ।

১৯৮. الحداة (আল- হিদাত) চিল

প্রাণীদের মধ্যে চিল বড্ড দুষ্ট ও পাজি। এর উপাধি হল আবুল খাত্তাফ ও আবুস সাল্‌ত। যদি 'হাদাত'-এর হা অক্ষরে যবর যোগে পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে দুই মাথা বিশিষ্ট কোদাল। হাদীস শরীফে এ শব্দটি حدیا এসেছে। ثریا-এর ওযনে এবং حدایا হামযা ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন বর্ণনায় হামজাসহ এসেছে। সম্ভবত এটা حداءة-এর তাসগীর (ক্ষুদ্রতাবাচক বিশেষ্য)।

হাদীসে বর্ণিত আছে : চিত্রল সাঁপ ও চিলকে হত্যা করলে কোন ক্ষতি নেই। এ হাদীসে হিদাত শব্দটি واو-এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় যারা حدا পড়েন তারা এর তা'লীল করেন যে, আলিফ কে হামজা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন হয়েছে افعى তে।

আসমায়ী বলেন, حداة এর বহুবচন حدا কুতাইবা বলেন حدان-ও আসে। জাওহারী বলেন, এটা عنبة-এর মত। আর عنب বলা হয় আঙ্গুরের একটি দানাকে। দামেরী বলেন, বহুবচন বানানোর এ রীতি দুর্লভ ও অপ্রচলিত।

চিল সাধারণত দুটি ডিম দেয়। কোন কোন সময় অবশ্য তিনটি ডিমও দিয়ে থাকে। চিল ডিমে মাত্র বিশ দিন তা দিয়ে থাকে। এরপরই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে। চিলের রং কালো অথবা মেটো রঙের হয়ে থাকে। চিল কোন পাখিকে শিকার করে না বরং শিকারকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। চিল খুব কমই উড়তে পারে। চিল তার পড়শীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। এমনকি তার প্রতিবেশী যদি মারাও যায় তাহলে তার বাচ্চার সাথে বৈরীতা তো করেই না বরং বাচ্চাকে লালন-পালন করে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন : এ পাখি হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর শিকারী পাখিদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। স্ত্রী চিলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল সহবাসের সময় খুব চিৎকার করতে থাকে। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে, পুরুষ চিলটি মাত্র একবারই সহবাস করে। এতে স্ত্রী চিলের বাচ্চা হয় (ডিম হয়)। কিন্তু পুরুষ চিল স্বীয় বাচ্চা অস্বীকার করে। মা চিল এই বিষয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারে বিচারের প্রার্থী হয় যে, নর চিল আমার সাথে মাত্র একবার সহবাস করে, এতে এ বাচ্চা জন্মলাভ করে। কিন্তু নর চিল তা অস্বীকার করছে। হযরত সুলাইমান (আঃ) নর চিলকে ডাকলেন এবং বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। নর চিল বলল, হে আল্লাহর নবী! সে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে হেফাযত করে না। বুঝা যায় না এ বাচ্চা আমার নাকি অন্য কারও। আল্লাহর

নবী বাচ্চাটি ভাল করে দেখলেন। তিনি বাচ্চার মধ্যে পিতার ছবি দেখলেন। তিনি আদেশ করলেন এ বাচ্চা তোমারই। তিনি বাচ্চাকে তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

এরপর স্ত্রী চিলকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন তোমার স্বামী তোমার সাথে সহবাস করে এবং যতক্ষণ সে তোমার উপর থাকে ততক্ষণ তুমি অন্য কোন পাখিকে সাক্ষী বানিয়ে নিও। সে সময় থেকেই তার এই অভ্যাস হয়ে গেল যে, যখন পুরুষ চিল স্ত্রী চিলের সাথে সহবাস করে তখন স্ত্রী চিল চিৎকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে– হে পাখিরা! তোমরা সাক্ষী থাক সে আমার সাথে সহবাস করছে। স্ত্রী চিল চিৎকার করার সময় কুরআনের এই আয়াতও পাঠ করতে থাকে كل شيئ هالك الا وجهه "প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল একমাত্র তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত"।

চিলের অভ্যাস হল সে বাম দিক থেকে শিকার করে; ডান দিক থেকে নয়। কাযবিনী বলেন, এমনকি কোন কোন লোক বলেন, চিল এক দিক দেখে না, এ কারণেই তার আক্রমণ শুধু এক দিক থেকেই হয়। কাযবিনী বলেন, চিল এক বৎসর পুরষ থাকলে অন্য বৎসর স্ত্রী হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে চিলের আলোচনা

সহীহ বুখারীতে আছে : এক গ্রাম্য মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিনীগণের খেদমতে থাকতেন।

তিনি অধিকাংশ সময় এই কবিতা পড়তেন

ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا على انه من ظلمة الكفر نجانى

সে দিন ছিল অতি আশ্চর্যের দিন যে দিন হার হারানো গিয়েছিল। এ দিন যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলো পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ কবিতার মর্ম কী? মহিলাটি জবাব দিল, একদিন আমি আমার গোত্রের এক নববধূকে দেখতে গেলাম। তখন সে গোসল করার জন্য গোসলখানাতে প্রবেশ করল এবং তার অলংকারাদি খুলে রাখল। হঠাৎ করে একটা চিল এসে সেগুলো লাল দেখে নিয়ে গেল। বধু এগুলো না পেয়ে আমাকে সন্দেহ করল। সে আমার সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করে তালাশ করল এমনি আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত খোঁজ করল। আমার সাথে এ আচরণের কারণে আমি আল্লাহর কাছে আমার নির্দোষিতার জন্য দুআ করলাম। দেখা গেল সেই চিলটি আসল এবং অলংকারগুলো সবার সম্মুখে ফেলে চলে গেল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি (গ্রাম্য মহিলা) আকাশের দিকে মাথা তুলে এ দুআ করলাম "হে সাহায্যকারীদের সাহায্যকারী (অর্থাৎ আল্লাহ)! আমি এ দুআ শেষ করতে না করতেই চিল আসল এবং সেই অলংকারগুলো ফেলে দিল।

উম্মুল মু'মিনীর যদি আপনি আমার এ সময়কার অবস্থা দেখতেন তাহলে আমার মুক্তির ও নির্দোষিতার জন্য দুআ করতেন। তাই আমি ঘটনাকে কবিতায় পরিণত করে তা পাঠ করে আল্লাহ তাআলা সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

একটি ঘটনা

হাফেয নাসাফী (রহ.) নিজ গ্রন্থ 'ফাযাইলুল আমাল'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আসেম ইবনে আবু নাজওয়াদ (রহ.) বলেন, একবার আমি দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লাম। সুতরাং আমার এ অবস্থার বিষয়টি আমার বন্ধুদেরকে জানালাম একং তাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করলাম। বন্ধুরা আমার আবেদনের প্রতি মনোযোগ দিল না। এতে আমি খুবই মর্মাহত হলাম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, কারও নিকট আর হাত প্রসারিত করব না। তাই আমি এক মরুভূমিতে চলে গেলাম এবং সেখানে 'সালাতুল হাজত' (প্রয়োজন পূরণের নামায) আদায় করলাম। এরপর সিজদায় পড়ে এ দুআ পড়লেন

يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا سامع الاصوات يا مجيب الدعوات يا

قاضى الحاجات اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك

দুআ পড়ে আমি তখনও মাথা উঠাই নি, আমি কিছু একটা পড়ার আওয়াজ অনুভব করলাম। মাথা উঠিয়ে দেখলাম, চিল একটি লাল থলে ফেলে দিয়েছে। আমি থলেটি উঠিয়ে দেখলাম তাতে ৮০ দিনার এবং তুলা দ্বারা মোড়ানো মূল্যবান পাথর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মূল্যবান পাথরগুলো অনেক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং দীনারগুলো হেফাযতে রেখে দিলাম, যাতে আমি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করতে পারি। আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম।

আল্লামা কুশাইরী তার 'কারামাতুল আওলিয়া' নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে শিবুল মারুযীর একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। একদিন তিনি অর্ধ দিরহামে গোশত ক্রয় করলেন। পথিমধ্যে চিল তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তিনি সোজা মসজিদে চলে গেলেন এবং নামাযান্তে দুআ করলেন। তারপর তিনি গৃহে গেলেন, স্ত্রী তার সমীপে গোশত পেশ করলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, গোশত আসল কোত্থেকে? স্ত্রী জবাব দিল, দুটি চিল গোশত নিয়ে ঝগড়া করছিল, তাদের থেকে গোশত পড়ে গেল। এতে শিবুল বলল, সকল প্রশংসা সেই প্রতিপালকের জন্য যিনি তার বান্দা শিবুলকে ভুলেন নি। যদিও শিবুল যিকরুল্লা থেকে গাফিলতি করেছে এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) গোশত নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চিল এসে গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

সা'দ (রাঃ) চিলের জন্য বদদোয়া করলেন। ফলে চিলের গলায় হাড় আটকে গেল এবং চিলটি সেখানেই মারা গেল।

হযরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) একদিন তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তীব্রবেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর মজলিসের পাশ দিয়ে একট চিল চিৎকার করে যাচ্ছিল। উপস্থিত শিষ্যগণ তার চিৎকারে অস্বস্তি বোধ করলেন এবং আশ্চর্য হলেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বাতাসকে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ করলেন। দেখা গেল তার মাথা একদিকে আর ধড় অন্যদিকে ছিটকে পড়ল। এরপর হযরত আবদুল জিলানী (রহ.) স্বস্থান থেকে উঠে গিয়ে চিলের মাথা ও ধড়টাকে স্বহস্তে নিয়ে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন। এতে চিলটি জীবিত হয়ে আবার উড়ে গেল। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য নিজ নিজ চোখে অবলোকন করলেন।

চিলের শরঈ বিধান

চিলের গোশত খাওয়া হারাম। কেননা, চিল সে পাঁচটি হারাম প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত যেগুলোকে হত্যা করার জন্য শরীয়তে আদেশ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ 'ফা' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচটি এমন মন্দ প্রাণী রয়েছে যেগুলোকে হিল্ল ও হারাম অর্থাৎ হেরেমের বাহিরে ও হেরেমে হত্যা করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় এ পাঁচটি প্রাণীর কোন একটিকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীর উপর কোন কাফফারা বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। এগুলোর মধ্যে একটি চিল, দ্বিতীয়টি ডোরাকাটা কাক, তৃতীয়টি বিচ্ছু, চতুথটি হল ইঁদুর ও পঞ্চমটি পাগলা কুকুর। এ পাচঁটি প্রাণী যেকোন স্থানে হত্যা করলে কোন ধরনের জরিমানা ওয়াজিব হবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উমর (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত হাফসা (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণিত।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এ পাঁচটি প্রাণী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ক্ষতিকারক প্রাণীকে তাদের ক্ষতির পূর্বে হত্যা করলে কোন ক্ষতি নেই। এ অবস্থায় এসব প্রাণীকে হত্যা করলে কোন প্রকার পাপ হবে না। যেমন-চিতাবাঘ, বাঘ, বাজ, ভীমরুল, মশা, ছারপোকা, বিষাক্ত পোকা-মাকড়, মাছি, পিঁপড়া ইত্যাদি। ইমাম রাফেয়ী (রহ.) বলেন, ক্ষতিকারক প্রাণীর মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্র, সিংহ শকুন এবং ঈগল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। এসব ক্ষতিকারক প্রাণী হত্যা করা মুহরিম (ইহরামধারী) ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ ছোয়াদ পরিচ্ছেদে আসবে।

প্রবাদ ও উপমা

আরবগণ কাউকে সাবধান করতে চাইলে বলে থাকেন حذاقة حذاقة وراك بندقة "হে চিল! তোমার পিছনে বন্ধুকের গুলি।" আবু উবায়দাহ বলেন, এ উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কাউকে আসন্ন বা আগত বিপদ থেকে সাবধান করা অথবা কাউকে সাবধান করতে ইচ্ছা করলে আরবগণ এটা বলতে থাকেন। বন্দুক দ্বারা উদ্দেশ্য বন্দুকের গুলি।

চিকিৎসায় চিলের উপকারিতা

চিলের পিত ছায়ায় শুকিয়ে কোন একটি বোতলে ভরে রাখতে হবে। কাউকেও যদি বিষাক্ত কোন প্রাণী দংশন করে তবে দংশিত স্থানে সেই পিত ফোঁটা ফোঁটা করে ফেললে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। চিলের পিত দ্বারা সুরমা বানিয়ে চোখে লাগাতে হবে, যদি ডান চোখ কাটা হয় তবে সুরমার শলাকা দ্বারা বাম চোখে এবং বাম চোখ কাটা হলে ডান চোখে ব্যবহার করতে হবে। চিলের পিত হালকা পিষে সাপের গর্তে ছিটিয়ে দিলে সাপ মরে যাবে। শ্বাসকষ্ট রোগীকে চিলের রক্ত মিশক জাফরানে মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। যে ঘরে চিলের পিত রাখা হয় সেই ঘরে সাপ, বিচ্ছু প্রবেশ করে না।

চিল স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে চিল দেখলে যুদ্ধ-বিগ্রহের আলামত। যেহেতু আরবগণ তদের প্রবাদে বলে থাকে : বলে থাকেন حذاقة حذاقة وراك بندقة এ প্রবাদটি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বলে থাকেন। আসলে حذاقة ও بندقة দুটি গোত্রের নাম। একবার حذاقة গোত্র بندقة গোত্রের উপর আক্রমন করে তাদেরকে পরাজিত করে। আবার কোন এক সময় بندقة গোত্র حذاقة-কে পরাজিত করে।

কেউ কেউ বলেন, হিদাত বলা হয় চিলকে, আর বান্দাকাহ বলা হয় শিকারীকে। কোন কোন সময় চিল স্বপ্নে দেখলে, নিরেট ফাসিক ও ব্যভিচারিণী নারীর ইঙ্গিতবহ। আর অনেক চিল একসাথে দেখা চোর-ডাকাত-এর দিকে ইঙ্গিতবহ। ইবনুদ দাকাক বলেন, চিল দ্বারা কোন কোন সময় জালিম বাদশাহর দিকে ইঙ্গিত করে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে সে চিল ধরেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে, সেই লোকের ছেলে সন্তান হবে এবং সে বালিগ হওয়ার পূর্বেই বাদশাহ হয়ে যাবে। আর যদি তার হাত থেকে চিল উড়ে যায় তাহলে ব্যাখ্যা হবে সন্তানটি মারা যাবে।

১৯৯. الحذف (আল-হাযাফ) ভেড়ার বাচ্চা

আল-হাযাফ বলা হয় ছোট ছোট মেষ শাবককে। নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

لا يتخللكم الشيطان كانها حذف

শয়তান তোমাদেরকে নামাযে অমনোযোগী করে দেয়, যেন তারা ভেড়ার বাচ্চা।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে كأولاد الحذف (ভেড়ার বাচ্চার মত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর নবী! আল-হাযাফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? জবাবে তিনি বললেন, ভেড়ার বাচ্চা।

২০০. الحر (আল-হুররু) ভাল জাতের ঘোড়া

আল-হুররু-এর বিভিন্ন অর্থ হয়– ভাল জাতের ঘোড়া, কবুতরের বাচ্চা, পুরুষ শকুন, হরিণের বাচ্চা, সাপের বাচ্চা, শিকারী বাজ। ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, আল-হুররু হল সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট ছোট একধরনের প্রাণী। এর লেজ ছোট এবং স্কন্ধ ও মাথা বড় হয়ে থাকে।

২০১. الحرباء (আল-হারবা) গিরগিটি

গিরগিটি-এর উপাধি হল, আবু খাজারিব, আবু যিন্দীক, আবুশ শাকীক, আবু কাদিম। এটাকে আবার জামালুল ইয়াহুদও বলা হয়ে থাকে।

ইমাম কাযবিনী (রহ.) 'আজাইবুল মাখলুকাত' গ্রন্থে গিরগিটিকে জন্মগতভাবে অতি আশ্চর্য প্রাণী বলে অভিহিত করেছেন। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর জন্য জীবিকা অন্বেষণ ও ব্যবহার অপরিহার্য। মডেল বিহীন কারিগর (আল্লাহ তাআলা) এই গিরগিটিকে অত্যাশ্চর্য করে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রাণীটি প্রচেষ্টা বিহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার আহার্য পেয়ে থাকে। সুতরাং সারা জাহানের স্রষ্টা তার চোখে এমন শক্তি সঞ্চিত করে রেখেছেন যে, গিরগিটি কোন কষ্ট ছাড়াই তার চোখ চারিদিকে ঘুরাতে পারে। যে বৃক্ষে সে বসবাস করে তার রংও পরিবর্তন করে দেয়। দর্শক বুঝতে পারে না এ বৃক্ষে কোন প্রাণী আছে। গিরগিটি ও বৃক্ষের রং এক হয়ে যায়। তার প্রকৃতি ও রং পরিবর্তনের বিষয়ে প্রবাদ রয়েছে।

আকৃতি ও রং পরিবর্তনে সে অদ্বিতীয়। সে যখন কোন ভয়-ভীতি অনুভব করে তখন নানান রং ধরে ফেলে। এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখে হত্যাকারী বা শিকারী নিজেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার ক্ষুধা পেলে শিকারের কাছে গিয়ে

বিদ্যুৎগতিতে তাকে ছোঁ মারে। অতঃপর রং পরিবর্তন করে বৃক্ষে চলে আসে। দর্শক বা শিকারী মনে করে এটা গাছেরই একটি অংশ। এর জিহ্বাও বেশ লম্বা হয়ে থাকে। কমপক্ষে তিন বিঘত (পৌনে এক হাত) দুরের শিকারকে সে সহজেই ধরে ফেলতে পারে। গিরগিটি টিকটিকির চেয়ে বড় হয়ে থাকে। সূর্যের সাথে সে ঘুরে। সূর্যের তাপেই সে রং পরিবর্তন করে নানা ধরনের রং ধরতে পারে। যেমন : লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি। স্ত্রী গিরগিটিকে উম্মে হাবীন বলা হয়। এর বহুবচন حرابى ও حرباء হয়ে থাকে।

এক ব্যক্তি তার ভাইপোর সাথে ঝগড়া করল। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে মামলা দায়ের করা হল। লোকটি তার ভাতিজার বিরুদ্ধে একটার পর একটা প্রমাণের স্তূপ পেশ করল। এতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি তো এ কবিতার সত্যায়নকারী হয়ে গেলে। যেমন কবি বলেন :

انى اتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق الا ممسكا ساقا

আমি তার সম্মুখে সেই গিরগিটির মতই আসি, যা বৃক্ষের ডালে সার্বক্ষণিক রং বদলায়। যেমন লোকটি একটি প্রমাণ শেষ থেকে না থেকেই আরেকটি উপস্থাপন করে। যেমন গিরগিটি ধারাবাহিকভাবে তার রং পরিবর্তন করে।

উল্লেখিত কবিতায় সাক দ্বারা ডাল উদ্দেশ্য। মূলকথা হল, একটি প্রমাণ শেষ থেকে না থেকেই আরেকটি প্রমাণ আরম্ভ করে। যেমন গিরগিটি রং বদলায়। দামেরী (রহ.) বলেন, এর নাম 'হারবাউয যাহিরাহ'। প্রথম গিরগিটি টিকটিকির মতই ছোট ও মেটো রঙের হয়ে থাকে। বড় হওয়ার পর তার এ রং দূর হয়ে যায়। গিরগিটি সর্বদা সূর্যের অনুসন্ধানে থাকে। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে সে-ও তার অনুসরণে ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং একে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। সূর্য স্থির হওয়া পর্যন্ত গিরগিটি কোন উচুঁ স্থানে বা গাছের ডালে চড়ে সূর্যকে দেখতে থাকে। কিন্তু সূর্য যখন তার উপর চলে আসে এবং তাকে দেখা না যায় তখন বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সূর্যকে অন্বেষণে পেরেশান হয়ে যায়। আবার পশ্চিম দিকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকে এবং সূর্য অস্ত গেলে গিরগিটি খাদ্যের অন্বেষণে বের হয়।

প্রাণী বিশারদগণ গিরগিটিকে সূর্য পূজারী বলেছেন। তার জিহ্বা তিন বিঘত লম্বা হয় এবং এর সাহায্যে দূর থেকেই শিকার করে নেয়। আর খাদ্য নালিতে লুকিয়ে নেয়। স্ত্রী গিরগিটিকে উম্মে হাবীন বলা হয়। (এর বিস্তারিত বিররণ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে আসবে।)

আবু নজম তার কোন কোন কবিতায় গিরগিটিকে শাকী নামে উল্লেখ করেছেন। অথচ কোন অভিধানেই এর এ নাম পাওয়া যায় নি। শুধু এটুকুই যে

গিরগিটি সূর্যকে অভ্যর্থনা জানায় বা পূজা করে। গিরগিটি অত্যন্ত চতুর প্রাণী। সূর্যের তাপে নিজের রং পরিবর্তনের সাথে তা তার হত্যাকারীর আওতার বাইরে চলে যায় এবং দ্রুত এক ডাল থেকে অন্য ডালে চলে যায়। গিরগিটি বাদুরের মাথার ন্যায় ছোট মাছের সদৃশ্য হয়। টিকটিকির মত এ নলা (পা) থাকে।

জামাল উদ্দীন ইবনে হিশাম বলেন, গিরগিটি উটের কুঁজের মত হয় এবং নানা রং ধারণ করে। যে বৃক্ষে সে বসবাস করে সে বৃক্ষকে যেকোন রঙে রাঙিয়ে দেয়। তার উপাধি আবু কুররা। মাছি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি যখন তার কাছে আসে তখন ছোঁ মেরে তাকে গিলে ফেলে।

গিরগিটির শরঈ বিধান

গিরগিটি খাওয়া জায়িয নয়। কেননা এটা টিকটিকি জাতীয় প্রাণী। জাহিয ও জাওহারী বলেন, যেহেতু উম্মে হাবীন পুরুষ এবং উম্মে হাবীন খাওয়া যেহেতু জাযিয়। সুতরাং গিরগিটি খাওয়া জায়িয হওয়া চাই। এর জবাব হল, গিরগিটি টিকটিকি জাতীয় হওয়ার কারণে হারাম করা হয় না; বরং স্বয়ং তার মাঝেই হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান। তাহল, গিরগিটি বিষাক্ত প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত।

উপমা ও প্রবাদ বাক্য

যে ব্যক্তি এক অবস্থায় থাকে না বরং সময় ও সুযোগ মত রং বদল করে আরববাসী এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলে থাকে

فلان يتلون كلون الحرباء

"অমুক ব্যক্তি বারবার গিরগিটির মত রং পরিবর্তন করে।"

اجود من عين الحرباء

"গিরগিটির চোখের চেয়েও অধিক দানশীল।"

واحزم من الحرباء

"গিরগিটির চেয়ে অধিক সাবধানী।"

হাযম সতর্কতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোন কাজের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসায় গিরগিটির উপকারিতা

চোখের পাতার চুল উপড়ে চুলের ঘোড়ায় গিরগিটির রক্ত লাগালে চুল উঠবে না। কোন লোকের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে এবং চোখে ঝাপসা দেখলে এর পিত সুরমা করে চোখে ব্যবহার করলে চোখের যাবতীয় ঝাপসা দুর হযে যাবে। কারও মাথায় ফোড়া হলে এর চর্বি লোহার পাত্রে গরম করে লাগালে ফোড়া থাকবে না।

স্বপ্নে গিরগিটি দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে গিরগিটি দেখার অর্থ হল, এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা সে পাবে যা থেকে তাকে অপসারণ করা সম্ভব হবে না। কেননা, গিরগিটির অভ্যাস হল সে সূর্যের সাথে সখ্যতা রাখে; তার থেকে পৃথক হয় না। আবার গিরগিটি দেখা বাদশাহর খেদমতও হতে পারে। কখনও ধর্মীয় বিষয়ে ফিতনার দিকেও ইঙ্গিতবহ হয়ে থাকে। কখনও অগ্নি উপাসক রমণীও হয়ে থাকে। আবার কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপকও হতে পারে। আবার মৃতের জন্য শোক ও বিলাপও উদ্দেশ্য হতে পারে।

২০২. الحرذون (আল-হিরযুন) গুঁইসাপ সদৃশ্য প্রাণী

হিরযূন হা বর্ণ যের। গুঁই সাপের মত এক প্রকার প্রাণী। কোন কোন আলেম বলেন- পুরুষ গুঁইসাপকে 'হিরযূন' বলে। কেননা গুঁই সাপের মত তার দুটি লিঙ্গ থাকে। এটা খুব শক্তিশালী প্রাণী। সাধারণত তালাবদ্ধ দালান-কোঠায় তারা বসবাস করে। মানুষের হাতের মত তার হাত আছে। কিন্তু তার চামড়ায় ধবল নেই যেমন ধবল আছে টিকটিকির চামড়াতে। দামেরী (রহ.) বলেন, এটা গুঁই সাপের মতই এক প্রকার প্রাণী।

হারযূনের শরঈ বিধান

এটা খাওয়া হারাম। কেননা এটা বিষাক্ত প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত।

চিকিৎসায় উপকারিতা

এরিস্টটল লিখেছেন : এর চর্বি মেখে কুমীরের সাথে মুকাবিলা করলে কুমীর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এর চর্বির গন্ধে জংলী গাধা কাছে আসে না। এর চামড়া পুড়ে যদি নিজের শরীরে মালিশ করা হয় তাহলে আঘাতের যন্ত্রণা মোটেও অনুভূত হয় না। এমনকি দেহ টুকরা টুকরা করলেও যন্ত্রণা অনুভূত হবে না। চোর ও ডাকাতরা এটা করে থাকে, যাতে প্রচণ্ড মার খেয়েও সহ্য করতে পারে। এ প্রাণী বিচ্ছুকে হত্যা করে ফেলে। তিনদিন পর যার জ্বর আসে এমন ব্যক্তির গলায় এ প্রাণীর চর্বি কালো কাপড়ে পেচিয়ে বেঁধে দিলে জ্বর সেরে যাবে।

স্বপ্নে এ প্রাণী দেখার ব্যাখ্যা

এ প্রাণীর স্বপ্নে দেখা লোভ- লালসার লক্ষণ। কখনও কখনও ভুলে যাওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করে।

২০৩. الحرشوف والحرشاف (হারশাক বা হারশূফ) হালকা পাতলা পঙ্গপাল

হারশাক হালকা পাতলা টিড্ডি। এর একবচন حرشافة। এ ধরনের টিড্ডি বিপুল পরিমাণ খেতে পারে। খাওলা বিনতে সা'লাবাহ (রাঃ)-এর হাদীসে আছে: তিনি স্বামীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট

মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার স্বামী আমাকে انت كظهر امى বলেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে নাযিল করেন :

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله

"নিশ্চয় আল্লাহ সে রমণীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফায়সালা কামনা করতেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাকে বললেন, তোমার স্বামীকে বল একটি গোলাম আযাদ করে (যিহারের) কাফ্ফারা আদায় করে দিতে। স্ত্রী বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো এটা করতে সক্ষম হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে বল। স্ত্রী আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এতেও তিনি সক্ষম হবেন না। কেননা তিনি দুর্বল, হালকা পাতলা টিড্ডির মত। চোখও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উক্ত হাদীসে দুর্বল ও হালকা পাতলা টিড্ডির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২০৪. الحرقوص (হুরকূস) মশার মত এক প্রকার বিষাক্ত পোকা

হা ও কাফ বর্ণে পেশ। হুরকূস মশার মত এক প্রকার বিষাক্ত পোকা। অভিধানে ص-এর স্থলে س-ও ব্যবহৃত হয়েছে। মশার মত তবে শরীরে লাল এবং হলুদ রঙের দাগ থাকে এবং রঙ হয় কালো। কখনও কখনও এর পাখা পড়ে যায়। কবি বলেন :

ما لقى البيض من الحرقوص يدخل تحت الحلق المرصوص

হুরকূসকে কখনও মশার মত সাদা ধরা যায় না, তবে তার গলার নিচে একটি ধারাল (যন্ত্র) থাকে।

من مارد لص من اللصوص يمهو لاغال ولا رخيص

এটা চোরদের মধ্যে বড় অবাধ্য চোর। না তাকে ধরা যায় কোন উচ্চ মূল্যে আর না সস্তা মূল্যে।

কেউ কেউ বলেন, হুরকূস বানরের মত এক ধরনের প্রাণী। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে এ কবিতা পেশ করেন : مثل الحراقيص على حمار যেমন বানর গাধার উপর।

আল্লামা যামাখশারী (রহ.)-এর "রবিউল আরবার" নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে হুরকূস বিচ্ছু থেকে বড় প্রাণী। বিচ্ছুর চেয়ে তাদের কামড় শক্ত। এরা মেয়ে লোকের লজ্জাস্থানে কামড় দিতে ভালবাসে। পিপীলিকার মতই তাদের দুটি পাখা গজায়। কেউ কেউ বলেন, হুরকূস বিচ্ছুরই অপর নাম। এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি এই কবিতা উল্লেখ করেন :

ولو ان حرقوصا على ظهر قملة يكر على صفى تميم تولت

আর যদি হুরকূস একটি উকুনের পিঠে সওয়ার হয়ে আমীম গোত্রের কাতার বন্দি লোকের উপর আক্রমন করে তাহলে তারা মোকাবিলা না করে পলায়ন করবে।

হুরকূসকে নহীকও বলা হয়। এক আরবী মহিলা বলেন :

يا ايها الحرقوص مهلا مهلا أإبلا اعطيتنى ام نحلا

ওহে হুরকূস! থাম! থাম! তুমি কি আমাকে উট দিয়েছ, না-কি মৌমাছি?

ام انت شيئ لا تبالى الجهلا

অথবা এমন জিনিস দিয়েছ যে, অজানা কাজের কোন পরোয়া নেই।

ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, হুরকূস একটি হারাম প্রাণী। বাঘের মত তার বিষাক্ত নখর রয়েছে চাবুকের তীক্ষ্ণ প্রান্তের মত। এর দ্বারা সে মারাত্মক ছোবল দেয়। এ জন্য তাকে চাবুক দ্বারা পেটানো হয়েছে। তার বেলায় বলা হয়ে থাকে আমাকে 'হুরকূস' ছোবল দিয়েছে।

নোট-জ্ঞাতব্য বিষয়

হুরকূস সা'দী তামিমী (লাঠিধারী) যারা মসজিদে পেশাব করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল বণ্টনের সময় তারা বলেছিল, সঠিকভাবে বণ্টন করুন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। আমি যদি সঠিকভাবে বণ্টন না করি তাহলে কে করবে? আমি যদি ন্যায় বিচার না করি তাহল তোমরা নিঃস্ব ও ধ্বংস হয়ে যেতে অর্থাৎ একবার তারা একটি জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। এ মামলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যুবায়েরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। ইবনে আসীর (রহ.) বলেন, ইবনে যুহাইর সা'দীকে 'হুরকূস' বলে। তাবারী (রহ.)-ও স্বীয় গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন-হরমুযান পারসী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং বিদ্রোহ করেছিল। তার সাথে ইকরাদ গোত্র অন্যান্যরা যোগ দিল। সুতরাং উতবা ইবনে আগওয়ান আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ)-কে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তার মুকাবিলার নির্দেশ জারি করলেন এবং হুরকূসকে মুসলমানদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। হুরকূস ও হরমুযান-এর মধ্যে যুদ্ধ হলে হরমযান পিছে হঠে গেল। হুরকূস আহওয়ায বিজয় করে তা দখল করে নিল। এ যুদ্ধে হুরকূস বিরাট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। হুরকূস হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। তাঁর সাথে সিফফীন যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর সে খারেজীদের সাথে মিলিত হয়েছিল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রবল

শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) ৩৭ হিজরীতে খারেজীদের মুকাবিলা করলেন। উহাতেই সে মারা যায়।

হুরকুসের শরঈ বিধান

হুরকুশ যেহেতু পোকা মাকড় খায় তাই তা খাওয়া হারাম।

২০৫. الحريش (আল-হারীশ) চেলা

'আল-হারীশ' চেলা বা কেরা অর্থাৎ বহুবদ বিশিষ্ট প্রাণী। জাওহারী বলেন, কোন কোন অভিধানবিদদের মতে 'হারীশ' হল ভূ-চর চতুষ্পদ জন্তু। বাঘের থাবার মত তার থাবা আছে। তার কপালে একটি শিং আছে। এ প্রাণীকে কিবকুদূনও বলা হয়। আবু হাইয়ান তাওহীদের মতে বকরীর সমান চতুষ্পদ জন্তুর নাম হারীশ। এটা খুব শক্তিশালী ও দ্রুতগতি সম্পন্ন এর মাথায় শক্ত ও সোজা শিং আছে। এর সাহায্যে সে অন্যান্য প্রাণীকে মেরে থাকে এবং জয়ী হয়। তাকে শিকার করার কৌশল হিসেবে এ পন্থা অবলম্বন করা হয় যে, সম্মুখে একজন বালিকা উপস্থিত করা হয়। যখন সে তাকে দেখে, তখন তার দুধ পান করার জন্য দৌড়ে আসে। এটা তার স্বভাবজাত ধর্ম। যা আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এ বালিকার দুধ বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু এ অবস্থায়ই বালিকার দুধহীন স্থানটি চুষতে তার ভাল লাগে। ঠিক সে সময় শিকারী তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তাকে শক্ত রশি দ্বারা বেঁধে ফেলা হয়। তাকে শিকারের এটাই একমাত্র পন্থা।

হারীশ-এর শরঈ বিধান

হারীশ সাপের অন্তর্ভূক্ত হোক অথবা উল্লেখিত প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হোক, সর্বাবস্থায় তা খাওয়া হারাম। কেননা ইসলামী শরীয়তে প্রতিটি দন্তবিশিষ্ট প্রাণী—যারা দন্ত দ্বারা শিকার করে, তা হারাম।

চিকিৎসায় হারীশ-এর উপকারিতা

শ্বাসকষ্টে এর রক্ত পান করলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায়। শূল-বেদনা রোগে এর গোশত বেশ উপকারী।

২০৬. الحسبان (আল-হাসবান) ছোট ছোট মাছ

আল হাসবান—ছোট মাছসমূহকে হাসবান বলা হয়ে থাকে।

২০৭. الحساس (আল হাসাস) ছোট মাছ

২০৮. الحسل (আল-হাসাল) শুইসাপের বাচ্চা

حسل-এর বহুবচন আসে احسال (আহসাল), حسلان (হাসলান) এবং حسالة (হাসালাহ)। গুইসাপের ডিম থেকে যখন বাচ্চা বের হয় তখন এ নামে ডাকা হয়। এজন্য গুঁইসাপের উপাধি হল আবু হাসাল।

শরঈ বিধান

গুইসাপের অন্তর্ভূক্ত বিধায় তা খাওয়া হারাম।

প্রবাদ

আরবগণ বলেন যে, তোমরা গুঁইসাপের বাচ্চার বয়স পেতে পার না। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জীবন। কেননা তার বয়স অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে। সুতরাং কবি রিবাহ ইবনে উজাজ বলেন :

انك لو عمرت عمر العسل او عمر نوح زمن الفطحل

তোমার যদি এমন আয়ু হতে যা গুঁইসাপের বাচ্চার হয় অথবা এত দীর্ঘ যা হযরত নূহ্ (আঃ) পেয়েছিলেন।

والصخر مبتل كطين الوجل كنت رهين هوم وقتل

পাথর থেকে পানি উপচাতে লাগল যেমন কাদা থেকে পানি টপকায়। অতঃপর তোমাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়ে গেল এবং তুমি মৃত্যুর শিকারে পরিণত হলে।

২০৯. الحسيل (আল-হাসীল) বাছুর

আল-হাসীল গৃহপালিত গাভীর বাচ্চা। এর একবচন ও বহুবচনের জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং স্ত্রী লিঙ্গের জন্য حسيلة আসে। এটা ইমাম জাওহারীর অভিমত। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, জাওহারীর এ অভিমত অমূলক। মূলত একবচনে حسيلة এবং বহুবচনে حسيل ব্যবহৃত হয়। এটা আরবগণের নিকট শ্রুত। 'কিফায়াতুল মুহতাফিয' গ্রন্থে বর্ণিত আছে : একবচনের জন্য حسيلة এবং বহুবচনের জন্য حسائل ব্যবহৃত হয়।

২১০. حسون (হুসসূন) মিষ্টি সুরেলা পাখি

হুস্‌সূন নীল কণ্ঠ অর্থাৎ মিষ্টি সুরেলা পাখি। এটা এমন এক পাখি যার রং লাল, হলুদ, সাদা, কালো, নীল ও সবুজ হয়ে থাকে। স্পেনীয়রা এটাকে আবুল হাসান বলে। মিসরীয়রা এটাকে আবু ফুকাবাহ বলে। কখনও সীন দ্বারা পরিবর্তন করে আবু সাকাবাহ বলে। এ পাখি শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা রাখে। যেমন– সে শিক্ষাগ্রহণ করে যে, দূরের কোন ব্যক্তির হাত থেকে কোন বস্তু নিজ মালিকের নিকট নিয়ে আসে। চড়ুই পাখির ব্যাপারে যে বিধান তার ক্ষেত্রেও একই বিধান। (ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত বর্ণনা আইন পরিচ্ছেদে আসবে।)

২১১. الحشرات (আল-হাসারাত)
যে সমস্ত প্রাণী যমীনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে

الحشرات একবচন حشرة হয়। ইবনে আবু আশয়াছ এ সমস্ত প্রাণীকে বলে। কেননা এ সমস্ত প্রাণী ভূমি থেকে কখনও পৃথক হয় না। বাতাসে ও পানিতে যায় না। এরা নিজেদের গর্তে ও যমীনেই বসবাস করে। এদের পানীর কোন প্রয়োজন হয় না আর না কোন ত্রাণ নেওয়ার। এগুলোর মধ্যে সাপ, জংলী ইদুর, গুইসাপ, গিরগিটি, সজারু, বিচ্ছু, গোবরে পোকা, টিকটিকি, পিপড়া, পোকা এবং অন্যান্য প্রাণী অন্তর্ভূক্ত।

নোট-জ্ঞাতব্য বিষয়.

প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (রহ.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী ويلعنهم اللاعنون (এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে) এ আয়াতে لاعنون দ্বারা কীট-পতঙ্গ ও চতুস্পদ জন্তু উদ্দেশ্য। কেননা 'উলামায়ে সু' (বদ আলেম) ও ইলম গোপনকারীদের গুনাহের কারণে তারা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। এ কারণে এসব বাণী 'উলামায়ে সু' (বদ আলেমদের) জন্য বদ দুআ করতে থাকে এবং অভিশাপ দিতে থাকে। এ আয়াত সম্পর্কে এ আপত্তি থেকে পারে যে, বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীর জন্য বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন প্রাণীর বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেন। এর জবাব হল, যেহেতু জ্ঞানহীন প্রাণীর কাজের সম্পর্ক করা হয়েছে এজন্য এমনটি করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউসুফে রয়েছে رأيتهم لى ساجدين (আমি তাদেরকে দেখেছি আমাকে সিজদা করছে।) বলা হয়েছে। অথচ বিধি মোতাবেক ساجدين শব্দটি ساجدات হওয়ার কথা ছিল।

এমনিভাবে অন্য স্থানে বলা হয়েছে : وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا অথচ এটা আরবী ভাষার ব্যবহার বিধির বিরোধী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاعنون দ্বারা জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্যান্য মাখলূকাত উদ্দেশ্য। কারও মতে ফেরেশতা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিজগতই উদ্দেশ্য।

কীট-পতঙ্গের শরঈ বিধান

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আহমাদ (রহ.) ও দাউদ (রহ.)-এর মতে কীট-পতঙ্গ খাওয়া হারাম। অধিকন্তু কীট-পতঙ্গ কেনাবেচা করাও

হারাম। ইমাম মালেক (রহ.) এগুলো হালালের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি তার অভিমতের সপক্ষে কুরআনের এ আয়াত পেশ করেন :

قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة

আপনি বলে দিন আমার উপর ওহীর মাধ্যমে যে আহকাম-বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে তাতে মৃত ব্যতীত কোন খাদ্যবস্তু আমি হারাম হিসেবে পাই নি।

অধিকন্তু ইমাম মালেক (রহ.) এ দলীল গ্রহণ করে থাকেন, কালৃব ইবনে সা'লাবা ইবনে রাবিয়াহ তামিমী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যে ছিলাম, তাকে কীট-পতঙ্গ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা বলতে শুনি নি। (আবু দাউদ)

কালবের পুত্র মিলকান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, (আমার পিতা) কালব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দুআ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার এই কথা বললেন : اللهم اغفر القلب وارحمه

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার বাণী ويحرم عليهم الخبائث (এবং হারাম করেছেন তাদের জন্য অপবিত্র) দ্বারা দলীল পেশ করেন। আর আরবগণ পোকা-মাকড়কে খাবাইস (অপবিত্র)-এর মধ্যে গণ্য করেন। নিম্নোক্ত হাদীসও তার দলীল।

পাঁচটি প্রাণী অপবিত্র। এগুলো হেরেমের বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র মারা জায়িয। যেমন– কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর। (বুখারী)

দ্বিতীয় হাদীস যা উম্মে শরীক (রাঃ)-এর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোবরে পোকা মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর অভিমতের পক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত قل لا اجد فى ما اوحى পেশ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেন : এ আয়াতের মর্ম হল, যে সমস্ত বস্তু তোমরা খাও এবং হালাল মনে কর এগুলোর মধ্যে আমি কোন বস্তুতে হারাম ঘোষণা করি নি এবং আমার প্রতি এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হয় নি। ইমাম গাযযালী (রহ.) আল-ওয়াশীত নামক কিতাবে লিখেছেন : পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে শুধু গুঁইসাপ খাওয়া জায়িয। এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত জংলী ইঁদুর ও সজারু ইত্যাদি। ইনশাআল্লাহ এ সবের বিষয়ে স্ব স্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

২১২. الحشو والحاشية (আল-হাশূ ওয়াল হাশিয়াহ)
উটের ছোট বাচ্চা

উটের অতি ছোট বাচ্চাকে আল-হাশূ ও হাশিয়াহ বলে। এমনিভাবে মানুষের একদম ছোট বাচ্চাকে আল-হাশূ ও হাশিয়াহ বলে।

২১৩. الحصان (আল-হিসান) ঘোড়া

'হিসান' নামকরণের কারণ হিসেবে লোকেরা বলে থাকে যে, যেহেতু এর বির্য সংরক্ষিত থাকে এবং উন্নত জাতের ঘোড়া ব্যতীত অন্য কোন ঘোড়ার সাথে সঙ্গম করে না তাই এটাকে হিসান বলে।

হাদীসে হিসান-এর আলোচনা

এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেছেন, একজন লোক সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিল। তার পাশে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ ছায়া ফেলল এবং তা ধীরে ধীরে সেই লোকটির নিকটবর্তী থেকে লাগল। এ অবস্থা দেখে ঘোড়াটি চমকে উঠল। সকালে লোকটি এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুনালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কুরআন তেলাওয়াতের পর মনে যে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় তাই মেঘের আকৃতি ধারণ করেছিল। কুরআন তেলাওয়াতকারী লোকটি ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হাদীর (রাঃ)।

বনী ইসরাইলের একটি কাহিনী

ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ফিরাউন লোহিত সাগরে প্রবেশ করতে ভয় করছিল এবং ফিরাউন 'আদহাম' নামক ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। এ জন্য হযরত জিবরাইল (আঃ) হামানের আকৃতি ধারণ করে যৌন লিপ্সা সম্পন্ন একটি ঘোটকীর উপর আরোহণ করে ফিরাউনের আগে আগে যেতে লাগলেন এবং ঘোটকীসহ সাগরের ভিতর চলে গেলেন। এদিকে ফিরাউনের ঘোড়াও জিবরাইল (আঃ)-এর ঘোটকীর পিছনে পিছনে সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করল। আর হযরত মিকাইল (আঃ) তার বাহিনীকে পিছন থেকে সমুদ্রের দিকে হাকাতে থাকল। সুতরাং তারা সবাই যখন সুমদ্রের ভিতর প্রবেশ করল তখন হযরত জিবরাইল (আঃ) সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসলেন। তখন সমুদ্র তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসল। অর্থাৎ পানিতে কানায় কানায় ভরে উঠল এবং ফেরাউন সমস্ত সৈন্যসহ ডুবে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে লোক ছিল সাত লক্ষ। আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) ছয় লক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ ছয় লক্ষ বিশ হাজারের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সংখ্যায় ২০ বৎসর ও ৬০ বৎসর বয়সের ব্যক্তিদেরকে গণনা করা হয় নি।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সঙ্গী সাথী মিশরে প্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার নারী-পুরুষ। তারা যখন যাত্রা শুরু করল তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তীহ প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। সুতরাং তারা জানতে পারে নি যে, তারা কোথায় যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাইলের বয়স ও সংখ্যা নির্ণয় করেন। তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) ইন্তেকালের সময় তাঁর ভাইদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা আমাকে ছেড়ে মিসর থেকে চলে যাবে না। এজন্য আমাদের চলার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

মূসা (আঃ) তাদের তাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সমাধির সন্ধান জানতে চাইলে তারা সমাধির সন্ধান দিতে অপারগতা প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আঃ) আহ্বান করলেন যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সন্ধান অবগত আছেন সে আমাকে তার সংবাদ না জানালে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ সংবাদ অবগত করাবেন। আর যে ব্যক্তি এর সন্ধান জানে না সে আমার আওয়াজ শুনতে পাবে না। সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) দুজন লোকের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা মূসা (আঃ)-এর আওয়াজ শুনল না। তবে একজন বৃদ্ধা মহিলা তার আওয়াজ শুনতে পেল। মহিলাটি ছিল বনী ইসরাঈলের। বৃদ্ধা বললেন, আমি যদি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সমাধির সন্ধান দিতে পারি তাহলে আমার যেকোন আবেদন মঞ্জুর করতে হবে। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত আমি তোমাকে একথা বলতে পারি না। আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধার যেকোন আবেদন মঞ্জুর করার আদেশ করেন। বৃদ্ধা বললেন, প্রথম শর্তটি হল জাগতিক। আর তা হচ্ছে, আমি বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে, চলাফেরা করতে অক্ষম এ জন্য আপনি আমাকে এ শহর থেকে বের করে অন্য শহরে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয়টি হল পরকাল সম্বন্ধীয়। আর তা হচ্ছে -আপনি জান্নাতের কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনার সাথে গমন করি। হযরত মূসা (আঃ) তা মঞ্জুর করে নিলেন। এরপর বৃদ্ধা বলে দিল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর সমাধি নীল দরিয়ার মাঝখানে রয়েছে।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলা নিকট দুআ করলেন এতে আল্লাহ তাআলা সে স্থান থেকে সমুদ্রের পানি সরিয়ে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) আরও দুআ করলেন সে সময় পর্যন্ত ফজর উদিত হওয়াকে মুলতবী করে দিন যতক্ষণ না হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে অবসর গ্রহণ করি। এরপর হযরত মূসা (আঃ) সে স্থানটি খনন করলেন এবং সেই সিন্দুক বের হয়ে আসল যাতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্র দেহ সংরক্ষিত ছিল। তিনি এ সিন্দুকটি তার সাথে নিয়ে সিরিয়াতে দাফন করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের রাস্তা খুলে দিলেন আর বনী ইসরাঈল সেখান থেকে মূসা (আঃ)-এর সাথে চলে আসলেন এবং হযরত হারুন (আঃ) তাদের অগ্রভাগে ছিলেন।

এদিক ফিরাউন প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। সে তার গোত্রকে আদেশ করল যে, যখন (সকাল বেলা) মোরগ ডাকবে তখন তাড়া করার জন্য বের হয়ে পড়তে হবে। হযরত উমর ইবনে মায়মুন বলেন, আল্লাহর কসম! সে রাত্রে মোরগ ডাকই দেয় নি। এদিকে ফিরাউন ১ কোটি সৈন্য নিয়ে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করল। সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হামান। তার বাহিনীর মধ্যে সত্তর হাজার অশ্বরোহী ছিল। শাইখুত তাফসীর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) বলেন, ফিরাউনের সৈন্য দলে এক লক্ষ অশ্ব ছিল এবং সাত হাজার অশ্বারোহী ছিল। তাদের পুরোভাগে ১ লক্ষ বল্লমধারী, এক লক্ষ তাবুর খুঁটিধারীর একটি খণ্ড সেনাদল। সমুদ্রের পানি উথাল পাথাল করছিল। ফিরাউন যখন বনী ইসরাঈলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল তখন সূর্য আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থা দৃষ্টে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী সাথীরা ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। হযরত মূসা (আঃ) তার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন। এতে সমুদ্রে ১২টি রাস্তা হয়ে গেল এবং ১২টি রাস্তার মাঝখানের পানি পাহাড়ের মত আড়াল হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বাতাস ও সূর্যের দ্বারা সমুদ্রের কাদামাটি শুকিয়ে দিলেন। সুতরাং বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা এক এক রাস্তায় প্রবেশ করল। প্রতিটি রাস্তার মাঝখানে যেহেতু পানি পাহাড়ের মত দেওয়াল হয়ে গিয়েছিল সেহেতু এক গোত্র অপর গোত্রকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারা এ ভেবে ভয় পেয়ে গেল যে, আমাদের অন্যান্য ভাইয়েরা কোথায় গেল? প্রত্যেক গোত্রের জন্য একটি প্রশস্ত রাস্তা এবং প্রতিটি রাস্তার পানিকে ফেটে যাওয়ার আদেশ করলেন। এতে এক গোত্র অপর গোত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল। এভাবে বনী ইসরাঈলের লোকেরা নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল।

এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আল্লার তাআলা বলেন :

فانجينكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون

"এরপর আমি তোমাদেরকে মুক্ত করলাম, আর ফিরাউন গোষ্ঠিকে ডুবিয়ে দিলাম। আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিল।"

বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার পর ফিরাউন সমুদ্রের কাছে পৌঁছল এবং তার দলীয় লোকদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পেল। তখন সে স্বীয় গোত্রকে ডেকে বলল, দেখ আমার ভয়ে সমুদ্র কীভাবে ফেটে গিয়েছে? যারা পলায়ন করে এসেছিলেন সেই সব দাসদেরকে পেয়ে গেলাম। তোমরা সমুদ্রে নেমে পড়। তার গোত্রের লোকেরা সমুদ্রে প্রবেশ করতে ইতস্ততঃ করছিল। তরা বলছিল, আপনি আমাদের প্রভু, তাই আপনি আগে প্রবেশ করুন। যেমনিভাবে মূসা (আঃ) আগে প্রবেশ করেছিলেন, ফিরাউন তখন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল।

তার বাহিনীর মধ্যে কোন ঘোটকী ছিল না। তাই হযরত জিবরাঈল (আঃ) যৌন লিপ্সাসম্পন্ন একটি ঘোটকীর উপর সওয়ার হয়ে তার বাহিনীর অগ্রে চলে এলেন এবং সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

ফিরাউনের ঘোড়া যখন ঘোটকীর গন্ধ পেল তখন জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোটকীর পিছনে পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফিরাউন তখন অসহায় হয়ে গেল। ফিরাউন জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়া তখন দেখতে পায় নি। ফিরাউনের ঘোড়ার পিছনে পিছনে তার বাহিনী সমুদ্রে নেমে পড়ল। ফিরাউন বাহিনীর পিছন দিকে হযরত মিকাঈল (আঃ) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে একথা বলছিল যে, তোমাদের ভাইদের সাথে মিলিত হও। মূলত তিনি তাদেরকে সমুদ্রের ভিতর হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে যখন সকল ফিরাউনী বাহিনী সমুদ্রে প্রবেশ করল তখন হযরত জিবারাঈল (আঃ) সমুদ্র থেকে বের হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে আদেশ করলেন, ফিরাউনসহ তার বাহিনীকে ডুবিয়ে দাও। অমনি সমুদ্র পূর্বের ন্যায় একত্র হয়ে গেল। ফিরাউন ও তার বাহিনী সবাই ডুবে মরল।

সমুদ্রের উভয় তীরের ব্যবধান ছিল চার ফারসখ (১ ফারসখ = পৌনে চার মাইল) অর্থাৎ ১৮,০০০ মাইল প্রায়। তীর থেকে বনী ইসরাঈল ফিরাউন ও তার বাহিনীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

وانتم تنظرون (আর তোমরা দেখছিলে)।

এ সমুদ্রের নাম লোহিত সাগর। এটা পারস্য সাগরের একটি কিনারা। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এ সমুদ্র মিসরের নিকটবর্তী। একে আসাফ বলে। এ কথা স্বীকৃত যে, ফিরাউন কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। কেউ কেউ এর বিপরীত কথা বলেছেন। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, তাদের অভিমত ধর্তব্য নয়।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কিস্‌সা

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন : খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান যখন মাসয়াব ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করার নিয়তে বের হলেন, তখন তার স্ত্রী আতিকা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া পরমর্শ দিলেন যে, আপনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে বরং অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করুন। তিনি এ ব্যাপারে স্ত্রীর খুব ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু মারওয়ান যখন তার স্ত্রীর কথা মোটেই আমলে নিলেন না তখন তিনি (স্ত্রী) কাঁদতে লাগলেন এবং তার নিকটবর্তী সবলোক তার মহত্ত্বের কারণে কাঁদতে লাগলেন। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান এ দৃশ্য দেখে বললেন, আল্লাহ কসীর (কবির নাম)-কে ধ্বংস করুন! যখন সে এ কবিতা পাঠ করছিল মনে হয় সে এ দৃশ্য দেখেছিল :

اذا ما اراد الغزو لم يثن همه عصان عليها نظم وريزينها

যখন কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করা হয় এবং যুদ্ধ করার হিম্মত না থাকে এবং যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা না করা হয়, তখন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই উচিত।

نهته فلما لم تر النهى عاقة بكت فبكى مما شجاها فطينها

আর যদি রণ প্রস্তুতি ব্যতীত যুদ্ধে যাপিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরবর্তীতে সে যুদ্ধের প্রস্তুতি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত জগা খিঁচুড়ি অবস্থায় চলতে থাকবে।

এরপর আবদুল মালেক তাঁর স্ত্রীকে কসম দিয়ে বললেন, তিনি তার জিহাদ থেকে বিরত থাকবেন না এবং তিনি যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়লেন। ইবনে খাল্লিকান এ ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমনিভাবে খলীফা মামুনুর রশীদের ঘটনা এর চেয়ে আকর্ষণীয়।

খলীফা মামুনের ঘটনা

খলীফা মামুন যখন বুরান বিনতে হাসান ইবনে সাহল-এর সাথে প্রথম রাত্র (বাসর রাত্র) যাপনের জন্য গমন করলেন, তখন তার জন্য স্বর্ণ নির্মিত চাটাই বিছানো হল। এরপর বিপুল পরিমাণ মূতী ছড়িয়ে দেওয়া হল। মামুন চাটাইয়ের উপর নানা ধরনের মূতী ছড়ানো দেখে বলতে লাগলেন, আল্লাহ আবু নাওয়াস (কবির নাম)-কে ধ্বংস করুন। মনে হয় যেন সে এ অবস্থা স্বচক্ষে দেখেই সেই কবিতা পাঠ করেছে যাতে শরাবের মটকার তুলনা করা হয়েছে :

كان كبرى وصغرى من فواقعها حصباء در على ارض من الذهب

ছোট বড় সব পাথরই যেন স্বর্ণের যমীনে বিছানো হয়েছে। এ কবিতা কবি আবু নাওয়াসের সাথে তার নিন্দা স্বরূপ সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে নিয়ম মোতাবেক তার ওযর (আপত্তি) পেশ করলেন যে, এ কবিতায় من অব্যয়টি অতিরিক্ত বলা হয়েছে। অথচ একথা নাহুবিদ আবুল হাসান আখফাসের নিকট জায়িয যে, প্রয়োজন বশত কোন বাক্যে কোন অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা বাণী : من جبال فيها من برد উপস্থাপন করেন। মূল ইবারত ছিল من جبال فيها برد।

২১৪ الحصور (আল-হাসূর) উটনী

হাসূর সে উটনীকে বলে যার পেশাবের ছিদ্র অপ্রশস্ত। অধিকন্তু সেই পুরুষ লোককেও হাসূর বলা হয় যে নারীর নিকট (সঙ্গমের জন্য) যেতে পারে না।

সাগানী 'উবাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ৫৯০ বৎসর পূর্বেই এ কথা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন)

অবহিত করেছেন। আমি তখন যৌবনকাল অতিক্রম করছি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করছি। আমার পিতা আমাকে অধিকাংশ সময় শিক্ষণীয় বিষয় ও দুর্লভ সম্পর্কে অবহিত করতেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। সুতরাং আমার পিতা আমার নিকট আরবদের قد اثر حصير الحصير فى حصير الحصير এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, আমার জানা নেই। তখন তিনি বললেন, প্রথম হাসীর-এর মর্ম চাটাই, দ্বিতীয় হাসীর-এর মর্ম বন্দি, তৃতীয় হাসীরের মর্ম পার্শ্ব, চতুর্থ হাসীরের মর্ম হল বাদশাহ। অর্থাৎ বাদশাহী ছেড়ে বনবাস বাছিয়ে নিল। নরম আরামদায়ক বিছানা পতিত্যাগ করে বন্দি জীবনকে প্রাধান্য দিল। অর্থাৎ মহৎ জিনিস পরিত্যাগ করে নগণ্য ও নিকৃষ্ট বস্তুর পিছনে পড়ল।

২১৫. حضاجر (হাদাজির) বুনো বিড়াল

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর পেট প্রশস্ততার কারণে একে 'হাদাজির' বলে। এ শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। কবি এভাবেই ব্যবহার করেছেন :

هلا غضبت لحل جا رك اذ تنبذه حضاجر

"সে সময় তোমার রাগ কেন আসল না যখন তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতি বুনো বিড়াল নিক্ষেপ করেছিল।"

ব্যাকারণগত একটি পর্যালোচনা

ইবনে সাইয়িদা এ কবিতাকে এভাবে পাঠ করেছেন এবং জাওহারী সামান্য পরিবর্তন করে পড়েছেন। সীরানীর ধারণা বুনো বিড়ালের জন্য 'মাদাজির' শব্দটি বহুবচনের ব্যবহার অধিক অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সিবওয়াই বলেন যে, আমি আরববাসীকে 'হাদাজির' বলতেই শুনেছি। কারণ, এ শব্দটি মা'রেফাহ ও নাকেরাহ উভয় অবস্থায় গায়রে মুনসারিফ থাকে। কেননা শব্দটি একবচনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ শব্দটি বহুবচন। আল্লামা হাজির স্বীয় গ্রন্থ কাফিয়ায় এটা গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে বর্ণনা করেছেন যে, শব্দটি 'ইসমে আলাম'। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এ কারণটি অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

২১৬. الحضب (আল-হাদাব) অজগর

কারও কারও মতে ছোট এবং সাদা সাপকে 'হাদাব' বলে।

২১৭. الحفان (আল-হিফান) চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা

চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাকে হিফান বলে। একবচনের জন্য حفانة (হাফানাহ) আসে। স্ত্রী ও পুরষের জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কখনও উটের বাচ্চাকেই 'হিফান' বলে।

২১৮. الحفص (হাফস) বাঘের বাচ্চা

ব্যাঘ্রের শাবককে 'হাফ্স' বলে। এ কারণে বীর পুরষকেও হাফস বলে।

২১৯. الحقم (আল-হাকম) কবুতর সদৃশ্য বাচ্চা

কবুতর সাদৃশ্য এক প্রকার পাখিকেই 'হাকম' বলে। কেউ কেউ বলেন, কবুতরকেই 'হাকম' বলে।

২২০. الحلزون (হালযূন) কীট

এটা এমন কীট যা সমুদ্র তীরের ছোট ছোট নালায় পাওয়া যায়। কীটগুলো তার খাদ্যের সন্ধানে নিজ গর্ত থেকে তার অর্ধ শরীর বের করে। যদি নরম ও কাদামাটি পায় তাহলে সেখানে গিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে। আর যদি শুকনো ও শক্ত মাটি দেখে, তাহলে বের হয় না এবং নিজের হেফাজতের জন্য গর্তে প্রবেশ করে।

শরীয় বিধান

অপবিত্র হওয়ার কারণে হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝিনুক, শামুক খাওয়া নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ কীটও ঝিনুক জাতীয়।

২২১. الحلم (আল-হিলমু) রক্ত খেকো কীট (আঠালী)

একবচনে حلمة ব্যবহৃত হয়। জাওহারী বলেন, এটা উকুনের মতই একটি কীট। বকরীর গায়ে যে কীট হয় তাকে হিলম বলে। এ কীট হলে চামড়া দুর্বল হয়ে যায়। সুতরাং চামড়াকে যখন খেয়ে ফেলে তখন আরবগণ বলেন, হিলমুল আদীম। ওয়ালীদ ইবনে উকবাহ ইবনে আবু মঈত-এর কবিতায়ও এ দিকে ইঙ্গিত করে।

فانك والكتاب الى على كدابغة وقد حلم الاديم

তুমি ও কিতাব এমন হয়ে গিয়েছ, যেমনিভাবে আঠালী চামডার মধ্যে লেগে থাকে।

অর্থাৎ সার্বক্ষণিক কিতাব পড়তে লেগে থাকা। ইবনে সাকীত বলেন, হিলম দ্বারা উইপোকা বুঝানো হয়েছে।

হাদীস শরীফে আঠালীয় আলোচনা

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে : হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর সওয়ারীর নিকট থেকে আঠালী বের করতে নিষেধ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামসহ নামায পড়ছিলেন। নামায অবস্থায় তিনি তাঁর জুতা মোবারক খুলে এক পাশে

রাখলেন। উপস্থিত নামাযরত সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ আমল দেখে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেললেন। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা কেন জুতা খুলে ফেললে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমাদের জুতাও খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আমার জুতা খুলেছি এ কারণে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতা মুবারকে আঠালীর রক্ত লেগে রয়েছে।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, দম—রক্ত দ্বারা এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল স্বাভাবিক রক্ত, যা ধর্তব্য নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক থেকে বাঁচার জন্য জুতা মোবারক খুলে ফেলেছিলেন।

মাসয়ালা

যেসব রক্ত স্বাভাবিক প্রবাহিত হয় না উলামায়ে কেরাম এ রক্তকে স্বাভাবিক রক্ত বলেছেন। তবে কুকুর ও শকুরের রক্ত ব্যতীত। কেননা এ দুটি প্রাণী প্রকৃতভাবেই অপবিত্র। যেসব রক্ত গোশত ও হাড়ে লেগে থাকে এগুলো পবিত্র। খুব কম ব্যক্তিই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন।

মুসাফির আবু ইসহাক সা'লাবী (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণের একটি বিরাট জামায়াত থেকে বর্ণনা করেন, এ রক্তে কোন অসুবিধা নাই।

ইমাম আহমাদ (রহ.) প্রমুখ বলেন : গোশত ও হাড্ডিতে লেগে থাকা রক্তের রং যদিও গোশতের উপর প্রাধান্য লাভ করে তবুও তা ধর্তব্য নয়। ইমাম আবু ইসহাক (রহ.)-ও এ মত সমর্থন করেছেন। তিনি الا يكون ميتة او دما مسفوحا আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

উল্লেখিত আয়াতে প্রবাহিত রক্ত খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম আসমাঈ (রহ.) বলেন, আঠালী যখন একদম ছোট হয় তখন থেকে এটাকে কুমাকামাহ বলে। এরপর হামনাকাহ, এরপর কুরাদ বলে। এরপর পূর্ণাঙ্গ হলে এটাকে হিলাম বলে।

শরঈ বিধান

অপবিত্র হয়ার কারণে খাওয়া হারাম। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'ক্বাফ' পরিচ্ছেদে কিরাদ শিরোনামে আসবে ।

উপমা ও প্রবাদ

আরবগণ বলেছেন قردان فما بال الحلم দুটি আঠালী হলে কীভাবে সহ্য করা যাবে?

আরবগণের এ কথনটি استنت الفصال حتى القرعى-ও একই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ উটের বাচ্চা বড় হয়েছে এবং আঠালীরাও। মর্ম হল ছোট ও দুর্বলও মুকাবিলায় এসেছে। মাদইয়ানী এ উপমার অন্য একটি অর্থ বলেছেন, যার মর্ম হল, ছোট বানরও এমন কিছু করতে চায় যা বড় বানর করে।

২২২. حمار الاهلية (হিমারুল আহলিউন)
গৃহ পালিত গাধা

حمار-এর বহুবচন حمر, حمير ও احمرة ইত্যাদি। শব্দটির তাসগীর (ক্ষুদ্রত্ব) حمير আসে। তোবা ইবনে হুমাইর লায়লার সাথীর নাম এর থেকে হয়েছে। গাধার উপনাম আবু যিয়াদ ও আবু সাবের। তাই কবি বলেন :

زياد لست ادرى من ابوه ولكن الحمار ابو زياد

"যিয়াদ সম্পর্কে আমি জানি না যে, তার পিতা কে? তবে এটুকু অবশ্যই জানি যে, গাধা হল আবু যিয়াদ।"

অনেকেই গাধাকে উম্মে মাহমুদ, উম্মে তাওলাব, উম্মে জাহাশ, উম্মে ওয়াহাবও বলে থাকে।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এমন কোন প্রাণী নাই যে, তার স্বজাতি ব্যতীত অন্য কারও সাথে সঙ্গম করে। শুধু গাধা ও ঘোড়াই এমন প্রাণী যে একে অপরের সাথে সঙ্গমের ফলে এমন এক জাতি জন্ম নেয়, যারা বিপুল পরিমাণে বোঝা বইতে সক্ষম। এ প্রাণীকে পাক-ভারত উপমহাদেশে খচ্চর বলে।

গাধার আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হল, সে যখন সিংহের গন্ধ পায়, তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পালাতে থাকে। গাধার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে হাবী ইবনে আওস তায়ী আব্দুস সামাদ ইবনে মা'দালকে তিরস্কার করে এ কবিতা বলেছেন :

اقدمت ويحك من حجوى على خطر والبغير بقدم من خوف على الاسد

তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি কি এসেছ এবং আমার হৃদয়ের উপর আক্রমণ করেছ। কেননা গাধা সিংহের উপর তখনই আক্রমণ করে যখন গাধা সিংহকে ভয় করে।

গাধার আরেকটি গুণ হল, যে রাস্তা দিয়ে সে একবার যায়, কখনও সে রাস্তা ভুলে না। গাধার ঘ্রাণ শক্তিও অত্যন্ত প্রখর।

গাধার প্রশংসা ও নিন্দা সম্পর্কে অনেক ধরনের অভিমত ও কথা বিদ্যমান। সুতরাং খালিদ ইবনে সাফওয়ান এবং ফযল ইবনে ঈসা রাককাশী গাধার

সওয়ারীকে তূর্কী ঘোড়ার সওয়ারীর উপর প্রাধান্য দিতেন। খালিদ ইবনে সাফওয়ান-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একবার গাধার উপর সওয়ার হয়ে বসরায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বসরার অনেক গুণী ও সুধীজনের সাথে সাক্ষাৎ হল। ভদ্র লোকেরা গাধার উপর তাকে আরোহী দেখে বললেন, হে ইবনে সাফওয়ান! এ কি? ইবনে সাফওয়ান জবাব দিলেন, এটা একটি পালিত গাধা। শংকর জাতীয় হওয়ার কারণে এটা আমার বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সময় আমি এর উপর আরোহন করে কঠিন পথ অতিক্রম করে থাকি। এর রোগ-ব্যাধিও কম হয়। অধিকন্তু এর চিকিৎসা ব্যয় স্বল্প। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, সে আমাকে এ বিষয়ে বাধা প্রদান করে যে, আমি যেন জালিম ও ঝগড়াটে না হই। এমনিভাবে যখন ফযল ইবনে ঈসাকে গাধার উপর আরোহণের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি কেন গাধার উপর আরোহন করেন? তিনি জবাব দিলেন, গাধার দাম অতি সস্তা এবং সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং প্রয়োজনীয় প্রাণী।

ঘটনাক্রমে ফযলের এসব কথা একজন বেদুইন শুনছিল। তখন সে ফযল ইবনে ঈসাকে জবাব দিল, গাধার বাহন সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাহন। আর সবচেয় খারাপ দিক হল, না এর উপর আরোহন করে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায় আর না নারী লোকের মোহরে তা দেওয়া যায়। অধিকন্তু তার আওয়াজও খুবই অপছন্দনীয়।

আরবদের মধ্যে নিয়ম হল, যখন কারও নিন্দাবাদ অথবা বদনাম করা উদ্দেশ্য হয় তখন আরবদের গাধার সাথে তুলনা করা হয়। পাক-ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশেও এ নিয়ম চালু আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে গাধার বাচ্চা বলে, আর যখন কারও বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উদ্দেশ্য হয় তখন বলা হয়– লোকটি নিরেট গাধা।

আরবের লোকেরা গাধা শব্দটি নিজের মুখের দ্বারা উচ্চারণ করতেও অছসন্দ করে থাকে। বরং প্রয়োজনে তারা গাধার উপনাম ব্যবহার করেন। যদিও বা কোন সময়ে অতি প্রয়োজনে তার নাম উচ্চারণ করতে হয় তবে নাম উচ্চারণ থেকে বিরত থেকে বলে الطويل الاذنين (লম্বা কান ওয়ালা)। আরবদের নিকট গাধার নাম উচ্চারণ করা কোন সমাবেশ ও মজলিসের শিষ্টাচার বিরোধী কাজ। তারা মনে করেন কোন ভদ্র সমাজে ও মাহফিলে গাধার আলোচনা থেকে পারে না। এ কারণে তারা গাধায় আরোহণ লজ্জাজনক মনে করেন।

আল্লামা দামেরী (রাঃ) জাওহারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, مروءة অর্থ হল মানবতা ও মনুষ্যত্ব। ইবনে ফারিস-এর মতে مروءة অর্থ ব্যক্তিত্ব। কোন কোন লোক مروءة অর্থ বলেছেন এমন লোক, যারা নিজেকে গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা

করে। আর কতিপয় লোকের মতে صاحب مروءة এমন সব ব্যক্তি যারা নিজেদের কালের এবং দেশের চালচলন, শিষ্টাচার ও সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন।

দামেরী (রাঃ)-এর মতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নিজস্ব পেশা বা কাজ অনুযায়ী হয়ে থাকে। আবার কারও মতে ব্যক্তিত্ব হলে ধর্মীয় শিষ্টাচারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন কোন সমাবেশে চিৎকার করে কথা বলা, ভিক্ষুককে সাহায্যের পরিবর্তে ধমক দেওয়া, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ভাল কাজ না করা অথবা অধিক পরিমাণে হাসা এবং অট্টহাসি ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে গাধার আলোচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে, আমার ভয় হয়, না জানি আল্লাহ তাআলা তাকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তর করে দেন। অথবা তার মাথা গাধার মাথার মত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসের মর্ম হল আল্লাহ তাআলা তার মাথা গাধার মাথার মত এবং তার শরীর গাধার শরীরের মত বানিয়ে দিবেন। (আল্লাহই ভাল জানেন) যাহোক এ হাদীস দ্বারা চেহারা বিকৃতি ঘটে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (আল্লাহ তাআলা এ ধরনের বিকৃতি থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন) আর এমন তখনই হয়, যখন আল্লাহ তাআলার ক্রোধ অত্যন্ত বেশি হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

"আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বড় আযাবের বিষয়ে অবহিত করব না যে, যার উপর আল্লাহ লা'নত ও গযব পতিত হয়েছে। যাদের আল্লাহ বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তর করে দিয়েছেন। আর এ আচরণ তাদের সাথেও করেছেন যারা শয়তানের পূজা করে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদা ও অন্যান্য আরকান ইমামের পূর্বে আদায় করা হারাম।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়বে। কেননা শয়তানকে দেখে গাধা চিৎকার করে। আর যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহর নিকট তার কল্যাণের নিবেদন করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতাদেরকে দেখে ডাক দেয়। (মোরগের বিষয়ে আলোচনা ইনশাআল্লাহ দাল পরিচ্ছেদে আসবে।)

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি ইবনে যুফার-এর গ্রন্থ 'আন-নাসাই'-এ দেখেছি যে, তিনি তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একবার স্পেনের একটি সীমান্ত এলাকাতে গিয়েছিলাম। সেখানে কর্ডোভার এক যুবক আলেম ফকীহ-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আলেম যুবকটি আমাকে তার কথার ও জ্ঞানের মোহে ফেলে দিল। আমি একদিন তার সম্মুখে এ দুআ চাইলাম يا من قال واسألوا الله من فضله (ওহে সে পবিত্র সত্তা যিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট তার দয়া প্রার্থনা করা) এ দুআ শুনে যুবক আলেম বললেন, যদি আপনি বলেন, তাহলে আমি এ আয়াত সম্পর্কিত একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করতে পারি। আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। সুতরাং তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন– আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের উদ্ধৃতিতে এ কাহিনী বর্ণিত যে, আমাদের এখানে তালীতার (এ স্থানের নাম) দুজন পাদ্রী যাদেরকে নিজ শহরে অত্যন্ত সম্মানিত লোক মনে করা হতে তারা আগমন করলেন। তাঁরা কুরআনের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তারা নিজদেরকে মুসলমান মনে করতেন। তারা কুরআন ও ফিকহ বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। ফলত আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে কেউ একজন তাদেরকে এখানে থাকতে দিলেন এবং তাদেরকে খুব খাতির ও সাহায্য সহযোগিতা করলেন। অথচ শহরের লোকজন তাদের বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতেন না।

তারা উভয়েই বৃদ্ধ ছিলেন। সুতরাং কিছুদিন পর তাদের একজনের মৃত্যু হল। কিন্তু দ্বিতীয়জন বছরের পর বছর আমাদের এখানে বসবাস করতে লাগলেন। হঠাৎ করে একদিন তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা দুজন কেন মুসলমান হয়েছিলেন? আমি তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তার তা অপছন্দ মনে হল। কিন্তু আমি তার সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করলাম। আবারও আমি তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি বর্ণনা করলেন যে, আহলে কুরআন অর্থাৎ মুসলমানদের একজন বন্দি একটি গির্জার খেদমত করত। আর আমরা সে গির্জার ছোট ঘরে বসবাস করতাম। আমরা সে বন্দিকে আমাদের খেদমতের জন্য নিয়া আসলাম। বন্দি লোকটি আমাদের নিকট দীর্ঘদিন কাটাল। আমরা তার নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করলাম। আর যেহেতু সে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করত সেহেতু আমাদেরও অনেক আয়াত মুখস্ত হয়ে গেল। একদিন সে এ আয়াত পড়ছিল واسئلوا الله من فضله (আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।)[১] এ আয়াত শুনে আমি আমার

[১] (সুরা নিসা : ৩২)

সঙ্গীকে যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন তাকে বললাম, আপনিও শুনেছেন এ আয়াত কোন বস্তুর দিকে আহ্বান করছে। এ কথায় আমার সঙ্গী আমাকে ধমক দিলেন। এরপর বন্দি লোকটি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

وقال ربكم ادعونى استجب لكم

আর তোমাদের প্রতিপালক বললেন, তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তা কবুল করব।

এ আয়াত শ্রবণ করে আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, এ আয়াতটি প্রথম আয়াতের চেয়েও অধিক পরিপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। এতে আমার সাথী বললেন, মুসলমান যা বলেছে আমার মনে হয় তা ঠিকই বলেছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) যে নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি মুসলমানদেরই নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তারপর একদিন এমন হল যে, আমরা খানা খাচ্ছিলাম আর সে মুসলিম বন্দি দাঁড়াইয়া আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার মুখে খাদ্য আটকে গেল। আমি বন্দীর হাত থেকে শরাবের পিয়ালাটি নিয়ে নিলাম এবং অতিরিক্ত শরাব পান করা অপছন্দ করলাম। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, ইয়া রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আপনি আমার এ বাণী দিয়েছেন ادعونى استجب لكم এবং اسئلوا الله من فضله যদি সে নবী যার মাধ্যমে আপনি এ বাণী পৌঁছিয়েছেন, তিনি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমার পানি পান করিয়ে দিন।

একথা বলতে না বলতেই সেখানকার একটি পাথর ফেটে গিয়ে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত থেকে লাগল। আমি দ্রুত উঠে সে পাথরের কাছে পৌঁছলাম এবং তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম। আমি যখন পানি পান করে শেষ করলাম তখন পানি বের হওয়া বন্দ হয়ে গেল। এ সময় আমার পিছনে দাঁড়িয়ে মুসলিম বন্দি এ দৃশ্য দেখছিলেন। এ কারণে তার অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হল আর আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ দেখা দিল। এ ঘটনা আমি আমার সঙ্গীকে বললাম। এরপর আমি ও আমার সঙ্গী উভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। পরদিন সকালে মুসলিম বন্দি এসে তার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমরা উভয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়ে তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। কিন্তু সে কোথায় যেন গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেল।

আমরা উভয়ে নিজেদের বিষয় নিয়ে পেরেশান ছিলাম যে, কোথায় গিয়ে কীভাবে প্রকৃত হেদায়েত অর্জন করি এবং দীন ইসলামকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। অবশেষে আমার সাথী যিনি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন চিন্তা করে বললেন, আমাদেরকে ঐসব দুআর মাধ্যমেই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে। সুতরাং আমরা সেই ব্যাকুলতা থেকে মুক্তির জন্য দুটি আয়াত পড়ে দুআ

করলাম এবং দ্বিপ্রহরের সময় শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম তিনজন সৌম্যকান্তি যুবক আমাদের খানকাতে প্রবেশ করলেন এবং খানকায়ে রক্ষিত মূর্তিগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। ইঙ্গিত করতেই মূর্তিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা একটি কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে সেখানে বিছিয়ে দিলেন। তারপর তাদের মতই বিরাট একদল সৌম্যকান্তি চেহারার লোক যাদের মাথা থেকে নূর চমকাচ্ছিল তারা খানকাতে প্রবেশ করলেন। সে দলে একজন লোক এমনই সুন্দর ছিল যে, তার চেয়ে সুন্দর লোক আমি আর কোন দিন দেখি নি। তিনি সে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করলেন। আমি তার সম্মুখে এলাম এবং নিবেদন করলাম যে, জনাব! আপনি কি মসীহ? তিনি জবাব দিলে- আমি মসীহ নই বরং আমি আমি মসীহ-এর ভাই আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, মুসলমান হয়ে যাও। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তারপর আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখান থেকে বের হতে চাই এবং আপনার উম্মতের দেশে যেতে চাই, এর ব্যবস্থা কী? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শোনে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তাদেরকে বাদশাহর নিকট নিয়ে যাও এবং তাকে বল এ দুজন মুসলমান; যে শহরে যেতে পছন্দ করে যেন সে শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর সে বন্দি যে তার ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়াছে, তাকে যেন বলে যে, তুমি তোমার পূর্ব ধর্মে ফিরে আস। সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে তাকে যেন হত্যা করে ফেলে।

তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি আমার সঙ্গীকে জাগিয়ে পূর্ণ স্বপ্নই শুনালাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আমরা কী করি? তখন আমার সঙ্গী জবাব দিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য প্রশস্ত সহজতর কাজ বাতলিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি সে মূর্তিগুলো দেখেন নি যে, তাদের কী দশাই না হয়েছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম যে, মূর্তিগুলো বাস্তবিকই একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এতে আমার ঈমানে আরও তরকী-উন্নতি এসেছে।

এরপর আমার সাথী বললেন, চলুন বাদশাহর দরবারে যাই। সুতরাং আমরা বাদশাহর দরবারে গেলাম। বাদশাহ আমাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করলেন এবং নিয়ম মতে আমাদেরকে বসতে দিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না। আমার সাথী বাদশাহকে বললেন, আমাদের সে মুরতাদ বন্দি সম্পর্কে আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা কার্যকর করুন। একথা শুনা মাত্রই বাদশাহর চেহারা ফ্যাকাসে রং হয়ে গেল এবং তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বাদশাহ যখন কিছুটা ভীতমুক্ত হলেন তখন তিনি সে মুরতাদ বন্দিকে ডাকালেন এবং বললেন, তুমি কি মুসলমান না খ্রিষ্টান? বন্দি মুরতাদ জবাব দিল

আমি খ্রিষ্টান। বাদশাহ বললেন, তুমি পূর্ব ধর্মে ফিরে যাও। কেননা যে লোক তার ধর্মের উপর স্থির থাকে না এমন লোকের আমার প্রয়োজন নাই। বন্দি জবাব দিল আমি কিছুতেই মুসলমান হব না। একথা শুনে বাদশাহ তরবারীর আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

তারপর বাদশাহ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ও তোমার স্বপ্নে যে লোক এসেছিল সে ছিল শয়তান। তাই এখন তোমরা কী চাও? আমরা বললাম, আমরা মুসলমানদের দেশে যেতে চাই। বাদশাহ বললেন : বেশ, আমি এর ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোমরা লোকদেরকে বলবে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসে যাচ্ছি। আমরা বললাম, ঠিক আছে তাই বলব। সুতরাং বাদশাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করলেন। আমরা তোমাদের শহরে এলাম।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতের বেলা যখন তোমরা কুকুরের চিৎকার শুনতে পাবে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাবে অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়বে। কেননা কুকুর ও গাধা সেই সমস্ত বালা-মসিবত দেখতে পায় যা মানুষ দেখতে পায় না। আর তোমরা রাতে ঘর থেকে কমই বের হবে, কেননা রাতে ক্ষতিকারক প্রাণী ও পোকা-মাকড় বের হয়।

সুনানে আবু দাউদ-এ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে সম্প্রদায় এমন মজলিস থেকে উঠে চলে যায় যেখানে আল্লাহর যিকির হয়, এর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোন সম্প্রদায় মৃত গাধা থেকে উঠে এসেছে এবং তার উপর দুঃখ ও লজ্জা হয়। অর্থাৎ এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ করা যেখানে আল্লাহর যিকির হয় না। এ ধরনের মজলিসে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য সর্বদা দুঃখ ও দূর্দশার কারণ বিদ্যমান থাকবে। তারীখে নিশাপুর এবং কামেল ইবনে আদ্দিতে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর উল্লেখ আছে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিকৃষ্টতম গাধা হল কালো ও বেঁটে ধরনের গাধা"।

তাশীর গাধা

জাওহারী বলেন, যে গাধা ঢোক গিলার সময় দশটি আওয়াজ করে তাকে তাশীর গাধা বলে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে কুপ্রথা ছিল যে, যে শহরে কলেরা বা মহামারীর প্রকোপ হত সে শহরে প্রবেশের পূর্বেই গাধার ১০টি হিচোঁ হিচোঁ আওয়াজ করত। কেননা তাদের আকীদা ছিল যে, এরূপ করলে তারা মহামারী থেকে রক্ষা পাবে। তাই কোন এক কবি বলেন

لعمرى لئن عشرت من خيفة الردى نهاق حمار انني لجزوع

আমার প্রাণের কসম! যদি আমি মৃত্যুর ভয়ে দশবার গাধার আওয়াজ করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত বোকামী।

দ্বিতীয় কাহিনী

মাসরূক (রহ.) বলেন, এক গ্রামে এক ব্যক্তি তিনটি প্রাণী পুষত। প্রাণীগুলো ছিল, গাধা, কুকুর ও মোরগ। মোরগ তাকে সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগাত। কুকুর তার ঘর পাহারা দিত এবং গাধা ব্যবহারের পানি ও ঘরের আসবাবপত্র বহন করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত। একদিন হঠাৎ এক শিয়াল এসে সে মোরগটি খেয়ে ফেলল। এতে লোকটি মর্মাহত হল। লোকটি যেহেতু আল্লাহভীরু ছিলেন, তাই বললেন, হয়ত এতে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কোন না কোন মঙ্গল নিহিত রেখেছেন। তারপর অন্য একদিন বাঘ এসে গাধার পেট ছিড়ে ফেললে গাধাটিও মারা গেল। তাতেও লোকটি বলল, হয়ত আল্লাহ আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। এর কিছুদিন পর রোগে আক্রান্ত হয়ে কুকুরটিও মারা গেল। তাতেও লোকটি পূর্বোক্ত মন্তব্যই করল।

একদিনের ঘটনা। লোকটি সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল যে, তার প্রতবেশি সকলকেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। গ্রেফতারের কারণ হল তাদের পোষা জন্তু-জানোয়ারগুলোর চিৎকারে শহরের হাকিমের কষ্ট হত। সুতরাং এ সৎ লোকটির পোষা জন্তুগুলোর মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ কল্যাণ ছিল যে, লোকটি গ্রেফতার থেকে বেঁচে গেল। এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণীর রহস্য উপলব্দি করতে পারে সে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কাজেই সন্তুষ্ট থাকে।

শিক্ষণীয় বিষয়

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'দালাইলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থে আবু সীরাতুন নাখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে এসেছিল। পথিমধ্যে তার গাধাটি মারা গেলে লোকটি অযু করে দু রাকাআত নামায আদায় করে এ দুআ করল–

اللهم انى جئت مجاهدا فى سبيلك ابتغاء مرضاتك وانا اشهد انك تحيى الموتى

وتبعث من فى القبور لا تجعل لاحد على اليوم منة اسالك ان تبعث لى حمارى

'হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে জিহাদ করতে এসেছি, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তুমি মৃতকে জীবিত করবে এবং করববাসীকে পুনরুত্থিত করবে। আজ আমাকে কারও দয়ার

মুখাপেক্ষী করবে না অর্থাৎ আমি ভিক্ষা করতে চাই না। আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি, আমার গাধাটি জীবিত করে দাও।'

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করলেন, তার মৃত গাধা কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, এ ঘটনার সূত্র বিশুদ্ধ। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, মৃতকে জীবিত করা সাহেবে শরীয়াতের (শরীয়াতের মালিক অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণ) জন্য একটি মু'জিযা। উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাঝে এমন পবিত্র ও পূণ্যবান ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান আছেন, যাদের দুআয় মৃত ব্যক্তিও জীবিত হয়ে যায়।

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, আমি সে গাধাটি বাজারে বিক্রি করতে দেখেছি। লোকেরা গাধার মালিককে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি এমন গাধাটি বিক্রি করতে চান, যাকে আল্লাহ তাআলা আপনার খাতিরে জীবিত করে দিয়েছেন। গাধার মালিক জবাব দিলেন, একে বিক্রি না করে কি করব? এ ব্যাপারে এ লোক কবিতার তিনটি চরণ আবৃত্তি করল যার একটি আমার স্বরণ আছে। যেমন :

ومنا الذى احيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو مفصل

আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, আল্লাহ তাআলা তার গাধাকে এমন প্রাণ দান করেছেন যা একজন নবীর গাধার মধ্যে দিয়েছিলেন। অথচ সে গাধার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে প্রাণ বের হয়ে গিয়েছিল।

সে গাধাটির মালিকের নাম নাবাতাতা ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী।

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ

"আর যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দিন যে, কীভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন"। (সূরা বাকারা : ২৬০)

এ আয়াতের তাফসীরে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যা উপকারার্থে নিম্নে বর্ণনা করা হল :

(১) হাসান, কাতাদাহ, আতা খুরাসানী, যাহহাক এবং ইবনে জুরাইহ (রহ.) প্রমুখ মনীষীগণের বক্তব্য হল, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ প্রশ্নের কারণ হল, একবার তিনি একটি মৃত প্রাণীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (ইবনে জুরাইহ (রহ.)-এর মতে তা ছিল একটি মৃত গাধা, যা সমুদ্র তীরে পড়েছিল। আর হযরত আতা (রহ.)-এর মতে সে সমুদ্র ছিল তিবরিয়া) মৃত দেহটি ডাঙ্গার অন্যান্য প্রাণীরা ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল। সমুদ্র যখন উত্তাল থাকত তখন সামুদ্রিক প্রাণীরা তা

ভক্ষণ করত আর সমুদ্র শান্ত থাকলে ডাঙ্গার প্রাণীরা তা খেয়ে পেট ভর্তি করত। পাখিরা তা খেয়ে উড়ে চলে যেত। এ অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিস্মিত হলেন এবং আবেদন করলেন, হে আমার রব! আমি জানি তুমি এ মৃত দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গকে হিংস্র প্রাণী, পানিতে বসবাসকারী প্রাণী এবং পাখির পেট থেকে বের করে আবার একত্রিত করে জীবিত করতে সক্ষম। কিন্তু আমি তা স্বচক্ষে দেখতে চাই যে, এগুলো কীভাবে জীবিত করেন- তাতে আমার জ্ঞান আইনুল ইয়াকীনে-চাক্ষুস দৃঢ় বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কেননা প্রখ্যাত উপমা হল :

شنیدہ کے بود مانند دیدہ

খবর বা সংবাদ দ্বারা পর্যবেক্ষণ হয় তবে পরিদর্শন বা বাস্তব দর্শন দ্বারা যেমন ইয়াকীন দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় তেমনি খবর বা সংবাদ দ্বারা হয় না।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ইচ্ছা অপছন্দ করে বললেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, কেন বিশ্বাস করব না? অবশ্যই আমি আপনাকে বিশ্বাস করি ও আপনার উপর দৃঢ় ঈমাণ পোষণ করি। কিন্তু আমার এ আকাঙ্ক্ষা হল শুধু এজন্য যে, তাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমার বিশ্বাস আইনুল ইয়াকীনে পরিবর্তন হয়ে যাবে। কতেক আরবীয় কবি এর মর্ম অতি সুন্দরভাবে কবিতায় বর্ণনা করেছেন :

لئن كلمت بالتفريق قلبی فانت بخاطری ابدا مقيم

আমার হৃদয়ে যদি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কোন খেয়াল আসে (তবে তাতে কি, কেননা) তুমি তো সার্বক্ষণিক আমার অন্তরে বিদ্যমান আছ।

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكلم

কিন্তু নয়ন তোমার হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও দর্শন লাভের দাবি এমন যেমন হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহর আওয়াজ শ্রবণের পর আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার আবেদন করেছিলেন।

(২) কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের কারণ ছিল, তিনি নমরূদের সাথে বিতর্কের সময় এ দলীল উপস্থাপন করেছিলেন যে, ربی الذی یحیی ویمیت অর্থাৎ আমার প্রতিপালক হলেন তিনি যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। নমরূদ তখন বলেছিল- আমিও তো জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতাবান। এর তাৎক্ষণিক প্রমাণের জন্য সে জেলখানা থেকে দুজন কয়েদীকে ডেকে এনে একজনকে ছেড়ে দিল আর অপরজনকে হত্যা করে ফেলল এবং বলল, দেখলে তো আমি একজনকে হত্যা করলাম আর আরেকজনকে জীবন

দান করলাম অর্থাৎ বাঁচালাম। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা তো মৃতকে জীবন দান করেন। আর তুমি তো জীবিতকেই জীবিত ছেড়ে দিলে মাত্র। আর বলছ- আমি জীবন দান করেছি। এ কথা শুনে নমরূদ বলল, তাহলে আপনি কি আপনার প্রভুকে এমনটি করতে স্বচক্ষে দেখেছেন? তাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিরুত্তর হয়ে গেলেন এবং পরবর্তী বিতর্কে সূর্যোদয়ের কথা বলে নমরূদকে ঘায়েল করে দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করলেন যে, হে আল্লাহ! মৃতকে জীবিত করার দৃশ্যটি আমাকে দেখিয়ে দিন এবং যখন আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? জবাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি তা এ জন্য দেখতে চাই যে, এতে আমার অন্তর স্বীয় প্রমাণের উপর সুদৃঢ় ও প্রশান্তি লাভ করে। আবার যদি নমরূদ আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করে তাহলে বলতে পারব যে, হ্যাঁ, মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত : আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল বানালেন তখন 'মালাকুল মাউত' (মৃত্যুর ফেরেশতা) আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করলেন যে, হে আল্লাহ! আমি নিজে গিয়ে তাঁকে এ সুসংবাদটি শুনাতে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনুমতি দিলেন। মালাকুল মাউত হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর বাড়ীতে আসলেন। কিন্তু তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাই মালাকুল মাউত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘরে তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন অতি লাজুক প্রকৃতির লোক। তিনি যখন বাড়িতে আসলেন তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে বসে থাকতে দেখে তাকে ধরার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? কার অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করলেন? মালাকুল মাউত জবাব দিলেন, ঘরের মালিকই আমাকে অনুমতি প্রদান করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, তিনি কোন ফেরেশতা হবেন এবং তিনি বলতে লাগলেন- তা সত্য বটে। তারপর ফেরেশতা বললেন যে, আমি মালাকুল মাউত। আল্লাহ তাআলার আদেশেই আপনাকে এ সুসংবাদ দিতে এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর খলীল বানিয়ে নিয়েছেন। মালাকুল মাউতের কাছ থেকে এ সুসংবাদ শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এর (খলীল) নিদর্শন কী? মালাকুল মাউত জবাব দিলেন, এর নিদর্শন হল আল্লাহ তাআলা আপনার দুআ কবুল করবেন এবং আপনার কথায় মৃতকে জীবিত করে দিবেন। এজন্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন : "হে আল্লাহ! আমি দেখতে চাই কীভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন।"

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকেও অধিক সন্দেহে নিপতিত। তিনি যখন আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন। এতে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার জীবিত করার প্রতি ইয়াকীন—দৃঢ় বিশ্বাস কর না? হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি পূর্ণরূপে তাতে বিশ্বাস রাখি। তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তা দেখতে চাই। আল্লাহ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-এর উপর রহম করুন। যখন তিনি কঠিন বিপদ মুহূর্তে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটা সুদৃঢ় খুটির আশ্রয়ের আশা পোষণ করেছিলেন। আর আমি যদি এত সময় জেলখানায় কাটাতাম যত সময় কাটিয়েছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাহলে অবশ্যই আমি শাহী ফরমানের আহ্বান কবুল করতাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বানী نحن احق بالشك من ابراهيم এ বিষয়ে ইমাম মাযেনী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন যে বরং সন্দেহ দ্বারা উদ্দেশ্য যে, যদি আমরা আল্লাহর কাছে মৃতকে জীবিত করার জন্য দুআ করি তাহলে তা কবুল করা হবে কি কবুল করা হবে না?

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণীতে তাঁর নিজের উপরই সন্দেহের স্বীকারক্তি করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর নয়। তবে উভয়ের পক্ষ থেকে নেতিবাচক সন্দেহ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল, আমি যেহেতু আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতার উপর সন্দেহ পোষণ করি না সেহেতু ইবরাহীম (আঃ) তো সন্দেহ না করার ব্যাপারে আমার চেয়েও প্রথম নম্বরের ছিলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ ধরনের বাণী শুধু বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ও শিষ্টতা প্রকাশের জন্যই। আর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে তাঁর বাণীও বিনয় প্রকাশের নিমিত্তেই। এ হাদীস দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিতে চাচ্ছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নটা সন্দেহের কারণে ছিল না বরং অধিকতর বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কেননা যেই পরিচিতি ও প্রশান্তি পর্যবেক্ষণ দ্বারা অর্জিত হয় তা দলীল ও যুক্তির দ্বারা অর্জিত হয় না।

অধিকন্তু বলা হয়ে থাকে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন কতিপয় মুসলমান বলতে লাগলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সন্দেহ করেছেন; কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ করেন নাই। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয় হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ফযীলত-মর্যাদা বর্ণনা করার জন্যই একথা বলেছেন। এ আয়াত সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ তোয়া পরিচ্ছেদে 'তাইর' শিরোনামে আসবে।

জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنّٰى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً

অথবা তোমার কি জানা আছে সে লোকটি সম্পর্কে যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যে জনপদের বাড়িগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল? সে বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কতকাল তুমি এভাবে ছিলে? সে বলল, এক দিন অথবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয় বরং তুমি তো একশত বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে সেগুলো পঁচে যায় নি এবং দেখ তোমার গাধাটির দিকে। আর তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর গোশতের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর তার নিকট যখন এ অবস্থা প্রকাশিত হল তখন সে বলে উঠিল, আমি জানি নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা বাকারা : ২৫৯)

আলোচ্য আয়াতের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে। মুফাসসির ও জীবনীকারকগণের মধ্যে এতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে অতিক্রমকারী লোকটি কে ছিল? ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন হযরত আরমিয়া ইবনে হালকিয়া (আঃ)। তিনি হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু হযরত ইকরামা, কাতাদাহ ও দাহহাক প্রমুখ মনীষীদের মতে তিনি ছিলেন হযরত উযাইর ইবনে শারকিয়া (আঃ)।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, অধিকতর বিশুদ্ধ মতামত ইকরামা ও কাতাদাহ (রহ.)-এরই। কিন্তু মুজাহিদ (রহ.)-এর অভিমত হল সে লোক ছিল

কোন কাফির ব্যক্তি যে পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। জনপদটির ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তা কোন বস্তি ছিল, যার পাশ দিয়ে লোকটি অতিক্রম করছিল। সুতরাং কাতাদাহ, ইকরামা প্রমুখ বলেন, জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। যেহেতু দাহহাক (রহ.)-এর দ্বারা পবিত্র ভূমি (আরদে মুকাদ্দাস) উদ্দেশ্য নিয়েছিল। কিন্তু কালবী (রহ.)-এর দ্বারা 'সাবের মন্দির' জনবসতি গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ হেরাকল মন্দির বলেছেন। কারও কারও মতে এটা সে জনপদ ছিল যাতে আল্লাহ তাআলা সে সমস্ত লোকদেরকে ধ্বংস করেন, যারা তাদের ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন। আবার কেউ কেউ 'ইনাব' গ্রাম উদ্দেশ্য নিয়েছিল। যা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দু ফরসখ (১ ফরসখ = পৌনে ৪ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এটা ছিল তখন বিরানভূমি। যারা 'অতিক্রমকারী' ব্যক্তি হযরত আরমিয়া বলেছেন এবং জনপদ দ্বারা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বুঝিয়েছেন, আর সে জনপদের (যার বাড়িগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল) এরূপ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন- যা জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.) উল্লেখ করেছেন আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা হযরত আরমিয়া (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ নাশিয়াহ ইবনে আনুয়াস-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন. যাতে তিনি তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ যাতে তার নিকট পৌছাতে পারেন।

মূলত তিনি (আরমিয়া) বনী ইসরাঈলের প্রতি কার্যনির্বাহী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে তিনি সমকালীন বাদশাহ এবং বাদশাহকে সমকালীন নবীর আনুগত্যের জন্য উৎসাহ দিতে পারেন। সুতরাং তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিধিবিধান দেওয়া হত তা তিনি বাদশাহকে অবহিত করতেন এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যথাপযুক্ত পরামর্শ দিতেন ও হেদায়েত প্রদান করতেন। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈল বিভ্রান্তিমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ল এবং অধিক পাপাচার করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করে আদেশ করলেন যে, তিনি স্বয়ং নিজে গিয়ে যেন বনী ইসরাঈলকে ভাল করে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেসব নিয়ামত দ্বারা অভিষিক্ত করেছেন তা যেন স্মরণ করিয়ে দেন। সুতরাং হযরত আরমিয়া (আঃ) তাদের নিকট গেলেন এবং তাদের সম্মুখে একটি মর্মস্পর্শী ও ফলদায়ক ভাষণ প্রদান করেন। যেই ভাষণটি আল্লাহ তাআলা ইলহাম দ্বারা তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। এ ভাষণে তিনি আনুগত্য করার সাওয়াব, পাপাচার করলে শাস্তির ওয়াদা ও ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা ছিল যে, আমি (আল্লাহ) আমার ইজ্জত ও জালালের (সম্মান ও মহত্ত্বের) কসম করে বলছি যে, যদি তোমরা পাপ থেকে বিরত না হও তাহলে আমি তোমাদেরকে এমন বিপদে ফেলব যাতে মহা

বিজ্ঞজনেরাও বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়বে। আর তোমাদের উপর একজন স্বৈরাচার শাসককে বিজয়ী করে পাঠাব যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ দয়া-মায়া ও প্রেম-প্রীতির লেশও থাকবে না।

এরপর হযরত আরমিয়া (আঃ)-কে ওহী মারফত অবহিত করলেন যে, আমি ইয়াফেসে বসবাসকারী ইসরাঈলদেরকে ধ্বংস করে দিব। (ইয়াফেস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাবেল শহরের বাসিন্দা, আর সে ইয়াফেস ইবনে নূহ-এর বংশের।)

হযরত আরমিয়া (আঃ) আল্লাহ তাআলার এ ফরমান যখন অবগত হলেন তখন তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং স্বীয় পরিধেয় ছিঁড়ে মাথায় মাটি লাগাতে লাগলেন।

এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে হযরত আরমিয়া (আঃ)-কে জানালেন যে, আমার কথা কি তোমার উপর ভারী বোধ হল? হযরত আরমিয়া (আঃ) জবাবে বললেন, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমার প্রতি এ আদেশ অতি দুঃসাধ্য। হে আমার রব! বনী ইসরাঈলকে ধ্বংসের পূর্বে আমার মৃত্যু দিন। কেননা আমি তাদের ধ্বংস চাই না। আল্লাহ তাআলা পুনরায় তার উপর ওহী প্রেরণ করলেন এবং জানালেন যে, আমার ইজ্জতের কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করব না যতক্ষণ না তুমি স্বয়ং তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা কর।

হযরত আরমিয়া (আঃ) এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন, সে সত্তার কসম! যিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছিলেন। আমি কখনই বনী ইসরাঈলের ধ্বংস হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হতাম না। এরপর তিনি সমকালীন বাদশাহর নিকট গেলেন, যিনি অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁকে এ সুসংবাদ শুনান হল । এ সুসংবাদে বাদশাহও আনন্দিত হয়ে বলতে লাগলেন, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তা হবে তাঁরই রহমত অনুগ্রহ।

এরপর তিন বছর অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু বনী ইসরাঈলের লোকেরা সৎ পথে ফিরে আসল না বরং তাদের নাফরমানী আরও বৃদ্ধি পেল। বাদশাহ তাদেরকে বারবার বুঝাতে চেষ্টা করলেন, যেন তারা তাওবা করে। কিন্তু যেহেতু তাদের ধ্বংস ও বিনাশ অতি সন্নিকটে ছিল, সেহেতু তারা বাদশাহর কথা মোটেই আমলে আনল না। বরং আরও অধিক পরিমাণে পাপাচারে জড়িয়ে পড়তে লাগল। এ সময় ওহীও কম কম আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বাবেল শহরের অত্যাচারী বাদশাহ বখতে নসরকে পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বখতে নসর ৬০ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ

করল। বাদশাহ যখন জানতে পারলেন তখন হযরত আরমিয়া (আঃ)-কে বললেন, আপনার সে দাবী এখন কোথায়- যা আমাকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস না করার ওয়াদা দিয়েছিলেন? সে ওয়াদা ভঙ্গের অবস্থা তো আমি দেখতে পাচ্ছি। হযরত আরমিয়া (আঃ) জবাব দিলেন, আমার আল্লাহ কখনই ওয়াদা ভঙ্গকারী নন। তাঁর ওয়াদার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।

বখতে নসরের আক্রমণের সময় যখন একদম ঘনিয়ে আসল তখন আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে নবী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তির আকৃতিতে হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর নিকট পাঠালেন। নবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে এবং কেন এসেছ? সে জবাব দিল- আমি একজন ইসরাঈলী এবং আপনার নিকট আমার গোত্রের লোকদের ব্যাপারে ফাতাওয়া জানতে এসেছি। ব্যাপার হল, আমি তাদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং আমার ভালর বিনিময় মন্দ দ্বারা দিয়ে থাকে। এখন আপনি বলুন কী করতে পারি? নবী বললেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। কেননা এতে তোমার কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। একথা শুনে ফেরেশতা চলে গেলেন।

বেশ কিছুদিন পর সে ফেরেশতা ওই ইসরাঈলী ব্যক্তির আকৃতিতে নবীর নিকট আসলেন এবং সে একই অভিযোগ পেশ করলেন। নবী প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? ফেরেশতা জবাব দিলেন, আমি সে লোক যে ইতিপূর্বে একবার আপনার নিকট এসেছিলাম। নবী বললেন- এখন তারা তোমার সাথে ভাল আচরণ করছে না? ফেরেশতা জবাব দিলেন, না তো। তখন নবী (আঃ) তাকে পূর্বোক্ত উপদেশই প্রদান করলেন। কিছুদিন পর বখতে নসর বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে ফেললেন। তা দেখে বনী ইসরাঈল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাদশাহ হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ওয়াদা বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। নবী (আঃ) এবারও সে জবাবই দিলেন যে, আমার প্রভু অচিরেই তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করবেন। একথা শুনে বাদশাহ চলে গেলেন।

বাদশাহ যখন চলে গেলেন, তখন সে ইসরাঈলী আকৃতিতে ফেরেশতা তৃতীয়বার হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হলেন। সে সময় নবী (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দেওয়ালে বসে আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় হাসছিলেন। তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল। ইসরাঈলী বেশে ফেরেশতাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি কে? সে জবাব দিল, আমি সে ইসরাইলি। ইতিপূর্বে আরও দু'বার আপনার কাছে এসেছিলাম আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের গোত্রের অত্যাচার অবিচার সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আর সহ্য করব না। কারণ, আমার ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেছে। অদ্য আমি তাদেরকে এমন আচরণ করতে

দেখেছি, যা আল্লাহ তাআলার আদেশের সম্পূর্ণ খেলাফ। এ কার্যকলাপ দেখে তাদের উপর আমার সীমাহীন ক্রোধ এসেছে। এ জন্য আমি আপনার সমীপে এসেছি। আমি সে সত্তার কসম দিয়া বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি তাদের ধ্বংসের জন্য দুআ করুন। সুতরাং হযরত আরমিয়া (আঃ) দুআর জন্য হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আসমান ও যমীনের মালিক! যদি তারা (বনী ইসরাঈল) সত্য ও কল্যাণের পথে থাকে তাহলে তাদেরকে জীবিত রাখুন। আর যদি তারা আপনার মর্জির খেলাপ কাজ করে মনে করেন, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিন।

নবীর দুআ শেষ হচ্ছিল সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসে আসমান থেকে এমনভাবে বজ্র দ্বারা আক্রান্ত করলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেল। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের সাতটি দরজা ভূমিতে ধ্বসে গেল। হযরত আরমিয়া (আঃ) এ দৃশ্য দেখে স্বীয় পোশাক ছিড়ে ফেললেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে নিবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কোথায় গেল? আসমান থেকে আওয়াজ আসল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু হয়েছে তা আপনার ফাতাওয়া এবং দুআর কারণেই হয়েছে। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এসব কিছু আমার বদদুআর কারণেই হয়েছে। আর সে প্রশ্নকারী যে বারবার আমার নিকট এসেছিল সে কোন মানুষ নয় বরং সে ছিল আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। এরপর হযরত আরমিয়া (আঃ) সে জনপদ থেকে উধাও হয়ে যান এবং বন্য প্রাণীর সাথে বসবাস করা পছন্দ করেন।

এরপর বখতে নসর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করল। সে মুলকে শাম (সিরিয়া)-কে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে হত্যা করে ফেলল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিরাণ ভূমিতে পরিণত করল। বখতে নসর তার সৈন্যদেরকে আদেশ করল যে, প্রত্যেক সৈন্য নিজ নিজ ঢালে মাটি ভর্তি করে বায়তুল মুকাদ্দাসে এনে ফেল। সুতরাং তার নির্দেশ পালন করে সৈন্যগণ মাটি দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস ভরে দিল। অতঃপর বখতে নসর নির্দেশ দিল, বায়তুল মুকাদ্দাসের অন্যান্য শহরে যত লোক আছে (শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক) সর্বস্তরের লোকদেরকে জমায়েত কর। সুতরাং তার নির্দেশ মত তারা সমস্ত লোকদেরকে একত্রিত করে তার সম্মুখে হাজির করল। বখতে নসর তন্মধ্যে ৭০ হাজার ছেলেকে বাছাই করে তার সাহায্যকারী অন্যান্য বাদশাহদের মধ্যে যারা তার সাথে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। প্রতিজনের ভাগে ৪ জন করে গোলাম আসল। এ সমস্ত গোলামদের মধ্যে হযরত দানিয়াল (আঃ) এবং হানিয়াও ছিলেন। অবশিষ্ট বন্দিদেরকে তিনভাগ করে এক অংশকে হত্যা করা হল এবং অন্য অংশকে গোলাম বানিয়ে নেওয়া হল। আর তৃতীয় অংশকে

সিরিয়ার লোকালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হল। এটাই ছিল প্রথম দূর্ঘটনা যা বনী ইসরাঈলের পাপের কারণে নাযিল হয়েছিল।

বখতে নসর যখন বন্দিদেরকে নিয়ে বাবেল শহরে প্রত্যাবর্তন করল, তখন হযরত আরমিয়া (আঃ) তাঁর গাধার উপর সওয়ার হয়ে চললেন। একটি চামড়ার থলিতে আঙ্গুরের রস এবং একটি আনারের টুকরী তাঁর সাথে নিলেন। যখন তিনি 'ইলিয়া' শহরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি এর পতিত অবস্থা দেখে বললেন انى يحيى هذه الله بعد موتها এই জনপদ বিরান হওয়ার পর আল্লাহ কী করে তা জীবিত করবেন?

এরপর তিনি তার গাধাটি একটি নতুন রশি দ্বারা বেঁধে একস্থানে শুয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে একশত বছর শুয়ে রইলেন। এ সময় তাঁর গাধাটিও মরে গেল। কিন্তু তাঁর সাথে নেয়া আঙ্গুরের রস ও আনারগুলো যেমন ছিল তেমনই তরতাজা রয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পঁচন বা দূর্গন্ধ কিছুই হল না। এ রাস্তায় চলাচলকারী সকল লোক ও অন্যান্য প্রাণীর চোখে পর্দা লাগিয়ে দেয়া হল। সুতরাং এ একশত বছর তাঁকে কেউ দেখতে পেল না। পশুপাখি ও হিংস্র জন্তুদেরকে সে গাধার গোশত ভক্ষণ থেকে বিরত রাখা হল। তাঁর ঘুমানোর পর যখন সত্তর বছর অতিবাহিত হল তখন 'নাওশিক' নামক পারস্যের এক রাজাকে বায়তুল মুকাদ্দাস আবাদ করার জন্য প্রেরণ করলেন। সুতরাং নাওশিক ১০০০ কর্মকর্তাসহ সেখানে আগমন করলেন। প্রতিজন কর্মকর্তার অধীনে ১০০০ করে তদারককারী মুসলমান ছিলেন। সুতরাং শুরু হয় বায়তুল মুকাদ্দাস পূণঃসংস্কার। দীর্ঘ ত্রিশ বছর শহরটি পূর্ণভাবে আবাসযোগ্য করা হল। এ সময় আল্লাহ তাআলা বখতে নসরকে মাত্র একটি মশার দ্বারা ধ্বংস করে দিলেন। মশাটি তার নাকের ভিতর প্রবেশ করে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। তার বন্দিশালায় অসংখ্য বনী ইসরাঈল ছিল। বখতে নসরের মৃত্যুতে তারা নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে গেল এবং পূর্বের তুলনায় তাদের অবস্থা আরও ভাল হয়ে গেল। একশত বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা প্রথম হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর চোখ খোলালেন। অবশিষ্ট অঙ্গ অনুভূতিহীন করে রাখলেন। তারপর অবশিষ্ট অঙ্গেও প্রাণ সঞ্চার করলেন।

হযরত আরমিয়া (আঃ) সর্ব প্রথম তাঁর গাধার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন গাধাটি পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং হাড়-গোড়ের উপর সাদা আবরণ পড়ে গেছে। এরপর আসমান থেকে একটি আওয়াজ আসল যে, 'হে ফোকলা হাড়গোড়! আল্লাহ তায়াল আদেশ করেছেন যে, একস্থানে একত্রিত হয়ে যাও।' সুতরাং হাড়গুলো একস্থানে একত্রিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আওয়াজে

সে হাড়গুলোর উপর গোশত ও চামড়া লেগে গেল। তৃতীয় আওয়াজে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং গাধাটি জীবিত হয়ে দাঁড়েয়ে আওয়াজ করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা হযরত আরমিয়া (আঃ)-কে নব জীবন দান করলেন।

যারা এ ঘটনাটি হযরত উযাইর (আঃ)-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন, তাদের বর্ণনা হল, বখতে নসর বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেন এবং বনী ইসরাঈলদেরকে বন্দি করে বাবেল শহরে নিয়ে যান। সে সমস্ত বন্দিদের মধ্যে হযরত উযাইর (আঃ) এবং হযরত দানিয়াল (আঃ)-ও ছিলেন। এরপর কোন এক সময় বখতে নসরের বাবেল শহরের বন্দিখানা থেকে হযরত উযাইর (আঃ) যখন মুক্তি পান তখন তিনি তাঁর গাধার উপর সওয়ার হয়ে সেখান থেকে রওয়ানা করেন এবং দজলা নদীর উপকূলে হেরাকল মন্দিরে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে জনপদের চারপাশে ঘুরলেন। কিন্তু সেখানে কোন মানুষজনের চিহ্নও পাওয়া গেল না। বৃক্ষরাজিতে ফলমূল ভরপুর ছিল। তিনি ফল খেলেন এবং আঙ্গুর নিংড়িয়ে তার রস পান করলেন। সফরের জন্যও কিছু ফল ছিঁড়ে রাখলেন এবং চামড়ার একটি থলিতে আঙ্গুরের রস ভরে নিলেন। যখন বস্তিকে জনমানবশূন্য দেখলেন তখন তাঁর মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবেই বের হয়ে আসল انى يحيى هذه الموتى।

বাক্যটি তাঁর মুখ থেকে পরিবেশের অবস্থা অবলোকনে আশ্চর্য হয়ে বের হয়েছিল, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নয়। কেননা আম্বিয়া কেরাম পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ থেকে অনেক দূরে অর্থাৎ তাঁদের ব্যাপারে এ ধরনের সন্দেহ কল্পনাতীত।

এ কথা বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। তিনি একশত বছর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে সেই ঘটনাই ঘটল যা হযরত আরমিয়া (আঃ)-এর ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

একশত বছর পর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত উযাইর (আঃ)-কে জীবিত করলেন, তখন তিনি তাঁর গাধার উপর আরোহণ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওনা হলেন। তিনি যখন সেখানে তাঁর মহল্লাতে তাশরীফ নিলেন তখন কেউই তাঁকে চিনতে পারে নি এবং তাঁর ঘরেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত তিনি অনুমান করে তাঁর ঘরের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে একজন অন্ধ ও পঙ্গু বৃদ্ধা মহিলা (যার বয়স একশত বিশ বছরের কাছাকাছি) দরজায় বসেছিলেন। বৃদ্ধা ছিলেন হযরত উযাইর (আঃ)-এর ঘরের দাসী। হযরত উযাইর (আঃ) যখন ঘর থেকে বের হন, তখন সে মহিলার বয়স ছিল বিশ বছর। সে সময়ে মহিলার নবীর সাথে অন্তরঙ্গ ছিল। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা

করলেন- এটা কি উযাইরের ঘর? বৃদ্ধা বললেন, হ্যাঁ, এটা তাঁর ঘর। একথা বলেই মহিলা কান্না করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, অনেক দিন যাবত আমি উযাইরের নাম শুনি নি। তিনি বললেন আমিইতো উযাইর। একথা শুনে বৃদ্ধা বললেন- সুবহানাল্লাহ! তাঁর হারিয়ে যাওয়ার পর একশত বছর অতীত হয়ে গেল; তবে তখন হয়ত আমি অদ্যাবধি তাঁর কোন সংবাদ পাই নি। (এখন বলছ- তুমি উযাইর)। তিনি বললেন, বৃদ্ধা! আমি উযাইর। আল্লাহ তাআলা আমাকে একশত বছর মৃত রেখে দ্বিতীয়বার জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা বললেন, উযাইরের দুআ কবুল হত। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দুআ করলে সে সুস্থতা লাভ করত এবং কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য দুআ করলে তার বিপদ-আপদ দূর হয়ে যেত।

সুতরাং যদি আপনি উযাইরই হয়ে থাকেন তাহলে দুআ করুন যাতে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। তাহলে আমি আপনাকে চিনতে পারব। সুতরাং তিনি কিছু পাঠ করে বৃদ্ধার চোখে হাত ফিরালেন। আল্লাহর রহমতে তার চোখের জ্যোতি ফিরে আসল। এরপর হযরত উযাইর (আঃ) বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও। একথা বলতেই তার পায়ের নলা ঠিক হয়ে গেল এবং বৃদ্ধা কোন বাধা ব্যতীতই দাঁড়িয়ে গেলেন। বৃদ্ধা যখন তাঁকে নয়ন ভরে দেখল, তৎক্ষনাৎ বলে উঠিলেন' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই সেই উযাইর। তারপর মহিলা বনী ইসরাঈলের এক মজলিসে গেলেন। সেখানে তাঁর এক পুত্র ও পৌত্র এবং অন্যান্য আত্বীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধা সবাইকে ডেকে বলতে লাগলেন, হযরত উযাইর (আঃ) এসে গেছেন এবং আল্লাহ তায়াল তাঁকে পুনরায় তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু তারা তার এ কথা মোটেও বিশ্বাস করতে পারল না এবং তারা তাঁকে ঘিরে ধরল। তখন বৃদ্ধা বলল, আমি তোমাদের পঙ্গু ও অন্ধ দাসী। হযরত উযাইরের দুআর বরকতে এই মাত্র সুস্থ হয়ে তোমাদের কাছে এলাম। হযরত উযাইর (আঃ) তো মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তবে একশত বছর পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুনরায় জীবন দান করেছেন। একথা শুনে তারা সকলেই বৃদ্ধার সাথে ঘরে পৌছল। তাঁর পুত্র তাকে বললেন, আমার পিতার একটি বিশেষ নিদর্শন ছিল যে, তাঁর উভয় স্কন্ধের মাঝখানে নব চাঁদের মত একটি কালো তিলক ছিল। তাই হযরত উযাইর (আঃ) স্কন্ধ খুলে তিলক চিহ্ন দেখালেন। তাতে সকলেরই বিশ্বাস হল যে, তিনিই উযাইর (আঃ)। সকলেই আনন্দে মেতে উঠলেন।

সা'দী ও কালবীর বর্ণনা মতে হযরত উযাইর (আঃ) যখন তাঁর জনপদে পৌছলেন তখন দেখলেন যে, তাদের নিকট এমন কোন গ্রন্থ নাই যার দ্বারা তারা শরীআতের বিধি-বিধান বুঝতে পারে। কেননা, বখতে নসর তাওরাতের সমস্ত

পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার একজন ফেরেশতা একটি পাত্রে পানি নিয়ে আগমন করলেন এবং সে পানি উযাইর (আঃ)-কে পান করালেন। পানি পান করার সাথে সাথেই তাওরাত কিতাব তাঁর বক্ষে চলে এল। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে নবুওয়াতী দান করলেন। তিনি বনী ইসরাঈলের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আমি উযাইর। কিন্তু কেউ তাঁর এ আহবানে বিশ্বাস করতে পারল না। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন, আমি উযাইর। আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিকট আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে নতুন করে তাওরাত শিক্ষা দেই। এতে বনী ইসরাঈল বলল, তাই যদি হয় তাহলে আপনি আমাদেরকে তাওরাত লিখে দিন। সুতরাং তিনি মুখস্থ তাওরাত লিখে দিলেন। আবার তারা বলতে লাগল, যখন থেকে তাওরাত হারিয়ে গিয়েছিল তখন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ তাআলা তাওরাতকে কারও অন্তরে ঢেলে দেন নি। সুতরাং বুঝা যায় আপনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি বললেন, কখনই নয়। মহান আল্লাহর সত্তা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি স্ত্রী ও পুত্র গ্রহণ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র।

যে-সময় আল্লাহ তাআলা হযরত উযাইরকে তাঁর নির্ধারিত মৃত্যু দেন সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। আবার যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বিতীয় বার জীবন দান করেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৪০ বছর। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যারা সে সময় জীবত ছিলেন তারাও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন যুবক। তাঁর দাড়ি ও গোঁফ ছিল কালো। সুতরাং সে সত্তাই পবিত্র যিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে খাল্লিকান ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন : রোম সম্রাট কায়সার হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট একখানা পত্র লিখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল এই– আমার দূতগণ যারা আপনার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করে এসেছিল তারা আমাকে বলেছেন, আপনাদের দেশে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যখন সে মাটি থেকে বের হয় তখন মনে হয় যেন গাধার দুটি কান। যখন সে গাছটি আরও একটু বড় হয় এবং প্রসারিত হয় তখন মনে হয় যেন মুক্তা দান সদৃশ্য এবং যখন আরও প্রসারিত হয় তখন মনে হয় যেন তাতে সবুজ যমরুদ ও যবরযদ পাথর লাগানো হয়েছে। অতঃপর যখন তার ফলে লালিত্ব আসে তখন মনে হয় যেন লাল ইয়াকুতের দানা ঝুলে রয়েছে। আর যখন পরিপক্ক হয় তখন মনে হয় যেন শ্রেষ্ঠতম জেলী। আর যখন তা শুকিয়ে যায় তখন মুকীমের জন্য তা হয় পুঁজি, আর মুসাফিরদের জন্য তা হয়ে যায় পাথেয়। যদি আমার

দূতগণের এ সংবাদ সঠিক হয়, তাহলে আমার ধারণা মতে তা হবে জান্নাতী বৃক্ষ অর্থাৎ খেজুর গাছ।

রোম সম্রাট পত্রের জবাবে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) লিখেন, আপনার দূতগণ আপনাকে সঠিক সংবাদই প্রদান করেছে। নিঃসন্দেহে আমাদের এখানে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে। আর এ বৃক্ষটি সে বৃক্ষ যা আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ)-এর জন্মের সময় হযরত মরিয়াম (আঃ)-এর জন্য উদ্‌গত করেছিলেন। পত্রের শেষাংশে তিনি লিখেন, হে কায়সার! আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁকে ভিন্ন ঈসাকে খোদা মানবেন না। তারপর পবিত্র কুরআনের এ আয়াত লিখেন :

ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

"নিশ্চয়ই ঈসা আল্লাহর নিকট আদমের মতই। তাঁকে (আদমকে) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর তাঁকে বলা হল, হয়ে যাও সে হয়ে গেল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এটাই সত্য। সুতরাং সন্দেহকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না।"

কায়সার (রোম সমাট্রের উপাধি)

কায়সার শব্দের ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে, এটা 'আফ্রিকান' শব্দ। এর অর্থ চিড়ে বের করা, কেটে বের করা। ঐতিহাসিকগণ কায়সার বলার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, প্রসব বেদনায় কায়সারের মাতা মারা গেলে দ্রুত পেট কেটে তাকে বের করা হয়েছিল। তাই তার উপাধি হয়ে যায় কায়সার। কায়সার তার সমাকালীন সম্রাটদের মাঝে এ বলে গর্ব করতেন যে, আমি তোমাদের মত লজ্জাস্থান দিয়া বের হই নাই। কায়সারের প্রকৃত নাম ছিল (অগস্টাস)। তাঁর শাসনামলে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রোমের সকল সম্রাটকেই কায়সার উপাধি দেয়া হয়। এমনিভাবে তুর্কী (তুরস্ক) বাদশাহদের উপাধি ছিল 'খাকান' এবং পারস্য রাজন্যবর্গের উপাধি 'কিসরা'। শ্যাম (সিরিয়া) রাজন্যবর্গের উপাধি ছিল হেরাকল। কিবৃত (মিসর) রাজাদের উপাধি 'ফিরাউন' এবং হাবশা বাদশাহগণের উপাধি ছিল 'নাজ্জাশী'। ফারগানা রাজাদের উপাধি 'আখশীদ' আর ইসলামী যুগে মিসর রাজাদের উপাধি ছিল 'সুলতান'।

ইবনে খাল্লিকান বলেন, এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয় যে, আরবরা যে, রোমীয়দেরকে 'বনু আসফার' বলত এর কারণ কী? তিনি লিখেছেন, প্রাচীনকালে একবার রোমে আগুন লেগেছিল। সে অগ্নিকাণ্ডে রাজ পরিবারের একজন মহিলা ব্যতীত সমস্ত লোক ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রজাসাধারণের মধ্যে সবারই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভ সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আপোষে এ সিদ্ধান্ত

হল যে, যে ব্যক্তি সকালে সর্বপ্রথম শহরে প্রবেশ করবে তাকে 'রাজা' বা বাদশাহ বানানো হবে। সুতরাং এ কাজের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হল। তারা শহরের প্রধান ফটকে প্রথম আগমনকারী ব্যক্তির অপেক্ষায় রইল। এ সময় ইয়ামনের দিক থেকে এক ব্যক্তি আসতে লাগল। আর তার সাথী ছিল একজন হাবশী গোলাম। তারা উভয়েই রোমে আসছিল। এ সময় গোলাম তার মনিবকে ছেড়ে তার পূর্বেই শহরের প্রধান ফটকে এসে পৌছে গেল। শহরের প্রধান ফটকে প্রবেশ করতেই অপেক্ষমাণ ব্যক্তিরা তার হাতে হাত রেখে বলতে লাগল- তোমার ভাগ্য কতই না সুপ্রসন্ন। সুতরাং সে গোলামকে তারা বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল এবং রাজ পরিবারের একা বেঁচে যাওয়া মহিলার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিল। বেশ কিছুদিন পর তাদের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কালো এবং চিত্রল বীর্যের সংমিশ্রণের ফলে সন্তানটির শরীরের রং হল হলুদ। তাহ তার নাম রাখা হল 'আসফার'। এ কারণে তার রক্তধারা থেকে যত বংশ বিস্তার লাভ করে সকলকেই 'বনু আফসার' বলা হয়।

কিছুদিন পর সে বাদশাহের মনিব এসে হাজির হল এবং বলতে লাগল, এ আমার পালিয়ে আসা গোলাম। সে (মনিব) রাষ্ট্রের মালিকানা দাবি করে বসল। ফল হল, সে গোলাম বাদশাহ তাকে মনিব বলে স্বীকার করল এবং তাকে কিছু অর্থ সামগ্রী দিয়ে সম্মত করাল।

ইবনে যুফার-এর 'কিতাবুন নাসাইহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদ যখন তুস অর্থাৎ খোরাসানের একটি শহরে পৌছলেন এবং তাঁর অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত এবং তুসে বসবাসকারী এক চিকিৎসককে আহ্বান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, তার পেশাবের শিশি চিকিৎসকের সম্মুখে এমনভাবে পেশ করবে যে, কিছু সুস্থ ও অসুস্থ লোকের পেশাবের শিশিও এর সাথে রাখা হবে। সুতরাং নির্দেশ মত তাই করা হল। চিকিৎসক এ সমস্ত শিশির মধ্য থেকে খলীফার পেশাবের শিশি চিনে বের করে ফেলল এবং তা দেখে বলল, এ শিশিতে পেশাবকারীকে বলে দাও, সে যেন তার অন্তিম নসিহত প্রদান করে। কেননা এ রোগীর শক্তি একদম দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং শরীর অস্তগমনোন্মুখ হয়ে পড়েছে। খলীফার আদেশে চিকিৎসককে বিদায় করা হল। চিকিৎসকের মন্তব্যের পর খলীফা তার জীবনের আশা থেকে একদম নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং নিরাশার মধ্যে এ কবিতা আবৃত্তি করলেন

ان الطبيب بطنه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى

চিকিৎসক তার সকল অভিজ্ঞতা ও উত্তম ঔষধ দ্বারাও মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারল না।

ما للطبيب يموت بالداء الذى قد كان يبرى مثله فى ما مضى

চিকিৎসকও সাধারণ এ রোগে মারা যায়, যে রোগের চিকিৎসায় সে সুখ্যাতি ও সুনাম লাভ করেছে এবং সে অগণিত রোগীকে এ রোগ থেকে আরোগ্য করেছে।

এরপর হারুনুর রশীদ জানতে পারলেন যে, জনগণ তার মৃত্যুর সংবাদ প্রত্যাখান করেছে। তখন তিনি একটি গাধা তলব করলেন এবং আদেশ করলেন যে, আমাকে এ গাধার উপর আরোহণ করিয়ে দাও। সুতরাং তাকে একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়ে দেয়া হল। খলীফা হারুন গাধার উপর সওয়ার হল। তৎক্ষণাত তাঁর পা অবশ হয়ে শক্তিহীন হয়ে গেল। তিনি আবার আদেশ করলেন যে, গাধার পিঠ থেকে আমাকে নিচে নামাও। সুতরাং তাড়াতাড়ি তাকে গাধার পিঠ থেকে নামানো হল। এরপর তিনি কাফনের কাপড় তলব করে ইচ্ছামত কাপড় নির্বাচন করলেন এবং তার শয্যা পার্শ্বেই কবর খোঁড়ার আদেশ করলেন। কবর খনন হয়ে গেলে তিনি তা ঝুঁকে দেখলেন এবং পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

ما اغنى ماليه هلك عنى سلطانية

"আমার ধন-সম্পদ কিছু কাজে লাগল না, আমার রাজত্ব আমার নিকট থেকে চলে গেল।"

এরপর সেদিনই তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।)

মানসুর হাল্লাজের ঘটনা

ইবনে খাল্লিকান তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন : হাল্লাজের ঘনিষ্ট কেউ বলেছেন, মনসুর হাল্লাজকে যেদিন হত্যা করা হয় সেদিনই এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে নাহবাওয়ানের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, তোমাদের ধারণা যে, আমি প্রহত হয়ে নিহত হয়ে গেছি।

মানসুর হাল্লাজের হত্যার কারণ ছিল, খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহর উযীর হামাদ ইবনে আব্বাস-এর দরবারে তাঁর মুখ থেকে এমন একটি কথা বের হয়ে পড়ল, যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী ছিল। এতে বিচারক ও উলামায়ে কেরাম তাঁকে হত্যা করার ফাতাওয়া প্রদান করেন। খলীফা মুক্তাদির শহর কতোয়াল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সামাদকে হাল্লাজকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। কতোয়াল তাকে এ ভয়ে দিনের বেলা গ্রেফতার করলেন না যে, পাছে জনগণ হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তাকে ছিনিয়ে নেয়। তাই রাতের বেলা তাকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু যখন তাকে মঙ্গলবার দিন ৩০৯ হিজরী ২৪ যিলকদ 'বাবু ইলতাক'-এ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সেখানে হট্টগোল বাঁধে। জল্লাদ সর্বপ্রথম তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করল।

কিন্তু তিনি উহ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।

এরপর তার চার হাত পা কর্তন করা হল। এতেও তিনি চুপ রইলেন। এরপর তার মাথা শরীর থেকে পৃথক করে দেয়া হল এবং তার শবদেহ পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হল। তাঁর কর্তিত মস্তক বাগদাদ শহরের দেওয়ালে স্থাপন করা হল। এরপর বাগদাদ শহরের অলিতে গলিতে ঘোরানো হল।

তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এ বলে তাদের অন্তরকে সান্ত্বনা দিতেন যে, তিনি চল্লিশ দিন পর আবার ফিরে আসবেন। ঘটনাক্রমে সে বৎসর দজলা নদীতে ভয়ানক জলোচ্ছ্বাস হল। এতে কিছু লোকের ধারণা যে, এ জলোচ্ছ্বাস তাঁর ছাই ভস্মের কারণেই হয়েছে, যা তাকে পুড়িয়ে দেয়ার পর নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

তার কতিপয় অনুসারীর এ ধারণা ছিল যে, তাঁকে হত্যা করার সময় আল্লাহ তাআলা তার কোন দুশমনকে তার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন। আর সে সময় সে নিহত হয় এবং তিনি প্রাণে বেঁচে যান। মনসুর হাল্লাজকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি এ কবিতা পড়ছিলেন–

আমি ভূ-পৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে ঠাঁই অন্বেষণ করেছি কিন্তু কোথাও ঠাঁই পেলাম না।

আমি লোভের শিকার হয়েছিলাম, আর লোভ আমার বিচারক হয়ে গেল। সম্ভবত যদি আমি অল্পে তুষ্ট থাকতাম তবে আমি যথারীতি স্বাধীন থাকতে পারতাম।

কতিপয় লোক বলেছিলেন মনসুর হাল্লাজকে হত্যার সময় তিনি এ কবিতা পাঠ করেছিলেন–

আমি নিজেকে নিজে এমন ব্যাধিতে সমর্পণ করতে পারি না, যা ধ্বংস করে দেয়। যেহেতু আমি জানি এখন কোন চিকিৎসা কাজে আসবে না মৃত্যু ছাড়া।

আর হে ঐ সত্তা (আল্লাহ) যিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণকারী এবং যার নিকট আমার সকল চাওয়া পাওয়া, তোমার একবার (রহমতের) দৃষ্টি আমার দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।

প্রেমিকের জীবন কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্যধারণকারী হয়, এ আশায় যে হয়তো বা তাকে বিনষ্টকারী একদিন তার চিকিৎসক হয়ে যাবে।

মানসুর হাল্লাজ শেখ জুনাইদ বাগদাদীর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং শিবলী ও অন্যান্য সুফীগণের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।

শাইখুল ইমাম আযীযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম মুকাদ্দাসী 'মাফাতিহুল কুনুজ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : যখন শূলীতে চড়ানোর জন্য নেয়া হয় এবং তিনি যখন কাষ্ঠ-ফলক ও পেরেক দেখেন তখন তিনি অট্টহাসি হাসলেন। এরপর তিনি যখন জন সমাবেশের দিকে তাকালেন তখন দেখলেন যে সেখানে শিবলী

উপস্থিত। তিনি শিবলীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! আপনার কাছে জায়নামায আছে কি? শিবলী জবাব দিলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, জায়নামাযটি বিছিয়ে দিন। সুতরাং শিবলী জায়নামায বিছালেন। মানসুর হাল্লাজ দুই রাকআত নামায আদায় করলেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع الخ পাঠ করলেন। দ্বিতীয়বার সূরা ফাতিহার পর كل نفس ذائقة الموت الاية পাঠ করলেন। এরপর দীর্ঘ সময় ওযীফা পাঠ করলেন। এমন সময় আবুল হারেস সিয়াফ এসে তাকে এমন জোরে থাপ্পর মারল যে, এতে তাঁর নাক মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে তার মধ্যে উম্মাদনা এসে গেল। তিনি স্বীয় পরিধেয় ছিড়ে ফেললেন এবং খুব জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগলেন। আবুল হাসান ওয়াসেতী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ শেখগণ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নিহত হওয়ার পূর্বে মনসুর হাল্লাজ বললেন, তোমাদের জন্য আমার রক্ত মোবাহ—বৈধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমাকে হত্যা করে ফেল। অন্য মুসলমানদের জন্য আমার হত্যা ছাড়া অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। আর আমার হত্যাকাণ্ড আল্লাহর 'হদ্' (দণ্ড) প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়ত অনুযায়ীই। যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে তার উপর 'হদ' (দণ্ড) জারি করাই উচিত।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, মনসুর হাল্লাজের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাকে একজন উচুমানের অলী বলেছেন। আবার কেউ কেউ তাকে কাফিরও বলেছেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম কুতুবুদ্দীন স্বীয় গ্রন্থ 'মিশকাতুল আনওয়ার' এবং মিশকাতুল আসরার' এ মানসুর হাল্লাজের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মনসুরের বাণী انا الحق এবং وما فى الجبة الا الله-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তার উত্তম অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মনসুরের এ কথা সীমাহীন ভালবাসা এবং কঠোর উন্মাদনার কারণেই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর কথার উদাহরণ এ কবিতা :

انا من اهوى ومن اهوى انا فاذا ابصرته ابصرتنا

আমি সেই ব্যক্তি যাকে আমি চাই, আর যাকে আমি চাই সে তো আমি। (ওহে লোকসকল!) তুমি যখন তাকে অর্থাৎ আমার প্রিয়কে দেখে থাক তাহলে আমাকেই যেন দেখলে। অর্থাৎ আমি প্রিয়ার ভালবাসায় এমনই মোহগ্রস্থ হয়ে গিয়েছি যে এক প্রাণে দু দেহ হয়ে গিয়েছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম কুতুব উদ্দীন (রহ.)-এর বর্ণিত দিক-নির্দেশনা মানসুর হাল্লাজের প্রশংসা ও দুর্নাম স্খলনের জন্য যথেষ্ট। অধিকন্তু ইমাম শুরাইহ

(রহ.)-কে যখন মানসুর হাল্লাজের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, আমি তার ব্যাপারে কিছুই জানি না। কেননা তিনি গুপ্ত অবস্থার লোক ছিলেন। এ উত্তরটি এমনই ছিল যেমন উত্তর দিয়েছিলেন আমীরুল মু'মিনীল হয়রত উমর ইবনে আব্দুল আযীয। তাকে যখন প্রশ্ন করা হল, হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি এর জবাবে বলেছিলেন– আল্লাহ্ তাআলা যখন আমাদের তরবারীকে তাদের রক্ত থেকে পবিত্র রেখেছিলেন, তখন তাদের ব্যাপারে আমাদের যবানকে কেন পবিত্র রাখতে পারব না?

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এটুকু আলোচনাই আল্লাহ ভীতি (মুত্তাকী) সম্পন্ন লোকদের জন্য কাউকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যথেষ্ট। এমন কথার উপর ভিত্তি রাখাও উচিত নয় যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেহেতু ইসলাম থেকে বের করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু এ বিষয়ে তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া মূর্খতার কাজ।

শাইখুল আরেফীন কুতুবুজ্জামান আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) মানসুর হাল্লাজের সমর্থনে বলেন, হাল্লাজকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউ তার সাহায্যকারী ছিল না। আমি যদি হাল্লাজের যুগের হতাম তাহলে অবশ্যই আমি তার সঙ্গ দিতাম। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর এ অভিমত এবং ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর ইতিপূর্বেকার মতামত মানসুর হাল্লাজের ব্যাপারে স্বল্প জ্ঞানী ও বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য যথেষ্ট।

হাল্লাজের নামকরণের কারণ

মানুসুরের 'হাল্লাজ' উপাধি হওয়ার কারণ হল, তিনি কোন এক তুলা ধুনকারীর দোকানে বসে তার নিকট কিছু কাজ করতে চাইলেন। ধুনকার বলল, আমি তুলা ধুনার কাজে ব্যস্ত, আমার কোন অবসর নাই। তিনি বললেন, তুমি অমার কাজ করে দাও আমিও তোমার কাজ করে দেব। এতে সে সম্মত হল। লোকটি (ধুনকর) মানসুরের কাজে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল তার যত তুলা ছিল সবগুলো ধুনে রাখা হয়েছে। অথচ এত বেশি পরিমাণ তুলা ছিল যে, দশ জন মিলে কয়েকদিন কাজ করলেও তা শেষ করা যেত না। সেদিন থেকেই লোকেরা তাঁকে (মানসুরকে) হাল্লাজ বলা শুরু করল। হাল্লাজ অর্থ 'ধুলা ধুনকর'। কোন কোন লোক এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, মানসুর তাসাওউফের গোপন রহস্য এবং সূফীগণের ভেদ বর্ণনা করতেন তাই তাকে হাল্লাজ বলা হত। মানসুর ছিলেন পারস্য (বর্তমান ইরান) দেশের 'বায়রা' শহরের অধিবাসী। প্রকৃত নাম ছিল হুসাইন ইবনে মানসুর।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের কাহিনী

ইবনে খাল্লিকান ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিপিবদ্ধ করেছেন : মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ)-এর শাসনামলে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং ৩৭ হিজরীতে তিনি মিসরে প্রবেশ করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন উমর ইবনুল আসকে সিরিয়ার সৈন্যদের সেনাপতি নিযুক্ত করে মিসরে প্রেরণ করেন, তখন পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। সেনাবাহিনীর সাথে মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ এবং তার বন্ধু-বান্ধবরাও ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) পরাজয় বরণ করেন এবং তিনি পলায়ন করে এক পাগল মহিলার গৃহে লুকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরই মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ এবং তার সাথীবর্গ সে পাগল মহিলার নিকট পৌছলে মহিলা বলল, তুমি কি আমার ভাইকে হত্যা করতে চেয়েছ? কারণ সে সময় তার এক ভাই জেলাখানায় বন্দি ছিল। মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ বললেন, তোমার ভাইকে হত্যা করব না। মহিলা বলে দিল, আমার ঘরেই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর লুকিয়ে রয়েছে। এ কথা শুনে মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ তার বন্ধুবর্গকে বললেন, তাকে বন্দি করে নিয়ে আস। সুতরাং তারা ঘরে প্রবশে করে রশি দ্বারা মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে শক্ত করে বেঁধে মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজের সম্মুখে নিয়ে আসল। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর তাঁর পিতার (প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করলেন। মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ জবাব দিলেন, তুমি তো সেই ব্যক্তি যে হযরত উসমান গণী (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে আমার বংশের আশি (৮০) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। এতদসত্ত্বেও কীভাবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি? আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করব না।

সুতরাং ৩৮ হিজরী সফর মাসে তাকে হত্যা করা হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এ আদেশ জারী করলেন যে, তার মৃতদেহ রাস্তায় টেনে হেঁচড়ে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ঘরের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে চলে যাও। কেননা সে তার হত্যা কামনা করে নি। তারপর তার মৃতদেহ গাধার সাথে জ্বালিয়ে ফেলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তার মৃত-দেহ নয় বরং তাকে জীবিত অবস্থাই মৃত গাধার সাথে রেখে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের এভাবে নিহত হওয়ার কারণ হল, উম্মুল মু'মিনীন হয়রত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাঃ)-এর বদ দুআ। যা তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের জন্য করেছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে সে যখন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাঃ)-এর হাওদায় (উটের পিঠে বসার পাল্কি বিশেষ) হাত

দিয়েছিলেন, তখন তিনি রাগের বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন, সে কে-যে কিনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেরেমে হস্তক্ষেপ করতে চায়? আল্লাহ তাআলা তাকে আগুনে জ্বালাবেন। তাঁর তখন জানা ছিল না যে, সে তারই ভাই? সুতরাং মুহাম্মাদ যখন বলল, হে আমার বোন! এমন কথা বলবেন না বরং বলুন- "দুনিয়ার আগুন।" সুতরাং এ বদ দুআর পরিণাম সে সময় প্রকাশিত হয়। (এর বিস্তারিত আলোচনা জ্বীম পরিচ্ছেদের 'জামাল' শিরোনামে ইতোপূর্বে করা হয়েছে)

যেখানে মুহাম্মাদ বিন আবু বকরকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। এক বছর পর তার গোলাম কবর খুড়ে তাতে মাথার খুলি ব্যতীত আর কিছুই পেল না। সে মাথার খুলিটি মসজিদের মিনারের নিচে দাফন করা হয়।

বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাঃ) তাঁর ভাই হযরত আব্দুর রহমানকে হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-এর নিকট তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের ব্যাপারে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত ইবনুল আ'স (রাঃ) জবাব দিলেন, তার ব্যাপারটি মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজ-এর হাতে। তাকে যখন হত্যা করা হল এবং তার গোলাম জামা নিয়ে মদীনায় পৌছল সমস্ত লোক জমায়েত হয়ে গেল। উম্মুল মু'মিনীত হযরত উম্মে হাবিবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) একটি ব্যাঙ ভুনা করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং বলে দিলেন যে, তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে এমনিভাবে ভুনা করা হয়েছে। তারপর থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাঃ) শেষ জীবন পর্যন্ত আর কোন দিন ভুনা গোশত আহার করেন নি। হিন্দা বিনতে শিমার হাযরামিয়া বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উসমান গণী (রাঃ)-এর স্ত্রী নায়েলাকে দেখেছি যে, তিনি মুয়াবিয়া ইবনে হুদাইজের পা চুম্বন করে বলেছিলেন, তোমার উসিলায় আমার প্রতিশোধ প্রাপ্তি ঘটেছে।

আসমা বিনতে উমাইস (মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরের মাতা) যখন তার পুত্রের নিহত হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন তখন রাগের কারণে তার বুক থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগিল। তাঁর মৃত্যুতে হযরত আলী (রাঃ)-ও মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদকে লালন-পালন করেছিলাম এবং আমি তাকে পুত্র ও ভাতিজা জ্ঞান করেছিলাম। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুহাম্মদের মাতা আসমা বিনতে উমাইসকে হযরত আলী হায়দার (রাঃ) বিবাহ করেছিলেন। এ কারণে মুহাম্মাদ তাঁর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।

সুফিয়ান সাওরীর ঘটনা

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়রা বলেন : একবার সুফিয়ান সাওরী (রহ.) আমাকে রাতে খাবারের দাওয়াত করেছিলেন। আমার সামনে খেজুর ও গরম দুধ

পরিবেশন করা হল। আমরা মাত্র অর্ধেক খানা খেলাম, এমন সময় সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, উঠুন, শোকরিয়া হিসেবে দু রাকআত নামায আদায় করি। সে সময় খানাতে আমাদের সাথে ইবনে ওয়াকীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন যে, আমাদের সম্মুখে যদি বাদামের হালুয়াও পেশ করা হত তবুও তিনি আমাদেরকে তারাবীহর নামায পড়তে বলতেন। ইবনে ওয়াকীর এ কথা শুনে সুফিয়ান হাসতে লাগলেন।

এক সময়ের ঘটনা। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাঃ) খলীফা মাহদীর নিকট আগমন করলেন। তিনি খলীফাকে সাধারণ নিয়মে সালাম করলেন। অর্থাৎ খলীফার জন্য যে সালাম নির্দিষ্ট ছিল সেভাবে তিনি সালাম করেন নি। খলীফা মাহদী রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন, হে সুফিয়ান! তুমি আমার হাত থেকে বেঁচে গিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাফিরা করছ। আর তুমি মনে করছ যে, যদি আমি তোমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করতে চাই তবে তা করতে পারব না। অথচ আমি ইচ্ছা করলে এখনই তা করতে পারি। তোমার কি ভয় হয় না যে, আমি এ সময়েই তোমাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার আদেশ দিতে পারি। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) জবাব দিলেন, যদি আপনি আমার জন্য এখন এ মুহূর্তে কোন আদেশ জারি করেন তাহলে জগতের বাদশাহও ক্ষমতাবান। তিনি হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণকারী অর্থাৎ আল্লাহও কোন আদেশ জারি করতে পারেন। রাবী (মাহদীর মন্ত্রী) তা শ্রবণ করে বললেন- আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এ মুর্খের সাথে কেন কথা বলছেন- আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

মাহদী মন্ত্রীকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর। সুফিয়ান এবং তার সমমনাগণ চায় যে, আমি তাকে হত্যা করে পাপিষ্ঠ হয়ে যাই এবং আমার উসিলায় তাঁর শাহাদাত নসীব হউক। এ কথা বলে তিনি মন্ত্রীকে বললেন, তার নামে কুফার বিচারপতির কাছে একখানা সতর্কতামূলক পত্র লেখে দাও এবং তাকে এ কথাও লিখে দাও যে, তার মতামতের উপর কোন প্রতিবাদ করা যাবে না। সুতরাং মন্ত্রী সমন লিখে তা সুফিয়ানের হাতে সমর্পণ করলেন। সুফিয়ান (রহ.) সমন নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন এবং সে সমনটি দজলা নদীতে ফেলে দিয়ে বাগদাদ থেকে উধাও হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে খলীফা মাহদী তাঁকে সর্বত্র অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। নির্বাসন থাকা অবস্থায়ই তিনি ১২১ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে একজন উঁচু মানের বিশ্বস্ত, দ্বীনদার পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে।

ইমামুল আল্লামা মাদরিদী (রহ.) প্রমূখ বলেন, একবার তিনি তাঁর স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু খানা বেশি খেলেন। তখন তিনি বললেন, গাধাকে যখন খাদ্য ও পানীয় অতিরিক্ত দেয়া হয় তখন তার দ্বারা অতিরিক্ত কাজও আদায় করা যায়। এ কথা বলে তিনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত নামাযই আদায় করলেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী

'ইবতিলাউল আখ্ইয়ার' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে : একদিন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে ইবলীসের সাক্ষাৎ হল। অভিশপ্ত ইবলীস ৫টি মালপত্র বোঝাই গাধা হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ইবলীসকে জিজ্ঞাস করলেন, এগুলো কী নিয়ে যাচ্ছিস? ইবলীস জবাব দিল, এগুলো ব্যবসার মালামাল। এগুলো বিক্রির জন্য ক্রেতার সন্ধানে বের হয়েছি। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কাছে কী কী মালামাল আছে? ইবলীস ৫টি গাধার পিঠের মালামালগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিল যে–

(১) এতে রয়েছে অত্যাচার-অবিচার। এগুলো আমি রাজা-বাদশাহদের নিকট বিক্রি করব।

(২) এতে রয়েছে কিব্র (নিজেকে বড় মনে করা) এগুলো সওদাগর ও জহুরীদের নিকট বিক্রি করব।

(৩) এতে রয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ। এগুলোর ক্রেতা হবে আলেম সম্প্রদায়।

(৪) এতে রয়েছে খেয়ানত ভর্তি। রণিক ও সওদাগরদের কর্মচারীদের নিকট এগুলো বিক্রি করব।

(৫) এতে আছে ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা। এগুলো আমি মহিলাদের নিকট বিক্রি করব।

মহিলাদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কাহিনী

ইমাম জাফর সাদেক মুহাম্মাদ আল বাকের (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে : বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একজন দ্বীনদার লোক ছিল। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর চমৎকার সম্পর্ক ছিল। লোকটির স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। কোন এক কারণে স্ত্রীর প্রতি তার কু-ধারণা হল। সুতরাং দ্বীনদার লোকটি যখন ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যেতেন তখন ঘরের বাহির থেকে তালাবদ্ধ করে যেতেন। একদিন ঘটনাক্রমে কোন যুবকের উপর স্ত্রীর চোখ পড়ল। কেননা উভয়েই ছিল পরম সুন্দর এবং যুবক বয়সের। এজন্য তারা একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করল। কিন্তু উভয়ের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের কোন উপায় ছিল না। তাই মহিলা কারও মাধ্যমে ঘরের বাইরের তালার চাবি বানিয়ে প্রেমিক যুবকের নিকট পাঠিয়ে দিল। যুবক পুরুষ তার প্রেমিকার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে নিয়মিত মহিলার নিকট

আসা-যাওয়া করতে লাগল। দিবা-রজনীর যেকোন সময় সুযোগ পেলেই যুবক প্রেমিক সে চাবির সাহায্যে তা খুলে প্রেমিকার একান্ত সান্নিধ্যে আসত। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও মহিলার দ্বীনদার স্বামী এ ব্যাপারে কোন খবরই পেল না। প্রেমিকের আগমন ও প্রস্থানের এ লীলাখেলা অব্যাহত রইল। মহিলার স্বামী যেহেতু একজন আবেদ (ইবাদতগুজার) ও যাহেদ ব্যক্তি, সেহেতু তিনি যেভাবেই হোক তাদের অভিসার টের পেয়ে গেলেন এবং তিনি সে মহিলার সাথে বিচ্ছেদের মনোভাব দেখাতে লাগলেন। আবেদ লোকটি তার স্ত্রীকে বললেন, এ মুহূর্তে আমার বিশ্বাস হবে যদি তুমি সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর হলফ করতে পার। মহিলা এতে সম্মত হল। মহিলা বলল, আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই আমার নিকট থেকে হলফ নিতে পারেন।

যে শহরে এ ঘটনা ঘটেছে সে শহরের বাহির একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ের পাশেই একটি নদী প্রবাহিত। সেখানে গিয়ে বনী ইসরাঈল কসম করত। সেখানে যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করত সে ধ্বংস হয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ শপথের আলোচনার পর মহিলার প্রেমিক আসলে তাকে এ ঘটনা অবহিত করল। এ কথা শুনে প্রেমিক যুবক চিন্তিত হয়ে গেল যে, এখন কী করা যায়? মহিলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। আমি এমন ব্যবস্থা করব যে, সাপও মরে যাবে কিন্তু লাঠি ভাঙ্গবে না। অমুক দিনের অমুক সময় আমি আমার স্বামীর সাথে সে পাহাড়ে শপথ করতে যাব। তাই তুমি তোমার বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং আরোহণের জন্য একটি গাধা নিয়ে শহরের বাইরের তোরণে দাড়িয়ে থাকবে। আমাদের স্বামী স্ত্রীকে যখন তুমি আসতে দেখবে তখন গাধাটি নিয়ে আমাদের নিকট চলে আসবে। আমি তোমার গাধার উপর সওয়ার হয়ে পাহাড় পর্যন্ত যাবার জন্য সওয়ার হব। এ সময় তুমি আমাকে দ্রুত গাধার উপর সওয়ার করে নিবে। তারপর দেখবে কি হয়। সুতরাং হলফের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসল। তখন দ্বীনদার স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, চল! সে পাহাড়ে যাই এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে আমাকে প্রশান্ত কর।

এ কথা শুনে মহিলা অতি দ্রুত কাপড় পরিবর্তন করে যাওয়ার ভান করে বলল, আমি পায়ে হেঁটে পাহাড়ে যেতে পারব না। স্বামী বলল, চল শহরের ফটকে হয়ত কোন গাধা পাওয়া যেতে পারে। তা ভাড়া করে পাহাড় পর্যন্ত যাওয়া যাবে। সুতরাং উভয়েই ঘর থেকে বের হল। তারা যখন শহরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছল তখন মহিলার প্রেমিক গাধা নিয়ে পূর্ব থেকেই তৈরি ছিল। তাকে দেখেই মহিলা আওয়াজ দিল– হে গাধাওয়ালা! এদিকে এস। আমরা তোমাকে অর্ধ হিরহাম দিব। তুমি আমাদেরকে ঐ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে দাও। সে বলল, ঠিক আছে পৌঁছে দিব। সে দ্রুত গাধা নিয়ে আসল এবং মহিলাকে তার হাতের সাহায্যে গাধার উপর বসিয়ে রওনা করল। গাধা আগে আগে যাচ্ছে আর পিছন

পিছন মহিলার স্বামী ও সাজানো বা বানোয়াট গাধাওয়ালা যাচ্ছিল। যখন পাহাড়ের নিকট চলে আসল- গাধা থেকে অবতরণের সময় হল তখন ভাড়াটে লোকটিকে (মূলত প্রেমিক) বলল, গাধা আটক করে আমাকে নামিয়ে দাও। লোকটি (প্রেমিক) আসতে না আসতেই মহিলা স্বেচ্ছায় গাধা থেকে পড়ে গেল। সে এমনভাবে পড়ে গেল যে, তার লজ্জাস্থান ভাড়াটে (প্রেমিক) লোকটির সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে গেল। মহিলা তাকে (প্রেমিক) কৃত্রিম গালি দিতে লাগল। ভাড়াটে গাধাওয়ালা লোকটি বলল, বেগম সাহেবা! আমার কোন দোষ নেই এবং তাকে (মহিলাকে) ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। এরপর সে পাহাড়ে আরোহণ করল এবং যেখানে শপথ করা হয় সেখানে গিয়ে পৌছল। তখন মহিলা তার হাত দ্বারা পাহাড়কে আকড়িয়ে ধরল এবং স্বামীকে লক্ষ্য করে শপথ করে বলতে লাগল, যখন থেকে তোমার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত তুমি এবং এ গাধাওয়ালা ব্যতীত কেই আমার গায়ে হাত দিতে পারে নি এবং দেখেও নি। এ শপথ বাহ্যিকভাবে সত্য ছিল। তার স্বামী ও এ ভাড়াটে গাধাওয়ালা (প্রেমিক) ব্যতিত তৃতীয় কেউ তাকে স্পর্শ করে নি এবং তার কাছেও কেউ যেতে পারে নি। এ জন্য পাহাড়টি খুব জোরে আন্দোলিত হতে লাগল এবং পাহাড়টি ধসে গেল। বনী ইসরাঈল তা ভুলে গিয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন : وان كان مكرهم لتزول منه الجبال

যদিও সে কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র এরূপ ছিল, যাতে পাহাড়ও স্থানচ্যুত হয়ে যেত।

অনুরূপ একটি ঘটনা ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াত যুগে শামশূন নামক এক ইসরাঈলী ছিল, তাদের বাসস্থান ছিল রোমের এক শহরে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছিলেন তার দ্বারা তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মান্য করত। শামশূনের গোত্রের লোকেরা ছিল মুশরিক- মূর্তি পূজারী। তারা থাকত শহরে। শামশূন লোকালয়ের বাইরে একস্থানে বসবাস করতেন। সময় সময় তিনি শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বন্দি করে নিতেন এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করতেন। কোন কোন দিন তিনি কিছু না খেয়েই বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত জিহাদ করতেন। যখন তার পিপাসা অনুভব হত, তখন তার জন্য পাথর থেকে পানি বের হত। তিনি তখন পরিতৃপ্তসহকারে পানি পান করতেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার হাতের থাবায় অত্যন্ত শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। এ জন্য শহরবাসী তার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত ছিল। অথচ তাদের করার কিছুই ছিল না। সুতরাং একদিন শহরবাসী পরস্পর মিলিত হয়ে পরামর্শ করল, কী করে তাকে বশে আনা যায়। পরামর্শদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে হাত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বশে আনা কঠিন হবে।

সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু লোক শামশূনের স্ত্রীর কাছে পৌঁছে গেল। তাকে তারা বলল, যদি তুমি তোমার স্বামীকে বেঁধে দিতে পার তাহলে আমরা তোমাকে অনেক পুরস্কার দিব। সুতরাং স্ত্রী ধন-সম্পদের লোভে তার স্বামীর সঙ্গে গাদ্দারী করার জন্য সম্মত হয়ে গেল। তাদের সাথে এ ওয়াদা ছিল যে, অতি সত্বরই তোমাদের সহায়তা করছি। তারা তার স্ত্রীকে অত্যন্ত মজবুত একটি রশি দিয়ে বলল, যখন শামশূন শুয়ে পড়বে তখন এ রশি দ্বারা তার হাত-পা বেঁধে ফেলবে। এভাবে তারা মহিলাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল। রাত্রিতে যখন গাদ্দার স্ত্রী তার স্কন্ধে রশি রেখে হাত পা খুব শক্ত করে বেধে ফেলবে। এভাবে তারা মহিলাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাতে যখন হযরত শামশূন ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন, তখন গাদ্দার স্ত্রী তার স্কন্ধে রশি রেখে হাত পা খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল এবং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং হাত-পা প্রসারিত করলেন, তখন রশি ছিড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। তিনি উঠে বসে গেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমনটি করলে কেন? প্রতারক স্ত্রী বলল, আমি আপনার শক্তি পরীক্ষার জন্য এমনটি করেছিলাম। তারপর প্রতারক স্ত্রী শহরবাসীকে গোপনে সংবাদ দিল যে, আমি তোমাদের পরামর্শক্রমে রশি দ্বারা আমার স্বামীকে শক্ত করে বেঁধেছিলাম। কিন্তু এর দ্বারা কোন ফায়দা হল না। কেননা তার শক্তির মোকাবেলায় রশি মোমের মত হয়ে যায়। এ কথা শুনে শহরবাসী প্রতারক ও গাদ্দার স্ত্রীর নিকট গলাবদ্ধ ও লোহার জিঞ্জির পাঠিয়ে বলল, তোমার স্বামী যখন ঘুমাতে যাবে তখন তাকে এ গলাবদ্ধ ও লোহার জিঞ্জির দ্বারা খুব শক্ত করে বেঁধে আমাদেরকে সংবাদ দিবে। সুতরাং রাতে স্ত্রী তাই করল। কিন্তু হযরত শামশূন যখন জাগ্রত হলেন তখন গলাবদ্ধ ও জিঞ্জির ভেঙ্গে গেল। তিনি বের হয়ে আসলেন। স্ত্রীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এমনটি করলে কেন? স্ত্রী পূর্বের জবাবই পুরনাবৃত্তি করে বলল, দুনিয়াতে এমন কোন জিনিসও কি আছে, যা তোমাকে পরাজিত করতে পারে? তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তাআলাই আমাকে পরাজিত করতে পারেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে একটি মাত্র জিনিসেই আমাকে পরাভূত করতে পারে। মহিলা জিজ্ঞেস করল, সেটি কী? তিনি বললেন, সে জিনিসটি আমি তোমাকে বলতে পারব না। কিন্তু এ প্রতারক ও গাদ্দার মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং তথ্য উদঘাটনের জন্য জেদ ধরল।

শামশূন-এর মাথায় অনেক লম্বা চুল ও ঘন চুল ছিল। তিনি বললেন, আমার মা আমার জন্য একটি ভীতিজনক বস্তু রেখে গিয়েছেন। আর তা হচ্ছে আমার মাথার লম্বা চুল। কেউ যদি আমাকে এ চুল দ্বারা বেঁধে ফেলে তাহলে আমি অসহায় হয়ে যাব। কেননা, এর উপর আমার কোন ক্ষমতা চলে না।

এ ব্যাপারটা জেনে মহিলা খুব আনন্দিত হল। রাতে যখন তিনি শুয়ে পড়লেন তখন স্ত্রী চুপিসারে উঠে গিয়ে তাঁর চুল দ্বারা তাঁকে বেঁধে শহরবাসীকে খবর দিল। শহরবাসী এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা তাঁর কান কেটে ফেলল এবং তার চোখ দুটি খুলে শহরের মধ্যখানে জনগণের তামাশার জন্য দাঁড় করিয়ে দিল। শহরের স্থানে স্থানে স্তম্ভ দাঁড়ানো ছিল, এতে বসে বসে লোকজন তাঁকে ঠাট্টার পাত্র বানিয়ে নিল। তামাশা দেখার জন্য বাদশাহও তার মহল থেকে বের হলেন এবং উঁচু স্থানে শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে বসে পড়লেন। সুতরাং তাঁকে যখন বিকৃত করতে শুরু করল তখন শামশূর (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে এ বলে দুআ করতে আরম্ভ করলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের উপর বিজয়ী করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং পুনরায় তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন এবং শহরের সে মিনারে বাদশাহ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ বসে তামাশা উপভোগ করছিলেন তাও ধ্বংস করে দিলেন। এতে সব লোক নিহত হয়ে গেল। তার প্রতারক ও গাদ্দার স্ত্রীর উপর আল্লাহ তাআলা বজ্রাঘাত করে জ্বালিয়ে শেষ করে দিলেন।

আল্লামা দামেরী (রহ.) 'নুযহাতুল আবসার ফী আখবারি মুলুকিল ইহসার' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে : কোন এক বাদশাহ এক বালককে দেখল যে, সে একটি মন্থর গতিসম্পন্ন গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বার বার সে গাধাকে খুব শক্তভাবে হুমকী দিয়ে হাঁকাচ্ছে। তা দেখে বাদশাহ বালককে বললেন যে, হে বালক! গাধার সাথে নম্র আচরণ কর। বালক জবাব দিল, যদি হুমকী ধমকী না দেই তাহলে সে এ রাস্তা ধীরে ধীরে অতিক্রম করবে। এতে তাঁর খুব বেশি ক্ষুধা লাগবে এবং সে দেরি করে বোঝা উঠাবে। আর যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই তাহলে বোঝা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে এবং অনেক সময় পর্যন্ত ঘাস খেতে পারবে। বালকের এ জবাব বাদশাহর খুবই পছন্দ হল। তাই তিনি বালককে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। পুরস্কার গ্রহণের পর বালক বলল, এ রিযিক আল্লাহ তাআলা আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন, তাই আমি প্রথমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করব তারপর আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব। বালকের এ ধরনের জবাবে বাদশাহর অন্তরে আরও প্রভাব বিস্তার করল এবং তিনি বললেন, আজ থেকে তোমার নাম আমার বন্ধুদের মাঝে লিপিবদ্ধ করে দিলাম। বালক জবাব দিল, এতে আমার গৌরবের কারণও রয়েছে এবং চিন্তারও কারণ আছে। এ কথা শুনে বাদশাহ বললেন, হে বালক! আমাকে কিছু উপদেশ দাও। কেননা তোমাকে বুদ্ধিমান বলে আমার মনে হচ্ছে।

'বালক বলল- জাঁহাপনা! আপনি যখন নিজেকে সুস্থ ও নিরাপদ মনে করবেন তখন ধ্বংসের খেয়াল করবেন। আর যখন আপনি খুশি ও আনন্দ অনুভব করবেন তখন বিপদাপদের কথা স্মরণ করবেন। আর যখন আপনার

অন্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করবেন তখন ভয়-ভীতির ধ্যান করবেন। আর যখন কোন কাজ শেষ করবেন তখন মৃত্যুকে স্মরণ করবেন। আর আপনি যদি নিজেকে ভালবাসেন তাহলে কোন মন্দ কাজে জড়াবেন না।'

বাদশাহ বালকের জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তায় খুব খুশি হলেন এবং বললেন, যদি তুমি কম বয়সের না হতে তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করতাম। বালক জবাব দিল, "বুদ্ধিমত্তায় রয়েছে মর্যাদা, বয়সে নয়"। বাদশাহ বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মধ্যে মন্ত্রিত্বের যোগ্যতা আছে কি? বালক জবাব দিল, ভাল মন্দের অনুমান করা যায় পরীক্ষার পরই। কোন মানুষের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা তখন পর্যন্ত বুঝা যায় না- যখন পর্যন্ত তাকে পরীক্ষা না করা হয়। এ কথা শুনে বাদশাহ তাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন এবং তাকে স্বীয় পদের দায়িত্ব পালনে সঠিক সিদ্ধান্তদাতা ও সঠিক মীমাংসাকারী হিসেবে পেয়েছেন।

(১) এক বৃদ্ধের কাহিনী

উক্ত গ্রন্থে কতিপয় কৌতুকপূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলে।

(১) একবার খলীফা হারুনুর রশীদ শিকার করার জন্য বের হলেন। ফযল ইবনে রবী (মন্ত্রী) তার সাথে ছিল। খলীফা এক শিকারের পিছনে ধাওয়া করে তাঁর সাথীবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। খলীফা এবং মন্ত্রী উভয়েই ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন এক বৃদ্ধ গাধার উপর আরোহন করে আসছেন। তার চোখে ময়লা ভর্তি ছিল। খলীফা লোকটিকে দেখে মন্ত্রী ফযল ইবনে রবীয়ারের প্রতি চোখে ইশারা করলেন। বৃদ্ধ যখন একেবারে কাছে আসল তখন ফযল তাকে জিজ্ঞাসা করল, মুরুব্বী কোথায় যাচ্ছেন? বৃদ্ধ জবাব ছিল, আমি আমার বাগানে যাচ্ছি। ফযল বলল, মুরুব্বী আপনি চাইলে আপনার জন্য একটি ঔষধ বলে দিতে পারি। এতে আপনার চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বৃদ্ধ বলল, এমন ঔষধ আমার অতীব প্রয়োজন। ফযল বলল, তুমি এক কাজ কর, মাশরুম ছত্রাক আখরোটের ছালের মধ্যে রেখে সুরমা করে চোখে লাগাবে তোমার চোখ ভাল হয়ে যাবে। এ কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি তার গাধার লাগামের আড় দ্বারা হেলান বানিয়ে এবং তার নিতম্ব উঠিয়ে খুব জোরে বায়ু ছাড়ল এবং বলল, এটা আপনার ঔষধের পুরস্কার। যদি ঔষধের দ্বারা আমি আরোগ্য লাভ করি তাহলে আপনাকে খুশি করব। এ কথা শুনে খলীফা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল।

(২) এক দর্জির কাহিনী

এক আমীর (গভর্নর) এক দর্জির নিকট স্বীয় কাবা (আচকান জাতীয় ঢিলা পোশাক) বানাতে কাপড়ের মাপ দিতে লাগলেন। সুতরাং দর্জি যখন কাপড়

মেপে কাটতে ছিল তখন আমীর সম্মুখে বসা ছিলেন। যে কারণে দর্জি কাপড় চুরির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কাপড় কাটতে দর্জি খুব বিলম্ব করতে লাগল। কিন্তু আমীর সম্মুখে বসে রয়েছেন। আমীরকে সরানোর কোন কৌশল না পেয়ে অবশেষে কৌশল হিসেবে দর্জি খুব জোরে বায়ু ছাড়ল। এতে আমীর হেসে লুটে পড়ল। এ ফাঁকে দর্জি তার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য কাপড় কেটে লুকিয়ে ফেলল। হাসাহাসির পর আমীর বলল- পুনরায় এমন কর। দর্জি জবাব দিল এখন নয়। কেননা এখন যদি আমি এমনটি করি তাহলে আপনার কাবা আটসাঁট হয়ে যাবে।

(৩) যুনযুন ইবনে মূসার কাহিনী

'নুশওয়ানুল মুহাদিয়া' নামক গ্রন্থে যুনযুন ইবনে মূসার একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। (যুনযুন নিজেই বলেন) আমার বয়স তখন খুব অল্প ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাল রাজপথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদিন আমি 'সানুতফ' প্রদেশ থেকে বের হয়ে 'ইকরে মুকাররম' যেতে মনস্থ করলাম। আমার সঙ্গে ছিল দুটি গাধা। একটির উপরে আমি আরোহী ছিলাম, অপরটির পিঠে ছিল তরমুজ। আমি খলীফার সৈন্যবাহিনীর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার জানা ছিল না যে, তারা কার সৈন্য। সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন এসে ৩/৪টি তরমুজ গাধার পিঠ থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমি এ জন্য চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। এগুলোর গণনায় কম হবে এবং আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হবে। আমি এবং গাধা রাজপথের মধ্যখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আমার সম্মুখে একটি অশ্ববাহিনী এসে পড়ল। তাদের আগে আগে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। লোকটি আমাকে কাঁদতে দেখে দাড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে বালক! তুমি কাঁদছ কেন? আমি তার নিকট কাঁদার কারণ বললাম। সুতরাং তিনি সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে তাকে এখনই আমার কাছে নিয়ে আস।

এ কথা বলা মাত্রই কয়েকজন সিপাহী সে সেপাহীকে ধরে তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসল। সিপাহীকে দেখে সে লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এ কি সে লোক যে তোমার তরমুজ বের করে নিয়ে গিয়েছিল? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ জনাব! সে আমার তরমুজ নিয়েছে। আমার জবাব শুনে লোকটি সিপাহীকে বেত্রাঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। সিপাহীকে বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল আর আমি গাধার পিঠে বসে তা দেখছিলাম। আর সে লোকটি সিপাহীকে বলছিল, কুত্তা! তোর কাছে কি এ তরমুজ কেনার মূল্যও ছিল না, যার দ্বারা তুই তা খরিদ করতে পারতি? এ তরমুজের মালিক এগুলো পরিশ্রম করে অর্জন করে নি? একি তোর বাপ-দাদার সম্পদ যে তুই তা ছিনিয়ে নিলি। এর মালিক কি সরকারী ট্যাকস দেয় নি। একশত বেত্রাঘাতের পর সিপাহীকে ছেড়ে দেয়া হল এবং সে ব্যক্তি আমাকে

হারিয়ে যাওয়া তরমুজের জন্য চারটি দিনার প্রদান করে চলে গেলেন। তার পশ্চাতের সৈন্যগণ আমাকে গালি দিতে দিতে চলে যেতে লাগল যে, তোমার কারণে সিপাহীকে একশত বেত্রাঘাত করা হল। সে সৈন্যগদের মধ্য থেকে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পক্ষ থেকে বাদী লোকটি কে ছিলেন? সে জবাব দিল, তিনি ছিলেন খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ।

(৪) একটি শিশুর কাহিনী

আল্লামা ইবনুল জাওযীর 'আল-আযকিয়া' নামক গ্রন্থে জাহিয থেকে বর্ণনা করেন : সুমামা ইবনে আশরাস বর্ণনা করেন যে, একবার এক বন্ধুর সাহায্যের জন্য তার ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার গাধাটি ঘরের দরজায় বেঁধে অন্দর মহলে চলে গেলাম। আমার সাথে কোন খাদেমও ছিল না যে, গাধাটি দেখাশুনা করবে। আমি আমার বন্ধুকে দেখার পর ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, আমার গাধাটির পিঠে একটি শিশু বসে আছে। আমি তাকে বললাম, আমার অনুমতি ব্যতীত কীভাবে তুমি গাধার পিঠে আরোহণ করলে? শিশুটি জবাব দিল, আমি এজন্য গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছি যেন গাধাটি কোথাও পালিয়ে না যায় এবং আপনি চিন্তিত না হয়ে পড়েন। আমি বললাম- গাধাটির এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে চলে যাওয়া ভাল ছিল। একথা শুনে শিশুটি বলল, আপনার যদি এরকম উদ্দেশ্যই থাকে তাহলে গাধাটি আমাকে দান করে দেন এবং মনে করেন যে, গাধাটি হারিয়ে গিয়েছে। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যান। সুমামা বলেন, শিশুটি আমাকে নির্বাক করে দিল এবং আমি বুঝতে পারি নি যে, তাকে কী জবাব দিব।

(৫) ইবনে খাকান-এর কাহিনী

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) শিশুর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে একটি উত্তম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ঘোড়ায় চড়ে খাকানবাসীর সেবা করার জন্য গমন করলেন। সে সময় ফতেহ ইবনে খাকান ছোট ছিলেন। খলীফা মু'তাসিম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলত আমীরুল মু'মিনীন (খলীফা মু'তাসিম) উত্তম না তোমার পিতা (খাকান) উত্তম? ফতেহ জবাব দিল, আমীরুল মু'মিনীন যখন আমার পিতার ঘরে অবস্থান করেন তখন আমার পিতার ঘর শ্রেষ্ঠ; আমীরুল মু'মিনীন নন। এরপর খলীফা মু'তাসিম তার আঙ্গুলের উপরের অংশ দেখিয়ে বললেন এর চেয়ে আর কোন ভাল জিনিস তুমি দেখেছ কি? ফতেহ জবাব দিল জি হ্যাঁ, দেখেছি। তাহল যে আঙ্গুলে এটা পরিধান করা হয়েছে তা উত্তম।

(৬) এক যুবকের কাহিনী

ইবনুল জাওযী লিখেছেন : একবার খলীফা মানসুরের নিকট একজন যুবক উপস্থিত হল। খলীফা যুবকের পিতার মৃত্যু সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

যুবক জবাব দিল যে, অমুক দিন তার ইন্তেকাল হয়েছে, রহমাতুল্লাহ। অমুক দিন থেকে তার অসুখ হয়েছিল, রহমাতুল্লাহ। তিনি এত বছর জীবিত ছিলেন, রহমাতুল্লাহ। যুবক বার বার রহমাতুল্লাহ বলায় খলীফার মন্ত্রী রাবী বিরক্ত হলেন। রাবী গিয়ে যুবককে খুব করে ধমকালেন এবং বললেন তোমার লজ্জা নাই যে, খলীফার সম্মুখে বার বার রহমাতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ বলে যাচ্ছ। যুবক জবাব দিল, আপনার ধমকে আমি ভয় পাই না। কেননা আপনি আপনার পিতামাতার দয়া ও অনুগ্রহের সাথে পরিচিত নন। একথা শুনে খলীফা মানসুর এতই হাসলেন যে, ইতিপূর্বে আমি তাকে এত হাসতে দেখি নি। তার কারণ ছিল যে, রাবীর পিতা কে তা জানা যায় নাই। রাবীকে শিশুকালে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। যেহেতু রাবী তখন খুব ছোট বাচ্চা ছিল এবং ভালভাবে কথাও বলতে পারত তাই তার পিতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এজন্য যুবক তার প্রতি বিদ্রূপ করেছিল।

(৭) হাকিম উবায়দির কাহিনী

তারিখে ইবনে খাল্লিকানে খলীফা হাকিম উবায়দীর জীবনীতে আলোচনা করা হয়েছে যে, হাকিম-এর কাছে একটি শক্তিশালী গাধা ছিল। যাকে আসহাব (সাদা কালো মিশ্রিত) বলা হত। হাকিম তার নাম রেখেছিলেন কমর। হাকিম তাতে আরোহণ করে বের হতেন এবং সর্বদা একাই এর উপর আরোহণ করতেন। ৪১১ হিজরী ১৭ শাওয়াল সোমবার রাতে তিনি মিসরে ঘোরাফেরার জন্য বের হলেন এবং সারা রাত্রই ঘোরাফেরা করেন। সকাল বেলা তিনি পূর্ব হালওয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন। সারা রাত্রই যে দুজন আরোহী তার সাথে ছিল তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারা চলে আসলেন। এরপর লোকজন হাকিমের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ফিরে না আসার কারণে লোকজন তার খোঁজে করতে লাগল এবং শাওয়াল মাসের শেষ পর্যন্ত খোঁজ করল। কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর যিলকাদার ২ তারিখ তার গোলামদের একটি বড় দল হাকিমের সন্ধানে বের হল। সন্ধান করতে করতে গোলামরা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দেখল, তার গাধা সেখানে পড়ে রয়েছে এবং তরবারির দ্বারা তার সম্মুখে দুটি পা কর্তিত। তারা রক্তের চিহ্ন দেখে আরও সম্মুখে অগ্রসর হল। এ রক্তের দাগ পূর্ব হালওয়ানের একটি চৌবাচ্চা পর্যন্ত দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজন গোলাম সে পানির চৌবাচ্চায় অবতরণ করতে গিয়ে দেখল যে, সাতটি বোতাম (যেগুলো খলীফা ব্যবহার করতেন) পড়ে রয়েছে এবং বোতামগুলোতে রক্তের দাগ রয়েছে। কিন্তু খলীফার মৃতদেহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বোতামগুলো দেখে বিশ্বাস হল যে খলীফা নিহত হয়েছেন। এ সময়ে কোন কোন মূর্খের ধারণা ছিল যে, খলীফা এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি কোন এক সময় অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করবেন। কারও ধারণা মতে খলীফার হত্যার পিছনে তার বোনের হাত ছিল।

হাকিম দানবীর ও দাতা ছিলেন আবার রক্ত পিপাসুও ছিলেন। তার অভ্যাস ছিল আশ্চর্য ধরনের। প্রত্যেক দিন সাধারণ লোকদের জন্য তিনি একেকটি নতুন ফরমান জারি করতেন এবং তা মানতে জনগণকে বাধ্য করতেন। ৩৯০ হিজরীতে তিনি একটি নতুন ফরমান জারি করলেন যে, প্রত্যেক মসজিদের দেওয়ালে, হাটে-বাজারে এবং প্রতিটি শহরে সাহাবা কেরামের ব্যাপারে দুর্নাম করা হোক। দু বছর পর আবার এ আদেশ প্রত্যাহার করে ফরমান জারি করলেন যে, যে ব্যক্তি সাহাবা কেরামকে গালি দিবে এবং তাদের শানে বেয়াদবী করবে তাকে হত্যা করা হবে। একবার তিনি কুকুর হত্যার আদেশ জারী করলেন। সুতরাং যেখানেই কুকুর পাওয়া যেত সেখানেই হত্যা করা হত। এরপর তিনি বিভিন্ন ধরনের আদেশ জারী করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

(১) যবের শরাব ও বিস্বাদ গোশতের উপর নিষিধাজ্ঞা।

(২) কিসমিস বিক্রি করার পর স্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং রাজ্যে যত কিসমিস আছে সব একত্র করে পোড়িয়ে দেয়া হল। এগুলো পোড়াতে পাঁচশত দীনার ব্যয় হল।

(৩) আঙ্গুর বিক্রি করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ।

(৪) ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের আদেশ করলেন যে, তাদের এবং মুসলমানদের পোশাকের মধ্যে পার্থক্য রাখতে হবে।

(৫) ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের পৃথক পৃথক গোসলখানা হবে।

(৬) তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে, তারা আলাদাভাবে নৌকা তৈরি করবে এবং তারা মুসলমানদের নৌকায় আরোহন করতে পারবে না।

(৭) কোন মুসলমান নিয়মিতভাবে খাদেম রাখতে পারবে না। কোন মুসলমান ভাড়ায় গাধায় আরোহণ করতে পারবে না।

(৮) ৪০৮ হিজরীতে মিসরের সমস্ত গীর্জায় মূর্তিগুলো ধ্বংস করে ফেলেন এবং গীর্জার সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেন । এর কিছুদিন পর এ ধ্বংসকৃত সব গীর্জা পুনঃ মেরামত ও গীর্জার বণ্টিত মালামাল ফেরত দানের আদেশ জারী করেন।

(৯) জ্যোতিষীদেরকে নির্বাসনে দিয়ে দেন এবং গণকবিদ্যা সম্পর্কে যাবতীয় আলাপ-আলোচনা করাও নিষেধ করেন। তিনি গায়কদেরকেও নির্বাসন দেন।

(১০) রাত ও দিনের যেকোন সময় মহিলারা রাস্তায় বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

(১১) মহিলাদের মোজা না বানাতে মুচীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

অন্য একটি কাহিনী

কুশাইরী রচিত গ্রন্থের "কারামাতুল আউলিয়া" অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে : আবু হাতেম সিজিস্তানী আবু নসর সিরাজ থেকে এবং আবু নসর হোসাইন ইবনে আহমাদ রাযী থেকে, তিনি আবু সুলাইমান খাওয়াস-এর থেকে শুনেছেন যে, তিনি একবার গাধায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন এবং গাধাটিকে মৌমাছি উত্তক্ত করছিল। যে কারণে গাধাটি বারবার মাথা ঝাড়া দিচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন- মাথা বারবার নড়াচড়ার কারণে আমি তাকে লাঠি দিয়ে মারপিঠ করছিলাম। যখন বেশি বিলম্ব হয়ে গেল এবং আমিও মারছিলাম, তখন গাধাটি আমার দিকে মুখ করে বলতে লাগল তুমি বিনা দোষে আমাকে মারপিঠ করছ। তোমার মাথায়ও এমনভাবে মারপিঠ পড়বে। হুসাইন বললেন, আমি খাওয়াসকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আবু সুলাইমান! ঘটনা কী? গাধা কি সত্যিই আমার সঙ্গে কথা বলেছিল? তিনি ইতিবাচক জবাব দিলেন এবং বললেন, তোমার কথাবার্তা আমি যেরূপ শুনতে পাচ্ছি গাধার কথাও আমি সেরূপই শুনেছি।

পরিশিষ্ট

ইমাম বায়হাকী (রহ.) "শোয়াবুল ঈমানে" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন, সকল নবীই গাধায় আরোহন করেছেন এবং পশমী কাপড় পরিধান করেছেন। তাঁরা নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটও একটি গাধা ছিল। তার নাম ছিল উফায়র। কেউ কেউ উফায়রকে গোফায়র বলতেন। তবে তা ভুল উচ্চারণ। এ গাধাটি মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'ইয়াকুর' নামক আরেকটি গাধা ছিল। এ গাধাটি ফারওয়া ইবনে উমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। উফায়র ও ইয়াকুর উভয় শব্দই ' আফরাহ' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ মেটে রং। ইমাম সুহাইলী (রহ.) বলেন, যেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিরোধাম ঘটে সেদিনই ইয়াকুর নামক গাধাটি এক কূপে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

ইবনে আসাকের স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থ আবু মানসুরের সনদে লিপিবদ্ধ করেছেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খায়বার বিজয় করলেন তখন তাঁর হাতে কালো রঙের গাধা আসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে গাধাটির সাথে কথাবার্তা বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী? গাধা জবাব দিল, আমার নাম ইযায়ীদ ইবনে শিহাব। আমার দাদার বংশ থেকে আল্লাহ তাআলা ৬০টি গাধা সৃষ্টি করেছেন। তাদের পিঠে নবী ব্যতীত অন্য কেউ সওয়ার হয় নি। এখন এ বংশের আমি ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নাই। এবং

আপনি ব্যতীত আর কোন নবীও নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার পিঠে আরোহণ করবেন। আপনার পূর্বে আমি এক ইয়াহুদীর নিকট ছিলাম। যে যখন আমার পিঠে আরোহণ করত তখন আমি ইচ্ছা করেই তাকে নিয়ে পড়ে যেতাম। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি 'ইয়াকুর' এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন গাধীর প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ আছে কী? গাধা উত্তর দিল, না আমার স্ত্রী গাধীর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাধাটির পিঠে সওয়ার হতেন। আর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোন সাহাবীকে তলব করতেন তখন এ গাধাটি পাঠিয়ে দিতেন। সুতরাং গাধাটি সাহাবীর বাড়িতে গিয়ে দরজায় মাথার সাহায্যে আঘাত করতেন। ঘরের মালিক ঘর থেকে বের হলে গাধাটি তার মাথার সাহায্যে এমন ইঙ্গিত করত; যাতে সাহাবী বুঝে যেতেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তলব করেছেন। সুতরাং সে সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতে শোকাহত হয়ে গাধাটি একটি কূপে পড়ে আত্মহত্যা করল। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর সনদ ও মতন অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং আমার বিশ্লেষণ যাচাই-বাছাই ব্যতীত আলোচনা করা জায়িয হবে না। অথচ "আত তারীফু ওয়াল ই'লাম ফিল কালাম" গ্রন্থে আল্লামা সুহাইলী (রহ.) আল্লাহ তাআলার বাণী والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة-এর ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

কামিল ইবনে আদ্দী আহমাদ ইবনে বশীর-এর জীবনীতে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : "নবী করীম (সাঃ ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈলের এক লোক তার ইবাদতখানায় ইবাদত করছিলেন। যখন বৃষ্টি হল এবং যমীন সবুজ-শ্যামল আকার ধারণ করল, তখন সে তার গাধাকে সবুজ শ্যামল ভূমিতে চরতে দেখে বলল– হে আল্লাহ! তোমারও যদি গাধা থাকত তাহলে আমি তোমার গাধার সাথে অবশ্যই একে চরাতাম। তার সংবাদ যখন বনী ইসরাঈলের কোন এক নবীর নিকট পৌছল তখন তিনি সে আবেদনের প্রতি বদদুআ করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ তাআলা নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন : "আমি আমার বান্দার জ্ঞান অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।"

উপরোক্ত হাদীসটি আবু নাঈমের 'আল-হুলইয়া' নামক গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আসলাম-এর জীবনীতে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আবু শায়বা তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ সুলাইমান ইবনে মুগীরাহ থেকে সাবিত এ হাদীসটি বর্ণনা করেন : হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট কেউ বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি আপনার প্রয়োজনে কোন গাধা গ্রহণ করতেন তাহলে কতই না ভাল হত। তিনি জবাব দিলেন, আমি এমন বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে চাই যে বস্তু আল্লাহর স্বরণ থেকে আমাকে গাফিল করে দিবে।

গাধার শরঈ বিধান

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে গাধার গোশত খাওয়া হারাম। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, পনেরো জন সাহাবীর পক্ষ থেকে গাধা মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আব্দুল বারর্ (রহ.) গাধার গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমার দাবী করে বলেছেন, হযরত গালিব ইবনে আবজার থেকে বর্ণিত। রাবী বর্ণনা করেন, এক বছর আমরা মুসীবতে পড়ে গেলাম। আমরা এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আবেদন জানালাম। তারপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার কাছে গাধা ব্যতীত শিশুদেরকে খাওয়ানের জন্য আর কিছুই নাই অথচ আপনি গাধার গোশত হারাম ঘোষনা করেছেন। (এখন কী করি) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার সন্তানদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়াতে পার। আমি সে সব গাধা ব্যবহার থেকে বিরত রইলাম, যা গৃহস্থলির কাজে আসত।

গালিব ইবনে আবজার থেকে এ বর্ণনাটি ব্যতীত আর কোন বর্ণনা নাই। "নবী করীম (সাঃ) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।"

হাদীসের সকল হাফেযগণ গালিব ইবনে আবজারের বর্ণনাকে দুর্বল বলে অভিমত দিয়েছেন। যদিও বা হাদীসটি সহীহ বলে ধরে নেয়া যায় তবুও তা অপারগ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এটা ঘটনা চক্রেরর নির্দেশ; এটা ব্যাপক বা সার্বজনীন নয় এবং এটা কোন হুজ্জত—দলীল প্রমাণও নয়। গাধার গোশত হারাম হওয়ার ইল্লাতের (কারণ) ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, এর ইল্লত—কারণ হল আরববাসীদের প্রকৃতিতে তা মাকরূহ, তাই তা মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেন, নস স্পষ্ট দলীলই তা মাকরূহের কারণ।

হাফেয মুলযিরী (রহ.) বলেন, গাধার গোশতের অবৈধতাও দুবার মানসুখ হয়েছে। আবার কিবলাও দুবার মানসুখ হয়েছে। অনুরূপ মুতআ বিবাহ (কোন কিছুর বিনিময়ে সাময়িক উপভোগ) দুবার মানসুখ হয়েছে।

গাধার দুধের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম হারাম বলেছেন। আতা, তাউস ও যুহরী (রহ.) গাধার দুধ পান করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। বিশুদ্ধ মতে গাধার দুধ হারাম। কারণ দুধের বিধান গোশতের অনুগামী হয়। নিস্প্রয়োজনে গাধা এবং অন্যান্য প্রাণী হত্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

বুখারীতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এমন একটি গাধার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চেহারায় দাগ দেয়া হয়েছিল। তা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- যে ব্যক্তি এমনটি করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা তাকে আপন রহমত থেকে বঞ্চিত করুন যে ব্যক্তি তাকে দাগ দিয়েছে।

উদাহরণ ও উপমা

আরববাসীগণ বলেন : عشر تعشير الحمار জাওহারী বলেন, "তা'শীরে হিমার" দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন আওয়াজ যা গাধা ঢোক গিলে বের করে। আরবগণ এ উদাহরণটি তখনই দিয়ে থাকেন, যখন কেউ বিপদের ভয়ে গাধার মত চিৎকার দিয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে ইয়াহুদী আলেমদের ব্যাপার উল্লেখ রয়েছে–

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا

যাদেরকে তাওয়াতের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করে নি। তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গাধা । (সূরা জুমাআ : ৫)

হাদীস শরীফেও গাধার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেমন : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তার পেটের ভিতরের অংশসমূহ এমনভাবে চক্কর খেতে থাকবে, যেমন গাধা চক্কর খেতে থাকে। জাহান্নামবাসীরা তাকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার এমন কী পাপ ছিল যে কারণে এমন ভীতিজনক সাজা দেয়া হচ্ছে? সে তখন বলবে, আমি আনুষকে ভাল কাজের উপদেশ দিতাম কিন্তু আমি নিজে তা পালন করতাম না। মানুষকে আমি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু নিজে বেঁচে থাকতাম না।

আরববাসীগণ বহু বিবাহকারীকে বলে থাকে – هم يتهارجون تهارج الحمر

তারাও আরও বলেন : يهرجها ليله جميعا

হাফেয আবু নাঈম আবুয যাহরিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, মানুষ ইয়াজুজ ও মা'জুজের ফিতনার পর দশ বছর আরাম আয়েশে জীবন কাটাবে। এমনকি

একটি আনার ও একটি আঙ্গুরের খোসা উত্তোলন করতে দুজন করে লোকের দরকার হবে। এ অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হবে। তারপর আল্লাহ তাআলা একটি সুগন্ধিময় বায়ু প্রেরণ করবেন। এতে সমস্ত মু'মিন নারী পুরুষ মৃত্যুবরণ করবে। এরপর লোকেরা এমন বিশৃঙ্খল জীবন কাটাবে যেমন গাধা চারণভূমিতে যেদিকে মুখ উঠায় সেদিকে চলে যায়। এরপর এমন বিশৃঙ্খল জীবনে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

কোন অপছন্দনীয় কাজে কোন সম্প্রদায় সহায়তা করলে এর দৃষ্টান্ত দিয়ে আরববাসীগণ বলে থাকে–

بال الحمار فاستبال احمرة اى حملهن على البول

"এক গাধায় দেখাদেখি অপর গাধাও পেশাব করতে লাগল।"

এ ধরনের উদাহরণটি তখনই দেয়া হয় যখন গোত্রীয় আকর্ষণে মানুষ ন্যায়-অন্যায় না দেখে কারও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। আরববাসীগণ আরও বলে থাকে– اتخذ فلان حمار الحاجات "অমুক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় গাধায় আরোহণ করেছে।" অর্থাৎ অপমানের কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু তারা এ উদাহরণও দিয়ে থাকে– تركته جوف الحمار এ উদাহরণটি এমন সময় দেয়া হয় যখন কোন বস্তুতে কল্যাণের কোন নাম গন্ধও থাকে না।

আবার ইহাও বলা হয়– اصبر من حمار "অমুক ব্যক্তি গাধার চেয়েও অধিক ধৈর্যশীল। কোন কবি বলেন :

غدونا غدوة سحرا بليل عشاء بعد ما انتصف النهار

আমরা খুব ভোরেই চললাম, আমরা অনবরত চলতেই থাকলাম, অবশেষে দিবসের অর্ধেক হয়ে গেল।

قصدناها حمارا ذا قرون اكلنا اللحم وانفلت الحمار

অতঃপর আমরা একটি শিংবিশিষ্ট গাধা প্রাপ্তির আশা করলাম, আমরা তার গোশত খেয়ে ফেললাম এবং গাধা তার জীবন দিয়ে দিল।

এখানে কবির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গাধাটিই খেয়ে ফেলা হল; কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আর 'শিংওয়ালা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল গাধাটি পূর্ণ বয়স্ক ছিল; বাচ্চা ছিল না। সুতরাং অন্য একজন কবি বলেন :

ومايقيم بدار الذل يعرفها الا الا الاذلان غير الحى والوتد

যেখানে শুধু অপমান ও লাঞ্ছনাই থাকে সেখানে কেউ দাঁড়ায় না। আর যদি দুটি বস্তু পড়ে থাকে একটি হল গাধা আর অপরটি পেরেক।

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له احد

তবে গাধার পায়ে রশি বেঁধে দেয়া হয় এবং পেরেকটি উঠিয়ে ফেলার জন্য তার মাথায় টোকা দেওয়া হয় । তবে এ যুলুমের জন্য কেউ দু ফোঁটা অশ্রুও ফেলবে না।

চিকিৎসায় গাধার উপকারিতা

কেউ যদি গাধার কানের ময়লা মদ অথবা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করে, তাহলে তার এমন নিদ্রা আসবে যে, তার কোন খবরই থাকবে না। গাধার সঙ্গমের সময় যদি কেউ তার লেজের পশম ছিড়ে নিয়ে রানে বাঁধে তাহলে যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গাধার লেজে যদি পাথর বেঁধে দেয়া হয় অথবা তার পাছাতে তৈল মালিশ করে দেয়া হয় তাহলে তার চিৎকার বন্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম রাযী (রহ.) ও হাভী গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, গাধার গোশত গরম করে টিঢেনাস রোগীকে সে গোশতে বসিয়ে দিলে আশাতীত ফলপ্রদ হবে। এর খুর দ্বারা আংটি বানিয়ে মৃগী রোগীর হাতে পরালে এ রোগ দূর হয়ে যাবে। ঘোড়া অথবা গাধার গোবর পোড়িয়ে অথবা না পোড়িয়ে সিরকায় মিশিয়ে কোন কাটা-ছেড়া স্থানে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। গাধার ললাটের চামড়া শিশুর গলায় বেঁধে শিশুর ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে। এর গোবরে শিরশ মিশিয়ে শ্বাস টানলে নাকছির (নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগ) ভাল হয়ে যাবে।

আল-ফালাহা গ্রন্থকার লিখেছেন : কাউকে বিচ্ছু কামড়ালে রোগীকে গাধার উপর সওয়ার করিয়ে পিঠের দিকে তার মুখমণ্ডল রেখে দিলে বিষ গাধার মধ্যে চলে যাবে। কাউকে বিচ্ছু কামড়ালে রোগীকে গাধার নিকট এনে তার কানে বলে দিতে হবে আমাকে বিচ্ছু কেটেছে তবে ব্যথা-বেদনা গাধার মধ্যে চলে যাবে। তবে প্রথম পদ্ধতিটি পরীক্ষিত। গাধার হাড়ের মগজ তৈলে মিশ্রিত করে মাথায় ব্যবহার করলে মাথার চুল লম্বা ও কালো হবে। গাধার কলিজা ভুনা করে সিরকায় মিশিয়ে খেলে মৃগী রোগী ভাল হয়ে যায়। সুস্থ মানুষ খেলেও মৃগী রোগী থেকে নিরাপদ থাকা যায়। গাধার দুধ লিঙ্গে মালিশ করলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়। গাধার চিৎকারে কুকুরের খুবই কষ্ট হয়। কোন কোন সময় কুকুর গাধার চিৎকারে অধিক কষ্টের কারণে কাঁদতে থাকে।

স্বপ্নে গাধা দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে গাধা দেখা আনন্দ ও সফলকাম হওয়ার লক্ষণ। গাধা স্বপ্নে দেখলে গোলাম বা সন্তান অথবা ধন-সম্পদ প্রাপ্তির প্রমাণ। আবার কোন সময় ভ্রমণ বা জ্ঞানার্জনের প্রতিও ইঙ্গিতবহ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : كمثل الحمار يحمل اسفارا যেমন গাধা বহন করে কাগজ।

আবার কখনও জীবিকা অর্জনের প্রতিও ইঙ্গিত করে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

انظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس

তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখ আর আমি তোমাকে করব মানুষের জন্য নিদর্শন।

কোন কোন সময় এর ব্যাখ্যা ইয়াহুদী আলেম দ্বারাও দেয়া হয়। কোন কোন সময় বিপদাপদ। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির দিকে ইঙ্গিতবহ। অথবা কোন বড় ধরনের সম্মান লাভেরও আলামত। আবার কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলার বাণী– والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة-এর আলোকে তার উপর সওয়ার হতে দেখলে ধন-সম্পদ অথবা পুত্র সন্তান হওয়ার ব্যাখ্যাও দেয়া হয়।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণের মতে, গাধার উপর সওয়ার হতে দেখলে চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষণ। গাধার মৃত্যু বা দুর্বল হতে দেখলে মালিক ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট পাওয়ার লক্ষণ। আবার কোন কোন ব্যাখ্যাকারকের মতে গাধার মৃত্যু দেখলে মালিকের মৃত্যু ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন।

স্বপ্নে গাধা জবাই করতে দেখলে স্বাচ্ছন্দ্যময় হওয়ার লক্ষণ। আবার অন্যের জন্য জবাই করলে জীবন ধ্বংস হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ গাধার লেজ লম্বা দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, তার ধন-সম্পদ অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এবং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। স্বপ্নে কেউ লাগামসহ গাধা দেখলে তার ছেলে হওয়ার লক্ষণ। অথবা তার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্বপ্নে গাধার পিঠে আরোহণ করতে অপছন্দ করলে তার এমন জিনিস প্রাপ্ত হবে, যে জিনিষের উপযোগী সে নয়। মোটা তাজা ও শীর্ণকায় গাধা দেখলেও ধন-সম্পদ অধিক পরিমাণে পাওয়ার আলামত। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে গাধার উপর সওয়ার হয়েছে এবং গাধার বাচ্চা পিছনে পিছনে আসছে। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল স্বপ্ন দ্রষ্টা কোন সন্তানবর্তী মহিলাকে বিবাহ করবে। স্বপ্নে গাধার চিৎকার দেখলে অমঙ্গলের লক্ষণ। কেননা পবিত্র কুরআনে রয়েছে–

ان انكر الاصوات لصوت الحمير

নিশ্চয়ই অপছন্দনীয় আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ।

অথবা কোন মহামারীতে পড়ে যাওয়ার লক্ষণ। কেননা গাধা শয়তানকে দেখে অপছন্দনীয় চিৎকার করে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : "গাধার আওয়াজ শুনলে তোমরা আল্লাহর নিকট পানাও চাও।" যদি কেউ বোঝাবহনকারী গাধা ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ তাআলা এ বোঝার বদৌলতে তার সর্বাধিক কল্যাণ করবেন।

স্বপ্নে গাধার দুধ দেখা শস্য-শ্যামল ও অধিক ফসল ফলার লক্ষণ। স্বপ্নে গাধার দুধ পান করলে স্বপ্নদ্রষ্টা রোগক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে গাধার গোশত খেতে দেখলে এতে তার স্বামীকে বুঝাবে। কোন মহিলা স্বপ্নে দেখল যে, তার

গাধাটি মরে গিয়েছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করবে অথবা তার মৃত্যু হবে। স্বপ্নে গাধার সাথে কুস্তী লড়তে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে তার কোন নিকটত্মীয়ের মৃত্যু হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল যে, তার গাধাটি ঘোড়া হয়ে গিয়েছে, তাহলে ঐ ব্যক্তির বাদশাহর পক্ষ থেকে ধনদৌলত হাসিল হবে। আর যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার গাধা খচ্চর হয়ে গিয়েছে এর ব্যাখ্যা হবে, ভ্রমণ থেকে তার ধন-সম্পদ প্রাপ্তি ঘটবে। স্বপ্নে কেউ নিজ গাধার উপর নিজেকে আরোহী দেখলে এর ব্যাখ্যা সে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হবে। স্বপ্নে গাধার খুর দেখলে অধিক ধন-সম্পদ লাভ ও ব্যয়ের লক্ষণ। কখনও কখনও গাধার ব্যাখ্যা মূর্খ ও কুসন্তানও করা হয়। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে, আসমান থেকে গাধা আবতরণ করে স্বীয় লিঙ্গ তার পাছায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে তবে তার ব্যাখ্যা হবে সে অগাধ সম্পদ প্রাপ্ত হবে। বিশেষত স্বপ্নদ্রষ্টা যদি বাদশাহ হয় এবং গাধার রং যদি লাল টুকটুকে হয়।

২২৩. الحمار الوحشى (আল হিমার আল-ওয়াহশী)

জংগলী গাধা

জংগলী গাধা অত্যন্ত আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন প্রাণী। এ কারণে সে সার্বক্ষণিক তার স্ত্রী গাধীকে প্রতিরোধ করে থাকে। এর আরও একটি বিষয় হল স্ত্রী গাধী যখন কোন পুরুষ বাচ্চা প্রসব করে তখন সে একটি রক্তের পিন্ডের মত প্রসব করে। সুতরাং গাধী এ বাচ্চা ফেলে পালাতে চাইলে গাধা গাধীকে পালাতে দেয় না। তদবীর হিসেবে এমনকি গাধা গাধীর পায়ের নলা ভেঙে ফেলে, যাতে সে কোথাও যেতে না পারে এবং বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকে। তবে বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গাধীর উপরই থাকে। এ বিষয়টি আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

يا رازق النعاب فى عشه وجابر العظم الكثير المهيض

হে রিযিকদাতা সত্তা! যিনি অসহায় বাচ্চাকেও তার বাসস্থানে খাদ্য পাঠিয়ে দেন এবং ভাঙ্গা হাড়কেও জোড়া লাগিয়ে দেন।

اتح لنا اللهم من عرضه من دنس الذم نقى لحيض

আমাদেরকে লজ্জাহীনতা থেকে বাঁচান এবং কাউকে আমাদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করার সুযোগ দিবেন না।

জংগলী গাধার ব্যাপারে মানুষের মাঝে কথিত আছে : তারা ২০০ বছরের বেশি বেঁচে থাকে। সুতরাং ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদের জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন : একজন সৈনিক বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা 'জারূদ' নামক স্থানে পৌছলাম, সেখানে আমরা অনেক বন্যগাধা শিকার করলাম। শিকারকৃত গাধা থেকে একটি গাধা জবাই করে গোশত পাকানোর

জন্য উনুনে চড়ালাম। দীর্ঘক্ষণ পাকালাম কিন্তু গোশত নরম হল না। তারপর আমি গোশতের পাতিলের নিচে আরও আগুন বাড়িয়ে দিলাম। সারাদিন আগুন দিলাম, কিন্তু গোশত নরম হল না। আমাদের মধ্যে একজন সৈনিক দাঁড়াল এবং সে গাধার চামড়াটি উলট-পালট করে দেখতে লাগল। হঠাৎ করে তার দৃষ্টি গাধার কানের প্রতি পড়ল। সৈনিকটি দেখল যে, এর কানে কী যেন লেখা রয়েছে। সৈনিক লেখাটি পড়ে বুঝতে পারল, তার কানে 'বাহ্‌রাম গোর' লেখা রয়েছে। এ নামটি কূফী হস্তাক্ষরে লেখা। ইবনে খাল্লিকান বলেন, লোকেরা সে চামড়াটি আমার নিকট নিয়ে আসে, আমিও সে নামটি কানের মধ্যে সুন্দরভাবে লেখা দেখেছি।

বাহ্‌রাম গোর নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের অনেক পূর্বে ইরানের একজন বাদশাহ ছিলেন। তার জংগলী গাধা শিকারের যথেষ্ট ঝোক ছিল। এ কারণে তার উপাধি হয়ে যায়, গোর অর্থাৎ জংগলী গাধা। তার নিয়ম ছিল যখনই তিনি কোন বন্যপ্রাণী শিকার করতেন, তখনই তিনি শিকারকৃত প্রাণীর গায়ে তার নাম লিখে ছেড়ে দিতেন। বাহরাম গোরের নাম লিখার পূর্বে এ জংগলী গাধাটির বয়স কত ছিল, তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু এটাকে জবাই করার সময় ধরে বলা যায় ২০০ বছর জীবিত ছিল।

দামেস্কের (সিরিয়ার রাজধানী) একটি শহরের নাম ছিল 'জারূদ'। সে শহরে প্রচুর পরিমাণ বন্যগাধা পাওয়া যায়। শহরে একটি পাহাড় রয়েছে। এটাকে 'জাবালুল মুদখান'—ধোয়ার পাহাড় বলে। এ পাহাড় থেকে সর্বদা ধোয়া বের হত। কেউ কেউ বলেছেন বন্য গাধা আট শত বছরেরর বেশি বেঁচে থাকে। এটা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। এদের দীর্ঘ জীবন লাভ ও মনোলোভা হওয়া আখদারী'র সম্পর্কযুক্ত। যেটি কাসরা আরদশীর-এর একটি ষাড় গাধা ছিল। সে পালিয়ে গিয়ে বন্যপ্রাণীদের সাথে মিশে যায়। এ ষাড় গাধা থেকে জংগলে যে বংশধারার সৃষ্টি হয় তাকে 'আখদারী' বলে।

জাহিয বলেন, গৃহপালিত গাধার চেয়ে জংগলী গাধার বয়স বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জানা মতে গৃহপালিত গাধীর মধ্যে আবু 'সিয়ারাহ'-এর গাধার চেয়ে অন্য কোন গাধার বয়স বেশি হয় নি। আবু সিয়ারাহ-এর প্রকৃত নাম ছিল উমাররাহ ইবনে খালিদ আদওয়ানী। তার নিকট একটি কালো গাধা ছিল। এই গাধাটি তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে মীনা পর্যন্ত তাড়ায় খাটিয়েছেন। নিজের ব্যাপারে তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতেন–

এই গাধাটি আমার একমাত্র সম্পদ নয় বরং এটা ছাড়াও আমার নিকট আরও ধন-দৌলত রয়েছে। যার কারণে লোকেরা আমাকে হিংসা করে থাকে।

তুমি গাধাটি এমন কেন করলে না যে, হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচাতে পারে। এখন শুধু এই দুআই করি যে, আল্লাহ–

শুধু হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা করুন এবং সেই জাদুকারিণীদের থেকেও যে ফুকে থাকে গিটটুতে।

আবু সিয়ারের ব্যাপার কোন কবি বলেন :

আবু সিয়ারাহ এবং তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য রাস্তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাদের গাধা নিরাপদে কিবলার নিকট পৌছে যাবে।

তাহলে কিবলা তার জন্য দুআ করে যে, আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে দয়া করুন যে দয়া করল।

এমনিভাবে আরবদের এ উদাহরণটি প্রসিদ্ধ যে, اضح من حمار ابى سيارة সিয়ারহ-এর গাধা থেকেও অধিক সুস্থ।

ইবনে আবু শাইবাহ ও ইবনে আব্দুল বার (রহ.) আবু ফাতিমা লাইসী থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে বসা ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সার্বক্ষণিক সুস্থতা কে চাও? তখন আমাদের মধ্য থেকে অগ্রসর হয়ে সবাই বলল, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি হারানো গাধার মত হতে চাও? আমরা জবাব ছিলাম এমন হতে চাই না। আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা বিপদ থেকে কেন ভেগে থাকতে চাও? তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শপথ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা কোন মুমিনের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বিপদে ফেলেন না বরং এটা আল্লাহ তাআলা সে মুমিনের উপর দয়া করেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান।

কিন্তু যখন তার কাছে কোন নেক আমল ছিল না তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদে ফেলেন। আর এই বিপদই তার উন্নতির কারণ হয়ে যায়।"

ইমাম বায়হাকী (রহ.) উক্ত হাদীসখানা শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করে বলেন- আমি কোন এক বিজ্ঞ সাহিত্যিকের কাছে 'হারানো গাধা'র ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এর দ্বারা জংগলী গাধা উদ্দেশ্য। ইবনে আসীর উল্লেখ করেন যে, মাহমাদ আসকারী তার কথা আমি দাল্লাকে সাল্লা (ছোয়াদ দিয়া) পড়লাম, অথচ তা ভুল। জংগলী গাধা অত্যন্ত শক্তিশালী ও তার শরীর সুঠাম হওয়ার কারণে তাকে সাল ও সালসালও বলা হয়ে থাকে।

জংগলী গাধার শরঈ বিধান

বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সর্বসম্মত মতে জংগলী গাধার গোশত খাওয়া জায়িয। বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ان النبى ﷺ قال انا لم نرده عليك الا اننا حرم

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমরা ইহরামের কারণে এটাকে (বন্য গাধাকে) ছেড়ে দিয়েছি। যদি ইহরাম অবস্থায় না হতেন তাহলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ব্যবহার করতেন।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, গৃহপালিত গাধা যদি লোকালয় ছেড়ে জংগলে চলে যা, তাহলে তা খাওয়া হারাম। অনুরূপ বন্য প্রাণী যদি লোকালয়ে চলে আসে এবং স্থায়ীভাবে থেকে যায়, তাহলে তা খাওয়া হারাম নয়। এ কথায় সারসংক্ষেপ হল বন্য হওয়া এবং বন্য না হওয়া।

মুতরারাফ থেকে এ কথা বর্ণিত যে,

انه قال اذا انس واعتلف صار كالاهلى

'যদি এটা মানুষের পোষ না মানে এবং পোষা প্রাণীর ঘাস পানি সে ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে এার বিধান পোষা প্রাণীর মতই হবে। কিন্তু সকল আলেম মুতাররাফের এ কথা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। গাধা এবং বন্য গাধার মিলনে জন্মগ্রহণকারী বাচ্চা হারাম। কেননা, বাচ্চা খাওয়ার ব্যাপারে তার পিতামাতার মধ্য থেকে উভয়টিরই অনুগামী হয়। তাই আমরা পিতামাতার মধ্য থেকে একটিকে মেনে নিয়ে গোশত খেতে পারি না। তাহলে বাচ্চা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে পিতামাতার মধ্য থেকে মন্দটির অনুগামী হবে। যদি সে কোন পাত্রে মুখ দেয় তাহলে সেই পাত্রটি ধৌত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিংস্র প্রাণীর বিধানের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন কুকুর ও ভেড়ার মিলনে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে।

এ বিধান বিবাহের ব্যাপারেও। কোন মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং তার পিতা আসমানী দ্বীনে বিশ্বাসী অথবা ইহার বিপরীত অবস্থায় হয়, তাহলে সে মেয়ের সাথে বিবাহ জায়িয হবে না। তবে এ নিয়মটি 'জিয্য়া' (অর্থ মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত কর ও ট্যাক্স)-এর বিধান ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার উপরও জিয্য়া ধরা হবে, যে সন্তানের জন্ম কিতাবী পুরুষ ও কাফের মহিলার সঙ্গমে জন্ম হয়েছে। এ বিধানটি রক্তপণের বিধানের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। যে সন্তান এ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে তার বিধান লাগানো হবে যার উপর রক্তপণ বেশি পাওয়া যাবে।

বিশুদ্ধ অভিমত এটাই। যদিও কেউ বাচ্চাকে সম্পৃক্ত করেছে যার উপর রক্তপণ কম আসে। আবার কেউ বলেন প্রত্যেক অবস্থায় পিতার অনুগামী হবে। এ ধরনের সকল অভিমত ইমাম রাফেয়ী বর্ণনা করেছেন এবং হজ্জের মাসয়ালায় সে বাচ্চাকে পিতামাতার মধ্য থেকে তার অনুগত হয়েছে যার উপর শরীয়াতের আহকাম শক্তি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে।

যদি এমন বাচ্চাকে মেরে ফেলা হয়, যে বাচ্চা হরিণ এবং বকরীর মিলনে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাহলে তার উপর ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু জবেহ-এর বিধানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত করা হয়েছে। সুতরাং পোষা এবং অপোষা প্রাণীর যৌন মিলনে যদি বাচ্চার জন্ম হয়, তাহলে এর জন্য শরঈ জবাই আবশ্যক বলে ধার্য করা হয় নি। আর যদি এমন অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে যে, মহিষ এবং গাভীর মিলনে হয়েছে এরপর এ ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করা হয়েছে এবং ধর্মীয় মাসয়ালায় বাচ্চাকে পিতা মাতার মধ্য থেকে তার অনুগামী করা হয়েছে যা ধর্মীয় ব্যাপারে উত্তম ছিল। যেমন গর্ভ স্থায়ী হওয়ার সময় পিতা মাতার কোন একজন মুসলমান ছিল। যদিও জন্মের সময় সে কাফির হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা গর্ভকালীন সময়ের অবস্থা ধরে পিতামাতার অনুগামী করে সন্তানকে মুসলমানই বলব। যদি পিতা সন্তানের বালিগ হওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল করে নেয় তবেও সন্তানকে মুসলমান বলা হবে। কিন্তু গোলামী ও আযাদীর ব্যাপারে সন্তান মায়ের অনুগামী যতক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ের পেটে আছে। আর বংশের ধারার সকল অবস্থায় সন্তান পিতারই অনুগামী মনে করা হবে। কেননা, বংশের মধ্যে পিতা ও দাতার সম্পর্ক থাকে; মামা বাড়ির নয়। নয় অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের। এ সমস্ত বিধান থেকে শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুমারী কন্যাগণ বহির্ভূত। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুমারী কন্যাগণকে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিকেই সম্পর্ক করে ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার দাদার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় না। মূলত বিধানটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। অবৈধ সন্তানের বংশ কারও দ্বারা প্রমাণিত হবে না। যদি কোন পিতা তার সন্তানকে অস্বীকার করে যে, এটা আমার নয়। যদিও তার আকার আকৃতি অবৈধ সন্তানের মতই হয়। তবুও ফকীহগণ তার উপর অবৈধ সন্তানের হুকুম জারি করেন না।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরববাসী বলে থাকে– اكفر من حمار অমুক ব্যক্তি গাধার চেয়েও বেশি কাফির নাফরমান। আরবগণ এ উদাহরণটি এমন সময় দিয়ে থাকেন, যখন কাউকে অধিক কুফুরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকেন। প্রকৃত বিষয় হল আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক লোক ছিল যাকে হিমার ইবনে মুয়াই বলা হত। অথবা হিমার ইবনে মালেক ইবনে নাসর আযদী। সে ছিল মুসলমান। তার মালিকানায় একটি উপত্যকা ছিল। এ উপত্যাকার দৈর্ঘ্য ছিল একদিনের রাস্তার সমপরিমাণ এবং প্রস্থ ছিল চার ফরসাখ। এ উপত্যাকাটি সমগ্র আরবের মধ্যে সকল উপত্যকার চেয়ে বেশি সবুজ ও শ্যামল ছিল এবং এতে সব ধরনের ফলের বৃক্ষ ছিল।

একদিন তার ছেলেরা শিকারের জন্য সে উপত্যকায় গেলে তাদের উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হল। এতে সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। এতে সে কমবখত কাফির হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, যে আমার ছেলেদের সাথে এ ধরনের আচরণ করেছে আমি তার ইবাদত করব না। (নাউযুবিল্লাহ্) এরপর লোকটি তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কুফরীর দিকে আহ্বান করতে থাকে। যে তার আহবানে সাড়া দিল না তাকেই হত্যা করে ফেলল। এ পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংসসহ তার উপত্যকাকে বিরাণ ভূমিতে পরিণত করলেন। তখন থেকেই এ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যায়।

তাই আরবের কোন এক কবি বলেন–

الم تر ان حارثة بن بدى يصلى وهو اكفر من حمار

তুমি কি দেখ নি যে, হারিস ইবনে বদর নামায পড়ত অথচ সে হিমার নামক লোক থেকেও অধিক কাফের।

চিকিৎসায় বন্য গাধার উপকারিতা

ইবনে ওয়াহশিয়া ও ইবনে সুয়াইদী লিখেছেন যে, বন্য গাধার চোখের প্রতি তাকাইলে চোখ ভাল থাকে এবং চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এর পিত্ত দ্বারা সুরমা বানিয়ে চোখে ব্যবহার করলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধিসহ চোখে কম দেখা দূর হয়ে যায়। এর গোশত যাবতীয় ব্যথা-বেদনার জন্য বিশেষ উপকারী। পায়ের আঙ্গুলের ব্যথা বেদনার জন্যও গাধার গোশত বেশ উপকারী। শ্বেত রোগী এর চর্বি মালিশ করলে এ রোগ ভাল হয়ে যায়। টাক রোগে এর পিত্ত মালিশ করলে বেশ উপকার হয়। এর মজ্জা শরীরের সাদা দাগে মালিশ করলে সাদা দাগ আর থাকবে না।

স্বপ্নে বন্য গাধা দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে জংগলী গাধা দেখলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবহ। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে জংগলী গাধার পিঠে আরোহণ করে পড়ে গিয়েছে, তাহলে পাপের দণ্ড অর্থাৎ অপরাধের জরিমানা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে বন্য গাধার কিছু গোশত পেয়েছে অথবা বন্য গাধার মালিক হয়ে গিয়েছে। তাহলে তার ধন সম্পদ ও ইজ্জত বাড়বে। কেউ স্বপ্নে জংগলী গাধার দুধ পান করতে দেখলে দ্বীনের প্রজ্ঞা লাভ হবে। স্বপ্নে জংগলী গাধা বিদ্রোহ করে ভেগে গেলে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বপ্নে জংগলী গাধার সাথে সম্পর্ক হতে দেখলে তার প্রকৃত কল্যাণ হবে।

২২৪. حمار قبان (হিমারু কুববান)
একটি ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তু

ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন : কুববান قبان শব্দটি فعلان এর ওজনে قب يقب থেকে নির্গত। শব্দটি মারিফা ও নাকারাহ উভয় অবস্থায় গাইরে মুনসারিফ--- । জাওহারী বলেন, 'হিমারু কুব্বান' একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। قبان (কুববান) فعلان এর ওজনে قب থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা আরবগণ শব্দটি মুনসারিফ পড়ে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে তারা এটাকে গাইরে মুনসারিফ পড়ে থাকেন। তারা বলেন– رائيت قطيعا من حمر قبان আমি হিমারে কুববানের একটি দল দেখেছি। কবিও এটাকে গাইরে মুনসারিফ পড়েছেন।

يا عجبا لقد رائيت عجبا حمار قبان يسوق ارنبا

আমি একটি অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি যে, একটি হেমারে কুববান খরগোশকে তাড়া করছিল।

خاطبها يمتعها ان تذهبا فقالت ارقني فقال مرحبا

সে খোরগোশকে বলল, তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাবে না। এতে খরগোশ বলল, তাহলে তুমি আমাকে তোমার সাথে সওয়ার করে নাও। এতে ছোট্ট প্রাণীটি বলল ঠিক আছে তাই হবে।

ইবনে মালেক ও অন্যান্য সরফগণ বলেন, প্রত্যেক ইসমের শেষে আলিফের পরে নুন এবং আলিফ এবং 'ফা' কলেমার মাঝখানে কোন তাশদীদ বিশিষ্ট অক্ষর থাকলে এতে নুনে আসলী হওয়া বা অতিরিক্ত হওয়া উভয়টিই বৈধ। উদাহরণস্বরূপ حسان, دكان, تبان এবং ربان উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং বলা হয়ে থাকে যদি حسان কে حسن থেকে নির্গত মেনে নেয়া হয় তাহলে এ অবস্থায় একটি 'সীন' অতিরিক্ত হবে। আর যদি এটাকে حسن থেকে নির্গত মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নুন আলিফসহ অতিরিক্ত হবে। এর ওজন প্রাথমিক অবস্থায় فعال এবং দ্বিতীয় অবস্থায় فعلان হবে। আর প্রথমাবস্থায় মুনসারিফ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আলিফ ও নুন উভয়টি অতিরিক্ত হওয়ার কারণে 'গাইরে মুনসারিফ' হবে।

এমনিভাবে যদি تبان কে تب থেকে নির্গত মেনে নেয়া হয় তাহলে তাতে আলিফ ও নুন অতিরিক্ত হবে। এবং এটাকে মুনসারিফ পড়তে হবে। যদি এটাকে تبن থেকে নির্গত ধরে নেয়া হয় তাহলে 'নুন' হবে আসলী আর যখন

আপনি এই কায়দা (নিয়ম) বুঝতে পারেন তবে قبان-ও قب থেকে নির্গত হতে পারে। قب-এর অর্থ পাতলা পেট বিশিষ্ট এবং اقب অর্থও পাতলা পেট বিশিষ্ট। জাওহারী এই বক্তব্য মেনে নিয়েছে। বলা হয়ে থাকে الخيل القب পাতলা পেট বিশিষ্ট ঘোড়া। জাহিয মহিলাদের প্রশংসায় এ কবিতা বলেছেন এবং তাকে قب-এর অর্থই গ্রহণ করেছেন।

يمشين مشى قطا البطائح تاودا قب البطون رواجح الاكفال

"সে (মহিলা) এমন ঢং-এ চলে যেমন পাতলা পেট বিশিষ্ট ঘোড়া তার পাছা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে।"

সুতরাং সম্ভাবনা যে, 'হিমারু কুব্বান'-এর হালকা পেট এটা قب থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা প্রাণীটি দিনারের মত একটি গোলগাল এবং এর পেট হালকা পাতলা হয়ে থাকে। এটা নরম মাটিতে জন্ম লাভ করে। এর পিঠ হয় হালকা উঁচু। এর কোমরও হালকা পাতলা হয়।

এ প্রাণীটি যখন হাঁটে তখন এর পায়ের নলা ও মাথা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। তবে এটাকে উপুড় করে ফেললে এর কপালের সম্মুখে একটি গোলাকার বাউণ্ডারী থাকে। এটা গোবর পোকার চাইতেও কম কালো এবং ছোট হয়ে থাকে। এর ছয়টি পা আছে। এরা নরম তুলতুলে মাটিতে থাকতে ভালবাসে। অধিকন্তু কুববান কাবানা ইয়াকুবিনু থেকে নির্গত হতে পারে। ইহার অর্থ 'দ্রুত চলা'।

মুফরাদাত গ্রন্থকার বলেন, এটা সেই জানোয়ার যাকে হুদাইয়া বলা হয়। এ জন্তুর অনেকগুলো পা থাকে। যদি সেটাকে স্পর্শ করা হয় তবে কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। হিমারু কুব্বান-এর এক প্রকার এমনও রয়েছে যে, তার হালকা পাতলা পেট হয় এবং তা কুন্ডলী পাকায় না। আর মানুষ এটাকে আবু শাহীমাও বলে। এ প্রাণীও নরম মাটি পছন্দ করে।

কেউ কেউ বলেন, এটা কোন আলাদা প্রাণী নয় বরং ছোট হিমারু কুব্বান। ইয়ামানবাসীগণ 'হিমারু কুব্বান' সে প্রাণীকেই বলে যা টিড্ডির চেয়ে বড়। অবশ্য শব্দগত উৎপত্তিতে এরূপ সম্ভাবনা ও সুযোগ নেই। অধিকন্তু এটাও সম্ভব যে, এর শব্দগত উৎপত্তি 'কুব্বানুল মাতা' হতে পারে। এমতাবস্থায় এটি মুনসারিফ হবে। কেননা সে অবস্থায় তার 'নুনে হতে আসলী' হবে। কুব্বান সেই বস্তুকে বলা হয় যদ্বারা ওযন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'কুব্বান' 'কুব্বা' থেকে নিষ্পন্ন। এ কারণে আরববাসীগণ এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকে।

হিমারু কুব্বান-এর শরঈ বিধান

এ প্রাণীটি তার মাঝে প্রাপ্ত নোংরামীর কারণে হারাম।

চিকিৎসায় হিমারু কুব্বান-এর উপকারিতা

হিমারু কুব্বান-এর উচ্ছিষ্ট পানি জন্ডিস রোগে বেশ উপকার হয়। কেউ কেউ বলেন, হিমারু কুববান জ্বরগ্রস্ত রোগীর কাপড়ে বেঁধে দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়।

হিমারু কুববান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে হিমারু কুববান দেখা সংকীর্ণ ইচ্ছাশক্তি, ছোট মনমানসিকতা সম্পন্ন লোকদের থেকে সতর্কতা ও তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার লক্ষণ।

২২৫. الحمام (আল হামাম) কবুতর

জাওহারীর মতে যেসকল পাখির গলায় প্রাকৃতিভাবেই কণ্ঠহার থাকে, আরবগণ সেসমস্ত পাখিকে কবুতর বলে। যেমন- কপোত, ঘুঘু, পুরুষ ঘুঘু, টিড্ডি ইত্যাদি।

الحمام শব্দটি নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শব্দটিতে ة প্রবেশ করিয়ে حمامة ব্যবহার করা হয় তা জাতি বুঝানোর জন্য, স্ত্রীলিঙ্গের জন্য নয়। কিন্তু ইমাম জাওহারী ব্যতীত অন্যান্য আলেমগণের অভিমত হল حمام শব্দটি শুধুমাত্র পুরুষের জন্য এবং একবচনেরর জন্য হামামাহ حمامة আসে। হুমাইদ ইবনে সাওর হিলালী এ কবিতার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন ।

وما حاج هذا الشوق الا حمامة دعت ساق حر برهة فترنما

আমার ঐ ইচ্ছাকে জাগ্রত করে নি বরং ঘুঘু পাখি একে মুক্ত করে দিয়েছে ডালকে হেলিয়ে। তারপর উভয়েই গানে বিভোর হয়ে গেল।

উল্লেখিত কবিতায় হামামাহ দ্বারা মর্ম হল ঘুঘু পাখি।

কবি আসমাঈ আরও উচ্চাঙ্গের কবিতায় বলেছেন–

واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد الثمد

আর নির্দেশ দেয় যেমন গোত্রের যুবতী মেয়ে নির্দেশ দেয়। যখন সে দেখল কবুতর পানি পান করার জন্য ঘাটে অবতরণ করছে।

قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقد

তখন সে বলল, লক্ষ্য কর এটা সত্যিকার কবুতর যে আমাদের কবুতরের সাথে মিলিত হয়েছে।

فحسبوه فالفوه كما زعمت تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزد

তারা সবগুলো কবুতরই গণনা করেছে, গণনায় ৯৯টি হয়েছে। এতে কমও হয় নি বেশিও হয় নি।

ইয়ামামা শহরে যারকা নাম্নী এক বালিকা ছিল। সে সংকীর্ণ পাহাড়ের চূড়ায় মনোমুগ্ধকর প্রাণী দেখে বলল, হায়! এই প্রাণীগুলো যদি আমার আয়ত্তে আসত। এবং একে ধরতে পারলে আমার প্রাণীগুলো ১০০-তে পূর্ণ হত। বালিকার বলার প্রেক্ষিতে প্রাণীটির পিছন ধরল। যখন সে এগিয়ে গেল গণনা করতে তখন সে ৬৬টি পাখি পেল।

আবু উবায়দাহ বলেন, বালিকাটি প্রাণীটিকে তিন দিনের দূরত্বে দেখেছিল। সেটাকে দেখে সে আকর্ষণীয় নাম দিয়েছিল অথচ তা ছিল একটি কবুতর।

উমুয়ী বলেন যে সমস্ত গৃহপালিত কবুতর ঘরে থাকে এদেরকেই কেবল হামাম বলে। তিনি তার অভিমতের পক্ষে কবি উজাজের কবিতা পেশ করেন।

انى ورب البلد المحرم والقاطنات البيت عند زمزم

কা'বা ঘরের প্রভুর কসম! এবং সে সমস্ত কবুতরের কসম, যারা জমজম কুপের আশেপাশে থাকে আর যাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে।

উপরোক্ত কবিতায় কবি হামামই উদ্দেশ্য করেছেন। حمامة-এর বহুবচন حمائم এবং حمامات হয়। আবার কোন কোন সময় একক শব্দের প্রতিও حمام-এর সম্পর্ক করা হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেন–

وذكرنى الصبا بعد التنائى حمامة ايكة تدعو حماما

শিশুকাল আমাকে স্বরণ করিয়ে দেয়। অথচ আমি শিশুকাল থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। উপত্যাকায় একটি কবুতর যখন অপর একটি কবুতরকে আহ্বান করছিল।

আবু হাতিম কিতাবুত তাইরুল কাবীর-এ আসমাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ামাম দ্বারা উদ্দেশ্য ডাঙ্গার কপোত। এর বহুবচন يمامة। এটা আবার কয়েক প্রকার। আমাদের নিকট ইয়ামাম এবং হামাম-এর মধ্যে পার্থক্য হল হামামের লেজের নিচের পালক সাদা হয় আর ইয়ামাম-এর লেজের নিচে সাদা হয়।

ইমাম নববী (রহ.) তাহরীর নামক গ্রন্থে আসমাঈ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে পাখির হালকা বৃত্তে কণ্ঠাবরণ থাকে এগুলো হল 'হামাম'। আর বৃত্ত দ্বারা

উদ্দেশ্য সে লাল অথবা কালো রেখা যে রেখাটি তাদের গর্দান ঘিরে রয়েছে। ইমাম কুসাই বলেন, 'হামাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল ডাঙ্গার কপোত। আর 'ইয়ামাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে সকল কবুতর যা গৃহে থাকে। অর্থাৎ পোষ্য কপোত। তবে প্রকৃত অর্থ তাই যা ইমাম আসমাঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত।

আযহারী ইমাম শাফিয়ী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, 'হামাম' হল সে যে শ্বাস টানা ব্যতীত পানি পান করে এবং একটানা আওয়াজ দেয় অর্থাৎ বিরতি না দিয়ে বাকবাকুম ডাক দেয়। ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, এটা শুধু কবুতরের বৈশিষ্ট নয় বরং সব পাখিই শ্বাস টানা ব্যতীত পানি পান করে। রাফেয়ী এবং আশবাহ বলেন, কোন বিরতি ব্যতীত আওয়াজ বড় করা শুধু কবুতরের বেলায়ই প্রযোজ্য। তার প্রমাণ হল ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উয়ুনুল মাসাইল গ্রন্থে বলেছেন : পানি পান করতে যে পাখি শ্বাসগ্রহণ করে না বরং ধারাবাহিকভাবে পানি পান করতে থাকে তাই হামাম (কবুতর) আর যেসব পাখি ফোঁটা ফোঁটা পানি পান করে যেমন মুরগী এগুলোর বেলায় হামাম—কবুতর প্রয়োগ হয় না।

ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, এত দীর্ঘ আলোচনার পর এখন আমি সম্মানিত পাঠক মহলে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অভিধানবিদগণের অভিমত উপস্থাপন করব। যেই সমস্ত পাখি ঘরে থাকে এগুলোর প্রতিও হামাম প্রয়োগ করা যায়। এ সমস্ত প্রাণীদের আলোচনা যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। তখন আলোচনা হবে গৃহপালিত কবুতরের ব্যাপারে। এগুলো দু প্রকার : (১) স্থল (২) গৃহ পালিত পাখি। স্থলে বসবাসকারী হল যারা মিনার, শিখর, চূড়া ইত্যাদিতে বসবাস করে। এদের মধ্যে খুব ক্ষিপ্রতা থাকে। এ কারণেই এগুলোকে বাররী- স্থল বলে। গৃহপালিতগুলো আবার কয়েক প্রকার এবং বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন- রাদাইব আশরাইশ, আদাদ সুরাদ, মুদরাব, কুলার, ইত্যাদি। যেমন ঘোড়া বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- ইতাক, বারযুন ইত্যাদি। জাহিয বলেন, কুকাই কবুতর সাকলাব সাদৃশ্য হয়ে থাকে। তার রং একেবারেই সাদা।

হাদীস শরীফে হামাম—কবুতর এর উল্লেখ

ইমাম আবু দাউদ, তিবরানী, ইবনে মাজা, ইবনে হিববান হযরত আবু হুবাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কবুতরের পেছনে ঘুরতে দেখে বললেন শয়তান শয়তানীর পিছনে ঘোরে। অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ রয়েছে যে শয়তান শয়তানের পিছনে যাচ্ছে।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, কতিপয় জ্ঞানীজন বলেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল কবুতর শিকারী। কেননা অধিকাংশ সময় এসব কবুতর শিকারী

কবুতর উড়াতে, ধরতে বিভিন্ন ঘরের ছাদে ছড়িয়ে থাকে। এতে প্রতিবেশির ঘরের পর্দা ও শালীনতা ক্ষুন্ন হয়। এ কারণে তা হারাম করা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) উসামা ইবনে যায়িদ (রাঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, "আমি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি উড়ার কবুতরকে জবাই করতে এবং ঘরে খাচায় বন্দি কবুতরকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।"

ইবনে কানি' ও তাবারানী (রহ.) হাবীব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাবসা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় জাতের লেবু ও লাল রঙের কবুতর দেখতে ভালবাসতেন।

হাকেম (রহ.) স্বীয় 'তারীখে নীশাপুরে' হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সব্জী, বড় জাতের লেবু, লাল কবুতর দেখতে ভাল লাগত।

ইবনে কানি' ও হাফেয আবু মূসা (রহ.) বলেন, হিলাল ইবনুল আলা ও অন্যান্য কতিপয় আলেম হাদীসে বর্ণিত লাল কবুতর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সিব ফল—আপেল জাতীয় ফল। যদি একথা সত্যিই হয় তবে লাল কবুতর পছন্দ হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে না। কিন্তু হাফেয আবু মূসা বলেন হামামে আহমার—লাল কবুতর দ্বারা মর্ম হল সিব ফল। হেলাল ব্যতীত আর কারও থেকে এ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এটাও লিখেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীনা মুবারকে লাল কবুতর ছিল যাকে 'ওয়ারদান' বলা হয়। ইবনে সানজার-এর গ্রন্থ 'আমালুল ইওয়াম ওয়াল লাইল'-তে হযরত মুরযি ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘরে ভয়ভীতি অনুভুত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি এক জোড়া কপোত পোষ। যখন এগুলো বাকবাকুম বলবে তখন ঠিক সেই সময় আল্লাহর যিকির করবে।

উক্ত হাদীসটি হাকিম ইবনে আসাকির (রহ.)-ও বর্ণনা করে বলেছেন যে, হাদীসটি গরিব- অপরিচিত এবং সনদ দুর্বল।

ইবনে আদ্দী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'কামিল' এ মায়মুন ইবনে মূসার জীবনীতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট স্বীয় অন্তরের ভয়ভীতির অভিযোগ করলে, তিনি তাঁকে বললেন, কবুতর পোষ, এতে ভালবাসাও সৃষ্টি হবে। এদের বাচ্চাও হবে, আবার এরা বাকবাকুম করে ডেকে তোমাকে নামাযের জন্য জাগাবে। অথবা একটি মোরগ পোষ, এতেও তোমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং সে ডাক দিয়ে তোমাকে নামাযের জন্য জাগাবে।

মুহাম্মাদ ইবনে তাহহান ইবনে মায়মুন ইবনে মিহরান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা ফুরকীগঞ্জ (বিশেষ প্রজাতির কবুতর) ঘরে রাখ। এরা তোমাদের সন্তানদেরকে জিনদের প্রভাব থেকে রক্ষা করবে।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্তর অস্থির থাকার অভিযোগ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : কবুতর পোষ।

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তাবারানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন সালাত ইবনুল জাররাহ। যিনি অপ্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য রাবীগণ বুখারী ও মুসলিমের।

ইবনে আদ্দির 'কামিল' গ্রন্থে সাহল ইবনে ফারীর জীবনীতে মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে হযরত জাবের (রাঃ) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত– কা'বা ঘর আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযোগ করল যে, আমার জিয়ারতে আগমন ও প্রস্থানকারী লোক খুব কম। তখন আল্লাহ তাআলা কা'বাকে জানালেন এখন আমি তোমার কাছে এমন একটি দল প্রেরণ করে রাখব যারা তোমাকে এমনিভাবে প্রেমডোরে আবদ্ধ করে রাখবে যেমন কবুতর তার বাচ্চাদের সাথে লেগে থাকে।

সুনামে আবু দাউদ ও নাসাঈতে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস সনদসহ বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে যারা মাথায় ও দাড়িতে এমন খেযাব ব্যবহার করবে যেমন কবুতরের পাকস্থলি কালো রং হয়। এ সকল লোক জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (কেননা তারা আকৃতি পরিবর্তন করেছে এবং সাদা চুলের মর্যাদাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন।)

কবুতরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যদি কবুতরকে এক হাজার মাইল দূরত্ব থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তবুও সে তার ঘরে পৌঁছে যাবে। আবার দূর দূরান্তের খবর আদান-প্রদান করতে পারে। কবুতরের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ধরনের কবুতর আছে যারা একদিনে তিন হাজার ক্রোশ রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। যদি কার পোষা কবুতর কোন কারণে হারিয়ে গিয়ে তিন বছর বা আরও অধিক সময় নিখোঁজ থাকে কিন্তু এত দীর্ঘ সময় নিখোঁজ থাকার পরও তার বাসা সে ভুলে না। তারা বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তি এতই তীক্ষ্ণ যে, সুযোগ পেলেই সে তার বাসায় চলে আসে।

শিকারী পাখি কবুতর শিকারের জন্য ওৎ পেতে থাকে। বাজ পাখিকে তারা যত ভয় করে, তার বেশি ভয় অন্য কোন পাখিকে করে না। তাদের ওড়ার

ক্ষমতা বাজ পাখি থেকে অনেক বেশি। তবুও বাজ পাখির ভয় তাদের অন্তরে এতই প্রবল যে, বাজপাখি দেখামাত্রই কবুতরের ডানা ঢিলা হয়ে যায় এবং এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, যেমন বাঘের সামনে গাধা ও বকরী, বিড়ালের সামনে ইঁদুর অসহায় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

কবুতরের স্বভাবের একটি আশ্চর্য দিক হল যা ইবনে কুতাইবা 'উয়ুনুল আখবার' গ্রন্থে সানা ইবনে যুহুর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নারী পুরুষের মধ্যে এমন অভ্যাস দেখি নাই যা কবুতরের মধ্যে নাই। আমি কবুতরকে দেখেছি যে, সে তার জোড়ার পুরুষ কবুতর ব্যতীত অন্য জোড়ার পুরুষ কবুতরকে তার সঙ্গে সহবাসের সুযোগ দেয় না। আর পুরুষ কবুতর ও অন্য কোন স্ত্রী কবুতরের সাথে সহবাস করে না। তবে যদি জোড়ার কোন একটি মরে যায় কিংবা হারিয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। আমি আরও দেখেছি, যদি পুরুষ কবুতরটি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করে তখন স্ত্রীটি দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তবে কোন কোন সময় এমনও দেখা যায় যে, স্ত্রীটি তার স্বামী কবুতর থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষ কবুতরকে সঙ্গমের সুযোগ দেয়। কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল ঘটনা। যা ধর্তব্য নয়। আবার কোন কোন সময় স্ত্রী কবুতর পুরুষ কবুতরের উপর চড়ে সঙ্গম করে। এ সঙ্গমে ডিম হয় কিন্তু বাচ্চা হয় না।

আবার কোন কোন সময় পুরুষ পুরুষের উপর এবং স্ত্রী স্ত্রীর উপর চড়ে সহবাস করে। আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল যা কবুতর এবং মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হচ্ছে কবুতর সহবাস করার পূর্বে মানুষের মত চুমা খায়। তাছাড়া সহবাস করে তৃপ্তি না হলেও পরস্পর পরস্পরকে চুমা খেতে থাকে। ছয় মাস পর্যন্ত কবুতর সহবাস করে। আর স্ত্রী কবুতর চৌদ্দ দিন গর্ভবর্তী থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিমের মাঝখানে একদিন ও একরাত ব্যবধান থাকে। এক ডিম থেকে পুরুষ আরেক ডিম থেকে স্ত্রী বাচ্চা ফোটে। ডিম পাড়ার সময় এবং ডিম দেয়ার পরও যদি স্ত্রী কবুতরটি তার নিজের খাদ্য সংগ্রহে বের না হয়, তাহলে পুরুষটি খাদ্য এনে স্ত্রীকে খাইয়ে দেয়। পুরুষটি সব সময় স্ত্রীটির পিছনে পিছনে থাকে। আল্লাহ তাআলা কবুতরকে এ অভিজ্ঞতা দান করেছেন যে, যখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে তখন পুরুষটি লবণাক্ত মাটি এনে বাচ্চা দুটিকে খাইয়ে দেয়। এতে বাচ্চার খাদ্যনালি পরিস্কার হয়ে যায়।

فسبحان اللطيف الخبير الذى اتى كل نفس مداها

সে সত্তা পবিত্র যিনি সুক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাবান, আর যিনি প্রতিটি প্রাণীকে তার উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় পথ নিদর্শনা দিয়েছেন।

এরিস্টটলের ধারণা মতে কবুতর আট বছর বাঁচে। পবিত্র কুরআনের আয়াত وربك يخلق ماشاء ويختار (নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং

যাকে চান মনোনীত করেন।) এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম সা'লাবী প্রমুখ ওহাব ইবনে মুন্নাব্বেহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে বকরীকে আর পাখিদের মধ্যে কবুতরকে মনোনীত করেছেন।

মুস্তারশিদ বিল্লাহর ঘটনা

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে : আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ ইবনে মুস্তাজহির বিল্লাহর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেন, তার হাতে গলায় গোল মালা বিশিষ্ট একটি কবুতর। স্বপ্নের মধ্যেই এক ব্যক্তি তাকে বলছে যে, "তোমার মুক্তি এতেই নিহিত রয়েছে।" প্রভাতে খলীফা রাতে দেখা তার স্বপ্নটি ইমাম ইবনে সাকীনার নিকট বর্ণনা করলেন। ইমাম ইবনে সাকীনা খলীফাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি নিজে এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? খলীফা বললেন, আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আবু তামামের এ কবিতার মাধ্যমে করেছি–

هن الحمام فان كسرت عيافة من هائهن فانهن حمام

এগুলো কবুতর। যদি তুমি ভাগ্য গণনার উদ্দেশ্যে এর 'হা' কে যের দিয়ে দাও তাহলে হিমাম অর্থাৎ মৃত্যু হয়ে যাবে।

খলীফা এ কবিতা আবৃত্তি করে বললেন, আমার মুক্তি আমার মৃত্যুতেই লুকায়িত রয়েছে। সুতরাং তাই হল। কিছুদিন পরই ৫২৯ হিজরী খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহকে হত্যা করা হয়। তিনি ১৩ বছর ৮ মাস খিলাফত পরিচালনা করেন।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'শোয়াবুল ইমাম'-এ উল্লেখ করেছেন : ইবনে সিরীনের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখি একটি কবুতর একটি মূর্তি গিলে ফেলছে। এরপর তার পেট থেকে মূর্তিটি (পূর্বের চেয়ে) বড় হয়ে বের হল। এরপর অন্য একটি কবুতর এসে আরেকটি মূর্তি গিলে ফেলল। কিন্তু মূর্তিটি যেরূপ গিলেছিল সেরূপই পেট থেকে বের হল। অর্থাৎ মূর্তিটির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটল না। আবার তৃতীয় আরেকটি কবুতর এসে আরও একটি মূর্তি গিলে ফেলল। কিন্তু এই মূর্তিটি কবুতরের পেট থেকে ছোট হয়ে বের হল। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.) স্বপ্ন শুনে এর ব্যাখ্যা করলেন যে, যেই মূর্তিটি বড় হয়ে পেট থেকে বের হল এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইমাম হাসান বাসরী (রহ.)। হাসান বাসরী (রহ.) হাদীস শুনবেন এবং স্বীয় যবানে তাতে নতুনত্বের সৃষ্টি করবেন। আর স্বীয় ওয়াজ নসীহত বক্তব্য ও উপদেশ দ্বারা তাতে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করবেন অর্থাৎ কোন কথা শ্রবণ করে নিজস্ব বক্তব্যের মাধ্যমে তাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিবেন। এরপর তাতে স্বীয় উপদেশাবলী শামিল করবেন। আর দ্বিতীয় মূর্তিটি যা দেখেছ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাতাদাহ (রহ.) যিনি হাদীসের একজন শ্রেষ্ঠ হাফেয এবং শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিশক্তির অধিকারী। আর তৃতীয় মূর্তি যা ছোট হয়ে বের হতে দেখেছ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বয়ং ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.)।

কেননা, তিনি হাদীস শোনেন, কিন্তু হাদীসকে তিনি সংক্ষিপ্ত করেন অর্থাৎ যা শুনেন তা সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেন।

ইবনে খাল্লিকান (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন : এক ব্যক্তি তার নিকট স্বপ্নের ব্যাখা জিজ্ঞাসার জন্য আসল। লোকটি বলল, আমি স্বপ্নে দেখি আমি আমার প্রতিবেশির কবুতরী ধরে তার ডানা ভেঙ্গে ফেলছি। এ কথা শুনে ইবনে সিরীন (রহ.)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, তারপর কী দেখলে? লোকটি বলল, এরপর একটি কালো কাক এলে আমার গৃহের কোণে বসল এবং কাকটি গৃহ ভেদ করে তাতে ঢুকে গেল। আল্লামা ইবনে সিরীন (রহ.) সম্পূর্ণ স্বপ্ন শুনে বললেন, তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ) তোমাকে অতি দ্রুতই সাবধান করেছেন। এর ব্যাখ্যা হল তুমি তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর নিকট অবৈধ পন্থায় যাতায়াত কর, আর সে কালো কাক হল তোমার হাবসী গোলাম যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

ইবনে খাল্লিকান বলেন : ইবনে সিরীন (রহ.) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁর কোন ঋণের কারণে তাকে বন্ধি করে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি জানি যে, কী কারণে আমি জেল খেটেছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল কী কারণে? তিনি বললেন, আমি একজন সর্বহারা গরিব লোককে চল্লিশ বছর পর্যন্ত 'ওহে গরিব লোক' বলে ডাকতাম।

হযরত আনাস (রাঃ) অসীয়াত করেছিলেন যে, আমার ইন্তেকাল হলে ইবনে সিরীন এসে আমাকে গোসল দিবে এবং সেই আমাকে কাফন পড়াবে এবং সেই আমার জানাযা নামায পড়াবে। হযরত আনাস (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন। সে সময় ইবনে সিরীন (রহ.) জেলখানায় বন্দি। লোকেরা আবেদন করে প্রশাসকের অনুমতিতে তাকে জেলখানা থেকে বের করে আনেন। সুতরাং তিনি অসীয়াত মোতাবেক তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে স্বীয় গৃহে না গিয়ে জেলখানায় চলে যান।

ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বর্ণিত আছে : এক মহিলা তার নিকট আসলেন, তিনি তখন নাস্তা করছিলেন। মহিলা তার স্বপ্নের বর্ণনা দিয়া বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, চাঁদ সুরাইয়া তারকার ভিতর ঢুকে পড়েছে। এবং এজজন আহ্বানকারী আমার পিছন দিক থেকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি ইবনে সীরীনের নিকট গিয়ে এ স্বপ্ন বর্ণনা কর। মহিলার কথা শুনতেই তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি স্বীয় পেটে ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বোন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে এ মহিলার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, আমি সাত দিনের মধ্যেই মারা যাব। সুতরাং তাই হল। সাত দিন

পর ১১০ হিজরীতে ইমাম হাসান বসরী (রহ.)-এর মৃত্যুর ১০০ দিন পর ইমাম ইবনে সিরীনও ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহম করুন।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'শোয়াবুল ঈমান' এ হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কওমে লুত কবুতর বাজী ধরত। ইমাম নাখয়ী (রহ.)-এর অভিমত হল কবুতর বাজি অর্থাৎ যে ব্যক্তি শর্তাধীন কবুতর উড়ায় এবং তাতে হারজিতের কিছু বিনিময় থাকে। তার মৃত্যু ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অভাব-অনটন ও দারিদ্রতায় কষ্ট ভোগ না করবে। এ কথার মর্ম হল কবুতরবাজ দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হবে।

বাযযার তাঁর মসনদে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনল এবং জংগলী কবুতরের একটি জোড়া এসে গুহার মুখে বসে গেল। ঘটনাটি হল হিজরতের সময়। আল্লাহ তাআলা সাওর গুহায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কাফেরদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং তাই হল, মক্কার কাফিররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালাশে সাওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু মাকড়সার জাল ও কবুতর দেখে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। বায়তুল্লাহ শরীফের সকল কবুতরের জোড়া সে সাওর গুহার কবুতরের বংশধর। ইবনে ওহাব বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ শরীফের সমস্ত কবুতর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ছায়া বিস্তার করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য বরকতের দুআ করেছিলেন।

ইমাম তিবরানী (রহ.) হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত বেশি বেশি তেলাওয়াত করতেন, যার অর্থ এই–

যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পেরেশানীর মধ্যেও মুক্তির পথ সৃষ্টি করবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক : ২-৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলো বার বার তেলাওয়াত করছিলেন, এমনকি শুনতে শুনতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবূ যর।। তোমাকে যখন মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে তখন তুমি কী করবে? আমি বললাম, তখন আমি কা'বা ঘরে চলে যাব- ইয়া রাসূলাল্লাহ।। সেখানে গিয়ে এমন নির্জনবাসী হয়ে যাব যেমন সেখানকার কবুতরগুলো নির্জনবাসী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মক্কা থেকেও যদি বের করে দেয়া হয় তখন কী করবে? হযরত আবু যর বললেন, তখন ফিলিস্তিন ও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে চলে যাব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার

বললেন, যদি সেখান থেকেও বের করে দেয়া হয়? হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন, এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে তলোয়ার উঠিয়ে নিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু যর! এর চেয়েও কোন ভাল কথা আমি তোমাকে বলে দেব? তুমি তরবারী উঠাবে না। (বরং) সমকালীন শাসকের আনুগত্য করতে থাকবে। যদিও হাবশী গোলাম তোমার শাসক হোক না কেন।"

বুখারী শরীফে এ হাদীসের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার সামান্য অংশ এসেছে। আর ইবনে সাজাতে এ বর্ণনার প্রথম অংশ এসেছে।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ কবুতর ও কবুতর বাজীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। সুতরাং একবার কোন এক ব্যক্তি তার সামনে উপহার হিসেবে কবুতর পেশ করল। খলীফার সামনে তখন কাযী আবুল বুখতারী বসেছিলেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : হার-জিত বা জয়-পরাজয় শুধু সে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে যেগুলোর গদি, ক্ষুর অথবা বাহু আছে। অর্থাৎ ঘোড়া, উট এবং কবুতর ইত্যাদিতে প্রতিযোগিতা জায়িয। এ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীতে জায়িয নেই।

কাযী আবুল বুখতারী খলীফা হারুনুর রশীদের মনোরঞ্জনের জন্য او جناح (অথবা বাহু) বাক্যটি নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলেছেন। এতে খলীফা আবুল বুখতারীকে যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার প্রদান করেন। আবুল বুখতারী চলে গেলে হারুনুর রশীদ বলেন, আমি পূর্ব থেকেই জানতাম যে, এ জালিমটা কবুতরের আলোচনা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করবে। এরপর তিনি কবুতরগুলো জবাই করতে নির্দেশ দিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল এ কবুতরগুলোর অপরাধ কী যে, তাদের জবাই করা হবে? তখন খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, এগুলোর কারণেই তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

আবুল বুখতারীর এ মিথ্যাচারের পরিণাম এই হল যে, উলামায়ে কেরাম তার বর্ণনাকৃত সকল হাদীস বর্জন করলেন। আবুল বুখতারী ছিলেন মদীনার কাযী। তার স্থলে বাকার ইবনে আব্দুল্লাহ যুবাইরীকে কাযী নিয়োগ দান করা হয়। পরবর্তী ইমাম ইমাম আবু ইউসুফের মৃত্যুর পর তাকে বাগদাদের কাযী নিয়োগ করা হয়। বুখতারী শব্দটি বুখতারুন থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ অহংকার ও গর্ব করা। অনেকেই আবুল বাহতারী 'খা' এর স্থলে হা বলেন, অথচ এমনটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে আবুল বাহতারী নামক একজন কবি ছিলেন। কাযী আবুল বুখতারী খলীফা মামুনুর রশীদের শাসনামলে ২০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আবু খায়সামা ও শাইখ তাকী উদ্দীন কুশাইরী 'ইফতিরাজ' গ্রন্থে লিখেছেন সে কবুতরের হাদীস রচনাকারী আবুল বুখতারী ছিলেন না। বরং সে ছিল গিয়াস উদ্দীন ইবনে ইব্রাহীম। আর সে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন খলীফা মাহদীর জন্য।

ইবন কুতাইবা বলেন, আবুল বুখতারীর প্রকৃত নাম ছিল ওহাব ইবনে ওহাব ইবনে ওহাব । অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্যন্ত একই নাম ছিল। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, নামের এ ধারাবাহিকতা অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন, পারস্যের শাহানশাহের নাম ছিল, বাহরাম ইবনে বাহরাম ইবনে বাহরাম। তাবেঈদের মধ্যে হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান। পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ।

শেখ আবুল হাসান শাযলী (রহ.)-এর স্বপ্ন

শেখ আরিফ বিল্লাহ আবুল হাসান সাযলী (রহ.) বর্ণনা করেন : স্বপ্নে আমার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব হয়, এমন অবস্থায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর ব্যাপারে গর্ব করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন আপনাদের উভয়ের উম্মতের মাঝে কি এ ধরনের আলেম জন্ম গ্রহণ করেছে? তাঁরা উভয়েই না সূচক জবাব দিলেন।

শাইখুল ইমাম আরিফ বিল্লাহ শরীয়াত ও হাকীকতের মূল স্তম্ভের গুরু। আবুল আব্বাস মুরসী (রহ.) ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর বেলায় উচ্চতম মানের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেয়া হয়। শেখ জামালুদ্দীন দাসনুবী (রহ.)-এর ' আল মুহিম্মাত' নামক গ্রন্থে ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর ব্যাপারে উঁচুমানের শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রশংসা করেছেন। শব্দাবলী নিম্নরূপ :

"তিনি বিদ্যমান সকলের জন্য ধ্রুবতারা সম, ঈমানদারদের মধ্যমণি ও চলমান আত্মা, যা তাঁকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাঁর উসিলায় প্রত্যেক সিদ্দীক (সত্যবাদী) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। তাঁর প্রতি সে সকল ব্যক্তিই বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে যারা মুলহিদ ও যিন্দীক-নাস্তিক। তিনি তাঁর যুগের প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনন্য ছিলেন। আর কোন ব্যক্তিই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।"

হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ আল গাযযালী (রহ.) বাগদাদে নিযামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করতেন। কিছুদিন পর তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং রাবিয়াতুল জামিয়ায় (জামে মসজিদ) অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস চলে যান। এরপর মিসর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে

ইসকান্দারিয়ায় বেশ কিছুদিন থাকেন। তারপর তিনি স্বীয় মাতৃভূমি তুস-এ আসেন। তুস থেকে আবার নীশাপুর চলে যান। সেখানে গিয়ে নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। এরপর শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়া পুনরায় তুসে চলে আসেন। সেখানে তিনি সুফীদের জন্য একটি খানকা নির্মাণ করেন। এতে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, যিকির আযকার, সৎ লোকদের সান্নিধ্য লাভ এবং ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করেন। একদিকে তিনি একাকীত্ব জীবন শুরু করেন অপরদিকে জাগতিক যাবতীয় চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ বর্জন করেন।

তিনি দ্বীনি ইলম তথা ধর্মীয় জ্ঞানে গভীরতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী অতি উঁচু ও উন্নতমানের। বিশেষ করে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্বীন' থেকে আখিরাত প্রত্যাশী কোন ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তিনি ৫০৫ হিজরীতে তুস নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন, শরফুদ্দীন ইবনে উনাইন একবার ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর দরসে (পাঠদান চক্র) উপস্থিত ছিলেন। পাঠদান অবস্থায় হঠাৎ একটি কবুতর তাঁর (ইমাম রাযীর) নিকট পড়ে যায়। সম্ভবত কবুতরটিকে কোন হিংস্র পাখি ধাওয়া করেছিল। কবুতরটি যখন পড়ে গেল হিংস্র পাখিটি সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু হিংস্র পাখিটির ভয়ে কবুতরটি উড়তে পারছিল না এবং তার মধ্যে উড়ার শক্তিও ছিল না। ইমাম রাযী (রহ.) পাঠ দান থেকে অবসর নেয়ার পর কবুতরটির পাশে এসে দাঁড়ান এবং তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি কবুতরটি হাতে নিলেন। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কবি ইলিয়াস কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন। তন্মধ্যে ৩টি পংক্তি এই-

من نباء الورقاع ان مجلسكم حرم انك ملجاء للخائف

কবুতরীর ঘটনা, তোমার মজলিসে তার জন্য নিরাপত্তা হয়ে গেল। আর তুমি স্বয়ং ভীত-সন্ত্রস্তদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে।

وقدت عليك وقد ترانى خنفها فحبوتها ببقائها السمتانف

এ কবুতরীটি আপনার নিকট আশ্রয়ের জন্য হাযির হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তার মৃত্যু সন্নিকটে এসে পৌঁছে ছিল। এজন্য আপনার হাতে এসে পড়ায় তার নবজীবন লাভ হল।

ولو انها تحبى ببال لا نثنت من راحتيك بنائل متضاعف

যদি আপনি জীবনের বদলে ধন-সম্পদকে প্রাধান্য দিতেন, তাহলে আপনার উভয় হাতে ধন-সম্পদ দ্বিগুন এসে ভরে যেত।

আশরাফ ইবনে উনাইন ও দামেস্কের গভর্নর ও অধিপতি ঈসা ইবনে মালিক মুয়াযযম আবু বকর ইবনে আইউব-এর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এ দুজনের

মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে উঠল যা দামেস্ক অধিপতির সচ্চরিত্রের প্রমাণ। তন্মধ্যে একটি নমুনা হল, একবার ইবনে উনাইনের প্রচণ্ড জ্বর হল; তখন তিনি দামেস্ক অধিপতিকে লিখে পাঠালেন–

انظر الى بعين مولى لم يزل يولى الندى وتلاف قبل تلافى

انا كالذى احتاج مايحتاجه فاغتمثنائى والثواب الوافى

তুমি আমাকে এমন চোখ দ্বারা দেখ, যেমন মনিব তার গোলামকে দেখে। আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তুমি আমাকে তোমার বদান্যতার বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। দেখ তুমি কিন্তু মুখাপেক্ষী আর আমিও মুখাপেক্ষী। তবে উভয়ের প্রয়োজনের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তুমি প্রশংসার মুখাপেক্ষী আর আমি সে প্রশংসার প্রতিদান দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

এ পয়গাম পৌঁছা মাত্রই মালিক মুয়াযযম ঈসা স্বশরীরে উনাইনের শুশ্রুষার জন্য উপস্থিত হলেন এবং তাকে তিনশত দীনার প্রদান করে এবং বললেন এ তো হল প্রতিদান এবং শুশ্রুষাকারী অর্থাৎ আমি বারবার দানকারী। মালিক মুয়াযযমের বক্তব্য هذه القبلة وانا العائد-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। কেননা ইসমে মাওসূল সিলাহ এবং সর্বনাম চায়। সুতরাং সিলাহ এখানে সে মালামাল যা সে পেয়েছে আর عائد দুটি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। প্রথমটি হল আমি তোমার নিকট প্রতিদান নিয়ে দ্বিতীয়বার আসব, বারবার প্রতিদান নিয়ে আসব, সুতরাং তুমি খুশী হবে। আর দ্বিতীয়টি হল عاد، يعود، عيادة থেকে বহির্গত।

মালিক মুয়াযযম ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও হানাফী মাযহাব অনুসারী। বিশেষত তিনি ছিলেন সাহিত্য প্রেমিক। তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি যামাখশারীর 'মুফাসসাল' গ্রন্থ মুখস্ত করতে পারবে তাকে একশত দিনার পুরস্কার দেয়া হবে। এবং একটি মূল্যবান চুলের গদি উপহার দেয়া হবে। সুতরাং পুরস্কার ও উপহারের লোভে অনেকেই এ গ্রন্থটি পূর্ণ মুখস্ত করে ফেলেন। মালিক মুয়াযযম ৬২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আর ইমাম রাযী (রহ.) ৬০৬ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তেকাল করেন।

নোট- জ্ঞাতব্য বিষয়

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, প্রতিটি মানুষ তার অনুরূপ আকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন আকৃষ্ট হয় তার স্বীয় জাতির প্রতি। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ স্বীয় আকৃতির প্রতি যেমন আকৃষ্ট তেমনি পাখিও। মর্মকথা হল, মানুষের মাঝে যে

আকার-আকৃতির পার্থক্য হয় এর দৃষ্টান্ত হল যেমন কোন পাখির মাঝে শ্রেণীগত পার্থক্য হয়। মালিক ইবনে দীনার (রহ.) বলতেন, দশজন মানুষের মাঝে দুজন এমন হবে যে, যদি একজনের মাঝে কোন গুণ থাকে তবে তা দ্বিতীয়জনের মাঝে থাকবে না। কেননা মানুষের আকৃতির মাঝেই সে ভিন্নতা বিদ্যমান। যা পাখিদের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। যদি পাখিদের দু শ্রেণীর উড়ার মধ্যে ঐক্য থাকে তবুও দুই-এর মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। সুতরাং তিনি একবার একটি কবুতরকে একটি কাকের সাথে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্যবোধ করলেন। কেননা, তাদের আকার-আকৃতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান। কিন্তু যখন সে হাঁটত তখন খোড়িয়ে হাঁটত।

এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, এদের একত্রে থাকার কারণেই এ অবস্থা অর্থাৎ খোড়ামী। প্রতিটি মানুষের রীতি হল সে তার মত আকৃতির সাথে অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলবে। ধরা যাক যদি দুজনের মধ্যে কোনদিক দিয়েই মিল না থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য যদি একত্রে বসে যায়, তাহলে অবশ্যই কিছুক্ষণ পরই তারা আবার পৃথক হয়ে যাবে। যেমন কোন কবি বলেন–

কোন বক্তা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা উভয়ে একে অপর থেকে কীভাবে পৃথক হয়ে গেলে। তখন আমি বললাম, আমি একটি ইনসাফপূর্ণ কথা বলছি।

পৃথকের কারণ হল সে আমার আকৃতির সাদৃশ্য নয়, মানুষ বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে এবং এ সংখ্যা হাজার হাজার।"

ইমাম আহমাদ (রহ.) 'যুহদ' গ্রন্থে ইয়াযীদ মাইসারাহ থেকে বর্ণনা করেন : হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় সাথীদেরকে বলতেন, তোমাদের যদি আল্লাহর প্রেমে কবুতরের মত আত্মহারা হওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তাই কর। বলা হয়ে থাকে, কবুতরের মত অধিক বোকা অথবা পাগলপারা আর কোন প্রাণী নেই। কেননা এরা নিজ চোখে দেখে যে, তার বাচ্চাকে স্বীয় বাসা থেকে ধরে নিয়ে জবাই করা হয়। কিন্তু আবার সেখানেই এরা ডিম দেয় এবং বাচ্চা ফোটায়।

কবুতরের শররী বিধান

সর্বসম্মত মতানুসারে কবুতর হালাল। কেননা কবুতর তাইয়্যেবাত বা পবিত্র বস্তুর মধ্যে শামিল। আর এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে কবুতর হত্যার জন্য বকরী জরিমানা হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব।

অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কবুতর শিকার করলে জরিমানা হিসেবে বকরী আদায় করতে হবে। এর দুটি কারণ– (১) যেহেতু কবুতর ও মানুষ গৃহবন্ধু হয়ে থাকে। আর মানুষ তো বন্ধুপ্রতীমই। (২) (এই কারণটি শক্তিশালী) আমাদের জানা নাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবুতর ও মানুষের মাঝে কোন ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। যেহেতু আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া

হয়েছে কবুতর মারার বিনিময়ে পূর্ণ প্রতিদান দেয়ার জন্য। সুতরাং আমরা এ নির্দেশের উপরই আমল করব। যদি আমরা বলি, যে বিধান কার্য করার নির্দেশ রয়েছে, তাতে কারণ অন্বেষণ করার কী প্রয়োজন? এমতাবস্থায়ও আমাদেরকে বকরীই আদায় করতে হবে, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। যদি জরিমানার ভিত্তি মানুষ ও কবুতরের মধ্যে সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত করা হয়, তবুও মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক।

ইমাম নববী (রহ.) স্বীয় 'রাওয়' গ্রন্থে এ মাসয়ালা বাদ দিয়েছেন। কারণ এ বিষয়ে মতপার্থক্য শাব্দিক। আর এ মতপার্থক্যে কোন সুফল নেই। কবুতর ও অন্যান্য পাখির ডিম শিকার করা মুহরিমের জন্য হারাম। সুতরাং মুহরিম ব্যক্তি যদি এ ধরনের পাখির ডিম নষ্ট করে দেয় তবুও তার জরিমানা আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর এ অভিমত। অবশ্য ইমাম মাযেয়ী ও দাউদ (রহ.) এবং অন্যান্য সাথীবর্গের মতামত হল ডিম নষ্ট করলে কোন জরিমানা হবে না। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, ডিমের জরিমানা প্রাণীর মূল্যের দশ ভাগের একভাগ।

ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, কবুতরের ডিমের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং হযরত আলী (রহ.) ও হযরত আতা (রহ.) একথা বলেন যে, দুটি ডিমের জরিমানা হবে এক দিরহাম। ইমাম যুহরী, ইমাম শাফেয়ী ও আবু সাওর প্রমুখ বলেন ডিমে প্রাণীর মূল্য জরিমানা ওয়াজিব হবে।

بيض نعام শিরোনামে ইনশাআল্লাহ ইহার বিধান বর্ণিত হবে।

কবুতর শিকারের বিধান হল যদি কবুতরের সাথে কোন নির্দিষ্ট এলাকার কবুতর শরীক থাকে তাহলে সে কবুতরকে শিকার করা শুধু সে এলাকাতেই জায়িয। আর যদি কোন উঁচু মিনারে বসবাসকারী কবুতরের সাথে অন্য কোন এলাকার কবুতরও শরীক থাকে, তাহলে এগুলো শিকার করা বা না করার মধ্যে দুটি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে তা জায়িয। উঁচু মিনারে বসবাসকারী কবুতর বিক্রির বিধান হল আবদ্ধ জলাশয়ের মাছ বিক্রির মত। মাছের বর্ণনা ইনশাআল্লাহ 'সীন' পরিচ্ছেদে আসবে। যদি কেউ উড়ন্ত কবুতর বিক্রি করে এ ভিত্তিতে যে, তাদের অভ্যাস তারা ফিরে আসবে। এ বিষয়েও দুটি অভিমত রয়েছে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হল ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যা বৈধতার পক্ষে। তিনি বিষয়টি সে গোলামের উপর কিয়াস করেন, যাকে তার মুনিব কোন কাজের জন্য কোথাও প্রেরণ করেছেন। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কেরাম তা না জায়িয সাব্যস্ত করেছেন। কেননা অবুঝ হওয়ার কারণে ফিরে আসা নিশ্চিত নয়। ইরাকী আলেমগণ কবুতরের প্রতিটি শ্রেণীকে একটি আলাদা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। তাঁর মতে কবুতর এক শ্রেণীর। ঘুঘু একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং ফাখ্তাও এক শ্রেণীর পাখি। ডিম ও বাচ্চা পাওয়ার জন্য কবুতর পোষা, তাদের প্রতি ভালবাসা

পোষণ করে এবং এমনিভাবে দূর দূরান্তে সংবাদ প্রেরণের জন্য কবুতর পোষা কোনরূপ কারাহাত (অপছন্দনীয়তা) ব্যতীত জায়িয।

কবুতর দ্বারা খেলা করা, তাদের উড়ানো, প্রতিযোগিতা করা, কারও মতে কোন রূপ মাকরূহ ব্যতীতই জায়িয। কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহে সংবাদ পৌছানোর জন্য কবুতর প্রয়োজনীয় বাহক। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে তা মাকরূহ। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে شيطان يتبع شيطانة অর্থাৎ শয়তানই শয়তানের অনুসরণ করে। ইবনে হিব্বান (রহ.) এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, কবুতর বাজীকে এ জন্য শয়তান বলা হয়েছে যে, কবুতর বাজীতে লিপ্ত হয়ে পড়লে মানুষ অহেতুক বাজে কাজ ও পাপ কর্ম থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। আর পাপী লোককে শয়তান বলার বিষয়টি বহুস্থানে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেন : شياطين الانس والجن মানুষ আর জিন শয়তান। কবুতরের প্রতি শয়তান প্রয়োগ এ কারণে যে, তাতে গোমরাহী অবশ্যম্ভাবী। শুধুমাত্র কবুতর বাজীর ভিত্তিতে কারও সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় সাব্যস্ত করা যায় না। অবশ্য ইমাম মালেক ও ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)- এর মতে সে ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য—যদি এ খেলাকে জুয়ার মত বানিয়ে নেয় তাহলে সর্বসম্মত মত—এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর কাহিনী

আবু মুহাম্মাদ রামহারমুযী স্বীয় المحدث الفاصل بين الراوى والواعى নামক গ্রন্থে মুসআব ইবনে যুবাইয়া থেকে বর্ণনা করেন, আমি মালিক ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে শুনেছি যে, আমি দেখছি তোমরা উভয়ই হাদীস পছন্দ কর এবং তা অন্বেষণ কর। তারা জবাব দিল জি হাঁ। আনাস (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা পছন্দ কর তবে তোমাদের উপকার হবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ পৌছাবেন। যদি তোমরা হাদীস কম বর্ণনা কর তবে তা বুঝতে চেষ্টা কর।

বলা হয়ে থাকে যে, একবার ইবনে মালেক ছাদ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। তার হাতে ছিল একটি কবুতর। কবুতরটি তিনি লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লোকেরা কবুতরটি দেখে ফেলেন। মালেক যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকেরা কবুতরটি দেখে ফেলেছে তখন তিনি বলতে লাগলেন– আদাবুল্লাহরই আদাব, পিতামাতার নয়, এবং খাইরুল্লাহ তাআলার খায়ের, পিতামাতার নয়।

অধিকন্তু তিনি বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে মালেক ইবনে আনাস আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু আমাদের সাথে তার পিতার নিকট বসতেন না। একদিন

তার পিতা তাকে দেখলেন এবং তার কাছে আসার জন্য ডেকে বললেন, আমার নিকট তাই অধিক পছন্দ যা উত্তারাধিকারী সূত্রে পাওয়া যায় না। এরপর তিনি বললেন– কেবলমাত্র আব্দুর রহমান ইবনে কাশেম মুহাম্মাদ আবুবকর (রাঃ) ব্যতীত কেউই তার পিতার মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর যুগে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) হজ্জের আহকাম অধ্যায়ে বলেছেন : আমাদের নিকট আলী ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন এবং আলী বলেন যে, আমাদের নিকট সুফিয়ান বর্ণনা করেন এবং সুফিয়ান বলেন, আমাদের নিকট আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.) বর্ণনা করেন—যিনি তাঁর যুগে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন—তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন—যিনি তার যুগে একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন, মু'মিন জননী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমার দু হাত দ্বারা সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.)-এর মাহাত্ম্য মর্যাদা তার ইমামত, তাক'ওয়া, যুহদ কৃচ্ছতা এবং অধিক ইলমের বিষয়ে সমস্ত লোক একমত। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যুগেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

খলীফা মানসূরের ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা মানসূর আব্বাসী হযরত আব্দুর রহমানের নিকট বলেন যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আব্দুর রহমান তখন বলেন, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ইন্তেকালের সময় ১১টি ছেলে সন্তান রেখে যান। এবং পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে মাত্র ৭০টি দিনার রেখে যান। তন্মধ্যে ৫টি দিনার কাফনের কাপড়ের জন্য এবং দু দিনার কবরের জায়গা ক্রয়ের জন্য এবং অবশিষ্ট দিনার শিশু ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেক ছেলের ভাগে ১৯ দিরহাম পড়ে। হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের ইন্তেকালের সময় তিনি ১১ জন ছেলে সন্তান রেখে মারা যান। তাদের পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে প্রত্যেকেই দশ লক্ষ দেরহাম করে ভাগে পান। তারপর আমি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের এক ছেলেকে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একশত ঘোড়া প্রেরণ করেন। তখন হিশামের এক ছেলেকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখলাম।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত ঘটনাটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) তার সন্তানগণকে আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যথেষ্ট

হয়ে যান এবং তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন। পক্ষান্তরে হিশাম তার সন্তানদেরকে জাগতিক সম্পদের উপর সোপর্দ করেছিলেন। তাই তার পরিণাম হল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিঃস্ব করে দেন।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, কবুতরের বিষ্ঠা, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় এবং যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় না সকল চতুস্পদ জন্তুর বিষ্ঠা বিক্রি করা বাতিল এবং তা থেকে অর্জিত মূল্যও হারাম।

এ অভিমত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) গোবর অন্যান্য বিষ্ঠা বিক্রি জায়িয সাব্যস্ত করেন। কেননা প্রত্যেক যুগে সব স্থানের লোকেরা বিনা বাক্যে গোবর বিক্রির ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। অধিকন্তু যেহেতু গোবর দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, তাই তা বিক্রি করা জায়িয। তাই অন্যান্য বস্তুর মত গোবরও বিক্রি করা জায়িয। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তাআলা যখন কোন গোত্রের প্রতি কোন বস্তু হারাম করে দেন তখন তার মূল্যও হারাম করে দেন।

উপরোক্ত হাদীসটিতে যে সমস্ত বস্তুর পক্ষে দলীল প্রমাণ আছে সেগুলো ব্যতীত ব্যাপক বস্তুকে আলাদা করা হয়েছে। যেমন- গাধা ইত্যাদি প্রাণী। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্বিতীয় দলীল হিসেবে বলেন, এটা প্রকৃত নাপাক। এজন্য পয়খানার মতই তা বিক্রি করাও জায়িয নয়। কেননা উপকার সত্ত্বেও পায়খানা বিক্রি জায়িয নয়। এ ব্যাপারে সকল ব্যক্তিই ঐক্যমত পোষণ করেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর দলীলের জবাবে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, যে গোবর ইত্যাদি বিক্রি করা মূর্খ ও নীচ প্রকৃতির লোকদের কাজ আর তাদের কাজ ইসলামে দলীল হতে পারে না। আর যে কথা বলা হয় যে, এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার কারণে অন্যান্য বস্তুর সাদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহলে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হল গোবর নাপাক এবং অন্যান্য বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া জায়িয।

কবুতরের দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ

আরবগণ নিরাপত্তার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন– امن من حمام الحرم। হেরেমের কবুতরের চেয়েও কি অধিক নিরাপদ? তারা কারও সাথে ভালবাসার জন্য বলে থাকেন– الف من حمامكة। মক্কা শরীফের কবুতরের চেয়েও কি অধিক মহব্বতকারী। কারও বদ অভ্যাসের দিকে ইঙ্গিত করে বলে থাকেন– اتقلدها طوق الحمامة সে কুঅভ্যাসকে এমনভাবে নিজের মাঝে রপ্ত করে ফেলেছে, এখন

সে তা থেকে পৃথক হতে পারে না। যেমন কবুতর তার গলা থেকে চিহ্ন কখনও সরাতে পারে না।

এ উদাহরণ পবিত্র কুরআনেও আছে। যেমন—

وكل الانسان الزمناه طائره فى عنقه

প্রতিটি মানুষের আমলনামা তার গর্দানে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। যা কখনই আলাদা হবে না।

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) বলেন, যদি কেউ এ আপত্তিও করে যে, উল্লেখিত আয়াতের পূর্বে حسيبا কেন বলা হয়েছে? তাহলে এর জবাবে আমি বলব, মানুষ সে সময়ে সাক্ষী, বিচারক ও আমানতদারদের ভূমিকায় থাকবে। কেননা এসব বিষয় এমন যে, সাধারণত তা মানুষকেই অর্পণ করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মনে হয় যেন আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজের হিসেবের জন্য উত্তম হিসাবকারী স্বয়ং সে নিজেই। হযরত হাসান বসরী (রহ.) যখন এ আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনি নিজেই বলতেন—হে আদম সন্তান! নিজের উপর ন্যায় বিচার করা! আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী–

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

কিয়ামত দিবসে অচিরেই তাদের আমল তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে কণ্ঠহার গর্দানে পরিয়ে দেয়া হয়।

অধিকন্তু বলা হয়ে থাকে—طوق فلان عمله طوق الحمامة অর্থাৎ তার আমলের প্রতিদান দেয়া অত্যাবশ্যক।

ইমাম আহমাদ (রহ.) 'যুহুদ' নামক গ্রন্থে মুতাররাফ থেকে এ দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করেছে–

قال اذا انا مت فلا تحسبونى ولكن يجمع الناس فاطوقهم الحمامة

আমি যখন মরে যাব তাদের মাঝে এমনভাবে মিশে যাব যেমন কবুতরের গলায় গলাবদ্ধ থাকে।

এ অর্থেই সুফিয়ানের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ-এর কবিতা—

ابلغ ابا سفيان عن امدعوا قبه ندامة

✪ আবু সুফিয়ানকে বলে দাও তার আচার-ব্যবহারের পরিণাম লজ্জাকর।

دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنك الغرامة

✪ তোমার চাচাত ভাইয়ের গৃহ আমি বিক্রি করে দিয়েছি, যা দ্বারা ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

وخليفكم بالله رب الناس مجتهد النسامه

✪ আর তোমার প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ যিনি মানুষের প্রভু, আর যিনি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের যিম্মাদার।

ادهب بها ادهبا بها طوقتها طوق الحمامة

✪ গৃহ বিক্রির এ ফয়সালা আমি এমন নিশ্চয়তার মাঝে সম্পন্ন করেছি যেমন কবুতরের গলায় গলাবন্ধ। অর্থাৎ এখন তাতে আর কোন পরিবর্তন হবে না।

ইমাম আবু আব্দুর রহমান সুহাইলী (রহ.) বলেন, দৃষ্টান্তটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথা থেকে নেয়া হয়েছে– যেমন, কেউ যদি কারও এক বিঘত পরিমাণ জমিও গ্রাস করে ফেলে তাহলে কিয়ামতের দিন তার গর্দানে সাতটি যমীন শিকলের মত লটকিয়ে দেয়া হবে।

আর কবির কথা– طوق الحمامه—(কবুতরের কণ্ঠহার) এ কারণে যে, তাদের কণ্ঠাবরণও গলা থেকে বের হবে না যেমনিভাবে কোন মানুষ কোন হার গলায় পরিধান করেছে। এ কবিতায় যে-সব ইশারা ইঙ্গিতের মধুময়তা ও রূপকার্থের লাবণ্যতা কমনীয়তা রয়েছে তা অনেক বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। কবির কথা—اخرق من حمامة—তে সেসব লোকদের কথার প্রতিবাদও রয়েছে যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী– طوقه من سبع ارضين এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ কথা طاقة থেকে নির্গত طوق থেকে নয়।

ইমাম খাত্তাবীও তার বক্তব্যে এ ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ এ বিষয়ে বুখারী শরীফে বর্ণিত– خسف به الى سبع ارضين মুসান্নিফে ইবনে শায়বায় এ হাদীস বর্ণিত যে, "যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও এক বিঘত পরিমাণ ভূমি আত্মসাৎ করবে তবে তার গলায় সে পরিমাণ সাত জমীন গলাবদ্ধ পরিয়ে দেয়া হবে।"

এমনিভাবে আরবগণ বলেন—اخرق من حمامة। অত্যধিক দুর্বল অথবা কবুতরের চেয়েও অধিক দুর্বল। উদাহরণটি এজন্য দেয়া হয় যে, কবুতর তার বাসা মজবুত করে তৈরি করে না। কোন কোন সময় তারা বৃক্ষের ডালে বাসা তৈরি করে, হালকা বাতাসে তা ভেঙ্গে পড়ে এবং ডিম নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টান্তটির সাথে মিল রেখে কবি উবাইদ ইবনে আব্বাস বলেন—

عيو ابا مرهم كما عيبت ببيضتها الحمامة

✪ সে তার কাজকর্মে এতই অক্ষম ও দুর্বল রয়ে গেল যেমন কবুতর তার ডিম রক্ষায় দুর্বল ও অক্ষম।

جعلت لها عودين من بشم واخر من ثمامة

✪ যেহেতু কবুতর সামান্য খড়কুটা দিয়ে তার বাসা বাধে আর সেই খড়কুটাগুলোও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।

চিকিৎসায় কবুতরের উপকারিতা

কার যদি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায় অর্থাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে এমন স্থানে বসবাস করা উপকারী যেখানে কবুতর বসবাস করে। অথবা কবুতরের কাছাকাছি বসবাস করা। এটা কবুতরের অভিনব বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এ ধরনের রোগীর জন্য কবুতরের রক্ত ও গোশত বেশ উপকারী। কবুতরের গরম রক্ত সুরমা হিসেবে ব্যবহার করলে আঘাতপ্রাপ্ত চোখে বা অল্প দেখা চোখের জন্য বেশ উপকারী। বিশেষ করে মস্তিষ্ক থেকে স্খলিত নাকের পানি বের হওয়া রোগের জন্য কবুতরের রক্ত বিশেষ ফলদায়ক। আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানে কবুতরের রক্ত যায়তুন তৈলে মিশ্রিত করে লাগালে প্রভুত উপকার পাওয়া যায়। পরবর্তীতে পুড়ে যাওয়া চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। কবুতরের গরম বিট বিশেষ কের বন্য কবুতরের বিটে (পায়খানায়) আশ্চর্য ধরনের প্রভাব বিদ্যমান। এ বিট পানিতে মিশিয়ে মুত্র বদ্ধ রোগীকে সে পানিতে বসিয়ে রাখলে অতি শীঘ্রই তার পেশাব হবে।

শিক্ষণীয় ও পরীক্ষিত বিষয়

কোন পবিত্র পাত্রে নিচের আয়াত লিখে ধৌত করে পেশাব বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীকে পানি পান করালে অচিরেই তার পেশাব হবে (এটা বহুল পরীক্ষিত)

ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما قدرو الله حق قدره والارض جميعا قبضة يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

কবুতরের বিট সিরকায় মিশিয়ে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীর পেটে প্রলেপ দিলে ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই উপকার পাওয়া যাবে। লাল কবুতরের দুই দিরহাম পরিমাণ বিট তিন দিরহাম পরিমাণ দারুচিনিতে মিশিয়ে পাথুরে রোগীকে পান করালে পাথুরে রোগ ভাল হয়ে যাবে। কবুতরের গোশত অত্যন্ত উপকারী। এর গোশত ও রক্ত ধাতু বর্ধক। জীবিত কবুতরের পেট চিড়ে বিচ্ছু কাটা স্থানে ধরে রাখলে বিচ্ছুর বিষ বিনষ্ট হয়ে যায়। কবুতরের বিট দ্বারা ধুপ দিলে প্রসব বেদনা আক্রান্ত রোগীর ব্যথা-বেদনা দ্রুত সেরে যাবে এবং সত্ত্বর সন্তান প্রসব হবে।

স্বপ্নে কবুতর দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কবুতর দেখলে বিশ্বস্ত দূত, প্রকৃত বন্ধু ও সাক্ষাৎকারী লোক পাওয়ার নিদর্শন। আবার স্বপ্নে কবুতর দেখা কখনও কখনও অধিক ক্রন্দনের আলামত। যেমন কোন কবি বলেন— صب ينوح اذا الحمام ينوح "কবুতর যখন ক্রন্দন করে তখন তার সাথে প্রেমিক কাঁদে।"

স্বপ্নে কবুতর দেখা কোন কোন সময় আরবী বংশোদ্ভুত ভাগ্যবতী এবং রূপসী মহিলার আলামত, যে মহিলা তার স্বামী বদলের প্রত্যাশী নয়। আর যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে কবুতর তার মাথায় বসে আছে, তাহলে বুঝতে হবে এ রোগই তার মৃত্যুর কারণ। মিনার, শিখর ইত্যাদিতে বসবাসকারী কবুতর স্বপ্নে দেখলে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে কবুতরের জন্য খাদ্য ইত্যাদি দিচ্ছে এবং কবুতরকে ডাকছে তাহলে এর তাবীর হবে স্বপ্ন দ্রষ্টা তার গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করা। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, কবুতর ও কাক এক স্থানে বসবাস করছে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে তার গোত্রের নেতা হবে। কারণ প্রতিটি শ্রেণী তার বিপরীত শ্রেণীর সাথে বসবাস করা নেতৃত্ব প্রদানের আলামত। বিশেষ করে কাকের ব্যাপার এ কারণে যে, কাককে ফাসিকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। স্বপ্নে কবুতরের বাক বাকুম আওয়াজ শুনলে বুঝতে হবে এটা কোন বেহুদা আওয়াজ অর্থাৎ কবুতরের বাক বাকুম আওয়াজ কোন বাতিল কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ। এ জন্য স্ত্রী কবুতরের বাকবাকুম আওয়াজ করতে দেখলে এমন মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে যে তার স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে।

স্বপ্নে কেউ দেখল যে, কবুতর তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এরকম স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, অচিরেই স্বপ্ন দ্রষ্টার কাছে কোন পত্র আসবে। স্বপ্নে কেউ দেখল, তার কবুতরী উড়ে চলে গিয়ে, আর ফিরে আসে নি, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে অথবা তার স্ত্রীর ইন্তেকাল হবে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, তার কবুতরীর পালক কেটে দিয়াছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে তার স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে যাওয়া থেকে, সন্তান জন্ম দেয়া থেকে বা গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। আর যদি স্বপ্নে দেখে, কবুতর তাকে রাস্তা দেখাচ্ছে , তাহলে দ্রষ্টার নিকট অচিরেই দূর দূরান্ত থেকে কোন ভাল সংবাদ পৌছবে। স্বপ্নে কবুতর দেখা কার সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার আলামত। স্বপ্নে কবুতর শিকার করলে শত্রুর নিকট থেকে ধন-দৌলত পাওয়ার আলামত। স্বপ্নে কেউ কবুতরীর চোখে ত্রুটি দেখলে বুঝা যাবে তার স্ত্রীর ধর্মীয় ও চারিত্রিক দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনুল মুকরী বলেন, স্বপ্নে কবুতরের মত কোন প্রাণী দেখার অর্থ হল সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সম্মানী হওয়া। স্বপ্নে কবুতর দেখা কোন কোন সময়ে খেলাধুলা, হাসি-তামাশায় এবং দুশমনের উপর বিজয়ী হওয়ার লক্ষণ। আর কোন কোন সময় পবিত্র অন্তর, বিশ্বস্ত ও শিশুদের প্রতি স্নেহময়ী স্ত্রী পাওয়ার আলামত। আবার কোন কোন সময় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিক সন্তানদাত্রী স্ত্রী এবং পরিবার পরিজনের প্রতি অতি স্নেহময়ী স্ত্রী।

২২৬. الحمد (আল-হুমদ্) পর্বত গুহায় বসবাসকারী পাখির বাচ্চা

আরবগণ এ পাখির বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন—

حمد قطاة يسعى الارنب ان يصدها

উদাহরণটি তারা তখনই দিয়ে থাকেন যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি কোন সবল ব্যক্তির সাথে লড়াই করার সংকল্প করে।

মায়দানী বলেন, আমি এ পাখিটির উল্লেখ কোন গ্রন্থেই পাইনি।

২২৭. الحمر (আল-হুমমুর) চড়ুই জাতীয় একটি পাখি

الحمر হা অক্ষরে পেশ এবং মীম অক্ষরে তাশদীদ। চড়ুই জাতীয় একটি ছোট পাখি।

কবি আবুল মাহুস বলেন—

قد كنت احسبكم اسود حمية فاذا لصاف تبيض فيه الحمر

আমি তাদেরকে কালো কুচকুচে কয়লা মনে করেছিলাম। কিন্তু দেখে মনে হল এগুলো ছোট চড়ুই পাখি বিশেষ এবং এগুলো থেকে লাল রঙের ডিম বের হয়। لا সাফ একটি পাহাড়ের নাম। حمر-এর একবচন حمرة।

রাজর কবিতায় বলেন—

وحمرات شربهن عب اذا غفلت غفلة تعب

লাল বর্ণের মদপান যেহেতু অলস করে দেয় তাই পুনরায় তা পান করা দোষণীয়। কখনও মীম অক্ষরটি হালকা করে অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতীতও পড়া যায়।

ইবনে লিসানের ঘটনা

ইবনে লিসান আল-হুমরাহ আরবের একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল বনী তামীমুলাত ইবনে সালাবার সাথে। সমকালীন যুগে তাকে শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হত। বাগ্মীতা ও দীর্ঘায়ুর কারণে লোকেরা তাকে প্রবাদ বাক্যে ব্যবহার শুরু করে দিল। তার প্রকৃত নাম ছিল ওরাকা ইবনে আশয়ার। উপাধি ছিল আবু কিলাব। একবার আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) তাকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি সঠিক জবাব দেন। হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কী করে বিদ্যার্জন করলেন? তিনি জবাব দিলেন, অধিক প্রশ্নকারী জিহ্বা এবং বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয় বলে লোকের কাছে আমি জ্ঞানার্জন করেছি। অতঃপর বললেন আমীরুল মু'মিনীনের ইলমের জন্য বিপদ হল ধ্বংস ও ক্ষুধা। সুতরাং ইলমের জন্য ক্ষতিকর হল ভুলে যাওয়া আর ইলমের বিলোপ

সাধন হল অনুপযুক্ত কারও নিকট বর্ণনা করা। আর ইলমের জন্য শত্রু হল মিথ্যার মিশ্রণ আর ক্ষুধা হল ইলম অন্বেষণকারী কখনও ইলম দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না।

হুমমার-এর শরয়ী বিধান

হুমমার পাখির গোশত খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। কেননা এটা এক শ্রেণীর চড়ুই পাখি। উবাদী বলেন, কোন কোন আলেম এটা হারাম বলেছেন। কেননা এটা অপবিত্র। তবে এ মতটি ধর্তব্য নয়।

হাদীসে হুমমার পাখির আলোচনা

আবু দাউদ তায়ালিসী এবং হাকিম (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এক পাখির বাসা নিয়ে আসেন। বাসায় ছিল হুমমার পাখির ডিম। ডিমের মায়ায় পাখিটিও সাথে সাথে আসল। পাখিটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিতে লাগল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ পাখিটিকে কে কষ্ট দিয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশ্ন শুনে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার ডিম বের করে নিয়ে এসেছি। আর হাকিমের বর্ণনা মতে লোকটি বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করে ফেরত দিয়ে আস।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহতে আমের দামেরী থেকে একটি বর্ণনা যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একদল সাহাবী পাখির বাসা নিয়ে আসেন। তাঁরা একটি পাখির ছানা ধরে রেখেছিল। পাখিটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর চক্কর দিতে লাগল। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কে তার বাচ্চা ধরেছ? সাহাবাগণের একজন বলেন, আমি ধরেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে সে সাহাবী ছেড়ে দিলেন।

কিতাবুল জানাইয-এর প্রথম দিকে আবু দাউদ (রহ.) আমের দামেরীর যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা ইনশাআল্লাহ 'ফা' পরিচ্ছেদে 'ফারখ' শিরোনামে বর্ণনা করা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে যে ডিম ও ছানা ফেরত দেয়ার আদেশ করেছিলেন এর দুটি হেকমত রয়েছে। প্রথমত, সাহাবায়ে কেরাম ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পাখিটি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফরিয়াদ করেছিল

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাখিটির প্রতি মায়া এসে যায়। তাই এ অবস্থায় একে ছেড়ে দেয়া জরুরী ছিল।

উদাহরণ ও প্রবাদ

কারও দীর্ঘ বয়সের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে— اعمر من لسان الحمرة লোকটি হুমমার-এর চেয়েও দীর্ঘ জীবনধারী। কারও উচ্চ বংশ হলে বলা হয়ে থাকে— انسب من ابن لسان الحمرة সে হুমমার পাখির চেয়েও উচ্চ বংশ ওয়ালা। ইবনে লিসান আল হুমমারাহ আরবের বংশের এক ব্যক্তি এবং অত্যন্ত অহংকারী ছিলেন।

২২৮. الحسسة (আল হামসাহ) একটি সামুদ্রিক প্রাণী

আল হামসাহ সামুদ্রিক প্রাণী। কারীও মতে এটা ব্যাঙ। এর বহুবচন حسس ব্যবহৃত হয়।

২২৯. الحماط (আল-হিমাত) সব্জির পোকা

এটাকে حماط ও حموط উভয়ই বলে।

২৩০. الحمك (আল হাম্ক) প্রাণীদের ছোট বাচ্চা

সবধরনের প্রাণীর ছোট বাচ্চাকে হাম্ক বলে। শব্দটি উকুন অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়। ভিতর ও উট পাখির বাচ্চাকেও হাম্ক বলে। অধিকন্তু ছোট আকৃতির মানুষকেও হুমক বলে। যেমন কবি রাজিয-এর বক্তব্য— لا تعذ لينى برز الات الحمك হে প্রিয়া! তুমি আমাকে নিন্দা কর না এবং আমাকে অপমানিত ও ছোট লোকদের মধ্যে গণ্য বল না।

২৩১. الحمل (আল-হামাল) বকরীর ছয় মাসের ছানা

কেহ কেউ হামাল দ্বারা দুম্বাও গ্রহণ করেছেন। এর বহুবচন حملان ও احمال আসে।

হাদীস শরীফে হামাল-এর আলোচনা

ইমাম ইবনে মাজা (রহ.) আবু ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে ভুনা গোশতের ঘ্রাণ অনুভব করলেন। তিনি তখন বললেন, কার গৃহে যবেহ করা হয়েছে। একথা শুনে এক আনসারী ঘর থেকে বের হলেন এবং নিবেদন করলেন আমি আমার বাচ্চাদের জন্য জবাই

করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, এ কুরবানী শুদ্ধ হয় নি। দ্বিতীয়বার কুরবানী কর। (যেহেতু এ সাহাবী ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছিলেন। শরঈ বিধান মতে শহুরে লোক ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করতে পারে না। তবে গ্রাম্য লোকদের জন্য জায়িয।) তখন আনসারী সাহাবা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট ভেড়ার বাচ্চা ব্যতীত কুরবানী দেয়ার মত আর কোন প্রাণী নাই। তিনি বললেন, তাই কুরবানী করে দাও। আর তা শুধু তোমার জন্যই অনুমতি দেয়া হল। (অর্থাৎ এত কম বয়সের বাচ্চা দ্বারা কুরবানী তোমার পরে আর কারও জন্য অনুমতি নাই।)

একটি কাহিনী

আবু তালেব মক্কী স্বীয় কুওয়াতুল কুলুব গ্রন্থের ২৫তম অধ্যায়ের শুরুতে তার এক বন্ধুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের নিকট একনজ ফকীর আসল। আমি আমার এক প্রতিবেশীর নিকট থেকে ভুনা করা বকরীর বাচ্চা ক্রয় করে সে ফকীরসহ খেতে বসলাম। আমাদের খানা শুরু হল এবং যখন আমার সাথে ফকীর লোকটি ভুনা করা বকরীর বাচ্চার এক টুকরো গোশত মুখে দিল সঙ্গে সঙ্গে সে তা বমি করে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল আপনারা খান, আমি খাব না। কারণ এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, তোমাকে ব্যতীত আমি খাব না। এরপর ফকীর লোকটি বলল, আমি খাব না। একথা বলে লোকটি চলে গেল। অবশেষে আমরাও খেলাম না এবং পরামর্শ হল যে, যে প্রতিবেশীর নিকট থেকে তা ক্রয় করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি হয়ত কোন কথা বের হয়ে আসবে। যেহেতু আমার বিশ্বাস ছিল এতে কোন কিছু ব্যাপার আছে যে কারণে সেই লোকটি তা খাওয়া বর্জন করেছে।

এরপর আমরা সেই প্রতিবেশীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কিসের গোশত ছিল? কিন্তু প্রতিবেশী লোকটি সন্তুষজনক জবাব দিতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আমরা কঠোরতা অবলম্বন করলে লোকটি বলল, এটা ছিল মৃত বরুরীর বাচ্চা। আমি টাকার লোভে তা ভুনা করে তোমার নিকট বিক্রি করেছিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন তা জানতে পারলাম তখন সেই ভুনাকৃত গোশত কুকুরকে দিয়ে দিলাম। তারপর সেই বুযর্গ (ফকীর) লোকটির সন্ধানে বের হলাম। তাকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব কোন কারণে আপনি খেলেন না? তিনি জবাব দিলেন, কমপক্ষে বিশ বছর যাবত গোশতের প্রতি আমার মোটেও আগ্রহ নাই অর্থাৎ বিশ বছরের মধ্যে আমি অতি অল্প পরিমাণ গোশতই খেয়েছি। অথচ অধিকাংশ সময়ই গোশত আমার সম্মুখে থাকত, কিন্তু খেতে মন চাইত না। কিন্তু আজ যখন আপনি ভুনা করা গোশত আমার সম্মুখে রাখলেন তখন তা খেতে আমার মন সীমাহীন আগ্রহ দেখাল। অথচ গোশতের প্রতি এত আগ্রহ ইতিপূর্বে আমার হয় নি। এ জন্য আমার মনে এ ধারনার সৃষ্টি হল যে,

হতে পারে এ গোশতে কোন ত্রুটি আছে। তাই আমি তা খেতে অস্বীকার করলাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

ইবনে কানি-এর মু'জাম এবং তাবারানী (রহ.) কেরাম ইবনে সায়িব আনসারী (রাঃ)-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন : তিনি (ইবনে সায়িব) বলেছেন যে, একবার আমি আমার পিতার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় যাচ্ছিলাম। সময়টি ছিল যখন মক্কাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। (অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগ) রাত্র হয়ে গেলে আমরা এক রাখালের ঘরের পাশে থেমে গেলাম। অর্ধরাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে, এমন সময় একটি বাঘ এসে বকরীর পাল থেকে একটি বাচ্চা ধরে নিয়ে গেল। তখন রাখাল তাড়াতাড়ি জেগে উঠল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল— يا حامر الوادى اوذى جارك হে মাঠের জিন সর্দার নিজ প্রতিবেশীর খবর নাও। একথা বলতে না বলতেই একটি আওয়াজ শোনা গেল যে— ياسرحان ارسله অর্থাৎ হে বঘ্র! এটাকে ছেড়ে দাও। তারপর সে বাচ্চাটি দৌড়ে ফিরে আসল এবং বকরীর পালের সাথে মিশে গেল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। যেমন :

وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا

কতিপয় মানুষ জিনদের আশ্রয় নিত, ফলে জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা জিন : ৬)

অর্থাৎ কতিপয় মানুষ কতিপয় জিন থেকে সাহায্য প্রার্থনা করত। সুতরাং জিনেরা যখন এমন কাজ করত এতে তাদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পেত।

ঘটনাটি 'মিয়ান' গ্রন্থে ইসহাক ইবনে হারস-এর জীবনীতে বর্ণিত আছে। অবশ্য বর্ণনাটি দুর্বল।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাহিনী

আল্লামা কাযী আয়ায (রহ.) তাঁর 'আশ-শিফা' গ্রন্থে লিখেছেন : হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহে পতিত হওয়ার কারণ ছিল একদিন পিতা-পুত্র একই দস্তরখানায় বসে ভুনা বকরীর গোশত খাচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই ছিল একটি এতীম শিশু। শিশুটি ভুনা গোশতের ঘ্রাণ পেলে তারও ভুনা গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হল। কিন্তু ভুনা গোশত তার জন্য দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে শিশুটি ক্রন্দন করতে লাগল। তার সঙ্গে তার বৃদ্ধা দাদিও ক্রন্দন করতে লাগল। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত ইয়াকুব (আঃ) কিছুই জানতেন না। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে হযরত ইউসুফের বিরহে ফেলা হল। তিনি তাঁর

বিরহে এতই কাঁদলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তার দু চোখ সাদা হয়ে গেল। অতঃপর যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ ঘটনা অবহিত হলেন, তখন তিনি স্থায়ী নিয়ম করে নিলেন যে, খানা খাওয়ার পূর্বে গৃহের ছাদে উঠে এই আহ্বান করতেন যে, কেউ না খেয়ে থাকলে ইয়াকুবের ঘরে এসে খেয়ে যাও। আর কোন রোযাদার থাকলে ইফতার কর।

এ বর্ণনার ব্যাপারে আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মনে করি না। আমি বিস্ময়বোধ করি যে, কাযী আয়াযের মত ব্যক্তি এ ঘটনাকে কী করে তার গ্রন্থে স্থান দিলেন? অথচ ঘটনাটি নিছক কাল্পনিক। এ ধরনের ঘটনা থেকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা অত্যন্ত জরুরী। তাই আমি এ ঘটনাটি আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি, যাতে আমি এ ঘটনাটি সম্পর্কে সাবধান করতে পারি যে, ঘটনাটি কাল্পনিক। এতে সত্যের লেশমাত্রও নেই। যদিও তাবারানী (রহ.) মু'জামুল আওসাত ওয়াস সাগীর''-এ হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ করেছেন। এতে উক্ত ঘটনাটিও রয়েছে। এ ঘটনার পর হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখনই খানা খেতে ইচ্ছা করতেন তখনই আহ্বান করতেন যে, যদি কেউ খানা খেতে ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে আস। আর যখন তিনি রোযা রাখতেন তখন ইফতার করতে আহ্বান করতেন। এ বর্ণনাটি তাবারানী তাঁর উস্তাদ শেখ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল বাহিলী আল-বাসরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল রাবী। বায়হাকীও 'শোয়াবুল ঈমাম'-এর বাইশতম অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা ওয়াহেদী সূরা ইউসুফের আয়াত— انى لاجد ريح يوسف এর তাফসীরে লিখেছেন, ভোরের বাতাস আল্লাহর কাছে নিবেদন করল যে, হযরত ইয়াকুবের নিকট সুসংবাদ পৌছার পূর্বে তাঁর জামার সুঘ্রাণ পৌছে দিব। আল্লাহ তাআলা ভোরের বাতাসের এ আবেদন মনজুর করলেন। অতঃপর বাতাস অনেক দূর থেকেই তাঁর সন্তানের সুঘ্রাণ পৌছে দিল। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি ভোরের বাতাস থেকে প্রশান্তি লাভ করে। এ বাতাস পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

ايا جبلى نعمان بالله خليا نسيم الصبا يسرى الى نسيمها

হে নু'মান পাহাড়! আল্লাহর ওয়াস্তে প্রশস্ত মাঠের মৃদুমন্দ বাতাসকে তোমার পক্ষ থেকে প্রেরণ কর।

فان الصبا ريح اذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها

কেননা, উন্মুক্ত মাঠের ভোরের বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন চিন্তিত ব্যক্তির চিন্তাসমূহ বিদূরীত করে দেয়।

২৩২. الحمنان (আল-হামনান) ছোট কীট বিশেষ

ইহা অতি ক্ষুদ্র একটি কীট। একবচনে حمنانة ও হামনাতুন حمنة আসে।

২৩৩. الحمولة (আল-হামুলাহ) সওয়ারীর উট

ইমাম জাওহারী (রহ.) বলেন, 'হামুলাহ' এর হা অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তে হবে। ওইসব উটকে 'হামুলাহ' বলা হয়, যার দ্বারা বোঝা উঠানোর কাজ করানো হয়। এমনিভাবে যেসব প্রাণীর দ্বারা বোঝা উঠানোর কাজ করানো হয় এগুলোকেও হামুলাহ বলে। যেমন গাধা চাই এর উপর বোঝা উঠানো হোক বা না হোক।

২৩৪ الحميق (আল-হামীক) বাজ পাখি

ইবনে সাইয়্যেদাহ বলেন, আল হামীক এমন একটি পাখি যে তিতর ও টিড্ডি ইত্যাদি শিকার করে। কোন কোন মনীষীর নিকট আমি শুনেছি, আল হামীক বাজ পাখিকে বলে। আর মক্কার ইতিহাসে উল্লেখ আছে, আবুল ওয়ালিদের এ কথা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আতা (রহ.) থেকে ইবনে জুরাইহ জানতে চান যে, ইহরাম অবস্থায় ঈগল পাখি হত্যা করা জায়িয কিনা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, জায়িয। আবার জিজ্ঞাসা করলেন চিল ও বাজ কি হত্যা করা জায়িয? কেননা এই দুটি পাখি মুসলমানদের কবুতরকে ধরে খেয়ে ফেলে। তখন আতা জবাব দিলেন হ্যাঁ এগুলোকে হত্যা করা জায়িয। কেননা এগুলো মানুষের দুশমন।

২৩৫. حميل حر (হুমীলে হুর) এক ধরনের পাখি

সম্ভবত জামীল পাখিকেই হুমীলে হুর বলা হয়েছে। হুমীলে হুর হা অক্ষরে পেশ ও যের উভয় অবস্থায় পড়া যায়।

২৩৬. الحنش (হানাশ) সাপ

(হা ও নুন অক্ষরে পেশ) কারও মতে এটা চিত্রল সাপ। এর বহুবচন احنش আসে। আবার কারও মতে ভূ-চর সমস্ত প্রাণীকে 'হানাশ' বলেন। যেমন– গুঁইসাপ, সজারু ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এরপরও আমরা শব্দটাকে শুধু সাপ অর্থে ব্যবহার করি। কবি যুররামাহ কবিতায় বলেন—

وكم حنش ذغف اللعاب كانه على الشرك العادى نصف عصام

আমার এমন সব পোকা-মাকড়ও প্রাণী আছে যারা মানুষের জীবন শেষ করে দেয়। বিশেষত সাপ মানুষের জীবন নিঃশেষ করে দেয়।

একজন মানুষের নামও ' হানাশ ' ছিল। কেউ কেউ বলেন, অজগর বা এর চেয়েও বড় সাদা সাপকে 'হানাশ' বলে। কারও ধারণা সবচেয়ে কালো সাপকে 'হানাশ' বলে। আবার কারও মতে টিকটিকে এবং এমন সব প্রাণী যেগুলোর মাথা সাপের মত।

'হাদীসে' হানাশ'-এর উল্লেখ

দাজ্জালের হত্যার ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হাদীসে রয়েছে—

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন সে যুগটি এমন হবে যে, তাতে হিংসা, বিদ্বেষ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবং বিষাক্ত প্রাণীর বিষও বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি ছোট শিশুরা অজগরের মুখে হাত দিবে কিন্তু অজগর ছোবল দিবে না।

সুনানে আবু দাউদ ও জামে তিরমিযীতে খারীমা ইবনে জাযা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ভূ-পৃষ্ঠের প্রাণীদের মধ্যে শিয়াল সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন কেউ কি আছে যে, সে শিয়াল খায়? আবার জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাঘ্র খাওয়া কি জায়িয? তিনি বললেন, কোন সুস্থ মানুষ কি ব্যাঘ্র খায়?

২৩৭. الحنظب (আল-হানযাব) টিড্ডি

হানযাব বলা হয় টিড্ডিকে। কিন্তু খলীল বলেন, হানযাব হল বিচ্ছু। হামযা ইসফাহানী বলেন, হানযাব হল বুনো বিড়াল ও শৃগালের মাঝামাঝি জন্ম হওয়া একধরনের প্রাণী। প্রমাণ হিসেবে তিনি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর কবিতা উপস্থাপন করেন—

ابوك ابوك وانت ابنه فبئس البنى وبئس الاب

✪ তোমার পিতাই তোমার পিতা, আর তুমি তার পুত্র। সুতরাং পিতাও বদ আর পুত্রও বদ।

وامك سوداء نوبية كان انا ملها لحنظب

✪ আর তোমার মা নিকস কালো, যার আঙ্গুল টিড্ডি সদৃশ্য।

بيت ابوك لها سافدا ما سفد الهرة الثعلب

✪ বিড়াল শৃগালের সাথে যেভাবে সঙ্গম করে তোমার মাও তোমার পিতার সাথে সেভাবে সঙ্গম করে।

কালো কুকুরের প্রশংসায় তাবাখী এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন- (বঙ্গানুবাদ)

اعدت الذئب وليل الحارس مصدرا الثلع مثل الفارس

✪ ব্যাঘ্র থেকে বাঁচার জন্য রাত্রে পাহারা দেয়ার জন্য আমি কুকুর পুষে থাকি।

يستقبل الريح بألف خانس فى مثل جلد الخطباء اليابس

✪ এ কুকুরটি নিপুণ ঘোড়া সওয়ার থেকেও অধিক সাহসী। তার নাকের ছিদ্র থেকে এমন শুষ্ক বাতাস বের হয় যেমন টিড্ডির শুষ্ক চামড়া।

২৩৮. الحوار (আল-হিওয়ার) উটনীর বাচ্চা

মায়ের সাথে সাথে থাকে এমন বাচ্চাকে 'আল-হিওয়ার' বলে। আর মা থেকে আলাদা হয়ে গেলে বলা হয় ফাসীল। তিনটি পর্যন্ত বাচ্চা সংখ্যাকে হাওয়ারাহ বলে এবং তিনটির উর্ধ্বে হলে হীরান এবং হাওয়ারান বলে। ইবনে হিশাম প্রমুখ খালিদ ইবনে লাইসিজ-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস-এর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন। এ ভ্রমণ তৃতীয় হিজরীর মুহররম মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি এ ব্যাপারে ৫টি কবিতা বলেছেন। এগুলোর মধ্যে একটি হল—

تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح ترى كل جيب مقدد

আমি ইবনে সাওরকে এমন অস্থির অবস্থায় ছেড়ে দিলাম যেমন উটনীর বাচ্চা তার মা থেকে পৃথক হওয়ার পর ব্যাকুল হয়ে যায়। এখন তার আশেপাশে রয়েছে ক্রন্দনকারী, যা অধিক চিন্তার কারণে তার জামার অগ্রভাগে ছিঁড়ছে।

প্রবাদ ও উদাহরণ

আরবগণ বলে থাকেন— يا يسار كل لحم الحوار واشرب لبن العشار واياك ونبات الاحرار উটের বাচ্চার গোশত খাও, গাভীন উটের দুধ পান কর এবং মুক্ত স্বাধীন বালিকা থেকে নিজেকে বাঁচাও। এ কবিতার প্রেক্ষাপটে একটি কাহিনী রয়েছে। কবি বলেন—

واني لاخشى ان خطبت اليهم عليك الذى لاقى يسار الكواعب

✪ আমি তাকে সংবাদ দিতে ভয় করি যে, না জানি সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। যা তার মত ব্যক্তিরা বহন করে থাকে।

আরববাসীরা অপকারী বস্তুর বেলায় বলে থাকে যে- امسخ من لحم الحوار কবিতা বলেন—

وقد علم الغثر والطارقون بانك للضيف جوع وقر

✪ তোমার ব্যাপারে মেহমানদের এ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তোমার মেহমান ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গিয়েছে।

مسيخ مليخ كلحم الحوار فلا انت حلو ولا انت مر

✪ তুমি এমনই লোক যেমন উটের বাচ্চার বিকৃত গোশতও এখন আর না মিষ্টি না তিক্ত।

মাসীখ ও মালীখ বলা হয় বিস্বাদ গোশতকে। কোন কোন স্থানে আরবগণ বলে থাকেন— كسور العيد من لحم الحوار দৃষ্টান্তটি তখনই দেয়া হয় যখন কোন বস্তু থেকে কিছুই অর্জিত হয় না। এ প্রবাদটির পটভূমি হল একটি গোলাম একটি উটের বাচ্চা জবাই করল এবং সম্পূর্ণ গোশত সে নিজেই খেয়ে ফেলল এবং তার মালিকের জন্য কিছুই রাখল না। তখন থেকেই আরবগণ সে বস্তুর জন্য যার সবটুকুই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এই উদাহরণটি দিয়ে থাকেন।

২৩৯. الحوت (আল-হুত) মৎস্য

حوت এর বহুবচন حوتة, احوات এবং حيتان আসে। এর বিস্তারিত আলোচনা سمك শিরোনামে আসবে। কেননা মৎস্যকে আরবীতে سمك বলে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اذتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الاية

তাদের (বনী ঈসরাইলদের) নিকট শনিবার দিন প্রচুর মৎস্য আসত। (আর যে দিন শনিবার হত না সেদিন মৎস্য আসত না।) একটি জিজ্ঞাসা যে, মাছ কিভাবে জানতে পারত যে, আজ শনিবার? তারা আজ শিকার থেকে নিরাপদ? এ ব্যাপারে আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী (রহ.) বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) সম্ভবত আল্লাহ তাআলা মেঘের মত এমন কোন জিনিস প্রেরণ করতেন, যাতে মাছ বুঝতে পারত যে, আজ শনিবার।

(২) অথবা মৌমাছির মত আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট ইলহাম প্রেরণ করতেন।

(৩) অথবা শনিবারের জ্ঞান তাদের এভাবে হত যেমন- ভূ-চর প্রাণীদের শুক্রবার দিন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান হয়। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এমন কোন প্রাণী নাই যার অন্তর শুক্রবার দিন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে না। এ ভয়ের প্রেক্ষাপট হল যে, না জানি আজই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা হাদীসে রয়েছে শুক্রবার কিয়ামত সংঘটিত হবে।

(৪) অথবা হেরেম শরীফের কবুতরের মত এদেরও শনিবার দিন নিরাপদ থাকার উপলব্ধি হয়ে যেত।

এ ব্যাপারে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, শনিবারে এত প্রচুর মাছ নিকটে আসত যে এগুলোকে হাতেই ধরা যেত। কিন্তু রবিবার আসতেই সব মাছ গায়েব হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন অধিকাংশ মাছ গায়েব হয়ে যেত আর স্বল্প সংখ্যক মাছ থেকে যেত। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট সঠিক সনদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আঃ)-কে ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়ে দিলেন, সে সময়ে ভূ-পৃষ্ঠে গাধা এবং পানিতে মৎস্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। রাতের বেলা গাধা এসে মাছের পাশে থাকত। গাধা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে দেখতে পেল তখন মাছের কাছে এসে বলল, আজ ভূ-পৃষ্ঠে এমন জিনিস অবতরণ করেছিল যে, তারা পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করে এবং হাত দ্বারা ধরে। একথা শুনে মাছ বলল, তোমার কথায় যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে সমুদ্রেও তার হাত থেকে আমাদের নিস্তার নাই এবং ডাঙ্গায়ও নাই।

দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ

কবি বলেন—

كالحوت لا يلهية شيئ يلهمه يصبح ظمأن وفى البهر فيه

✪ মাছের মত অন্য কোন জিনিস অসতর্ক থাকে না। আশ্চর্য ব্যাপার যে, মাছ সমুদ্রে বসবাস করে অথচ তার পিপাসা লাগে না।

উদাহরণটি এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যার কাছে ধন-সম্পদ আছে। কিন্তু একজন উঁচুমানের কৃপণ এবং তার ধন-সম্পদ থেকে কেউ কোন উপকার গ্রহণ করে না।

হাদীসে মৎস্যের আলোচনা

হাদীস শরীফে মাছের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম তাবারানী স্বীয় 'মু'জামুল' আওসাত' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : এ উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদী) আলেমগণ দুপ্রকার হবেন। প্রথম প্রকার আলেম যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন এবং সে তা মানুষের মধ্যে বণ্টন করে। এবং এর বিনিময়ে মানুষের নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করে না বা চায় না। আর না ইলমকে বিক্রয়ের পণ্য বানায়। সুতরাং এ ধরনের আলেমের জন্য আকাশের পাখি, পানির মাছ, ভু-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং কেরামান কাতেবীন দুআ করতে থাকেন। এসব আলেম ব্যক্তি জান্নাতের সাধারণ লোকের নেতা হয়ে পৌঁছে যাবেন। এসব আলেম রাসূল ও নবীগণের সান্নিধ্যে বসবাস করবেন।

দ্বিতীয় প্রকার হল, সেসব আলেম ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন কিন্তু সে এ ইলমকে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মাঝে খরচ করতে

কৃপণতা করছে। এ ইলমের মাধ্যমে সে দুনিয়াতে রুজি রোজগার করছে এবং সাধারণ মূল্যে মাসয়ালা পরিবর্তন করে দেয়।

এ ধরনের আলেম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার মুখের মধ্যে আগুনের লাগাম হবে। একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে উপস্থিত লোকদের সম্মুখে বলবে এ হল অমুকের পুত্র অমুক। তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ইলম দান করেছিলেন, কিন্তু সে এই ইলম প্রচারে কৃপণতা করেছে। আর যদিও বা প্রচার করেছিল, তাও বিনিময় করেছে। এ আলেম যেই পর্যন্ত না হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর গ্রহণ করবে ততক্ষণ সে আযাবে নিপাতিত থাকবে। (আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন)

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী

মাছের জন্য সৌভাগ্য যে তার পেটে আল্লাহর একজন নবীর বাসস্থান। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইউনুস (আঃ)-কে মাছের পেটে পৌঁছে দিলেন এবং মাছকে সাবধান করে দিলেন যে, আমি ইউনুসকে তোমার খাদ্য বানাইনি বরং তোমার পেটকে তার আশ্রয়স্থল এবং জেলখানা বানিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কিছুদিন পর হযরত ইউনুসকে মাছের পেট থেকে বের করে দিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কতদিন ছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে ছিলেন। আর আতা (রহ.) বলেন, সাত দিন এবং যাহহাক বিশ দিনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আদ্দি, কালবী ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমান চল্লিশ দিনের প্রবক্তা। এবং ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-কে মাছে সকাল বেলা গ্রাস করেছিল এবং সন্ধ্যায় বের করে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত—وانبتنا عليه شجرة من يقطين (আর আমি তার উপর একটি লতানো গাছ উদগত করেছিলাম) يقطين দ্বারা উদ্দেশ্য হল লাউ গাছ। এ বিষয়ে সকল মুফাসসির ঐক্যমত পোষণ করেন। এমন বৃক্ষ যা যমীনে প্রসারিত হয় এবং লম্বা হয় এবং তাতে কাণ্ড হয়। সুতরাং খিরাই, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি বৃক্ষও এর মধ্যে শামিল।

শিক্ষণীয় বিষয়

ইমামুল হারামাইন (রহ.)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ তাআলা কোন দিকে আছেন? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ তাআলা এ থেকে অনেক উর্ধে। এতে লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল তাহলে এর দলীল কী? জবাবে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী পেশ করেন : لا تفضلونى على يونس بن متى—তোমরা আমাকে ইউনুস ইবন মাতার

উপর প্রাধান্য দিও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী হযরত ইউনুসকে অসম্মানের জন্য নয় বরং তাঁকে তিনি নিজের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যাপার হল, ইহুদীরা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উপর আল্লাহর নাফরমানীর অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে অপদস্ত করেছেন। এতে তিনি সমাজে আশ্রয় চেয়েও অপদস্ত হয়েছেন। মূলত এসব কথা ইহুদীদের বোকামির ফল। অন্যথায় হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তাআলার একজন সম্মানিত নবী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণা—আমাকে প্রাধান্য দিও না এমন কি ইউনুস ইবন মাতার উপরও—এ কথার মর্ম হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে খাটো করেছেন এবং বলেছেন ইউনুস আমার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান এবং আল্লাহর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। আল্লাহ না করুন তিনি কখনও মর্যাদাহীন নন। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করা হল এর কারণ কী? ইমামুল হারামাইন বলেন, এ প্রশ্নের জবাব আমি ততক্ষণ পর্যন্ত দিব না যতক্ষণ না আমার এ মেহমান এক হাজার দিনার উপার্জন করে তার ঋণ পরিশোধ করে। সুতরাং এ কাজের জন্য দুজন লোক তৈরি হল এবং তারা তার মেহমানের এক হাজার দিনার পরিশোধ করে দিল। তারপর তিনি বলেন, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেন তখন একটি মাছ এসে তাকে গ্রাস করল এবং সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে গেল। সেখানে তার উপর তিন ধরনের অন্ধকার ছেয়ে যায়। প্রথমত সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার, দ্বিতীয়ত মাছের পেটের অন্ধকার, তৃতীয়ত রাত্রের অন্ধকার। এই ত্রিবিধ অন্ধকারে পড়ে হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ তাআলাকে ডেকে দুআ করলেন—

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন ইলাহ নাই, তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি নিজের উপর যুলুম করেছি।

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ রজনীতে রফরফের উপর আরোহণ করে এমন স্থানে পৌঁছেছিলেন, যেখানে কলমে লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর সেখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুর সাথে একান্ত আলাপ করেছিলেন। এমন অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ইউনুস ইবনে মাতা সমুদ্রের গভীরে আল্লাহর যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন, তা মি'রাজ রজনীতেও নবীজী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভ করেন নি অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইউনুসের তুলনায় নিকটবর্তী ছিলেন না। (ইনশাআল্লাহ্ 'নুন পরিচ্ছেদে' রোম সম্রাটের সেই পত্র যাতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল সে কবর কোনটি যা তার ভিতর অবস্থিত মৃতদেহকে নিয়ে চলাচল করে। তার জবাব হযরত ইবনে আব্বাস

(রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হবে)।

হাকিম (রহ.) স্বীয় মুসতাদরাকে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এ রেওয়াতের বর্ণনা করেছিলেন (আনাস (রাঃ) বলেন) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক ভ্রমণে ছিলাম। ভ্রমণাবস্থায় আমরা এক স্থানে থেমে গেলাম। সে নির্জন মরুভূমিতে কেউ একজন বলছে যে, হে আল্লাহ! আমাকেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে শামিল করে নিও। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি সে লোকটির নিকট গিয়ে দেখি তার দেহের দৈর্ঘ্য তিনশত হাত লম্বা। তিনি বসা ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? জবাবে বললাম, আমি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাদেম আনাস ইবনে মালিক। বুযুর্গ লোকটি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোথায় আছেন? আমি জবাব দিলাম তিনি কাছেই আছেন এবং আপনার দুআ তিনি শুনতে পেয়েছেন।. একথা শুনে বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, আপনি গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলবেন যে, আপনার ভাই ইলিয়াস (আঃ) আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। সুতরাং আমি তাঁর এ সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌছে দিলাম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আগমন করলেন এবং উভয়ে কোলাকুলি করলেন এবং একত্রে বসে তারা কথাবার্তা বললেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সারা বছরে মাত্র একবার খাদ্য গ্রহণ করি। আজ আমার ইফতার করার দিন। আপনিও আমার সাথে খানায় অংশগ্রহণ করুন। এমন সময় আকাশ থেকে একটি দস্তরখানা অবতরণ করল। এতে মাছ, রুটি ও শাক-সব্জি ইত্যাদি ছিল। এরপর উভয়েই খেলেন এবং আমাকেও খাওয়ালেন। এরপর উভয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে আসলেন। আমি দেখলাম হযরত ইলিয়াস (আঃ) একখণ্ড মেঘের উপর আরোহণ করে আকাশের দিকে চলে গেলেন।

হাকিম (রহ.) উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু শাইখুল ইসলাম আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) 'মীযান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : হাকিম এরূপ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে আল্লাহর কাছে লজ্জিত না হন। সুতরাং শাইখুল ইসলাম 'তালখিসুল মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে হাকিমের এ কথার শেষে এটা সহীহ লিখেছেন। আমার মতে উক্ত হাদীসটি জাল। আর যে লোক এ হাদীসটি জাল করেছে আল্লাহ তাআলা তার অমঙ্গল করুন। আমার ধারণা ছিল না যে, হাকিম এ হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে মূর্খতার জন্য পাপের দায়িত্ব নিবেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিমন্ত্রণ

আল্লামা কুশাইরী (রহ.) বর্ণনা করেন : হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহ তায়ালর নিকট আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি যদি অনুমতি দিতেন

তাহলে আমি একদিন সমস্ত প্রাণীকে খানা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতাম। আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমানের আবেদন মনজুর করে তাঁকে অনুমতি দিলেন। আল্লাহ তাআলার অনুমতি পেয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) যিয়াফতের আয়োজন করতে লাগলেন। এজন্য তাঁর অনেক সময় লেগে গেল। তারপর আল্লাহ তাআলা সমুদ্র থেকে মাত্র একটি মাছকে যিয়াফতের খানা খেতে পাঠালেন। মাছটি এসে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দীর্ঘদিনের আয়োজনকৃত খাদ্য একবারে খেয়ে সাবাড় করে দিল। তার পেট না ভরায় সে সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট আরও খাদ্য চাইল। সুলাইমান (আঃ) বললেন, তোমাকে দেয়ার মত এখন আর আমার কাছে কোন কিছু নেই। এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) মাছটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি প্রত্যহ এ পরিমাণ খাদ্য খাও? মাছটি জবাব দিল প্রত্যেক দিন এ পরিমাণ খাদ্য আমি খেয়ে থাকি, কিন্তু আজ এ খাদ্য ব্যতীত আল্লাহ তাআলা আর কোন খাদ্য দেন নি। তাই আপনার এ যিয়াফত করা উচিত হয় নি। আমি আপনার যিয়াফতের কারণে আজ উপোস রইলাম।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এ কাহিনীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ শক্তিমত্তা, সর্বময় ক্ষমতা, তাঁর বাদশাহীর মহানত্ব, তাঁর ধনাগারের বিশালতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) একজন সম্মানিত বাদশাহ ও একজন নবী হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে ওই একটি মাছের পেট ভরাতে পারলেন না। فسبحان المتكفل بارزاق خلقه কত পবিত্র সত্তা তিনি যিনি তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির রিযিকের হিফাযত করেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খানাপিনার মাধ্যমে পেট ভরা এবং পরিতৃপ্তি লাভ করা খাদ্য ও পানীয়ের কাজ নয় বরং তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট একটি অভ্যাস মাত্র। বান্দা পানাহার করে পরিতৃপ্ত হয়। সত্যপন্থীদের অভিমত তাই। আর যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। মাছের শরঈ বিধান, চিকিৎসায় উপকারিতা, স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ইত্যাদি ইনশাআল্লাহ সীন পরিচ্ছেদে 'সামাক' শিরোনামে বর্ণনা করা হবে।

২৪০. حوت الحيض (হুত আল-হায়েয)

এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ

তিমি মাছ। ইবনে যুহার বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি যিনি মাছটি দেখেছেন। তিনি বলেন, এ মাছটি সমুদ্রের একটি বিশাল মাছ। এ মাছটি সমুদ্রে চলাচলকারী বড় ধরনের নৌকা পর্যন্ত আটকে দিতে পারে। সমুদ্রে ভ্রমণকারীরা এদের কবলে পড়লে হায়েযের কাপড়ের টুকরা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তারা পালিয়ে যায় এবং নৌকার কাছেও আসতে পারে না।

সুতরাং হায়েয হল এদের হাত থেকে বাঁচার হাতিয়ার যা নাবিকরা সব সময় তাদের জাহাজে রাখে। মাছটির নাম ফাতোস। আর যে নৌকা বা জাহাজে ঋতুবতী রমণী থাকে সে নৌকার কাছেও এরা আসে না। 'ফা' পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

হুত আল-হায়েয মাছের শরঈ বিধান

অন্যান্য মাছের যে বিধান এ মাছেরও সে-ই বিধান। তবে মাছের রক্তের ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথম অভিমত হল অন্যান্য রক্তের মত মাছের রক্তও অপবিত্র। দ্বিতীয় অভিমত হল মাছের রক্ত পাক-পবিত্র। কেননা এ রক্ত শুকিয়ে গেলে সাদা হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার পর কালো রং ধারণ করে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) কোন কোন হানাফী থেকে এমনটি বর্ণনা করেছেন।

চিকিৎসায় উপকারিতা

ইমাম রাযী (রহ.) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন : এ মাছের পিত্তে যবের দানা পিষিয়ে মিশ্রিত করে কোন মৃগী রোগীর নাকে ফুক দিলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটা পরীক্ষিত। এটাও পরীক্ষিত যে, এ মাছের কলিজা শুকিয়ে পিষিয়ে কারও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে সেখানে লাগালে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ক্ষতস্থান যত গভীর হোক, তা ভরে যাবে। এ মাছের পিঠের গোশত খেলে যৌন ক্ষমতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পরিশিষ্ট

স্বপ্নে হায়েয দেখার মর্ম হল বিবাহ হারাম। সুতরাং স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে ঋতুবর্তী হয়েছে তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে, সে কোন হারাম কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আর যদি কোন মহিলা স্বপ্নে নিজেকে ঋতুবর্তী দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে যে তার ব্যাপারটি রহস্যজনক। আর স্বপ্নে গোসল করতে দেখলে তার ব্যাখ্যা হবে তার পেরেশানী দূর হবে। স্বপ্নে কোন মহিলা দেখল যে তার ইস্তিহাযার (অনিয়মিত রক্তস্রাব) রক্ত বের হচ্ছে, তাহলে বুঝা গেল মহিলার অনেক পাপ রয়েছে এবং এ মহিলা তাওবা করার পর তার উপর দৃঢ় থাকে না। যদি কোন পুরুষ স্বপ্নে নিজের হায়েয দেখে তাহলে তার ব্যাপারটি গোপনীয়।

হযরত মূসা ও হযরত ইউশা (আঃ)-এর মাছ

আবু হামিদ আন্দুলুসী বলেন, আমি সাবতা শহরের নিকটে এ মাছের একটি বংশধর দেখেছি। যার কিছু অংশ হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইউশা (আঃ) খেয়েছিলেন এবং অর্ধাংশ আল্লাহ তাআলা জীবিত করেছিলেন। আর সে মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ করে চলে গিয়েছিল। এ মাছের বংশধর আজও সমুদ্রে আছে। এর দৈর্ঘ্য ১ গজ ও প্রস্থে এক বিঘত হয়ে থাকে। এর উভয় পাশে একটি কাটা ও হাড্ডি আছে। এর আতুড়ীতে এক ধরনের পাতলা চামড়া রয়েছে। মাছটির

মাত্র একটি চোখ ও অর্ধমাথা রয়েছে। যদি কেউ একে দেখে তাহলে মৃত মনে করে তাকে ধরবে না অথচ তা জীবিত সম্পূর্ণই তরতাজা। মানুষ এ মাছকে অপয়া মনে করে দূর দূরান্তে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে থাকে। ইবনে আতিয়া (রহ.) এ মাছের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মাছটি জীবিত হওয়ার কারণ হল সেখানে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল। আর সে পানি মাছটির শরীরের সাথে লেগে গিয়েছিল। যেহেতু এ পানির বৈশিষ্ট্য হল যদি মৃত প্রাণী এ পানিতে ছোঁয়া লাগে তাহলে জীবিত হয়ে যায়।

কালবী বলেন, হযরত ইউশী (আঃ) আবে হায়াতের পানি দ্বারা অযু করেছিলেন এবং অযু থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পানি তিনি মাছের উপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এতেই মাছটি জীবিত হয়ে লেজ নাড়তে লাগল কিন্তু লেজ পানিতে নয় শুকনাতেই ছিল। অথচ পানি প্রবাহিত ছিল । সুতরাং সে যখন লেজ নাড়াত তখন পানি শুকিয়ে যেত।

কোন কোন মুফাসসির এর চেয়েও অতি আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করেছেন : যে-স্থান দিয়ে মাছটি পানিতে প্রবেশ করে, সেখানে শুকনো পথ হয়ে গেল। মূসা (আঃ) মাছের পিছনে পিছনে চললেন। যেতে যেতে তিনি একটি দ্বীপে চলে এলেন। ওই দ্বীপে গিয়ে তিনি হযরত খিযির (আঃ)-এর দেখা পেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন : যে পানির ফোঁটা দ্বারা মাছটি জীবিত হয়েছিল, তা ছিল একজন অযুকারীর মুখমণ্ডল ধোয়া অবশিষ্ট পানি। আর ইবাদতে আল্লাহ তাআলা প্রভাব রেখেছেন। তাই তাতে মাছটি জীবিত হয়ে গেল। বিধান আছে, নেককাজ দ্বারা কল্‌ব জিন্দা হয়। আর অযুও একটি নেক কাজ। এজন্য নেক আমলের প্রভাবে মাছটি জীবিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ইউশা (আঃ) যে কষ্ট-চিন্তায় ডুবে ছিলেন, তাদের সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পথ প্রদর্শনও হয়। পেয়ে যান তাঁরা আপন গন্তব্যের সন্ধান।

এমনিভাবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভয়ভীতিতে কম্পমান হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই আল্লাহর যিকির অন্তরে গেঁথে যায়, তখনই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রশান্তি লাভ করে। এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ)-কে সন্ধানে অক্লান্ত কষ্ট স্বীকার করেছেন। অবশেষে একদিন তিনি (মাছটির জীবিত হওয়ার সাথে সাথে) তাঁকে পেয়ে যান। এমনিভাবে ইহকাল ও পরকাল অন্বেষণকারীর উচিত চেষ্টা করতে থাকা। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা থেকে বিরত না হওয়া। কেননা অব্যাহত চেষ্টা-সাধনার ফলে সে সফলকাম হলে তো গনীমত লাভ করবে আর নিহত হলে নসীব হবে শাহাদাতের

সৌভাগ্য। যেমনটি হয়েছে হযরত হুসাইন মনসূর হাল্লাজ প্রমুখের সাথে। ইতোপূর্বে যার বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– মাছের গমন পথ থেকে পানি সরে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) সেই মাছের পিছনে পিছনে গমন করলে হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, মাছটি যতদূর পর্যন্ত গমন করেছিল, সেখানকার পানি জমাট বেঁধে গিয়েছিল। তৈরি হয়েছিল একটি শুষ্ক পথ। অনন্তর হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্ষুধা পেলে তিনি হযরত ইউশা (আঃ)-কে বললেন :

اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

'আমার সামনে আমার নাশতা নিয়ে আস! এ সফরে খুব ক্লান্তি বোধ করছি।' (সূরা কাহ্ফ)

হযরত ইবনে আতিয়া (রহ.) বলেন, জাওহারী তাঁর উপদেশে বলতেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত সফর করেছেন। অথচ তাঁর আহারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই। কিন্তু যখন তিনি একজন মানুষের সন্ধানে বের হলেন, তখনই এক দিনেই ক্ষুধা লেগে গেল। এতে বুঝা যায়, তাঁরা দুজন ছিলেন তালিবে ইলম; জ্ঞানান্বেষী। আর একজন জ্ঞানান্বেষীর বৈশিষ্ট্য হল, সে সর্বপ্রকার কষ্ট-ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করবে। শীত-গরমের তোয়াক্কা করবে না। তার কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা অসম্মান বোধ হবে না। কেননা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য-মর্যাদা ভাল জানেন তার সন্ধানকারীই। আর যে ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, তার জন্য সমস্ত বিপদাপদ, চেষ্টা-সাধনা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহজ হয়ে যায়। আর নিয়মই তা-ই; কাঙ্ক্ষিত বস্তুর গুরুত্ব যত বেশি হবে, তার প্রত্যাশা-অনুসন্ধানও তত বেশি প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মুকাতিল (রহ.)-এর সূত্রে একটি দীর্ঘ কাহিনী ইনশাআল্লাহ ছোয়াদ পরিচ্ছেদে 'সরদ' শিরোনামে বর্ণনা করা হবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাছের জীবিত হওয়ার ঘটনাটি দুই দরিয়ার মোহনায় সংঘটিত হয়েছিল। এ দরিয়া দুটি নির্ণয়ে মুসাফিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এর মতে ঘটনাটি ঘটেছিল পারস্য সাগর ও রোম সাগরের পূর্ব দিকে। সেখানে এদুটি সাগর পরস্পরে মিলিত হয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে এ ঘটনা ঘটেছিল জর্ডান সাগর ও লোহিত সাগরের মোহনায়। আবার কার কার মতে এ দু'সাগর দ্বারা পশ্চিম সাগর ও যিকাক সাগর উদ্দেশ্য। বাকি দু' সাগরের মোহনায় হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার রহস্য কী? এর রহস্য হল, তাঁরা দুজন ছিলেন

জ্ঞানসমুদ্র। একজন ইলমে জাহিরি অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন ইলমে শরীয়তের সমুদ্র আর হযরত খিযির (আঃ) ছিলেন বাতেনি ইলম বা আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বজগতের নানা রহস্যজ্ঞানের সমুদ্র। সুতরাং এ দুই জ্ঞানসমুদ্রের দুই প্রাকৃতিক সমুদ্রের মোহনায় একত্র হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

জ্ঞাতব্য

প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আঃ) মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত খিযির (আঃ)-এর চেয়ে বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে (হযরত খিযির (আঃ)-কে) তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, যাবৎ না তিনি হযরত খিযির (আঃ) ব্যতীত সকল কিছু থেকে পৃথক হয়েছেন। সত্যান্বেষী মাওলাপ্রেমিক বান্দার অবস্থাও এমনই হয়। সে আপন মাওলার সান্নিধ্য ও ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে পারে না, যাবৎ না গাইরুল্লাহ তথা এক আল্লাহ ভিন্ন সবকিছু থেকে পৃথক ও নীর্জনতা অবলম্বন করে। সুতরাং শাইখ শিবলী (রহ.) বলেন :

انفرد بالله حتى تكون مجردا عن الاغيار وتكون واحدا للواحد فردا للفر

"আল্লাহ তাআলার সাথে সর্বাত্মক একাকিত্ব অবলম্বন কর! যেমনি অচেনা সকল লোক থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর আল্লাহ তাআলার জন্য একদম নিঃসঙ্গ হয়ে যাও। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেমনি এক ও একক, তেমনি মানুষকেও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে হলে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একাকী হয়ে যেতে হবে।"

ইমাম তাজ উদ্দীন সিকান্দরী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের বর্তমান সময়ে ভবিষ্যতের জন্য নিঃসঙ্গ হয়ে গেল অর্থাৎ আজকের কাজটি যে আগামী কালের জন্য ছেড়ে দিল, 'আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিও না'— উপদেশটির প্রতি কর্ণপাত করল না, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আপন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আগামী দিনের কাজটি আজই করে ফেলল, সে আপন উদ্দেশ্যে পূর্ণ কৃতকার্য হল। এরপর তিনি এ কবিতা পাঠ করেন :

لا كنت ان كنت ادرى كيف الطريق اليك

আমি জেনেও না জানার ভান করলাম যে, তোমার নিকট যাওয়ার পথ কোন্‌টি?

افنيتنى عن جميعى فكنت سلم يديكا

তুমি আমার অন্তরের প্রশান্তি বিনষ্ট করে দিয়ে।
এখন আমি তোমার হাতে বন্দি হয়ে গেলাম।

হযরত শাইখ জুনাইদ (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বান্দা কখনও নিঃসঙ্গ ও পৃথক হয়ে যায়? তখন তিনি বললেন, যখন সে তার সমস্ত অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় বিপরীত বস্তু থেকে অবশ্যই বিরত রাখে এবং নিজের প্রবৃত্তির সকল তাড়নাকে বিলীন করে দেয়, তখনই সে তার প্রভুর দরবারে নির্বাচিত বান্দা হিসেবে গণ্য হয়। এমনিভাবে তার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর বিবেচনা ও পরিচিতি থাকে না। জনৈক কবি এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন :

وعن فنائى فنى فنائى وفى فنائى وجدت انتا

আমি তো নিঃশেষ হয়ে গেলাম। সঙ্গে আমার নাম ও সত্তা দুটোই নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু সর্বসান্ত হওয়ার পরে পেলাম আমি তোমাকে।

فى مهو اسى ورسم جسى سألت عنى ثقلت انتا

এরপর আমি যখন আমার বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, উত্তর পেলাম তোমার বিষয়েই।

اشار سرى اليك حتى فنى فنائى ودمت انتا

আমার অনুরাগ শুধু তোমার দিকেই ইঙ্গিত করে অর্থাৎ আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমাস্পদ ছিলে সর্বদা তুমিই। অবশেষে আমি হলাম নিঃশেষ আর থাকলে শুধু তুমি।

انت حياتى وسر قلبى فحيث ما كنت كنت انتا

তুমিই আমার জীবন! তুমিই আমার অন্তঃপ্রাণ! তাই যেখানেই আমি, সেখানেই থাক তুমি।

হযরত খিযির (আঃ)-এর নাম

হযরত খিযির (আঃ)-এর নামের ব্যাপারে কঠোর মতভেদ রয়েছে। সুতরাং কোন কোন মনীষী বলেন, তাঁর নাম বালিয়া ইবনে মিলকান ইবনে কানে' ইবনে সালেহ ইবনে ইরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)। এ মতটি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.)-এর। কোন কোন মনীষী বলেন, তাঁর নাম ইলিয়া ইবনে গামিল ইবনে শামালখীন ইবনে আরমা ইবনে আলকামান ইবনে ঈসু ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আঃ)। ইমাম সালাবী (রহ.) এ বিষয়ে বলেন, তাঁর নাম আরমিয়া ইবনে হালকিয়া ইবনে সাবত হারুন (আঃ)। তিনি হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, তাঁর বিশুদ্ধ নাম সেটিই, যা সকল ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। যেমন আল্লামা বাগাভী (রহ.) বলেছেন, তাঁর নাম বালিয়া ইবনে মিলকান।

তার নামের ব্যাপারে যেমনি মতভেদ রয়েছে, তেমনি তাঁর বংশধারা সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তিনি বনী ইসরাঈলের লোক। আবার কেউ বলেন তিনি একজন শাহজাদা রাজবংশধর। তাঁর উপাধি ছিল আবুল আব্বাস।

ইতিহাসবিদ সুহাইলী বলেন, তাঁর পিতা ছিলেন একজন বাদশাহ। তাঁর মায়ের নাম উলুহা। তিনি হযরত খিযির (আঃ)-কে এক গুহায় প্রসব করেছিলেন। ওই গুহাতে এক গ্রাম্য লোকের বকরীর পালের একটি বকরী এসে তাঁকে প্রত্যহ দুধ পান করাত। কেননা তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাঁর মা তাকে সেখানে রেখে চলে আসেন। পরে ওই গ্রাম্য লোকটি জানতে পেরে তাঁকে গুহা থেকে তুলা এনে লালন পালন করেন। তিনি যখন যুবক, তখন তাঁর পিতা তৎকালীন বাদশাহর হযরত শীষ (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সহীফা লেখার জন্য একজন লিপিকারের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং অনেক জ্ঞানীগুণী লেখক সে আশায় বাদশাহর নিকট এলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত খিযির (আঃ)-ও ছিলেন। বাদশাহ খিযির (আঃ)-কে ঘুণাক্ষরেও চিনতেন না। তিনিও বাদশাহকে চিনতেন না। কোন লোকও জানত না যে, ওনি একজন শাহজাদা। বাদশাহ তাঁর হাতের লেখা বেশি পছন্দ করলেন। তাই তাকে লিপিকার হিসেবে নিয়োগ দানের পূর্বে বাদশাহ তাঁর বংশমর্যাদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার আদেশ করলেন। যখন বাদশাহর উপরেই তাঁর জন্মের গোপন রহস্য উন্মোচিত হল এবং জানা গেল, হযরত খিযির (আঃ) তাঁরই ঔরসজাত সন্তান, তখন বাদশাহ অত্যন্ত খুশি হলেন; তাঁকে নিজের বুকে জড়ালেন। অনন্তর তাঁকে প্রজাদের কার্যনির্বাহী পদে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যান এবং নির্বাসিত জীবন বেছে নেন। এ অবস্থায় তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে একদিন তিনি আবে হায়াত[১]

---

[১] আবে হায়াতের অস্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না বরং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবে-আয়াতের চিন্তার বিরোধী। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

كل نفس ذائقة الموت 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 'আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে স্থায়ী জীবন দান করি নাই।' অন্যত্র আরো ইরশাদ করেছেন :

كل شيئ هالك الا وجهه 'তোমার সত্তা ব্যতীত সকল বস্তুই ধ্বংসশীল।' এসব আয়াতের মর্ম হল, কাউকেই চিরস্থায়ী-চিরন্তন জীবন দান করা হয় নাই। সকলেরই চূড়ান্ত নিয়তি ধ্বংস-লয়। এসব আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষকগণ বলেন : জান্নাত-জাহান্নামেরও ধ্বংস অনিবার্য। অবশ্য ধ্বংসের পর তা পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন : "এখন যারা জীবিত, তারা 'করন' তথা শতাব্দির শেষ পর্যন্ত বাকি থাকবে না।"

সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে উম্মতের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এমনকি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হযরত খিযির (আঃ)-এর চিরস্থায়ী জীবন লাভের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

বাকি কারও দীর্ঘ জীবন লাভ সম্ভব। স্বয়ং হযরত নূহ (আঃ) প্রায় এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তা-ই বর্ণিত আছে। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ের মানুষের গড় আয়ু কম। নবী করীম (সাঃ) তো স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন : 'আমার উম্মতের গড় আয়ু হবে ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি'।

তথা প্রাণসঞ্জীবনী ঝর্ণার পাশে এসে পৌছান। ওই ঝর্ণার পানি পান করে তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন। তাই তিনি বর্তমানেও জীবিত আছেন। তিনি দাজ্জাল বের হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব। দাজ্জাল তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলবে। আল্লাহর আদেশে তিনি পুনরায় জীবিত হবেন। 'সীন' পরিচ্ছেদে 'সাআদাত' শিরোনামে 'ইবতিলাউল আখইয়ার' গ্রন্থকারের উদ্ধৃতিতে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করব যে, হযরত খিযির (আঃ) যুল-কারনাইনের খালাত ভাই ছিলেন।

তাঁকে কেন 'খিযির' বলা হত, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ও ঐতিহাসিক বলেন : তিনি যে স্থান দিয়ে হেঁটে যেতেন, সেটি সবুজ-শ্যামল হয়ে যেত। তাই তাঁকে 'খিযির' বলা হত। কারও কারও মতে তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর আশপাশ সবুজ হয়ে যেত। তবে আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

তাঁর 'স্থায়ী জীবন' লাভের বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ইমাম মুহীউদ্দীন নববী (রহ.)-সহ জমহূর উলামায়ে কিরামের মতে তিনি এখনও জীবিত আছেন। সকল আলেম ও সূফী-দরবেশ এরই প্রবক্তা। আলেমদের থেকে হযরত খিযির (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রশ্নোত্তর এবং পবিত্র স্থানে তাঁর উপস্থিতির অনেক বর্ণনা ও উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে। শাইখ আবু আমর ইবনে সালাহ বলেন, হযরত খিযির (আঃ) সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের সাথে থাকেন। তিনি জীবিত আছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের অভিমত এটাই। অবশ্য কেউ কেউ তাঁর জীবিত থাকার বিষয়ীট অস্বীকার করেনে।

ইবনুল মুনাদির মতে কোন হাদীস দ্বারাই তাঁর জীবিত থাকার কথা প্রমাণিত নাই। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আবু বকর ইবনেন আরাবী (রহ.) বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর—'প্রথম শতাব্দির মধ্যে তোমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করবে' বাণীর মর্মানুযায়ী—উক্ত শতাব্দি শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ.)-এর নিকট একবার কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত ইলিয়াস ও হযরত খিযির কি জীবিত আছেন? জবাবে তিনি বললেন, তা

এমনিভাবে হযরত খিযির (আঃ)-এর 'দীর্ঘ জীবন লাভ' তো এমনিতেই বিতর্কিত। কুরআন-হাদীসের কোন ইশারা-ইঙ্গিতের ভিত্তিতে এমন দীর্ঘ জীবন লাভ সমর্থন করা যায় না। এ বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর গবেষণাটি চমৎকার। তিনি বলেন, আসলে 'খিযির' একটি পদমর্যাদা। যেমন– কুতুব, গাওস, আবদাল, মাজযুব প্রভৃতি। সুতরাং এসব ব্যক্তি তো চলে যান; কিন্তু তাঁদের স্থলে অন্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই বলা যায়, 'আবে হায়াত'-এর চিন্তাধারা ইসলামি জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারের কোথাও বিদ্যমান নাই।

কী করে সম্ভব! অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'আজ যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠে আছে, দ্বিতীয় শতাব্দির প্রারম্ভে সে অবশিষ্ট থাকবে না।'

বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য অভিমত হল, হযরত খিযির (আঃ) এখনও জীবিত আছেন। সুতরাং কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় হযরত খিযির (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গোসল দেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি আহলে বাইতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.)-এর রচিত 'তামহীদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গোসল দান এবং কাফন পরানোর সময় সাহাবায়ে কেরাম অদৃশ্য কার মুখে শুনছিলেন– 'ওহে গৃহবাসী! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যেক ধ্বংসশীলের কোন স্থলাভিষিক্ত রয়েছে। প্রতিটি হারানো বস্তুর তিনিই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর তিনিই প্রতিটি দুঃখ-বিপদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকেন। তাই আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন এবং ধৈর্যের মাধ্যমে প্রতিদান লাভ করুন।'

তারপর তিনি আহলে বাইতের জন্য দুআ করেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথার আওয়াজ শুনলেন বটে; কিন্তু তাঁকে তাঁরা দেখতে পেলেন না। তখন সকল সাহাবী ও আহলে বাইত বুঝতে পারলেন, নিশ্চয় এ আওয়াজ হযরত খিযির (আঃ)-এর ছিল।

হযরত সুহাইলী (রহ.) বলেন : কোন কোন লোকের ধারনা মতে 'খিযির' বলে হযরত আরমিয়া (আঃ) উদ্দেশ্য। পূর্বে যার কথা বলে এসেছি। কিন্তু ইমাম জারীর ইবনে আত-তাবারী (রহ.) এ অভিমতকে ভুল বলেছেন। তিনি এর ভ্রান্তির উপর অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। সে আলোচনা বেশ দীর্ঘ। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সঙ্গী হযরত ইয়াসা ছিলেন। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্য কথা বলেছেন নাক্কাশ। তিনি বলেন, হযরত খিযির (আঃ) ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের ফিরাউনের পুত্র।

এখন বাকি রইল তাঁর নবুওয়াতের বিষয়টি। এ বিষয়েও বেশ মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কুশাইরীসহ অধিকাংশ আলেম বলেন: হযরত খিযির (আঃ) নবী নন; তিনি ছিলেন একজন অলী। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি নবী ছিলেন। ইমাম নববী (রহ.) এ মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম মাওরিদী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ৩টি অভিমত উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) তিনি নবী। (২) তিনি অলী। (৩) তিনি একজন ফেরেশতা। অবশ্য এ তৃতীয় অভিমতটি অভিনব ও পরিত্যাজ্য।

ইমাম মাওরিদী (রহ.) বলেন : হযরত খিযির (আঃ)-এর নবুওয়াতের

ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ তাঁকে একজন নবী, আবার কেউ অলী বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশের অভিমত হল, তিনি নবী। ইমাম মাওরিদী (রহ.) স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত وما فعلته عن امرى—'আমি এ কাজটি স্বেচ্ছায় করি নি'—দ্বারা দলীল পেশ করেন। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি একজন নবী ছিলেন। তিনি যা কিছু করেছেন, সব ওহীর মাধ্যমেই করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, তাঁর উপর ওহী নাযিল হত। দ্বিতীয়ত অলীর তুলনায় নবীর জ্ঞান বেশি থাকে।

পক্ষান্তরে তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারীগণ এ দলীল প্রত্যাখ্যানে এক অর্থহীন অস্পষ্ট দলীল পেশ করেন। তারা বলেন, সে-সময় সম্ভবত আল্লাহ তাআলা নবীকে আদেশ করেছিলেন, আপনি হযরত খিযিরকে বলে দিন! তিনি যেন এরূপ করেন। কিন্তু তাদের এ কথার কোন সনদ বা দলীল- প্রমাণ নেই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের যুগে অন্য কোন নবীও বিদ্যমান ছিলেন। কেননা তখনও হযরত ইউশা (আঃ)-কে নবুওয়াত দান করা হয় নাই। উপরন্তু হযরত ইউশা (আঃ)-ও হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। আর তিনিই মূসা (আঃ)-কে মাছটি সমুদ্রে প্রবেশের সংবাদ প্রদান করেছিলেন। তাঁর (হযরত ইউশা (আঃ)-এর) নবী হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ইমাম সালাবী (রহ.) বলেন, তিনি নবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর পরে প্রেরণ করেছেন। তিনি এখনও জীবিত। অবশ্য অধিকাংশ লোকের দৃষ্টির অন্তরালে। কথিত আছে, তাঁর ইন্তেকাল হবে অন্তিম সময়ে; যখন পবিত্র কুরআন পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে।

জ্ঞাতব্য

হযরত খিযির (আঃ)-এর নিকট থেকে হযরত মূসা (আঃ) বিদায় গ্রহণের সময় হযরত খিযির (আঃ) তাঁকে বললনে, হে মূসা! আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলে আরও বিস্ময়কর এক সহস্র ঘটনা অবলোকন করতে পারতেন। এ কথা শুনে হযরত মূসা (আঃ) কেঁদে ফেললেন এবং হযরত খিযির (আঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সুতরাং হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে নিম্নলিখিত উপদেশগুলো প্রদান করেন :

(১) আপনি পরকালের চিন্তা করবেন। কোন নিরর্থক বিষয়ের অনুসন্ধানে পড়বেন না।

(২) নিরাপদ থাকার সময় ভয়কে ভুলবেন না। আর ভয়ের সময় নিরাপত্তা থেকে নিরাশ হবেন না।

(৩) গোপন বিষয়ে ভেবে-চিন্তে কাজ করবেন। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দয়া-অনুগ্রহ করা ছেড়ে দিবেন না।

(৪) কখনও অক্ষমতা প্রদর্শন করবেন না, কখনও প্রয়োজন ব্যতিরেকে ভ্রমণ করবেন না এবং অত্যাশ্চার্য কথার শেষ না শুনেই হাসবেন না।

(৫) অপরাধীরা নিজের অপরাধের কারণে লজ্জিত হলে তাদেরকে লজ্জা দিবেন না। আর কদাচ আপনার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে হে ইবনে উমর! তজ্জন্য আপনি অনুতাপের অশ্রু বর্ষণ করুন।

তারপর মূসা (আঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি তার নিয়ামত পূর্ণ করে দিন, আপনার বয়সকে তার আনুগত্যে পূর্ণ করুন এবং দুশমন থেকে আপনাকে হিফাযত করুন। এরপর হযরত খিযির (আঃ)-ও হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেন, আপনিও আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলো প্রদান করেন :

(১) রাগ-ক্রোধ পরিহান করুন। একান্তই কারও উপর রাগ করলে কেবলই মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে ক্রোধ ও শক্তি দুটোই প্রয়োগ করবেন। এ ব্যাপারে কোন ছাড় দিবেন না।

(২) আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে আশ্রয়প্রার্থী হবেন না।

(৩) দুনিয়াকে ভালবাসবেন না আবার এর উপর বিরাগও হবেন না। কেননা এরূপ করলে মানুষ ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কুফরে প্রবেশ করে।

তারপর হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে অমূল্য দুআ দিলেন। বললেন– আল্লাহ তাআলা তার আনুগত্য প্রদর্শনে আপনাকে সাহায্য করুন! আপনার সকল বিষয়ে আপনাকে আনন্দ ও প্রশান্তি দান করুন! সৃষ্টিকূলের অন্তরে আপনার ভালবাসা সৃষ্টি করুন! আপনাকে তার অনুগ্রহে অভিষিক্ত করুন। হযরত মূসা (আঃ) এ দুআর সঙ্গে সঙ্গে আমীন বললেন।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত পূর্ণ বর্ণনাটিই সুহাইলীর। আল্লামা বাগাভী (রহ.) বলেন : হযরত মূসা (আঃ) যখন হযরত খিযির (আঃ)-এর সান্নিধ্য থেকে চলে আসার ইচ্ছে করলেন, তখন হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন– 'শুধু মানুষের সম্মুখে বয়ন করার জন্য ইল্‌ম অর্জন করবেন না বরং আমলের জন্য ইল্‌ম অর্জন করবেন'।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘটনা

আবু বকর ইবনে আবিদ্ দুনিয়া রচিত 'আল-হাওয়াতিফ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে একবার হযরত খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত খিযির (আঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে একটি দুআ শিক্ষা দিয়ে বলেন, এ দুআর বিরাট মাহাত্ম্য আছে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ দুআটি পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত নাযিল করবেন। দুআটি হল :

يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا تعظله المسائل ويا من لا يبرمه الحاح الملحمين اذقنى برد عفوك وحلاوة رحمتك

একটি আশ্চর্য ঘটনা

খতীবে বাগদাদী হাফিয আবু বকর (রা.) তাঁর 'আল-মুত্তাফিকু ওয়াল মুতফারিকু' গ্রন্থে হযরত উসামা ইবনে যায়িদ তানুখী-এর জীবনীতে লিখেছেন, তিনি খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক এবং তারপরে হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক-এর পক্ষ থেকে মিসরের গভর্নর ছিলেন।

খতীব লিখেন, আলেকজান্দিয়া শহরে 'শারাহিল' নামে একটি মূর্তি ছিল। মুতিটি স্থাপিত ছিল একদম সমুদ্রের তীরে। ওই মূর্তির একটি আঙুল কুস্তুনতুনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করছিল। কারও জানা ছিল না মূর্তিটি হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর যুগের, নাকি বাদশাহ ইসকান্দারের সময়কার? মূর্তিটির নিকট প্রচুর মাছ একত্র হত। মানুষ তা সহজেই শিকার করে নিয়ে যেত। মূর্তিটি অনেক উঁচু ছিল। একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাত উত্তোলন করলে সেটির সমান হত। সুতরাং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান-এর নিযুক্ত মিসরের গভর্নর উসামা ইবনে যায়িদ তানুখী ওয়ালিদকে লিখলেন : আমীরুল মুমিনীন! আমাদের এ আলেকজান্দিয়ায় সমুদ্রের তীরে স্থাপিত একটি মূর্তি রয়েছে। মানুষ একে 'শারাহিল' বলে। মূর্তিটি তামার তৈরি। এদিকে আমাদের নিকট মুদ্রা সংকট রয়েছে। যদি আমীরুল মুমিনীন অনুমতি দেন, তাহলে আমরা মূর্তিটি তুলে এনে মুদ্রা তৈরি করতে পারি। আপনার মতামত জানাতে স্ববিনয় অনুরোধ করছি। খলীফা ওয়ালিদ লিখলেন– তুমি সেই মূর্তিটি উঠাবে না, যাবৎ না আমি তোমার নিকট কোন নিরীক্ষক প্রেরণ করি। সুতরাং খলীফা ওয়ালিদ সেখানে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লোক পাঠালেন। তারা মূর্তিটি সমুদ্র তীর থেকে তুলে এনে সেটির ইয়াকূত পাথরের তৈরি দুটি চোখ উঠিয়ে ফেলেন। উক্ত ইয়াকূত পাথর দুটি ছিল নেহাৎ মূল্যবান। এর মূল্য কেউই অনুমান করতে পারে নাই। মূর্তিটি সমুদ্র তীর থেকে সরাতেই সেখান থেকে মাছও চলে গেল। এরপর সেখানে আর কোন দিন কোন মাছ দেখা যায় নি। অথচ সেখানে সর্বদা প্রচুর মাছ থাকত। সেগুলো খালি হাতেই ধরা যেত।

২৪১. الحوشى (আল-হূশী) বন্য উট

الحوشى : (আল-হূশী/বন্য উট) বল হয়, 'ওয়াহ্শী' (وحشى) শব্দটি حوش-এর সাথে সম্পর্কিত। 'হুশ' বলা হয়, জিনদের ষাঁড়কে। আরবদের ধারণামতে এ ষাঁড় কোন কোন উটনীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেছিল। এজন্য এর বংশধর তার সাথে সম্পর্কিত।

২৪২. الحوصل (আল-হুছাল) বৃহৎ এক পাখি

এ পাখির পাকস্থলি বেশ বড় হয়ে থাকে। এর পালক দ্বারা পোশাক তৈরি হয়। এর বহুবচন حواصل (হাওয়াছিল)।

ইবনে বায়তার বলেন, এ পাখিগুলো সাধারণত মিসরে বেশি দেখা যায়। بجع (বুজা) ও جمل ما (জামালে মা') ইত্যাদি নামেও এদের ডাকা হয়। এটা সাদা ও কালো হয়। কালোগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও ব্যবহার অনুপযোগী। কিন্তু সাদাগুলো খুব ভাল। এদের মধ্যে উষ্ণতা কম; শীতলতা বেশি। এদের বয়স খুব কম হয়। খিটখিটে মেজাযের লোকদের জন্য এ পাখি ব্যবহার খুবই উপযোগী। যুবকদের জন্য এর ব্যবহার খুবই ফলদায়ক।

উপরিউক্ত অভিমত ইবনে বেতারের। তবে জনশ্রুতি এর বিপরীত। তাদের মতে এগুলো অত্যন্ত উষ্ণ। ভেড়া ও শৃগালের চেয়েও এগুলো বেশি গরম। এদের পাকস্থলী মানুষের পাকস্থলীর মত হয়ে থাকে।

এ পাখির শরঈ বিধান

এ পাখি খাওয়া জায়িয। যেমনটি ইমাম রাফেয়ী প্রমুখের অভিমত। মূলত এ পাখি গৃহপালিত হাঁসের মতই। আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন : আমি মদীনা তাইয়িবায় এ পাখি দেখেছি। এদের মধ্যে একটি অনেক বছর পর্যন্ত মদীনার নালা-খন্দকে ঘুরাফিরা করত।

২৪৩. الحلان (আল-হুলান) বকরীর পেটে প্রাপ্ত ছানা

আসমাঈ বলেন, ছোট বকরীকে 'হুলান' বলা হয়। কিন্তু ইবনে সাকীত বলেন, 'হুলান' কুরবানীতে জবাইযোগ্য বকরীর বাচ্চাকে বলা হয়।

হাদীসে হুলানের উল্লেখ

হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) গাভিন এক বকরীর ব্যাপারে মীমাংসা দিয়েছিলেন—বকরীটিকে জনৈক মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করেছিল—তিনি এর মীমাংসায় একটি বকরী ক্ষতিপূরণ আদায় করান।

হযরত উসমান (রাঃ) এমনভাবে জবাই করেন, যেমনি বকরীর পেটে থাকা বাচ্চাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে জবাই করা হয় অর্থাৎ এর রক্ত বকরীর বাচ্চার রক্ত থেকেও অধিক মূল্যহীন ও সস্তা মনে করা হয়েছে। এর শরঈ বিধান ইনশাআল্লাহ সামনে বর্ণনা করা হবে।

২৪৪. حيدرة (হায়দারাহ) বাঘ

'হায়দারাহ'—এটি বাঘের অন্যতম একটি নাম।

হাদীসে বাঘের আলোচনা

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) সালমাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : খায়বার যুদ্ধে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) সে-সময় চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন– আগামীকাল আমি যুদ্ধের পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অতি প্রিয় এবং তাঁর রাসূলেরও প্রিয়। আর সে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসা রাখে। এরপর আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। হযরত আলী (রাঃ) কঠিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত থাকায় একা একা কোথাও যেতে পারতেন না। এজন্য আমি হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মুখের পবিত্র লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ ভাল হয়ে গেল। আর যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি তিনি তাঁর হাতে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন: ইয়াহুদীদের পক্ষে 'মারহাব' নামে এক বীর নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতে করতে হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মোকাবেলার জন্য বেরিয়ে এল :

قد علمت خيبر انى مرهب شاكى السلاح بطل مجرب

খায়বারবাসী জানে আমি বীর 'মারহাব', যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধবাজ।

اذ الحرب اقبلته تلتهب

যখন যুদ্ধ শুরু হয় আর স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে, আমিও সামনে অগ্রসর হই।

হযরত আলী (রাঃ)-ও তার জবাবে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতে করতে সামনে অগ্রসর হলেন :

انا الذى سمتنى امى حيدرة كليث غابات كريهه المنظر

আমি সেই ব্যক্তি, মা যার নাম রেখেছেন 'হায়দার'। আমি তো ঝোপের সেই বাঘের সম, যাকে দেখতেই মানুষ কাঁপতে থাকে।

اكيلهم بالسيف كيل السندرة

আর আমি তরবারি উঁচিয়ে বজ্রের মত শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

একথা বলেই হযরত আলী (রাঃ) মারহাবের উপর আক্রমণ করলেন। মারহাবের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জয় হল খারবার। সুহাইলী বলেন, কাসেম ইবনে ছাবিত 'হায়দার' নামকরণের তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যথা–

(১) প্রাচীন গ্রন্থসমূহে হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম 'আসাদ' লেখা ছিল। শের আসাদ ও হায়দার বাঘের জন্য সমার্থবোধক শব্দ। এজন্য তাঁকে 'হায়দার' বলা হয়।

(২) তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর পিতা (আবু তালিব) গৃহে ছিলেন না। তখন তাঁর মা ফাতেমা বিনতে আসাদ তাঁর (আলীর) নাম রাখেন তাঁর পিতার নামে। এরপর তাঁর পিতা এসে তাঁর নাম রাখেন 'আলী'।

(৩) বাল্যকালে তাঁর উপাধি ছিল 'হায়দার'। কারণ, তাঁর শরীর বাঘের মত সুঠাম আর উদর বড় ছিল। এজন্য তাঁকে 'হায়দার' বলে ডাকা হত। এ কারণে এক চোর হযরত আলী (রাঃ)-এর নাফে নামক বন্দিখানা থেকে পলায়ণকালে বলছিল—

ولو الى مكثت لهم قليلا لجرونى لحيدرة البطين

✪ আমি তাঁর বন্দিখানায় আরও কিছুদিন থাকলে অবশ্যই সে আমাকে ধরে নিয়ে সেই স্থূলোদর (পেটুক বাঘের) সম্মুখে ছুঁড়ে ফেলত।

কথিত আছে, খায়বার যুদ্ধের পূর্বে মারহাব স্বপ্নে দেখেছিল, একটি বাঘ তাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) যখন মারহাবের সম্মুখে তেজদীপ্ত সেই কবিতাটি পাঠ করেন, তখন তার সেই স্বপ্ন স্মরণে পড়ল আর সে মৃত্যুর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, এ ঘটনা থেকে একটি মাসয়ালা বের হয়। যুদ্ধের সময় এভাবে বাজি ধরা জায়েয। যে ব্যক্তি বাজি ধরল, সে হত্যা করে ফেললে সাধারণ মুসলমানের তাতে কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং কোন যুদ্ধাংদেহী কাফির জিঘাংসু হলে তার মোকাবেলার জন্য সাড়া দেয়া মুসলমানদের জন্য মুস্তাহাব।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রবিয়ার দু' ছেলে উতবাহ ও শাইবাহ এবং উতবাহর ছেলে ওয়ালীদ যুদ্ধের ময়দানে এসে যুদ্ধের আহ্বান করে। সুতরাং তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনজন আনসার যুবক তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হলেন। উতবাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কারা? তাঁরা তাদের যথাযথ পরিচয় দিলেন। তখন উতবাহ বলল, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা তো শুধু কুরাইশী আত্মীয়দেরকে চাই। একথা শুনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হামযাহ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উবায়দাহ ইবনুল হারেস (রাঃ)-কে যুদ্ধের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং হযরত হামযাহ (রাঃ) উতবাহর সাথে, হযরত আলী (রাঃ) উতবাহর ভাই শাইবার সাথে আর হযরত উবায়দাহ (রাঃ) ওয়ালিদ ইবনে উতবাহর সাথে মোকাবেলা করার জন্য এসে দাঁড়ালেন।

হযরত উবায়দাহ (রাঃ) ও ওয়ালিদের মধ্যে শুধু দু হাতেই যুদ্ধ চলছিল। এতে উভয়ই আহত হয়ে গেল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, উতবাহ ও শায়বাহকে হত্যা করার পর আমরা চাচা-ভাতিজা উভয়ে ওয়ালিদের দিকে দৃষ্টি দিলাম। আমরা তাকেও হত্যা করলাম আর হযরত উবায়দাহকে উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে নিয়ে এলাম। তখন তাঁর জখম থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হযরত উবায়দা (রাঃ) বললেন– হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি কি শহীদ হতে পারব? তিনি বললেন, কেন পারবে না? এ জবাব শুনে হযরত উবায়দাহ (রাঃ) বললেন, হায়! আজ আবু তালিব জীবিত থাকলে নিশ্চয় তিনি আমরা যে সত্যের উপর রয়েছি, তাতে বিশ্বাস করতেন। অধিকন্তু তিনি জানতে পারতেন, তার রচিত কবিতার বিষয়বস্তুর যথার্থ পাত্র আমরাই; তারা নয়। জনাব আবু তালিব উক্ত কবিতায় বলেছিলেন :

ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل

আমি তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) কখনও তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না। হ্যাঁ! তাঁকে তোমরা তখনই ধরতে পারবে যখন আমার লাশ পড়ে যাবে এবং আমি আমার স্ত্রী-সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

এরপর হযরত উবায়দাহ (রাঃ) এ কবিতা পাঠ করলেন :

فان تقطعوا ارجل فانى مسلم ارجى بها عيشا من الله عاليا

যদিও দুশমন কেটে ফেলে আমার পা (কাটুক! তবু চিন্তা নেই)। আমি মুসলমান। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে শ্রেষ্ঠতর জীবন দান করবেন। অর্থাৎ আমি শাহাদাতের আশা পোষণ করি।

والبسنى الرحمان من فضل منه لباسا من الاسلام غطى المساويا

আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ করুণায় আমাকে পরিয়েছেন ইসলামের অমূল্য পোশাক, যা ঢেকে দিয়েছে আমার পাপরাশি।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বর্ণনা করেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবন আব্দুদ যুদ্ধের আহ্বান করতে করতে সামনে অগ্রসর হল। লৌহাবৃত ছিল তার আপাদমস্তক। তার সে আহ্বান চ্যালেঞ্জ করে হযরত আলী (রাঃ) এগিয়ে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার মোকাবেলা করতে চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– সে আমর! কাজেই তুমি বসে যাও। আমর পুনরায় হাঁক ছাঁড়ল, আমার সাথে যুদ্ধ করবে এমন কোন পুরুষ নেই!? সে দম্ভ করে বলতে লাগল, হে মুসলমানেরা! কোথায় গেল এখন তোমাদের দাবিকৃত সেই জান্নাত,

যার সম্পর্কে তোমরা দাবি করতে—'তোমাদের কেউ শহীদ হলে সে সোজা জান্নাত চলে যাবে' ? এখন আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য তোমাদের কেউ বের হচ্ছে না কেন? একথা শুনে হযরত আলী (আঃ) পুনরায় দণ্ডয়মান হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার পূর্বের কথা বলে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। তৃতীয়বারও আমর চ্যালেঞ্জ করল এবং উচ্চ কণ্ঠে কবিতা পাঠ করল। হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় দাঁড়ালেন। নিবেদন করলেন, হোক না সে আমর! আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মোটেও গ্রাহ্য করবেন না। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শুধু অনুমতি দিন। সুতরাং এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে মোকাবেলার অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পেয়েই হযরত আলী (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। বিদ্যুৎ বেগে মোকাবেলার জন্য পৌঁছে গেলেন আমরের নিকট। আমর জিজ্ঞাসা করল, বালক তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব। আমর বলল, ভাতিজা! তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার নিকটাত্মীয় বয়সে বড় অন্য কাউকে চাই। কেননা তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে আমার খুব খারাপ লাগবে। হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে আমার তো মোটেও খারাপ লাগবে না। একথা শুনে আমর ক্রোধে লাল হয়ে গেল। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে খাপ থেকে তরবারি বের করল। তরবারিটি অগ্নিশিখার মত চমকাচ্ছিল। এরপর সে বালিঝড়ের মত হযরত আলীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তঁঅকে আক্রমণ করে বসল। হযরত আলী (রাঃ) তার এ আক্রমণ ঢালের সাহায্যে প্রতিহত করলেন। কিন্তু আক্রমণ ছিল তীব্রতর। এতে ঢাল ভেদ করে তরবারি ঢুকে গেল। হযরত আলী (রাঃ) মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। এবার শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) তার উপর পাল্টা আক্রমণ করলেন। তাঁর অব্যর্থ আক্রমণে যুলফিকারের প্রচণ্ড আঘাত চরমাকর ধারণ করল। দুই টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আমর। তখন ধূলিঝড় চলছিল। বিধায় যুদ্ধের এ ভয়াবহ দৃশ্য কেউ দেখতে পেল না। হযরত আলী (রাঃ) 'আল্লাহু আকবার' বজ্র ধ্বনি দিলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর আর কাফিরদের গর্ব নিহত হয়ে গেছে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রাঃ) আমরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : اليوم برز الايمان كله للشرك كله—'আজ ঈমানের অবয়ব (আলী) কুফরের অবয়ব (আমর)-এর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নেমেছে'।

হযরত আলী (রাঃ)-এর তরবারির নাম ছিল 'যুলফাকার'। কারণ, এ

তরবারিটির মধ্যভাগে কিছু চিহ্ন ছিল। আসলে তরবারিটি ছিল মুনাব্বিহ ইবনে হাজ্জাজের। বদর যুদ্ধে এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাগে পড়েছিল। তিনি তা হযরত আলী (রাঃ)-কে দান করেছিলেন। তরবারিটি কা'বা ঘরের নিকট লুকায়িত গুপ্ত ধনের লোহা দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। যা বনু জুরহাম বা কার গুপ্তধনের সাথে এসেছিল। আমর ইবনে মা'দিকারব-এর তরবারিটিও ছিল এ লোহার তৈরি।

পরিশিষ্ট

অগ্রসেনাদল বা সেনাপতির উচিত নিম্নলিখিত পাশবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া । মনোবলে বাঘের মত দুরন্ত হওয়া। কখনও মনোবল না হারানো। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না পালানো। আত্মগরীমায় চিতা বাঘের মত হওয়া। কেননা চিতা বাঘ কখনও শত্রুর সামনে মাথা নত করে না। সাহসিকতায় হবে ভাল্লুকের মত। কেননা ভাল্লুক তার শত্রুকে সর্বাঙ্গে আক্রমণ করে। আক্রমণে হবে শূকরের মত। কেননা শূকর আক্রমণ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। ত্রাস সৃষ্টি করবে সিংহের মত। কেননা সে এক পথে ব্যর্থ হলে তৎক্ষণাত অন্য পথে আক্রমণ করে। হাতিয়ারের ভার বহনে হবে পিপীলিকার তো। কেননা সে নিজের ওযন বা বহনক্ষমতার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি ভারি মালামাল বহন করে। দৃঢ়পদতায় হবে পাথরের মত। পাথর কখনও স্বস্থান থেকে একচুলও নড়ে না। বিশ্বস্ততায় হবে কুকুরের মত। কুকুর তার প্রভুর জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতেও পিছপা হয় না। ধৈর্যস্থৈর্যে হবে গাধার মত। স্থান চেনায় হবে মোরগের মত। সে কখনও নিজের স্থান ভুলে না। সংরক্ষণে হবে সারসের মত। পরিশ্রমে হবে ভীমরুলের মত। অবশ্য ভীমরুল একটি ক্ষুদ্র প্রাণী।

২৪৫. الحيرمة (আল-হায়রামা) গাভী

الحيرمة : (গাভী) এর বহুবচন আসে (الحيرمة) 'হায়রাম'। যেমন, ইবনে আহমার তার কবিতায় বলেছেন : تبدل أدما من ظباء وحيرما — 'হরিণের চামড়া হয়ে যায় গাভীর চামড়া'।

২৪৬. الحية (আল-হায়য়াত) সাপ

'আল-হায়য়াত' ইসমে জিন্‌স। স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের উভয়ের উপর এর প্রয়োগ হয়। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করত্যে এভাবে ব্যবহার করা হয়— هذا حية ذكر وهذا حية انثى। ব্যাকরণবিদ মাবরাদ তাঁর 'আল-কামিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : এতে 'ت'টি জিন্‌স বা শ্রেণী বুঝানোর জন্য। যেমন,

دجاجة এবং বাত্ততা بطة-এর মধ্যে। অবশ্য কোন কোন আরবলোক থেকে এর ভিন্ন ব্যবহারও বর্ণিত রয়েছে। তারা বলেন : رأيت حيا على حية—'আমি একটি সর্পকে সর্পিণীর উপর দেখেছি। 'হাইয়াত' (حية)-এর সাথে সম্বন্ধসূচক ব্যবহারে 'হাইয়াওয়ী' (حيوى) আসে। 'হাইয়াত' (حيات) -এর পুংলিঙ্গের জন্য 'হায়াওয়াত' (حيوت)-ও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আসমায়ীর কবিতায় :

ويأكل الحية والحبوتا ويخنق العجوز او تموتا

'সাপ তো মাছ খায়; কিন্তু বৃদ্ধকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে ফেলে।'

ইবনে খালুয়াই বলেন : আরবী ভাষায় সাপের একশত নাম রয়েছে। সুহাইলী মাসঊদী থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা সাপকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রেরণকালে সর্বপ্রথম সিজিস্তানে প্রেরণ করেন। এজন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় আজও সিজিস্তানে সাপ অনেক বেশি পাওয়া যায়।

যদি আরবাদ অর্থাৎ বিভিন্ন সাপখেকো একপ্রকার সাপ না থাকত, তাহলে সাপের আধিক্যের কারণে সিজিস্তান বিনাশ হয়ে যেত। কা'ব আহবার বলেন : আল্লাহ তাআলা সাপকে ইস্পাহানে, ইবলীসকে জেদ্দায়, হযরত হাওয়া (আঃ)-কে আরাফায় এবং হযরত আদম (আঃ)-কে (শ্রীলঙ্কায়) সরন্দীপ[১] পর্বতের চূড়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন।

সরন্দ্বীপ (লঙ্কা বা শ্রীলঙ্কা)

ভারত মহাসাগরে চীনের একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানের পবর্তটি বিরাট উঁচু। নাবিক ও জাহাজে ভ্রমণকারীগণ কয়েক দিনের দূরত্ব থেকে পাহাড়টি দেখতে পায়। ওই পর্বতের একটি পাথরের উপর হযরত আদম (আঃ)-এর কদম মোবারকের চিহ্ন রয়েছে। তা থেকে প্রত্যহ রাত্রিবেলায় যেন বিদ্যুত-চমক বিচ্ছুরিত থেকে দেখা যায়। অথচ তখন আকাশে মেঘের নাম-গন্ধও থাকে না। প্রত্যহ ওই চিহ্নের উপর অবশ্যই বৃষ্টিপাত হয়ে তা ধৌত করে যায়।

বলা হয়, ওই পাহাড়ে লাল ইয়াকুত[২] ও আলমাস[১] পাথর পাওয়া যায়। বৃষ্টি

---

[১] সরন্দীপ কোন একসময় চীনের একটি দ্বীপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটা স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র; শ্রীলঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে একটি উঁচু পর্বত রয়েছে। ওই পর্বতকে 'সরন্দীপ' পর্বত বলে।

[২] ইয়াকুত : এর ইংরেজি নাম রুবী (Ruby) । হিন্দী ভাষায় মানিক, পানজাবী ভাষায় লা'ল, সংস্কৃতিতে পাদাম রাগ বলা হয়। আরবিতেও একে লা'ল (لعل) বলে। পৃথিবীতে যত অমূল্য পাথর পাওয়া যায়, বিজ্ঞজনদের মতে মূল্যমানের দিক থেকে নিম্নরূপ :

১. আলমাস, ২. ইয়াকুতশ, ৩. যমরুদ, ৪. নিলম, ৫. মারওয়ারীদ, ৬. পাখরাজ, ৭. মারজান, ৮. যারকুন, ৯. লাহসীনা। এগুলোকে শ্রেষ্ঠ পাথর বলে গণ্য করা হয়। হিন্দী ভাষায় এগুলোকে নুরতন আর আরবীতে 'জাওয়াহিরে তিসয়াহ' বলা হয়। মোগল সম্রাট আকবরও এ বিবেচনায়ই নিজের জন্য 'নয়জন উপদেষ্টা' নির্বাচন করেছিলেন। তারা 'নুরতন' নামে খ্যাত ছিলেন।

রত্নশ্রেণী বিবেচনায় ইয়াকুত দ্বিতীয়। ইয়াকুতকে উন্নতমানের মূল্যবান পাথর বলে গণ্য করা হয়। এ পাথরটি চমৎকার ও উজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে। অন্ধকার রাত্রেও এর আলো চমকায়। প্রাচীনকালের কবিগণ এ পাথরের লালিমাকে প্রেয়সীর ঠোঁটের সঙ্গে তুলনা করতেন। অলঙ্কারের সৌন্দর্য দ্বিগুণ বৃদ্ধির জন্য এটা ব্যবহার হয়। বিশেষ করে রাজ-বাদশাহগণ এবং আমীর-উমরাহগণ এগুলো নিজের কাছে রাখতেন। কেননা এগুলোকে নিজেদের সুখ-শান্তি ও দাম্পত্য জীবনের প্রশান্তির সহায়ক মনে করতেন।

প্রকারভেদ : রঙের দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াকুত ৪ প্রকার। (১) টুকটুকে লাল, (২) গোলাপি লাল, (৩) কমলা লাল—এগুলো কড়া লালের সাথে হরিদ্রী বর্ণের হয়ে থাকে, (৪) লেবু রঙের লাল—এগুলো পাকা লেবু সদৃশ অর্থাৎ কড়া লাল-সবুজ। অধিকাংশ জাওহারিদের মতে কবুতরের তাজা রক্ত সদৃশ ইয়াকুত হল সর্বোৎকৃষ্ট।

পরিচিতি : এ পাথর আসল হওয়ার প্রমাণ হল, এগুলো একমাত্র হীরার সাহায্যেই কাটা যায়। এ ছাড়া তা অন্য কোন পাথর বা বস্তু দ্বারা কর্তন করা গেলে সেটি আসল ইয়াকুত নয়; নকল এবং এ পাথরটি বেশ হালকা।

ঐতিহাসিক সম্পর্ক : পুর্বাকাল থেকেই এ পাথরটি আলোচিত। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এর কিছু ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা তুলে ধরছি। যেমন—

(১) পবিত্র কুরআনে ইয়াকুত ও মারজান পাথরের উল্লেখ আছে।

(২) হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি আংটি ইয়াকুত পাথরের ছিল।

(৩) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, ইয়াকুত দারিদ্র্য দূরীভূত করে।

(৪) শাইখ মুহাম্মাদ বাবুইয়া (রহ.) তাঁর 'সাওয়াবুল আমল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইয়াকুত পাথর পরিধান করলে সওয়াব হয়।

(৫) হযরত মুফাজ্জল ইবনে হুমার থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আলী ইবনে রেযা (রহ.) বলেন, ইয়াকুতের আংটি পরিধান করা উত্তম।

(৬) তোহফায়ে আলমশাহীতে বর্ণিত আছে, সঙ্গে ইয়াকুত পাথর রাখলে ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি পায়।

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, ইয়াকুত পাথর পরিধানে গৌরব বৃদ্ধি পায় ও সওয়াব হয়। শিশুদের গলায় পরালে 'উম্মু ছিবইয়ান' রোগ হয় না। এটা গর্ভবতী মহিলা বাহুতে বেঁধে রাখলে তার গর্ভপাতের ভয় থাকে না। তাছাড়া হাত-পা ফোলা রোগের বেলায়ও বেশ উপকারী।

(৮) ইমাম মূসা রেযা (রহ.)বলেন, ইয়াকুতের আংটি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করে।

(৯) এরিষ্টটল বলেন, ইয়াকুত পাথর শত্রুকে পরাভূত করে। এটা পরিধান করলে কর্মোদ্দীপনা ও শক্তি-সাহস বৃদ্ধি হয়। মানুষ যেকোনো কঠিন কাজও নিঃসঙ্কোচে সমাধা করতে পারে।

(১০) সুলতান মাহমূদ গজনভী সোমনাথ মন্দিরে অমূল্য একটি ইয়াকুত পাথর পেয়েছিলেন। সেটির ওজন ছিল ১৪৫ ক্যারাট। সুলতান মাহমূদ আমৃত্যু সেটি নিজের সাথে রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে সেটির কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

জগদ্বিখ্যাত ইয়াকুত

(১) জগদ্বিখ্যাত ইয়াকুত হল 'বারমা স্টার রুবী'। এটা আমেরিকার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক বস্তুর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ পাথরটি বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত। এর ওজন ১ ক্যারাট। এটি দুর্লভ ইয়াকুত বলে গণ্য।

(২) রাশিয়ার জাদুঘরে জারের টুপিতে একটি মুক্তা আছে। রাশিয়ার জার সম্রাট ১৮৭৭ সালে তা অর্জন করেছিলেন। এটি ছোট ডিমের মত। ওজন ১১০ ক্যারাট। এটাও জগদ্বিখ্যাত একটি ইয়াকুত।

(৩) রানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটেও অনন্য সৌন্দর্যময় একজোড়া ইয়াকুত পাথর স্থাপন করা হয়েছিল।

(৪) ইরান অধিপতির নিকটেও একটি অমূল্য ইয়াকুত ছিল। বর্তমানে সেটি ইরানের জাদুঘরে সংরক্ষিত।

চিকিৎসায় ইয়াকুত পাথর : আত্মিক প্রশান্তি ও শারীরিক বলবর্ধনে এটা শ্রেষ্ঠ। রক্তসঞ্চালন ও প্যারালাইসিস রোগের জন্য বিরাট উপকারী। শিরাকে সঠিক স্থানে রাখে ও রক্ত পরিষ্কার করে। অধিক পিপাসা নিবারণ করে। অন্তরের রোগের জন্য বেশি উপকারী। মৃগী, মস্তিষ্ক বিকৃতি, প্লেগ রোগ মুক্ত করে। আর্দ্রতা শুষ্ক করে এবং কলিজাকে শক্তিশালী করে। ভয়-ভীতি বিদুরিত করে। ধাতু

দুর্বলতা দূর করে। জরায়ুর রক্ত পড়া বন্ধ করে। এর সুরমা চোখের যাবতীয় রোগের নিরাময়ক। চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে। বিষক্রিয়া ও শারীরিক সকল দুর্বলতা দূর করে।

ইয়াকুত পাথরের জাদুশক্তি : প্রেম-ভালবাসা বৃদ্ধি করে। দাম্পত্য জীবনের জন্য উপকারী ও আনন্দদায়ক। মন-মানসে ফূর্তি-উদ্দিপনা আনে। আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করে। এটা দর্শনে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। মানুষের শক্তি-সাহস বৃদ্ধি করে। অন্তরে কোন কুটিলতা সৃষ্টি হয় না। আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার দুঃসাহস জাগায়। আত্মবিশ্বাস ও সাবধানতা আনয়ন করে। প্রভাবশালীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

[১] **আলমাস :** এটা আরবী নাম। ইংরেজিতে একে ডায়মণ্ড (Dimond) বলা হয়। পানজাবি ভাষায় হীরা আর সংস্কৃতি ভাষায় বলা হয় হীরক। এটা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ-পরিষ্কার পাথর। পৃথিবীতে উৎকৃষ্টমানের যে 'নয় রত্ন' পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এটা প্রথম নম্বরের অর্থাৎ 'ধালমাস' পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান পাথর বলে গণ্য। এর আলোকচ্ছটা চোখ ধাঁধাঁনো। একে শাহী পাথরও বলা হয়। এজন্য এটা গুপ্তভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখা হয়। পৃথিবীর সকল জাতি এটিকে সকল মূল্যবান পাথরের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

আলমাসের প্রকারভেদ : আলমাস পাথর অসংখ্য ধরনের। ইউরোপের লোকেরা এটিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) **আলমাস খাস :** এটা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। একে সবচেয়ে দামি মনে করা হয়। আংটি ও অলংকারাদিতে এটা ব্যবহার করা হয়।

(২) **বোর্ট :** এটা সামান্য কালচে এবং কারুকাজে ব্যবহার করা হয়।

(৩) **বালাস :** এটি অত্যন্ত শক্ত হয়। এতে মোটেও চাকচিক্য নাই। বিভিন্ন শিল্পকার্যে এর ব্যবহার দেখা যায়।

(৪) **কাবিউণ্ডা :** এটা কালো রঙের পাথর। শিল্পকার্যে ব্যবহার হয়।

আলমাসের পরিচয় : আলমাস অত্যন্ত শক্ত পাথর। এ পাথর 'নাইলাম' ও ইয়াকুত পাথরকে কর্তন করতে পারলে বুঝা যাবে, এটি সত্যিকারের আলমাস; অন্যথায় নকল।

ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা : এ পাথরের গুরুত্ব নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

কহিনুর হীরা : এ হীরাটি আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে সমুদ্রের গভীর তলদেশে পাওয়া যায়। এ হীরাটি ভারতের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ ও রাজপুত্রদের মালিকানায় ছিল। কথিত আছে, এ পাথর মূল্যবান ও অদ্বিতীয় হওয়ার কারণে সকলের দৃষ্টি এর উপর লেগেই ছিল। ফলে এটি এক বিশাল ষড়যন্ত্রের কারণ হয়ে যায়। মালয়ের রাজা এ পাথরটি তার পাগড়িতে রাখতেন। তার ধারণা ছিল যেদিন এ পাথর পাগড়ি থেকে পড়ে যাবে, সেদিন থেকে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যাবে। একদিন রাজার পাগড়ি থেকে পাথরটি গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। ওই বছরই সুলতান আলাউদ্দিন মালয় আক্রমণ করে এ হীরাটি করায়ত্ত করেন। এভাবে একদিন এ হীরাটি গোয়ালিয়ার রাজা 'মহারাজ বিক্রম জিৎ'-এর হাতে চলে গেল। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধের পর ইবরাহীম লোদীর মাতা এ হীরাটি দিয়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করেন। বাদশাহ হুমায়ুন এ হীরাটি তার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। বাবর পুনরায় হীরাটি তার পুত্র হুমায়ুনের নিকট ফেরত পাঠিয়েছিলেন। এরপর এ হীরাটির গুণেই সমগ্র ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা হয়ে থাকে, এ হীরাটি বাদশাহ আকবরের যুগে মোঘল শাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে। এজন্য বাদশাহ আকবরের শাসনামল মোঘল যুগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গৌরব লাভ করে। আবার তার যুগেই হীরার চাকচিক্য মলিন হয়ে যায়। তখন আকবরের দু'ছেলে ধ্বংস হয়। শাহজাদা সেলিম তার শত্রুতে পরিণত হয়। হৃদয়ভাঙা আকবর ১৬০৫ সনে ইহকাল ত্যাগ করেন। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। পরে নাদির শাহের সাথে মোঘলদের চুক্তি হয়। ওই চুক্তিনামা স্বাক্ষরের সময় মোগল শাহজাদা এ হীরাটি নিজের পাগড়িতে স্থাপন করে নাদির শাহের সম্মুখে আসে। নাদির শাহ হীরাটি দেখেই শাহজাদার পাগড়িটি নিজের মাথায় আর নিজের পাগড়িটি শাহজাদার মাথায় পরিয়ে দেন। যাকে বলা হয় 'পাগড়ি বদল'। এভাবে হীরাটি নাদির শাহের হাতে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে নাদির শাহ আপন পুত্র শাহরুখকে দিয়ে দেন। তারপর শাহরুখের নিকট

হলে পানিপ্রবাহের সঙ্গে সেগুলো পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসে।

থেকে হীরাটি আফগানিস্তান বাদশাহ আহমদ শাহ এর নিকট চলে যায়। এরপর আহমদ শাহের লোকদের নিকট থেকে হীরাটি মহারাজা রনিজাত সিং-এর নিকট চলে যায়। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ রনিজাত সিং-এর পুত্র দিলীপ সিং ইংরেজদের হাতে বন্দি হলে এ অমূল্য হীরা কোহিনুর বৃটেন চলে যায় এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে পৌঁছে। আজ পর্যন্ত এ হীরাটি বৃটেনের ধনাগারে সংরক্ষিত আছে।

রিজান্ট হীরা : এ হীরাটি ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে গুলকুণ্ডায় এক বন্দি কাজের সময় পায়। হীরাটি পাওয়ার পর ওই বন্দি উধাও হয়ে এক জাহাজে উঠে ভ্রমণ করতে থাকে। তার হাতে কোন টাকা-পয়সা না থাকায় ভাড়া বাবদ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে হীরাটি দিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন হীরাটি এক হিন্দু সাহুকার-এর নিকট বিক্রি করে। এরপর হীরাটি কয়েক হাত বদল হয়ে ফ্রান্সের রাজা লুইস পর্যন্ত পৌঁছে। লুইস হীরাটি ৮০,০০০ হাজার পাউন্ডে ক্রয় করেন। কিন্তু লুইসের জন্য এটা অমঙ্গলের কারণ হয়ে দেখা দিল। ওটা ক্রয় করতেই ফ্রান্সে বিদ্রোহ শুরু হল। শেষে লুইস ক্ষমতাচ্যুত হলেন। বর্তমানে হীরাটি ফ্রান্সের জাদুঘরে আছে।

আকবর শাহ হীরা : এ হীরায় আরবী ভাষায় দুটি শব্দ উৎকীর্ণ রয়েছে। (১) আকবর শাহ; শাহ আলম ১০৩৮ হিজরী। (২) শাহজাহান দু'জাহান ১০৩৬ হিজরী। হীরাটি লন্ডন নেয়া হয়। সেখানে একজন রাজকর্মকর্তা ৭৫,০০০ ডলারের বিনিময়ে তা খরিদ করে নেন। এর ওজন ৭৬ ক্যারাট।

শাহ হীরা : এটা একটি প্রসিদ্ধ ও দুর্লভ হীরা। ওজন ৮৮ ক্যারাট। এ হীরার উপর তিনটি নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। (১) আকবর শাহ, (২) নিযাম শাহ, (৩) ফতেহ আলী শাহ। এ হীরাটির পারস্য ইতিহাসের সাথে নিবিড় সম্পর্ক। এটি ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে রুশ রাষ্ট্রদূত জার নিকলাস তেহরানে নিহত হওয়ার বদলায় শাহজাদা খসরু দিয়েছিল। এটি বর্তমানে মস্কোর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ছাঁছী হীরা : এ হীরার একটি সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হল, ফ্রান্সের রাজদরবারের সাথে সম্পৃক্ত 'মিস্টার ডি ছাঁছী' এ হীরাটি ফ্রান্সের সম্রাট হেনরী সুতম-এর আবেদনে সুইজারল্যান্ডের হাতে বন্ধক রাখতে প্রেরণ করেন। কিন্তু হীরা বহনকারী লোকটি পথিমধ্যে নিহত হয়। নিহত হওয়ার পূর্বে সে হীরাটি গিলে ফেলে। পরে মিস্টার ছাঁছী তার পেট কেটে হীরাটি বের করেন এবং ইংল্যাণ্ডের সম্রাট জেম্‌স প্রথমের নিকট বিক্রি করে দেন। জেম্‌স আবার তা ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজার নিকট বিক্রি করেন। ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের লুইসী প্রথাগত মুকুট ধারণের সময় এটি তার মুকুটে স্থাপন করেন। এরপর ফ্রান্স বিপ্লবের সময় হীরাটি গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জামশীদ জিজাভী ভাই তা খরিদ করে নেন। আবার তার পুত্র মহারাজ পুটিয়ালার নিকট বিক্রি করে দেন। এ হীরাটির ওজন ছিল ৫৫ ক্যারাট।

চিকিৎসায় আলমাস হীরার উপকারিতা : এ পাথর স্ত্রীলোকের উরুতে বেঁধে দিলে প্রসববেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পেটে বেঁধে রাখলে সবধরনের পেটব্যথা ও আমাশয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের কাছে বেঁধে রাখলে হৃৎপিণ্ড খুব শক্ত হয়। মৃগী রোগেও বেশ উপকার হয়।

বড় মহৌষধ : হীরার কুশতা (তরল হীরা) ভিটামিনের প্রাণ ও খনিজ স্বরূপ। এটা বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য প্রতিষেধক। পৃথিবীর যেকোনো চিকিৎসায় হীরার কুশতা অত্যন্ত ফলপ্রদ ও কার্যকরী। ডায়াবেটিস, পঙ্গুত্ব ইত্যাদির জন্য তো এর চার ফাইলই যথেষ্ট। তবে স্থূল হীরা বিন্দু পরিমাণ সেবনও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। কারণ, তা নোহাৎ শক্ত। তা শরীরের যে স্থানেই গমন করে, তা বিদীর্ণ করে ফেলে। এর চিকিৎসা ভারি কঠিণ। তথাপি চিকিৎসকগণ বলেছেন : গাভীর দুধ পান করিয়ে বমি করানো গেলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে কিংবা কয়েকটি ছারপোকা পিষে দুধে মিশিয়ে পান করালেও স্বস্তি বোধ হয়।

আলমাস হীরার জাদুকরী বৈশিষ্ট্য : এটা দেখলে প্রাণে শক্তি আসে। স্বভাব-চরিত্রে ভদ্রতা ও নম্রতা সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল সুদৃঢ় হয়। এটা পরিধান করলে আসমানী বজ্র থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এর উপর সূর্যকিরণ বিশেষ প্রতিক্রিয়া করে। এতে মানসিক পীড়া দূর হয়। অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

ইমাম কাযবিনী বলেন, এখানে 'উদে হিন্দী' (উন্নতমানের সুগন্ধী কাষ্ঠ)-ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, সরন্দীপ পর্বতটি সাতীদমা-এর নিকটেই অবস্থিত। 'সাতীদমা' একটি দ্বীপ। এটি ভারত মহাসাগর ও নীলনদের পাশে অবস্থিত। 'সাতীদমা' মূলত আরবী শব্দ। অর্থ— রক্তপাত বা হানাহানি। সাতীদমা বলার কারণ এখানে প্রত্যহ রক্তপাত ও হানাহানি হয়। আল্লামা বাকরি তাঁর 'মুজাম' (معجم) গ্রন্থে আর আল্লামা জাওহারী সিবওয়াই থেকে বর্ণনা করেছেন : একবার রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ হল। কায়সার গিয়ে কিসরার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করল। কিসরা পাল্টা আক্রমণ করে কায়সারকে পিছু হটিয়ে দিল। এরপর নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করল। অবশেষে 'সাতীদমা' দ্বীপে গিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল। কায়সারবাহিনী শত্রুবেষ্টিত হয়ে চরম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ফলে বিনা যুদ্ধেই তারা পালাতে শুরু করল। কিসরাবাহিনী তাদেরকে কুকুরের মত হত্যা করল। এদিকে কায়সার উধাও হয়ে গেল। বিধায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হল না। এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে জনৈক কবি বলেন :

لما رأيت ساتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها

প্রেয়সী আমার রক্তাশ্রু দেখেছে। তার চোখে তবু অশ্রু প্রবাহিত হয় নি। তার এ হৃদয়হীনতার জন্য কেউ তাকে তিরস্কার করলে তা যথার্থ।

সাপ বিভিন্ন জাতের হয়। যেমন, রাকশা (رقشاء)। এ সাপের গায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে। এ সাপকে (رقطاء) 'রাকতা'ও বলা হয়। এ সাপটি চিত্রল সাপ থেকেও দুরন্ত প্রকৃতির হয়। কবি নাবেগা এক কবিতায় সেলিমের প্রশংসায় বলেন :

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في انيابها السم ناقع

আমি রাত্রিযাপন করেছি এমন চিন্তিত অবস্থায়, যেন আমি কোন সাপের আয়ত্তে আছি। আর মুখটি তার বিষে ভরা।

تبادرها الراقون من شر سمها فتطلقه يوما ويوما تراجع

এর দংশণে ওঝা পর্যন্ত বিষ থেকে বাঁচানোর জন্য মন্ত্র পাঠ করতে লাগল; কিন্তু সেই মন্ত্র কখনও সফল আবার কখনও ব্যর্থ।

تسهل من ليل التمام سليمها كحلى نساء في يديه قعاقع

সাপে কাটা লোক এমনি বিনিদ্র রজনী কাটায়, যেমনি রমণীর হাতে ঝংকারযুক্ত অলংকার।

এরপর কবি বলেন :

وهم يقظوا وقط الانامى وتبهوا عقارب ليل نام عنها حواتها

সে জাগ্রত থাকে সাপে কাটা লোকের মত এবং রাতের বিচ্ছু যেভাবে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে; তবে যে ব্যক্তি শুয়ে থাকার সে শুয়ে থাকে।

وهم نقلوا عنى الذى افه به وما افة الاخبار الا رواتها

প্রিয়তমের ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে লোকেরা আমার ধারণা-কল্পনারও অতীত আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলে। বস্তুত ভুল সংবাদদাতাদের কারণে অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন থেকে হয়।

আরবদের ধারণামতে চিত্রল সাপ বোবা হয়ে থাকে। তদ্রূপ উটপাখিও বোবা হয়ে থাকে।

আলী ইবনে নাসর জাহযামীর ঘটনা

আলী ইবনে জাহযামী বলেন, একবার আমি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নিকট গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি 'রিফক' তথা নম্রতার প্রশংসা করছেন। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন! কবি আসমাঈ আমার সম্মুখে এ কবিতাটি পাঠ করেছেন :

لم ار مثل الرفق فى لينه اخرج للعذراء من خدرها

নম্রতার মাঝে তার চেয়ে বড় কাউকে পাই নি। এ নম্রতা কুমারী রমণীকেও তার নিরাপদ স্থান থেকেও বের করে আনে।

من يستغن بالرفق فى المره يستخرج الحية من جحرها

যে ব্যক্তি নিজ কর্মে উগ্রতার পরিবর্তে নম্রতা প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে। দেখনা! সাপুড়ে কীভাবে সাপকে তার গর্ত থেকে নম্র ব্যবহারে বের করে আনে।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল এ কবিতা শ্রবণ করে তাঁর গোলামকে কাগজ- কলম নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। গোলাম কাগজ-কলম এনে খলীফার সম্মুখে পেশ করল। মুতাওয়াক্কিল এ কবিতাগুলো নিজ হাতে লিখে নিলেন এবং আমাকে অনেক দামিদামি উপহার দিলেন। আবু বকর ইবনে দাউদ বলেন, খলীফা মুস্তাঈন বিল্লাহ একবার নসর ইবনে আলীর নিকট একটা ফরমান প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল, 'আপনাকে বিচারক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে'। তার নিকট যখন এ ফরমান এসে পৌঁছাল, তখন আব্দুল মালেক তাকে এ ব্যাপারে ইস্তিখারা করার আদেশ দিলেন। এরপর নসর ইবনে আলী গৃহে এসে দু রাকাত নামায আদায় করলেন এবং দুআ করলেন : 'হে আল্লাহ! আমার জন্য যদি

আপনার নিকট কোন কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে মৃত্যু দিন!' এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। সুতরাং লোকেরা তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতে গেলে তাকে মৃত্যু অবস্থায় পেল। ঘটনাটি ঘটে ২৫০ হিজরী রবিউল সানী মাসে।

একপ্রকার সাপকে 'আযআর' বলে। এর সংখ্যা অনেক। এরই আরেক প্রকার সাপ হল 'আযব'। এ সাপের চুল আছে। আরেক প্রকার সাপের নাম 'যাওয়াতুল কুরূন'। এ সাপের শিং আছে। দার্শনিক এরিষ্টটল এ সাপের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজেয এক কবিতায় বলেন :

وذات قرنين طحون الضرس تنهس لو تمكنت من نهس

تدير عينا كشهاب القيس

এ সাপটির শিং-দাড়ি আছে। সে একবার দাঁত বসালে দাঁত আর খোলে না। এ সাপের চোখ থেকে বিষের স্ফুলিঙ্গ বের হয়।

আরেক প্রকার সাপের নাম শুজা'। ইনশাআল্লাহ 'শীন' পরিচ্ছেদে এর আলোচনা হবে। আরেক প্রকার সাপ 'আরবাদ'। এগুলো খুব বড়সড় হয়। অন্যান্য সাপকে খেয়ে ফেলে। আরেক প্রকার সাপকে 'আছলা' বলে। এ সাপও খুব বড় হয়। এর আকৃতির সাথে মানুষের মিল আছে। বলা হয়, এদের বয়স হাজার বছর হলে দেখতে এগুলো মানুষের মত হয়ে যায়। কী অবাক কাণ্ড! এসব সাপ মানুষকে দৃষ্টি দ্বারাই ধ্বংস করে দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির দৃষ্টি এ সাপের উপর পড়ে আর চার চোখ একত্র হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মরে যায়।

আরেক প্রকার সাপকে 'সাল্ল' বলে। একে মাকলাহ-ও বলে। কেননা এদের মাথায় মুকুট থাকে। এ সাপ মারাত্মক বিষাক্ত হয়। এরা যে স্থান দিয়ে চলাচল করে, সে স্থানটি পর্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এদের গর্তের আশপাশে কোন প্রকার গাছপালা উদ্ভিদ ইত্যাদি জন্মে না। কোন পাখি এ সাপের গর্তের আশপাশ দিয়ে উড়ে গেলে তখনই সে মৃত্যুবরণ করে নিচে পড়ে যায়। কোন প্রাণী তার গর্তের নিকট দিয়ে গেলে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। কোন শিকারী এ সাপের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে ওই শিকারী সওয়ারীসহ মারা যায়। কেননা এর ফোঁস ফোঁস আওয়াজেই বিষক্রিয়া রয়েছে। একবার এক অশ্বারোহী বল্লম দ্বারা এ সাপ হত্যা করলে ঘোড়াসহ সে মারা যায়। এ সাপ তুর্কিস্তানে অধিক পাওয়া যায়।

একপ্রকার সাপকে 'তুয-তাফীন' বলে। একপ্রকার সাপকে 'আবতার' (লেজকাটা) বলে। উপরিউক্ত দু'ধরনের সাপের ব্যাপার বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : দু'প্রকার সাপকে তোমরা মেরে ফেল। কেননা এগুলো চোখের জ্যোতি এবং গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট করে দেয়।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, আমি এ সাপের বিষ দেখেছি। এ ব্যাপারে 'ত্বা' পরিচ্ছেদে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। আরেক প্রকার সাপ আছে 'নাযিরাহ'। এ সাপের আওয়াজ শুনেই মানুষ দেশছাড়া হয়ে যায়। আল্লামা দামেরী সকল প্রকার সাপের নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন। যথা— (১) আল-ঈম (২) আল-আইন (৩) আছ-ছুম্ম (৪) আল-আযআরার (৫)আল-আবতার (৬) আন-নাশির (৭) আল-আইনু (৮) আল-আরকাম (৯) আল-আসলাহ (১০) আল-জান্ন (১১) আস্-সু'বাল (১২) আশ-শুজা' (১৩) আল-আযব (১৪) আল-আরব (১৫) আল-উফুওয়ান (১৬) ইল্-আরকাশ (১৭) আরকাত (১৮) আস-সাল্ল (১৯) যু তাফাতাইন (২০) আরবাদ।

ইবনে আসীর বলেন, সাপকে আবুল বুখতারী, আবুর রাবী, আবু উসমান, আবুল আসী, আবু নাদউর, আবু দাসাব, আবু ইয়াফয়ান, উম্মে তাবাক, উম্মে আফিয়া, উম্মে উসমান, উম্মুল যাফাহ্, উম্মে মাহবুব, নাবাতে তাবাক ও হায়াতুস সামা বলা হয়। এ হাইয়াতুস সামা অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন :

اذا تخززت وما بي من خزر ثم كسرت الطرف من غير حور

আমি যখন কাতরাচ্ছিলাম, অথচ বাহ্যত আমার কোন কষ্ট ছিল না, তখন আমি নির্বিঘ্নে বন্ধন ছিন্ন করে ফেলি।

الفيتني الوى بعيد المستمر احمل ما حملت من خير وشر

كالحية الصماء في اصل الشجر

তুমি আমায় দেখেছ, আমি ডিগবাজি খাচ্ছি দূর-দূরান্তে আর বোঝা বহন করছি ভালমন্দের। যেমনি নর সাপ বৃক্ষমূলে পেঁচিয়ে থাকে।

নর সাপকে 'ছাম্মা'ও (صمة / বহুবচনে– صم) বলে।

প্রাণীদের চরিত্র বিশ্লেষকগণ তথা প্রাণীবিদগণ লিখেছেন : সাধারণত সাপ এক হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। প্রতিবছর সাপ নিজের খোলস পাল্টায়। প্রতিবছর একবার ডিম দেয়। ডিমের সংখ্যা হয় তাদের শরীরের হাড়ের সমান অর্থাৎ এদের শরীরে যতটি হাড় আছে, ততটিই ডিম পাড়ে। অধিকাংশ ডিম পিঁপড়া নষ্ট করে দেয়। অল্পকিছু ডিম থেকে বাচ্চা ফোঁটে।

সাপকে কোন বিচ্ছু ছোবল মারলে তৎক্ষণাত সে মারা যায়। 'হুরাইশ' নামেও একপ্রকার সাপ আছে। এ সাপটিও চিত্রল সাপের মত অনন্ত দুষ্টু প্রকৃতির হয়। এসব সাপ বালুকাময় স্থানে বাস করে। সাপের ডিম লম্বাটে ও বিভিন্ন বর্ণের হয়। কোনটি মেটো, কোনটি সবুজ, কোনটি কালো ও চিত্রল হয়। আবার কোন ডিমের উপর সাদা-কালো উজ্জ্বল ডোরাকাটা থাকে। ডিমের ভিতরে পানির মত মসৃণ শুক্রাণু থাকে। তা ডিমের খালি স্থানে একটি লম্বা রেখার মত দেখায়।

সাপ সাধারণ পন্থায় সঙ্গম করে না; এদের সঙ্গমের পন্থা হল, এরা পরস্পর বৃত্তাকারে বসে যায়। সাপের জিহ্বা কাটা অর্থাৎ দু'ভাগে বিভক্ত। এজন্য অনেকেই মনে করেন, সাপের জিহ্বা দুটি। সাপ চরম লোভী ও মন্দপ্রকৃতির হয়। সুতরাং কোন হাঁস-মুরগি ইত্যাদির বাচ্চাকে ধরলে এরা বাঘের মত চিবানো ব্যতীতই গিলে ফেলে। আর কোন শক্ত জিনিস ভক্ষণ করলে কোন বৃক্ষ বা তদ্রূপ শক্ত বস্তুতে জড়িয়ে যায় এবং সজোরে মোচড় মারে। যাতে শক্ত বস্তুটি পেটেই ভেঙ্গে যায়।

সাপের স্বভাব হল, কাউকে কামড়ালে সে উল্টে যায়। এতে অনেকেই মনে করেন, এভাবে উল্টে গিয়ে সাপ তার সমস্ত বিষ ঢেলে দেয়। কিন্তু ধারণাটি ভুল। সাপের আরেকটি অভ্যাস হল, খাবারের জন্য কোন কিছু না জুটলে সে শুধু বাতাসের উপরই নির্ভর করে। প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়ও সে বাতাসের উপরে নির্ভর করে। সাপ বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার শরীর সঙ্কোচিত ও ক্ষুদ্র হয়ে যায়। সে-সময় সাপ শুধু বাতাসের উপরই নির্ভরশীল থাকে। আশ্চার্যের কথা হল, সে কোন দিন পানি পান করে না। পানি পান করার ইচ্ছেও তার জাগে না। কিন্তু কখনও পানিতে চলে গেলে সে পানি পান না করে আর পারে না অর্থাৎ সে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারে না। সাপের পানীয়—যেমন, দুধ ইত্যাদির প্রতি আসক্তি আছে। তাই অনেক সময় সে তা অতিমাত্রায় পান করে ফেলে। এতে তার নেশা লেগে যায়। আর এ নেশাই কখনও কখনও তার প্রাণনাশের কারণ হয়।

নর সাপের একটি বৈশিষ্ট্য হল, সে কোন সময়ই এক স্থানে থাকে না। সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। কিন্তু মাদি সাপ তার ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার স্বস্থান পরিবর্তন করে না অর্থাৎ সে ডিমে তা দিতে থাকে। এরপর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহের উপযুক্ত হলে তবেই সে সেখান থেকে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেয়।

সাপের চোখ তার মাথায় ঘোরে না বরং তা যেন একস্থানে পেরেকের মত গেঁথে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থা টিড্ডি/ফড়িংয়ের চোখেরও। সাপের চোখ খুলে ফেললে পুনরায় তা গজায়। অনুরূপ তার দাঁত ভেঙে বা লেজ কেটে ফেললেও তা পুনরায় পূর্ববৎ হয়ে যায়। আশ্চর্য! গাপ উলঙ্গ লোক দেখলে পালিয়ে যায় আর আগুন দেখলে খুব খুশি হয়। যদি চাবুক ঘোড়ার ঘামে ভিজিয়ে সাপকে মারা হয়, তাহলে সে তৎক্ষণাত মারা যাবে। কিন্তু সাপকে দু'টুকরা করে ছেড়ে দেয়া হলে তৎক্ষণাত মরবে না; একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থাকবে। সাপ অন্ধ হয়ে গেলে অথবা মাটির নিচ থেকে বের হলে সে তখন দেখতে পায় না। তাই সে সুনেফ (سونف /একজাতীয় গাছ) বৃক্ষ সন্ধান করে এবং তার পাতা দ্বারা চোখ মুলে চোখের আলো ফিরিয়ে আনে। 'فسبحان من قدر فهدى'—কত

মহান ওই আল্লাহ, যিনি আক্রান্ত করেন আবার মুক্তির পথও নির্দেশ করেন!

ভূ-মণ্ডলে এমন কোন প্রাণী নাই, যার শরীর সাপের মত শক্তিশালী হয়। এর প্রমাণ হল, কোন সাপ একবার কোন গর্তে বা ছিদ্রে নিজ বক্ষ প্রবেশ করালে যত শক্তিমান লোকই আসুক কারও সাধ্য নেই তাকে গর্ত থেকে টেনে বের করবে বরং এরূপ করতে গিয়ে অধিকাংশ অকৃতকার্য থেকে দেখা গেছে। অবশ্য কখনও মধ্যভাগ থেকে ছিঁড়ে যায়: তবু বাইরে বের হয় না। অথচ সাপের কোন পা-নখ নেই যে, তার সাহায্য নিবে। তার কোমড়ের এ জোর পাজরের কারণে। সাপের ৩০টি পাজ আছে। সে চলার সময় তার জোড়াগুলো একটি অন্যটির সাথে এমনভাবে মিলে যায় যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথক হয় না। যত শক্তিই তার উপর কেউ প্রয়োগ করুক না কেন। সাপ মূলত ও স্বভাবত জলজ প্রাণী। কিন্তু ডাঙ্গায় জন্মগ্রহণকারী সাপ পানিতেও বসবাস করতে পারে। তদ্রূপ পানিতে জন্মগ্রহণকারী সাপও ডাঙ্গায় বসবাস করতে পারে।

জাহিযের মতে বিষাক্ততা হিসেবে সাপ তিন প্রকার। প্রথমত তন্মধ্যে কিছু সাপ দংশন করলে তার কোন প্রতিষেধক পাওয়া যায় না। কোন ঔষধও কাজে লাগে না। যেমন— ছু'বান, আফআ ও হিন্দী (গোখরা)।

দ্বিতীয় প্রকার সাপের দংশনে প্রতিষেধক পাওয়া যায় এবং উপকারও হয়। এ দু প্রকার সাপ ব্যতীত অন্যান্য সাপের দংশনে মানুষ শুধু ভয়ের কারণেই মরে যায়। প্রাণীবিগণ বলেন : একমাত্র ভয়-ভীতিই বিষের মধ্যে তীব্রতা সৃষ্টি করে। কেননা ভয়ের কারণে মানুষের শরীরের লোমকূপগুলো খুলে যায় এবং অতি সহজেই সমস্ত শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা শুনুন! জনৈক ব্যক্তি একবার একটি বৃক্ষের নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। বৃক্ষের ডালে ছিল একটি সাপ। হঠাৎ সাপটি ঝুলে পড়ে লোকটির মাথায় ছোবল মারল। এতে তার চেহারা লাল হয়ে গেল। ভেঙে গেল তার ঘুম। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোন কিছুই বুঝতে না পেরে মাথা ঝাকুনী দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে জাগ্রত হল। কিন্তু সাপের বিষের কোন প্রতিক্রিয়া হল না। কিছুক্ষণ পর অপর এক লোক এসে তার মাথায় সাপের কামড় দেখল। কিন্তু এ ব্যক্তি তার সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনা করল না। ঘটনার বেশ ক'দিন পর সেই লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, অমুক দিন তুমি বৃক্ষের নিচে শুয়েছিলে। তখন তোমাকে কিসে কামড় দিয়াছিল? লোকটি জবাব দিল, এ ব্যাপারে আমি তো কিছুই জানি না। এরপর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলল, সেদিন দেখেছি বৃক্ষটির ডালে একটি সাপ ঝুলছিল। সে তোমার মাথায় ছোবল মেরেছিল। একথা শুনামাত্র লোকটি মারাত্মক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং সে তৎক্ষণাত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

জ্ঞাতব্য

ইবনে যুফার তাঁর 'আন্-নাছাইহ' গ্রন্থে লিখেছেন : হীরাবাসী যখন তাদের

'কছরে আবইয়ায' (শ্বেত প্রাসাদে) দুর্গে আত্মগোপন করল, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) নাজাফে অবস্থান করছিলেন। তিনি নাজাফবাসীকে বলে পাঠলেন— 'তোমাদের কোন সর্দার লোককে সন্ধির জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সুতরাং তারা আব্দুল মাসীহ ইবনে আমর ইবনে কায়েস ইবনে হাইয়ান ইবনে নুফাইলাতুল আসানীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করল। লোকটি ছিল অতি বৃদ্ধ। তার বয়স হয়েছিল সাড়ে তিন শত বছর। হযরত খালিদ (রাঃ) বৃদ্ধের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। ইতিহাসে এটা প্রসিদ্ধ। কথাবার্তার সময় বৃদ্ধের হাতে একটি শিশি (বোতল) ছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ বারবার শিশিটি দেখছিল। ব্যাপারটি হযরত খালিদ (রাঃ)-এর চোখে পড়ল। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বারবার এ শিশির দিকে তাকাচ্ছ কেন? এর মধ্যে এমন কী আছে? বৃদ্ধ বলল, এতে 'সাম্মে সায়াত' অর্থাৎ মারাত্মক এক বিষ রয়েছে। যে ব্যক্তি তা পান করবে, মুহূর্তের মধ্যেই সে মারা যাবে। হযরত খালিদ (রাঃ) বললেন, এটা তোমার সঙ্গে আনলে কেন? বৃদ্ধ আব্দুল মাসীহ জবাবে বলল : আমি এটা আমার সঙ্গে আনার কারণ হল—আপনার সঙ্গে আমার এ সংলাপ যদি আমার গোত্রের জন্য সুখকর হয়, তাহলে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করব এবং আপনার মনোনীত সকল শর্ত আমি মেনে নিব। কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম হয়; আলোচনা সফল না হয়, তাহলে এ বিষ পান করে আমি আত্মহত্যা করব। কারণ, কোন দুঃসংবাদ নিয়ে আমি আমার গোত্রের নিকট ফিরে যেতে চাই না।

একথা শুনে খালিদ (রাঃ) বললেন : এ শিশিটি আমাকে দিয়ে দাও। সুতরাং সে তা দিয়ে দিল। হযরত খালিদ শিশি থেকে বিষ ঢেলে তাঁর হাতে নিলেন এবং

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله رب الارض والسماء بسم الله

الذى لا يضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم

দুআটি পড়ে ওই বিষ পান করেন। বলা হয়, এরপর তিনি সামান্য পানি পান করেন এবং তাঁর চাবুক বুকের উপর মারলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ঘর্মাক্ত হলেন। সেইসঙ্গে বিষক্রিয়াও নষ্ট হয়ে গেল।

আব্দুল মাসীহ এ দৃশ্য দেখে চলে গেল। স্ব গোত্রের নিকট গিয়ে বলল, আজ আমি এক মহান ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে এলাম। ওনি 'সাম্মে সায়াত' পান করে ফেললেন; কিন্তু এতে তার কোন ক্ষতিই হল না।

তাই তোমরা তার দাবি-দাওয়া মেনে নাও। যে-প্রকারেই হোক তাকে সন্তুষ্ট করে এখান থেকে বিদায় কর। কেননা এরা এমন জাতি, যাদের মধ্যে যোগ্যতা কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। অচিরেই এ জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং হীরাবাসী দশ সহস্র দিরহাম/ রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি

করল। কোন কোন বিজ্ঞলোকের মতে 'সাম্মে সায়াত' একমাত্র ভারতীয় সাপের মধ্যে পাওয়া যায়। এর প্রভাব কোন প্রতিষধক রুখতে পারে না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর ঘটনা

'আন্-নাছাইহ' গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ)- এর একজন দাসী ছিল। একদিন সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিসের তৈরি? তিনি উত্তরে বললেন, আমি তো তোমার মতই একজন মানুষ। সে বলল, আমি আপনাকে মানুষ মনে করি না। কেননা আমি চল্লিশ দিন যাবৎ আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছি; কিন্তু আপনার পশমও ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। তিনি বললেন : তুমি কি জান না, যে-লোক আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করে কোন জিনিসই তাঁর ক্ষতি করতে পারে না? আর আমি তো আল্লাহ্ তাআলাকে 'ইসমে আযম'সহ স্মরণ করি। দাসী জিজ্ঞাসা করল, 'ইসমে আযম'টি কী? তিনি বললেন :

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم-

তারপর তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন আমাকে বিষ প্রয়োগ করেছ? সে বলল, আপনার সাথে আমার বিদ্বেষ ছিল। তার এ জবাব শুনে তিনি বললেন : 'আল্লাহর জন্য তুমি আযাদ'। আর আমার সঙ্গে তুমি যে দুর্ব্যবহার করেছ, তা-ও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

একটি আশ্চর্যজনক কাহিনী

ইমাম কুরতুবী (রহ.) সূরা গাফির (মুমিন)-এর তাফসীরে সাওর ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি খালিদ ইবনে মা'দান থেকে, তিনি কা'ব আহবাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ তাআলা যখন আরশকে সৃষ্টি করলেন, তখন আরশ গর্ব করে বলতে লাগল– আল্লাহ্ তাআলা আমার চেয়ে বড় কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। আরশ এ গর্ব করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা একটি সাপকে শৃঙ্খল পরিয়ে দিলেন। সাপটির ৭০ হাজার বাহু ছিল। প্রত্যেক বাহুতে ৭০ হাজার পাখা, প্রত্যেক পাখাতে ৭০ হাজার মুখ, প্রত্যেক মুখে ৭০ হাজার জিহ্বা ছিল। প্রত্যেহ এ সাপের মুখ থেকে এতবার 'সুবহানাল্লাহ' বের হত, যা সংখ্যায় বৃষ্টির ফোঁটা, বৃক্ষের পাতা, পৃথিবীর পাথরকণা, বালিরাশি, দুনিয়ার দিবসসমূহ এবং ফেরেশতাদের সংখ্যা পরিমাণ হত। অর্থাৎ এসব বস্তু মিলে যত সংখ্যা হয় (যা গণনা করা অসম্ভব), সাপ ঠিক তত পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার তাসবীহ্ পাঠ করে। সুতরাং সাপটি আরশকে আকড়ে ধরল এবং আরশ সাপটির অর্ধেক শরীর পর্যন্ত আসল। অর্থাৎ সাপটি আরশের দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং আরশ সাপটি দেখে লজ্জিত হয়ে গেল। অতএব আরশ বিনয়ী হয়ে গেল।

খলীফা হারুনুর রশীদের ঘটনা

কথিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ একবার রাত্রে শুয়ে ছিলেন। শুয়ে শুয়ে তিনি কাউকে বলতে শুনলেন :

يارا قد الليل انتبه ان الخطوب لها سرى

ثقة الفتى من نفسه ثقة محللة العرى

'ওহে রাত্রে শয়নকারী, জেগে উঠ! কেননা বিপদ অত্যাসন্ন।'

'যুবকের আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত। কেননা আত্মবিশ্বাসীই বিপদের সমাধান দিতে পারে।'

সুতরাং এ কবিতা শ্রবণ করতেই খলীফার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন, মোমবাতিটি গলে গিয়েছে। তিনি মোমবাতিটি জ্বালাতে আদেশ করলেন। আলোকিত হওয়ার পর তিনি দেখলেন, তার পালঙ্কের কাছে একটি সাপ বসে আছে। সুতরাং খলীফা সাপটি মেরে ফেললেন।

একটি কাহিনী

ইমামুল ফারজ ইবনে আল-জাওযী (রহ.) তাঁর 'কিতাবুল আযকিয়া' গ্রন্থে বিশর ইবনে ফযল থেকে বর্ণন করেন, আমরা হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়ে আরবের একটি ঝর্ণার পার্শ্বে পৌঁছলাম। তখন আমাদের নিকট কয়েকজন লোক বলল : এখানে পরমা সুন্দরী তিনটি বালিকা আছে। তারা পরস্পর সহোদরা এবং ডাক্তার। একথা শুনে তাদেরকে দেখার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হল। আমি তাদের নিকট যাওয়ার একটি কৌশল বের করলাম—বনের একটি বড় কাষ্ঠ নিয়ে আমার এক সঙ্গীর পায়ের গোছায় তীব্র আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিলাম। এরপর ওই সঙ্গীটিকে নিয়ে তাদের বাড়ি গেলাম এবং ডাক দিলাম, সাপেকাটা রোগীর ঝাঁড়-ফুঁকের কেউ আছে কি? আমাদের ডাক শুনে সর্বকনিষ্ট মেয়েটি বের হয়ে আসল। মেয়েটি খুব ভাল করে পায়ের আঘাতের স্থানটি দেখল। বলল, তাকে সাপে কাটে নি বরং সে যা দিয়ে আহত হয়েছেন, তাতে পুরুষ সাপে প্রস্রাব করেছে। কিন্তু সে বাঁচবে না; সূর্যোদয় হওয়ার সাথে সাথে মারা যাবে। সুতরাং তাই হল। সূর্যোদয় হওয়ার সাথে সাথে লোকটি মারা গেল। এ ঘটনায় আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে গেলাম। এরপর সেখান থেকে চলে এলাম।

হযরত ঈসা (আঃ)- এর ঘটনা

'কিতাবুল আযকিয়া' গ্রন্থের শেষ ভাগে উল্লেখ আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার জনৈক জাদুকরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি (মন্ত্র পড়ে) সাপ ধরার চেষ্টা করছিল। সাপটি তখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলল, হে রুহুল্লাহ!

আপনি দয়া করে তাকে বলে দিন, সে যেন আমার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। অন্যথায় আমি তাকে চরম অপমান করব এবং ছোবল দিব। একথা শুনে ঈসা (আঃ) সামনে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন, সাপটি সাপুড়ের ঝুড়িতে রয়েছে। হয়রত ঈসা (আঃ) ওই সাপটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে সর্প! এক্ষুণি তুমি আমার কাছে সাপুড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে আর এখনই তুমি তার ঝুড়িতে। আসলে ব্যাপারটা কী? সাপ জবাব দিল, হে রুহুল্লাহ! সে কসম করেছিল। অথচ এখন সে আমার সাথে প্রতারণা করছে। অর্থাৎ সে বলেছিল– আমাকে ছেড়ে দিবে; নিজের ঝুড়িতে বন্দি করবে না। এখন সে তা করছে না। সুতরাং তার প্রতারণার বিষ তার জন্য আমার বিষের চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক।

নওশিরওয়ার ঘটনা

'আজাইবুল মাখলুকাত, গ্রন্থে আল্লামা কাযবিনী (রহ.) 'নওশিরওয়াঁ'র একটি ন্যায়বিচারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি প্রমাণ করেছেন, 'রাইহানে ফার্সী' প্রথমে পারস্য রাজ্যে ছিল না। একটি সাপ এ বীজ এনে নওশিরওয়াকে দিয়েছিল। 'রাইহান' বীজ প্রাপ্তির ঘটনায় বলা হয়, এক সাপের ভাইকে একটি বিচ্ছু হত্যা করেছিল। তখন মৃত সাপটির ভাই নওশিরওয়ার কাছে বিচার প্রার্থী হল। সাপটি কোনভাবে নওশিরওয়ার কাছে গিয়ে পৌছাল। নওশিরওয়ার দেহরক্ষী সাপটিকে মারার জন্য দৌড়ে আসল। নওশিরওয়া তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় নিশ্চয় এতে কোন বিশেষ কারণ রয়েছে। সাপটি নওশিরওয়ার পাশে এসে কিছু ইশারা করল। তাতে নওশিরওয়া বুঝতে পারলেন, এ সাপটি মাজলুম। সে আমার নিকট কোন সাহায্যের জন্যই এসেছে। সুতরাং নওশিরওয়া সাপটির সাথে তার একজন সৈন্য পাঠালেন। সাপটি সৈন্যকে সাথে নিয়ে একটি কূপের নিকট গেল। সৈনিকটি তখন কূপের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল একটি মৃত সাপ পড়ে আছে। সাপটির কোমরে একটি বিচ্ছু বসে আছে। সৈনিকটি বল্লমের সাহায্যে বিচ্ছুটিকে হত্যা করে ফেলল। এর প্রতিদান স্বরূপ সাপটি নওশিরওয়াকে 'রাইহান' বীজ প্রদান করল। বাদশাহ কাউকে এ বীজ বুনার আদেশ করলেন। সুতরাং তা থেকে রাইহান চারা উৎপন্ন হল। এদিকে নওশিরওয়াঁ সর্দি ও অন্যান্য মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য তিনি তা ব্যবহার করেন। এতে তার অনেক উপকার হয়। এভাবে পারস্যে 'রাইহান' বীজের যাত্রা শুরু হল। পরে এ রাইহান অনেক রোগ নিরাময়ের ঔষধ হিসেবে খ্যাতি লাভ করল।

একটি বিরল ঘটনা

আল্লামা আবু নাঈম (রহ.) বিরচিত 'হুলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল হামিদ বর্ণনা করেনঃ একবার আমি সুফিয়ান

ইবনে উয়ায়নার সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তখন অন্তত এক হাজার লোক উপস্থিত ছিল। এরপর ইবনে উয়ায়না (তাঁর ডান দিকে সর্বশেষ কাতারে উপবিষ্ট) এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে তোমার জানামতে সাপের একটি বিরল ঘটনা উপস্থিত লোকদেরকে শোনাও। লোকটি জবাব দিল, বেশ। শোনাচ্ছি। আগে আমার কোমর সোজা করার জন্য একটি বস্তু দিন। সুতরাং একজন উঠে গিয়ে তার কোমরের পিছনে একটি বালিশ দিয়ে দিলেন। লোকটি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার পিতা আমার মরহুম দাদার নিকট থেকে শুনেছেন, তার সময়ে আবুল হামীর নামে একজন লোক ছিলেন। লোকটি বড় আল্লাহভীরু ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি রোযা রাখতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুত পড়তেন। শিকারের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। সুতরাং একদিন তিনি শিকারের জন্য বনের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি শিকার সন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময় একটি সাপ এসে তার সম্মুখে হাযির হল। সাপটি বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ ইবনে হামীর! আল্লাহর জন্য আমাকে আশ্রয় দিন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আশ্রয় দিবেন।

ইবনে হামীর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শত্রু কোথায়? জবাব দিল সে আমার পিছনেই আসছে। এরপর ইবনে হামীর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন উম্মতের সাথে সম্পর্ক রাখ? সাপটি জবাব দিল, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত। ইবনে হামীর একথা শুনে নিজের চাদর বিছায়ে দিয়ে বললেন, এর ভিতর প্রবেশ কর। সাপটি বলল, সে তো এর মধ্যে আমাকে দেখে ফেলবে। ইবনে হামীর তাঁর চাদর প্রসারিত করে বললেন, এর ভিতরে প্রবেশ কর এবং আমার বুক বরাবর এসে পেঁচিয়ে বসে থাক। কিন্তু সাপটি পূর্বের জবাবই দিল। বলল, এখানেও সে আমাকে দেখে ফেলবে। এরপর ইবনে হামীর বললেন, তাহলে এখন আমি কোথায় রাখব? সাপটি বলল– আপনি যদি আমার মঙ্গলই কামনা করেন, তাহলে আপনার মুখ খুলুন! আমি সেখানে প্রবেশ করব। ইবনে হামীর বললেন, আমার ভয় হয়। পাছে না তুমি আমাকেই ধ্বংস করে ফেল। সাপটি জবাব দিল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সমস্ত ফেরেশতা, আরশ বহনকারী ফেরেশতা এবং আকাশের অধিবাসীদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনার কোন ক্ষতিই করব না। শত্রু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বের হয়ে যাব। সুতরাং ইবনে হামীর নিজের মুখটি খুলে দিলেন। সাপ তাঁর মুখের ভিতরে প্রবেশ করল। ইবনে হামীর তাকে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। সামান্য এগুতেই দেখলেন, একলোক তরবারি হাতে দৌড়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আমার শত্রুকে (সাপটিকে) দেখেছেন? ইবনে হামীর জবাব দিলেন, কী ধরনের শত্রু? লোকটি জবাব দিল, সে একটি সাপ। এইমাত্র এদিকে এসেছে। আমি বললাম, তাকে দেখি নাই। ইবনে হামীর বলেন, এ মিথ্যা বলার কারণে আমি শতবার ইস্তিগফার

পড়লাম। আর লোকটিকে পিছনে ফেলে আমি সম্মুখে অগ্রসর হলাম। কিছুক্ষর পর সাপটি মাথা বের করে আমাকে জিজ্ঞাস করল, একটু দেখুন তো আমার শত্রুকে দেখা যায় কিন? আমি পিছনে পিছনে ফিরে দেখলাম সেখানে কেউ নাই। তাই আমি সাপকে বললাম, তোমার শত্রু তো চলে গেছে। এবার তুমি বের হও!

সাপটি জবাব দিল, ওহে ইবনে হামীর! এখন তুমি তোমার জন্য দুটি পথের যেকোন একটি বেছে নাও! আমি বললাম, পথ দুটি কী? সাপটি বলল, আমি দুস্থানে ছোবল দিতে পছন্দ করি। প্রথমত কলিজায়; দ্বিতীয়ত হৃৎপিণ্ডে। এখন তোমার ইচ্ছে! তুমি বললে আমি ছোবল মেরে তোমার কলিজা টুকরা টুকরা করে দিব অথবা তোমার হৃৎপিণ্ড ঝলসে দিব। এতে তোমার দেহ নিস্প্রাণ নিথর হয়ে যাবে।

ইবনে হামীর জবাব দিল, সুবহানাল্লাহ! এ-ই কি তোমার ওয়াদা! এ-ই কি তোমার কসম!? কিছুক্ষণ পূর্বেই তো তুমি আমাকে লম্বা ওয়াদা দিলে! সে কারণেই তো আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম! আর তুমি সেই উপকারের এ-ই প্রতিদান দিতে চাও?

সাপটি বলল, হে ইবনে হামীর! আমি তোমার চেয়ে অধিক বোকা আর কোন লোক দেখি নাই। তোমার কি সেই ওয়াদার কথা স্মরণে নাই, যা আমার ও তোমার পিতা আদম (আঃ)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল? যে কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে বের থেকে হয়েছিল!? কেন যে তুমি আমার সাথে সদাচরণ করলে, আমার বুঝে আসে না। ইবনে হামীর বললেন, তুমি কি আমাকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? এ ছাড়া কি আর কোন উপায় নাই? সাপটি বলল, না! এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ইবনে হামীর বললেন, তোমার ইচ্ছে এরকমই হয়, তাহলে আমাকে ওই পাহাড় পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দাও। সেখানে গিয়ে আমি একটি স্থান প্রস্তাব করব। সাপটি বলল, বেশ! চল ওই পাহাড়ে। সুতরাং আমি আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে লাগলাম—

يا لطيف يا لطيف الطف بلطفك الخفى يا لطيف يا قدير اسألك بالقدرة التى

استويت بها على العرش فلم يعلم العرش اين مستقرك منه يا حليم يا عليم يا على

يا عظيم يا حى يا قيوم يا الله الا ما كفيتنى شر هذه الحية

দুআটি আমি দ্বিতীয়বার পড়েছিলাম মাত্র, এমন সময় হঠাৎ অত্যন্ত সুন্দর একলোক, মনোহারি পোশাক পরে সুগন্ধিযুক্ত অবস্থায় আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। লোকটি আমাকে আস্সালামু আলাইকুম বলল। আমি জবাবে 'ওয়া আলাইকুম সালাম ইয়া আখি' (হে ভাই!) বললাম। সালামের জবাব শুনে লোকটি বলল, তোমার রং বিবর্ণ হল কেন? তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে

কেন? আমি বললাম, এক দুশমন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তাই আমি চরম উদ্বিগ্ন। লোকটি বলল, কোথায় তোমার দুশমন? বললাম, সে আমার পেটের ভিতরেই আছে। লোকটি বলল, তাহলে তোমার মুখটি একটু খোল। ব্যাস, আমি আমার মুখটি খুলে দিলাম। লোকটি তখন 'বরগে যায়তুন' পাতার মত একটি পাতা আমার মুখে ভরে দিয়ে বলল, এটা চিবিয়ে গিলে ফেলুন। আমিও তা চিবিয়ে গিলে ফেললাম। অমনি আমার পেট মোটড়াতে লাগল আর সাপটি আমার পেটে ঘুরতে লাগল। এরপর আমি সাপটিকে বায়ুপথে খণ্ড-বিখণ্ড রূপে বের করে দিলাম। সাপটি বের থেকেই আমার অন্তরে বিরাজমান সকল ভয়ভীতি একদম দূর হয়ে গেল।

তারপর আমি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ভাই! আপনার পরিচয় কী? আপনার উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অপার দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ভাই আপনার পরিচয় কী, বলুন? এ কথা শুনে লোকটি মুচকি হেসে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নাই? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আসলেই আমি আপনাকে জানি না। এরপর লোকটি সবিস্তারে বলল : যে-সময় তোমার ও সাপের মধ্যে কথা চলছিল আর তারপর তুমি তার নিকট সুযোগ চেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দুআ করছিলে, তখন সাত আকাশের ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলা নিকট ফরিয়াদ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের শপথ! আমার বান্দার সাথে সাপটি যে আচরণ করেছে সবই আমি দেখেছি।

এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করলেন, জান্নাত থেকে তূবা বৃক্ষের একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমার বান্দা হামীরের কাছে চলে যাও। সুতরাং আমি জান্নাত থেকে তূবা বৃক্ষের পাতা নিয়ে এসে তোমাকে খাইয়ে দিলাম। আর এর প্রতিক্রিয়া তো তুমি স্বচোখেই দেখলে। বাকি আমার নাম মারূফ। আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। এরপর মারূফ বললেন, হে মুহাম্মাদ! সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবেন। কারণ, নেককাজ পাপের হামলা থেকে রক্ষা করে। যদিও যার সাথে নেককাজ (সদাচরণ) করা হয়েছে, সে ব্যক্তি তার অবমূল্যায়ন করে তা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট নেক কাজ কখনও বিনষ্ট হয় না।

শিক্ষা

হাকিম (রহ.) আবুল ইয়াসির (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআ পড়তেন—

اللهم انى اعوذبك من الهدم والتردى واعوذبك من الحرق والغرق واعوذبك من ان يتخبطى الشيطان عند الموت واعوذبك من ان اموت فى سبيلك مدبرا واعوذبك ان اموات لديغا

'হে আল্লাহ! আমি পতিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পুড়ে যাওয়া, নিমজ্জিত হওয়া, মৃত্যুর সময় শয়তানের বিভ্রান্তি, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন এবং সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

উলামায়ে কেরাম এ দুআর ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তান আল্লাহর দুশমন। তাই মুমিনের মৃত্যুর সময় সে ধোঁকা দিতে চায়। যাতে মুমিনের পরিণাম শুভ না হয়। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। বস্তুত এ আশ্রয়প্রার্থনা ছিল উম্মতের জন্যে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তানের ধোঁকা-প্রবঞ্চনা থেকে নিঃসন্দেহে নিরাপদ ও সংরক্ষিত ছিলেন।

দৈনন্দিন আমল

কতিপয় প্রবীণ উলামায়ে কেরাম বলেন : যে ব্যক্তি রাত ও দিনের শুরুতে নিম্নের দুআটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি সাপ-বিচ্ছুর দংশন ও চোরের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। দুআটি হল—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

বিচ্ছুর কামড়ে ঝাড়ফুঁক

ঝাড়ফুঁককারী প্রথমে রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে, ব্যথা এখন কোন্ স্থান পর্যন্ত পৌঁছুল? এরপর ব্যথার স্থানে লৌহদণ্ড রেখে বারবার নিম্নের দুআটি পড়বে। দণ্ডটি ব্যথার স্থানে চেপে ধরে রাখবে। তাহলে সমস্ত বিষ এসে বিচ্ছুর কামড়ের স্থানে জমা হয়ে যাবে। এরপর সে স্থানটি মুখ দ্বারা চুষতে আরম্ভ করবে। বেদনা না যাওয়া পর্যন্ত চুষতেই থাকবে। দুআটি হল—

سلام على نوح فى العالمين. وعلى محمد فى المرسلين من حاملات السم اجمعين لادابة بين السماء والارض وربى اخذ بناصيتها اجمعين كذلك يجزى عباده المحسنين ان ربى على صراط مستقيم نوح نوح قال لكم نوح من ذكرنى فلا تلدغوه ان ربى بكل شيئ عليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم.

সাপে কাটলে বা পাগলা কুকুর কামড়ালে বা বিষপান করলে পরীক্ষিত ঝাড়ফুঁক

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি কোন কোন মুহাক্কিক আলেমের লেখা মন্ত্রে দেখেছি– সাপেকাটা, কুকুরে কামড়ানো বা বিষ পানকারী রোগী বা তার বার্তাবাহক তথা কবিরাজকে অবহিতকারীকে প্রথমে সোজা দাঁড় করাবে। এরপর তার উভয় পায়ের চারপাশে একটি রেখা টানবে। আর সে রেখাটি যেন তার ডান

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে। তারপর তামার একটি নতুন চাকু নিয়ে পায়ের মাঝখানে আরেকটি রেখা টানবে। এরপর ডান পায়ের তাণ্ডু এবং বাম পায়ের টাখনুর নিচ থেকে মাটি উঠিয়ে একটি পবিত্র পাত্রে রেখে সেই মাটিতে পানি ছিঁটিয়ে দিবে। এরপর একটি ছুড়ি নিয়ে অন্য একটি পাত্রে খাঁড়া করবে। লক্ষ্য রাখবে যেন ছুরির ধারালো দিকটি উপরে থাকে। তারপর প্রথম পাত্রের পানি (যার মধ্যে পায়ের মাটিও ছিল) দ্বিতীয় পাত্রে খাঁড়া করা ছুড়ির উপর প্রবাহিত করবে। এসময় মন্ত্র পাঠ করবে। পানি এমনভাবে ঢালবে, যেন মন্ত্র পাঠ ও পানি ঢালা একসঙ্গে শেষ হয়। আগে-পরে না হয়। তারপর ছুরিটি উঠিয়ে নিয়ে শূন্য পাত্রে পূর্বের মতই খাঁড়া করবে এবং এ আমল আবার করতে থাকবে। এরপর এ পানি রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ রোগী মুক্তি পাবে। মন্ত্রটি হল—

سارا سارا فی سارا عاق نور نور نور اتا وارمیاہ فاہ یا طوا کطوا بر ملس او

زاناوصناینما کاما یوقابانیا ساتیا کاطوط اصبا وتا ابر یلس توق تنا اوس

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমলটি অত্যন্ত কার্যকরি ও পরীক্ষিত। জনৈক আরবী কবি কবিতায় সাপের ছোবল ও বিচ্ছু দংশনের চমৎকার উপমা দিয়েছেন—

قالوا حبیبك ملسوع فقلت لهم من عقرب لصلاغ او من حیة الشعر

লোকেরা আমাকে বলল– তোমার প্রেয়সীকে এক বিষাক্ত কীট দংশন করেছে। সুতরাং আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকে কি কানপট্টির বিচ্ছু কেটেছে, নাকি তার চুলের খোপায় নাগিনী তাকে ছোবল দিয়েছে?

قالو بلی من افاعی الارض قلت لهم وکیف تسعی الارض للقمر

তারা বলল– তা নয়; তাকে সংশন করেছে ভূমির কোন সর্প। এ শুনে আমি তাদের বললাম, আশ্চর্য! ভূমির সাপ চাঁদে পৌঁছুল কীভাবে?

উক্ত কবিতায় কবি তার প্রিয়তমার কানপট্টিকে বিচ্ছুর সাথে, চুলের খোঁপাকে নাগের সাথে এবং প্রেমিকাকে চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন।

কবি জামালুল মুলক ইবনে আফলাহ এক কবিতায় বলেন :

وقالوا یصیر الشعر فی الماء حیة اذ الشمس حاذته فما خلته صدقا

লোকেরা বলে, চুল পানিতে পড়লে নাকি সাপ হয়ে যায়; যখন সূর্যের আলো পড়ে তার ওপর—এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

فلما التوی صدغاہ فی ماء وجهه وقد لسعا قلبی تیقنته حقا

কিন্তু প্রেয়সী যখন তার মুখমণ্ডলে পানি ঢালল আর তার চুল দোল খেয়ে আমার অন্তরে ছোবল মারল, তখনই আমার বিশ্বাস হল—মানুষের কথা সম্পূর্ণ সঠিক।

একটি আশ্চর্য কাহিনী

মাসউদী ইবনে জুবাইর ইবনে বাকার থেকে বর্ণিত আছে, জাহেলি যুগে দু'ভাই ভ্রমণের জন বের হল। তারা রাস্তার পাশে একটি বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করতে বসল। বৃক্ষের নিচে একটি পাথর ছিল। কিছুক্ষণ পর তারা যখন উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করল, তখন সেই পাথরটির তলদেশ থেকে একটি সাপ তার মুখে দীনার নিয়ে বের হল। সাপটি ওই দীনার দু'ভাইয়ের সম্মুখে এনে ছেড়ে দিল। দীনারটি হাতে নিয়ে দু'ভাই পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এখানে কোন গুপ্তভাণ্ডার লুকায়িত থাকতে পারে। সুতরাং তারা তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করল। সাপটি প্রত্যেক দিন একটি করে দিনার তাদের সম্মুখে এনে রাখত। চতুর্থ দিন তাদের এক ভাই বলল, আর ক'দিন আমরা এখানে বসে একটি করে দীনার পেতে থাকব? কিন্তু অপর ভাই তার কথা কিছুতেই মানল না। সে একটি কুঠার হাতে নিয়ে সাপটির অপেক্ষায় বসে রইল। সাপটি পাথরের নিচ থেকে মাথা বের করার সঙ্গে সঙ্গে সে কুঠার দ্বারা সাপটিকে আক্রমণ করল। কিন্তু এ আক্রমণে সাপের তেমন কিছু হল না। আহত হল মাত্র; মরল না। সাপটি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে পাল্টা আক্রমণ করে বসল। কুঠারধারীকে ছোবল মেরে হত্যা করে দ্রুত পাথরের নিচে চলে গেল। অন্য ভাই তার মৃত ভাইকে কবরস্থ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সাপটি পরদিন বের হল; কিন্তু তার মুখে কোন দিনার ছিল না। মাথায় ছিল পট্টি বাঁধা। সাপটি বের হয়ে তার দিকে তেড়ে আসল। কিন্তু সে দ্রুত বলতে লাগল, তুমি তো জান, আমি আমার ভাইকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম। তোমাকে হত্যা করায় আমি সম্মত ছিলাম না। হতভাগ্য আমার কথায় কান দিল না। তোমার উপর আক্রমণ করে বসল। যার ফলে তার জীবনাপাত ঘটল। এ থেকে কি তোমার বুঝে আসে না যে, আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না; তুমি আমার প্রতি গত চার দিনের মতই অনুগ্রহ করবে। কিন্তু সাপটি নেতিবাচক জবাব দিল। লোকটি বলল, এর কারণ কী? সাপ জবাব দিল, আমি ভাল করেই জানি, তোমার অন্তর আমার প্রতি কখনও পরিষ্কার হবে না। কেননা আমি তোমার ভাইকে হত্যা করেছি। তুমি তার কবরটি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। আর আমার অন্তরও তোমার প্রতি পরিষ্কার নয়। কেননা আমার মাথার এ জখম স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বেদনা, যা তোমার ভাইয়ের হাতে আমকে ভোগ করতে হয়েছে। তারপর সাপটি (মূলত জিনটি) মহিলা কবি নাবেলার নিম্নাক্ত কবিতা বলল—

وما لفيت ذات الصفا من حليفها وكانت تربه المال زعيا وظاهره

'আমি আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে কোন সদাচরণ লক্ষ্য করি নাই। অথচ আমার ধন-সম্পদ তাকে লালন পালন করত। তার বাহ্যিক খবর রাখত।'

একটি অভিনব ঘটনা

রিহলা ইবনে সালাহ ও তারিখে ইবনে নাজ্জার-এ ইউসুফ ইবনে আলী মুহাম্মাদ যানজামী (শাফিয়ী মাযহাবপন্থী)-এর জীবনীতে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন : শেখ আবু ইসহাক শীরাজী (রহ.) কাযী ইমাম আবুত্ তাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, বাগদাদের মনসুর জামে মসজিদে অনেক জ্ঞানী-গুণাজনের সমাবেশ চলছিল। সেখানে এক খুরাসানী লোক এসে 'মুছররাত' (مصرا)-এর বিষয়ে দলীল-প্রমাণ চাইল। সুতরাং কোন দলীলদাতা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করলেন। তখন ওই খুরাসানী যুবক লোকটি জবাবে বলল, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কাযী সাহেব বলেন : যুবকটি তার কথা শেষ করতেও পারল না, এমন সময় ছাদ থেকে একটি সাপ তার সম্মুখে এসে পড়ল। লোকজন সাপের ভয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন করতে লাগল। কিন্তু সাপটি কাউকেও আক্রমণ করল না; সোজা ওই খুরাসানী যুবকের প্রতি তেড়ে গেল। কাজেই সেখানে উপস্থিত জনতা ওই যুবককে বলল : শীঘ্রই তাওবা কর। কেননা তুমি এইমাত্র হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এটা তারাই শাস্তি। সুতরাং যুবকটি তাড়াতাড়ি তাওবা করে নিল। আর সাপটি তার পিছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘটনাটি প্রমাণিত সত্য। এ ঘটনার বর্ণনায় তিনজন ইমাম রয়েছে—কাযী আবু তাইয়িব, তাবারী, আবু ইসহাক ও আবুল কাসেম যানজানী।

হুবহু এরূপ আরেকটি ঘটনা আবুল ইয়ামীন কিন্দী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার নিকট আবু মনসুর কাযায—তার নিকট আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম নাহভী—তার নিকট করিমী, তার নিকট ইয়াযীদ ইবনে কুররাতুদ-দেরা হযরত উমর ইবনে হাবীব থেকে মারফূ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাবীব বলেন, একবার আমি খলীফা হারূন রশীদের দরবারে উপস্থিত হলাম। সেখান 'মুছররাত'-এর উপর আলোচনা চলছিল এবং খুব তর্ক-বিতর্ক চলছিল। কেউ কেউ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আলোচনা করলেন। কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষ এ দলীলটি গ্রহণ করল না বরং বলল, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসটি সঠিক নয়। খলীফা হারুনুর রশীদও এদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললাম, এ হাদীসখানা অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একজন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী।

একথা শুনে খলীফা হারুনুর রশীদ আমার দিকে শ্যান দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তখন মাহফিল থেকে উঠে ঘরে চলে গেলাম। ঘরে গিয়ে আমি বসেছি

মাত্র, ঠিক ওই মুহূর্তে ঘরের দরজায় এক সিপাহী এসে বলল, খলীফা আপনাকে তলব করেছেন। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, হে আল্লাহ! তুমি জান আমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীর মর্যাদা রক্ষায় প্রতিবাদ করেছিলাম মাত্র। আমি হারুনুর রশীদের দরবারে হাযির হয়ে দেখলাম, তিনি শোয়ার চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতে তরবারি নিয়ে বসে আছেন। তার সম্মুখে বিছানো আছে অপরাধীকে রেখে হত্যা করার চামড়াটাও। আমাকে দেখে খলীফা বললেন, হাবীব! অদ্যাবধি এমন দুঃসাহস কার হয় নাই যে, আমার কথাকে খণ্ডন করে জবাব দেয়। আজ তা তুমি করলে। আমি নিবেদন করলাম, আমীরুল মুমিনীন! আপনার কথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণিত শরঈ আহকাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছিল।

হারুনুর রশীদ বললেন, তা কীভাবে? আমি বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ যখন অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে, তখন পূর্ণ শরীয়াতই বাতিল হয়ে যাবে এবং সমস্ত ফরয নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই পরিত্যাজ্য ও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ সবকিছুই তাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁরা ব্যতীত দীন ইসলামকে জানার-বুঝার আর কোন মাধ্যম নাই। একথা শুনে হারুনুর রশীদ বললেন : আল্লাহ কসম! ইবনে হাবীব তুমি তো আমাকে জীবন দান করলে। আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন! এরপর আমাকে দশ সহস্র দীনার পুরস্কার দিতে বলবেন।

এরূপ আরেকটি ঘটনা 'কাফ' পরিচ্ছেদে 'কিরাদ' (قرد) শিরোনামে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে অত্যাসন্ন, যে ব্যক্তি মিম্বরে বসে হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর সমালোচনা করত।

পরিশিষ্ট

তারেক ইবনে শাবাব যুহরী বর্ণনা করেন : হযরত উমর (রাঃ) মিরাস সংক্রান্ত অনেক মাসয়ালায় দাদাকে 'ভাই' আখ্যা দিয়ে মামলা মীমাংসা করেছেন। এরপর তিনি সমস্ত সাহাবীকে একত্র করেন এবং লেখার জন্য একটি লোহার পাত্র নেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মনে করছিলেন, হযরত উমর (রাঃ) মীরাসের বিষয়ে দাদাকে ভাইয়ের মতই ঘোষণা করবেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) লিখার জন্য পাত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় একটি সাপ দেখা গেল। এতে সাহাবা কেরাম (রাঃ) বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করতেন, আমি এ মাসয়ালা জারি করি, তবে আমি অবশ্যই জারি করতাম। এরপর তিনি হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর ঘরে তাশরীক নিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর অনুমতি পেয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন এক দাসী হযরত যায়িদ (রাঃ)-এর মাথায় তৈল

দিচ্ছিল। তিনি দাসীকে সেখান থেকে চলে যেতে নির্দেশ দেন। এরপর তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করলেই তো আমি স্বয়ং গিয়ে হাযির হতাম। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আপনি দাসীকে কাজ করতে দিন। আমার প্রয়োজনেই আমি আপনার নিকট এসেছি। আমার ইচ্ছে (মীরাসের বিষয়ে) আমি দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করব। হযরত যায়িদ (রাঃ) বললেন, আমার অভিমত এর বিপরীত। একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) রাগ করে সেখান থেকে চলে আসলেন। এরপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত যায়িদ (রাঃ)-এর নিকট পুনঃ সংবাদ পাঠালে হযরত যায়িদ (রাঃ) এ বিষয়ে তাঁর মতামত একটি কাষ্ঠখণ্ডে লিখে হযরত উমর (রাঃ)- এর খেদমত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মতামত একটি বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। লিখলেন, ধরুন! একটি বৃক্ষে একটি কাণ্ড উদগত হল। তা থেকে একটি শাখা বের হল। এরপর সেই শাখা থেকে আরেকটি শাখা বের হল। আর ওই কাণ্ডটি প্রত্যেকটি শাখাকে পরিতৃপ্ত করে। এখন প্রথম শাখাটি কাটতে গেলে পানি অপর শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। আর দ্বিতীয় শাখাটি কাটতে গেলেও পানি প্রথম শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং হযরত যায়িদ (রাঃ)-এর এ পত্রখানা হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছালে হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে তা পড়ে শুনালেন এবং বললেন, হযরত যায়িদ (রাঃ) দাদার বিষয়ে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কাজেই আমি তা-ই জারি করছি।

উপসংহার

ইমাম হাফেজ আবু উমর ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বর্ণনা করেন– আবু খারাশ হাজলী (অর্থাৎ খুয়াইলিদ ইবনে মুররাহ) হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করেন। আবু উমর বলেন, আবু খারাশ অতি দ্রুতবেগে দৌড়াতে পারতেন। অনেক সময় তিনি ঘোড়াকেও পিছনে ফেলে দিতেন। তার একটি কবিতা শুনুন—

رقوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم

'সাপে কাটায় ওঝা আমাকে ঝাড়ল। বলতে লাগল, হে খুয়াইলিদ? ভয় কর না! (তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।) আমি বললাম, আমার অবস্থা নিদারুণ! আমি মানুষের মুখও চিনতে পারি না। অতি ঘুমে আমার মাথা নুইয়ে যায়।'

আবু খারাশ পরে একসময় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ইসলামী বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করতেন। তার মৃত্যুর কারণ ছিল, একবার হজ্জে গমনকারী কতিপয় ইয়ামানী লোক তার কাছে অবস্থান করেন। তার বাড়ি থেকে পানি ছিল দূরে। সে-সময় তার ঘরের পানিও ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ইয়ামানী মেহমানদেরকে একটি দড়ি, একটি বালতি এবং একটি বকরী দিয়ে বললেন, আজ হঠাৎ আমার ঘরের পানি ফুরিয়ে গেল। তাই আপনারা অমুক

জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করুন এবং এ বকরীটি জবাই করে খাওয়া সারুন। আর যখন আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন, তখন রশি ও বালতি কূপের নিকটেই রেখে যাবেন। আমি সকালে গিয়ে তা নিয়ে আসব। মেহমানগণ বলল, আল্লাহ কসম! আমরা আজ রাত্রে মোটেই সফর করব না আর পানিও আনব না।

সুতরাং আবু খারাশ নিজেই রশি-বালতি নিয়ে কূপের দিকে ছুটলেন। কূপ থেকে গিয়ে মেহমানদের জন্য পানি নিয়ে এলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে মেহমানদেরকে পানি দেয়ার পূর্বেই তাকে একটি সাপ দংশন করল। তিনি খুব দ্রুত বাড়ি এসে মেহমানদেরকে পানি দিয়ে বললেন, অতি সত্বর বকরীটি জবাই করুন। কিন্তু তিনি তাদের নিকট একথা ব্যক্ত করেন নাই যে, তাকে সাপে সংশন করেছে। সুতরাং মেহমানগণ বকরীটি জবাই করল এবং রান্না করে তৃপ্তিসহ খেল। তাদের সকাল হয়ে গেল খেতে খেতে। এদিকে আবু খারাশ বিছানায় মরেই প্রভাত করলেন। মেহমানগণ বিষয়টি জানার পর তারা তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে চলে গেল।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) যখন আবু খারাশ-এর মৃত্যুর খবর অবগত হলেন এবং জানতে পারলেন, ইয়ামানী মেহমানগণই তার মৃত্যুর কারণ, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। বললেন– মেহমানকে আপ্যায়ন করা সুন্নত না হলে আমি আদেশ জারি করতাম, ইয়ামানীদেরকে ভবিষ্যতে আর কখনও মেহমান হিসেবে রাখবে না এবং এ আদেশ ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র প্রচার করে দিতাম। এরপর তিনি ইয়ামনের শাসকের নামে একটি ফরমান প্রেরণ করলেন— এ মেহমানগণ হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই তাদের নিকট থেকে আবু খারাশের দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করুন এবং তাদেরকে শিক্ষামূলক শাস্তিও প্রদান করুন।

ইমাদুদ্দৌলার কাহিনী

কাযি ইমাম শামসুদ্দীন আহমাদ ইবনে খাল্লিকান 'ওয়াকিয়াতুল আয়ান' গ্রন্থে ইমাদুদ্দৌলাহ আবুল হাসান আলী ইবনে বুইয়াহ'র জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, তার পিতা ছিলেন একজন মৎস্য শিকারী (জেলে)। এ ছাড় তার অন্য কোন পেশা ছিল না। তার ছিল তিন পুত্র। তাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন ইমাদুদ্দৌলা, মেঝ রুকনুদ্দৌলা আর সর্বকনিষ্ঠ মায়াযুদ্দৌলা। তারা তিন ভাইই বাদশাহ হয়েছিলেন। ইমাদুদ্দৌলাহই ছিলেন পরবর্তী দুজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাদুদ্দৌলার শাসনাধীন এলাকা ছিল ইরাক, আরব-আযম, পারস্য ও আহওয়ায এলাকা। তিনি প্রজাসাধারণের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করতেন এবং তাদেরকে ভালবাসতেন।

ইবনে খাল্লিকান বলেন, একবার ইমাদুদ্দৌলাহর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ইরানের বিখ্যাত নগরি 'শীরাজ' তার হস্তগত হলে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধবরা

তার কাছে ধন-সম্পদ প্রার্থনা করলেন। ঘটনাক্রমে সে-সময় ইমাদুদ্দৌলাহর নিকট ধন-সম্পদ ছিল না, যা দিয়ে তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। এ কারণে ইমাদুদ্দৌলাহ গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং এককক্ষ থেকে অন্যকক্ষে পায়চারি করতে লাগলেন। অথচ কক্ষগুলো ছিল একদম শূন্য। তিনি এ ব্যাপারে একটা সুরাহা করার যথেষ্ট চিন্তা করলেন। কিন্তু কোন উপায় বের করতে পারলেন না। তখন তিনি সাথীবর্গের নিকট ফিতে আসলেন। এভাবে কয়েক দিন কেটে গেল। এরপর একদিন বন্ধুরা ধন-সম্পদের জন্য তাঁকে তাগিদ শুরু করল। তাই তিনি আবার ওই শূন্য কোঠায় আসলেন এবং শুয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল একটি সাপের ওপর। সাপটি কক্ষের কোন এক ফাটল থেকে বের হয়ে অন্য ফাটলে চলে গেল। তিনি ভয় পেলেন, না জানি সাপটি তার উপর এসে পড়ে। তাই তিনি প্রহরীদেরকে ডেকে বললেন, এ সিঁড়িটি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখত সাপটি কোথায় গেল? প্রহরীগণ সিঁড়িতে উঠে দেখতে পেল, এক ছাদের সঙ্গে আরেকটি ছাদ মিশে আছে। তার মধ্যখানে একটি জানালার সংযোগ রয়েছে। প্রহরী ইমাদুদ্দৌলাকে এ সংবাদ দিলে তিনি তা খুলতে আদেশ করলেন। জানালা উন্মুক্ত করা হলে দেখা গেল, তাতে কয়েকটি সিন্দুক রয়েছে। ইমাদুদ্দৌলা সিন্দুকগুলে খুলতে আদেশ করলেন। সিন্দুকগুলো খোলা হলে দেখা গেল তাতে ৫ লক্ষ দিনার আছে। সবগুলো দিনার ইমাদুদ্দৌলার সম্মুখে রাখা হল। তিনি নেহাৎ খুলি হলেন দিনারগুলো দেখে। আপন সাথীবর্গকে ডেকে এনে তাদের সকলের দাবিই পূর্ণ করলেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। ওই সিন্দুকগুলোতে দিনার ছাড়াও অত্যন্ত মূল্যবান কাপড়ের থানও পাওয়া গেল। ইমাদুদ্দৌলা সে কাপড় দ্বারা পোশাক তৈরির জন্য একজন অভিজ্ঞ দর্জির সন্ধান করতে লাগলেন। লোকেরা তাঁকে জনাল, পূর্ববর্তী বাদশাহর পোশাক প্রস্তুতকারী দর্জিটি ছাড়া এখানে আর কোন ভাল দর্জি নাই।

সুতরাং ইমাদুদ্দৌলা ওই দর্জিকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। দর্জি লোকটি ছিল বধির। তার নিকট পূর্ববর্তী বাদশাহর কিছু আমানত ছিল। ইমাদুদ্দৌলা তাকে তলব করায় সে মনে করল, কোন চোগলখোর হয়তো ইমাদুদ্দৌলার কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। বর্তমান বাদশাহ হয়তো তার কাছে গচ্ছিত আমানতের কথা জেনে গেছেন। সুতরাং ইমাদুদ্দোলার কাছে এসে দর্জি হাজির হল। তিনি কাপড় মাপতে বললেন; কিন্তু সে বধির হওয়ায় কিছুই বুঝতে পারল না। বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আমার নিকট মাত্র ১২টি সিন্দুক রয়েছে। আর সেই সিন্দুকগুলোতে কী রয়েছে, আমি কিছুই জানি না। ইমাদুদ্দৌলা দর্জির মুখে একথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এরপর তিনি নিজের ক'জন লোককে দর্জির সাথে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, সিন্দুকগুলো এখানে নিয়ে এস! সুতরাং দর্জি বাড়িতে গিয়ে ১২টি সিন্দুক তাদের হাতে তুলে দিল। তারা

সিন্দুকগুলো ইমাদুদ্দৌলার সম্মুখে নিয়ে আসল। তিনি সিন্দুকগুলো খোলার আদেশ করলেন। তা খুলে দেখা গেল এগুলোর মধ্যে অতি মূল্যবান কাপড়চোপড় রয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা ইমাদুদ্দৌলাহকে অনেক অনুগ্রহ করলেন। ইমাদুদ্দৌলাহ ৩৩৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ঘরের ভিতর যে সমস্ত সাপ পাওয়া যায়, সেগুলো দেখামাত্রই মারতে নাই বরং তিন দিন পর্যন্ত এগুলোকে সাবধান করবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মদীনাতে কিছু জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং ঘরে কোন সাপ দেখলে তোমরা এগুলোকে তিন দিন পর্যন্ত সুযোগ দিবে।' কোন কোন আলেম এ হাদীসকে শুধু মদীনা শরীফের সাথেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান; কিন্তু আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, এ আদেশ সার্বজনীন। এটা প্রত্যেক শহরেই প্রযোজ্য। নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা সাবধান করবে—

انشدكن بالعهد الذى اخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السلام

ان لا تبدولنا ولا تؤذونا

'আমি তোমাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যা হযরত নূহ ও হযরত সুলাইমান (আঃ) তোমাদের থেকে নিয়েছিলেন—'তোমরা আমাদের সম্মুখে আসবে না এবং আমাদেরকে কষ্ট দিবে না'।

একটি পরীক্ষিত আমল

কতিপয় শাইখ থেকে বর্ণিত আছে, কাগজের ৪টি টুকরায় নিম্নেলিখিত অক্ষরগুলো লিখে ঘরের চারকোণে রেখে দিলে ইনশাআল্লাহ সেই ঘর থেকে সাপ পালিয়ে যাবে; কোন সাপ আর ঘরে প্রবেশ করবে না। অক্ষরগুলো হল—

١٧٨١١١٦٧٧ ر ح ٥٥٧١١٥١١٠١٩٩٧٩ برو ١١م

١١ح ١١١ح ط لا ٨ ٨

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, উপরিউক্ত আমলটি সাপ তাড়ানোর জন্য পরীক্ষিত। এ আমল আমি আমার উস্তাদগণের নিকটে পেয়েছি। এ আমল বারবার পরীক্ষা করা হয়েছে।

সাপের শরঈ বিধান

সাপ ক্ষতিকর বিধায় খাওয়া হারাম। এমনিভাবে গোশত দ্বারা বানানো প্রতিষেধকও মাকরূহ তাহরিমী। কিন্তু যে সমস্ত সামুদ্রিক মাছ সাপ সদৃশ সেগুলো খাওয়া জায়িয। এটা ইমাম শাফেয়ীর অভিমত।

হানাফীদের মতে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। আবার কেউ কেউ শর্তসাপেক্ষে জায়িয বলেছেন। তাদের মতে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি বলেন– এ ছাড়া আরোগ্য লাভের আর কোন ঔষধ নাই, তাহলে জায়িয। (দূররে মুখতার)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাপ মারতে যে আদেশ করেছেন তা মুস্তাহাব পর্যায়ের আদেশ।

হাদীসে সাপের উল্লেখ

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা মিনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে একটি গুহাতে বসা ছিলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর 'সূরা মুরসালাত' অবতীর্ণ হয়। আমরা এ সূরাটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র যবান থেকে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটি সাপ বের হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটিকে মারতে আদেশ করলেন। আমরা সাপটি মারার জন্য সাপের পিছনে দৌড়ালাম; কিন্তু সাপটি গর্তে ঢুকে পড়ায় আমরা তাকে মারতে পারলাম না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভালই হল! তোমরা এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে আর সে-ও তোমাদের হাত থেকে বাঁচল।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যখন থেকে সাপের সাথে আমাদের বিরোধ শুরু হল, তখন থেকেই আমরা তার থেকে নিরাপদ নই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাপ না মেরে ছেড়ে দেয়, সে মুসলমান নয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রাঃ) বলেন– যে ব্যক্তি এ ভয়ে সাপ মারে না যে, সে প্রতিশোধ নিবে এবং না মেরে ছেড়ে দেয়, তার উপর আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ।

সুনানে বায়হাকীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– সাপ, বিচ্ছু, কাক ইত্যাদি আল্লাহর নাফরমান।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি সাপ মারল, সে যেন মুশরিককে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিশোধের ভয়ে না মেরে ছেড়ে দিল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাপ একটি বিকৃত প্রাণী। যেমনি বনী ইসরাঈলকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম মালেক (রহ.) মোয়াত্তার শেষ দিকে এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হিশাম যাহরাহ'র আযাদকৃত দাস আবু সাইব থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলাম। তিনি তখন নামায আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি তার নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। এমন সময় সেখানে বিছানো একটি খাটিয়ার নিচে কোন বস্তুর ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি তাকিয়ে দেখলাম একটি সাপ। এরপর

আমি তা মারতে উদ্ধত হলাম। হযরত আবু সাঈদ নামাযরত থেকেকই আঙুলের সাহায্যে সেটিকে না মারতে ইশারা করলেন। তাই আমি ফিরে এলাম। নাযায শেষে তিনি ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : এ কক্ষটি কি দেখছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ! দেখছি। এরপর তিনি বললেন, এ কক্ষে আমাদেরই নতুন বিবাহিত এক যুবক থাকত। আমরা সেই যুবকসহ খন্দক যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হলাম। যুবকটি দ্বিপ্রহরের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুমতিক্রমে বাড়িত চলে আসত। আবার ফিরে যেত। যথারীতি একদিন সে অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাবেই যখন, তোমার হাতিয়ারটা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা আমার ভয় হয়, না জানি বনু কুরায়যা তোমাকে অপমান করে। সুতরাং তিনি তার বল্লমখানা সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে পৌঁছে তিনি দেখলেন, তার স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগল। তাই সে স্ত্রীকে মারার জন্য বল্লমটা সোজা করল। স্ত্রী বলল, একটু থামুন! আগে ঘরে এসে দেখুন কী হয়েছে? কী কারণে আমি ঘরের বাইরে এসেছি। তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, বিরাট এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার উপর বসে আছে। যুবক সাপের গায়ে বল্লম বসিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরেই বল্লমটা খাঁড়া করল। সাপটি টফট করে যুবককে ছোবল মেরে বসল আর যুবকটি ঘরের মেঝেতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সাপটিও মারা গেল। কিন্তু বুঝা গেল না কে আগে মরেছে—সাপ, নাকি যুবক।

আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে এ ঘটনা তাঁকে অবহিত করলাম এবং নিবেদন করলাম, আপনি এ যুবক জীবিত হওয়ার জন্য দুআ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর মাগফিরাতের জন্য দুআ কর! অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুযকের জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মদীনাতে কিছু জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই যখন তোমরা ঘরের ভিতরে কোন সাপ দেখবে, তখন সাপটিকে মারার পূর্বে তিন দিন পর্যন্ত তাকে সতর্ক করতে থাকবে। এরপর যদি সে তোমাদের সম্মুখে আসে, তাহলে সেটিকে মেরে ফেলবে। কেননা অবশ্যই সে শয়তান।

সাপটিকে তিনবার সাবধান করতে হবে, নাকি তিন দিন?—এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সঠিক মতে তিন দিন পর্যন্ত সাবধান করতে হবে।

'উসদুল গাবা' গ্রন্থে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা যখন

ঘরের মাঝে কোন সাপ দেখবে, তখন উচ্চঃস্বরে বলবে– তোমার সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করা উচিত, যা তুমি হযরত নূহ এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সাথে করেছিলে। এরপরও যদি সে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তাকে মেরে ফেলবে।

হাফেয আবু উমর আব্দুল বার (রহ.) বর্ণনা করেন, উকবা ইবনে আমের ইবনে নাফে' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-এর খালাত ভাই। তিনি যখন আফ্রিকা জয় করলেন, তখন ভয়ঙ্কর সর্পরাজ্য 'কিরওয়ান' গিয়ে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা দিলেন— 'হে উপত্যকার অধিবাসীরা! এখন থেকে এ এলাকায় আমরা বসবাস করব। তাই তোমরা এ এলাকা খালি করে দাও!' তার এ আহ্বানের পর ঘটল আশ্চর্য ঘটনা। প্রতিটি পাথরের তলদেশ এবং প্রতিটি বৃক্ষের শিকড় থেকে সাপ বের হয়ে অন্য এলাকায় চলে যেতে লাগল। যখন পুরো এলাকা শূন্য হয়ে গেল, তখন উকবা ইবনে আমের তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন : এবার আল্লাহর নামে এখানে বসবাস করতে থাক!

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) ছিলেন 'মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াহ' অর্থাৎ তাঁর যেকোন দুআ কবুল হত। হানাফী উলামায়ে কেরাম বলেন, সাদা সাপ মারা উচিত নয়। কেননা এরা জিন। কিন্তু ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন, সর্বপ্রকার সাপই মারা জায়েয। এতে কোন বাধা নেই। অবশ্য প্রথমে এদেরকে সাবধান করা উত্তম।

মাসয়ালা

আহইয়া (احياء) কিতাবের 'সফরের শিষ্টাচর' অধ্যায়ে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি সফর বা গৃহে অবস্থানকালে মোজা পরিধান করলে সে যেন মোজাটি পরিধানের পূর্বে ঝেড়ে নেয়। তাহলে সে সাপ-বিচ্ছুর সম্ভাব্য ছোবল থেকে রক্ষা পাবে। এ মাসয়ালার দলীল হল, হযরত আবু উমামার একটি হাদীস। আমি তা গাইন পরিচ্ছেদে গুরাব (غراب/ কাক) শিরোনামে উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ।

'ফাতাওয়ায়ে ইমাম নববী (রহ.)' গ্রন্থে একটি মাসয়ালা লিখা আছে— কোন সাপুড়ে তার অভ্যাসমাফিক সাপ ধরল আর সাপ তাকে ছোবল মারার কারণে সে মারা গেল, তাহলে সে গোনাহগার হবে কি-না?

এর জবাব দেয়া হয়েছে, যদি সে সাপ ধরার বিদ্যায় মানুষের আস্থা-বিশ্বাস অর্জনের নিয়তে সাপ ধরে এবং সে এ বিষয়ে অভিজ্ঞও বটে আর তার সাপ থেকে নিরাপদ থাকার প্রবল বিশ্বাসও আছে, তাহলে ওই সাপের ছোবলে মারা গেলে সে গোনাহগার হবে না। তদ্রূপ সাপটি সাপুড়ের হাত থেকে ছুটে গিয়ে কাউকে ছোবল মারলে ওই সাপুড়ে থেকে কোনরূপ জরিমানাও আদায় করা যাবে না।

ইমাম আহমাদ (রহ.) 'যুহদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন : এক সাপুড়ের ঝুড়িতে কিছু সাপ ছিল। সে ইয়ামানে কারও মেহমান হল। রাত্রে ঝুড়ি থেকে একটি সাপ বের হয়ে একজনকে ছোবল মারল। ইয়ামানের গভর্নর হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট এ ঘটনা জানিয়ে এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, জানতে চাওয়া হল। জবাবে তিনি লিখলেন : এজন্য সাপুড়ের কোন জরিমানা হবে না। অবশ্য তাকে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিবে, ভবিষ্যতে কারও মেহমান হলে ঘরের মালিককে অবগত করতে হবে যে, আমার সাথে সাপ রয়েছে।

হাফেহ আবু সাউদ সুলাইমান ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইসফাহানী 'কিতাবুল আরবাঈন আলা মাযহাবিল মুহাক্কিকীন মিন সুফিয়াহ' গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার পিছন দিক থেকে আমার পাগড়ির শিমলা ধরে বললেন : হে ইমরান! আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা তিনি ভালবাসেন আর কৃপণতাকে তিনি অপছন্দ করেন। তাই তোমরা খাও এবং খাওয়াও। যদি তোমরা হাত গুটিয়ে ফেল, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের রিযকের দরজা বন্ধ করে দিবেন। আর স্মরণে রেখ! যখন বিপদাপদ বা মুসিবত ঘিরে ফেলে, তখন বিবেক-বুদ্ধির দিশাই তার নিকট প্রিয়তর হয়। দানশীলতা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়তর যদিও তা সামান্য পরিমাণ খেজুর হোক না কেন। তদ্রূপ তিনি সাহসিকতাকে ভালবাসতেন, যদি তা দ্বারা একটি সাপও মারা হয়।

মানুষ এবং সাপের মধ্যেকার শত্রুতা প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন : إهبطوا بعضكم لبعض عدو —'নেমে যাও ভূ-পৃষ্ঠে; তোমরা একে অপরের শত্রু'।

সুতরাং অধিকাংশ আলেমের মতে এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এতে সাপ ও শয়তানও শামিল ছিল।

প্রবাদ ও উদাহরণ

আরবগণ চালাক-চতুর লোকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে থাকেন : فلان اسمع من حية واعدى من حية | اعدى (আ'দা) শব্দটি عدو (আদুয়্যুন) থেকে চয়িত। অর্থ— পালন করা। ভয় পাওয়া। কেননা সাপ কোন ভয় অনুভব করলে অতি দ্রুত নিজ গর্তে ঢুকে পড়ে।

হাদীসেও সাপের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : ইসলাম প্রকাশ পেয়েছে অচেনা পরিবেশে। শীঘ্রই আবার অপরিচিত হয়ে যাবে এবং একমাত্র মক্কা-মদীনাতেই ইসলাম সঙ্কুচিত হয়ে বাকি থাকবে। যেমনি সাপ তার গর্তে আশ্রয় নেয়।

হাদীস শরীফে 'মাসজিদাইন' তথা দু'মসজিদ দ্বারা 'মসজিদে হারাম' (বায়াতুল্লাহ) ও 'মসজিদে নববী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। কাজেই হাদীসখানার উদ্দেশ্য হল, শেষ যামানায় মুমিনের ঈমান ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহব্বত তাকে মদীনায় টেনে নিবে। উক্ত হাদীস দ্বারা আরেক উদ্দেশ্য থেকে পারে, মদীনাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে এবং মদীনায় ইসলাম জাঁকজমকপূর্ণভাবে অবশিষ্ট থাকবে। এর দ্বারা আরও উদ্দেশ্য থেকে পারে, মানুষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের প্রতি ফিরে আসবে কিংবা সে-সময় ইলমে দ্বীন শুধু মদীনার আলেম-উলামা থেকেই হাসিল হবে। ইনশাআল্লাহ 'মীম' অনুচ্ছেদে مطية শব্দের অধীনে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত নিম্নেলিখিত হাদীসখানা উল্লেখ করব—

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : শীঘ্রই মানুষ দীনী ইলম অর্জনের জন্য দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করবে। কিন্তু মদীনা ব্যতীত কোথাও সঠিক ইলম পাওয় যাবে না।

কোন বস্তুর অপছন্দনীয়তা বর্ণনা করতে বলা হয় : من الريح السذاب الى انحيات। কেননা প্রসিদ্ধ আছে, গন্ধমের দুর্গন্ধ সাপের জন্য অসহনীয়। এভাবে যখন কোন দুর্বলের সাথে সবলের মোকাবেলা হয়, তখন বলা হয়– الحيوت من الحية। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে– الحيوان من الحية।

চিকিৎসায় সাপের উপকারিতা

ঈসা ইবনে আলী লিখছেন : প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত কোন রোগীকে যদি জীবন্ত সাপেও দাঁত উঠিয়ে গলায় বেঁধে দেয়া হয়, তাহলে আর জ্বর আসবে না। দাঁত ব্যথার জন্যও তা উপকারী। সাপের গোশত পঞ্চেন্দ্রীয়ের নিরাপত্তাবিধায়ক। সাপের গোশতের ঝোল চোখের জ্যোতিবর্ধক। সাপের গোশত শক্ত ও উষ্ণ হয়। এটা রক্ত পরিষ্কার করাসহ অনেক রোগের জন্য উপকারী। সাপের চামড়া উলের কাপড়ের সাথে রেখে দিলে কাপড় বিনষ্ট হয় না; কাপড় পোকামাকড় থেকে নিরাপদ থাকে। সাপের চামড়া পুড়িয়ে যায়তুন তৈলে মিশ্রিত করে দাঁত ও মাড়ির ব্যথায় ব্যবহার করলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়। এমনিভাবে সাপের চামড়া পিষে সিরকায় মিশিয়ে টাক মাথায় ব্যবহার করলে চুল গজায়। সাপের চামড়া অর্শ্ব রোগের জন্যও বেশ উপকারী। সাপের ডিম সোহাগা ও সিরকায় মিশিয়ে ধবল রোগীর শরীরে মালিশ করলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। সাপের ডিম তিনিটি খেজুরের সাথে মিশ্রিত করে ফোঁড়া ও বাগী রোগীকে খাওয়ালে আরোগ্য লাভ করবে। সুস্থ মানুষ খেলেও ভবিষ্যতে আর ফোঁড়া ও বাগী হবে না। সাপের কলিজা প্রচণ্ড জ্বরের রোগীর গলায় বেঁধে দিলে জ্বর সেরে যায়।

ফায়দা

ইবনে শায়বা প্রমুখ বর্ণনা করেন : এক বৃদ্ধ লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় খেদমতে হাযির হলেন। তাঁর চোখ সাদা এবং আলোহীন ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার চোখে কী হয়েছে? লোকটি বলল, অজান্তে আমি একবার সাপের ডিমে পা দ্বারা আঘাত করি। এতে আমার চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। একথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখে নিজের লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন। এতে তার চোখের জ্যোতি ফিরে এল এবং এমন জ্যোতি ফিরে এল যে, আশি বছর বয়সেও লোকটি সূচের ছিদ্রে সূতা লাগাতে পারত।

স্বপ্নে সাপ দেখার ব্যাখ্যা

সপ্নে সাপ দেখার ব্যাখ্যা নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— দুশমন, ধন-সম্পদ, প্লাবন, রমণী ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি।

সপ্নে কেউ সাপের সাথে যুদ্ধ করছে আর সাপ তাকে ছোবল দেয়ার পন্থা খুঁজছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, তার শত্রু আছে। যেমন– কুরআনে কারীমে শত্রুকে শত্রু দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সপ্নে কেউ সাপ ধরেছে, সাপের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং নিজের ইচ্ছেমত পরাভূত করতে পেরেছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সপ্নেদ্রষ্টা অনেক ধন-দৌলতের মালিক ও বিজয়ী হবে। কেননা হযরত মূসা (আঃ) সাপ দ্বারাই ফেরাউনকে পরাজিত ও পরাভূত করেছিলেন। সপ্নে কেউ নিজের মুখ থেকে সাপ বের হচ্ছে দেখল। সুতরাং এ স্বপ্নদ্রষ্টা রোগী হলে বুঝবে তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। কেননা 'হাইয়াতুন' (حيّة/সাপ) ও 'হায়াতুন' (حياة/জীবন) একই মূলধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আর বৃক্ষে-ক্ষেতে সাপ ঘোরাফেরা করতে দেখা স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রী বিয়োগের আলামত।

কেউ স্বপ্নে নিজের স্ত্রী সাপ প্রসব করেছে দেখল। বুঝবে স্বপ্নদ্রষ্টার সন্তানরা বিদ্রোহী হবে। স্বপ্নে কেউ মৃত সাপ দেখলে এর দ্বারা তার শত্রু উদ্দেশ্য। তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপদ রেখেছেন। কেউ স্বপ্নে সাপের কাঁচা গোশত খাচ্ছে দেখল। বুঝবে তার শত্রু অদৃশ্য হয়ে যাবে। স্বপ্নে কেউ নিজ ঘরের ছাদ থেকে নিচে সাপ পতিত হয়েছে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, সে ঘরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে। স্বপ্নে কেউ সাপ গিলে ফেললে বুঝবে অচিরেই সে রাজত্বের মালিক হবে।

সাপের সাথে মেলামেশা করা আর সাপের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি না হওয়া ইত্যাদির অর্থ হল, সে তার দুশমন থেকে নিরাপদ থাকবে। স্বপ্নে কেউ নিজ ঘর থেকে সাপ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে দেখল। এর ব্যাখ্যা হল, সে ঘরে কলেরার

কারণে অনেক লোকের মৃত্যু হবে। কেননা সাপ দ্বারা জীবন উদ্দেশ্য। কোন বন্দি অনেক সাপের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ দেখলে এটা তার নিরাপদ ও মুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত। রাস্তায় সাপ ফনা তুলে মানুষকে বাধা দিতে দেখলে এর দ্বারা রাজার অত্যাচার উদ্দেশ্য। স্বপ্নে কেউ সাপের সাথে কথা বলতে দেখলে তার আনন্দ ও খুশি নসীব হবে। স্বপ্নে কালো সাপ দেখা অত্যন্ত শক্তিশালী দুশমনের লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ কালো সাপ নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসলে সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করবে।

স্বপ্নে শ্বেত সাপ দেখার দ্বারা দুর্বল শত্রু উদ্দেশ্য। অজগর সাপ দেখা স্বপ্নদ্রষ্টার পরিবার-পরিজন ও স্ত্রী নিজের শত্রু হওয়ার আলামত। অজগর দ্বারা আবার কখনও হিংসুক প্রতিবেশী উদ্দেশ্য হয়। বৃহৎ অজগর দেখা অত্যন্ত ভয়ের কারণ ও অত্যাচারী শাসকের আলামত। আবার কখনও এর দ্বারা আগুনও উদ্দেশ্য হয়। আসলাহ পাইথন (অজগর জাতীয়) সাপ দেখা অভিজাত মহিলার দিকে ইঙ্গিত। নির্ভীক সাপ দ্বারা অপব্যয়ী মহিলা অথবা সাহসী বালক উদ্দেশ্য। অত্যন্ত বিষধর সাপের দ্বারা সম্পদশালী গোত্র উদ্দেশ্য। এদের বিষের প্রবলতার কারণে গৃহের সাপের দ্বারা ডাকাত দল উদ্দেশ্য করা হয়। পানির সাপ দ্বারা ধন-দৌলত বুঝায়। তাই কেউ স্বপ্নে পানির সাপ ধরে ফেলেছে দেখলে বুঝবে অচিরেই সে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হবে। স্বপ্নে পেটের ভিতর সাপ আছে মনে করলে বা পেটের ভিতর সাপ আছে দেখলে বুঝবে নিজ গোত্র থেকেই কোন দুশমন সৃষ্টি হবে।

২৪৭. الحيوت (আল-হায়ওয়াত) নর সাপ

২৪৮. الحيدوان (আল-হায়দাওয়ান) ঘুঘু পাখি

এর আলোচনা 'ওয়াও' পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

২৪৯. الحيقطان (আল-হায়কুতান) মোরগ

২৫০. الحيوان (আল-হায়ওয়ান) প্রাণের অধিকারী

(প্রাণের অধিকারী যেকোন জিনিস।) জান্নাতের একপ্রকার পানির নামও 'হায়ওয়ান'। যেমন, ইবনে সাইয়েদা বর্ণনা করেন : চতুর্থ আসমানে 'হায়ওয়ান' নামে একটি ঝর্ণা আছে। প্রত্যহ একজন ফেরেশতা ওই ঝর্ণায় ডুব দিয়ে উঠে তার পাখাসমূহ ঝাড়া দেন। এতে সত্তর হাজার পানির ফোঁটা পড়ে। প্রত্যক ফোঁটা থেকে আল্লাহ তাআলা একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। এমনিভাবে ৭০ হাজার ফেরেশতা দৈনিক সৃষ্টি হচ্ছে। এরপর তাঁদেরকে বায়তুল মা'মুর তাওয়াফের আদেশ করা হয়। সুতরাং একবার যারা তাওয়াফ করেন, দ্বিতীয়বার তাদের পালা আসে না। এরপর তাঁদের কাজ শুধু আকাশ-মাটির মাঝখানে

দাঁড়িয়ে কিয়ামতাবধি আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করা। এটি ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেকের আযাদকৃত দাস রূহ ইবনে জানাহ বর্ণনা করেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : একজন সত্যিকার আলেম ব্যক্তিত্ব শয়তানের মোকাবেলায় এক সহস্র আবেদের চেয়েও গুরুতর। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (রহ.) নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) وان الدار الاخرة لهى الحيوان আয়াতখানার তাফসীরে লিখেছেন, পরকালীন জীবন চিরস্থায়ী হবে। মৃত্যু বলতে কিছুই থাকবে না। মনে হয় যেন তিনি চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবেন।

حيوان (হায়ওয়ান) ح (হাইয়া)-এর মাসদার বা ধাতুমূল। এর আসল রূপ হল حييان (হায়ইয়ান)। এতে দ্বিতীয় ইয়াকে ওয়াও দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, আরবের কোন কোন লোকের নাম 'হায়ওয়ান' ছিল। এ অর্থ, প্রাণের অধিকারী যেকোন বস্তুকেই 'হায়ওয়ান' বা প্রাণী বলে। 'হায়ওয়ান' শব্দে 'হায়াত'-এর অর্থের চেয়েও ব্যাপকতা পাওয়া যায়। فعلان (ফি'লানুন) ওজনের বৈশিষ্ট্য এটা। 'হায়াত' অর্থ, নড়াচড়া আর 'মওত' অর্থ, নীরবতা-স্থিরতা। সুতরাং فعلان ওজনটি এ শব্দের অর্থে ব্যাপকতা আনয়নের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে।

ইবনে আতিয়া বলেন : 'হায়াত' ও 'হায়ওয়ান' শব্দে অর্থগত কোন পার্থক্য নাই। খলীল ও সিবওয়াইর মতে 'হায়ওয়ান' হল মাসদার। যেমন, 'হায়মান' (هيمان) ইত্যাদি। আর উপর্যুক্ত আয়াতের মর্ম হল, 'পরজগতে কোন মৃত্যু নাই'। মুজাহিদ (রহ.)-ও তা-ই বলেন। উত্তম অভিমত এটাই। কেউ কেউ বলেন, 'হায়ওয়ান' মূলত 'হায়ইয়ান' ছিল। দুটি ইয়ার সম্মিলন কঠিন হওয়ার কারণে একটি ইয়াকে ওয়াও দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

জাহিয বলেন, 'হাইওয়ান' চার প্রকার। যথা, ১. ভূ-চর। ২. নভোচর। ৩. সন্তরণশীল। ৪. সরীসৃপ। কিন্তু ভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীরা আকাশে উড়তে পারে না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত প্রাণী উড়তে পারে, সেগুলো ভূমিতে চলতেও পারে। ভূচর তথা ভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীসমূহ তিন প্রকার। যথা—১. মানুষ, ২. গবাদি পশু, ৩. হিংস্র প্রাণী।

জগতে যত ধরনের পাখি আছে তথা উড়তে সক্ষম প্রাণীও চার প্রকার। যথা: ১. মাংসাশী, ২. গবাদি, ৩. নগণ্য শ্রেণীর উড়ন্ত প্রাণী, ৪. পোকা-মাকড় ও সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ মাংসখোরদের মধ্যে আছে শিকারী পাখি। যেমন– বাজ, ঈগল, চিল, কাক ও শকুন ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে আছে কবুতর ও ঘুঘু ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মধ্যে আছে টিড্ডি, প্রজাপতি, মাছি ও মৌমাছি ইত্যাদি। চতুর্থ প্রকারের মধ্যে আছে পিপীলিকা ও উই পোকা ইত্যাদি। এসব পোকা-মাকড় বর্ষা মৌসুমে বের হয় হয়ে উড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার প্রাণীগুলো উড়তে পারলেও এগুলো পাখিদের মধ্যে গণ্য নয়। আর কোন প্রাণীর ডানা থাকলেই সেটিকে পাখি বলা জরুরী নয়। যেমন– ফেরেশতা বা জিন। এদেরও ডানা আছে এবং তারাও উড়তে পারে; কিন্তু এদেরকে পাখি বলা হয় না। হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ)-ও আল্লাহর নির্দেশে জান্নাতে উড়ে বেড়ান। তথাপি তিনি একজন মানুষ বলেই গণ্য, কোন পাখি নন।

অনেক পাখি আছে শুধু গোশত খায়। যেমন– বাজ ও ঈগল হত্যাদি। আবার কোন কোন পাখি আছে গোশত ও শস্য দুটোই খায়। যেমন– মুরগি, কাক, চড়ুই ইত্যাদি পোকা-মাকড় ও শস্য দানা দুটোই খায়।

হাদীসে শরীফে প্রাণীর আলোচনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির উপর লা'নত (অভিসম্পাত) বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর চেহারা বিকৃতি ঘটায়। আরেক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি বা আকৃতি তৈরি করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোন প্রাণীকে হাত-পা বেঁধে তীর অথবা বন্দুকের নিশানা বানাতে নিষেধ করেছেন।

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ফকীহগণ তাহরীম বা হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা হাদীসে লা'নত শব্দটি রয়েছে। আর লা'নতের কারণ হল– প্রাণধারীকে কষ্ট দেয়া, তার প্রাণ বধ করা, তার উপযোগিতা নষ্ট করা। এ ছাড়া ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর বৈধতা আর ভক্ষণ অযোগ্য প্রাণীর উপকারিতা নষ্ট করা।

পরিশিষ্ট

'কিতাবুত তানবীর ফী ইসকাতিত তাদবীর' গ্রন্থে শাইখ তাজ উদ্দীন আতাউল্লাহ ইসকান্দারী রহ. লিখেছেন, অন্যান্য সৃষ্টিজীবের বিপরীত আল্লাহ তাআলা প্রাণী বা মানুষকে বিশেষত খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন। কেননা মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিজের অনেক গুণ দান করেছেন। যদি তাদেরকে খাদ্যগ্রহণ থেকে অমুখাপেক্ষী করতেন, তবে খুব সম্ভব তারা নিজেকে খোদা বলে দাবি করে বসত এবং নিজেদের মধ্যে রবুবিয়্যত তথা প্রভুত্বের অস্তিত্ব অনুভব করত। আর মহান আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি মানুষকে পানাহার,

পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মুখাপেক্ষী করেছেন। যাতে মানুষের এসব প্রয়োজন নিজকে প্রভু দাবির বাস্তবতাকে বাতিল করে দেয়।

প্রাণীর শরঈ বিধান

ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে প্রাণীতে 'বাইয়ে সালাম' অর্থাৎ প্রাণীর মূল্য আগে দেয়া আর প্রাণী পরে নেয়া জায়িয। কেননা তা মূল্য হিসেবে ক্রেতার দায়িত্বে অর্পিত হয়। এভাবে রক্তপণ এবং বিবাহের মহর প্রদানেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। হাদীসে প্রমাণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রাণী বিক্রয়ে 'বাইয়ে সালাম' করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. 'বাইয়ে সালাম' তথা পণ্যের অগ্রিম মূল্য প্রদান নাজায়িয বলেন। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা মাকরূহ বলতেন। উপরন্তু এতে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যও নির্ণয় করা যায় না।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর দলিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর হাদীস। তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন : আমি যেন একটি উটের বদলে দুটি উটের মূল্য গ্রহণ করি এবং আদায়ের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিই।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর আসফুর উটটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে বিশটি উটের বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর সওয়ারী উটটি ৪টি উটের বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, উটের মালিক এ ৪টি উট 'যাবদাহ' নামক স্থানে উমর (রাঃ)-কে প্রদান করবেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)-এর দলীল হযরত হাসানের হাদীস। হযরত হাসান হযরত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ হাদীসখানাকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত সামুরা থেকে হযত হাসান এর শ্রবণও প্রমাণিত। যেমন, আলী ইব্ন মাদিনী (রহ.) বলেন : আর এ হাদীসের উপর অনেক সাহাবী ও তাবেঈর আমল রয়েছে—প্রাণীর বদলে প্রাণী বিক্রি করা নাজায়িয। ইমাম সুফিয়ান সাওরি, কূফাবাসী ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতও তা-ই। যদিও অন্যান্য আলেমগণ প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী কর্জ হিসেবে বা বাকিতে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত এটাই।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন : হযরত সামুরা (রাঃ)-এর হাদীসখানা

তখনই ধর্তব্য হবে, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় দিকেই কর্জ হবে অর্থাৎ এ বেচাকেনাটি মূলত 'কর্জের বদলে কর্জ'-এর হুকুমভুক্ত হবে। এ ব্যাখ্যা খাত্তাবী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের আলোকে করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুমতি দিয়েছেন যখন প্রাণীদের শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার সময় অর্থাৎ প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের হলে প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকি বিক্রির অনুমতি প্রদান করেন আর উভয় দিক একশ্রেণীর হলে নাজায়িয বলেন।

'আল আহইয়া' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, প্রাণীর ব্যবসা মাকরূহ। কেননা ক্রেতা আল্লাহর নির্ধারিত এবং আল্লাহর হুকুমে অবশ্যই সংঘটিতব্য বিষয়টি অর্থাৎ প্রাণীর মৃত্যু পছন্দ করে না। যেমন, বলা হয়– প্রাণী বিক্রি কর আর দু' মরা ক্রয় কর।

সর্বপ্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মূল্যের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। যেমন, সাহীহাইন বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কোন গোলামের মধ্যে একজনের অংশ ছিল। সে তা আযাদ করে দিল আর তার কাছে ওই গোলামের মূল্য পরিমাণ টাকাও রয়েছে, তাহলে মূল্য ধার্য করা হবে এবং তার অংশের টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট মূল্য অংশীদারকে দিয়ে দিতে হবে। আর এ গোলাম শুধু প্রথম আযাদকারীর পক্ষ থেকে আযাদ ধরা হবে।'

কাজেই আযাদ করার দ্বারা গোলামের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যার ক্ষতিপূরণে মূল্য ওয়াজিব হয়েছে। কেননা এখানে তদনুরূপ একটি গোলাম ওয়াজিব করা হলে একই শ্রেণীতে মূল্যের তারতম্য ও বেশকম হওয়ার দরুন তা অসম্ভব। এজন্য প্রাপ্য পরিশোধের বেলায় মূল্যই অধিকতর উপযোগী।

ইমাম শাফিয়ীর মতে প্রাণীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ত্রুটির কারণে প্রাণীর মূল্য যত কম হবে ততই জরিমানা দিতে হবে। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে উট, গাভী, ঘোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে গাধা ও খচ্চরের লেজ কাটলে পূর্ণ মূল্যই ওয়াজিব হবে। তিনি আরও বলেন : যে বস্তুর ক্ষতি করা হয়েছে, তা ক্ষতিকারী ব্যক্তিকেই দিয়ে দেয়া হবে।

চিকিৎসায় প্রাণীর উপকারিতা

হিজড়া প্রাণী অহিজড়া প্রাণীর তুলনায় শান্ত হয়ে থাকে। মোটাতাজা এবং চর্বিদার প্রাণী খেতে খুব মজাদার হয়, তবে দেরিতে হজম হয়। আর কৃশ হলে এর বিপরীত হবে। কিন্তু দ্রুত হজম হয় বকরীর রানের গোশত। তবে তা পাকস্থলি ঢিলা করে দেয়। এর চিকিৎসা হল ফলের শরবত পান করা। সর্বাধিক মজাদার গোশত জওয়ান ভেড়া, কম বয়সী গাভী ও খাশির গোশত।

হাইওয়ান স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কেউ চতুস্পদ জন্তু বা পাখির সাথে কথা বলল আর কথাগুলো সে বুঝতেও পারল, তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টার দ্বারা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটবে। পক্ষান্তরে প্রাণীর কথা না বুঝা গেলে স্বপ্নদ্রষ্টার সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা প্রাণী হল ভক্ষিত বস্তু। তবে এ ধরনের প্রায় স্বপ্ন অনর্থকই হয়। সুতরাং এর অনুসন্ধানে না পড়া উচিত।

স্বপ্নে যেকোন প্রাণীর চামড়া দেখা 'মিরাছ' (ওয়ারিশ সম্পদ) কিংবা বাড়ি লাভের আলামত। কেননা পবিত্র কুরআনে রয়েছে : وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا—'আমি চতুস্পদ জন্তুর চামড়াকে তোমাদের জন্য গৃহউপকরণ বানিয়েছি।' যদি কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রাণীগুলোর চামড়া পরিধান করতে দেখলে সে অধিক নিয়ামত, অগাধ ধন-সম্পদ ও উচ্চমর্যাদা লাভ করবে। যথা– দিতামোর (বেজীর মত একপ্রকার প্রাণী), সঞ্জাব (শৃগালের তো প্রাণী) শৃগাল, খরগোস, চিতাবাঘ ইত্যাদি। কোন অসুস্থ ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের গায়ের চামড়া টানা হচ্ছে দেখলে তার মৃত্যু অত্যাসন্ন অথবা নিঃস্ব বা অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন সময় প্রাণীর চামড়া দেখা চামড়াজাত দ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত হয়। সুতরাং উটের চামড়া দ্বারা তবলা, ভেড়ার চামড়া দ্বারা পত্র, বকরীর চামড়া দ্বারা বিছানা, গাভীর চামড়া দ্বারা ঢোল ও ফিতা-বেল্ট ইত্যাদি, গাধা ও খচ্চরের চামড়া দ্বারা ঢোল ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়। প্রাণীর লোম-পশম দেখলে উপকারী ধন-সম্পদ, মালামাল, মান-সম্মান, পোশাক ও বেওয়ারিশ মাল হস্তগত হয়। শিং দেখলে হাতিয়ার, সম্পদ, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়। হাতীর দাঁত দেখা কোন বাদশাহর পরিত্যক্ত সম্পদ পাওয়ার ইঙ্গিত।

প্রাণীর ক্ষুর দেখা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতৈক্য ও মিলমিশের প্রতি ইঙ্গিত। প্রাণীর পা দেখা কখনও দুশমনের চারপাশে ঘোরা আবার কখনও অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ। প্রাণীর লেজ দেখা ভয় পাওয়ার আলামত। প্রাণীদের আওয়াজের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা হয়। যেমন, বকরীর আওয়াজ শোনা কোন নারী, বন্ধুর বা কোন ভদ্র লোকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার ইঙ্গিত। ছাগল ছানার আওয়াজ শোনা সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনের লক্ষণ। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি শোনা কোন বড়লোকের দাপটের আলামত। গাধার আওয়াজ শোনা মূর্খতার আলামত। খচ্চরের আওয়াজ কোন অভাব-অনটনের আলামত। বাছুর, বলদ ও গাভীর আওয়াজ শোনা কোন ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত। উটের আওয়াজ শোনা দীর্ঘ ভ্রমণের আলামত। বাঘের গর্জন শুনলে কোন অত্যাচারী-প্রতাপশালী বাদশাহের ভয় স্বপ্নদ্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কোন চাকর-কর্মচারি বা অপরাধী যদি স্বপ্নে বিড়ালের আওয়াজ শ্রবণ করে, তাহলে এটা তার লাঞ্ছিত হওয়ার আলামত। ইঁদুরের আওয়াজ শোনা কোন মুখোশধারী ব্যক্তি বা চোরের

হাতে মার খাওয়ার ইঙ্গিত। হরিণের আওয়াজ শ্রবণ কোন সুহৃদ নারীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইঙ্গিত। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা কোন জালিমের হাতে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা বুঝায়। বাঘের আওয়াজ শোনা জালিমের জুলুমের সূচনা হওয়ার লক্ষণ। শিয়ালের আওয়াজ শোনা কোন মিথ্যুক বা ধোঁকাবাজের কবলে পড়ার লক্ষণ। শকুনের আওয়াজ শোনা কোন নারী বা হতাশ কয়েদির শোকতাপ বুঝায়। শূকরের আওয়াজ শ্রবণ কোন বোকা শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আলামত। চিতা বাঘের আওয়াজ শ্রবণ দ্বারা কোন লোভী ও অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং স্বপ্নদ্রষ্টা তার উপর বিজয়ী হওয়ার ইঙ্গিত। ব্যাঙের আওয়াজ শ্রবণ কোন বাদশাহর কাজ করে দেয়ার আলামত। কেউ কেউ বলেন, এরূপ স্বপ্ন কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত। সাপের আওয়াজ দ্বারা এমন শত্রুর আত্মপ্রকাশ উদ্দেশ্য, যার উপর স্বপ্নদ্রষ্টা বিজয় লাভ করবে। যদি কোন ব্যক্তির সাথে সাপ ভাল কথা বলছে দেখে, গবে তার শত্রু তার সম্মুখে পরাজিত হবে আর মানুষ এতে হতবাক হবে।

২৫১. ام حبين (উম্মে হুবাইন) গিরগিট

উম্মে হুবাইন শব্দটি ইসমে জিনস্ মা'রিফাহ। কখনও এতে আলিফ লামও প্রবিষ্ট হয়। এর নাম হুবন। যেমন : বলা হয়ে থাকে فلان به حبن অর্থাৎ অমুকের পেট বড় হয়ে গিয়েছে। আসলে এ প্রাণীর পেট বড় হয়ে থাকে। তাই একে 'উম্মে হুবাইন' বলা হয়। এর বুক ছাড়া পুরো শরীরই গিরগিটের মত। স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবচন, বহুবচনের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আবু মনসুর বলেন : প্রাণীটি তার হাতের তুলনায় বড় এবং গুইসাপের মতই প্রায়। ইবনে সাকীত বলেন, এটা টিকটিকির মতই ছোট। তার মাথায় একটি নিশানা থাকে। আবু যায়িদের মতে এটি চাতকের মত। এর চারটি পা আছে। এটা ছোট ব্যাঙ থেকে একটু বড় হয়। শিকারী এর পিছু নিলে বলে, ام حبين الشرى بر ديك ان الامير ناظر اليك وضارب بسوطه جنبيك—'হে উম্মে হুবাইন! আমি কি তোমার চাদর ক্রয় করেছি? যেহেতু আমীর তোমার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছে আর সে অচিরেই তোমার পাজরে চাবুক মারবে'।

একথা বলে শিকারী তার পিছু ধাওয়া করে। আর তাকে ধরতে পারলে এটি নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে তার ডানাসমূহ বিছিয়ে দেয়। এর ডানাগুলো মেটে বা ধূসর রঙের হয়। এরপর শিকারী যখন তার পিছনে আরও যেতে থাকে, তখন সে তার ডানার নিম্নাংশও বিছিয়ে দেয়। তার ডানার নিচের অংশে মিশ্রিত লালিমা, হলুদাভ ও শুভ্রতা অত্যন্ত চমৎকার। এরপর শিকারী তার পিছন ছেড়ে দেয়।

আলী ইবনে হামযাহ বলেন : আমার মতে সঠিক কথা হল, এটা স্ত্রী টিড্ডির বৈশিষ্ট্য। (এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ 'আইন' পরিচ্ছেদে আসবে)।

ইবনে কুতায়বা বলেন : গিরগিটি তার মুখটি সূর্যের দিকে করে রাখে। সূর্যের সাথে সাথে তার চেহারাও ঘুরাতে থাকে। এ বৈশিষ্ট্য শুধু গিরগিটির মধ্যেই পাওয়া যায়।

'মারছা' গ্রন্থে লিখা আছে, গিরগিটির বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সুতরাং কেউ বলেন, 'উম্মে হুবাইন' গিরগিটির স্ত্রীলিঙ্গ। বেদুঈনরা এটিকে উপেক্ষা করে চলে। দুর্গন্ধের জন্য এটি খায় না। ইবনে কুবাইবার মতে এটা টিকটিকিরই একটি শ্রেণী। এতে বেশ আপত্তি আছে। কেননা وزغ অর্থ, টিকটিকি। অভিধানবিদগণ তা-ই লিখেছেন।

'উম্মে হুবাইন' কে 'হুবাইনাহ'-ও বলা হয়। এটা আলিফ লাম বিহীন মারেফাহ। একবচন ও বহুবচন উভয়ের উপরই এটা প্রয়োগ থেকে পারে। অবশ্য কোন কোন সময় এর বহুবচন ام حبينات (উম্মে হুবায়নাত), امهات حبين (উম্মাহাতে হুবাইন) এবং امهات حبين (উম্মাতে হুবাইন)-ও ব্যবহার হয়।

হযরত উকবাহ (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, اتموا صلاتكم ولا تصلوا صلاة ام حبين 'নামায পূর্ণ কর; গিরগিটের মত নামায পড় না'। উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, গিরগিটির উদর বড় হওয়ার কারণে চলার সময় সে সাধারণত নিজ মাথা কখনও উপরে আবার কখনও নিচু করে চলে। তাই নামাযীকে সিজদাবস্থায় নিজের মাথা উঁচু-নিচু করতে নিষেধ করা হয়েছে ।

হাদীসে গিরগিটির আলোচনা

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ)-কে দেখলেন, তাঁর পেট বের হয়ে আছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকৌতুক করে হযরত বিলালকে 'উম্মে হুবাইন' বলে ডাকলেন।

জাহিয বলেন, আবু যায়িদ নাহভী বলেছেন : আমি এক বেদুঈনকে উম্মে হুবাইনকে 'হুবাইনাহ' বলতে শুনেছি।

গিরগিটির শরঈ বিধান

ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে গিরগিটি খাওয়া হালাল। কারণ, এটা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয়ত কোন মুহরিম একে হত্যা করলে অথবা হেরেমের মধ্যে কেউ একে মেরে ফেললে জরিমানা দিতে হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে ফিদিয়া বা জরিমানা এমন প্রাণীরই দিতে হয়, যে-প্রাণীটি স্বাধীন এবং যার গোশত খাওয়া বৈধ।

ইমাম মাওরিদী থেকে এ বিষয়ে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমত তিনি বলেন, ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর মতে তা হালাল। দ্বিতীয়ত ইবনে আমীর 'মারছা' কিতাবে লিখেছেন, তা হারাম।

ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে একদল বড় আলেমের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন : একজন শহুরে লোক একজন গ্রাম্য লোককে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি বন্য ইঁদুর খাও? সে বলল, হ্যাঁ। খাই। আবার জিজ্ঞাসা করল, গিরগিট খাও? সে বলল, না। এতে শহুরে লোকটি বলল, তাহলে তো গিরগিট এ ক্ষমায় অনেক খুশি হবে।

২৫২. ام حسان (উম্মে হাস্‌সান)

অঞ্জলির মত একধরনের জন্তু

২৫৩. ام احسين (উম্মে হুসাইন) একটি জলজ প্রাণী

পানিতে বাসকারী একধরনের প্রাণী। এর অনেক পা আছে।

২৫৪. ام حفصه (উম্মে হাফসাহ) গৃহপালিত মুরগি

২৫৫. ام حمارس (উম্মে হুমারিস) হরিণ

ইবনে আসীর বলেন, হরিণকে উম্মে হুমারিস বলে।

باب الخاء

পরিচ্ছেদ : 'খা'

২৫৬. الخاذباذ (আল-খাযিবায) মশা-মাছি

'আল-খাযিবায' (মশা-মাছি)। এক অভিধানে الخزباذ উল্লেখ আছে।

জাওহারী বলেন, এদুটি পৃথক পৃথক ইসম। 'খায' ও 'বায' উভয় ইসম মিলে একটি শব্দ তৈরি হয়েছে। অর্থ, মাছি। এটা যেরের উপর অটল। এটি পেশ, যবর ও যের সর্বাস্থায় একরকম থাকে।

ইবনে আহমার বলেন :

تفقا فوقه القلع السوارى وجن الخاذباز به جنونا

'তার উপর বিস্তৃত হয়েছে চর্ম নির্মিত ঘনঘটা, যেভাবে মাছিরা গুঞ্জনের সাথে দলবেধে আসে।'

জাওহারী নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন : এটা হয়তো حن الذباب থেকে চয়িত। কেননা মাছির আওয়াজ বৃদ্ধি পেলে বলা হয় جن الذباب অর্থাৎ মাছিরা গুঞ্জন করছে। তদ্রূপ থেকে পারে এটা جن البنت جنونا থেকে চয়িত। কেননা ঘাস দীর্ঘ হলে বলা হয় جن البنت جنونا। কবি মুতানাব্বী নিম্নোক্ত কবিতায় خاذباز শব্দটিকে এ অর্থেই (মাছির গুঞ্জন) ব্যবহার করেন। কবিতা

كلما جادت الظنون يوعد يوعد جادت يداك بالابخاز

'হে মামদুহ (প্রশংসিত)! যখন মানুষ তোমাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী মনে করে, তখন তুমি ওই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর।'

منك متشد القريض لديه يضع الثوب فى يدى بزاز

'সে এমন বাদশা, যার সামনে কবিতা পাঠকারী সে ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি কাপড় ব্যবসায়ীর হাতে কাপড় রেখে দেয়।'

ولنا القول وهو ادرى بفحوا واهدى فيه الى الاعجاز

'আমরা তো শুধু কাব্য পাঠ করি আর সে তার উদ্দেশ্য বুঝে। এমনকি কাব্যের গভীরতায় পৌঁছেয় যায়।'

ومن الناس من تجوز عليه شعراء كانها لاخاذباز

'কতিপয় মানুষ আছে কবিগণের উপর মশা-মাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

ويرى انه البصير بهذا وهو فى العى ضائع العكاز

তাদেরকে কাব্যপরীক্ষক ভাবা হয়। অথচ 'মহিষের সামনে বাঁশি বাজানো হচ্ছে' বুঝা উচিত।

আসমায়ী বলেন : الخاذباز মশা-মাছির আওয়াজ; কিন্তু পরবর্তীসময়ে এটা মশা-মাছির নাম রাখা হয়েছে। ইবনে আরাবী الخاذباز -কে একশ্রেণীর ঘাস বলেছেন। ইবনে নসীর ইবনে আরাবীর উক্তির পক্ষে নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন :

رعتيها اكرم عود عودا الصل والصفصل وليعضيدا

'আমি এর পক্ষ নিয়েছিলাম, যেভাবে উন্নত কাষ্ঠ সংরক্ষিত থাকে, যার দ্বারা উন্নত মানের বর্শা, তীর এবং চিমটা প্রস্তুত করা যায়।'

والخاذباز السنم النجودا بحيث يدعوا عامر مسعودا

'মাছিরা গুণ গুণ করে আর আমের ও মাসউদ নামক রাখালদ্বয়কে আক্রমণ করে।'

কেউ কেউ বলেন, এটা একটি বিড়াল।

মোটকথা, এটা যাই হোক এর হুকুম সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন : الخاذباز اخصب 'মশা-মাছিরা চোষক'।

মায়দানী বলেন, এটা একটি মশা। এটা বসন্তকালে উড়ে ও সে বছর কল্যাণ হওয়ার ইঙ্গিত করে।

২৫৭. خاطف طله (খাতিফা যিল্লাহ) একধরনের চড়ুই পাখি

কুমাইত ইবনে যায়েদ একটি কবিতায় লিখেছেন :

وريطة فتيان كخاطف ظله جعلت لهم منها خباء ممددا

'যুবকদের পাগড়ি এমন হালকা, যেন উড়ন্ত চড়ুই পাখি আর আমি তাদের জন্য দীর্ঘ তাঁবু প্রস্তুত করেছি।'

২৫৮. الخبهقى (আল-খাবহাকয়ী) কুকুর ছানা

'খা' ও 'বা'-তে যবর আর 'আইন' খাটো ও দীর্ঘ উভয় স্বরেই পড়া যায়। এটা কুকুর-ভেড়ির যৌনমিলনে ভেড়ির গর্ভে জন্ম নেওয়া একটি কুকুর ছানা। এ সূত্রেই তামীম গোত্রের জনৈক বেদুঈনের নাম ছিল এটা।

২৫৯. الخشق (আল-খাছাক) একধরনের বড় পাখি

الخشق: 'খা' ও 'ছা' অক্ষরে যবর হবে।

দার্শনিক এরেষ্টটল 'নাঊত' গ্রন্থে বলেছেন : চীন ও বাবেল শহরে বড় একধরনের পাখি পাওয়া যায়। কিন্তু অদ্যাবধি কেউ একে জীবিত দেখতে পায় নাই। এ পাখিটি বিষ শুঁকলেই নিথর হয়ে যায়। তখন তার প্রচণ্ড ঘাম নির্গত হয়। এরপর এরা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলেন : শীত ও গ্রীষ্মকালে এ পাখিটি যে-পথ দিয়ে অতিক্রম করে, তাতে অনেক অনেক বিষ পড়ে থাকে। ব্যাস, এরা ওই বিষের দুর্গন্ধ শুঁকতেই (মরে) নিথর হয়ে যায়। আর মানুষ ওই মৃত পাখির দেহ দ্বারা বাসনপত্র, ছুরি, চাকু ইত্যাদি হাতিয়ার তৈরি করে। মৃত্যুও পরও এদের হাড়ে ওই বিষের প্রভাব বহাল থাকে। তা-ও যদি বিষের নিকর্টে করা হয়, তখনও ওই হাড্ডি থেকে ঘাম নির্গত হয়। অধিকাংশ মানুষ সন্দেহের বশে বিষ মিশ্রিত খাদ্যের অভিজ্ঞতা এর দ্বারা অর্জন করে।

এ পাখির হাড্ডির মজ্জা সকল প্রাণীর জন্য মারাত্মক বিষ। এমনকি সর্প পর্যন্ত এর হাড্ডি থেকে পলায়ন করে। কখনও আর সেখানে আসে না।

২৬০. الخدرنق (আল-খাদারনাক) মাকড়শা

শব্দটি 'দাল' ও 'যাল' দুটি দ্বারাই লিখা আছে।

২৬১. الخرطين (আল-খারাতীন) কেঁচো

বর্ণিত আছে, এটা اراسيع তথা কেঁচো। যার বিশদ বিবরণ 'আলিফ' অনুচ্ছেদে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে এটা হল, 'শাহমাতুল আরয' তথা ব্যাঙের ছাতা। যার আলোচনা শীন পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ। কেউ কেউ বলেন, এটি ভিজা মাটির একটি বড় জোঁক।

চিকিৎসায় কেঁচো

যদি কেঁচো তেলে ভেজে হালকা পিষে অর্শ্বরোগের স্থানে লাগানো হয়, তাহলে অনেক উপকার হবে। যদি কেঁচো তৈলে ঢেলে ওই পাত্রটি জমিতে পুঁতে রাখা হয় এবং ৭ দিন পর বের করে দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য ওই কেঁচো তৈল থেকে ফেলে দেয়া হয়, এরপর ওই তৈল ও তার অর্ধেক পরিমাণ গোলাপ মিশ্রিত করে আবার একটি শিশিতে ভরে ওই শিশি ৭ সাত দিন পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, তারপর তা তুলে এনে খেযাব হিসেবে চুলে ব্যবহার করা হয়, তাহলে চুল কালো হয়। এ চুল বার্ধক্যের আগে আর সাদা হবে না।

২৬২. الخرب (আল-খারাব) নর মাছরাঙা

'খা' ও 'রা'-এর উপর যবর। যিকরুল হুবারি অর্থাৎ নর মাছরাঙা। এর বহুবচন اخراب, خراب ও خربان আসে।

কৌতুক

আবু জাফর আহমাদ ইবনে জাফর বলখী (রহ.) বলেন : একবার খলীফা হারুনুর রশীদ বিতর্কের উদ্দেশ্যে আবুল হাসান কাসাঈ এবং আবু মুহাম্মাদ ইয়াযেদীকে একত্র করলেন। সুতরাং ইয়াযেদী কাসায়ীর উদ্দেশ্যে জনৈক কবির একটি কবিতা পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলেন : এর বিশুদ্ধ ইরাব বলুন!

ما رأيت قط خرابا نقر عنه البيض صقر

لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا

এটা শ্রবণ করে কাসায়ী বলেন : দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় অংশে 'মহর' শব্দটিতে যবর হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ 'মহর'-এর স্থলে 'মহরান' হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এটা 'কানা' (كان ফেলে নাকেছ)-এর খবর। কাজেই কবিতার পংক্তিটিত একধররে ক্রটি সৃষ্টি হয়ে গেল।

ইয়াযেদী এ কথা শুনে বললেন : পংক্তিটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও ক্রটিমুক্ত। এতে কোন ক্রটি নেই। কারণ, বাক্যটি এর দ্বিতীয় অংশের শুরুর لايكون এর উপর শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর নতুন বাক্য শুরু হয়েছে। এ কথা বলে ইয়াযেদী নিজের টুপিখান জমিনে ছুঁড়ে মারল আর অহংকারবশত বলে উঠল, হ্যাঁ! আমি আবু মুহাম্মাদ। এটা শুনে বাদশাহ হারুনুর রশীদের উযির ইয়াহইয়া বিন খালিদ বললেন, আপনি আমীরুল মুমিনীনের সামনে নিজের উপনাম উল্লেখ করে শাইখের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন। খলীফা হারুনুর রশীদ উযিরের এ কথা শুনে বললেন : কেসায়ী ভুল করেছেন বটে; তবে শিষ্টাচার বজায় রেখেছেন। আমার নিকট সে তার চেয়ে প্রিয়। কারণ, সে পংক্তিটি বিশুদ্ধ করলে সাথে সাথে

বেয়াদবির মালাও পড়েছে। খলীফার নিকট ইয়াযেদী আরজ করল, হে আমীরুল মুমিনীন! সফলতার আনন্দ আমাকে আত্মহারা করে দিয়েছিল। তাই অনিচ্ছাকৃত আমার দ্বারা এমনটি হয়েছে। এজন্য শিষ্টাচার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে খলীফা রাগান্বিত হয়ে ইয়াযেদীকে নিজ দরবার থেকে বের করে দিলেন।

উপর্যুক্ত কবিতার অর্থ

১. আমরা কখনও মাছরাঙার ডিমে বাজপাখিকে ঠোকর মারতে দেখি নি অর্থাৎ আমরা মাছরাঙার ডিম থেকে বাজপাখির বাচ্চা থেকে দেখি নি।

২. গাধা অশ্বশাবক থেকে পারে না। পুনঃ বলছি, গাধা অশ্বশাবক থেকে পারে না; শাবক শাবকই অর্থাৎ শাবক ঘোড়ারই হয় গাধার নয়।

একবার খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান হানাফী এবং নাহুর ইমাম কেসায়ী যৌথভাবে উপস্থিত ছিলেন। কেসায়ী বলতে লাগলেন, সর্ববিষয়ে কার পাণ্ডিত্ব আছে? এতে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) কাসাঈকে প্রশ্ন করলেন : কেউ নামাযে সাহু সিজদাহ দিতে ভুলে গেলে কি দ্বিতীয়বার (অন্য নামাযে) আদায় করতে পারবে? কেসায়ী 'না' বললেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান বললেন, কেন? কেসায়ী বললেন : নাহুবিদের একটি উক্তি আছে, ইসমে তাছগীর পুনরায় তাছগীর থেকে পারে না। এরপর ইমাম সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, কেউ কোন আযাদ গোলামকে মালিকানাধীন করে দিলে তার হুকুম কী? প্রত্যুত্তরে কেসায়ী বলেন, সহীহ হবে না। এর কারণ স্বরূপ বলেন, বৃষ্টির পূর্বে প্লাবন থেকে পারে না অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হলে তবেই পানি প্রবাহিত হবে; অন্যথায় নয়।

কেসায়ী ইলমে নাহু বৃদ্ধ বয়সে অর্জন করেছেন। এর প্রেরণা হয়েছিল নিম্নোক্ত ঘটনা। বর্ণিত আছে, একদিন তিনি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। আরবীতে বললেন, قدعييت—'আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তার এ বাক্য শুনে কেউ বললেন, আপনি ভাষায় ভুল করেছেন। কেয়াসী জিজ্ঞাসা করলেন, কী ভুল করেছি? উত্তরে আপত্তিকারী বললেন, এর দ্বারা আপনার 'ক্লান্তি' প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে 'أعييت' বলা উচিত ছিল। আর 'নিরুপায় হওয়া' প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে عييت বলা উচিত ছিল। আপত্তিকারী এ কথা শুনে ইমাম কাসাঈ লজ্জিত হলেন এবং পুনরায় ইলমে নাহু অর্জনে মগ্ন হলেন। অবশেষে এ শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে যান। এমনকি ওই যুগের নাহুর ইমামে পরিণত হলেন। খলীফা হারুনুর রশীদের তাঁর দু'ছেলে আমীন ও মামুনের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর দু'ছেলের কাছে তিনি বিরাট সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান হানাফী আর কেসায়ী

উভয়ে একই দিবসে ১৮৯ হিজরী সনে ইহলক ত্যাগ করেন। তাঁদেরকে একই স্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁদের সমাধিস্থলে খলীফা হারুনুর রশীদ দাঁড়িয়ে বলেন : আজ এ স্থানে ইলম ও আদব দাফন করা হল।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

ما رأينا صقرا يرصده خرب অর্থাৎ আমরা কোন বাজপাখিকে এমন দেখি নাই, যার ঘাঁটিতে কোন মাছরাঙা বসে থাকে। আরবগণ এ উপমাটি তখনই ব্যবহার করে, যখন কোন সভ্য ব্যক্তির উপর অসভ্য ব্যক্তি জয়ী হয়।

২৬৩. الخرشة (আল-খারাশাহ) মশা

জাওহারী বলেন, এ সূত্রেই নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম রাখা হয়েছে- (১) সামাক বিন খারাশাতান আহবারী। এভাবে তার মাতার নাম খারাশহ। (২) আবু খারাশাহ আছ-ছালমী। আব্বাছ বিন মারদাসের নিম্নোক্ত কবিতায় তাদের নাম উল্লেখ আছে :

ابا خراشة اما انت ذا نفر فان قومى لم تاكلهم الضبع

'হে আবু খারাশাহ! তুমি ঘৃণ্যযোগ্য নও? নিশ্চয় তোমার কওম এমন, যাদেরকে দুর্ভিক্ষ কখনও কষ্ট দেয় নি।'

তদ্রূপ এ সূত্রেই খারাশা বিন হরফযারী কূফীর নামকরণ করা হয়েছে। যার মৃত্যু হয়েছে ৭৪ হিজরী সনে আর সে ছিল এতীম। তার প্রতিপালনের দায়িত্ব হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নিয়েছিলেন।

২৬৪. الخرشقلا (আল খারশকালা) বুলতী মাছ

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, বুলতী মাছ না হলে জান্নাতের পত্রপল্লব নীলনদের পানিতে পাওয়া যেত।

২৬৫. الخرشنة (আল-খারশনাতু) কবুতরের চেয়ে আকারে বড় এক পাখি

কবুতরের চেয়ে আকারে বড় এক পাখি, যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ باب الكاف-এ আসবে।

২৬৬. الخرق (আল-খুরুক্ব) এক জাতীয়

الخرق: 'খা' ও 'রা-তে পেশ; শেষ 'কাফ'। জাহিযও তা-ই বলেছেন।

২৬৭. الخرنق (আল-খিরনাক) এক জাতীয় চড়ুই

خدارية খরগোসের শাবক। 'খা' বর্ণে যের। 'আখিরনাক' তাবেঈ যুগের একজন কবির নাম ছিল। আর এটা থেকেই বলা হয়, ارض مخرنقه (খরগোসভূমি) অর্থাৎ যে জমিতে অধিক পরিমাণ খোরগোস থাকে। আরবগণ বলেন : الين من خرنق—'এটা খরগোস অপেক্ষা অধিক নরম'। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি যুদ্ধের পোশাক (কোমল হওয়ার দরুন) নাম খিরনাক ছিল। কারণ, আরবদের প্রথা ছিল, কোন বস্তুর কোমলতা বর্ণনা করতে তারা তাকে খিরনাকের সাথে তুলনা করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপর একটি যুদ্ধের পোশাক ছিল জাতুল ফযল নামে। কেননা এটা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে অন্যান্য পোশাকসমূহের তুলনায় বেশি দীর্ঘ ছিল। এ যুদ্ধের পোশাকটি হযরত সাআদ বিন উবাদাহ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে প্রদান করেছিলেন। আর এ যুদ্ধের পোশাকটিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় এক ইয়াহুদীর নিকট বন্দক রেখেছিলেন। পরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তা ফেরত আনেন। এছাড়া রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরও চারটি পোশাক ছিল। চতুর্থ পোশাকটির নাম জাতুল উশাহ, পঞ্চমটির নাম জাতুল হাওয়াশী, ও ষষ্ঠটির নাম ফিদ্দাহ, সপ্তমটির নাম সাগদিয়া ছিল।

হাফেয দিমিয়াতী বলেন : সাগদিয়া নামক যুদ্ধের পোশাকটি হযরত দাউদ (আঃ)-এর ছিল। এটি তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন এবং এটা পরিধান করেই তিনি জালুতকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত দাউদ (আঃ) শুধু নিজ হাতে তৈরি রুটিই ভক্ষণ করতেন। আল্লাহ তাআলার বাণী وعلمه مما يشاء—'তাকে যা ইচ্ছে শিক্ষা দিলেন'। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কালবি প্রমুখ বলেন : এ আয়াতে যুদ্ধের পোশাক ইত্যাদি বানানো উদ্দেশ্য, যা তিনি বানিয়ে বিক্রি করতেন। কোন কোন মুফাস্সির উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা চতুষ্পদ জীব-জন্তু ও পাখির ভাষা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

আবার কোন কোন মুফাস্সির বলেন : এর দ্বারা 'সুমধুর কণ্ঠস্বর' উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে যে উন্নত কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন, তদ্রূপ অপর কাউকেই দেন নাই। সুতরাং তিনি যাবুর পাঠ শুরু করলে বনের প্রাণীরা একদম তাঁর সন্নিকটে চলে আসত। তিনি তাদের গর্দান ধরতেন। পাখিরা তাদের স্ব স্ব ডানা দ্বারা ছায়া দান করত। প্রবাহমাণ পানি ও বায়ু পর্যন্ত তার সুমধুর কণ্ঠ শুনে স্থির হয়ে যেত।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ

তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে একটি শিকল দান করেন। যাতায়াত পথে সেটি ঝুলানো থাকত। এর এক মাথা লাগানো ছিল তাঁর উপাসানালয়ে। ওই শিকলে ছিল লৌহাশক্তি। এর রঙ ছিল আগুনের মত। কড়াগুলো ছিল গোল। প্রত্যেক দু'কড়ার মাঝে ছিল জ্যোতির্ময় মুক্তা খচিত। এর চারপাশে ঝুলানো ছিল মতিহার। বাতাসের স্পর্শে শিকলটিতে ঝনঝন আওয়াজ হত। এর দ্বারা দাউদ (আঃ) সকল দুর্ঘটনার জ্ঞান লাভ করতেন। কোন বিপদগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এটা স্পর্শ করলে তৎক্ষণাত নিরাপদ ও সুস্থ হয়ে যেত। হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরঈলগণ এ শিকরে মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযোগ করত। সুতরাং যখন কেউ কার উপর কোন জুলুম করত বা কেউ কারও অধিকার হরণ করত, তখন বাদী এসে ওই শিকলটি ধরত। সেই দাবিদার সত্যবাদী হলে শিকলটি তার হস্তগত হত। পক্ষান্তরে সে মিথ্যাবাদী হলে তা ধরতে পারত না। যতদিন পর্যন্ত বনী ইসরাঈল ছল-চাতুরী থেকে দূরে ছিল, তাদের মাঝে এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক জমিদার কারও নিকট একটি দামি মুক্তা আমানত রাখেন। ক'দিন পর তিনি ওই আমানত ফেরত চান। কিন্তু ওই ব্যক্তি তা অস্বীকার করে বলে, আপনি আমার কাছে কোন আমানত রাখেন নাই। সেই সঙ্গে এ খিয়ানত গোপন রাখতে সে কৌশল অবলম্বন করে। একটি লাঠি ছিদ্র করে তাতে ওই দামি মুক্তার দানাটি লুকিয়ে রাখে। এরপর উভয়ে শিকলের নিকটে এসে উপস্থিত হয়। জমিদার নিজ দাবি উপস্থাপন করে শিকলটি ধরতে হস্ত প্রসারিত করতেই সেটি তার হস্তগত হয়। এরপর খিরানতকারীকে শিকলটি ধরতে বলা হলে সে দাবিদারকে বলল : আপনি আমার এ লাঠিটি ধরুন! যাতে আমি শিকল ধরতে পারি। সুতরাং জমিদার লাঠিটি ধরে দাঁড়ান। তখন খিয়ানতকারী শপথ করে বলল, উক্ত আমানত আমার নিকট নেই; সেটি স্বয়ং তার মালিক জমিদারের নিকটেই রয়েছে। এ কথা বলে সে নিজের হাতটি ওই শিকলের দিকে এগিয়ে দেয়। ফলে অনায়াসেই শিকলটি তার হাতে চলে আসে। কারণ, সে তখন নিজের কথায় সত্যবাদী ছিল। কেননা মুক্তাটি ওই লাঠির ভিতরেই ছিল। আর প্রতারক ওই লাঠিটি জমিদারের হাতে উঠিয়ে দিয়েছে। যদ্দরুন শিকলটি তার হাতে চলে আসে। তখন জমিদারের সত্যতা সম্পর্কে যারা জ্ঞাত ছিল, তাদের মনে শিকলটির প্রতি সন্দেহ ও সংশয় জন্ম নিল। তারা এর প্রতি কুধারণা পোষণ করতে লাগল। অতএব পরদিন মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখল, ওই শিকলটি আর নেই। বস্তুত বনী ইসরাঈলদের এ জাতীয় প্রতারণার কারণে উক্ত শিকলটিক আল্লাহ তায়ালা আসমানে উঠিয়ে নিলেন। যাহ্হাক ও কালবী বর্ণনা করেন : হযরত দাউদ (আঃ) জালুতকে হত্যার পর ৭০ বছর রাজত্ব করেন। হযরত দাউদ (আঃ) ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন বাদশাহর অধীনে বনী ইসরাঈলরা একত্রিত হয় নাই। অর্থাৎ হযরত দাউদ

(আঃ)-এর বাদশাহীকে তারা মেনে নিয়েছিল। আর আল্লাহ হযরত তাআলা দাউদ (আঃ)-কে বাদশাহী ও নবুওয়াত দুটিই দান করেছিলেন। তার পূর্বে আর কাউকেই তা দেয়া হয় নাই। কারণ, তার পূর্বে নিয়ম ছিল, নবী এক বংশ থেকে আর বাদশাহ অন্য বংশ থেকে হবে। হযরত দাউদ (আঃ) একশত বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

হাফেয দিময়াতী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি যুদ্ধের পোশাক বনী কাইনুকার গনীমতে মাল থেকে অর্জন করেছিলেন। আর এ দুটি পূর্বের যুদ্ধের পোশাকের সাথে যোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধের পোশাকের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ যুদ্ধে ফিদ্দা ও জাতুল ফুজুল আর হুনাইন যুদ্ধে জাতুল ফজলু ও সাগদিয়া নামক যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেছিলেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

২৬৮. الخدارية (আল-খাদারিয়াহ) খরগোসের শাবক

'খা' পেশের সাথে। ঈগল পাখির নাম। ঈগল কালো রঙের হওয়ার কারণে এ নাম রাখা হয়েছে। কারণ, এর মূল অর্থ কালো। এজন্য বলা হয় بغير خدارى অর্থাৎ কালো উট। তেমনিভাবে বলা হয় لون خدارى। ময়দানী 'মাজমাউল আমাছাল' গ্রন্থের ভূমিকায় খুদারি শব্দটি 'কালো' অর্থে ব্যবহার করে লিখেন : ভাল মানুষ কখনও নিজ চেষ্টা-প্রয়াস ছেড়ে দেয় না। এজন্য তাদের অবদান জীবন্ত; ধ্বংসশীল নয়। অথচ স্বয়ং যুগ ধ্বংস হয়ে যায়। আমি পাঠকের সমীপে এ গ্রন্থের দুর্বলতা স্বীকার করছি। হয়তো এ গ্রন্থে কার চোখে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে বা আমার কোন ব্যাখ্যার সাথে কার মিল হবে না। কারণ, আমরা আমাদের মনে জাগা অবস্থাগুলো অস্বীকার করি। অথচ যুগ তার অন্ধকারে অন্তরায় হয়ে গেছে। আর পাখি তার নীড় থেকে উড়ে গিয়েছে। যৌবন ম্লান হচ্ছে। দুর্বলের পাঞ্জা শক্তিশালীর উপর বিজয় লাভ করেছে। ভালবাসার মাঠে আনন্দের দৌড় শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং জনৈক কবি এক কবিতায় বলেন :

وهت عزمانك عند المشيب وما كان من حقها ان تهى

হে প্রিয়তমা! তোমার মতলব আমার এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। অথচ এ সময় সেসব বিষয়ের ছিল না।

وانكرت نفسك لما كبرت فلا هى انت ولا انت هى

এখন তো অপরিচিত মনে হয় তোমায়; আরও মনে হয় ইতোপূর্বে তুমি যেমন ছিলে, এখন তেমন নও।

وان ذكر شهوات النفوس فما تمشى غير ان تشتهى

যদি সে-সময়কে স্মরণ করা হয়, যখন আমাদের ভালাবাসা একে অপরের সাথে মিলেছে, তাহলে কোন লাভ নেই। কেননা এ তুমি পূর্বের সে-ই তুমি নও ; আমিও পূর্বের সে-ই আমি নই।

২৬৯. الخروف (আল-খুরুফ) ছাগলের শাবক

আসমায়ী বলেন : ভেড়া বা ঘোড়ীর ছয় মাসের শাবককে আরবীতে 'খুরুফ' বলে। ইবনে লাহিয়াহ মুছা বিন ওয়ারদান থেকে আর তাঁরা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: একবার একটি ভেড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি বলেন, এটা সেই ভেড়া, যাতে বরকত দেয়া হয়েছে। আবু হাতেম এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন : كالخروف يتقلب على الصوف—'ছাগল ছানা পশমের উপর লুটোপুটি খায়'। তারা এ উদাহরণটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি অন্যের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছে।

স্বপ্নে ছাগল ছানা দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে ছাগলের ছানা দেখা এমন সন্তানের ইঙ্গিতবহ, যে পিতামাতার প্রতি বিনয়ী ও অনুগত হবে। কার স্ত্রী স্বপ্নে তাকে কেউ একটি ছাগলের বাচ্চা দান করেছে বা দিয়েছে দেখে, তবে সে যেন নেক সন্তান জন্মের আশা রাখে। তবে স্বপ্নে অন্যান্য প্রাণীর ছোট বাচ্চা দেখা চিন্তার লক্ষণ। কেননা ছোট বাচ্চা লালন পালনে অনেক কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এ ব্যাখ্যাটি যুবক হওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য। আর কোন কর্মোদ্যোগী ব্যক্তি স্বপ্নে ছাগল ছানা দেখা তার জন্য কল্যাণের প্রমাণ। কারণ, ছাগল ছানা মানুষের চেয়ে দ্রুত অন্তরঙ্গ হয়ে যায়। কেউ স্বপ্নে বিনা প্রয়োজনে ছাগল ছানা নিজে জবাই করতে দেখা তার সন্তানের মৃত্যুর লক্ষণ। স্বপ্নে মোটাতাজা ছাগল ছানা দেখা অধিক সম্পদের ইঙ্গিত। স্বপ্নে ছাগল ছানার কিছু অংশ খেতে দেখা অল্প সম্পদের লক্ষণ। ভাজা ছাগল ছানার কিছু অংশ খেতে দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজ সন্তানের উপার্জন ভক্ষণ করবে। (আল্লাহই ভাল জানেন।)

২৭০. الخزز (আল-খুযায) নর খরগোস

'খা'-তে পেশ; প্রথম 'যা'-তে যবর। এর বহুবচন خزان আসে, যেভাবে صرد-এর বহুবচন صردان আসে।

২৭১. الخشاش (আল খাশাশ) পোকা-মাকড়

'খা'-তে যবর আর কাযী ইয়াজ 'খা'-এর উপর তিন শ্রেণীরই হরকত বর্ণনা করেন। আবু আলী ফারেসী 'খা'-তে পেশ বলেছিলেন। তদ্রূপ জুবাইদি 'খা'-তে পেশ বলেছেন। আবার জুবাইদী 'খা'-এর পেশকে 'ফুহশে গলত' গণ্য করেন। কিন্তু সঠিক হল 'খা'-এর উপর যবরই হবে। প্রসিদ্ধও এটাই। خشاش-এর একবচ خشاشة আসে।

খাশাশ শব্দের অর্থে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

(১) 'খাশাশ' জমির পোকা-মাকড়।

(২) 'খাশাশ' শরীরে সাদা-কালো বিন্দুধারী একধরনের পোকা। আর এটা সর্পের সাথে সর্পের গর্তে।

(৩) 'খারাশ' এর দ্বারা অনেকে الثعبان العظيم তথা বড় সাপ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেউ কেউ একধরনের অজগর সাপ বলে মত পোষণ করেছেন, যাকে 'চিৎকোরিয়া' সাপও বলে। আবার কেউ কেউ ছোট মাথার সাপকে 'খারাশ' বলেছেন।

হাদীসে পোকা-মাকড়ের বর্ণনা

সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে, এক মহিলাকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে এজন্য যে, ওই মহিলা একটি বিড়ালকে খাবার না দিয়ে বেঁধে রাখত আবার ছেড়েও দিত না, যাতে সে জমির পোকা-মাকড় খেয়ে পেট ভরতে পারে। (অত্র হাদীসে حشاش দ্বারা উদ্দেশ্য জমিনের পোকা-কামড়।)

হাসান বিন আব্দুল্লাহ বিন সাআদ আসকারী 'আত-তাহরিফ ওয়াত্ তাছহীহ' গ্রন্থে 'খাশাশ' সম্পর্কে লিখেছেন : 'খাশাশ' (যবর দিয়ে) প্রত্যেক ক্ষুদ্র বস্তুর অংশকে বলে। উদাহরণস্বরূপ পাখিদের মধ্য থেকে মৃতখেকো সেই পাখিকে খাশাশ বলে, যাকে শিকার করা যায় না। এরপর তিনি এ অর্থের সমর্থনে একটি কবিতা উল্লেখ করেন :

خشاش الارض اكثرها فراخا وام الصقر مقلاة نزور

'জমিনের পাখি অনেক বাচ্চা দেয়; কিন্তু বাজপাখি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অল্প বাচ্চার অধিকারী।'

ইবনে আবিদ্দুনিয়া তাঁর 'মাকায়িদুশ শায়তান' গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাআলা জিন জাতিকে তিন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেন। যথা–

(১) সর্প, বিচ্ছু ও পোকা-মাকড় আকৃতিতে।

(২) সম্পূর্ণ উড়ো বা বাতাসে উড়তে সক্ষম।

(৩) যাদের হিসাব-কিতাব ও শাস্তি-পুণ্য প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) একশ্রেণীর মানুষ সম্পূর্ণ জীব-জন্তুর মত। কিন্তু তাদের অন্তর থাকা সত্ত্বেও তারা বোঝে না। চক্ষু থাকা সত্ত্বেও দেখে না। কর্ণ থাকা সত্ত্বেও শ্রবণ করে না।

(২) একশ্রেণীর মানুষ শারীরিকভাবেই মানুষ; কিন্তু তাদের অন্তর-প্রাণ শয়তানের।

(৩) একশ্রেণীর মানুষ ফেরেশতা তুল্য। আর তারাই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার বিশেষ ছায়ায় থাকবে। যে দিবসে আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

ওয়াহাব ইবনুল ওরদ বর্ণনা করেন : ইবলিস আকৃতি পবিবর্তন করে একবার হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর সামনে এসে বলে, আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন– তোমার উপদেশের কোন প্রয়োজন আমার নাই। তবে তুমি বলত! আদম সন্তান সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? শয়তান উত্তরে বলল, আমার নিকট আদম সন্তান তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) আমরা কিছু লোককে গিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে অত্যন্ত মিষ্টি কথায় তোষামোদ করে অনুগত করি এবং তাদেরকে দ্বীনের পথে অন্তরায় ও বাধা সৃষ্টি করি। কিন্তু এরা পরক্ষণেই লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করে ফেলে। তাদের এ তাওবার কারণে আমাদের সকল চেষ্টা-প্রয়াস বিফলে যায়। পুনরায় তাদেরকে নানাভাবে প্ররোচিত করে আমাদের অনুগত বানানোয় সফলতা অর্জন করি। কিন্তু আবারও তারা তাওবা-ইস্তেগফারের আশ্রয় নেয। ফলে এসব মানুষ আমাদের জালে আসে না। এজন্য আমরা তাদের দ্বারা নিজেদের কোন প্রয়োজন মিটাতে পারি না বরং সর্বদা অক্লান্ত কষ্ট-ক্লেশেই পড়ে থাকি।

(২) কিছু মানুষকে আমরা অনায়েসেই আমাদের করায়ত্তে নিয়ে আসি। আর তারা আমাদের হাতে ঠিক শিশুদের হাতে বল থাকার মতই আবদ্ধ থাকে। আমাদের ইচ্ছেমত তাদেরকে যেকোন দিকে ঘুরাতে পারে। এ শ্রেণীর মাধ্যমে আমাদের পরিশ্রম সার্থকতা পায়।

(৩) আবার একশ্রেণীর মানুষ আপনার মত নিষ্পাপ। তাদের উপর আমাদের কোন থাবা চলে না।

২৭২. الخفاش (আল-খাশাফ) চামচিকা/ বাদুড়

الخفاش চামচিকাকে বলে। এর বিস্তারিত বর্ণনা خفاش শব্দের অধীনে

আসসে ইনশাআল্লাহ।

২৭৩. الخشرم (আল খাশরাম) ভিমরুল মাঁক

ভিমরুলের মাঁক। এ শব্দ থেকে কোন একবচন আসে না।

২৭৪. الخشف (আল খিশফু) হরিণের বাচ্চা

'খা'-তে যের, 'শীন' সাকিন হলে এর অর্থ, হরিণের শাবক বা এর সবাগত শাবক আর 'খা' ও 'শীন' উভয়টিতে পেশ হলে এর অর্থ, সবুজ মশা। এর বহুবচন خشفة আসে।

ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা

ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, জারির লাইছ থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত করল– হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার সংশ্রবে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করছি। উত্তরে তিনি বললেন, বেশ! থাক। এরপর একদিন তিনি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যান। এক নদীর পাশে গিয়ে উভয়ে বসে খানা খান। খানায় দুটি রুটি তারা ভক্ষণ করেন আর একটি অবশিষ্ট ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) স্বস্থান উঠে গিয়ে নদীর পানি পান করে ফিরে এসে দেখেন, অবশিষ্ট রুটিটি আর নেই। তিনি তার সঙ্গীকে ওই রুটিটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সঙ্গীটি বলল, আমার জানা নেই। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, সামনে চল। এরপর পথিমধ্যে তাঁরা একটি হরিণ দেখতে পান। হরিণটির সাথে দুটি শাবকও ছিল। তিনি ওই শাবকদ্বয় থেকে একটিকে কাছে ডেকে আনলেন। এরপর সেটি জবাই করে উভয়ে একত্রে আহর করছেন। খাওয়া তখনো শেষ হয় নি; ইত্যবসরে তিনি শাবকটিকে বললেন : আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও! অমনি শাবকটি জীবিত হয়ে লাফাতে লাফাতে তার মায়ের নিকট চলে গেল। পুনরায় তিনি তাঁর সাথীকে বললেন : তোমাকে আমি সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি তোমাকে এ মু'জেযা দেখালেন! বল, তৃতীয় রুটিটি কোথায় গিয়েছে? কিন্তু সাথীটি এবারও পূর্বের মত একই উত্তর দিল আমার জানা নেই। এরপর উভয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেন। অবশেষে এক মাঠে গিয়ে পৌঁছান। হযরত ঈসা (আঃ) সেখান থেকে কিছু বালি-মাটি উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহ হুকুমে স্বর্ণ হয়ে যাও!' সুতরাং তা স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এবার তিনি সে স্বর্ণকে তিন ভাগে বিভক্ত করে বললেন, এক অংশ আমার, এক অংশ তোমার আর বাকি অংশটুকু সেই রুটি ভক্ষণকারী ব্যক্তির। এটা শ্রবণ করে ওই ব্যক্তি বলল– হে আল্লাহর রূহ! ওই তৃতীয় রুটিটি আমিই ভক্ষণ করেছি।

মোটকথা, তিনি নিজ সাথী থেকে তৃতীয় রুটিটি ভক্ষণের স্বীকারক্তি নিয়ে তাকে বললেন : এসব স্বর্ণ আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এ কথা বলে তিনি

সেখান থেকে চলে যান। ওই ব্যক্তি একাকী সেখানে বসে রইল। আর সম্পদ সংরক্ষণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সেখানে দুজন লোক এল এবং স্বর্ণ দেখে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে তা ছিনিয়ে নেয়ার মনোস্থ করল। ব্যাপারটা বুঝে লোকটি বলল, তোমরা আমাকে হত্যা কর না। চল! আমরা এ স্বর্ণগুলো সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিই। এ কথা শুনে তারা রাজি হল। এবার ঈসা (আঃ)-এর সাথী লোকটি তাদের বলল, এক্ষুণি তোমাদের একজন শহর থেকে গিয়ে খাবার নিয়ে এস! খাবার খেয়ে শান্তি মত স্বর্ণগুলো বণ্টন করা যাবে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে একজন খাবার আনতে শহরে গেল। পথিমধ্যে চিন্তা করল, যদি খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে দিই, তাহলে তো এ খাবার খেয়ে উভয়ে মরে যাবে আর সব স্বর্ণ আমার হবে। এ চিন্তা করে সে খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে আসল। এদিকে অপর দুজন পরামর্শ করল, সে খাবার নিয়ে আসা মাত্রই তাকে হত্যা করে ফেলব এবং শান্তিতে খাবার খেয়ে দুজনেই স্বর্ণ সমান ভাগ করে নিব। এরপর ওই ব্যক্তি যখন খাবার নিয়ে আসল, তখন তারা দুজন তাকে ধরে হত্যা করে ফেলল। এরপর মনের আনন্দে খেতে বসল। কিন্তু খাবারে বিষ মিশ্রিত থাকার দরুন সাথে সাথে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তৎক্ষণাত মারা গেল আর স্বর্ণগুলো ওই অবস্থায়ই পড়ে রইল। ঘটনাক্রমে হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় সেখান দিয়েই যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, এরই নাম দুনিয়া আর সে দুনিয়াদারদের সাথে এমন ব্যবহারই করে থাকে। তোমারা তা থেকে বেঁচে থাক!

২৭৫. الخضارى (আল খাদারা) এক জাতীয় পাখি

সবুজ-হলদে মিশ্রিত রঙের এক জাতীয় পাখি। একে 'আখইয়াল'-ও বলা হয়। এর আলোচনা আলিফ পরিচ্ছেদে গত হয়েছে।

২৭৬. الخضرم (আল খাদরাম) শুইসাপের বাচ্চা

২৭৭. الخضيرا (আল খাদীরা) পাখি

আল খাদীরা আরবদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ পাখি।

২৭৮. الخطاف (আল খাত্তাফ) আবাবীল

'খা' পেশের সাথে, এর বহুবচন خطاطيف আসে। একে হিন্দুস্থানে যাওয়ারাল হিন্দও বলা হয়। এ পাখিটি সব জায়গা ছেড়ে সুদূর থেকে জনবসতির দিকে ছুটে আসে। কারণ, এরা মানুষের নিকট থাকতে পছন্দ করে। এরা বেশ উঁচু স্থানে বাসা বঁধে, যেখানে সহজে কেউ পৌঁছতে পারে না। মানবসমাজে এ পাখি عصفور الجنة (জান্নাতের পাখি) বলে প্রসিদ্ধ। কেননা এ

পাখি মানুষের খাদ্যদ্রব্যের প্রতি একদম অনাগ্রহী। কারণ, এদের খাদ্য শুধু মশা-মাছি। এরা শুধু মশা-মাছি আহার করে। মানুষের আহার্য্য এরা কখনও ভক্ষণ করে না। এজন্য এরা মানুষের দৃষ্টিতে প্রিয়।

ইবনে মাজাহ সাহাল বিন সায়াদুস্ সায়াদী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা করলে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাগণ আমাকে ভালবাসবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের কাছে বিদ্যমান বস্তুনিচয় থেকেও বিমুখ থাকবে। তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।

আল্লাহ দামেরী (রহ.) বলেন : দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভের কারণ। কেননা আল্লাহ তাআলা তার অনুগত বান্দাদের ভালবাসেন আর অবাধ্যদের প্রতি হন অসন্তুষ্ট। কেননা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দুনিয়ার লোভ-লালসার সাথে একত্র হয় না। তাছাড়া মানুষের অধীন বস্তুনিচয় থেকে বিমুখ হওয়াই তাদের প্রিয় হওয়ার কারণ। কেননা ধনলোভী লোক দুনিয়ার মোহে মৃতখেকো কুকুরের মত ডুবে থাকে। এজন্যই কোন ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়লে সে শত্রুতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে তাদের প্রতি বিমুখ এবং অনাগ্রহী হলে সে তাদের প্রিয় হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈ (রহ.) দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের নিন্দায় বলেন:

وما هى الاضيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها

✪ দুনিয়া একটি মরা লাশ ছাড়া কিছুই নয়। অথচ দুনিয়া একে বৈধ জ্ঞান করে। বস্তুত দুনিয়াদারদের দৃষ্টান্ত ওই কুকুরের মত, যে কুকুর মরা খাওয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে।

فان لجتنبها سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها

✪ এ মরা দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হলে তুমি জগদ্বাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তুমি তা খাওয়ার বাসনা রাখলে দুনিয়ার কুকুরগুলো তোমার সাথে যুদ্ধে রিপ্ত হবে।

এ আবাবীলের প্রসংশায় জনৈক কবি চমৎকার কবিতা লিখেছেন :

كن زاهدا فيما حوته يدا الورى تضحى الى كل الانام حبيبا

✪ দুনিয়াদারদের আয়-উপার্জন ও তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদের দিকে মোটেও দৃষ্টিপাত কর না। তুমি এ নীতিই ধারণ করতে পারলে সকলেই তোমাকে ভালবাসবে।

او ماترى الخطاف حرم زادهم اضحى مقيم فى البيوت ربيبا

✪ তুমি কি দেখ না, আবাবীল পাখি নিজের জন্য সকলের জীবিকা হারাম করে নিয়েছে। আর এজন্যই মানুষের গৃহে থাকা সত্ত্বেও কেউ তাকে উৎপীড়ন করে না।

এদেরকে রাবীব বা 'সৎপুত্র'ও বলা হয়। কেননা এদের পছন্দ আবাদ ভূমি। আর অনাবাদ পতিত ভূমি এদের অপছন্দ। এরা মানুষের কাছাকাছি বাস করে। আবাবীলের মধ্যে আশ্চর্যজনক একটি বিষয় হল কোনক্রমে এদের চক্ষু বের হয়ে গেলে পুনরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে একে কেউ কোন আহর্য্যের উপর স্থায়ী থেকে বা সবসময় এক খাবারে স্থির থেকে দেখে নি এবং একে কেউ মাদীর সাথে সঙ্গম করতেও দেখে নি।

আবাবীলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা

বাদুর আবাবীলের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাদুর সর্বদা এদের বাচ্চাদেরকে উৎপীড়ন করে। তাই আবাবীল বাচ্চা প্রসবের সময় নিজের বাসায় উৎকট গন্ধীলতার চারাগাছের লাকড়ি রাখে। ওই লাকড়ির গন্ধে বাদুর তার বাসার কাছেও আসে না আর এর বাচ্চা নিরাপদে থাকে। আবাবীল তার বাসায় নতুন মাটির প্রলেপ দেয়ার পূর্বে বাচ্চা প্রসব করে না। এরা নিজে বাসা আশ্চর্যজনক ও সূক্ষ্মভাবে তৈরি করে। প্রথমে এরা লতা মিশ্রিত মাটি সংগ্রহ করে আনে। এরূপ মাটি কোথাও না পেলে এরা পানিতে ডুব দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। এতে এদের শরীর ও বাহুতে খুব মাটি লেগে যায়। এরপর নীড়ে এসে এরা নিজের পাখা ঝেড়ে কিছু পালক ফেলে। এরপর ওই পারকের সাহায্যে বাসা বানায়। বড় আশ্চর্যজনক বিষয় হল, আবাবীল নিজের বাসায় পায়খানা করে না; বাইরে গিয়ে পায়খানা করে। আর বাচ্চা যখন বড় হয়ে উঠে তখন তাদেরকেও এ শিক্ষা প্রদান করে।

আবাবীলের কৌশল

আবাবীলের বাচ্চা পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত হলে এরা হিন্দুস্থান এসে একটি পাথর নিয়ে যায়। সেটি ওই বাচ্চার উপর রাখতেই এদের পাণ্ডু রোগ নিরাময় হয়ে যায়। সুতরাং এ রোগ যদি কোন মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আর কোথাও এ পাথর না পাওয়া যায়, তখন আবাবীলের বাসা থেকে এদের বাচ্চা বের করে এনে তাকে জাফরান রঙে রঞ্জিত করে পুনরায় তার বাসায় নিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়। আর আবাবীল নীড়ে এসে যখন এদেরকে পিতবর্ণে দেখে ভাবে, বোধ হয় গরমের কারণে এদের পাণ্ডু রোগ হয়েছে। তখন এরা হিন্দুস্থান এসে ওই পাথর নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের উপর রাখে। দিত। পরে তা যার প্রয়োজন এসে নিয়ে যায়। বস্তুত এটা আবাবীল পাথর নামে প্রসিদ্ধ একটি ক্ষুদ্র পাথর। এতে লাল-কালো দাগ থাকে। এভাবে মানুষ পাথরটি সংগ্রহ করে পাণ্ডু রোগের

চিকিৎসা করে। উক্ত পাথরটির বৈশিষ্ট্য হল, যদি কোন পাণ্ডু রোগী এ পাথরটি গলায় ঝুলিয়ে রাখে বা তা পানিতে ভিজিয়ে ওই পানির পান করে, তাতেও পাণ্ডু রোগ মুক্ত হয়ে যাবে ইনশালাল্লাহ।

আবাবীল পাখির একটি অভ্যাস আছে, আকাশের মেঘ গর্জনের বিকট শব্দে সে খুব ভয় পায়। অনেক সময় মৃত্যুপ্রায় হয়ে যায়। হাকীম আরাস্তু 'আন-নুয়ূতুল খাতাতীফ' গ্রন্থে লিখেন : আবাবীল পাখি কখনও অন্ধ হয়ে গেলে 'আইনুশ শামছ' বৃক্ষের পাতা খায়। এতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

চোখের জন্য সুস্থতা

কুশাইরী পুস্তকের 'মুহাব্বাত' অনুচ্ছেদের শেষ দিকে লিখেন : হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর প্রাসাদে একবার আবাবীল তার স্ত্রী সাথে সঙ্গমের ইচ্ছে করছিল এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তা পূরণের প্রচেষ্টা করে। কিন্তু তার স্ত্রী কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ সময় প্রয়াসের পরও যখন সম্ভব হল না, তখন আবাবীল রেগে বলল, তুমি আমার কথা মানছ না! অথচ আমাতে এমন শক্তি আছে, চাইলে আমি এ প্রাসাদটি হযরত সুলাইমান (আঃ)- এর উপর উল্টিয়ে দিতে পারি।

ঘটনাক্রমে তাদের এ আলাপ হযরত সুলাইমান (আঃ) শুনে ফেললেন। অতএব তিনি নর আবাবীলকে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিলেন। সে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, বল তুমি কেন এমন কথা মুখ থেকে বের করলে? সে বলল, হে আল্লাহর নবী! প্রেমালাপের কারণে গ্রেফতার করা যায় না। এ উত্তর শুনার পর তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

ফায়েদা

সা'লাবী প্রমুখ সূরা নামলের তাফসীরে লিখেন : যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি ভয়ের আপত্তি করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে আবাবীল পাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এজন্যই আবাবীল আদম সন্তানের গৃহ থেকে পৃথক হয় না।

সা'লাবী লিখেন : পবিত্র কুরআনে কারীমের ৪টি আয়াত আবাবীলের জানা আছে। তাহল, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الخ সূরা হাশরের শেষ পর্যন্ত, পারা—২৮, আর আবাবীল যখন العزيز الحكيم পর্যন্ত পৌছে আওয়াজ উঁচু করে।

আবাবীলের শ্রেণীবিন্যাস

আবাবীল অনেক শ্রেণীর। তবে চার প্রকার প্রসিদ্ধ। যথা— (১) সমুদ্র উপকূলে বাসকারী। এরা সেখানে জমি খনন করে বাসা বানায়। এগুলো ছগীরুজ

জাস্‌সাহ ও আছফুরুজ জান্নাহ অপেক্ষা ছোট। এদের শরীর ছাই রঙের। এরা سنونو (সীন পেশসহ; এর বর্ণনা সীন পরিচ্ছেদে আসবে) নামে প্রসিদ্ধ।

(২) যেগুলোর রঙ সবুজ আর পিঠের অংশ লাল। মিসরীয়গণ এগুলো সবুজ রঙের হয় বলে এদেরকে খাযিরি বলে। এদের খাদ্য মশা-মাছি আর ফড়িং-প্রজাপতি ইত্যাদি।

(৩) যেগুলোর বাহু দীর্ঘ ও পাতলা হয়। এরা পাহাড়ে বাস করে। আর এদের খাদ্য পিপীলিকা। এগুলোকে সামাইম (বিষধর) বলে। এর একবচন سمائم আসে।

(৪) যেগুলোকে সুনুনু سنونو বলে। এর একবচন سنونوة আসে। এ আবাবীল সাধারণত মসজিদে হারামে থাকে এবং বাবে ইব্রাহীম ও বাবে বনী শাইবার ছাদে বাসা বানায়।

কতিপয় লোকের ধারণা, সুনুনই সেই পাখি যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আসহাবে ফীল অর্থাৎ আব্রাহা ও তার সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিলেন।

নাঈম বিন হাম্মাদ হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তাঁর নিকট অপূর্ব সুন্দর কতিপয় বালক বসেছিল। যারা দেখতে চাঁদের মত। আমরা আল্লাহর এ দান ও তাদের অসাধারণ সৌন্দর্যে আশ্চর্য হলাম। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদের আশ্চর্য থেকে দেখে বললেন : মনে হয় তোমার এ বালকদের প্রতি ঈর্ষা করছ? উত্তরে আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! একজন মুসলমানের তাদের মত বালকের প্রতি অবশ্যই ঈর্ষা হওয় স্বাভাবিক। এরপর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিজ কামরার ছাদের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে বলেন : ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি যদি এ বালকদেরকে জমিনে দাফন করে নিজ হাতে এদের কবরের মাটি ঝাড়ি, তবে তা এ ছাদের সাথে ঝুলন্ত আবাবীল পাখির বাসা উজাড় হওয়া এবং এদের ডিম ভেঙে যাওয়ার তুলনায় অধিক প্রিয়। ইবনুল মুবারক বলেন: হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ শব্দগুলো এজন্য বলেছেন, যেন এদের প্রতি কোন কুদৃষ্টি না লাগে।

আবু ইছহাক সাবী আবাবীল সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো বলেন :

وهندية الاوطان زنجية الخلق مسودة الالوان محمرة الحدق

হিন্দুস্থানী জন্ম আর হাবশী জন্মে, রঙে কালো ও চোখে লালিমা। কথা বলার সময় সে শেষের আওয়াজকে তীব্র করে আর তার অশ্রু থেকে রক্ত ঝরে।

اذا صوت باخر صوتها حداد فاذرت من مدامعها العلق

আমি তাকে দর্শানার্থে থমকে গেলাম। মনে হল, সে চিন্তিত। তার কথায় ছির

কড়কড় শব্দ; যেন তা কামানের কাষ্ঠ-রশি বিদারণ শব্দ।

كان بها حزوا وقد لبست له كما صر ملوى العود بالوتر الحزق

এরা গ্রীষ্মকালে আমাদের নিকটে থাকে আর শীতকালে বাস করে নিজের জন্মভূমিতে। এভাবেই প্রতি বছর আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং বিচ্ছেদও হয়।

আবাবীলের শরঈ বিধান

আবুল হারিস আব্দুল রহমান ইবনে মুয়াবিয়া তাবেয়ীর বর্ণনা মতে আবাবীল খাওয়া হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবাবীল মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'এসব আশ্রয় প্রত্যাশীদের হত্যা কর না। কেননা এরা অন্যদের থেকে পলায়ন করে তোমাদের আশ্রয়ে এসেছে।' অন্য এক বর্ণনা আছে, উবাদাহ বিন ইসহাক নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আশ্রয় নেয়া আবাবীল মারতে নিষেধ করেছেন। এ উভয় বর্ণনা সূত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল। তবে আরেকটি বর্ণনা আছে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে। তিনি বলেন, হাদীসে ব্যাঙ মারা নিষিদ্ধ। কারণ, এর ডাক তাসবীহ। তদ্রূপ আবাবীলকে মের না। কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার সময় আবাবীল আল্লাহর নিকট আবেদন করেছিল, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সামুদ্রিক শক্তি দাও, যেন আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসকারীদের ডুবাতে পারি। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবাবীল মারতে নিষেধ করেন। কেননা এরা আল্লাহ তাআলার উপাসানায় ধ্বংসের বিরোধী ছিল। হাদীসে আরও উল্লেখ্য আছে, আবর্জনাখেকো প্রাণী ও এমন প্রাণী ব্যবহার করা নিষেধ, যাকে বেঁধে দূর থেকে মারা হয়েছে। এভাবে খাতফা (ছোঁ মেরে নিয়ে যায় প্রালী) থেকেও নিষেধ করেছেন।

হাদীসে খাতফা শব্দ এসেছে 'তা' সাকিনের সাথে। উলামায়ে কেরাম এর দুটি অর্থ লিখেন : (১) খাতফা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন প্রাণী, যাকে কোন পাখি ছোঁ মেরে নেয়ার পর মরেছে। এ মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম।

(২) ইবনে কুতাইবা আরেকটি অর্থ লিখেছেন, খাতফা প্রত্যেক ওই প্রাণীকে বলে, যে ক্রোধের সাথে কোন বস্তু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। সুতরাং আবাবীলেরও এ অভ্যাস আছে বিধায় এর গোশত খাওয়া হারাম।

এরা ময়দানে শিকার করে খায়। এজন্য এদের শিকার হারাম বস্তুর অন্তর্ভূক্ত থেকে পারে। তাই এদের গোশত খাওয়া হারাম। অবশ্য মুহাম্মাদ বিন হাসান (রাঃ)-এর মতে আবাবীল হালাল। এরা হালালই আহার করে। অধিকাংশ শাফিয়ী মাযহাবের ইমামগণের অভিমতও এটাই।

'চিকিৎসায় আবাবীল'

দার্শনিক এরেষ্টোটল লিখেন : আবাবীলের চক্ষু তুলে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে কোন তক্তা বা টেবিলে বেঁধে রেখে ওই টেবিলে কোন ব্যক্তি শয়ন করে, তবে সে

ব্যক্তি কখনও নিদ্রা যেতে পারবে না। আবাবীলের চক্ষু শুকিয়ে উন্নত তৈলে ভিজিয়ে কোন মেয়েকে পান করানো হলে সে মেয়ে ওই ব্যক্তির কঠিন প্রেমে পড়ে যাবে। ওই শুষ্ক চক্ষু মল্লিকা ফুলের তৈলে ভিজিয়ে প্রসূতির নাভিতে মালিশ করা হলে অতি দ্রুত ব্যথার উপশম হবে। আবাবীলের কলিজা শুকিয়ে পানিতে ভিজিয়ে পান করা যৌনশক্তির জন্য বিরাট ফলপ্রদ। কোন নারীকে তার অজান্তে আবাবীলের রক্ত পান করানো হলে ওই নারীর সঙ্গমশক্তি হ্রাস পাবে। কার মাথায় আবাবীলের রক্তের প্রলেপ দেয়া হলে নোংরা বস্তু মেশার কারণে সৃষ্ট মাথা ব্যথার অনেক উপকার হবে। আর এ ব্যথা সাধারণত নবজাতক সন্তানদের হয়ে থাকে। আবাবীলের পায়খানা পিষে ক্ষতস্থানে লাগালে অতি দ্রুত ওই ক্ষত ভাল হয়ে যাবে। বিশেষত যে ক্ষতস্থানে ছিদ্র থাকে, তা ভাল হওয়ার অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। আবাবীলের পিত্ত পান করলে সাদা চুল কালো হয়। তবে পানকারীকে খেয়াল করে সর্বাগ্রে সামান্য মাঠা-দুধ মুখে লাগাতে হবে। যেন দাঁত কালো না হয়। আবাবীলের গোশত খাওয়ার দ্বারা অনিদ্রা রোগ সৃষ্টি হয়। আবাবীল পাখির মাথায় একটি পাথর থাকে। সেটি বেশ উপকারী। প্রত্যেক আবাবীল তা গিলে ফেলে। কারণ, সৌভাগ্যক্রমে কেউ এ পাথরটি সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখলে সে মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ থাকবে। আর এ পাথরধারী কারও সাথে প্রেম-মুহাব্বাত করতে চাইলে পাথরটি তাকে এতে সাহায্যকারী হবে। তার প্রেমাস্প তার প্রেম ভঙ্গ করার সাহস পাবে না।

সেকান্দর বলেন : আবাবীল যখন প্রথম ডিম দেয়, তখন তার বাসায় প্রথমত দুটি পাথর প্রকাশ হয়। ওই পাথর দুটি সাদা রঙের অথবা একটি সাদা দ্বিতীয়টি লাল রঙের হয়। এ পাথরদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য হল, সাদা পাথরটি মৃগী রোগীর উপর রাখা হলে তাৎক্ষণিক তার জ্ঞান ফিরে আসবে। আর লাল পাথরটি কোন অর্শ্বরোগীর কাঁধে রাখা হলে সে অতি দ্রুত পীড়া থেকে মুক্তি লাভ করবে। অধিকন্তু এ উভয় পাথর বিভিন্ন আকৃতিতে পাওয়া যায়। একটি লম্বা; দ্বিতীয়টি গোলাকার। এ দুই পাথর গাভীর শাবকের চামড়ায় পেঁচিয়ে মস্তিষ্ক বিকৃত রোগীর গলায় বেঁধে দিলে সে ভাল হয়ে যাবে। এগুলো সেসব বাসায় পাওয়া যায়, যার মুখ পূর্বদিকে থাকে। অন্য দিকে মুখ করা বাসায় পাওয়া যায় না। এ পাথরগুলোর সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুরো বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

স্বপ্নে আবাবীল দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে আবাবীলের ব্যাখ্যা কখনও নারী-পুরুষ এবং ধন-সম্পদের দ্বারা দেয়া হয় এবং কখনও উহার ব্যাখ্যা লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা প্রদান করা হয়। কেউ স্বপ্নে আবাবীলকে ধরতে দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে, স্বপ্নদ্রষ্টা হারাম মালের মালিক হবে। কেননা খাতাফ-এর এক অর্থ, 'যে ছোঁ মারে'। স্বপ্নে কেউ নিজ গৃহে আবাবীল প্রবেশ করতে দেখলে এর ব্যাখ্যা, তার হালাল মাল হস্তগত হবে।

কেননা সে এদেরকে ধরে নি; স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছে। আবার কেউ বলেন, খাতাফ দ্বারা উদ্দেশ্য একজন নেককার প্রেমিক ব্যক্তি। খ্রিষ্টানদের নিকট স্বপ্নে আবাবীলের গোশত খাওয়া কোন বড় ধরনের ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত। স্বপ্নে আবাবীলের ডাক শোনা কোন ভাল কাজের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা এর ডাক তাসবিহ সদৃশ্য। কেউ স্বপ্নে নিজ গৃহ থেকে আবাবীল বের হচ্ছে দেখলে বুঝবে তার আত্মীয়রা সফরের কারণে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য আবাবীলের অধিকাংশ ব্যাখ্যা কর্মলিপ্ত হওয়া। কেননা সে আত্মপ্রকাশ করে কর্মহীন যুগে।

জামাসার বলেন : স্বপ্নে কোন শিকার করতে দেখা স্বপ্নদ্রষ্টার গৃহে চোর প্রবেশ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২৭৯. الخطاف (আল খাত্তাফ) সামুদ্রিক মাছ

('খা'-এর উপর যবর আর 'ত্বা'-এ তাশদীদ) সামুদ্রিক মাছ। এর পিঠে দুটি পাখা থাকে। এদের রঙ কালো। এরা পানি থেকে বের হয়ে বাতাসে উড়ে, পুনরায় পানিতে ফিরে আসে। আবু হামেদ উন্দুলুছী তাই লিখেছেন।

২৮০. الخفاش (আল খুফফাশ) বাঁদুড়

('খা'-এর উপর পেল আর 'ফা'-এ তাশদীদ) এর বহুবচন خفافيش আসে। এ পাখিগুলো রাত্রে উড়ে এবং ভয়ঙ্কর আকৃতির হয়।

জ্ঞাতব্য

বাদুড়কে خفاش বলার কারণ, এ শব্দটি اخفش থেকে চয়িত। অর্থ, ক্ষীণ দৃষ্টি। আরবী ভাষায় 'আখফাশ' ওই ব্যক্তিকে বলে, যে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা জন্মের পর কোন কারণবশত তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। এজন্য সাধারণ ভাষায় আখতাশ 'ক্ষীণদৃষ্টি' ওই ব্যক্তিকে বলে, যে রাত্রে দেখে কিন্তু দিনে কিছুই দেখতে পায় না। অথবা বৃষ্টির দিনে দেখে, কিন্তু সূর্যের আলোতে কিছুই দেখে না।

বাদুড়ের মধ্যেও এ দোষ রয়েছে। তাই তাকে 'খুফফাশ' বলা হয়। বাত্‌লিমুছি বলেন : খুফফাশের চারটি নাম— خفاش (খুফফাশ), خشاف (খুশশাফ), خطاف (খুত্তাফ) এবং وطواط (ওয়াতুয়াত)। কিন্তু জাহিয বলেন : খুফফাশ নামটি রাত্রের সমস্ত পাখিদের উপর প্রয়োগ করা যায়। আর বুতুয়াত ওই খুফফাশের নাম, যার বর্ণনা ইবনে কুতুাইবা ও আবু হাতেম বড় পাখিদের নামে করেছেন। আবার বাত্‌লিমুছি খুফফাশকে খুত্তাফও বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে গ্রন্থপ্রণেতা মতানৈক্য প্রকাশ করেন। কেননা বিশুদ্ধ মতে এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাখি। কেউ কেউ বলেন : খুফফাশ বড় পাখি আর বুতুয়াত ছোট পাখি। দুটিউ চাঁদনী রাত্রে ও দিনের বেলায় দেখে না।

জনৈক কবি তার কবিতায় তা-ই উল্লেখ করেছেন :

مثل النهار يزيد ابصار الورى نورا ويعمى اعين الخفاش

"দ্বিপ্রহরে সৃষ্টিজীবের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়; কিন্তু বাদুড়ের সে-সময় চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়ে যায়।"

বাদুড়ের চক্ষু দিনের বেলায় যেহেতু আলোহীন হয়ে যায়, তাই সে বের হওয়ার জন্য মধ্যম সময় সন্ধান করে, যা একেবারে অন্ধকার কিংবা একদম উজ্জ্বলও নয়। অতএব, এরা সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পরক্ষণে হয়। আর এটাই এদের আহারের সময়। কেননা মশারা এ সময়েই নিজ রিযিক অর্থাৎ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর রক্ত চোষার জন্য বের হয়। সুতরাং বাদুড় মশার সন্ধানে আর মশা জীবজন্তুর সন্ধানে একসাথে বের হয়। এরপর একটি খাদ্যান্বেষণকারী, আরেকটি খাদ্যান্বেষণকারীর খোরাকে পরিণত হয়। বস্তুত পবিত্র সত্তার প্রতিটি কাজই হিকমতপূর্ণ।

বাদুড়কে শুধু একটি উড়ন্ত প্রাণী বলা ছাড়া কোন যুক্তিতেই পাখি বলা যায় না। কেননা এদের দুটি দৃশ্যমান কান, দাঁত এবং দুটি অণ্ডকোষ আছে। স্ত্রী বাদুড়ের ঋতুস্রাবও হয়। ঋতুস্রাবের পর পবিত্র হয়। বাদুড় মানুষের মত হাসেও। চতুষ্পদ জন্তুর মত প্রস্রাব করে। ডিম ছাড়ই এরা বাচ্চা প্রসব করে; বাচ্চাকে দুধ পান করায়। এদের শরীরে কোন পশম নাই। কোন কোন তাফসীরকারের মতে বাদুড় একটি প্রাণী। এটি হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্য আল্লাহ পাকের অন্যান্য সৃষ্টিজীব থেকে বাদুড় ভিন্ন ধরনের। আর এ কারণেই সমস্ত পাখি বাদুড়ের সাথে বৈরিতা প্রদর্শন ও এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। মাংসাশি পাখিরা বাদুড় খেয়ে ফেলে আর যেসব পাখি মাংস খায় না, তারা একে মেরে ফেলে। এ কারণে বাদুড় শুধু রাত্রিতেই বের হয়।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন : মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত বাদুড়ের উপর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাদুড় শুধু উড়তেই থাকে। আর মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল হলে পড়ে মরে যায়। যাতে স্রষ্টার কর্ম সৃষ্টির কর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় এবং প্রকাশ হয়ে যায়, পূর্ণতা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত। বাদুড়ের মধ্যে উড়ার ক্ষমতা খুব বেশি। উড়ার সময় সে নিজের ইচ্ছেমত যে-কোনো দিকে তাৎক্ষণিক মোড় নিতে পারে। বাদুড়ের খাদ্য হল মশা-মাছি আর গাছের ফল। যেমন– আম, জাম, বড়ই, বন্য ফল ইত্যাদি। বাদুড়ের আয়ু অনেক হয়ে থাকে। বলা হয়, এদের আয়ু গাধা ও বন্য গাধার চেয়েও বেশি হয়। স্ত্রী বাদুড় তিন থেকে সাতটি বাচ্চা প্রসব করে। এরা উড়ন্ত অবস্থায়ও সঙ্গম করতে পারে। বাদুড়, বানর এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী তাদের বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলাচল করে না। বাদুড় তার বাচ্চাকে

ডানার নিচে রাখে। কোন কোন সময় মুখে রেখেও উড়ে। কোন কোন সময় দেখা যায়, উড়ন্ত অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করায়। বাদুড়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এদের গায়ে যদি চিনার গাছ (মানুষের হাত সদৃশ পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষ)-এর পাতা অথবা ডালের ঘষা লাগে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে অবশ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

মানুষে বাদুড়কে বোকা মনে করে। কারণ, বাদুড়কে যদি বলা হয়— اطرق كرى اطرق كرى ان النحام فى القرى (মন্ত্র বিশেষ) তবে সে মাটির সাথে লেগে যায়।

ফিকহী মাসয়ালা

যেকোন চক্ষু নষ্ট করলে অর্ধেক দণ্ড দিতে হবে হোক তা কোন বোবা, বধির, টেরাচক্ষু, একচোখা কিংবা অন্ধ লোকেরই। কেননা এ সমস্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয় কিছু না কিছু কাজ করত। অর্থাৎ সামান্য হলেও সে তা দ্বারা উপকৃত হত। এ কারণে এক চোখের জন্য অর্ধ দিয়ত বা রক্তপণ আর উভয় চোখের জন্য পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। প্রশ্ন হল, কানা বা টেরা ব্যক্তির চক্ষু তার কতটুকু উপকারে আসত? বস্তুত এ বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। কেননা আটককারীর আটকশক্তি আর পথিকের দ্রুত বা মন্থর চলাতেও মীমাংসা হয় না। মোটকথা, এমতাবস্থায় মূলত দৃষ্টিশক্তির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে; তার দুর্বলতা-সবলতার উপর নয়। আর যদি চোখে সাদা ছানি পড়ে যায়, অবশ্য এ কারণে তার দেখতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাহল বিষয়টি হুবহু এরকম যেমন, কার শরীরে মেচতা বা তিল হল। আর মেচতা বা তিলের কোন ধর্তব্য নেই। এজন্য ওই সাদা ছানিরও কোন ধর্তব্য নেই। এখন এ সাদা পর্দা চোখের বিশেষ কোটরেই হোক বা পুতলিতেই হোক। পক্ষান্তরে এ পর্দা যদি পুরো দৃষ্টিশক্তিতেই হয়; কিন্তু খুবই হালকা। এতে দৃষ্টিশক্তির কোন অসুবিধা হয় নি। এ ধররে চোখ কেউ ছিদ্র করে দিলে এমতাবস্থায়ও অর্ধেক দণ্ড ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। এ সকল মনীষী এ দৃষ্টিভ্রম কোন রোগ, নাকি অন্য কোন কারণে হয়েছে, সে পার্থক্যের কোন মূল্যায়ন করেন না। আর পর্দা যদি খুব কম হয় এবং আমরা তা হিসেব করতে পারি, তাহলে দিয়ত সে হিসেব মতে কম-বেশি হবে। পক্ষান্তরে ক্ষতির হিসেব দুঃসাধ্য হলে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তার মীমাংসা করতে হবে। আলোর ঝলকানিতে দৃষ্টিশক্তি জন্মগতভাবেই কম হয়। এ পার্থক্যটা তখনই ধরা পড়ে, যখন তা নিজের অসাবধানতার কারণে হয়। যেমন ভুলবশত কেউ মুখ ধৌত কিংবা চোখ পরিষ্কার করল না। এটা এক জিনিস আর জন্মগত অন্ধত্ব অন্য জিনিস।

কানা ব্যক্তির বা একচোখার চোখ নষ্ট করলে তার জন্য অর্ধেক দিয়ত (অর্থদণ্ড) ওয়াজিব হবে। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতেন। এ অভিমত আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান, যুহ্‌রী, কাতাদাহ, মালেক, লাইছ, ইমাম আহমাদ ও ইছহাক ইবনে রাহবিয়া প্রমুখ মণীষীগণের।

শরীয়াতে বাদুড়ের হুকুম

আবুল হুয়াইরিছ বলেন, মুরছাল সনদের বর্ণনানুসারে বাদুড় খাওয়া হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদুড় মারতে নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন : যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তখন বাদুড় বলেছিল– হে রাসূল! সমুদ্রকে আমার অধীন করে দিন! আমি তাহলে বায়তুল মুকাদ্দাস উজাড়কারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিব।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর কাছে বাদুড়ের ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : বাদুড় কে খাবে!? ইমাম নাখয়ী বলেন, বাদুড় ব্যতীত সমস্ত পাখিই হালাল। 'রওজাহ' কিতাবের ভাষ্যে বুঝা যায়, বাদুড় খাওয়া হারাম। কিতাবুল হজ্জে লিখা রয়েছে, মুহরিম ব্যক্তি বাদুড় মেরে ফেললে জরিমানা ওয়াজিব হবে এবং পূর্ণ মূল্য দিত হবে। অথচ প্রকাশ্য কথা হল, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম, ইহরাম অবস্থায় সেসব প্রাণী হত্যা করলে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না।

মুহামিলী লিখেছেন : বন্য ইঁদুর খাওয়া নাজায়েয অথচ ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং সমস্ত কথায় মতানৈক্য আছে বিধায় আবাবীল পাখি খাওয়া হারাম না হালাল, এর কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না।

পরিশিষ্ট

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) 'কিতাবুল উম্মু'-এ লিখেছেন, --- চড়ুই পাখির চেয়ে বড় আর হুদহুদ পাখির চেয়ে ছোট। এর গোশত খাওয়া যায়। যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি একে মেরে ফেলে, তাহলে মূল্য দিতে হবে। হযরত আতা-এরও এ অভিমত। তার মতে তিন দিরহাম মূল্য দিতে হবে। এ বিশ্লেষণে বুঝা যায়, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এটা খাওয়া-না খাওয়ার ব্যাপারে কোন মীমাংসা দেন নাই। অবশ্য তিনি লিখেছেন, এটা কেউ খেলে সে শাস্তিযোগ্য হবে।

হযরত আতা যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তিন দিরহাম ওয়াজিব হবে। ইমাম আসমাঈ বলেছেন, خطاف বাদুড়ই হবে। আর আবু উবাইদাহ বলেছেন, এটা وطواط হবে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই এটা হালাল হবে না।

চিকিৎসায় বাদুড়

যদি বালিশের নিচে বাদুড়ের মাথা রাখা হয় আর সেই বালিশে কোন ব্যক্তির মাথা রেখে ঘুমোতে চায়, তাহলে তার ঘুম আসবে না। বাদুড়ের মাথা তামা বা লোহার কোন পাত্রে চামেলী তৈলে জ্বাল দিবে। যাতে তৈল ফুটতে ফুটতে মাথাটি জ্বলে কয়লা হয়ে যায়। এরপর সেই তৈল পরিষ্কার করে কোন বোতলে রেখে প্যারালাইসিস রোগী বা কাঁপুনে রোগীর শরীরে মালিশ করবে। এতে সে খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। এ চিকিৎসা পরীক্ষিত ও বড় আশ্চর্যজনক। বাদুড় ধরে ঘরের ভিতর জবাই করে এর কলিজা দ্বারা ধুপ দিলে সেই ঘরে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারবে না। কেউ যদি সহবাসের সময় বাদুড়ের কলিজা শরীরে কোন স্থানে বেঁধে রাখে, তাহলে তার যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাদুড়ের কলিজা কেউ সাথে রাখলে সে বিচ্ছু থেকে নিরাপদ থাকবে। বাদুড়ের পীত প্রসবকালে কোন মহিলার লজ্জাস্থানে মালিশ করা হলে অতি দ্রুত তার সন্তান প্রসব হবে।

কোন মহিলা যদি রক্তস্রাব বন্ধের জন্য বাদুড়ের চর্বি মালিশ করে, তাহলে শীঘ্র রক্তসাব বন্ধ হয়ে যাবে। বাদুড় হালকা জ্বালে রান্না করে তা পুড়ে ছাই বানাবে। এরপর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবকারী ব্যক্তির লিঙ্গের ছিদ্রপথে প্রবেশ করালে বা লিঙ্গে মালিশ করলে এ রোগ আর থাকবে না। বাদুড়ের গোশত হালকা ঝোল করে একটি বড় পাত্রে রেখে পক্ষাঘাত রোগীকে তাতে বসালে পক্ষাঘাত রোগ থেকে সে মুক্তি পাবে। বাদুড়ের বিষ্ঠা দাদ রোগের জন্য মালিশ করলে দাদ রোগ ভাল হবে। কেউ যদি বগলের পশম উঠিয়ে বাদুড়ের রক্তে সমপরিমাণ দুধ মিশিয়ে বগলে মালিশ করে, তাহলে সেখানে আর কোন দিন পশম গজাবে না।

স্বপ্নে বাদুড় দেখার তাবীর

স্বপ্নে বাদুড় দেখলে আবেদ ও জাহেদ লোকের প্রমাণ বহন করে। আরতাইমিয়াওছ বলেন, স্বপ্নে বাদুড় দেখা বাহাদুরী ও ভয় দূর হওয়ার আলামত। কেননা এরা নিশিচর পাখি। গর্ভবর্তী মহিলা স্বপ্নে বাদুড় দেখলে অতি সহজে তার গর্ভ খালাস হবে। স্থলপথে বা সমুদ্রে ভ্রমণকারীর জন্য স্বপ্নে বাদুড় দেখা ভাল নয়। স্বপ্নে ঘরের ভিতর বাদুড় প্রবেশ করতে দেখা সেই ঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আলামত। কেউ কেউ বলেছেন, স্বপ্নে বাদুড় দেখা জাদুকারিণী মহিলা দিকে ইঙ্গিত।

২৮১. الخنان (আল খান্নান) টিকটিকি

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, তিনি একবার একটি বিচার মীমাংসা করলেন; কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, ওহে টিকটিকারা! চুপ করে থাক। হারভী প্রমুখ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

২৮২. الخنوس (আল খানাম্বুবুছ) একধরনের পাখি

এটা চড়ুই পাখি থেকে কিছুটা বড়। তবে এ রঙের আরেকটি পাখিও দেখা যায়।

২৮৩. الخلد (আল খুলদ) ছুঁচো

জাহিয বলেন, এটা একটি অন্ধ-বধির ছোট প্রাণী। সে তার সম্মুখের বস্তুকে শুধু ঘ্রাণের সাহায্যেই চিনে নিতে পারে। ছুঁচো সাধারণত অন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে তার গর্ত থেকে বের হয়ে হা করে শিকারের আশায় বসে থাকে। এর মুখের আশেপাশে মাছি বসলে তা ধরে সে খায়। এরা মাছিকে তখনই আক্রমণ করে, যখন অনেক মাছি তার মুখের কাছে জমা হয়।

কোন কোন মনীষী বলেছেন : ছুঁচো মূলত অন্ধ ইঁদুর। সে বস্তুর গন্ধ শুঁকেই তা চিনতে পারে। ছুঁচোকে অন্ধ বানিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে সে শুধু ভূ-গর্ভেরই বাস করে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য ভূ-গর্ভকে অনিবার্য করেছেন। যেমনি মাছের জন্য পানিকে অনিবার্য করেছেন। আল্লাহ পাক ভূ-গর্ভেই এর খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এজন্য যমীনের উপরে তার কোন শক্তি নাই। আল্লাহ পাক তাকে চোখের বদলে প্রখর শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি দিয়েছেন। সে দূর থেকেও হালকা আওয়াজ শুনতে পারে এবং দ্রুত মাটির গর্তে চলে যায়। এটা ধরার কৌশল হল, গর্তের মুখের অনতি দূরে সামান্য কিছু গম রেখে দিলে তার গন্ধ পেয়ে তা খাওয়ার জন্য এরা বাইরে বেরিয়ে আসে।

বর্ণিত আছে, ছুঁচোর শ্রবণশক্তি অন্যান্য প্রাণীর দৃষ্টিশক্তির সমান অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণী দূর থেকে যতটুকু দেখে, ছুঁচো দূর থেকে ততটুকু ঘ্রাণ পায়। সুঘ্রাণ ছুঁচোর নিকট অপছন্দনীয়। দুর্গন্ধ তার অতি প্রিয়। তাই সে সুঘ্রাণ থেকে দূরে থাকে। আর গন্ধক ও পিঁয়াজকে এরা ভালবাসে। কোন কোন সময় এ দুটি জিনিস দ্বারাই এদের ধরা হয়। কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন, কওমে সাবাকে এরাই ধ্বংস করেছিল।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা পরীক্ষার ঘটনা

সাবা জাতির ডানে-বামে অর্থাৎ সাবা জাতির আবাসভূমির ডান ও বাম দিকে দুটি মনোরম বাগান ছিল। আল্লাহ পাক তাদেরকে বলেছিলেন : كلوا من رزق ربكم واشكروا له—'তোমাদের প্রভুর দেয়া রিযিক খাও এবং তার শোকর আদায় কর'।

কওমে সাবার সেই শহরে আল্লাহ পাকের অফুরন্ত অনুগ্রহ ছিল। সে অঞ্চলে মশা, মাছি, বিচ্ছু, সাপ ইত্যাদি কোন ক্ষতিকারক প্রাণী ছিল না। এটা ছিল নেহাৎ পবিত্র শহর। এ শহরের উপর আল্লাহ তাআলা বিরাট দয়া করেছিলেন। কোন লোক অন্য এলাকা থেকে এ শহরে আগমন করত আর তার কাপড়ে বা

ভন কোথাও লেগে উকুনও আসত, তাহলে অত্র শহরে আসার সাথে সাথে তা- ৎ মরে যেত। কওমে সাবার বাগানসমূহে ফল-ফলাদির প্রাচুর্য ছিল। কেউ খালি ঝুড়ি নিয়ে বাগানে প্রবেশ করলে তার ঝুড়িটি নানা ধরনের ফলে ভরে যেত। কিন্তু এফলগুলো হাতে ছিড়তে হত না; পেকে অমনি গাছের নিচে ঝরে পড়ত। এ কওমে সাবা নাফরমান হয়ে গেলে আল্লাহ পাক তাদের নিকট পর পর ১৩ জন নবী পাঠালেন। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীগণ এ কওমে সাবাকে আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসতে বলেন। আল্লাহ তাআলার দেয়া নিয়ামতের কথা এবং তাঁর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু কওমে সাবা নবীদের কথা তো মানলই না বরং তারা বলতে লাগল– আমরা জানি না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোন নিয়ামত দান করেছেন কি না?

সাবা শহরে একটি শহররক্ষা বাঁধ ছিল। রাণী বিলকিসের যুগে তিনি এ বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাঁধের নিকটেই একটি পুকুর ছিল। পুকুর থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য ওখানে বিদ্যমান খালের সমান পরনালা রাখা হয়েছিল। উক্ত পরনালার সাহায্যে ওই খালে পানি বন্টন হত। আর খালের সংখ্যা ছিল ১২টি। রাণী বিলকিসের সাথে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর বিবাহ হওয়ার পর সাবাবাসী এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত সঠিক পথে ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে বিদ্রোহ ও চরম অবাধ্যতা শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত তারা কাফের হয়ে গেল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট অন্ধ ছুঁচো প্রেরণ করলে এরা বাঁধের তলদেশে মাটি খুঁড়ে বাঁধটি ছিদ্র করে দিল। ফলে তাদের সকল বাগান ও ফসলের জমি পানিতে ডুবে গেল।

সাবাবাসী তাদের জ্ঞান ও অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা আগেই বুঝেছিল, তাদের এ বাঁধটি একটি ইঁদুর ধ্বংস করে দিবে। তাই বাঁধটি নির্মাণকালে তারা প্রতি দুটি পাথরের মাঝখানে এমন কোন ছিদ্রই বাকি বাকি রাখে নি, যেখানে একটি বিড়াল বেঁধে রাখা হয় নাই। কিন্তু সাবা জাতি যখন বিদ্রোহী হয়ে গেল আর আল্লাহ পাকের আযাব এসে গেল, তখন একটি লাল রঙের ইঁদুর প্রকাশ হল এবং সে ওই বিড়ালগুলোর মধ্যে থেকে একটি বিড়ালের উপর লাফ দিয়ে পড়ল। এতে বিড়ালটি ইঁদুরকে ধরার জন্য তার জায়গা থেকে সরে আসল। এ ফাঁকে একটি অন্ধ ইঁদুর সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে বাঁধের ভিতরে ইচ্ছামত ছিদ্র করে দিল। ফলে পানি প্রবাহিত থেকে লাগল। অন্ধ ইঁদুরটি যে ছিদ্র করেছিল, ওই ছিদ্রপথ দিয়ে লাল ইঁদুরটি বের হয়ে গেল। এতে বাঁধ ভেঙ্গে বাগানে পানি ঢুকতে লাগল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবাবাসীর মালামাল, জমি-জমা, বাগান সবকিছুই পানির নিচে ডুবে গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ওয়াহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ওই বাঁধটি নির্মাণ করেছিলেন রানী বিলকিস। আর এটি নির্মাণের কারণ ছিল, সাবাবাসী নিজ নিজ উপত্যকার জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করত। তাই

রাণী সব উপত্যকায় পানিপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য দু'পর্বতের মাঝখানে বড় বড় পাথর শিকল দ্বারা সংযুক্ত করে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন। একে হিমইয়ারি ভাষায় عرم-ও বলা হয়। এ প্রাচীরের তিনটি দরজা ছিল। এগুলো দিয়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য ১২টি পরনালা ও খাল তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং তাদের যখন পানির প্রয়োজন হত, তখন ওই ১২টি খাল ও গেইট খুলে দেয়া হত।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেন : ওই সাবায়ীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে লোকটির বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার জ্ঞান হয়, সে ছিল তাদের নেতা আমর ইবনে আমের আল আযদী। সে রাত্রে স্বপ্নে দেখল যে, বাঁধে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে আর তা ভেঙ্গে তার উপর এসে পড়েছে এবং সমস্ত উপত্যকা পানিতে ভরে গিয়েছে।

স্বপ্ন দেখে সে ভোরবেলা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং দ্রুত বাঁধের দিকে গিয়ে দেখল, একটি বড় ইঁদুর তার লোহার মত ধারালো দাঁত দ্বারা বাঁধটি কেটে ফেলেছে। এ অবস্থা দেখে সে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসল। তার স্ত্রীকে এ সংবাদ দিল এবং ছেলেদেরকে তা দেখে আসার জন্য সেখানে পাঠাল। ছেলেরা ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করল– আমি যা বলেছিলাম, তা কি সত্য? তারা 'হ্যাঁ' বলল। এরপর সে বলল, এটা এমন এক বিপর্যয়, যা ফিরানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। এ বিপদটি আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি এখন সাবা জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছেন।

এপর সে একটি বিড়াল ধরে ইঁদুরের উপর ছেড়ে দিল। কিন্তু ইঁদুর বিড়ালকে তোয়াক্কাই করল না; স্বাভাবিক গতিতে বাঁধ কাটতেই থাকল। এরপর বিড়ালও সেখান থেকে সরে গেল। তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে সে তার ছেলেদের বলল, এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা এখন অন্য কোন উপায় বের কর। তারা বলল, আব্বাজান! আপনি বর্তমান থাকতে আমরা আবার কী উপায় বের করব?

ইবনে আমের বলল : আমি একটি উপায়ের কথা ভাবছি। ছেলেরা বলল, আব্বাজান! আপনি বলুন, আমরা তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হব। ইবনে আমের তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে বলল, আমি যখন সকালবেলা বৈঠকে বসব এবং দলে দলে লোক আসতে থাকবে তখন আমি তোমাদের কাজের আদেশ দিব, কিন্তু তুমি আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে। তখন আমি তোমাকে গালিগালাজ করব, সে সময় তুমি উঠে এসে আমার গালে একটা থাপ্পর মেরে দিবে।

এরপর সে তার বড় ছেলেকে বলল– যখন তুমি তোমার ছোট ভাইকে এ কাজ করতে দেখবে, তখন তুমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না বরং তুমি চুপ করে বসে থাকবে। উপস্থিত জনগণ যখন এ অবস্থা অবলোকন করবে, তখন

তাদেরকে এমন দুঃসাহস দিবে না যে, তোমার ভাইয়ের সাথে তারা কোন মতানৈক্যে জড়াতে পারে। সুতরাং পরদিন যখন শহরের সকলেই বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হল, তখন ইবনে আমেরের ছোট ছেলে পিতার উপদেশ মত তা-ই করল। বৈঠকের সকল জনতা চুপ করে বসে রইল। এরপর ইবনে আমের আসন থেকে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে বলল, আমার ছেলেই আমাকে থাপ্পর আজ মারল আর তা দেখেও তোমরা চুপচাপ বসে রইলে! এটা আমি কীভাবে সহ্য করব? কাজেই আমি শপথ করলাম, তোমাদের নিকট আমি আর থাকব না। আমি অন্য কোথাও চলে যাব। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ওজর-আপত্তি করে বলতে লাগল– আমাদের জানা ছিল না যে, আপনার ছেলেই আপনার সাথে এমন অমানবিক আচরণ করবে! সে আপনার সাথে এরূপ নাফরমানী করবে। ভবিষ্যতে আমরা কাউকেই এরূপ কাজ করতে দিব না। আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

ইবনে আমের বলল– যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে আমাকে এখন চলেই যেতে হবে। কারণ, আমি দৃঢ় শপথ করে ফেলেছি। এরপর ইবনে আমের তার মালামাল বিক্রি করতে শুরু করল। শহরের যারা তার ধনৈশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত ছিল, তারা মালামালগুলো দ্রুত খরিদ করে নিল। ইবনে আমের অবশিষ্ট মালামাল ও তার ছেলেদেরকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। ইবনে আমের চলে যাওয়ার দু-তিনদিন পর রাত্রে যখন শহরবাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন হঠাৎ করে বাঁধ ভেঙ্গে পানি এসে সাবাবাসীর ঘরবাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছু ভাসিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যেই শহরটি বিরান হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেন (:فارسلنا عليهم سيل العرم—) 'এরপর আমি বাঁধ ভেঙ্গে তাদের উপর বন্যা পাঠায়ে দিলাম'। এ আয়াতে কারীমায় উপরিউক্ত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইরাম নদীর বাঁধ

عرم শব্দের 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কাতাদাহ বলেন : 'ইরাম' সেই প্রাচীরের নাম। সুহাইলীর মতে 'ইরাম' ওই উপত্যকার নাম, যেখানে এ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া আরেক মতে 'ইরাম' সেই প্রাণীর নাম, যে প্রাচীরটি ভেঙেছিল। আবার কারও মতে 'ইরাম' দ্বারা 'বন্যা' উদ্দেশ্য।

مارب : (হামজা সাকীন) 'মারিব' শব্দটি নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 'মারিব' সাবায়ীদের রাজপ্রাসাদের নাম। ইবনে মাসউদ বলেন, 'মারিব' একটি উপাধি। সাবা রাজ্যের সকল বাদশাহদের উপাধিই ছিল 'মারিব'। যেমনি ইয়ামানের সকল শাসকের নাম ছিল 'তোব্বা'। সুহাইলী বলেন, এ প্রাচীর

নির্মাণ করেছিলেন সাবা ইবনে ইয়াশজুব। তিনি সত্তরটি উপত্যাকার সমস্ত পানি এ প্রাচীরের দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। কিন্তু সাবা ইবনে ইয়াশজুব প্রাচীরটির নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। তারপর এ প্রাচীর হিমিয়ারের বাদশাগণ শেষ করেন। তাদের সকলেরই নাম ছিল আরদে শামস হবনে ইয়াশজুব ইবনে আরব ইবনে কাহতান। তিনিই সর্বপ্রথম চাবুক মারার প্রচলন করেছিলেন। এ কারণেই তার নাম হয় 'সাবা'। কেননা আরবীতে سبته মাথায় বেত্রাঘাতকারীকে বলা হয়। আরও বলা হয়, তিনিই ইয়ামানের প্রথম বাদশা ছিলেন, সর্বপ্রথম যিনি রাজমুকুট মাথায় পরিধান করেন।

মাসউদী বলেন, এ প্রাচীরের নির্মাতা ছিলেন লোকমান ইবনে আদ। তিনি প্রতি এক মাইল অন্তর (পানি নিষ্কাশনের জন্য) একটি করে সুইজ গেইট ও ছোট খাল বানিয়েছিলেন। এভাবে সর্বমোট তেইশটি সুইজ গেইট তেইশ মাইল অন্তর অন্তর বানিয়েছিলেন। এগুলো দ্বারা সমস্ত উপত্যাকার পানি পৃথক পৃথকভাবে প্রবাহিত হত। সুতরাং আল্লাহপাক প্রাচীরের উপর বন্যা প্রবাহিত করলে সেগুলো পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ এক উপত্যকা থেকে অপর উপত্যকা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকে এরা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়, تفوقوى ايدى سبا—'সাবাবাসী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল'। শা'বী বলেন– বন্যায় যখন সাবার সমস্ত শহর পানিতে ভেসে গেল, তখন শিশু-আবাল-বৃদ্ধ সকলেই এদিক-ওদিক চলে গেল। সুতরাং 'গান' গোত্র চলে গেল সিরিয়াতে, খুর্জায়া গোত্র তেহামায়, আযদ গোত্র আম্মানে এবং খুজইমাহ গোত্র রয়ে গেল ইরাকে। বাকি আউস ও খাজরাজ গোত্র মদীনায় বসবাস করতে লাগল।

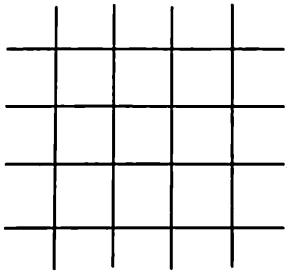
এ গোত্রের সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ইয়াসরিব (মদীনায়) পর্দাপণ করে, সে ছিল ওমর বিন আমের। আর এটাই আউস ও খাজরাজ গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দল। আবু ছাবুরাহ নাখঈ ফরওয়াহ ইবনে মুসাইক কুতাইফী থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে 'সাবা' সম্পর্কে বলুন সে পুরুষ ছিল না নারী, নাকি এটা কোন ভূখণ্ডের নাম? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : সাবা আরবের একজন ব্যক্তির নাম ছিল। তার দশজন পুত্র সন্তান ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ছিল ভাগ্যবান আর চার জন দুর্ভাগা। ভাগ্যবানদের মধ্যে কিন্দাহ, আশয়ারিযুন, আযদ, মাজহাজ, আনমার ও হেমিয়ার। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল, আনমার কে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে খিছআম ও বাজিলা রয়েছে। আর দুর্ভাগারা হল– লেখাম, জুযাম, আমেলা ও গাছছান।

পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র

خلد একটি রোগেরও নাম আর তা সাধারণত পায়ে হয়ে থাকে। বিশেষ করে ঘোড়া ইত্যাদির পায়ে। এ রোগের জন্য নিম্নের তাবীজটি পশুর বাম কানে বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

يا خلد سليمان بن داؤد ذكر عزرائيل على وسطك وذكر جبرائيل على رأسك وذكر اسرافيل على ظهرك وذكر ميكائيل على بطنك لا تدب ولا تسقى الا ايبس كما واسرافيل الدجاج وقرن الحمار بقدرة العزيز القهار هذا قول عزرائيل وجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملائكة الله المقربين الذين لا ياكلون ولا يشربون الا بذكر الله هم يعيشون اصياد تا ال شداى ايبس ايها الخلد من دابة فلان بن فلانة او من هذه الدابة بقدرة من يرى ولا يرى ويسئلونك عن الجبال فقد ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا كذلك يموت الخلد من دابة فلان بن فلانة او من هذه الدابة

উল্লেখ্য, 'অমুকের ছেলে অমুক'-এর জায়গায় মালিক ও তার মাতার নাম লিখবে। আর নাম জানা না থাকলে هذه الدابة লিখবে। তারপর নিচের নকশাটি লিখবে। নকশা—



١١١٨١١١ ل ط ط ٢١١٧١ د ه ١٢١ ب ر ك

আরেকটি আমল

নিম্নলিখিত তাবিজ এক টুকরা কাগজে লিখে উক্ত রোগে আক্রান্ত প্রাণীর গলায় বেঁধে দিলে তার রোগ ভাল হয়ে যাবে। তাবিজ—

طلعوا ستة وستين ملكا الى جبال المقدس لقوا ثلاث شجراتا لوسدة قطعت والثانية يبست والثالثة احترقت انطع ايها الخلد ببركة سيهوم دهوم بالف لا حول

ولا قوة الا بالله العلى العظيم ج وج وج دار تفع ارتفع ارتفع اه اه اه ل ط اس ل ط اس ل ط اس ل ط اس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم تو كلت ل ادهى ل ل ا اعلى الله اللهم احفظ حامله ودابته بحرمة الرب العظيم والقران العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ছুঁচোর শরঈ বিধান

ছুঁচো খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এটি ইঁদুরেরই একটি জাত। কিন্তু মালেক (রহ.) বলেন, ছুঁচো ও সাপ জবাই করে ভালভাবে পরিষ্কার করে খেলে কোন দোষ নাই।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন : اسمع من خلد وافسد من خلد—'অমুক ছুঁচোর চেয়েও অধিক শ্রবণ করে এবং অধিক ঝগড়াটে'।

চিকিৎসায় ছুঁচোর উপকারিতা

ছুঁচোর রক্ত সুরমা হিসেবে চোখে ব্যবহার করলে উপকার হয়। ছুঁচোর লেজের রক্ত ঘ্যাগ রোগে প্রলেপ দিলে ঘ্যাগ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর উপরের ঠোঁট মৌসুমী জ্বরে গলায় বেঁধে দিলে জ্বর দ্রুত আরোগ্য হবে। ছুঁচোর গোশত সূর্যোদয়ের সময় রান্না করে ভক্ষণ করলে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে সে অবগত থেকে পারবে। এর গোশত গোলাপের তৈলে মিশিয়ে কোন বোতলে ভরে রেখে দিয়ে সেই তৈল দাদ, খাজলীসহ সব ধরনের চর্মরোগে ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

জাহিয বলেন : মানুষের ধারণামতে ছুঁচোর নিজ গর্ত থেকে নির্গত মাটি পানির সাথে মিশিয়ে নগরাছে (আঙুলের রোগে) ব্যবহার করলে দ্রুত রোগ সেরে যাবে।

হাকীম আরস্তু লিখেন, ছুঁচোকে যদি তিন রিতল (দেড় কেজি) পানিতে ডুবিয়ে ওই পানি কোন মানুষ পান করে, তবে তার কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে ৩৮ দিন পর্যন্ত পাগলের মত শুধু তা-ই বলবে।

ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া বলেন : তিন রিতল পানিতে কোন ছুঁচো ডুবিয়ে ছেড়ে দিবে। যাতে সে ওই পানিতে ফুলে ফেটে যায়। এরপর পানি থেকে তার হাড়-মাংস সব তুলে ফেলে দিবে আর পানিটুকু তামার কোন পাত্রে জ্বাল করবে। তাতে চার দিরহাম ও সমপরিমাণ আফিম, গন্ধক এবং নিশাদল গুঁড়া করে মিশাবে। এরপর তাতে চার রিতল মধু মিশিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বাল দিবে।

যাতে তা চাটনির মত হয়ে যায়। এরপর সে চাটনি শিশির মধ্যে ভরে রাখবে। আর সূর্য যখন মেষরাশির মধ্যে থাকবে, তখন তা মেষরাশি থেকে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করা পর্যন্ত কেউ যদি এ মলম চেটে খায় এবং সে-সময় সাথে অন্য কিছু না খায়, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে অনেক জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করবেন।

স্বপ্নে ছুঁচোর ব্যাখ্যা

ছুঁচো স্বপ্নে দেখা অন্ধত্ব, হয়রানী, পেরেশানী, গোপনীয়তা ও সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির আলামত। আবার কোন কোন সময় কানের রোগী স্বপ্নে ছুঁচো দেখা কানে বেশি শোনার আলামত।

২৮৪. الخلفة (আল খিলফাতু) গর্ভবর্তী উটনী

এর বহুবচন خلفات।

হাদীস শরীফে গর্ভবর্তী উটনীর আলোচনা

ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে কারও কি এ কথা ভাল লাগবে যে, সে তার ঘরে ফিরে গিয়ে তিনটি গর্ভবর্তী হৃষ্টপুষ্ট বড় বড় উটনী বাঁধা পাবে? সাহাবাগণ বলেন– হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একথা শুনে তিনি বলেন: তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে পবিত্র কুরআনের যে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করল, তা তার জন্য এরূপ তিনটি উটনীর চেয়েও উত্তম।

ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : নবীদের একজন জিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে তার জাতিকে বলেন– আমার সাথে তিন শ্রেণীর লোক জিহাদে গমন করতে পারবে না।

(১) যে লোক বিবাহ বা ক্রয়ের মাধ্যমে কোন মহিলার লজ্জাস্থানের মালিক হয়েছে ও তার সাথে সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করছে; কিন্তু এখনও তা হয় নাই।

(২) যে লোক বাড়ি তৈরি করেছে, কিন্তু এখনও তার ছাদ করে নাই।

(৩) যে লোক গর্ভবর্তী বকরী বা উটনী ক্রয় করেছে এবং এগুলোর প্রসবের অপেক্ষায় রয়েছে।

(ওই নবী (আঃ) তাদেরকে এজন্য জিহাদ যেতে বারণ করলেন। কারণ, তারা জিহাদে গেলেও তাদের অন্তর সেদিকেই আকৃষ্ট থাকবে। আর এ অমনোযোগিতার কারণে জিহাদে অংশ নিতে পাবে না।)

তারপর তিনি জিহাদের জন্য রওয়ানা হলেন। এরপর তিনি জিহাদের জন্য নির্ধারিত শহরে যখন পৌঁছলেন, তখন আছরের নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও আল্লাহর আদিষ্ট। এরপর তিনি

প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! সূর্যকে আমার মর্জিমত অস্ত যাওয়া থেকে বিরত রাখুন। সুতরাং তিনি যতক্ষণ না ওই শহরটি বিজয় করলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে বিরত রইল।

এ জিহাদকারী এবং সূর্য অস্ত না যাওয়ার দুআকারী মহান নবী ছিলেন হযরত ইউশা বিন্ নূন (আঃ)।

জ্ঞাতব্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য সূর্য দুবার অস্ত যাওয়া থেকে বিরত ছিল। (ত্বহাবী শরীফে বর্ণিত আছে,) প্রথম বার মি'রাজ রজনীর সকালে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ থেকে ফিরে এলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে একটি কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করার সংবাদ দিয়েছিলেন আর ওই কাফেলা তখনও মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে নাই। সে-সময় আল্লাহ পাক সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। মুস্তদরাকের শেষ ভাগে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম যাহবী (রহ.) হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ বলেছেন। তাতে উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি ৭টি গর্ভবতী মোটাতাজা উট দোযখে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে দোযখের তলদেশে এগুলো পৌঁছতে ৭০ বছর সময় লাগবে।

হযরত ইবনে উমরের হাদীস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যদি লাঠি বা বেত্রাঘাতের দ্বারা ভুলবশত কাউকে হত্যা করা হয়, তাহলে এর জরিমানা ধার্য হবে একশত উট। এদের চল্লিশটি থেকে হবে গর্ভবতী উটনী। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত হাদীসে একটি বিশেষ কথা হল 'যখন خلفه অর্থ, গর্ভবর্তী উটনী অর্থাৎ যার পেটে বাচ্চা আছে, তখন পরে কেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'এদের পেটে বাচ্চা আছে' বললেন? এর কী রহস্য?

ইমাম নববী (রহ.)-এর চারটি রহস্য বর্ণনা করেছেন। যথা–

(১) এটা শুধু গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন।

(২) فى بطونها اولادها প্রকৃতপক্ষে خلفه (গর্ভবতী উটনী)-এরই ব্যাখ্যা।

(৩) এ ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্য একটি সন্দেহ দূর করা অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে যে, জরিমানা হিসেবে এমন خلفه অর্থাৎ যেটি পূর্বে কখনও গর্ভবর্তী হয়েছিল, এমন উটনী দেয়াই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য হল, জরিমানায় প্রদত্ত উটনীটি

তখন অবশ্যই গর্ভবতী থেকে হবে। এ কথা বুঝাতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فى بطونها اولادها বাক্যটি বাড়িয়েছেন।

(৪) চতুর্থ রহস্য হল, উটনী বাস্তবে গর্ভবতী হওয়া জরুরী। তার গর্ভ প্রকাশ হওয়া নয় অর্থাৎ তার গর্ভবতী হওয়াতে যেন কোনরূপ সন্দেহ না থাকে এবং তার পেটে বাচ্চা থাকে। তাছাড়া فى بطونها اولادها-এর একটি জবাব ইমাম রাফেয়ী (রহ.) দিয়েছেন : خلف উটনীকে বলা হয় যে উটনী বাচ্চা প্রসব করেছে আর বাচ্চাটি মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরে।

জ্ঞাতব্য

'সরাসরি ভুল'-এর উদ্দেশ্য হল, মারার ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু; কিন্তু সে-জায়গায় মারা গেল কোন মানুষ। এতে কেছাছ (হত্যার বদলে হত্যা) ওয়াজিব হবে না বরং হালকা জরিমানা দিতে হবে অর্থাৎ নামমাত্র জরিমানা আদায় করা হত্যাকারীর পক্ষে তার আত্মীয়-স্বজনের উপর ওয়াজিব হবে। তা তিন বছরে ক্রমান্বয়ে আদায় করা হবে। বাকি কাফ্ফারাটা তার সকল প্রকার মালেই ওয়াজিব হবে।

ইচ্ছাকৃত সন্দেহ

সাধারণত মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা হত্যা করে না, এমন জিনিস দ্বারা কেউ অন্যকে মারার ইচ্ছা করল। যেমন, কেউ লাঠি দিয়ে একজনকে মৃদু আঘাত করল অথবা ছোট্ট পাথর দ্বারা মাত্র এক-দু'বার ঢিল ছুড়ল। আর এতেই মানুষটি মরে গেল। এতে কিছাছ ওয়াজিব হবে না বরং হত্যাকারীর আত্মীয়দের উপর তিন বছরের আদায়যোগ্য ভারি দিয়ত ওয়াজিব হবে।

নিরেট প্রতিজ্ঞা

এমন বস্তু দ্বারা হত্যা করার ইচ্ছা করল, যা দ্বারা সাধারণত মানুষ মরে যায়। যেমন– তরবারী, ছুরি ইত্যাদি। এতে সমতা পাওয়ার সময় কিছাছ ওয়াজিব হবে। বড় ধরনের জরিমানা হত্যাকারীর সম্পদ থেকে দিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে ইচ্ছাকৃত হত্যায় কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যা করা কবিরা গুনাহ। আর কবিরা গুনাহে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। তাই এতেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

স্বাধীন মুসলমানের রক্তপণ ১১০টি উট। রক্তপণটি নিরেট ইচ্ছাকৃত বা সন্দেহের রক্তপণ হলে যুগ যুগ ধরে শক্ত জরিমান বলা হবে। সুতরাং ত্রিশ হিক্কাহ (চার বছরের উট), ত্রিশটি যুজয়াহ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উট) এবং চল্লিশটি গর্ভবতী তথা পেটে বাচ্চা আছে এমন উটনী দিতে হবে রক্তপণ হিসেবে। এ মতের প্রবক্তা হযরত ওমর এবং যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)। আর

ইবনে ওমরের পূর্বোক্ত হাদীসটির কারণে ইমাম শাফেয়ীও সেদিকেই সমর্থন করেছেন। অবশ্য অপর এক দলের মতে বড় ধরনের জরিমানা চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা (১) ২৫টি বিনতে মাখায, ২) ২৫টি বিনতে লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট), ৩) ২৫টি হিক্কাহ এবং (৪) ২৫টি যুজযাহ। এ মতের সমর্থক যুহ্‌রী ও ইবনে রবীয়াহ (রহ.)। ইমাম মালেক, আহমাদ এবং আবু হানিফা (রহ.)-ও এ মতের সমর্থক।

বাকি ভুলবশত হত্যার জরিমানা হালকা হয়ে থাকে। এটা সর্বসম্মত মতে ২০টি বিনতে মাখাজ, ২০টি বিনতে লাবুন, ২০টি ইবনে লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উট) এবং ২০টি হিক্কাহ। এ মতের প্রবক্তা ওমর বিন আব্দুল আযীয, সুলাইমান ইবনে ইয়াছাব ও রবিয়া।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইবনে লাবুনের স্থলে ইবনে মাখাজ বলেছেন। আর তা ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ভুলবশত হত্যা ও সন্দেহমূলক হত্যার জরিমানা আরোপিত হয় নিকটাত্মীয়দের ওপর। উট না থাকলে এর মূল্য পরিমাণ টাকা দিয়ে জরিমানা আদায় করতে হবে। কোন কোন মতে তা ১০০ দিনার বা ১২০০ দিরহাম দেয়া ওয়াজিব। কেননা হযরত ওমর (রাঃ) স্বর্ণের মালিকদের জন্য ১০০০ দিনার আর রৌপ্যের মালিকদের জন্য ১২,০০০ দিরহাম জরিমানা ধার্য করেছিলেন।

ইমাম মালেক (রহ.), উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ.) এ কথাই বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, জরিমানা হবে ১২০টি উট বা ১০০০ দিনার অথবা ১০,০০০ দিরহাম সমপরিমাণ। সুফিয়ান ছাওরী থেকেও এ মত পাওয়া যায়।

মাসয়ালা

মহিলার জরিমানা পুরুষের অর্ধেক। জিম্মি ও চুক্তিবদ্ধ লোকের জরিমানা মুসলমানের জরিমানার এক-তৃতীয়াংশ। আর জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ কিতাবী বা অগ্নিপূজারী ব্যক্তি হলে ক্ষতিপূরণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ধার্য হবে। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের জরিমানা ৪০০০ দিরহাম আর অগ্নিপূজারী ব্যক্তির জরিমানা হবে ৮০০০ দিরহাম। এ মতকে সমর্থন করেছেন হযরত হাসান বসরী (রহ.) এবং ইবনে মুছাইয়াব (রহ.)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-ও এ মতটি সমর্থন করেছেন। আহলে ইলমের একদলের মতে জিম্মি ও চুক্তিবদ্ধ লোকের জরিমানা মুসলমানের জরিমানার অনুরূপ হবে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)-ও এ মতের সমর্থক। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর মতে জিম্মির জরিমানা মুসলমানের জরিমানার অর্ধেক। ইমাম মালেক, আহমাদ (রহ.)-ও এ মতটি সমর্থন করেছেন।

পরিশিষ্ট

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন :

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها

"যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি দোযখ; সেখানেই সে চিরকাল আবস্থান করবে।"

মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখিত আয়াতে বলেন, কাফেরদের মত মুমিনদের চিরস্থায়ী দোযখ হবে, এটা কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ কোন মুমিন অপর কোন মুমিন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হত্যা করলে উল্লেখিত আয়াতের মর্মানুযায়ী মুমিনও কি কাফের-মুশরিকদের মত চিরস্থায়ী দোযখী হবে?

এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতখানা মুকীছ ইবনে সাবাবাহর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্ত প্রবাহ বৈধ করে দিয়েছিলেন। ঘটনা হল তার ভাই হিশাম বিন সাবাবাহকে বনী নাজ্জারের লোকেরা হত্যা করল; কিন্তু তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তার ভাইয়ের জরিমানা স্বরূপ বনী নাজ্জার ১০০ উট প্রদান করল। জরিমানা আদায়ের পর মকীছ বিন সাবাবাহ এবং বনী নাজ্জারের ফেহরী নামক এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে মদীনায় যাত্রা করল। পথিমধ্যে শয়তান মুকীছের নিকট এসে তার অন্তরে প্ররোচনা দিল যে, তোমার ভাইকে হত্যার বদলে জরিমানা গ্রহণ করে নিজেকে লজ্জিত ও কলঙ্কিত কর না। এ লজ্জা থেকে বাঁচতে হলে তোমার সঙ্গী লোকটিকে হত্যা কর। তাহলে তোমার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধও নেয়া হবে আর তার উটটিও তোমার হাতে চলে আসবে।

সুতরাং সুযোগ মত মুকীছ বড় একটি পাথর নিয়ে তার সঙ্গীর মাথা লক্ষ্য করে স্বজোরে আঘাত করল এবং তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

তারপর মুকীছ জরিমানার উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে মক্কা শরীফ চলে গেল। এরপর আল্লাহ পাক উপরিউক্ত আয়াত নাযিল করেন। এ মুকীছ ছাড়া অন্যান্য সকল লোককে মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। কাবা ঘরের চাদরে ধরা অবস্থায় মুকীছকে হত্যা করা হয়। উক্ত আয়াতের বিধান সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বগ্‌বী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

যখন সূরা ফুরকানের والذين يدعون مع الله الها اخر আয়াতখানা নাযিল হয়, তখন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বলেছিলেন : এ আয়াতের নম্রতায় আমরা

খুব আশ্চর্য বোধ করছি। সুতরাং এরপর সাত মাস অতিবাহিত থেকে না থেকেই কঠোর বিধানের আয়াত নাযিল হয়। কঠোর বিধানের সে আয়াতখানা সূরাতুন্ নিসার আর নরম বিধানের আয়াতখান সূরাতুল ফুরকানের। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সূরা ফুরকানের আয়াত মক্কায় আর সূরা নিসার আয়াত মদীনায় নাযিল হয়। আর তা কোন আয়াতই রহিত করেন নি।

জমহূর মুফাস্সির এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ বলেন : ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানকে হত্যাকারীর তাওবাও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন—

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء

"শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"

এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, এ হত্যার দ্বারা কঠোর ধমকি ও শাসন উদ্দেশ্য। যেমন, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ থেকে বর্ণিত আছে, 'মুমিন হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে বলা হবে, তোমার তাওবা কবুল হবে না। আর যদি সে হত্যা করেই ফেলে, তখন আবার বলা হবে, তোমার তাওবা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল থেকে পারে।

উদ্দেশ্য হল, কোন মুমিন ব্যক্তি অপর কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে এ হত্যা করা থেকে নিবৃত করতে বলা হবে– এ হত্যা তথা গুনাহের কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার তাওবাও কবুল হবে না। আর এ কথা তাকে শুধু পাপ থেকে বিরত রাখতেই বলা হবে। প্রকৃতপক্ষে তার তাওবা কবুল না হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এ ধমকী সত্ত্বেও কেউ যদি হত্যা করেই ফেলে তাহলে এ পাপ কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধু তাওবাই দরকার হবে। আর এমতাবস্থায় তাকে তাওবার উপদেশ দিবে– আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমার তাওবা কবুল থেকে পারে, নতুবা নয়। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে আল্লাহর দরবারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যাকারীর তাওবাও কবুল হবে। সে চিরস্থায়ী দোজখী হবে না।

পক্ষান্তরে যারা কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে ঘাতক চিরস্থায়ী দোজখী হবে বলেন, তার নিকট উল্লেখিত আয়াতে কোন প্রমাণ নাই। কেননা আয়াতখানা এক কাফের মুকীছ ইবনে সাবাবাহর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। আবার বলা হয়েছে, যে ইচ্ছাকৃত হত্যাকে বৈধ মনে করে সে কাফের ও স্থায়ী দোযখী। বর্ণিত আছে, আমর বিন উবাইদ আবু আমর ইবনে আ'লা-এর কাছে বলল– আল্লাহ পাক কি তার ওয়াদা ভঙ্গ করবেন? আবু আমর জবাব দিলেন, না! আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না। এতে আমর বিন উবাইদ বলল, আল্লাহ পাক কি বলেন নি–

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها

এ বিষয়ে আবু ওমর বলেন, হে আমর বিন উবাইদ! তুমি কি অনারবী লোক? তোমার কি জানা নাই যে, আরবগণ ধমকিতে খেলাফকে খেলাফ ও নিন্দনীয় মনে করে না; কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গকে খারাপ মনে করে। এরপর এ কবিতা পড়েন–

وانى واعدة او وعدته ما خلقت ايعادى ومنجز موعدى

'আমি তার সঙ্গে ওয়াদা দিয়েছি এবং তার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছি। সে আমার ওয়াদা পূর্ণ করাল; কিন্তু নিজের ওয়াদা পূর্ণ করল না।'

আর শিরক ব্যতীত অন্য কোন পাপ দোযখকে চিরস্থায়ী না করার প্রমাণ বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাঃ) যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার রাতে অন্যতম এক নেতা ছিলেন এর হাদীস। তাতে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর চার পার্শ্বে সাহাবায়ে কেরাম সমবেত ছিলেন বললেন : তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ে বাইআত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করব না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, কাউকে অপবাদ দিবে না এবং ভাল কাজে কখনও কারও বিরোধিতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এগুলো পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর যে লোক এসব বিষয়ের কোন একটি লঙ্ঘন করবে, এ দুনিয়ায়ই সে শাস্তিতে পতিত হবে। এটাই তার কাফফারা। আর দুনিয়াতে কোন পাপ না করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তিও দিতে পারেন নতুবা ক্ষমাও করতে পারেন। উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাঃ) বলেন, আমরা এ কথার উপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাইআত গ্রহণ করলাম।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

২৮৫. الخمل (আল খামলু) একপ্রকার মৎস্য

২৮৬. الخنتعة (আল খানতাআতু) শিয়ালিনী

আল-খানতাআতু অর্থ, শিয়ালিনী। এটা আজহারীর উক্তি।

২৮৭. الخندع (আল খানদাউ) ছোট টিড্ডি

কোন কোন অভিধানে একে 'বাদুড়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৮৮. الخنزير البرسى (আল খিনযিরুল বারছী)
স্থলজ শূকর, খিনজীর

এর বহুবচন خنازير। অধিকাংশ অভিধানবিদের মতে শব্দটি চৌকর্ষিক। ইবনে সাইয়িদা কোন কোন অভিধানবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, শব্দটি خزير العين (চকিত চোখে দেখা) থেকে উদ্ভূত। কেননা খিনযির এভাবেই দেখে থাকে। তাই বুঝা যায়, এটা শূকরই হবে। বর্ণিত আছে, تخازرا الرجل অর্থাৎ মানুষ তীক্ষ্ণভাবে দেখার জন্য পলক সঙ্কুচিত করে।

হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ছিফফীনের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন :

اذا تخازرت وما بى من خزر ثم كسرت الطرف من غير خور

যুদ্ধ শুরু হলে আমি রিশমী কাপড় পরিহিত ছিলাম না। এতদসত্ত্বেও আমি শত্রুর লৌহ টুপি অনায়েসেই ভেঙ্গে ফেলেছি।

القيتنى الوى بعيد المستمر كالحية الصماء فى اصل الشجر

তুমি আমাকে ভালবাসায় এমনই ব্যাকুল করে তুলেছ, যেমনি সাপ গাছের মূলে পেঁচিয়ে থাকে।

احمل ما حملت من خير وشر

আর এখন আমি সেই ভালবাসার ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষ করছি।

খিনযিরের কয়েকটি উপাধি হল আবু জাহাম, আবু দালফ, আবু তাম আবু বারমাহ ও আবু আলাইহি।

খিনযিরের স্বভাব

খিনযির একটি হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তু। এটা চতুষ্পদ জন্তু বলে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর মত এর পায়ে খুর আছে। এটা ঘাসও খায়। অন্যদিকে খিনজিরের হিংস্রতার পরিচয় হল, এর মুখ গহ্বরে বড় বড় দুটি দাঁত আছে। এ দাঁতগুলোর সাহায্যে সে চিড়ে ফেড়ে খায়। তাছাড়া খিনযির অত্যন্ত বৌনপিপাসু হয়ে থাকে। অধিকাংশ দেখা যায়, মাঠে চরার সময় সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম লিপ্ত হয়। কোন কোন সময় দেখা যায়, এর স্ত্রী চরতে চরতে বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে যায়। আর এ সময় সে তার পুরুষটির সাথে সঙ্গম করতে করতে যেতে থাকে। দূর থেকে এর স্ত্রী ও পুরুষের ছয়টি পা দেখে একটিই মনে হয়। এর পুরুষটি তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশতে দেয় না। এমনকি কোন কোন সময় এক পুরুষ খিনযির অন্য পুরুষ খিনযিরকে হত্যা করে ফেলে। কারণ, সে তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। আবার কোন কোন সময় এক বাথানের

সকল খিনযির মিলে এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একটি অপরটিকে হত্যা করে ফেলে। খিনযির যখন কামোত্তেজনায় পড়ে, তখন সে নিজ মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় ও লেজ খুব নাড়াতে থাকে। সঙ্গে তার আওয়াজও পরিবর্তন হয়ে যায়। পুরুষ খিনযির আট মাস আর স্ত্রী খিনযির ছয় মাসেই বাচ্চা প্রজনন ও জন্ম দেয়ার ক্ষমতার অধিকারী হয়। কোন কোন পুরুষ মাত্র চার মাসেই বাচ্চা জন্ম দেয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রীটি ছয় সাত মাসের না হলে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না। আবার স্ত্রীর বয়স ১৫ বছর হয়ে গেলে তার বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। প্রাণীদের মধ্যে এদের বংশ বেশি বিস্তার লাভ করে। পুরুষ খিনযিজের মধ্যে বেশি পরিমাণ যৌনশক্তি এবং বিলম্বে বীর্যপাত ঘটার ক্ষমতা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, দাঁত ও লেজবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে এত শক্তিশালী প্রাণী আর নাই, যা খিনযিরের দাঁতে রয়েছে। সে তার সম্মুখের দাঁতের সাহায্যে তরবারিধারী ও বল্লমধারীকে পর্যন্ত পরাস্ত করে দিতে পারে। এর দাঁত শরীরের যেখানেই ফুটাবে সেখানের গোশত, হাড্ডি রগ সবই কেটে যাবে।

কোন কোন সময় দেখা যায়, এর সম্মুখের দুটি দাঁত বের হয়ে একটি অপরটির সাথে মিশে যায়, যার কারণে এর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে মরে যায়। খিনযির যদি কোন কুকুরকে কামড় দেয়, তাহলে কুকুরের শরীরের পশম ঝড়ে পড়ে যায়। আর যদি বন্য খিনযির বন্দি করে লোকালয়ে নিয়ে পোষা হয়, তাহলে সে পোষ মানে না। সে অসভ্য হয়েই থেকে যায়। সাপকে দেখা মাত্র সে খেয়ে ফেলে। সাপের বিষ খিনযিরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। খিনযির শিয়ালের চেয়েও বেশি ধূর্ত। খিনিযিরকে কয়েক দিন উপোস রেখে খাদ্য দেয়া হলে সে দু'দিনেই মোটা হয়ে যায়। তাই রোমের খ্রিষ্টানরা যখন এটা খেতে ইচ্ছা করে, তখন বেশ কয়েক দিন উপোস রেখে তারপর খেতে দেয়। এর দু দিন পর তার একে বধ করে খায়।

খিনযির যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে কাঁকড়া ধরে খায়। এতে তার রোগ দূর হয়ে যায়। আশ্চার্যের ব্যাপার হল, খিনযিরকে যদি গাধার সাথে শক্ত করে বাঁধা হয় আর তখন গাধাটি প্রস্রাব করে দেয়, তাহলে খিনযির মরে যায়। তাই খিনযির পালনকারী গাধা থেকে একে যথেষ্ট দূরে রাখে। যদি কোন কারণে খিনযিরের এক চোখ বেরিয়ে যায় বা উপড়ে ফেলা হয়, তবে সে বেঁচে থাকে না। মানুষ আর খিনযিরের মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য আছে। মানুষের চামড়ার মত এর চামড়াও গোশত থেকে পৃথক হয় না।

হাদীস শরীফে খিনযিরের আলোচনা

বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নব করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! শীঘ্রই ন্যায়পরায়ণ শাসক ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হয়ে

ক্রুশদণ্ডকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিবেন, খিনযির হত্যা করবেন এবং একে অকেজো করে দিবেন। তার যুগে ধন-সম্পদ এতই বৃদ্ধি পাবে যে, কেউই তা গ্রহণ করবে না।

অন্য বর্ণনানুসারে তাঁর যুগে অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন শুধু ইসলাম ধর্মই থাকবে। দাজ্জাল ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াতে জীবিত থাকবেন। তারপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে তুলে নিবেন। মুসলমানগণ তার নামাযে জানাযা পড়বেন। উপরে বর্ণিত হাদীসটি আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম খাত্তামী (রহ.) 'খিনযির মেরে ফেলবেন' বাক্যের উপর ভিত্তি করে বলেন : খিনযির হত্যা করা ওয়াজিব। আর খিনযির হচ্ছে প্রকৃত নাপাক। হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যুগে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবেন। সে-সময় দীনে মুহাম্মাদী ছাড়া আর কোন ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি কর প্রথা বাতিল করে দিবেন। অর্থাৎ তিনি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের কর মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবেন।

'মোয়াত্তা' নামক কিতাবের শেষাংশে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার পথিমধ্যে একটি খিনযির দেখতে পেলেন। তিনি একে বললেন, ভালভাবে চলে যাও। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, খিনযিরকেও এরূপ সম্বোধন করা যায়? হযরত ঈসা (আঃ) বললেন : আমার আশঙ্কা হয়, না জানি আমার জিহ্বা কোন খারাপ ও অশ্লীল কথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

জ্ঞাতব্য

মুফাসসিরীনে কেরাম ও সাহাবাগণ বর্ণনা করেন : হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক ইয়াহুদী গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইয়াহুদীরা তাঁকে দেখে বলল, দেখ্! দেখ্! জাদুকারিণীর পুত্র জাদুকর যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা তাঁর ও তাঁর মায়ের উপর অভিযোগ আরোপ করল। এ কথা শুনে হযরত ঈসা (আঃ) তাদের প্রতি বদ'দুআ করলেন। সুতরাং এ বদ'দুআর কারণে ইয়াহুদীরা খিনযিরে পরিণত হল। তাদের সরদার 'বাহুজা' এ ঘটনা শুনে ঘাবড়ে গেল। সরদারের সন্দেহ হল, হযরত ঈসা (আঃ) হয়তো তার জন্য বদ'দুআ করেছেন। সুতরাং সরদার তাড়াতাড়ি পরামর্শ করার জন্য সবাইকে ডেকে আনল। ইয়াহুদীরা সকলেই একবাক্যে তাঁকে হত্যা করতে সম্মতি জানাল। তারা সে পরামর্শ মত কাজ করার জন্য জোর তৎপরতা শুরু করল। তারা তাঁকে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করার জন্য শূলিদণ্ড তৈরি করল। এরপর ভূ-পৃষ্ঠ ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলা আকাশ থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে ইয়াহুদীদের দৃষ্টি থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আড়াল করে দিলেন। সে রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের একত্র করে ওছিয়ত করলেন : মোরগ ডাকের সময় তোমাদের

একজন আমার সাথে প্রতারণা করবে। মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিবে।

তারপর তাঁর অনুসারীগণ চলে গেলে এদেরই একজন ইয়াহুদীদের ওঁৎ পেতে থাকা রাস্তা ধরে যেতে যেতে বলতে লাগল, আমি যদি তোমাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর খোঁজ দিতে পারি, তাহলে তোমরা আমাকে কী পুরস্কার দিবে? সুতরাং তারা তাকে তখনি ত্রিশটি দিরহাম প্রদান করল। সে ওই দিরহামগুলো নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর খোঁজ বলে দিল।

এরপর সে যখন এগুলো নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ করল, আল্লাহ পাক তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতিতে রূপান্তর করে দিলেন। এদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে উঠিয়ে নিলেন। সুতরাং ইয়াহুদীরা ঘরে প্রবেশ করে ওই লোকটিকেই ঈসা ভেবে গ্রেফতার করল। সে ইয়াহুদীদের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। সে যে ঈসা (আঃ) নয়, তা তাদেরকে বিশ্বাস করাতে বলল, আরে! আমি তো অমুক। কিছুক্ষণ আগেই তো আমি তোমাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর খবর বলে দিয়েছিলাম। তোমরা ভুল করছ। তোমরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঈসা (আঃ)-কে খোঁজ কর। কিন্তু ইয়াহুদীদের কেউই তার এ কথা বিশ্বাস করল না। শেষ পর্যন্ত তারা তাকেই ঈসা মনে করে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করল।

কেউ কেউ বলেন : যাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতিতে পরিণত করা হয়েছিল, সে ইয়াহুদীদেরই একজন ছিল। তার নাম ছিল ত্বাত্বিয়ানুছ। অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সাথীবর্গকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারবে? তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি প্রস্তুত আছি। পরবর্তীসময়ে আল্লাহ তাআলা তাকেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতিতে রূপান্তর করে দিলেন। ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা মনে করে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করল। এদিকে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয় নিলেন। আকাশে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাখা সংযোগ করে দিলেন এবং নূরের পোশাক পরিধাণ করালেন আর পানাহারের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্ত র থেকে মুছে দিলেন। ব্যাস! তিনি ফেরেশতাদের সাথে আরশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়াতে লাগলেন। বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, মি'রাজের রজনীতে দ্বিতীয় আসমানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-ও ছিলেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে হযরত মারইয়াম (আঃ) তের বছর বয়সে গর্ভবতী হয়েছিলেন। তিনি বাদশাহ সিকান্দারের বেতেলহামের বাবেল আক্রমণের ৬৫ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী

আসা শুরু হয়। শবে কদরের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৩৩ বছর বয়সে আল্লাহ পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ছয় বছর পর তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন।

ইবনে আবুদ্দুনিয়া সাঈদ আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেন : উসাইদ ছাজাবীর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোত্থেকে খাদ্যবস্তু পেয়ে থাকেন? তিনি আল্লাহ পাকের গুণকীর্তন করে বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি কুকুর, শূকরের খাদ্য দিতে পারেন, তাহলে আবু উসাইদকে খাদ্য দিবেন না? হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বিদ্যান্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে বিদ্যা রাখা শূকরের গলায় মুক্তার হার পরানোর মত।"

'এহইয়া' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনে সিরীন-এর নিকট এসে বলল, স্বপ্নে দেখি আমি শূকরের গলায় মুতির মালা পরাচ্ছি। ইবনে সিরীন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, তুমি এমন অযোগ্য লোককে ইলম শিক্ষা দিবে যে এর উপযুক্ত নয়।

দুনিয়া অন্বেষণকারীর জন্য শিক্ষনীয় ঘটনা

আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী (রহ.) উলামায়ে-ছু সম্পর্কে এহইয়া নামক কিতাব থেকে বর্ণনা করেন : এক লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমত করত। লোকটি সব সময় তার সেবা-যত্ন করত। কিছুদিন পর লোকটি মানুষের সম্মুখে বলতে লাগল حدثنى موسى صفى الله অর্থাৎ মূসা সফিউল্লাহ আমার নিকট বলেছেন—حدثنى موسى نبى الله আমার নিকট মূসা নাজিউল্লাহ বর্ননা করেছেন—حدثنى موسى كليم الله আমার নিকট মূসা কালিমুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। লোকটি এরূপ বারবার বলার কারণ লোকদের সামনে হযরত মূসা (আঃ)-কে সত্যে পরিণত করা। তাহলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাকে মানুষ নানা ধরনের উপঢৌকন প্রদান করবে। আর এতে সে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হতে পারবে। সুতরাং এ পন্থা অবলম্বন করার ফলে লোকটি অনেক ধন-সম্পদের মলিক হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন লোকটি উধাও হয়ে গেল। লোকটি মূসা (আঃ)-এর খেদমতে আর আসছে না। তাকে অনেক খোজাখুজি করা হল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর এক লোক তার কাছে আগমন করল। লোকটির হাতে কালো রশিতে একটি খিনজির বাধা ছিল। লোকটি মূসা (আঃ)-কে বলল, অমুক লোকটি সম্পর্কে কিছু জানেন কি? জবাবে তিনি বললেন, অনেক দিন হয় সে আমার কাছে আসে না এবং আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু তাকে কোথাও পাই নি।

এ কথা শুনে লোকটি বলল, আমার হাতে কালো রশি দ্বারা বাঁধা খিনজিরটিই সে লোক, যাকে আপনি খোঁজ করেছেন। এ কথা শুনে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন হে আল্লাহ! আপনি তাকে পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে দিন, তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারব যে কী কারণে সে খিনজিরে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)-কে জানিয়ে দিলেন, আমি তোমার এ দুআ কবুল করব না। অবশ্য তার এ পরিণতির কারণ জানিয়ে দিচ্ছি– সে দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়াকে তালাশ করেছিল।

অনুরূপ অন্য একটি বর্ণনা, ইমাম আবু তাবেব মাক্কী "কুওয়াতুল কুলূবে" এবং মুস্তাদরাক-এ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, উম্মতের মধ্যে একদল লোক এমন হবে যে, যারা পানাহারে ও আনন্দ ফুর্তিতে রাত অতিবাহিত করবে। কিন্তু তারা যখন সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠবে খিনজিরের আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক এদের কোন কোন গোত্রকে এবং তাদের ঘর বাড়িকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিবেন। লোকেরা তখন বলতে থাকবে– অমুক ঘরকে রাতে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক পাথর বর্ষণ করবেন যেমন হযরত লুত (আঃ)-এর কওমের উপর বর্ষণ করা হয়েছিল।

এরপর তাদের উপর একটি গরম বাতাস প্রবাহিত করবেন। তাদের মদ পান, সুদ খাওয়া, গায়িকা মহিলা রাখা এবং আত্মীতার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে এসব বিপদ আসবে।

শরীয়তে শূকরের হুকুম

খিনজির নামামুল আইন এবং তা হারাম। খিনজির বেচা-কেনা করাও হারাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মদ এবং তার মূল্য, মৃত এবং এর মূল্য, খিনজির এবং তার মূল্য হারাম করেছেন। এ থেকে বৈধ উপকার সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। যেহেতু একদল শুকর থেকে উপকৃত হওয়া মাকরূহ বলেছেন। আর যারা এর উপকার গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন তারা হলেন– ইবনে শিরীন (রহ.), হেকাম (রহ.), শাফেয়ী (রহ.), আহমাদ (রহ.) ও ইছহাক (রহ.) এবং হাম্মাদ (রহ.) আবার অন্যদের শূকর থেকে উপকৃত হওয়া না হওয়ার প্রতি স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা হলেন হযরত আওযারী, আসহাবে রায় এবং হাসান (রহ.) প্রমুখ।

কুকুরের মত খিনজির "নাজামুল আইন"। এজন্য এর কোন অঙ্গ কোন বস্তুতে লাগিলে বা গেলে গেলে তা নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং সে বস্তুটিকে সাতবার ধৌত করতে হবে। এবং একবার মাটি দ্বারা মেজে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের মাধ্যমে খিনজির খাওয়া হারাম—

قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

ফায়েদা

কাজীউল কুযাত আল্লামা মাওরিদী বলেল—فانه رجس-এর মধ্যে যমিরটি خنزير-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ مضاف اليه-এর দিকে যেহেতু তা অতি নিকটে। আর তার উপমা অন্য একটি আয়াতে দেখুন—واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون কিন্তু শেখ আবু হাইয়ান এতে মতবিরোধ করে বলেন, সর্বনামটি লাহম-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। কেননা বাক্যে যখন مضاف.مضاف اليه হয় তখন সর্বনাম مضاف-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে; مضاف اليه-এর দিকে নয়।

আল্লামা দামেরী বলেন, আমার শাইখ "আছ ছানুয়ী" (রহ.) বলেন, আল্লামা মাওরিদীর আলোচনা অর্থের দিকে উত্তম। এজন্য গোশত হারাম। তখন আয়াতে খিনজিরের গোশতই বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং যদি সর্বনাম-এর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে বাক্যের মূল ভিত্তি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। এজন্য খিনজিরের দিকে সর্বনাম প্রত্যাবর্তন করানো ওয়াজিব। আবার এ কারণেও যে, গোশত, কলিজা, পা এবং এর সমস্ত শরীর হারাম হওয়া বুঝায়।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) সূরা বাকারার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একমাত্র পশম ছাড়া শূকরের সমস্ত অঙ্গই হারাম। কেননা পশম থেকে চামড়া পৃথক করা জায়েজ আছে। ইবনে মানজার রহ.-এর অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন, অথচ এর ইজমার দাবীতে মতভেদ রয়েছে। যেহেতু মালেক এতে দ্বিমত করেছেন। অবশ্য কুকুর থেকে খিনজির অধিক নিন্দনীয়। যেহেতু খিনজির হত্যা করা মুস্তাহাব। আর এটা থেকে উপকৃত হওয়া কোন অবস্থাতেই জায়েজ নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম নববী (রহ.) বলেন খিনজির নাপাক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই বরং মাজহাবের দাবী অনুযায়ী তা পবিত্র। যেমন–বাঘ, সিংহ, ইদূর ইত্যাদি।

বর্ণিত আছে যে, কোন লোক কর্তৃক নবী করীম (সাঃ) কে খিনজিরের পশম থেকে চামড়া পৃথক করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেল : এতে কোন দোষ নেই।

ইবনে খুজাইজ মিকদাদ বলেন, খিনজিরের পশম থেকে চামড়া ছাড়ানোর নিয়ম নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেই ছিল। নবী করীম (সাঃ)-এর পরে বর্তমান হওয়া দৃশ্যমান। তার জানা ছিল না যে, নবী করীম (সাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা

আরোপ করেছেন আর না কোন ইমাম থেকে তা প্রমাণিত। শেখ নাছরুল মুকাদ্দাছী বলেন, মোজাতে খিনযিরের পশম ব্যবহার করা হয়েছে এমন মুজাতে মাসেহ করা জায়েজ নেই। যদিও একে সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করা হয় এবং একবার মাটি দ্বারা ধৌত করা হোক না কেন। এরপরও মাসেহ করা জায়েয হবে না। যেহেতু মাটি ও পানি সে জায়গায় পৌছাতে পারবে না যেখানে অপবিত্র পশম লাগানো হয়েছে।

কাফালী তালখীছ নামক কিতাবে লিখেছেন, আমি শেখ আবু সায়েদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনে শূকরের পশমযুক্ত মোজা নিয়ে নামায আদায় করা জায়েজ।

মানুষকে আক্রমণ করুক আর নাই করুক খিনজির পোষা জায়েজ নাই। যদি মানুষকে আক্রমণ করেই, তাহলে খিনজিরকে হত্যা করা ওয়াজিব। অন্যথায় এর আবার দু'অবস্থা আছে। প্রথমত তা হত্যা করা ওয়াজিব দ্বিতীয়ত হত্যা করা জায়েজ। এটাকে ছেড়ে দেয়াও জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলো লালন-পালন কোন অবস্থাতেই জায়েজ হবে না। এ বিষয়ে শরহে মুহাজ্জির-এ আলোচনা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে হযরত ইকরামা (রাঃ)-এর হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ছুতরাহ (আড়) ব্যতীত নামায আদায় করে তাহলে তার নামাযকে কুকুর, গাধা, শূকর, ইহুদী নাসারা এবং ঋতুবর্তী মহিলা কৃর্তক ভেঙ্গে দেয়া উত্তম হবে। এমনিভাবে হযরত মুগীরা বিন শোবার হাদীস নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ বেচা-কেনা করে সে যেন শূকরের গোসত কেটে বন্টন করে থাকে। ইমাম খাত্তাবী বলেন, এর মর্ম হল, মে শূকরের গোশত খাওয়াও হালাল মনে করে। নেহায়া নামক কিতাবে এর উদ্দেশ্য হল– এমন লোক যেন শূকরের গোশত কর্তন করে এবং যেন এর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক করে যেমনভাবে গোশত বিক্রি করা হয় এবং এর শরীর কেটে টুকরা টুকরা করে পৃথক করা হয়। উদ্দেশ্য হল যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করা হালাল মনে করে সে খিনজির বিক্রি করাও হালাল মনে করে। যেহেতু মদ এবং শূকর একই ধরনের হারাম। বর্ণিত হাদীসে শব্দাবলী হল আদেশ সূচক কিন্তু এর অর্থ নিষেধসূচক অর্থাৎ যে ব্যক্তি শূকর বিক্রি করে সে যেন শূকরের কসাই হয়ে যায়।

খিনজিরের উদাহরণ

আরবগণ বলেন—اطيش من عفر অর্থাৎ সে শুকরের বাচ্চার চেয়েও অবুঝ। عفر বলা হয় শূকরছানাকে। তেমনি আরবীগণ বলেল—اقبح من خنزير অর্থাৎ সে খিনজিরের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। অনুরূপভাবে বলে থাকেন—اكره كراهة الخنازير الماء المغور অর্থাৎ সে খিনজিরের জন্য গরমকৃত পানি থেকেও

বেশী অপছন্দনীয়। এ দৃষ্টান্তের মূল কথা হল, খ্রীষ্টানরা যখন শূকরের গোশত খেতে চায় তখন পানি গরম করে ফুটন্ত পানিতে শূকর ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করে। একে ইগার বলে। আবু উবায়দা বলেন–

ولقد رائيت مكانهم فكوهنتهم ككراهة الخنزير للايغار

আমি তাদের বাসস্থান দেখেছি, তা আমার এমন অপছন্দ হল যেমন খিনজির সে উপচানো পানিকে অপছন্দ করে যেখানে একে জীবিত ছাড়া হয়।"

ইবনে দূরাইদ বলেন "ইগার" দ্বারা বুঝানো হয় পানি ফুটানো। এরপর এতে খিনজিরকে সিদ্ধ করা।

ইবনে দুরাইদ

তার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে দূরাইদ আবু বকর আযদী বসরী। তিনি তৎকালীন সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। তার উত্তম কবিতাগুলোর কিছু প্রশংসা করেছেন শাহ ইবনে মিকয়াল। কোন কোন আলেম বলেন, ইবনে দূরাইদ কবিতার জ্ঞানে পারদর্শি এবং আলেম কবি ছিলেন। শেষ জীবনে তার প্যারালাইসিস রোগ হয়েছিল। সুতরাং কেউ তার কাছে আগমন করলে তিনি চিৎকার আরম্ভ করতেন এবং খুব বিরক্তি বোধ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাকে সাপের বিষ পান করানো হয়। এতে তিনি সুস্থ্য হয়ে উঠেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু এক বৎসর পর তিনি আবার প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন এবং তার সমস্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে অবশ হয়ে যায়। শুধু হাতে সামান্য অনুভূতি অবশিষ্ট ছিল। একজন ছাত্র তার এ অবস্থা দেখে সবসময় মনে মনে ভাবত, তার এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ইচ্ছামত দেয়া হয়েছে। এর আলোচনা সে তার একটি কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

فواخزني ان لاحياة لذيذة ولا عمل برضى به الله صالح

হায় আফসোস! আমার জীবনও তো পঙ্কিলমুক্ত। এমন কোন ভাল আমল আমার নিকট নাই যার প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হাতে পারেন।"

দ্বিতীয়বার প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি মাত্র ২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

ইবনে দূরাইদ বলেন, এক রাতে এক ব্যক্তিকে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সে আমার কক্ষের উভয় দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বলছেন, ওহে ইবনে দূরাইদ! তুমি যে শরাবের মত আকর্ষণকারী ছোট একটি কবিতা রচনা করেছ তা আমাকে একবার শুনাও তো। আমি বললাম আবু নাওয়াস সবকিছুই বর্ণনা করে দিয়েছে। সে কারও জন্য কিছুই অপূর্ণ রাখে নাই। (অর্থাৎ আবু নাওয়াসের চেয়ে মদের উপর আর কেউ উত্তম কবিতা লিখে নি)। এতে লোকটি বলল, আমি সিরিয়ার আবু নাজিয়াহ। এরপর তিনি এ কবিতা পাঠ করেন–

وحمراء قبل المزج صفراء بعده انت بين ثوبي نرجس وشقائق

"শরাবে রং মিশানোর পূর্বে লাল ছিল, মিশে গিয়েছে তাই হলুদ রঙের হয়ে গেল। ওহে, আমার নিকট দুইটি পোশাক আছে– একটি নার্গিস। (হলুদ বর্ণের) অপরটি গুলে লালা (লাল রঙের)।"

حكت وجنة المعشوق صرفا فسطوا عليها مزاجا فاكتست لون عاشق

"প্রেমিকের গণ্ডদেশের আলোচনা করল এতে কিছু হলেও প্রেমসিক্তের পেরেশানীও মিশানো হয়। এরপর ভালবাসার মুখমণ্ডল যা জ্বলন্ত কয়লার মত ছিল তা হঠাৎ প্রেমিকের রক্তে পরিণত হয়ে গেল।"

এ কবিতা শুনে আমি তাকে বললাম, তুমি ভুল বলছ, সে বলল তা কী রকম, আমি বললাম তুমি حمراء বলে سرخی-কে মুকাদ্দাম করে ফেলেছ আবার بين ثوبي سرجس وشقائق বলে হলুদকে কোমাদ্দাম করে ফেলেছ। সে জবাব দিল, ওহে হিংসুক এ সময় ব্যতিক্রম উদ্দেশ্য নয়।

বর্ণিত আছে ইবনে দূরাইদ প্রচুর পরিমাণে মদ পান করতেন। তার বয়স ৯০ বছর অতিক্রম করেছিল তারপরও তিনি মদ পান ছাড়েন নি। প্যারালাইসিস রোগের সময়ও তার জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক ছিল। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিকভাবে জবাব দিতে পারতেন। তিনি ৩২১ হিঃ সাবান মাসে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

দূরাইদ শব্দটি আদবাদ-এর তাছগীর আর আদাদ অর্থ যার দাঁত নাই। ইবনে খাল্লিকানসহ অন্যান্য আলেমগণের অভিমত এটাই।

চিকিৎসায় খিনজিরের উপকারিতা

খিনজিরের কলিজা কারও খাইয়ে দিলে অথবা কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করিয়ে দিলে অজগর সাপ সে ব্যক্তির কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর খিনজিরের কলিজা শুকিয়ে প্যারালাইসিস রোগীকে অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করালে দ্রুত এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে। কার নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলে শূকরের পিত্ত তিন ফোটা করে নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করালে অতি সত্ত্বর ভাল হয়ে যাবে। শূকরের হাড্ডি পুড়িয়ে ছাই করে ভাল করে খুব মিহি করে কোন অর্শ্ব রোগীকে পান করালে এ রোগ ভাল হয়ে যাবে। জ্বর ছেড়ে ছেড়ে আসে এমন রোগীকে শূকরের হাড্ডি গলায় বেঁধে দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়।

শূকরের হাড্ডি পুড়িয়ে পুরাতন ক্ষতের মধ্যে (যে স্থান থেকে সার্বক্ষনিক রক্ত ঝরে) ভরে দিলে খুব শীঘ্রই ক্ষত ভাল হয়ে যাবে।

হাকীম ইউ হেন্না বলেন, হাড্ডি কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখতে হয়। শূকরের পিত্ত শুকিয়ে অর্শ্বস্থানে বেঁধে রেখে দিলে অর্শ্ব সম্পূর্ণ ভাল হবে। শূকরের বিষ্ঠা টক

আনার গাছের শিকড়ে প্রলেপ দিলে আনার মিষ্টি হয়ে যায়। কেউ যদি হেচকী রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে শূকরের বিষ্ঠা সাথে রাখলে উপকার হয়। আর যদি এক মিছকাল পরিমাণ খেয়ে ফেলে তাহলে কিডনীর পাথর ভেঙ্গে সুস্থ্য হয়ে যাবে। এমনিভাবে এক মিছকাল পরিমাণ মধুসহ সেবন করলে আমাশয় এবং আঁতে তিক্ততার জন্য খুব উপকারী হয়।

স্বপ্নে শূকর দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে শূকর দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে– দারিদ্রতা, নিঃস্বতা এবং হারাম মাল পাওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে শূকরী দেখলে অনেক সন্তানের লক্ষণ বলে জানবে। স্বপ্নে যদি শূকর কারও ক্ষতি করতে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে স্বপ্ন দ্রষ্টাকে কোন খ্রিস্টান লোক বিপদে ফেলে দিবে।

কোন কোন সময় শূকরের স্বপ্নে শক্তিশালী দুশমন, প্রতারক ও অভিশপ্ত লোকের আকুতি বোঝা যায়। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, শূকরের উপর আরোহণ করছে তাহলে তার ধন-সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। সে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে শূকরের রান্না করা গোশত খেতে দেখে তার তাবীর হবে, সে ব্যবসায় হারাম মাল অর্জন করবে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে শূকর হয়ে গিয়েছ। তাহলে তার অপমানের সাথে প্রচুর মালামাল মিলবে। আর তার ধর্মে কমতি দেখা দিবে। স্বপ্নে কেউ দেখল যে, সে খিনজিরের মত চলাফেরা করছে তাহলে তার সুখ-শান্তি আসবে। আর যদি খিনজিরের বাচ্চার মালিক স্বপ্নে দেখে তাহলে চিন্তার কারণ হবে। স্বপ্নে পোষা খিনজির দেখা সবুজ শ্যামলতার লক্ষণ। তবে নিজ বাড়িতে এ স্বপ্ন দেখতে হবে। যে সমস্ত প্রাণী দ্রুত বর্ধনশীল এগুলো স্বপ্নে দেখলে সবুজ শ্যামল উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে জংলী শূকর দেখা মুসাফিরের জন্য বৃষ্টি বা আরও উত্তম জিনিসের লক্ষণ। কেউ দেখল যে তার স্ত্রী শূকর হয়ে গিয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে। কেননা এটা হারাম। কারণ, এর গোশত দেখা সমস্ত মানুষের জন্যই উত্তম। যেহেতু শূকর মরে গেলেই তা উপকারে আসে এবং তা হারাম। আল্লাহ পাক বলেন— انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير উল্লেখিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (আল্লাহই ভাল অবগত)

২৮৯, الخنزير البحرى (আল খিনযিরুল বাহরী)

সামুদ্রিক শূকর

ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট সামুদ্রিক শূকর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা বলছ শূকর সামুদ্রিক প্রাণী। কিন্তু আরবের লোকদের নিকট শূকর নামে কোন সামদ্রিক প্রাণী নাই। অবশ্য তাদের কাছে সামুদ্রিক প্রাণী

ডলফিন-এর আলোচনা باب الدال এ আসবে ইনশাআল্লাহ। একে আবার ছোট্ট মাছও বলা হয়ে থাকে।

সামুদ্রিক শূকর সম্পর্কে রবি (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সামুদ্রিক শূকর খাওয়া যাবে। বর্ণিত আছে ইমাম লাইলা সামুদ্রিক শূকর হালাল বলেছেন। এ মতামতটি হযরত ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বছরী, আওয়ারী, লাইছ এবং আবু মালেক থেকে বর্ণিত, তারা বলেন এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। পরবর্তীতে এ সমস্ত মনিষীগণ সামুদ্রিক শূকর থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইবনে খাইরান হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : ؏। সামুদ্রিক শূকর নিজের জন্য শিকার করেছেন এবং রান্না করে খেয়ে বলেছেন, এর স্বাদ মাছের মতই। ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমি লাইছ ইবনে ছাদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, মানুষ যদি একে শূকর বলে তাহলে খাওয়া যাবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা শূকরের গোশত হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সামুদ্রিক শূকরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণের যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কেউ এটা হালাল আবার কেউ হারাম বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর সঠিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সামুদ্রিক শূকর কোন ধরনের প্রাণী? সুতরাং আমাদেরকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতকেই মানতে হবে যা তিনি হারাম বলে নির্ধারন করেছেন। (অনুবাদক)

২৯০. الخنفساء (আল খিনফাছা) গোবরে পোকা

যেহেত উক্ত শব্দে 'নুন' অক্ষরটি অতিরিক্ত সেহেতু গোবরে পোকার আলোচনা পূর্বে আলোচনার কথা ছিল এবং 'ফা' অক্ষরে যবরযোগে। এর স্ত্রী লিঙ্গ خنسفاة। ইবনে সাঈদাহ বলেন, এটা একপ্রকার কালো রঙের দুর্গন্ধযুক্ত কীট। এটা ডাস পোকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট, যার মাটি পঁচা থেকে জন্ম। এর স্ত্রীলিঙ্গ خنسفه এবং خنفساء ও হয়। আর এক লুগাতে 'ফা' অক্ষরে পেশযুক্তও পাওয়া যায়। ইমাম আছমাঈ (রহ.) বলেল خنفساء হা যোগ করে পড়া যাবে না। এর উপাধি হল উম্মুন নাতানি, উম্মুল লুজাজি, উম্মু মাখরাজ, উম্মুল আসওয়াদ, উম্মুল ফাসু। এই প্রাণীটি পানি পান করা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। এর মধ্যে ও বিচ্ছুর মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব রয়েছে। এ জন্য মদিনাবাসী একে جارية العقرب বলে থাকেন অর্থাৎ বিচ্ছুর প্রতিবেশী বলা হয়। গোবরে পোকা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন, جعل, حمار قبان, وردان

এবং حنظب এটা خنافس এর পুংলিঙ্গ। গোবরে পোকা দুর্গন্ধের জন্য বিখ্যাত। যেমন ظربان অর্থাৎ বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মত খুব দুর্গন্ধময়। তাই আরবগণ বলেন— اذا لتحركت الخنفساء فست অর্থাৎ গোবরে পোকা যখন নড়াচড়া করে তখন পিছনে বায়ু ছাড়ে, যা খুবই দুর্গন্ধময়। হানীন ইবনে ইছহাক ত্বরীফ বলেন, যখন আজওয়ারীন (অর্থাৎ তীব্র গন্ধ লতা বিশিষ্টের বীজ) থাকে সেখান থেকে গোবরে পোকা দূরে থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মানুষ মূর্খতার মধ্যে অহংকার করা ছেড়ে দেয়া উচিৎ। অন্যথায় আল্লাহ পাকের নিকট গোবরে পোকার চেয়েও অধিক ঘৃণার পাত্র হয়ে যাবে।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আল্লামা কাজবিনী (রহ.) একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কোন এক ব্যক্তি গোবরে পোকা দেখে বলে, আল্লাহ পাক এ গোবরে পোকাকে সৃষ্টি করলেন কেন? এর সৌন্দর্যতা বা এর সুগন্ধির কারণে কি সৃষ্টি করেছেন? অর্থাৎ লোকটি এর সৃষ্টির ব্যাপারে আপত্তি করেছিল। তার প্রশ্নটি ছিল আল্লাহর উপর সরাসরি আপত্তি উত্থাপন (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা লোকটিকে এক মারাত্মক যখমে পতিত করলেন। যখমটি এমনই মরাত্মক ছিল যে, সমস্ত চিকিৎসকগণ এর চিকিৎসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। লোকটিও চূড়ান্ত পর্যায়ে চিকিৎসা ছেড়ে ঘরে বসে রইল। হঠাৎ একদিন সে একজন চিকিৎসকের আওয়াজ শুনল। চিকিৎসক বাইরের ওলি-গলিতে ডাকাডাকি করছিল এবং মানুষের চিকিৎসা করতে বলছিল। অসুস্থ লোকটি তার পরিবারের লোকদেরকে বলল, চিকিৎসকে এনে আমার ক্ষত স্থান দেখাও। পরিজনরা বলল, তুমি তো বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়েই চিকিৎসা করিয়েছ কিন্তু কোন কাজে আসল না। রাস্তায় রাস্তায় ডেকে যে লোক চিকিৎসা করে সে তোমার কি চিকিৎসা করবে? লোকটি বলল, এক নজর দেখলে তাতে তোমাদের এমনকি ক্ষতি? সুতরাং অপারগ হয়ে পরিজনরা চিকিৎসককে ক্ষত স্থান দেখাল। হাকীম ক্ষত দেখে বলল, একটি গোবরে পোকা নিয়ে আস। এ কথা শুনে লোকেরা হাসতে লাগল এবং বলতে লাগল, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম, এ হাতুড়ে ডাক্তার কি চিকিৎসা করবে? কিন্তু রোগী গোবরে পোকার কথা শুনে তার পূর্বের কথা স্বরণ হয়ে গেল। সুতরাং রোগী বলল, হাকীম সাহেব যা চেয়েছেন তার ব্যবস্থা কর। সুতরাং তারা একটি গোবরে পোকার ব্যবস্থা করে চিকিৎসকের হাতে দিল। হাকীম সাহেব গোবরে পোকাটি জ্বালিয়ে এর ছাই রোগীর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। আল্লাহর হুকুমে ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেল। তারপর রোগী অন্যান্য লোকদেরকে তার কাহিনী আগা-গোড়া বর্ণনা করে বলল, আমাকে এটা দেখানো

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল। অতি ঘৃণিত সৃষ্টিও মহা ঔষধের কাজে লাগে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন বস্তুই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।

একটি ঘটনা

ইবনে খাল্লিকান জাফর ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকী (হারুনুর রশীদের উজীর) এর জীবনীতে লিখেছেন : একবার তার নিকট আবু ওবায়দাহ সাকাফী বসা ছিল। এমন সময় একটি গোবরে পোকা বের হল। জাফর তার চাকরদেরকে এটা সরাতে নির্দেশ দিলেন। আবু ওবায়দাহ বললেন, ছেড়ে দাও, হয়তো কোন ভাল কাজ হবে, যেহেতু আরবদের ধারণা ছিল যখন গোবরে পোকা কাছে আসে তখন অব্যশই কোন মঙ্গল হয়। এতে জাফর আবু ওবায়দার অনুমানই সঠিক হল। তারপর জাফর গোবরে পোকাটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং গোবরে পোকা আবু ওবায়দার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এতে জাফর পুনরায় আবু ওবায়দাকে এক হাজার দিনার প্রদান করার নির্দেশ দিলেন।

গোবরে পোকার শরয়ী বিধান

দুর্গন্ধের কারণে গোবরে পোকা খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। সাহাবগণ বলেন, যার মধ্যে উপকার ও অপকার নাই তা হত্যা করা ইহরামধারী ও ইহরামবিহীন সকলের জন্যই মাকরুহ। যেমন গোবরে পোকা, কীটপতঙ্গ, কালো কুৎসিত এক ধরনের পোকা, কাকড়া এবং অন্যান্য প্রাণী। উদ্দেশ্য হল এ ধরনের প্রাণী যার দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, আর না কোন উপকার হয়। এ ধরনের প্রাণী হত্যা করা মাকরূহ। মাকরূহ হওয়ার কারণ হল প্রয়োজন ছাড়া এটা একটি নিরর্থক কাজ। মুসলিম ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর উপর সৌজন্যমূলক আচরণ করা ফরজ করে দিয়েছেন। তোমরা যখন কোন প্রাণী হত্যা করবে তখনও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। অনর্থক কোন জিনিস হত্যা করার নাম ইহসান নয়।

ইমাম বায়হাকী কুত্বাহ নামক এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, মানুষকে কষ্ট দেয় না এমন প্রাণী হত্যা করা তিনি অপছন্দ করতেন।

প্রবাদ বাক্য

আরবগণ বলেন—افسى من الخنفساء অর্থাৎ সে গোবরে পোকার চেয়েও বেশী বায়ু ছাড়ে। এমনিভাবে তারা আরও বলেন—الخنفساء اذا مست نتنت অর্থাৎ গোবরে পোকা আসলে তার সাথে দূর্গন্ধও আসে। উদাহরণটি এমন সময় বলা হয় যখন কোন সম্পদশালী লোকের আলোচনা হয়। অর্থাৎ খারাপ লোকের আলোচনা কর না। কেননা তাদের আলোচনার মধ্যে অমঙ্গল ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।

নাহুবীদ আহমার উৎবার বদনাম করে বলেন—

لنا صاحب مونع بالخلاف كثير الخطاء قليل الصواب

অর্থাৎ আমাদের এখানে এমন একজন লোক আছে যে, মতানৈক্য করা তার ইচ্ছা। অথচ সে সব সময় ভুল করে। তার কাছে সততার কোন নাম গন্ধও পাওয়া যাবে না।

الج لجاجا من الخنفساء واذهى اذا ما مشى من غراب

অর্থাৎ সে গোবরে পোকার চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক আর যখন সে চলে তখন কাকের চেয়েও বেশী শক্তি নিয়ে চলে।

চিকিৎসায় গোবরে পোকা

গোবরে পোকার মাথা কেটে যদি কোন মিনারে রেখে দেয়া হয় তাহলে সেখানে অনেক কবুতর একত্রিত হবে। গোবরে পোকার পেটের লালা চোখে লাগালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং চোখের সাদা পর্দা কেটে যায়। বিশেষ করে চোখ দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখের পানি পড়া বন্ধ করে চোখ একদম পরিস্কার করে দেয়। কার ঘরে যদি বেশি পরিমানে গোবরে পোকা জন্মে তাহলে চিন্নার পাতা দ্বারা ঘরে ধুপ দিলে গোবরে পোকা থাকবে না। গোবরে পোকা তিলের তেলে ভেজে সেই তৈল ছেকে কানে ব্যবহার করলে কানের সমস্ত রোগ ভাল হয়ে যায়। গোবরে পোকার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচ্ছু কামরানোর স্থানে বেঁধে দিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এটা পুড়ে ছাই করে ক্ষতস্থানে লাগালে অচিরেই ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যাবে। কেউ যদি অসাবধানতা বশতঃ গোবরে পোকা খেয়ে ফেলে তাহলে তার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

স্বপ্নে গোবরে পোকার তাবীর

স্বপ্নে গোবরে পোকা দেখলে সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যুর লক্ষণ বলে প্রতীয়মান হয়। আর পুরুষ দেখলে ইতর লোকের খাদেম হবে। অধিকাংশ ক্রোধ এবং দুশমনের লক্ষণ।

২৯১. الخنوص (আল খিনুছ) শূকর শাবক

'খা' অক্ষরে যের এবং 'নুন' অক্ষরে তাশদীদ। এর বহুবচন خنانيص হয়। আখত্বাল বশির ইবনে মারওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেন—

اكلت الدجاج فافنيتها فهل فى الخنانيص مخمر

"অর্থাৎ তুমি মুরগি খেলে কিছু অবশিষ্ট রাখলে না, তাহলে কি এখন শূকর ছানাকে সাবার করার ইচ্ছা রাখ।"

শূকর ছানার শরয়ী বিধান

এর শরয়ী বিধান ও স্বপ্নের তাবীর শূকরের অনুরূপ।

চিকিৎসায় উপকারীতা

শূকর শাবকের পিত ক্যানসার রোগ দূর করে। কেউ এর পিতের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর চর্বি টক আনারের গাছে প্রলেপ করলে আনার মিষ্টি হয়।

১৯২. الخيتعور (আল খাইতাউর) বাঘ

এর অর্থ ভূতও হয়। 'ইয়া' অক্ষর অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

ذاك ازب العقبة يقال له الخيتعور

অর্থাৎ তুমি যখন কোন মহিলার ভালবাসা থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার আশা প্রকাশ করবে তাহলে এতে ভালবাসার নাম গন্ধও পাবে না।

তার ভালবাসা ঠিক বাঘের প্রতারণার মত। অন্য মতে ইহা একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, যা পানির উপর থাকে এবং এক স্থানে স্থির অবস্থায় থাকে না। আবার ইহাও বলা হয়ে থাকে যে, 'খাইতাউর এমন সাদা বস্তু যা শূন্যে উড়ে বেড়ায় অথবা মাকড়সার জালের মত বলা হয়।

১৯৩. الخيدع (আল খিদা) বিড়াল

এর আলোচনা "ছীন" পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

২৯৩. الاخيل (আল আখিল) সবুজ পাখি

এটা একধরনের সবুজ পাখি। এর শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রং ছাড়াও ডানাতে ভিন্ন রঙ রয়েছে, যা দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু নিকট থেকে দেখলে তার ডানার রঙও সবুজ দেখা যায়। 'আল-আখিল' নাম রাখার কারণ হল, তিলক বিশিষ্ট মানুষকে 'আল আখিল' বলা হয় এবং যেহেতু এর উজ্জ্বলতা তিলকের মত, তাই একে 'আখিল' বলে। বর্ণিত আছে, এটা একটি অপয়া পাখিবিশেষ। যার অমঙ্গল কোন না কোন সময় অবশ্যই প্রকাশ ঘটবে।

১৯৪. الخيل (আল খাইল) ঘোড়া

শব্দটির কোন একবচন নেই। যেমন قوم এবং رهط শব্দের কোন একবচন হয় না। এর মুফরাদ خائل। আবু ওবায়দাহ বলেন শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহুবচন خيول। সিজিস্তানী বলেন এর তাছগীর خييل হয়। আর خيل অর্থ অকুঞ্চন বা মুচড়ানো। আর যেহেতু ঘোড়ার চলনে মোচড়ানো অবস্থা পাওয়া যায় সেহেতু

এর অর্থ ঘোড়া। তাই ঘোড়াকে خيل বলা হয়ে থাকে। ইমাম সুয়ুতীর মতে خيل শব্দটি اسم جنس এবং আবদুল হাসানের মতে এটা বহুবচন।

ঘোড়ার মর্যাদা

ঘোড়ার মর্যদার জন্য এ প্রমাণই যথষ্ট যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর শপথ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেন والعاديات ضبحا (শপথ উর্ধস্বাসে চলমান ঘোড়াসমূহের)।

এ সমস্ত ঘোড়া দ্বারা যুদ্ধের ঘোড়া বোঝানো হয়েছে যে ঘোড়াগুলো দৌড়াতে দৌড়াতে হাপাতে থাকে।

হাদীসে ঘোড়ার আলোচনা

বুখারী শরীফে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর আঙ্গুল তাঁর ঘোড়ার কপালের পশমে বুলাচ্ছেন এবং বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার পেশানীতে কল্যাণ অংকন করে দিলাম।

উক্ত হাদীসে পেশানী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কপালের সে চুল যা সম্মুখে ঝুলে থাকে। খাত্তাবী বলেন, পেশানী অর্থ হল ঘোড়ার বংশধর। যেমন বলা হয়- فلان مبارك الناصية وميمون, অর্থাৎ অমুক লোক ভাগ্যবান অর্থাৎ ভাগ্যবান বংশের। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোন এক কবরস্থানে তাশরীফ নিলেন এবং তিনি এ সমস্ত শব্দাবলী দ্বারা মৃতদের জন্য দুআ করলেন—

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله.

এরপর তিনি বললেন : আমার ইচ্ছা হয় আমি আমার ভাইদের দেখি। আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমার আসহাব। আমার ভাই হল তারা যারা এখনও পৃথিবীতে আগমন করে নি (জন্মগ্রহণ করে নি)। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা এখনও পৃথিবীতে আসে নি তাদেরকে আপনি কীভাবে চিনবেন যে, তারা আপনার উম্মত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবাবে বললেন, ধর! কোন লোকের যদি কপালে সাদা দাগ বিশিষ্টি একটি ঘোড়া থাকে আর তা যদি অসংখ্য (অন্য রঙের) ঘোড়ার মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে কি তার ঘোড়া চিনে নিতে অসুবিধা হবে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই সে তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

কিয়ামতের দিন আমার উম্মত তাদের কপালে অযু এবং সিজদার চিহ্নসহ এভাবে উত্থিত হবে যে, তা চমকাতে থাকবে। আমি তখন হাউজে কাউসারে তাদের সম্মুখে অবস্থান করব। বায়হাকীর বর্ণনা মতে, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তাদের অযুর অঙ্গসমূহ সাদা ধবধবে দেখাবে এবং অযুর প্রত্যঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। এ অবস্থা এ উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদী) ছাড়া অন্য কোন উম্মতের থাকবে না।

মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার তিন পা সাদা ও চতুর্থ পা অন্য রংয়ের হওয়া পছন্দ করতেন না। তিন পা সাদা আর চতুর্থ পা অন্য রংয়ের অর্থ হল ঘোড়ার পিছনের ডান পা এবং সম্মুখের বাম পা সাদা হওয়া। অথবা সম্মুখের ডান পা এবং পিছনের বাম পা সাদা হওয়া। তিন পা সাদা হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। অভিধান বিশারদ জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে شكال অর্থ ঘোড়ার তিন পা সাদা হওয়া এবং চতুর্থ পা সাদা না হওয়া। আবু ওবায়দাহ বলেন, কখনও কখনও شكال এমন হয় যে, ঘোড়ার তিন পা অন্য রংয়ের এবং এক পা সাদা হয়। দূরাইদ বলেন, شكال একই চিড়যুক্ত হয়। অর্থাৎ এক হাত এবং এক পায়ে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে একে ব্যতিক্রম شكال বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, شكال উভয় হাত (অর্থাৎ সম্মুখের উভয় পা) সাদা হওয়া বোঝায়। যখন অন্যান্য মনীষিরা বলেন شكال উভয় পা সাদা বোঝায়। কোন কোন উলামার মতে যদি হাত পায়ের সাদার সাথে কপালও সাদা হয় তাহলে আর অপছন্দনীয় থাকে না।

ইবনে রাশীক তার উমদাহ নামক কিতাবের منافع الشعر ومضاره অধ্যায়ের শেষ দিকে উল্লেখ করেছেন : কবি আবু ত্বাবাব মুতানাব্বি যখন পারস্য দেশে গেলেন এবং আযদোদ্দৌলা ইবনে বুইয়াহ আন্দাইলাসীর ভূয়সী প্রশংসা করে কবিতা পাঠ করে শুনান, তখন আযদোদ্দৌলার পক্ষ থেকে অনেক উপহার পেয়ে বাগদাদে আগমন করেন। এ ভ্রমণে তার সাথে আরও অনেক লোক সঙ্গী ছিলেন। তারা বাগদাদের কাছাকাছি পৌছলে ডাকাত দল আমাদের কাফেলার উপর আক্রমন করে। কবি মুতানাব্বিও প্রতিরোধে অংশ নেন। তিনি যখন দেখলেন, ডাকাত দল বিজয়ী হয়ে যাবে তখন তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কবির খাদেম যখন এ অবস্থা দেখল তখন সে বলতে লাগল– মানুষ আপনাকে চিরদিন কাপুরুষ বলবে এবং ভীতু হিসেবে অভিশপ্ত মনে করবে। কেননা আপনি

আপনার এক কবিতায় স্বীয় বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর আপনার এই কাজ আপনার সম্পূর্ণ বিপরীত হবে।

الخيل والليل والبيداء تعرفنى والحرب والضرب والقرطاس والقلم

ঘোড়া, রাত্রের অন্ধকার এবং বিজন বলে আমাকে ভাল করে জানে। আর যুদ্ধ, তরবারি, নেয়া, কাগজ, কলম এর মাধ্যমেও আমাকে জানে। (অর্থাৎ বিজন বলিয়াও জানে আর কাগজ কলমেও জানে)

ভৃত্যের মুখে এ ধরনের শব্দাবলী ও স্বীয় কবিতার উদ্ধৃতি শুনে মুতানাব্বির হুশ হল। এরপর কবি দ্বিতীয়বার ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত কবি মারা গেলেন। সুতরাং তার এ কবিতাই তার নিহত হওয়ার কারণ হল। কবি মুতানাব্বি ৩৪৫ হিঃ রমজান মাসে নিহত হন।

আবু সুলাইমান খাত্তাবী নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অথচ তার মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী মোটেও ছিল না।

انست بوحدتى ولزمت بيتى فدام الانس لى ونما السرور

আমি আমার একাকীত্বের সাথে সম্বন্ধ গড়েছি। আর আমি আমার ঘরকে আবশ্যক করে নিয়েছি। (অর্থাৎ নির্জনতাকে বেছে নিয়েছি। যার ফল হল, সার্বক্ষণিক আমার অশ্রু প্রবাহিত হয় এতে আমার আনন্দ হয়।

وادبنى الزمان فلا ابالى هجرت فلما ازار ولا ازور

যুগ আমার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রতিষ্ঠিত হল। সুতরাং এখন আমার কোন ভয় নেই যে, কেউ আমার সাথে সখ্যতা গড়ুক বা আমি কার সাথে সখ্যতা গড়ি।

ولست بسائل ما دمت حيا امار الخيل ام ركب الامير

জীবন থাকতে আমি কার কাছে হাত পাতব না আমার সম্মুখ দিয়ে দানশীল সৈন্য অতিবাহিত হোক অথবা আমীর স্বয়ং সওয়ার হয়ে যাক।

ইবনে খাল্লিকান তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : কোন এক ব্যক্তি তার নিম্নোক্ত পংক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল–

بارد هواك صبرت ام لم تصبر

(অর্থাৎ তুমি ধৈর্য্য ধর আর নাই ধর কিন্তু নিজ আকাঙ্খা দ্রুত পূর্ণ করে নাও।

উল্লেখিত কবিতায় تصبرا কীভাবে 'আলিফ' বাকি রইল। যেহেতু ইতিপূর্বে 'লাম' জযম দাতা উল্লেখ আছে। হয়ত এরকম হওয়ার ছিল যে, আপনি এভাবে বলতেন—ام لم تصبر অর্থাৎ لم جازمه হয়ে تصبر বলা দরকার ছিল; بصبرا

নয়। এ আপত্তি শুনে মুতানাব্বি বললেন, যদি আবুল ফাতাহ ইবনে জনি এখানে হাজির থাকতেন তাহলে তিনিই তোমার এ আপত্তির জবাব দিতেন। কিন্তু এর জবাব এখন আমি নিজেই দিব। আর তা হচ্ছে, যে 'আলিফ' এসেছে, তাহল সাকীনযুক্ত নুনের পরিবর্তে। কেননা এটা মূলে لم تصبرن ছিল। আর নিয়ম হল যখন কেউ তাকীদের নূনে খফীফাতে বিরাম চিহ্ন দিতে চায় তাহলে একে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা আবশ্যক। তাই اعشى এর কথা— ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا (অর্থাৎ শয়তানের এবাদত করিও না বরং আল্লাহই মাবুদ)

اعشى-এর এ কথায় প্রকৃত শব্দ فاعبدن ছিল। কিন্তু বিরামের কারণে নুনকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

আল্লামা দারেমী (রহ.) বলেন, আবুল ফাতাহ দ্বারা মুতানাব্বির মুরাদে উসমান ইবনে হুবনী, যিনি একজন বিখ্যাত নাহুবিদ ছিলেন। যিনি আবু আলী ফার্সী থেকে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। আর তিনি মওসেলে এসে নিজেই শিক্ষকতা শুরু করেন। একদিন তিনি নিয়মমত পড়াচ্ছিলেন আর তার উস্তাদ এদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আবু আলী কাসী ইবনে হুবনীকে দেখে বলেন— زببت وانت حصرم অর্থাৎ তুমি দীর্ঘদিন বেষ্টনে থেকে কৃপণ হয়ে গিয়েছ। এ কথার উদ্দেশ্য হল আমার সাথে সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়েছ। ইবনে হুবনী এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে উস্তাদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত আবু আলী ফার্সীর দরসে যোগদান করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নাহু শাস্ত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

ইবনে হুবনীর পিতা ছিলেন একজন রোমান গোলাম। সমস্ত কবিতাই তার উত্তম। তিনি ছিলেন একচোখা (কানা) সুতরাং এ ব্যাপারে কবিতা হল–

صدورك عنى ولا ذنب لى يدل على نيت فاسدة

* অর্থাৎ আমার কোন দোষত্রুটি ছাড়া তোমরা আমাকে ভিন্ন করা তোমাদের বদ নিয়তের লক্ষণ।

فقدو حياتك مما بكيت خشيت على عينى الواحدة

* তোমার প্রাণের কসম তোমার বিচ্ছেদ আমার ক্রন্দনের কারণে এক চোখ বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম, সে যেন চলে না যায়।

ولولا مخافة ان لا اراك لما كان فى تركها فائدة

* আর শুনে রাখ! সে এক রোখা আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। তার অস্তিত্ব শুধু তোমাকে দেখার জন্য।

ইবনে হুবনীর রচনাবলী রয়েছে। এ রচনাবলীর মধ্যে দেওয়ানে মুতানাব্বীর শরাহ অন্যতম। এজন্য আপত্তিকারীদের জবাব দেয়ার সময় মুতানাব্বী ইবনে হুবনীর উদ্ধৃতি দিতেন। ইবনে হুবনী ৩৬২ হিঃ সফর মাসে বাগদাতে ইন্তেকাল করেন। সুনানে নাসাঈ শরীফে সালমা ইবনে নুফাইল উছকুনরীর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) ازالة الخيل থেকে নিষেধ করেছেন।

ازالة الخيل এ কথার উদ্দেশ্য হল ঘোড়াকে অপমানিত করা। অর্থাৎ ঘোড়াকে বোঝা বহনের কাজে ব্যবহার করা। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাসের ভূমিকায় আবু ওমর ইবনে আব্দুল বার এ কবিতা পাঠ করেন—

احبوا الخيل واصطبروا عليها فان العز فيها والجمالا

তোমরা ঘোড়াকে ভালবাস আর সে ভালবাসার প্রতি দৃঢ় থাক। কেননা ঘোড়া পোষাতে সম্মান, সৌন্দর্যতা রয়েছে।

اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها فاشركت العيالا

মানুষ বোঝা টানিয়ে ঘোড়াকে ধ্বংস করে দিল। তখন আমি এগুলোকে বেঁধে দাড় করিয়ে দিয়েছি। আর তাদেরকে আমি এভাবে সাবধান করেছি যেমন মালিক মালকে বাঁচিয়ে রাখে।

نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراق والحلالا

আমি একে প্রতিদিন ঘাস পানি দেই আর এদের মুখে আমি ঢাকনা পড়িয়ে দেই।

আল্লামা দামেরী (রহ.) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহর 'তারিখে নিশাপুরী'তে আবু জাফর হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-এর জীবনীতে দেখেছি, তিনি হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন– আল্লাহ তাআলা যখন ঘোড়া সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি দক্ষিণা বাতাসকে বললেন, আমি তোমার থেকে মাখলুক সৃষ্টি করব। সে মাখলুক আমার বন্ধুদের জন্য সম্মান-মর্যদা এবং দুশমনের জন্য অপমানকারী হবে। আর যে আমার অনুগত বান্দা হবে, তার জন্য বাধ্যগত হবে। বাতাস বলল, ওহে আমার প্রভু, আপনার যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বাতাসের মধ্য থেকে এক এক মুষ্টি বাতাস নিয়ে তা থেকে ঘোড়াকে সৃষ্টি করলেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা ঘোড়াকে বললেন, আমি তোমাকে আরবী বংশোদ্ভূত করে সৃষ্টি করেছি। আর কল্যাণকে তোমার কপালের পশমে গিড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। তোমার পৃষ্ঠে গণীমতের মাল নিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থাতে যাতায়াত করা হবে। তোমার প্রসস্ত রিজিকের জিম্মাদার আমি নিজে। ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল

অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে তোমাকে বেশী সহায়তা দেয় হবে। তোমার মালিককে তোমার উপর মেহেরবান করে দিব। তোমাকে ভ্রমণ ক্ষিপ্রতা দিয়েছি যে, তুমি ডানা ছাড়াই উড়তে পারবে। মানুষ তোমাকে দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করবে। শত্রুর সাথে যুদ্ধের জন্য তোমাকে ব্যবহার করবে। আর অচিরেই আমি তোমার পৃষ্ঠে এমন মানুষকে সওয়ার করাব, যারা আমার প্রশংসা করবে।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করবে ফেরেশতাগণ তা শুনে অনুরূপ শব্দাবলী দ্বারা তার জাবাব দিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাও বলেছেন, ফেরেশতাগণ যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করলেন হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রব আর আমরা আপনার সৃষ্ট ফেরেশতা, আমরা আপনার গুণগান করি, আমরাও আপনার কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করি। ফেরেশতাদের এ আবেদন শুনে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন ঘোড়া সৃষ্টি করলেন যেগুলোর গর্দান বড় উটের গর্দানের মত। এগুলোর সাহায্যে আল্লাহ তার নবী রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করবেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ঘোড়ার পা যখন জমীনে একত্রিত হল তখন আল্লাহ তাআলা ঘোড়াকে বললেন, আমি তোমার হেষ্রা আওয়াজের মাধ্যমে দুশমনকে অপদস্ত করে দিব। আর এ আওয়াজ দুশমনের কানে প্রবেশ করবে। এ আওয়াজ তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত করে ঘাড় নিচু করে দিব। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত চতুস্পদ জন্তুকে হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন (হে আদম) এখান থেকে তোমার যেগুলো ইচ্ছা পছন্দ কর।

হযরত আদম (আঃ) ঘোড়াকে পছন্দ করলেন। এতে আল্লাহ তাআলা বললেন হে আদম! তুমি তোমার সন্তানদের জন্য চিরকাল সম্মান ও মর্যাদা বেছে নিলে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে থাকবে মান-মর্যাদাও ততক্ষণ অটুট থাকবে। সব সময়ই থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য শব্দাবলীতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন ঘোড়া সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন দক্ষিণা বাতাসের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, তোমার থেকে একটি মাখলুক সৃষ্টি করব। তাই তুমি জমাট বেধে যাও। তখন বাতাস জমাট বেঁধে গেল। তারপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং এ জমাট বাঁধা বাতাস থেকে এক মুষ্টি বাতাস নিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বাতাসকে বললেন, এটাই আমার মুষ্টি। তারপর আল্লাহ তাআলা তা থেকে কালো মিশ্রিত লাল রঙের ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তোমাকে ঘোড়া বানিয়েছি এবং আরবী বংশোদ্ভূত বানিয়েছি। আর আমি তোমাকে সমস্ত চতুস্পদ জন্তুর উপর রিজিকের প্রশস্ততা

প্রদান করলাম। গনিমতের মাল তোমার পিঠে বহন করা হবে। আর কল্যাণ তোমার কপালের সঙ্গে জড়িত থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে যমীনে পাঠিয়ে দিলেন এবং সে হেষ্রা ধ্বনি দিল। এতে আল্লাহ তাআলা বললেন, হে চিত্রল ঘোড়া! তোমার হেষ্রা রবে দুশমনেরা ভয় পেয়ে যাবে। তাদের কান ভারী হবে, আর তাদের পা টলটলায়মান অবস্থা করে দিব। তারপর আল্লাহ তাআলা ঘোড়ার কপাল এবং পা সাদা করে দিলেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে বললেন, হে আদম! এ চতুস্পদ দুটির মধ্যে থেকে যেটা তোমার পছন্দ সেটা বেছে নাও। (অর্থাৎ ঘোড়া ও বোরাক)। বোরাক খচ্চারাকৃতির, এটা পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। তখন হযরত আদম (আঃ) বললেন হে জিব্রাইল (আঃ) আমি এ দুইটির মধ্যে সুন্দর চেহারাবিশিষ্টকে পছন্দ করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি তোমার সম্মান ও তোমার সন্তানদের সম্মান বেছে নিলে। সে ঘোড়া ততদিন মানুষের মধ্যে অবস্থান করবে যতদিন মানুষ পৃথিবীতে থাকবে। "শিফাউছ ছুদূর" নামক কিতাবে হযরত আলী (রাঃ) থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, এ সমস্ত ঘোড়ার লাগাম হবে ইয়াকুত ও মুক্তার তৈরি। এ ঘোড়া পায়খানা পেশাব করবে না। এদের বায়ু বন্ধ থাকবে। এদের দম হবে দৃষ্টি সীমার শেষ পর্যন্ত। এদের উপর সওয়ার হয়ে যতদূর ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করা যাবে। এদের উড়তে দেখে নিচের স্তরের লোকেরা বলবে– হে আমাদের প্রভু! তোমার এ বান্দাদের কোন কারণে এ নিয়ামত দান করেছ?

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারা রাত জাগত আর তোমরা শুয়ে আরাম করতে। তারা দিনের বেলা রোযা রাখত আর তোমরা পেট পুরে আহার করতে। তারা আমার সম্পদ ব্যয় করত আর তোমরা ছিলে কৃপণ। তারা জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করত আর তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করতে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত ঈর্ষাকারীদের অন্তরে সন্তুষ্টি সৃষ্টি করবেন। সুতরাং তারা তাদের প্রাপ্ত জিনিষ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের চক্ষু শীতল হয়ে যাবে।

ফায়েদা

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। এ কারণে ঘোড়াকে عراب বলা হয়। ইতিপূর্বে এটা অন্যান্য প্রাণীর মত অসভ্য প্রাণী ছিল। সুতারাং যে সময় আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)-কে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণের আদেশ করেন তখন এ কথাও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে এমন এক ধন-ভাণ্ডার দান করব, যা আমি বিশেষ করে তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। তারপর আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, বাহিরে যাও এবং এই

ধন-ভাণ্ডার অর্জনের জন্য প্রার্থনা কর। সুতারাং তিনি اجیاد (মক্কায় একটি পাহাড়ের নাম) পাহাড়ে গমন করলেন অথচ তিনি দুআর শব্দাবলি জানতেন না। তিনি এই ধন-ভান্ডার সম্পর্কেও জানতেন না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার প্রতি দুআর ইলহাম হল। হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন দুআ করলেন তখন আরব ভূ-খণ্ডের সমস্ত জংলী ঘোড়া তার সামনে এসে হাজির হয়ে গেল। এরা সবাই তার সম্মুখে আনুগত্য ঘার অবনত করে দিল। এরই ভিত্তিতে নবী করীম (সাঃ) তার সাহাবাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা ঘোড়ার উপর সওয়ার হও। কেননা ঘোড়া তোমাদের পৈত্রিক সম্পদ। ইমাম নাসাঈ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, সহধর্মিনীগণের পরে আমার নিকট ঘোড়ার চেয়ে আর কোন জিনিস প্রিয় নাই। (ইমাম দামেরী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ সত্য)।

ইমাম ছালাবী সনদে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ঘোড়াতেই এমন নাই যে, যাকে প্রত্যেহ সকালে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুআ করার অনুমতি দেয়া হয় না। ঘোড়া বলে, হে আল্লাহ! আদম সন্তান থেকে যাকে আপনি আমার মালিক বানিয়েছেন আর আমাকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তাহলে তার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন থেকে আমাকে তার কাছে বেশি প্রিয় করে দিন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, (উপকারের বিবেচনায়) ঘোড়া তিন প্রকার।

এমন ঘোড়া যা রহমানের (আল্লাহর) জন্য হয়। (২) এমন ঘোড়া যা মানুষের জন্য হয় (৩) এমন ঘোড়া যা শয়তানের জন্য হয়।

রহমানের জন্য ঘোড়া যা আল্লাহর রাস্তায় তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদর করে লালন-পালন করা হয়। মানুষের জন্য যেই ঘোড়া দূর-দূরান্তে গমন করে। আর শয়তানের জন্য সেই ঘোড়া যা ঘোড় দৌড়ে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ করানো হয়।

তুবকাত্তে ইবনে ছাদ–এ "কারীবুল মালিকী" থেকে একটি বর্ণনা আছে– নবী করীম (সাঃ) কে পরিত্র কুরআনের সেই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই আয়াতের মধ্যে যেই লোক উল্লিখিত সে কে?

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অর্থাৎ "যাহারা দিন রাত্র প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। অতঃপর তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তারা ভীত হবে না আর না তারা চিন্তিত হবে" ইহার উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে.

তারা হল اصحاب خيل (অর্থাৎ ঘোড়াওয়ালা) অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বলেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয়কারী এমন ব্যক্তির মত যার হাত সার্বক্ষনিক সদকা দেয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকে। কখনও বিরত হয় না। কিয়ামতের দিন এই সমস্ত ঘোড়ার বিষ্ঠা ও পেশাব থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বের থেকে থাকবে।

শাইখান হযরতে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) প্রথমে বিদা পর্যন্ত ছেড়ে দেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) সেই সমস্ত ঘোড়াকে দৌড় করালেন যেইগুলো সবল ছিল। এই ঘোড়াগুলোকে তিনি ছানিয়াতুল বিদা থেকে বনু যরীফ-এর মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ান। হযরত ওমর সেই দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। শাইখুল ইসলাম হাফেয জাহাবী طبقات الحفاظ এ তার মুর্শিদ শাইখ দিমিয়াত্বী থেকে সনদসহ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) তিনটি খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলাতে অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দেন নাই। (১) স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খেলা করা (হাসি ঠাট্টা করা) (২) ঘোড় দৌড় (৩) তীর খেলা।

ইমাম তিরমীজি দুর্বল সনদে বেহেশতবাসীগণের গুণ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক বেদুইন নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল যে, ঘোড়াকে আমি খুব ভালবাসি, তাহলে কি বেহেশতে আমাকে ঘোড়া দেয়া হবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি যদি বেহেশতে যেতে সক্ষম হও তাহলে তোমাকে ইয়াকুতের ঘোড়া প্রদান করা হবে। এই ঘোড়ায় আরোহণ করে বেহেশতের সেইখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়াতে পারবে। معجم ابن قانع নামক কিতাবে আব্দুর রহমান ইবনে ছায়াতাদুল আনসারী এই বেদুইনের নাম ছিল। দীনুরীও কিতাবুল মাজালিসাতে তার আলোচনা করেছেন। হযরত আদ্দি এই সনদ ضعيف হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বেহেশতী সাদা এবং উত্তম জাতের উটে আরোহণ করে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করতে যাবে। আর বেহেশতী উট এবং পাখি ব্যতিত আর কোন প্রাণী থাকবে না।

خيل السباق অর্থাৎ দৌড়ের ঘোড়া দশ প্রকার। এই দশ প্রকার ঘোড়া সম্পর্কে রাফেয়ী বর্ণনা করেছেন। এইগুলোর নাম হল-

(১) مجا (২) مصل (৩) تال (৪) بارع (৫) مرتاح (৬) حظى (৭) عاطف (৮) مومل (৯) سكيت (১০) فسكل.

নিম্নলিখিত কবিতায় এই সমস্ত ঘোড়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে-

محمة خيل السباق عشرة * فى الشرح دون الروضة المعتبرة وهى مجل ومصل تالى *
والبارح المرتاح بالتوالى ثم حظى عاطف مؤمل * ثم السكيت والاخير الفسكل

নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোড়াসমূহ এবং তাদের নাম

সুহাইলী (রহ.) التعريف والاعلام নামক কিতাবে নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোড়াসমূহের নাম এভাবে লিখেছেন—

(১) سكب : এ ঘোড়ার এ নাম এজন্য রাখা হয়েছিল যে, এ ঘোড়া পানির স্রোতের মত তীব্র গতিতে চলত আর سكب অর্থ গুলে লালাও হয়। (২) নবী করীম (সাঃ)-এর এক ঘোড়ার নাম مرتجز ছিল। ঘোড়াটির আওয়াজ খুব সুন্দর ছিল বিধায় এ ঘোড়ার নাম مرتجز রাখা হয়। (৩) নবী করীম (সাঃ)-এর অপর ঘোড়ার নাম ছিল لحيف;لحيف অর্থ বন্ধ করা এবং ঢেকে দেয়া। এ ঘোড়া তার ক্ষীপ্র গতির কারণে রাস্তা বন্ধ করে দিত। কেউ কেউ একে لخيف-ও বলত। (৪) ইমাম বোখারী (রহ.) তার جامع কিতাবে নবী করীম (সাঃ)-এর এক ঘোড়ার নাম لزاز বলেছেন। (৫) নবী করীম (সাঃ)-এর এক ঘোড়ার নাম ছিল (جلاوح) এ ভাবে তার এক ঘোড়ার নাম ছিল (فرس) নবী করীম (সাঃ) এক ঘোড়ার নাম ورد ছিল। এ ঘোড়াটি তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে দান করেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিহাদের সময় এ ঘোড়ায় আরোহণ করে যুদ্ধ করতেন। এ ঘোড়াটি খুব কম মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল।

ইলম–এর সম্মান

ইবনে আলছানী ও আবুল কাশেম তাবরাানী আব্বান ইবনে আবু আইয়াশ থেকে এবং মুস্তাগফিরী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণণা করেছেন : একবার খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিল ইউসুফকে পত্র লিখেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে দেখাশুনা করবেন, তার সাথে ভাল আচরণ করবেন, তার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন এবং তাকে হাদিয়া তোহফা দিবেন। অতএব হযরত আনাস বলেন, ওহে আবু হামজাহ! আমার ঘোটাটি আপনাকে দেখাতে ইচ্ছা করছি।

আমার ঘোড়াটি দেখে বললেল যে, ঘোড়াটি নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোড়ার সাথে কতটুকু মিল আছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার ঘোড়াটি এনে আমার

সম্মুখে দাঁড় করাল। আমি তার ঘোড়াটি দেখে বললাম جه نسبت خاک را بعالم پاک অর্থাৎ তার ঘোড়া এবং রাসূলে পাক (সাঃ)-এর ঘোড়ার মধ্যে আসমান যমীন ব্যবধান। নবী করীম (সাঃ)-এর ঘোড়ার ঘাস, পানি লেদা এবং পেশাব পর্যন্ত পুণ্যের কারণ ছিল। আর তোমার ঘোড়াটি শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ এবং নাম ফুটানোর জন্য পালন করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমর জবাব শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসূফ রাগে আগুন হয়ে গেল। সে বলতে লাগল আপনার বিষয়ে যদি খলীফার পত্র না থাকত তাহলে আপনার মুখে এমন এক আঘাত করতাম, যে আঘাতের চোটে আপনার চোখ দুটি বের হয়ে যেত। আমি বললাম, তুমি কোন দিনই এ কাজ করতে পারবে না।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলল, কেন পারব না? আমি বললাম, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এমন এক দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন যা পাঠ করলে না কোন বাদশাহ আর না কোন শয়তান এবং না কোন সিংস্র প্রাণীর ভয় থাকে। আমার কথা শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রাগ কিছুটা কমে গেল। সে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল এবং খোশ মেজাজে কথা বলতে লাগল। সে বলল, ওহে আবু হামজাহ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেখানো সেই দুআটা আমার পুত্র মুহাম্মাদ বিন হাজ্জাজকে শিখিয়ে দিন। আমি বললাম, তা কখনওই সম্ভব নয়। আমি বিদ্যাকে তার উপযুক্তদের মাঝেই বিতরণ করি। এতে হাজ্জাজ তার পুত্রকে বলল, তোমার চাচা হযরত আনাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে অনুরোধ করে দুআটি শিখে নিবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন হযরত আনাস (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তার খেদমতে হাজির হলে তিনি আমাকে বললেন, হে আবু আহমাদ! আজ আমার কাছে তোমার শেষ আগমন। তোমার সম্মান করা আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি তোমাকে সেই দুআ শিখিয়ে দিব, যা নবী করীম (সাঃ) আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি নিব যে, তা এমন ব্যক্তিকে শিখাবে না, যে আল্লাহকে ভয় পায় না। দুআটি এই :

الله اكبر الله اكبر بسم الله على نفسى ودينى بسم الله على اهلى ومالى بسم الله على كل شئ اعطانيه ربى بسم الله خير الا سماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الا رض ولا فى السماء وهو السميع العليم بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا اشرك به شيئا اسئالك الله بخرك من خيرك الذى لا يعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثماءك ولا اله غيرك واجعلنى

فى عبادك واحفظنى من شر كل ذى شر خلقته واحترز بك من الشيطان الرجيم . الله انى احترس بك من شر كل ذى شر واحترز بك منهم واقدم بين يدن يدى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ومن حلقى مثل ذلك وعن بمينى مثل ذلك وعن يسارى مثل ذلك ومن فوق مثل ذلك ومن تحتى مثل ذلك.

মাসয়ালা

শাইখুল হাদীস তকীউদ্দীন আছ ছাবকী (রহ.) বলেন : ঘোড়ার ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে। যেমন–

(১) আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন নাকি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন?

(২) প্রথমে পুরুষ ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন না স্ত্রী ঘোড়া?

(৩) প্রথমে আরবী ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন না অনারবী ঘোড়া?

উপরোক্ত নিতটি প্রশ্নের ব্যাপারে কোন হাদীস বা আছার দলীল হিসেবে আছে? অথবা ইতিহাস এবং সংবাদ মাধ্যমে?

উত্তর (১) : হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির প্রায় দুইদিন পূর্বে আল্লাহ তাআলা ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন।

(২) ঘোড়াকে ঘুটকীর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।

(৩) অনারবী ঘোড়ার পূর্বে আরবী ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে ঘোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে—এ কথার স্বপক্ষে আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদীস প্রমান হিসেবে পেশ করব। এ ছাড়া আকলী প্রমাণ দ্বারা দলীল পেশ করতে চাই। সর্বোপরি নিয়ম হল, কোন সম্মানী ব্যক্তি কারও নিকট আসার ইচ্ছা করলে অথবা সে আসলে, তার আগমনের পূর্বে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রির ব্যবস্থা করা হয়। তাই হযরত আদম (আঃ) দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে তার জন্যও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) ও তার সন্তানেরা দুনিয়াতে আসার পূর্বে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আগেই পাঠানো হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের দ্বারা দলীল দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে যত বস্তু আছে তা সবই তোমাদের মঙ্গলের জন্য দেয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল, আদম সন্ত ানদের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের সৌজন্য পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আর সম্মান ও মর্যাদা তখনই প্রমাণিত হয়, যখন সম্মানী ব্যক্তির যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রি প্রস্তুত থাকে। তাছাড়া মহান আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ) হিসেবে

সৃষ্টি করেছেন। তাই হযরত আদম (আঃ)-এর আগমন সমস্ত সৃষ্টির পরে হওয়া—যেমন আশরাফুল আম্বিয়া নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শুভাগমন সমস্ত নবী রাসূলগণের পরে হয়েছে।

তৃতীয় দলীল আকলী

এখন বুঝতে পারছেন যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মানের কারণে তাঁর পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণী, বৃক্ষরাজি, জড় বস্তু ইত্যাদি সবই এ সৃষ্টির শামিল। আবার এও তার জানা ছিল যে, উদ্ভিদ ও জড় বস্তু থেকে প্রাণীই উৎকৃষ্ট। আর প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ব্যতিত ঘোড়াই শ্রেষ্ঠ। তাই শ্রেষ্ঠ মেহমানের জন্য শ্রেষ্ঠ বস্তু তৈরি করে রাখা হয়। অতএব ঘোড়ার জন্ম হয় হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে।

আকলী ও নকলী দলীল যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত পেশ করা যায়; কিন্তু এখানে মাত্র চারটি দলীল পেশ করা হল।

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের কল্যাণের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সবই ভূ-পৃষ্ঠে বর্তমান আছে। এরপর আল্লাহ তাআলা আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। এরপর সুবিন্যস্তভাবে সাতটি আসমান তৈরি হয়ে গেল। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, জমিন সৃষ্টির পর আকাশ সৃষ্টি হল এবং যমীনে সমস্ত বস্তুর মধ্যে ঘোড়াও একটি। অতএব আকাশ সৃষ্টির পূর্বে ঘোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-কে আকাশ সৃষ্টির পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রমাণ হল আকাশ ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

হাদীসে বর্ণিত আছে, সৃষ্টির সবকিছু পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে জুমার দিন সৃষ্টি করেন। এতে বুঝা যায়, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি হয়েছিল। ছয় দিনের শেষ দিন জুমাবার সে সময়ও হয়। মাখলুকের সৃষ্টি শুরু হয় রবিবার থেকে।

মোটকথা, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সর্ব শেষে আর ঘোড়া সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে ছয় দিনের ভিতরেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ

يَا اٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ-

"আর আল্লাহ তায়ারা আদমকে সমস্ত বস্তুর সামগ্রিক নাম শিখালেন। তারপর সে-সমস্ত বস্তু সামগ্রিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও যাদি তোমারা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কিছুই জানি না; তবে আপনি যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছো (তা ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমত ওয়ালা। এরপর তিনি বলেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে এ সবের নাম তুমি বলে দাও। তারপর তিনি যখন সেসবের নাম বলে দিলেন, তখল আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, আমি আসমান যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করে জানি এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন রাখ।

(সূরা বাকারা : ৩১-৩৩)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দলিল এভাবে হয় যে, সমস্ত নাম দ্বারা প্রাণীর নাম উদ্দেশ্য। অথবা নামসমূহের গুণাবলী এবং এদের উপকারিতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি উভয় অবস্থায়ই নামের অস্তিত্ব সেসময় খুব প্রয়োজন ছিল। কেননা আল্লাহ তাআলা هؤلاء দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। যদি مشار اليه বর্তমান না থাকত, তাহলে هؤلاء দ্বারা ইঙ্গিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মোটামুটি ঘোড়ার নাম তাও সে-সময় মওজুদ থাকা প্রয়োজন ছিল। আর الاسماء দ্বারা যাবতীয় নাম উদ্দেশ্য। কেননা الف ও আছে আবার كلها দ্বারা এর তাকীদও এসেছে। তাই এতে সাধারণের অধিক সমর্থন অর্জিত হয়ে গেল। আর এভাবে عرضهم এবং باسمائهم অর্থাৎ এ সমস্ত বস্তু উপস্থাপন করা হল। আর আদম (আঃ) এ সমস্ত বস্তুর নাম বলে দিলেন। এ সমস্ত প্রমাণাদি অকাট্য দলীলসমূহের অন্তর্ভূক্ত। আর নাম ব্যাপক হওয়ায় ঘোড়াও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয় আয়াত :

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ-

তিনি আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে সমাহীন হয়েছেন।

উল্লেখিত আয়াতে বুঝা যায় যে, আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা ইতিপূর্বে তা

আলোচনা করেছি যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি উল্লেখিত ছয় দিনের বাইরে অর্থাৎ পরে সৃষ্টি হয়েছে অথবা ছয় দিনের শেষ দিকে সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ আয়াত :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ-

আর আমি আকাশ ও যমীনকে এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। আর আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নি।

এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এমনিভাবে সব মিলিয়ে এ চারটি আয়াত যেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, ঘোড়ার জন্ম প্রথমে হয়েছে। ওয়াহাব ইবেনে মুনাব্বেহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ঘোড়া যখন দক্ষিণা বাতাস থেকে সৃষ্টি করা হল তখন তাও আমাদের বক্তেব্যের বিরোধীতা নয়। আর আমাদের উপর এর সত্যতার অভিযোগ নেই। কেননা আমরা এটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছি যা আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন।

আর আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে এর জবাবসমূহ বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ঘোড়া পূর্বে হিংস্র প্রাণী ছিল। আর আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্য অনুগত করে দিয়েছিলেন। এ কথাও আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়। কেননা হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বেই এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত হিংস্র ছিল। অথবা কোন এক সময় এর উপর সওয়ারও হয়েছেন। এরপর পরবর্তীতে হিংস্র হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ সময় পরে আল্লাহ তাআলা একে অনুগত করে দিয়েছেন। এ কথাটি অতি প্রশিদ্ধ। তবে এর সনদ সত্য নয়। আর আমরা এর সত্যতার অনুগামী নই। কেননা উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে তাই বিশ্বাসযোগ্য যেহেতু তা কুরআনী দলীল।

প্রথমে এটাও আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষ ঘোড়াকে স্ত্রী ঘোড়ার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। তাই এর দুইটি কারণ রয়েছে, প্রথমে পুরুষ মহিলা থেকে সম্মানী বলে বিবেচিত। দ্বিতীয়ত পুরুষের রাগ বেশী। কেননা যদি দুটি বস্তু এক জাতীয় এবং একই প্রকৃতির হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে একটির রাগ অপরটির চেয়ে বেশি হওয়া স্বাভাবিক। আর আল্লাহর বিধান হল যার রাগ বেশি শক্তিশালী তাকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যেহেতু পুরুষের রাগ বেশী তাই এ কারণে উচিৎ ছিল এর (পুরুষের) অস্তিত্ব প্রথমে হওয়া আর এ কারণেই হযরত আদম (আঃ)-কে হাওয়া (আঃ)–এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে দেখা যায় এখানেও পুরুষকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার এ কারণেও যে, ঘোড়া সৃষ্টির সবচেয়ে উদ্দেশ্য হল জিহাদ, আর পুরুষ ঘোড়া স্ত্রী ঘোড়ার চেয়ে উত্তম। যেহেতু ঘোড়া বেশি শক্তিশালী ও বেশি দৌড়াতে পারে। আর ঘোটকীর চেয়ে বেশি নির্ভিক হয়। ঘোড়া তার আরোহীসহ ঘোটকীর তুলনায় বেশি সময়

যুদ্ধ করতে পারে। ঘোটকী ঘোড়ার তুলনায় সর্বদিকেই কম কাজ করতে পারে। তুর্কী ঘোড়ার পূর্বে আরবী ঘোড়াকে সৃষ্টি করার কারণে হত সেই ঘটনা বা সেই ঘোড়া বাবা হইত বা মা হত অথবা স্বয়ং সেই ঘোড়া জন্ম নিত। আরও একটি প্রমাণ হল, অতীত যুগে হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনায় কোথাও তুর্কী গোড়ার আলোচনা পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে তুর্কী ঘোড়া আরবী ঘোড়ারই বংশধর।

এ কারণে উলামায়ে কেরামগণ এর অংশের ব্যাপারে মতভেদ করে থাকেন। মুরসাল সনদে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, আরবী ঘোড়ার জন্য দুই অংশ আর তুর্কী ঘোড়ার জন্য এক অংশ। মোটকথা, তুর্কী ঘোড়া নিকৃষ্ট বংশের। আর প্রথমে নিকৃষ্ট বংশ সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার বিধান নেই।

নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের এবং মজবুত আছারে ঘোড়ার ফজিলত, ঘোড় দৌড়ের আলোচনা এবং তা লালন পালনের ফজিলত, এগুলোর বরকত, ঘোড়ার জন্য খরচ করার ফজিলত এবং এগুলোর খেদমত, এগুলোর কপালে মায়া মমতার সাথে হাত বুলানো। ভাল জাতের ঘোড়ার খোঁজ করা, ভাল জাতের ঘোড়া দেখায় প্রভুত হেদায়েত পাওয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, ঘোড়ার অণ্ডকোষ কর্তন করা যাবে না। ঘোড়া ও তার মালিকের জন্য কী পরিমাণ গণীমতের মাল নির্দিষ্ট এ ব্যাপারেও হাদীসে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার কারণে এখানে আমরা উক্ত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

ঘোড়ার শরয়ী হুকুম

ঘোড়ার গোশত খাওয়া যাবে কি যাবে না فرس শব্দে আলোচনা করা হবে। শরহে বেকায়া নামক কিতাবে আছে, ইসলামের দুশমনের নিকট ঘোড়া বিক্রি করা মাকরূহ। কারণ, ঘোড়া জিহাদের হাতিয়ার। যে কারণে ইসলামের শত্রুদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ একই কারণে ঘোড়া বিক্রি করা মাকরূহ। ঘোড়ার গলায় কণ্ঠাবরণ বসানোও মাকরূহ। নবী করীম (সাঃ) এমন করতে নিষেধ করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ বলেন, কণ্ঠাবরণের নিষেধাঙ্গা এ সন্দেহে হয়েছে যে, হতে পারে তীব্র বেগে দৌড়ের সময় এ কণ্ঠাবরণ গলার ঘন্টা হয়ে যেতে পারে। আবার তাও সম্ভব যে, নবী করীম (সাঃ) নির্ধারিত কণ্ঠাবরণের নিষেধ করেছেন। এ কণ্ঠাবরণ ব্যতিত অন্য কোন জিনিস ঘোড়ার গলায় যদি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরায় তাহলে নিষেধ না।

কোন কোন আলেম বলেন জাহেলী যুগে আরবদের এ অভ্যাস ছিল যে, কোন কোন ঝগড়ার অর্থদণ্ড হিসেবে ঘোড়ার উপরে চাপিয়ে যন্ত্রপাতি নেয়া হত, নবী করীম (সাঃ) তা নিষেধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগীতায় জিতার মিমাংসা হবে ঘোড়ার গর্দাণ আগে চলে

যাওয়া হিসেবে। তবে উটের দৌড়ে হার জিতের প্রশ্নে গর্দান আগে যাওয়ার উপর নির্ভর হবে না। কেননা দৌড়ের সময় গর্দাণ লম্বা করে রাখা উটের অভ্যাস। তবে এ ধরনের মিমাংসায় এটা প্রয়োজন য়ে, উভয় ঘোড়ার গর্দাণ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং ঘোড়ার দৈর্ঘ্য সমান হতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার ও কিয়ামতের মধ্যে এ রকম মিল যে, দুটি দৌড়ের ঘোড়া। এদের মধ্যে মিমাংসা করা যায় না যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি আগে গন্তব্যে যাবে।

মুস্তাদরাক, সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর বর্ননা মতে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুটি ঘোড়ার মাঝখানে ছেড়ে দেয় অথচ সে এমন কথা থেকে নিরাপদ নয় যে, সে আগে চলে যাবে, তাহলে এমন করা জুয়া বা বাজি হবে না। আর যে ব্যক্তি দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, তার বিশ্বাস ছিল সে আগে চলে যাবে। তাহলে এমন এমন ভাবা জুয়া খেলার সমতুল্য হবে। সঠিক কথা হল জিম্মিকে ঘোড়ায় সওয়ার থেকে নিষেধ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুশমনদের বিরুদ্ধে ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে আদেশ করেছেন। আর জিম্মি হল আল্লাহ পাকের দুশমন। তাছাড়া আরও একটি কারণ হল এদের কারণে যদি ঘোড়ার আরোহন করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে যেন এদেরকে সম্মান দেয়া হল।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে জিম্মি লোককে ঘোড়ায় আরোহণ করতে নিষেধ করা যাবে না। শেখ আবু মুহাম্মাদ জুয়ানী (রহ.)-এর কথা হল, তাহাদেরকে ভাল ঘোড়ায় আরোহণ করতে নিষেধ করা হবে। যেমন আরবী ঘোড়া এবং যুদ্ধবাজ ঘোড়ায় আরোহণ করতে নিষেধ করা হবে। যেমন, তুর্কী ঘোড়া। ইমাম গাযযালী (রহ.) বললেন ভাল ঘোড়ার মধ্যে খচ্চরও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উলামায়ে কেরামগণের নিকট ঘোড়ার উপর কোন যাকাত নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে–

ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة

(মুসলমানের জন্য দাস ও ঘোড়ার উপর যাকাত নেই।) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শুধু একাই ঘোড়ার উপর অথবা ঘোড়ার সাথে ঘোটকী থাকলেও তার উপর যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। এগুলোর মালিকের স্বাধীনতা রয়েছে যে, ঘোড়ার পক্ষ থেকে এক দিনার দিবে অথবা এর মূল্য ধরে যাকাত দিয়ে দিবে। আর মূল্য ধরলে এ হিসেবে দিবে যে, প্রতি ২০০ দিরহামে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে অর্থাৎ আড়াই ভাগ। আর যদি শুধু ঘোড়াই থাকে ঘোটকী না থাকে তাহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

ঘোড়া সম্পর্কে প্রবাদ

আরবগণ বলেন– الخيل ميامين অর্থাৎ ঘোড়া মোবারক।

এমনিভাবে তারা বলেন الخيل اعلم بفرسانها অর্থাৎ ঘোড়া তার আরোহীকে বেশি চিনে। উদাহরণটি এমন ব্যক্তির বেলায় বলা হয়, যাকে সম্পদশালী বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সম্পদশালী নহে।

নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী يا خيل الله اركبى অর্থাৎ হে আল্লাহর ঘোড়া! সওয়ার হয়ে যাও।) যে কথা তিনি হুনাইন যুদ্ধে বলেছিলেন। হাদীসখানা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ)-এর এই কথায় مضاف উহা মানতে হবে। কেননা ঘোড়া কি সওয়ার হবে? অথবা বলেছেন ঘোড়াও সওয়ার হবে অথবা বলেছেন ঘোড়া সওয়ার হয়। এই কারণে উল্লেখিত বক্তব্যে প্রকৃত সম্বোধিত ব্যক্তি ঘোড়সওয়ার। আর এভাবে মুযাফ উহা রাখা আরবী বাক-রীতিতে সাধারণ ব্যাপার।

কিন্তু জাহিয "কিতাবুল বয়ান ওয়াত তিবইয়ান" এ উল্লেখিত হাদীসে কলামে ভুলের কারণে একে হাদীস মানতেই অস্বীকার করছেন। সুতরাং জাহীয এর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল আরবী বাক রীতিতে এ ধরনের উদাহরণে (অর্থাৎ উহা মুযাফের উদাহরণ) পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথাও মনে আছে যে, নবী করীম (সাঃ) অনেক বড় বাকপটু এবং বাগ্মী এবং তাঁর বাণী অন্যের জন্য মাপকাঠি বা মানদন্ড হয়।

চিকিৎসায় ঘোড়ার উপকারিতা

ঘোড়াকে যদি লাল আলকাতরা খাওয়ানো হয় তাহলে ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। অবশিষ্ট আলোচনা فرس পরিচ্ছেদ الفاء-এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

স্বপ্নে ঘোড়া দেখার তাবীর

ঘোড়া স্বপ্নে দেখার অর্থ হল শক্তি-সামর্থ্য, মান-সম্মান এবং সৌন্দর্যের লক্ষণ। কেননা এটা সওয়ারীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সওয়ারী। এজন্য কেউ একে স্বপ্নে দেখলে সে রকমই মান-সম্মানের অধিকারী হবে। অধিকাংশ তাবীর ধন-সম্পদ বেশি হওয়া বুঝায়। রিজিকের প্রশস্ততা এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়াও বুঝায়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন–

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

ঘোড়াকে কেউ যতি বাতাসে উড়তে দেখে তাহলে এর তাবীর হবে ফিতনা। যদি ঘোড় সওয়ারী নিজেকে অন্যস্থানে দেখে যেমন অট্টালিকার ছাদ বা দেওয়ালের উপর নিজের ঘোড়ার উপর নিজেকে সওয়ারী অবস্থায় দেখে তাহলে এর তাবীর হবে, এতে কোন কল্যাণ নাই। কেউ যদি নিজেকে ডাকের ঘোড়ার উপর আরোহী অবস্থায় দেখে তাহলে এর তাবীর হবে অচিরেই সে মৃত্যুবরণ করবে।

কার্যকরী চিকিৎসা

ঘোড়া এবং অন্যান্য প্রাণীর পেটে পীড়া হলে এদের খোড়ায় নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখে দিলে উপকার পাওয়া যাবে।

بسم الله الرحمن الرحيم فاصبها احصار فيه نار فاحترقت عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك।

ঘোড়ার ছুরখী ও অন্যান্য প্রাণীর ছুরখী (এক প্রকার রোগ) হলে নিম্নের নকশা লিখে গলায় বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ রোগ ভাল হয়ে যাবে।

ولا طلهه هو هو هو رهست هر هر هر هر هر و هو هو هو هو هو ٨٨٨٨٨

امهاهيا لولوس رد روبر حفرب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

উপরের আমল দুটি পরীক্ষিত।

২৯৫. ام خنور (উম্মু খুন্নুর) বেজী

এর আলোচনা باب الضاد-এ আসবে ইনশাআল্লাহ।

باب الدال

পরিচ্ছেদ : দাল

২৯৬. الدابة (আদ্ দাব্বাহ) ভূ-পৃষ্ঠে বিবরচণকারী প্রাণী

الدابة (ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী)। যে সমস্ত প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করে তাদেরকে আরবীতে দাব্বাহ বল। কেউ কেউ পক্ষীকুলকে দাব্বাহ শব্দের অন্ত র্ভূক্ত হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন। তারা এ বাদ দেয়ার সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াতখানি উপস্থাপন করে থাকে।

وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم

অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী এমন কোন প্রাণী ও নিজ ডানায় উড়ন্ত এমন কোন পাখি নাই, যাদের তোমাদের মত জামাত বা সংঘবদ্ধ দল নাই।

কিন্তু উক্ত উদাহরণের খণ্ডন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা হয়–

ستودعها وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها وكل فى كتاب مبين

অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠে কোন দাব্বাহ তথা প্রাণী এমন নাই যাদের রিযিক আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারীতে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা পক্ষীকূলের রিযিকেরও জিম্মাদার, সুতরাং তারাও দাব্বাহ-এর ব্যাপকতার আওতায় এসে পড়েছে।

শায়খ তাজউদ্দীন ইবনে আতা বলেছেন, দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবন্ত সকল মাখলুক সৃষ্টিকূলের কাছে রিযিক পৌছাবার জিম্মাদার। এ জিম্মাদারী ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে দৈনিক মুমিন বান্দার অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা ও সংশয় সৃষ্টি হয় তা দূর হয়ে যায়। আর যদি কখনও ঘটনাক্রমে তাদের অন্তরে কোন সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের সৈন্যবাহিনী ঐ সংশয়ের উপর আক্রমন করে তাদের পরাজিত করে দয়ে।

اعشى আ'শা (আরবের একজন কবি) সে دبيب (ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী) শব্দটি একটি মাত্র পাখি বুঝানোর জন্য এভাবে ব্যবহার করেছেনে—

بنات كغصن البان تربح ان مشت + دبيب قطا البطحاء فى كل منهل

অর্থ : মেয়েরা চিকন ডালের মত, যখন তারা হাঁটাচলা করে তখন ঐ ডালে কম্পন সৃষ্টি হয়, আর কূপসমূহের উপর পাথুরে এলাকার কাতা প্রাণী অনূভূত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : আর কত প্রাণী এমন রয়েছে, যারা নিজেদের রিযিক উপার্জন করে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সবজ্ঞ।

অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হল যারা মুক, বধির এবং নির্বোধ।

ইবনে আতিয়া বলেছেন, এ আয়াতে উদ্দেশ্য হল কাফিরদের সীমালঙ্ঘনকারী দলকে বুঝানো। তারা আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্টতম প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। হীন থেকে হীনতর প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। কাফিরদেরকে দাব্বাহ তথা চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে এ কারণে তুলনা করা হয়েছে, যাতে তারা অন্যায় ও নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কুকুর, শূকর, হিংস্র প্রাণী তথা সাপ বিচ্ছু ইত্যাদিও তাদের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখ দিয়ে একজন মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন, মুসতারিহ তথা আরাম প্রাপক। মুসতারাহ মিনহু তথা নিজ থেকে আরাম দানকারী। সাহাবীগণ রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল মুসতারিহ ও মুসতারাহ মিনহু কী জিনিস? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়ায় পৌঁছে যায় তখন তাকে মুসতারিহ বলা হয় অর্থাৎ আরাম প্রাপক। আর যে পাপী, তার মৃত্যুর ফলে অন্যান্য মানুষ, শহর, গাছ-পালা ও চতুষ্পদ প্রাণী আরাম ও শান্তি পেয়ে থাকে। এ জন্য তাকে মুসতারাহ মিনহু তথা নিজের পক্ষ থেকে আরাম, শান্তি, স্বস্তি প্রদানকারী।

সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বির্ণত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী কোন প্রাণী এমন নাই যে, সে জুমার দিনি নিশ্চুপ হয়ে মনোযোগী হয় না এই ভয়ে যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে না যায়।

হুলিয়াতে আবু লুবাবা (রাঃ) যিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভূক্ত একজন সাহাবী, তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুমার দিন সকল দিনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত দিন। আর আল্লাহ তাআলার নিকটে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা থেকে এ দিন বেশী মর্যাদাপূর্ণ। কোন ফিরিশতা আসমান জমিন, পাহাড়, বাতাস এবং সমূদ্রে অবস্থানকারী এমন কেউ নেই যে, সে জুমার দিন এ ব্যাপারে ভীত হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে না যায়।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরলেন অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মাটিকে শনিবার সৃষ্টি করেছেন। মাটিতে পাহাড়সমূহ রবিবার স্থাপন করেছেন। গাছ-গাছালি সোমবার সৃষ্টি করেছেন, অপছন্দনীয় জিনিষসমূহকে মঙ্গলবার, নূর তথা আলো বুধবার সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে প্রাণীসমূহকে বৃস্পতিবার ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুক্রবার আছরের পর একত্রিত করে অবশেষে আসর ও মাগরিবের মাঝামাছি সময়ে সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করে ফেলেন। কোন কারণ ও মর্যাদা ছাড়াই যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করে নেন। নিজের প্রতিপালনের জ্ঞান দেয়ার জন্য যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে থাকেন। নিজের একত্ববাদের প্রমাণ দেয়ার জন্য যা ইচ্ছা করেন নির্বাচন করে নেন। অত্যাচারী ও অন্যায়কারীরা (কাফির) তার প্রতি যা কিছু সম্পৃক্ত করে থাকে, তিনি তা থেকে অনেক উর্ধে ও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

কামেলী ইবনে আসীরে লিখেছেন : পারস্যের বাদশাহ কিসরার সম্পদের মধ্যে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ঘোড়া ও ৩,০০০ (তিন হাজার) মহিলা ছিল।

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

তারীকে ইবনে খালকান তথা ইবনে খালকান নামক ইতিহাস গ্রন্থে রোকনউদ-দৌলা ইবনে বুইয়াহ – এর জীবনীতে লেখা হয়েছে যে, একবার তার কোন এক শত্রুর সাথে যুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষের এত বেশী খাদ্য সংকট দেখা যায় যে, তারা উভয়ে নিজ নিজ প্রাণী পশুগুলোকে খাওয়া শুরু করে দেয়। রোকন-উদ-দৌলাহর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, যদি যুদ্ধ বন্ধ করা হয়, তাহলে তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। সুতরাং নিজ উজির আবুল ফজল ইবনুল উমায়েদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, যুদ্ধ চলতে থাকবে নাকি বন্ধ করে দেয়া হবে। উজির উত্তর দিলেন যে, আপনার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। সুতরাং আপনি মুসলমানদের জন্য কল্যাণের নিয়ত রাখুন, ভাল ব্যবহার ও ইহসান করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষন করুন। এটা এজন্যে আবশ্যক যে, বিজয় অর্জনের সমস্ত কার্যক্রম যা একজন মানুষের হাতে ছিল তা সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই যদি আমরা যুদ্ধ জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে ফলাফল এই হবে যে, শত্রুরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আমারে হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। বাদশাহ উজিরের এই বক্তব্য শুনে বললেন, হে আবুল ফজল আমি তো এই সিদ্ধান্ত তোমার পূর্ব থেকে স্থির করে রেখেছি।

উজির আবুল ফজলের বক্তব্য, এরপর আমি রোকন-উদ-দৌলাহর নিকট থেকে উঠে আমার খিমায় এসে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু রাতের এক-তৃতীয়াংশে বাকি থাকতেই রোকন-উদ-দৌলাহ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে উপস্থিত হলে আমাকে বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, আর তাহল আমি যেন আমার ফিরোজ নামক ঘোড়ার আরোহী ছিলাম। আমাদের শত্রু পরাজিত হয়েছে। আর তুমি আমার পাশে চলাফেরা করছ। আমাদের এমন স্থান থেকে প্রাচুর্যতা আসছিল সেখান থেকে তা আসার ব্যাপারে আমাদের কোন ধারনা ও আন্দাজও ছিল না। চলতে চলতে আমি দৃষ্টি অবনত করে মাটির দিকে তাকালাম। একটি আংটি পড়ে থাকতে দেখলাম; সুতরাং তা তুলে নিলাম। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম এতে ফিরোজা পাথর লাগানো রয়েছে। আমি একে বরকতময় মনে করে আঙ্গুলে পরলাম। এরপর সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মতে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয়ী হব। কেননা ফিরোজা এবং বিজয় সামর্থক শব্দ আমার ঘোড়ার নামও ফিরোজ।

উজির আবুল ফজলের বর্ণনা, এর সামান্য কিছু সময় পরই আমাদের নিকটে সুসংবাদ পৌছাল যে, শত্রু বাহিনী পালিয়ে গিয়েছে। নিজেদের তাবু, খিমা, রসদপত্র সবকিছু রেখে গিয়েছে। এরপর যখন ধারাবাহিকভাবে এই খবর আসতে লাগল, তখন আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, শত্রুরা পরাজিত

হয়েছে। মোদ্দাকথা শত্রুদের পরাজয়ের কোন কারণ আমাদের জানা ছিল না। তাই আমরা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তবে খুবই সতর্ক ছিলাম এই ধারনায় যে, আমাদের সাথে কেউ প্রতারণা করল কিনা। আমি সতর্কতা বশতঃ বাদশাহর একপাশে চলে আসলাম। বাদশাহ নিজের ফিরোজ নামক ঘোড়ার উপর আরোহণ করেছিলেন। আমি একসময় বাদশাহর চেয়ে খানিকটা সামনে চলে গিয়েছিলাম। এমন সময় বাদশাহ রোকন উদ-দৌলা তার সম্মুখে চলমান এক ভৃত্যকে ডেকে চিৎকার করে বললেন, ঐ আংটিটি তুলে আমাকে দাও। সুতরাং ভৃত্য ঐ আংটিটি তুলে বাদশাহর হাতে দিল। ঐ আংটিতে একটি ফিরোজা পাথর ছিল। বাদশাহ রোকন উদ-দৌলাহ তৎক্ষনাৎ ঐ আংটিটি পড়ে নিলেন, আর বললেন, আমার স্বপ্নের তাবীর পূর্ণ হয়েছে। এটা হুবুহু সেই আংটি যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। রোকন উদ-দৌলাহর নাম হাসান আবু আলী ছিল। তিনি একজন প্রভাবশালী ও সুমহান বাদশাহ ছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক রাষ্ট্র তিনি জয় করে নিজ শাসনভূক্ত করেছিলেন। তার রাজ্যের শাসনের জন্য তিনি কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছিলেন। এই মহান বাদশাহ ৪৫ বছর দেশ শাসন করেছিলেন এবং ৩৬৬ হিঃ মুহাররম মাসে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে সাবা, আস সাবতির কিতাব শিফাউল সুদূরে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, চতুস্পদ প্রাণীর চেহারায় আঘাত করিও না, কেননা প্রত্যেক প্রাণী আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে।

এই কারিগরগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম কারিগর হল হযরত মিকাঈল (আঃ), যিনি আল্লাহ তাআলার ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী, সবশেষে রুটি তৈরীকারী বাবুর্চি। উদ্দেশ্য হল, আপনার সামনে যখন রান্না করা রুটি আসে উহাতে হযরত মিকাঈল (আঃ) থেকে শুরু করে রুটি বানানোর বাবুর্চি পর্যন্ত মোট ৩৬০ হাতের কারিগরী ঐ রুটির মধ্যে থাকে। এরপর তা আপনি খাওয়ার জন্য পান–

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

অর্থ : যদি তুমি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তাহলে গণনা করতে পারবে না।

একটি ঘটনা

ইমাম আহমাদ (রহ.) ও বায়হাকী (রহ.) মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক প্রাণী প্রকাশ হয়, যা মানুষদের ধ্বংস করে দিচ্ছিল। যে কেউ প্রাণীর নিকটবর্তী হত, সেই জীবন বিসর্জন দিয়ে দিত। একদিন এক অন্ধ ব্যক্তি আসল। সে লোকদের কাছে বলল, তোমাদের এই প্রাণীর ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না, আমি উটার ব্যবস্থা করছি। সুতরাং যখন অন্ধ ব্যক্তি ঐ প্রাণীর কাছে পৌঁছল প্রাণীটি ঐ অন্ধ লোকটির কোন ক্ষতি

করল না, বরং তার সম্মুখে অনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে মস্তক অবনত করে দিল। আর ঐ ব্যক্তি ঐ প্রাণীটিকে হত্যা করে ফেলল। লোকেরা তাকে বলল, আপনার বিষয়টা আশ্চর্যজনক। আমাদেরকে আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন। লোকটি বলল, আমি জীবনে কখনও কোন পাপ কাজ করি নাই। শুধুমাত্র একবার আমার চোখ ভুল করেছিল। এতে আমি তাকে এই শাস্তি দিয়েছি যে, তীরের সাহায্যে তা বের করে ফেলে দিয়েছি। আর এই কারণে এখন আমি অন্ধ হয়ে আছি।

ঈমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন, তাওবার এ পদ্ধতি বনী ইসরাঈলের অথবা আমাদের পূর্বেকার কোন নবীর শরীয়তে জায়েজ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যদি কোন পুরুষ বেগানা নারীর প্রতি ইচ্ছা পূর্বক দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার চক্ষু বের করে দেয়া কোনভাবেই জায়েজ নাই; বরং আন্ত রিকভাবে তাওবা করে নেয়াই যথেষ্ঠ হবে।

ইবনে খালকান রবিউল জায়রীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি একবার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে মিশরের কোন এক রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। হঠাৎ কোন এক বাড়ীর ছাদ থেকে কেউ ছাই ভর্তি একটি ঝুড়ি তার মাথার উপর উপুর করে ছাই ঢেলে দিল। তিনি নিজ বাহন থেকে অবতরণ করে কাপড় ঝাড়তে লাগলেন। লোকেরা তাকে বলল, আপনি এই ঘরের লোকদের ডেকে তিরস্কার করছেন না কেন? উত্তরে তিন বললেন, যেই ব্যক্তি আগুন তথা দোযখের উপযুক্ত, তার মস্তকের উপর ছাই পতিত হওয়ার কারণে যদি তার পিছনে তার পিছনে ছুটে যাই, তার উপর রাগ হওয়া জায়েজ হবে না।

রবি ইবনে সুলাইমান শাফেয়ী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের নতুন বক্তব্যগুলো অন্যতম বর্ণনাকারী। তিনি ২০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জায়যী এই কারণে বলা হত যে, তিনি জিয়যার অধিবাসী ছিলেন। জিয়যা কাহেরা থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রপাড়ের একটি বসতির নাম। এখানকার অট্টালিকাগুলো প্রসিদ্ধ। এইগুলোকে পৃথিবীর আশ্চর্যজনক জিনিষের মধ্যে গণ্য করা হয়। মূলত ইহা মিশরের বাদশাহদের কবরস্থান। আর উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন করবস্থান নির্মাণ করার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, যেমনিভাবে আমরা জীবদ্দশায় অন্যান্য বাদশাহদের ব্যতিক্রম ছিলাম, তেমনি মৃত্যুর পরও যেন আমাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বহাল থাকে। কথিত আছে যে, আব্বাসীয় খলীফা মামুনর রশিদ যখন মিশর পৌঁছলেন তখন তিনি সেখানকার একটি পিরামিড ভাঙ্গার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তার ভিতরের অবস্থা অবহিত হতে পারেন। সুতরাং তা ভাঙ্গতে সীমাহিন কষ্ট পরিশ্রম করতে হয় এবং যথেষ্ট পরিমান অর্থ ব্যয় হয়। এভাবে ভাঙ্গার পর যখন তার মধ্যে প্রবেশ করা হল, তখন উহার ভিতরে কতিপয় অর্থহীন জিনিসপত্র–যেমন ঘোড়ার লাগাম, জিনের রশি ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। উহার ভিতরকার মাটিতে এত বেশি কাদা পানি ইত্যাদি জমে রয়েছে

যে, তার উপর দিয়া চলাফেরা করা দুস্কর। সেই অট্টালিকার উপরের অংশে একটি চতুস্কোণ বিশিষ্ট কামরা ছিল। যার প্রত্যেক পার্শ্বের দেয়ালের উচ্চতা ছিল আট হাত। তার মধ্যখানে একটি হাউজ ছিল। সবকিছু দেখবার পর মামুনর রশিদ অবশিষ্ট পিরামিডগুলো ভাঙ্গতে নিশেধ করে দেন। আরও কথিত আছে যে, প্রথম হুমায়ুন অর্থাৎ উখনু, (ইনি ইদ্রিস আঃ) নক্ষত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এক প্রলয়ংকারী তুফানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিনে। ঐ তুফান থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে এই পিরামিডগুলো তৈরী করা হয়েছিল। ঐ পিরামিডগুলো তৈরীতে ছয় মাস সময় লেগেছিল। পিরামিডের গায়ে এই বাক্যগুলো খোদিত ছিল–

"যে ব্যক্তি আমাদের পরে আসবে, তাকে বলে দেয়া হবে যে, এ পিরামিডগুলো ধ্বংস করতে ছয় মাস লাগবে। অথচ বিল্ডিং বা অট্টালিকা ভেঙ্গে ফেলা নির্মাণ করার চেয়ে অধিক সহজ। আমরা এ গুলোকে রেশমে পোশক পরিয়েছি। যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে যেন কাপড়ের পোশাক পরিধান করিয়ে দেয়। অথচ মোটা কাপড় রেশমের চেয়ে নিম্নমানের।"

ইমাম আবুল ফজল ইবনে জাওবী স্বীয় কিতাব 'সালওয়াতুল আহযাবে' লিখেছেন : ঐ পিরামিডগুলোর একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হল, প্রত্যেক পিরামিডের উচ্চতা চারশত গজ। ঐগুলোর নির্মাণ রিখান ও মর্মর পাথরের। ঐ পাথরের গায়ে মিম্নোক্ত বাক্যগুলো খোদিত আছে–

"আমি এই অট্টালিকাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে বানিয়েছি। যদি কোন ব্যক্তি শক্তির দাবিদার হয় তাহলে এই গুলোকে ভেঙ্গে ফেলে, কেননা ভেঙ্গে ফেলা নির্মাণের চেয়ে সহজ।"

ইবনুল মুনাদী বলেছেন, আমার এই বাক্যগুলোর এই অর্থ বুঝে এসেছে যে, যদি কেউ সমগ্র পৃথিবীর খেরাজ তথা ফসলী জমির রাজস্ব বারবার সংগ্রহ করে তা এইগুলো ভাঙ্গার কাজে ব্যয় করে, তথাপি এইগুলো ভাঙ্গতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনের সূরা বুরুজের যে আয়াত আছে—

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔

অর্থ : গর্তের লোকেরা অর্থাৎ অনেক জ্বালানি বিশিষ্ট আগুন প্রজ্বলনকারী অভিশপ্ত যখন তার আগুনের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। আর মুসলমানদের সাথে জুলুম-অত্যাচার যাই করা হচ্ছিল তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখক রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদিস বর্ননা করেছেন, যা মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এই হাদীসটি হযরত সুহাইব (আঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূল

(সাঃ) বলেছেন, একজন বাদশাহ ছিল। তার নিকট একজন গণক অন্য বর্ণনা মতে একজন যাদুকর ছিল। একবার বাদশাহ বলল, যেহেতু আমি হয়ে গিয়েছি, যেকোন সময় মৃত্যুবরণ করতে পারি। আমার আশংকা হচ্ছে, যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমার জ্ঞান আপনাদের আর কোন কাজে আসবে না। সেহেতু আপনি খুবই মেধাবী ও প্রচুর ধীশক্তিসম্পন্ন একটি ছেলে দিন, যাতে আমি তাকে আমার এই জ্ঞানসমূহ শিখিয়ে দিতাম। বাদশাহ তার আগ্রহ অনুযায়ী একটি ছেলে অনুসন্ধান করে দিলেন। আর তাকে নির্দেশ দিলন, সে যেন শাহী যাদুকরের নিকটে এসে যাদু শিক্ষা করে লয়। তাই ছেলেটি বাদশাহর নির্দেশে যাদুকরের নিকট আশা-যাওয়া করত সেই রাস্তার মধ্যে একস্থানে এক রাহেবের খানকা ছিল। (মা'মার বলেছেন, আমার ধারনা খ্রিষ্টানরা ঐ সময় পর্যন্ত সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং ঐ রাহেবও সেই সময় পর্যন্ত সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল)। ছেলেটি ঐ যাদুকরের নিকটে যাওয়া আসার পথে ঐ রাহেবের নিকটও কিছু সময় অবস্থান করত। তার সাথে কথাবার্তা বলত। ফলে তার যাদুকরের নিকট পৌছিতে একটু দেরী হয়ে যেত। এতে যাদুকর ছেলেটির পিতামাতার নিকটে অভিযোগ করল যে, তোমাদের ছেলে আমার কাছে আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ছেলেটি যাদুকরের এই অভিযোগের কথা রাহেবকেও জানাল। তখন রাহেব তাকে একটি কৌশল শিখিয়ে দিলেন যে, যখন তুমি যাদুকরকে ভয় পাচ্ছ, তখন তুমি যাদুকরের কাছে পৌছতে দেরি হলে বলবে, আমার ঘরের লোকেরা আমাকে রওয়ানা থেকে দেরি করিয়েছে। আবার যখন তোমার ঘরের লোকেরা তোমার ঘরে ফিরতে দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তখন বলবে আমাকে যাদুকর দেরি করে ছেড়েছে। ছেলেটি কিছুদিন এমন করে চলতে লাগল।

একবার ছেলেটি ফিরে আসছিল, পথিমধ্যে একটি বিশাল জানোয়ার কোথা থেকে এসেছে , ফলে লোকজনের রাস্তায় চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি এই দৃশ্য দেখে মনে মনে চিন্তা করল যে, অদ্য যাদুকর ও রাহেবের রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে যে, যাদুকর সঠিক না রাহেব সঠিক। অতঃপর সে একটি প্রস্তুর তুলে নিল, আর বলল, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট রাহেবের আমল যাদুকরের আমল থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে জানোয়ারটিকে ধ্বংস করে দাও। এই দুআ করে প্রস্তুর খণ্ডটি ছুড়ে মারল। আল্লাহর কুদরত প্রস্তুর খণ্ডটি ঐ জানোয়ারের গায়ে লাগা মাত্রই জানোয়ারটি মারা গলে। এই ঘটনা দেখে লোকজন পরস্পর বলতে লাগল, এই ছেলেটি এমন কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে যা অন্য কার নাই।

ঘটনাক্রমে বাদশাহর একজন সভাসদ অন্ধ ছিল। যখন সে এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল, তখন সে এই ছেলেটির নিকট এসে বলল, যদি তুমি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এনে দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে এত এত

পুরস্কার দিব। ছেলেটি উত্তরে বলল, পুরস্কারের কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শর্ত হল যদি আপনি ভাল হয়ে যান (অর্থাৎ আপনার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে) তাহলে ঐ পবিত্র সত্তা যার নির্দেশে আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন, তার উপর ঈমান আনবেন কি? অন্ধ রোকটি ঐ শর্ত মেনে নিল। আর বলল, নিশ্চয় আমি এমনই করব। এরপর ছেলেটি আল্লাহ তাআলার লোকটির জন্য দুআ করল। দুআ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অন্ধ লোকটি ভাল হয়ে গেল। আর ঐ লোকটি সত্য ধর্ম কবুল করে নিল। এরপর ঐ ব্যক্তি নিয়ম অনুযায়ী বাদশাহর দরবারে বসে পড়ল। বাদশাহ তাকে দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঐ দৃষ্টি শক্তি কে এনে দিল? সে উত্তরে বলল, আমার রব, বাদশাহ অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি ব্যতিত তোমার আরও কোন রব আছে? লোকটি উত্তর করল, আমার ও আপনার রব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এই উত্তর শুনে বাদশাহ একটি তলোয়ার আনালেন, আর তার মাথায় একটি কোপ দিয়ে তাকে দুই টুকরো করে ফেললেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ জানোয়ারটি বাঘ ছিল। ছেলেটি যখন রাহেবকে বাঘকে ঘিরে তার সাথে যা কিছু ঘটেছে তা অবহিত করল, তখন রাহেব তাকে বললেন, তোমার একটি বিশেষ অবস্থান তৈরী হয়েছে। এ কারণে তোমাকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সাবধান! কারও নিকটে আমার সম্পর্কে আলোচনা করবে না।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন বাদশাহ ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাদের ডেকে নিলেন। রাহেব ও অন্ধ ব্যক্তিকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করে ফেলনে। আর ঐ ছেলেটির ব্যাপারে বললেন যে, তাকে অমুক পাহাড়ের উপর থেকে উপুড় করে ফেলে দাও। সুতরাং বাদশাহর লোকজন যখন ছেলেটিকে পাহাড়ের উপর নিয়ে গেল এবং তাকে ফেলে দিতে ইচ্ছা করল, তখন ছেলেটি এই দুআ করলে যে, হে আল্লাহ! আপসি যেভাবে ইচ্ছা করেন, সেইভাবে তাদেরকে আমার নিকট থেকে দূর করে দিন। এই দুআ করার সাথে সাথেই তারা কাঁপিতে কাঁপিতে পাহাড়ের উর থেকে পড়ে গেল। শুধুমাত্র ছেলেটি একা সেখানে থেকে গেল। এরপর ছেলেটি একাকী ফিরে বাদশাহর নিকটে পৌছল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল আমার লোকেরা কোথায়? ছেলেটি উত্তরে বলল, আল্লাহ তাআলা আমার পথ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। এরপর বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। নির্দেশ অনুযায়ী তার লোকেরা ছেলেটিকে নিয়ে সমুদ্রের নিকটে পৌছে তাকে সমুদ্রে ফেলার জন্য ধাক্কা দিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছেলেটির পরিবর্তে ঐ লোকগুলোকেই সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন। আর ঐ ছেলেটি পানির উপর দিয়ে হেঁটে সম্পূর্ণ নিরাপদে সমুদ্রে থেকে বের হয়ে আসল

এবং বাদশাহ নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। বাদশাহ ছেলেটিকে দেখে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে ছেলেটি নিজেই বাদশাহকে সম্বোধন করে বলল, বাস্তবিকই আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চাইছেন? বাদশাহ ইতিবাচক উত্তর দিলেন। এরপর ছেলেটি বলল আপনি আমাকে কখনই হত্যা করতে পারবেন না। অবশ্য যদি আমাকে হত্যা করতেই হয়, তাহলে তার পদ্ধতি হল এই যে, আমাকে একটি তক্তার সাথে বেঁধে একটি তীর এই বলে আমার দিকে ছুড়তে হবে যে, بسم الله رب هذا الغلام (বিস্‌মিল্লাহি রাব্বি হাযাল গুলাম) কিন্তু মরার পূর্বে সমস্ত মানুষ ময়দানে একত্রিত করতে হবে। সুতরাং বাদশাহ ছেলেটির কথা অনুযায়ী সমস্ত মানুষ ময়দানে একত্রিত করলেন। এরপর ছেলেটির তূণির থেকে একটি তীর নিয়ে ঐ বাক্য বলে তীর মারল। তীরটি সরাসরি কান ও মাথার মাঝখানে বিদ্ধ হল। ছেলেটি শহীদ হওয়ার সময় নিজের হাত কান ও মাথার মাঝখানে রেখেছিল।

এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করে সকল মানুষ সমস্বরে বরে উঠল আমরা এই ছেলেটির রবেব উপর ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা বাদশাহকে বলল, প্রথমে তো আপনি তিনজন মানুষ মুসলমান হওয়াতে ঘাবড়াইয়া গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সমস্ত দেশের মানুষ মুসলমান হয়ে গেল এবং আপনার বিরোধী হয়ে গেল। এখন আপনি কি করবেন? এই কথা শ্রবণ করে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন যে, উখদুদ তথা গর্ত খনন করা হউক। আর এতে আগুন ও কাঠ দ্বারা ভরে দেয়া হোক। এরপর ঐ সমস্ত লোককে এতে ফেলে দেয়া হোক। সুতরাং এমনই করা হল। যেই ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করল না তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হল।

ইমাম মুসলিম নিজ বর্ণনার মধ্যে আরও কিছু সংযোজন করেছেন যে, যখন গর্ত খনন করে এতে আগুন জ্বেলে মুসলমানদের সেখানে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন বাদশাহর সেনাবাহিনী এক মহিলাকে আগুনে ফেলার জন্য ধরে আনল। তার ক্রোড়ে দুধপানকারী এক বাচ্চা ছিল। তাই বাচ্চার কারণে মহিলা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। মায়ের এই অবস্থা দেখে ঐ দুধপানকারী বাচ্চা বলে উঠল, আম্মাজান! বিচলিত হবেন না। কেননা আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইবনে কুতাইবা বলেন, ঐ বাচ্চার বয়স মাত্র সাত মাস হয়েছিল।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন যে, ঐ ছেলেটি–যাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল (যাকে বাদশাহ একটি তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করেছিলেন) হযরত ওমর (রাঃ)-এর ফিলাফতকালে কবর থেকে বের হয়ে পড়েছিল। আর তার তাহ নিয়মমাফিক তার কান ও মাথার মাঝখানে রাখা ছিল।

সীরাতের লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, ঐ ছেলেটির নাম আব্দুল্লাহ ইবনে তামির।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নাজরানের জৈনক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে একটি বিরান পরিত্যক্ত জমি খনন করল। সেখান থেকে একটি ছেলের লাশ বের হল। যা একটি দেওয়ালের নিচে পোতা ছিল। ছেলেটির হাত তীর লাগার স্থান কান মাথার মাঝখানে ছিল। তার আঙ্গুলে একটি আংটি ছিল, যাতে লিখা ছিল 'আমার রব আল্লাহ'। এ কথা যখন ওমর (রাঃ) লিখিতভাবে জানান হল। তখন তিনি লিখে পাঠালেন যে, লাশটি যেভাবে আছে সেভাবে দাফন করে দাও। সুতরাং তাই করা হল। সুহাইলী (রহ.) বলেছেন, লাশটি তার আসল অবস্থায় দাফন করে দিবার সমর্থন নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়—

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا-

অর্থ : যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাকে মৃত বল না।

এটা ছাড়া রাসূল (সাঃ)-এর একটি হাদীস থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। আর তাহল–

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء-

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন নবীগণের শরীর খেয়ে ফেলাকে। এই হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আবু জাফর আদ-দাওয়াদীও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনার মধ্যে শহীদ, আলেম ও মুয়াজ্জিনগণ অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। ইবনে বাশকাল (রহ.)-এর বক্তব্য, যেই বাদশাহর শাসনামলে গর্তে আগুন প্রজ্জলনের ঘটনা ঘটেছিল, সেই বাদশাহর নাম হল ইউসুফ ওয়া আনওয়াস, সে হিলইয়ার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন। নাজরান তার শাসনাধীন ছিল। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ঐ বাদশাহর নাম যারআহ আনওয়াস ছিল। আল্লামা সমরকন্দী (রহ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নুবয়াত প্রাপ্তির ৭০ (সত্তর) বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। এর এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট রাহেবের নাম 'কিতমুন' ছিল।

যখন আবু মুসা, আবু মালেক ও আবু আমের আশআরীদের একটি দলের সাথে হিজরত করে রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন পথিমধ্যেই তাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন তারা নিজেদের একজন দূতকে খাদ্য আনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পাঠালেন। যখন ঐ দূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত করিতেছেন শুনতে পেল–

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها-

অর্থ : "(ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের যিম্মাদারী আল্লাহর দায়িত্বে নহে।" এই আয়াত শ্রবণ করে দূত মনে মনে চিন্তা করল, আশআরীরা

আল্লাহ তাআলার নিকটে চতুস্পদ প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট নহে। সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে না গিয়ে ফিরে গেল এবং নিজ সাথীদের নিকটে গিয়ে বলল, তোমরা খুশি হয়ে যাও। তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। তারা তারা মনে করল, দূত আমাদের অবস্থার সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করে এসেছেন। তারা ঐ অবস্থাতেই ছিল। এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত ও রুটি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে তাদের নিকট আসল। সুতরাং তারা ঐ লোক দুইজনের নিকট থেকে খাবার নিয়ে যতদূর খাওয়া সম্ভব খুব তৃপ্তিসহকারে খেলেন। অতপর একে অপরকে বলতে লাগলেন অবশিষ্ট খাবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌছিয়ে দাও। সুতরাং তারা তা পাঠিয়ে দিলেন। পরে তারা নিজেরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য যে খাদ্য-সামগ্রী পাঠিয়েছেন, ইহার অধিক সুস্বাদু খাবার ও অধিক পরিমান খাবার আমরা কখনও দেখি নাই। তারা নিবেদন করল যে, আমরা আমাদের এই সফর সঙ্গীকে আপনার নিকট খাদ্য নেয়ার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করেছিলাম। এই কথা শুনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিকটে এর সত্যতা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঐ লোকটি বিস্তারিত ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা শুনে বললেন, এই খাবার সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ছিল। যা তিনি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইবনুস সুন্নী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমাদের কার কোন পশু ছুটে জঙ্গলে অথবা ময়দানে চলে যায়, তাহলে সে জঙ্গলে অথবা ময়দানে পৌছিয়া এইভাবে চিৎকার করে ডাকবে– يا عباد الله احبسوا (হে আল্লাহর বান্দা! থামাও)। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার কোন না কোন বাধাদানকারী বান্দা তথা ফেরেশতা তাকে বাধা দিবে বা থামাবে।

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন যে, আমার নিকটে আমার জৈনক প্রাজ্ঞ জ্ঞানী শায়খ বর্ণনা করেছেন যে, তার কোন এক প্রাণী (খুব সম্ভব খচ্চর) কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি এই দুআ করলেন يا عباد الله احبسوا "হে আল্লাহর বান্দা! আবদ্ধ কর।" ফলে ঐ প্রাণী আল্লাহর হুকুমে থেমে গিয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন, আমি একবার কোন কাফেলার সাথে সফর করছিলাম। হঠাৎ ঐ কাফেলার এক সদস্যের একটি প্রাণী কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল। লোকেরা উহা তালাশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তথাপি সেই প্রাণীর নাগাল পায় নাই। এরপর আমি দাড়িয়ে উক্ত দুআ পাঠ করলাম। কিছুক্ষণ পর

ঐ প্রাণী নিজেই নিজ স্থানে এসে দাঁড়িয়ে রইল। ঐ প্রাণীটি ফিরে আসার কারণ ঐ দুআ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ইবনুস সুন্নী (রহ.) ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইউনুস ইবনে উবাইদ ইবনে দীনার মিশরী তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রাণীর উপর আরোহণ করে থাকে যা থামতেছে না। এমতাবস্থায় তার উচিৎ হল উহার কানে নিম্নোক্ত আয়াতখানি পাঠ করবে–

افغير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون

ইনশাআল্লাহ উহা থেমে যাবে।

باء পরিচ্ছেদ بغله শব্দের আওতায় গিয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় খচ্চরের কানে قل اعوذ برب الفلق পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা ঐ খচ্চরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহন করার পর কিছুটা নড়াচড়া করেছিলেন।

হাম্বলী মাযহাবের কিতাবসমূহে লিখিত আছে যে, কোন প্রাণীকে এমন কাজে ব্যবহার করা যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয় নাই, উহা জায়েজ নহে। যেমন গাভী বোঝা বহনের কাজে অথবা মানুষ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা এবং উট-গাধার দ্বারা চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি, মুসলিমের- "জৈনিক ব্যক্তি একটি গাভী তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সেই লোকটি ঐ গাভীর উপর আরোহন করার ইচ্ছা করল, তখন গাভীটি বলল, আমাকে মানুষ পরিবহনের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এর মাধ্যমে এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, গাভীর সবচেয়ে বড় উপকার হল, তার দুধ। তবে এই দুগ্ধ প্রদান গাভী থেকে অন্য কোন উপকার লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নহে। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে গালি দেয়, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহনীয় হবে না। যেমনটি এই হাদীসে এসেছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, অধিক পরিমাণে অভিসম্পাতকারীরা কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী পাবে না। তাদের সাক্ষীও গ্রহণীয় হবে না।

মাসয়ালা

প্রাণীর মালিকের উপর ওয়াজিব হল তাকে চারণ ভূমিতে চড়িয়ে ও তৃপ্তি সহকারে খাদ্য-পানীয় প্রহণের ব্যবস্থা করা। কেননা উহার জীবনের সংরক্ষণ আবশ্যক। সুতরাং সহীহ হাদীসে এসেছে যে, এক মহিলা একটি বিড়াল আবদ্ধ করে রেখেছিল। তাকে আবদ্ধ করে ক্ষুদার্ত রাখার কারণে শাস্তি ভোগ করেছিল। তাই এই পর্যায়ে প্রাণী ভৃত্যের সমতুল্য হয়ে গিয়েছে।

যদি পশু মাঠে ময়দানে চড়াবার সুযোগ না হয়, তাহলে ঘরেই তার এই পরিমান খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যে, পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারেভ। তৃপ্তির শেষ পর্যায়ে পৌছানো উদ্দেশ্য নহে। আর যদি উহাকে মাঠে ময়দানের ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে পশুগুলো খেয়ে পেট পূর্ণ করা ও পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করা পর্যন্ত মাঠে ছেড়ে রাখতে হবে। তবে পশু মাঠে ময়দানে চড়াবার ক্ষেত্রে শর্ত হল, ঐ মাঠে-ময়দানের বা জঙ্গলে প্রাণী না থাকা এবং পান করার জন্য পানির ব্যবস্থা থাকা। যদি উভয় ব্যবস্থাই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ময়দানে বা জঙ্গলে পশু চড়াবার সময়ও রয়েছে এবং ঘরেও পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয় মজুদ রয়েছে; এমতাবস্থায় যে পদ্ধতি আবশ্যক হয়ে থাকে অর্থাৎ ময়দানে বা জঙ্গলে চরানো এবং ঘরে খাওয়ার দরকার হয়, তাহলে উভয় ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যদি পশু পিপাসিত হয়, আর পশুর মালিকের নিকটে সামান্য পরিমাণ পানি থাকে, আর তার পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যদি সে অযু করে নয় তাহলে পশু পিপাসিত থাকবে, এমতাবস্থায় পশুকে পানি পান করবে। আর নিজে তায়াম্মুম করে নিবে।

যদি পশুর মালিক পশুটিকে খাবার প্রদান না করে তাহলে পশুকে খাবার দেয়ার জন্য তাকে চাপ দিতে হবে। হয়তো পশুটি বিক্রি করে দাও, নতুবা পশুটিকে খাদ্য প্রদান কর। কেননা পশুকে মৃত্যুবরণ করা থেকে বাঁচানো আবশ্যক। আর যদি সে তা না করে তাহলে বিচারকের অধিকার থাকবে যে, যা তিনি ভাল মনে করেন তাই করবেন। যদি ঐ মালিকের কোন সম্পদ থাকে তাহলে উহা বিক্রয় করে দেয়া হবে। নুতবা বায়তুল মাল থেকে পশুটির খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফায়েদা

মুস্তাহাব হল পশুর উপর আরোহন করার সময় ঐ দুআটি পাঠ করে নেয়া, যা হাকেম ও তিরমিযী (রহ.) আলী ইবনে রাবীরা থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে রাবীরা বলেছেন যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তখন তার আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হল। যখন তিনি পশুর উপর আরোহণের উদ্দেশ্য রিকাব তথা পাদানীতে পা রাখলেন, তখন তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করলেন। অতঃপর যখন তিনি পশুটির পিঠে বসলেন তখন তিনি আলহামদু লিল্লাহ্ বললেন। তারপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন–

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون

এরপর তিনি তিন তিন বার আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বললেন। অবশেষে এই দুআ করলেন–

سبحانك اللهم انى ظلمت نفسى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت

এরপর তিনি হেসে উঠলেন, উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আমীরুল মুমিমীন! আপনি হেসে উঠলেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতে দেখছিলাম। আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্ন করেছিলাম, যা তোমরা করলে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকটে ঐ বান্দা প্রিয় যে বলে– رب اغفر لى ذنوبى এবং সাথে সাথে আরও বলে ولا يغفر الذنوب الا انت কেননা এই বাক্যটি বলার মাধ্যমে বান্দার এই কথার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। আবুল কাশেস তিবরানী কিতাবুল দাওয়াত-এ আতা থেকে, তিন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেই ব্যক্তি ঘোড়া ইত্যাদির উপর করার সময় আল্লাহর নাম না নিয়ে অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ পড়বে না, তার পিছেনে শয়তান আরোহন করে থাকে। আর তাকে বলে 'গাও।' যদি সে ভাল গান গাইতে না পারে তবে আরোহীন অন্তরে বিভিন্ন ধরনের অলীক কল্পনা তৈরি করে দিয়ে থাকে। উক্ত কিতাবে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি পশুর উপর আরোহন করার সময় এই দুআ পরে নয় যে–

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيئ سبحانه ليس له اسى سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام۔

তখন পশুটি বলতে থাকে যে, হে মু'মীন বান্দা! আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তুমি আমার পিঠের বোঝা হালকা করে দিয়েছ। তুমি স্বীয় প্রভুর আনুগত্য করেছ এবং নিজের জন্যও কল্যাণ করেছ। আল্লাহ তাআলা তোমার সফরে বরকত দান করুন এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পশুর ত্যাড়ামীর ক্ষেত্রে উহাদের প্রহার কর, তবে তাদের স্খলনের ব্যাপারে প্রহার করিও না।

ইবনে আবদ্দুনিয়া মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস থেকে, দিনি আবু নজর দামেশকী থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে আয়শা থেকে, তিনি আমর ইবনে কায়েস মুলাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন মানুষ কোন পশুর উপর আরোহন করে,

তখন ঐ পশু দুআ করে, হে আল্লাহ! তাকে আমার বন্ধু ও দয়ালু বানিয়ে দাও। তার যখন পশু তার উপর অভিসম্পাত করে, তখন বলে, আমাদের যে সর্বাধিক অবাধ্য তার উপর লা'নত পড়ুক।

বোখারী মুসলিমে হযরত উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আরাফাত থেকে মুজদালিফায় আসছিলেন তখন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে পিছনে আরোহন করিয়েছিলেন। অতঃপর মুজদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় হযরত মুয়াজ (রাঃ)-কে নিজের সাথে আরোহণ করিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঐ খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়েছিনে, যাকে আফীর বলা থেক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন স্বীয় বোন আয়েশা (রাঃ)-কে তানঈম নিয়ে সেখান থেকে ওমরা করিয়ে আনে। সুতরাং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হাওদার ভিতর করে নিজের পিছনে বসিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খায়বারের যুদ্ধের সময় সাফিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করলেন, তখন তাকে নিজের পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন।

যখন কোন পশুর মালিক অন্য কাকেও নিজের সাথে নিজ পশুর উপর আরোহণ করাতে চায়, তখন পশুটির মালিক সামনে বসার অধিকারী হবে। অপর লোকটিকে পিছনে অথবা বাম পাশে বসানো উচিৎ। অপর ব্যক্তির সম্মান ইত্যাদির কারণে পশুর মালিকের নিজ ইচ্ছায় তাকে সামনে অথবা ডান পাশে বসালে তা ভিন্ন কথা।।

হাফেজ ইবনে মান্দাহ-এর বিশ্লেষণ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল লোকদের নিজ বাহনের পিছনে বসিয়েছেন তাদের সংখ্যা ৩৩। কিন্তু উকবা ইবনে আমের জুহানীর উল্লেখ তাদের মধ্যে নাই এবং মুহাদ্দিন ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনাতেও এই কথার উল্লেখ নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাহনে নিজের পিছনে আরোহন করিয়েছেন।

তিবরানী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পশুর উপর তিনজন আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন।

ভূ-পৃষ্ঠের ঐ কীট যার উল্লেখ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা সাবাতে করেছেন। উহা হল ঘুন পোকা, যা কাঠ খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل منسأته

অর্থ : যখন তার মৃত্যুর নির্দেশ পাঠালাম, তখন কোন কিছুতেই তার মৃত্যুর

সংবাদ জানায় নাই। তবে ঘুন পোকা, উহা সুলাইমানের লাঠি খেয়ে ফেলেছিল।

এই ঘটনাটি এমন– হযরত সুলাইমান (আঃ) জিনদেরকে তাঁর জন্য একটি মহল নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন ঐ মহল নির্মাণ হয়ে গেল,তখন সুলাইমান (আঃ) গোপনে বিশ্রাম নেয়ার জন্য উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু এক যুবক সেখানে তার নিকটে পৌছিয়ে গেলে। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অনুমতি ছাড়া এখানে কীভাবে প্রবেশ করলে? যুবকটি বলল, আমি অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছি, তিনি জিজ্ঞসা করলেন, কে অনুমতি দিয়েছে, যুবকটি উত্তরে বলল, এই মহলের যিনি মালিক তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এই উত্তর শ্রবণ করা মাত্র তিনি বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তি মৃত্যুর ফেরেশতা, আমার রূহ কবজ করার জন্য এসেছ। যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ চলছে, তাই তিনি নিজ লাঠির উপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হলেন ও স্থির থাকলেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করলেন যে, আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ জিন ও মানুষ দ্বারা পূর্ণ করাবেন। ইহার মৃত্যুর পর ফেরেশতা তার রূহ কবজ করে লইল। জিনেরা মনে করছিল যে, তিনি জীবিত আছেন। এভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়ে গেল। তাঁর লাঠিতে ঘুন পোকা সৃষ্টি হয়ে গেল। ঐ পোকা তাঁর লাঠিখানা খেয়ে ভিতর দিয়ে ফাকা বানিয়ে ফেলল। ফলে ঐ লাঠিটি ভেঙ্গে গেল এবং তিনি পড়িয়া গলেন। এরপর জিনরা বুঝতে পেরেছিল যে, তার মৃত্যু অনেক পূর্বেই হয়েছিল। শুধুমাত্র লাঠির সাহায্যে তার রূহ বিহীন লাশ দণ্ডায়মান ছিল। তাই জিনেরা পরস্পর বলতে লাগল যে, যদি আমরা গায়েবের খবর জানতাম তাহলে আমাদের এই অপমানকর শাস্তি ভোগ করতে থেকো না। অর্থাৎ এই নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে থেকো না। এর পূর্বে জিনেরা গায়েব জানে বলে দাবি করত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে অবহিত করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক ঘন্টা বাকি আছে। এরপর তিনি জিনদের ডাকলেন। তাদের দ্বারা এই মহল নির্মাণ করালেন। যখন তা নির্মিত হয়ে গেল তখন তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। জিনদের নিয়ম ছিল, তারা সুলাইমান (আঃ)-এর মেহরাবের নিকট একত্রিত থেকো। কিন্তু কার এই অবকাশ ছিল না যে, নামাযরত সুলাইমান (আঃ)-কে দেখতে পারত। কেননা যখনই কোন জিন তার দিকে তাকাতো সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে যেতে। ঘটনাক্রমে এক জিন সুলাইমান (আঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সুলাইমান (আঃ)-কে কোন কিছু পাঠ করতে বা বলতে শুনতে পায় নাই। সে চলে গেল এবং ফিরে আসার পথে তাকে সালাম করল। কিন্তু সালামের উত্তর শুনতে পায় নাই। সে অত্যন্ত ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে, সুলাইমান (আঃ)-এর শরীর রূপ বিহিনী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ঐদিকে সুলাইমান (আঃ)-এর

লাঠি ঘুনে খেয়ে একেবারে খোলা তথা ভিতর দিয়ে ফাঁকা বানিয়ে ফেলেছে। ফলে তিনি লাঠি পড়ে যাওয়ার কারণে পড়ে যান। জিনেরা যখন এই ঘটনা জানতে পারল, তখন পরস্পর বলতে লাগল, যদি আমরা গায়েবের খবর জানতাম তাহলে এমন অপমানজনক আযাবে পতিত হতাম না। হযরত সুলাইমান (আঃ) ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর লাঠি খুরুবা গাছের ছিল। এর পিছনে একটি ঘটনা আছে, তা নিম্নরূপঃ যখন সুলাইমান (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে ইবাদত করতেন, তখন প্রতি বছর তাঁর মেহবাবে একটি গাছ উৎপন্ন হত। তিনি ঐ বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার নাম কি? এবং কোন কাজের জন্য তোমাকে ব্যবহার করা যেতে পারে? বৃক্ষটি উত্তরে বলত, আমার নাম অমুক, আমাকে অমুক কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যদি তা ফলদার ও লাগানোর যোগ্য হত তাহলে উহাকে তুলে অন্য কোথাও লাগানো হত। একবার তিনি নিয়ম মাফিক বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি নিজের সামনে একটি গাছ উৎপন্ন থেকে দেখলেন। তিনি বৃক্ষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন জাতীয় গাছ, বৃক্ষটি উত্তর দিল, আমার নাম খারুবা। আমাকে আপনার রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃক্ষের উক্ত উত্তর শ্রবণ করে সুলাইমান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। আর ঐ গাছের একটি লাঠি বানিয়ে নিলেন। এক বছরের খাদ্য, পানীয় সঞ্চয় করে নিলেন। জিনদের এই বিষয় স্বরণ ছিল যে, তিনি রাত্রে খাদ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু আল্লাহর যা নির্দেশ তা হয়ে থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) যেখানে নামায আদায় করতেন সেই স্থানে বৃক্ষ উৎপন্ন হত। তখন তিনি ঐ বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করতেন তোমার নাম কি এবং তুমি কি কাজে ব্যবহৃত হও? বৃক্ষটি উত্তর দিত– আমার নাম অমুক। আমি অমুক কাজে ব্যবহৃত হই। সুতরাং যদি উহা কোন ঔষধি গাছ হত তাহলে তিনি তা লিপিবন্ধ করে রাখতেন। আর যদি তা ফলাদি গাছ হত তাহলে অন্যত্র লাগিয়ে দিতেন।

অভ্যাস অনুযায়ী একবার তিনি একটি বৃক্ষ উদ্গাত থেকে দেখলেন। ইহার নিকটে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি এবং তুমি কি কাজে ব্যবহৃত হও? বৃক্ষটি উত্তর দিল, আমাকে খারুবা বলা হয়। আমাকে এই রাজত্ব শেষ ও ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃক্ষের এই উত্তর শ্রবণ করে সুলাইমান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, মহান প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহ তাআলার নিকটে প্রার্থনা করলেন যে, হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুকে এই জিনদের নিকট গোপন রাখবেন যাতে উহারা যে গায়েব জানে না,

এই বিষয়টি মানুষ বুঝতে পারে। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন যে, হে সুলাইমান! যদি ইহাই কামনা কর যে, তোমার মৃত্যুর সংবাদ জিনদের নিকট গোপন রাখবে তাহলে খারুব বৃক্ষের একটি লাঠি বানিয়ে লও এবং উহাতে ঠেক দিয়ে তথা ভর করে দণ্ডায়মান হয়ে থাক। (সুতরাং তিনি তাই করলেন, আর ঐ অবস্থাতেই তিনি স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গলেন। জিনদের তিনি যে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তারা সেই কাজ স্বাভাবিকভাবেই করে যেতে লাগল। জিনরা মনে করতেছিল যে, তিনি নামাযে রত আছেন। জিনেরা সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ ঐ সময় অবগত হল যে, যখন ঘুন পোকা তাঁর লাঠি খেয়ে ভিতর দিয়ে ফাঁকা করে ফেলল, যেই লাঠিতে ভর দিয়ে সুলাইমান (আঃ) দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। ফলে লাঠিটি পড়ে গেল ও তিনি পড়ে গেলেন। তখন জিনেরা আফসোস করে বলতে লাগল, যদি আমরা গায়েবের সংবাদ জানতাম তাহলে এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের এই অপমানকর কাজে লিপ্ত থাকতে হত না। বরং যে সময় তার রূহ কবজ হয়েছে, সেই সময় আমরা এই কাজ ছেড়ে দিতে পারতাম।

বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ

সর্ব প্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ (আঃ) শুরু করেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র আদম (আঃ)-এর শরীরের উচ্চতা পরিমাণ পর্যন্ত নির্মাণ করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপরে তার পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। অতঃপর তিনি উহার নির্মান কাজ সম্পন্ন করার চিন্তা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জিনও শয়তানদের একত্রিত করলেন এবং তাদের কাজ বন্টন করে দিলেন। যারা সেই কাজে পারদর্শী তাদের সেই কাজে নিয়োজিত করা হল। আর শহরের ব্যাপারে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শহর রিখাম ও বড় বড় পাথর দ্বারা নির্মাণ করতে হবে। এতে বারটি বসতি রাখতে হবে। প্রতিটি বসতিতে এক একটি পরিবার থাকবে। সুতরাং শহরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং এই কাজের জন্যও শয়তানের কতিপয় দলকে খনি থেকে সোনা, রোপা ও ইয়াকুত বের করার কাজে নিয়োজিত করলেন। আর কতিপয় দলকে সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণের কাজে নিয়োজিত করেছিরেন। আরেকটি দলকে মর্মর পাথর সংগ্রহ করতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর একটি দলকে মেশক, আম্বর ও অন্যান্য সুগন্ধিসমূহ সংগ্রহ করতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং যখন এই সকল জিনিস এত পরিমান সংগৃহিত হয়ে গেল যার সংখ্যা শুধু একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এরপর কারিগরদের উপস্থিত করা হল। তাদের হাতে ঐ সকল মালপত্র অপর্ণক করা হল, তারা বড়

পাথরগুলোকে সুন্দর করে কেটে ছেঁটে মজবুত স্লাব বানাবে। ইয়াকুত ও মুক্তাগুলোকে ছিদ্র করবে। আর অন্যাণ্য দামি পাথরগুলোকে সংস্কার করতে বলবেন। অবশেষে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি মসজিদ নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন। উহার দেয়াল সাদা, হলুদ এবং সবুজ রঙের মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত হল। খামগুলো উন্নত খনিজ পাথর দ্বারা সসজ্জিত করা হল। উহার ছাদে মূল্যবান স্বর্ণ ইত্যাদির পাত দ্বারা ঢেকে দেয়া হল। ছাদ. দেয়াল এবং খামগুলোতে মারওয়ারিদ, ইয়াকুত ও অন্যান্য দামি পাথর সংযুক্ত করে সুসজ্জিত করা হল। মসজিদের ফ্লোরে ফিরোজা পাথরের স্লাব বিছিয়ে দেয়া হল। অবশেষে যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হল, তখন দেখা গেল পৃথিবীর কোন স্থাপনাই উহার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের নিকটবর্তী থেকে পারছিল না। রাত্রের বেলায় উহা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করত। এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) বনি ইসরাঈলদের আলেমদের একত্রিত করলেন এবং বললেন, আমি এই মসজিদ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বানিয়েছি। আর ঐ দিনকে খুশির দিন হিসেবে পালন করা হল।

ফায়েদা

কোন কোন আলেম বলেছেন, জিনদেরকে আল্লাহ তাআলা সুলাইমান (আঃ)-এর অনুগত করে সৃষ্টি করেছেন। তার উহাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন, উহাদের তাঁর নির্দেশের অনুগত রাখবার জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যার হস্তে আগুনের একটি কোড়া/চাবুক ছিল। যখনই কোন জিন সুলাইমান (আঃ)-এর কোন নির্দেশ অমান্য করত তখন ঐ ফিরিশতা আগুনের ঐ চাবুক দ্বারা প্রহার করত, ফলে ঐ জিন পুড়ে যেত।

মুহাদ্দিসগন লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা সুলাইমান (আঃ)-কে তামার একটি কূপ দান করেলিলেন যা তিন দিন ও তিন রাত্র পর্যন্ত একাধারে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঐ কূপ ইয়ামেন দেশে অবস্থিত ছিল। ঐ কূপ থেকে আল্লাহ তাআলা ঐ সময় সুলাইমান (আঃ)-এর জন্য কিছু পরিমাণ তামা বের করেছিলেন। উহার বদৌলতে আমরা আজ পর্যন্ত তামা থেকে উপকৃত হচ্ছি।

কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্ন

ঐ বানী যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার চিহ্নসমূহের অন্যতম। আর যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে এসেছে–

واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ـ

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্য হল, ঐ প্রাণী এমন সময় বের হবে যখন মানুষ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ছেড়ে দিবে।

ঐ প্রাণীর দৈর্ঘ ৬০ (ষাট) হাত। উহার হাত পা থাকবে। শরীরে লোম থাকবে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর সাথে ঐ প্রাণীর মিল থাকবে। সাফা পাহাড় ফেটে যাবে। উহার মধ্যে থেকে এই প্রাণী বের হবে। উক্ত প্রাণী জুমার রাত্রে বের হবে। সেই সময় মানুষ মিনায় যাওয়ার জন্য একত্রিত হবে। উক্ত প্রাণীর বের হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য আছে। কেউ বলেছেন পাথর থেকে বের হবে। কেউ বলেছেন উহা তায়েফের ভূ-খণ্ড থেকে বের হবে। কেউ বলেছেন, উক্ত প্রাণীর নিকটে মূসা (আঃ)-এর লাঠি এবং সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি তাকে ধরতে চায় তো উহাকে ধরতে পারবে না। কেউ যদি উহার নিকট থেকে পলায়ন করতে চায়, তাও পারবে না, মুমিনদের কপালে লাঠি দিয়ে মুমিন লিখে দিবে, আর কাফিরদের কপালে কাফির শব্দ মোহরাঙ্কিত করে দিবে।

মাস্তাদরাকে হাকেমের শেষাংশে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে দাব্বাহ তথা প্রাণী তিনবার বের হবে। প্রথমবার ইয়ামেনের সীমান্ত থেকে বের হবে, যার আলোচনা জঙ্গলে ছড়িয়ে পরবে। তবে উহার আলোচান বসতিতে তথা মক্কাতে হবে না। একটা সময় অতিবাহিত হবার পর দ্বিতীয়বার মক্কার নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে বের হবে। যার আলোচনা হয়ার সাথে সাথে বসতি তথা মক্কাতেও হবে। ইহার পর একটা সময় অতিবাহিত হবার পর একদিন মানুষ ঐ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে যে মসজিদ আল্লাহ তাআলার নিকট খুবই সম্মানিত ও প্রিয়, অর্থাৎ মসজিদে হারাম। উক্ত প্রাণী তাদের দিকে ধাবিত হবে না। তবে সেই সময় উক্ত প্রাণী মসজিদের এক কোনে রুকনে আসওয়াদ ও বনি মাখযুমীর দরজার মাঝে অবস্থান করবে। এর ফলে উপস্থিত লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। মুসলমানদের একটি দল উহার নিকটে অবস্থান করবে। তারা বুঝতে পারবে যে, তারা পলায়ন করে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে লুকাতে পারবে না। তারা নিজ নিজ চেহারা থেকে ধুলো বালি ঝাড়তে থাকবে। তার ফলে তাদের চেহারা উজ্জলতর থেকে থাকবে। অবশেষে মনে হবে যেন তারকা ঝলমল করছে। এরপর ঐ প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে এমনভাবে চলতে থাকবে যে, কেউ তাকে ধরতে চাইলে ধরতে পারবে না। আবার তার নিকট থেকে পলায়নকারী কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। এমনকি এক ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে উহার আক্রমন থেকে বাঁচবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। উক্ত প্রাণী পিছন দিক দিয়ে তার নিকটে গিয়ে বলবে, হে অমুক! তুমি এখন নামায আদায় করছ। লোকটি ঐ প্রাণীর দিকে ফিরবে, তখন ঐ লোকটির চেহারায় একটি দাগ দিয়ে চলে যাবে। আর মানুষজন নিজ নিজ শহরে একে অন্যের সহযোগী হয়ে অবস্থান করবে। নিজ নিজ সফরে একে অন্যের সাথে এবং সম্পদের ক্ষেত্রে

একে অন্যের অংশীদার হয়ে থাকবে। মু'মিনগণ কাফেরদের নিকট থেকে পৃথক হবে যাবে। সুতরাং কাফিরেরা বলবে হে মু'মিনরা! আমাদের ফয়সালা করে দাও। আর মু'মিনরা বলবে, হে কাফিররা! আমার ফয়সালা করে দাও।

সুহাইলী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমাকে ঐ প্রাণী দেখান, যারা মানুষের ষাথে কথা বলবে। মূসা (আঃ)– এর দুআর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা উক্ত প্রাণীকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বের করলেন। মূসা (আঃ) উহার ভয়ানক অবয়ব দেখে বললেন যে, হে প্রতিপালক! একে প্রত্যাহার করে নিন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা উহাকে ফিরিয়ে নিলেন।

ঐ প্রাণী যা কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে, উহার নাম 'আকসাদ'। মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আল-মাকরী স্বীয় তাফসীরে এমনই বর্ণনা করেছেন।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, দাব্বাতুল আরদের বহির্গমন বা আত্মপ্রকাশ এমন সময় ঘটবে, যখন কল্যাণ শেষ হয়ে যাবে। মানুষ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিবে এবং কোন তাওবাকারী ও অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী থাকবে না।

হাদীসে এসেছে যে, উক্ত প্রাণী আত্মপ্রকাশ করা ও পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া উভয়টিই কিয়ামতের প্রাথমিক শর্তসমূহের অন্যতম। কিন্তু তন্মধ্যে থেকে কোনটি প্রথমে প্রকাশ পবে উহা নির্দিষ্ট নাই। কিন্তু হাদীসের স্পষ্টত অর্থ থেকে বুঝে আসে যে, পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় পরে হবে। আর যে প্রাণী আত্মপ্রকাশ করবে, উহা একটি হবে। তাবে বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক শহরে বের হবে বা আত্মপ্রকাশ করবে। এর অর্থ হল, একই প্রজাতির প্রাণী আত্মপ্রকাশ করবে। যা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে রয়েছে। উহা একটি নহে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার বাণীকে 'দাব্বাহ' দ্বারা প্রজাতি বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত প্রাণী বলে ঐ সাপকে বুঝানো হয়েছে যা কাবা ঘরের ভিতরে ছিল। যেই সময় করাইশর কাবা ঘর পুনঃনির্মানের ইচ্ছা করল তখন ঈগল পাখি ঐ সাপকে কাবা ঘর থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল। উক্ত সাপকে হুজুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সুতরাং ঐ প্রাণী কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সাফার নিকট থেকে বের হবে এবং মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে।

কুরতবী (রহ.) বলেছেন, কেয়ামতে সময় আত্মপ্রকাশকারী প্রাণী হল হযরত সালেহ (আঃ)-এর উটনীর বাচ্চা। কেননা হাদীসে এসেছে تخرج ولها زغاء অর্থ : তা বের হবে এবং তার زغاء অর্থাৎ উটের ডাক ডাকবে। উটের ডাকতো উটের জন্যেই নির্দিষ্ট।

ইমাম জাহাবী (রহ.)-এর মিজাল নামক গন্থে আছে যে, জাবের জু'ফী (রহ.) বলেছেন যে, দাব্বাতুল আরদ হল হযরত আলী (রাঃ)। জাবের জু'ফী শীয়ী ছিল। সে রাজাআত তথা প্রত্যাবর্তনের প্রবক্তা। সে বলত, হযরত আলী (রাঃ) পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি জাবের জু'ফী থেকে অধিক মিথ্যাবাদী ও আতা ইবনে আবী রাবাহ–এর অধিক ভাল কাউকে দেখি নাই।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি জাবের জু'ফীর ঘরে ছিলাম। সে আমার সাথে কথাবার্তা বলছিল। তার কথা শ্রবণ করে এই আশংকায় অতি দ্রুত তার ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম যে, তার ঘরের ছাদ আমাদের উপর ভেঙ্গে না পড়ে। আলেমগণের মাঝে এই ব্যাপারে ভীষণ মতপার্থক্য রয়েছে যে, ঐ প্রাণীর আকার-আকৃতি ও অবস্থা কেমন হবে? কারও অভিমত উহা মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট হবে। কার মতে, উহার মধ্যে সমস্ত মাখলুকের বৈষিষ্ট্য পাওয়া যাবে।

ফায়েদা

মুফাসসিরগণও এই ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, উক্ত দাব্বাহ কী কথা বলবে, এই ব্যাপারে সুদ্দী (রহ.) বলেছেন, উক্ত দাব্বাহ ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করবে। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, উক্ত প্রাণী একজনকে বলবে, সে মুমিন অপর ব্যক্তিকে বলবে, সে কাফের। কেউ বলেছেন, তার কথা হবে ان الناس كانوا بايتنا لا يوقنون সে আরবীতে কথাবার্তা বলবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত প্রাণী দাব্বাহ-এর অন্তর্ভূক্ত হবে না, কেননা উহার লেজ থাকবে। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, উক্ত 'দাব্বাহ' মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু অধিকাংশের অভিমত হল, উহা চতুস্পদ প্রাণীর আকৃতি বিশিষ্ট হবে।

"দাব্বাহ"-এর আকৃতি

ইবনে জুরাইজ আবু যুবাইর থেকে বর্ননা করেছেন যে, তিনি দাব্বাহ তথা উক্ত প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উহার মাথা ষাঁড়ের মাথার মত হবে। চোখ হবে শূকরের চোখের মত। উহার কান হবে হাতির কানের মত, উহার শিং থাকবে, যা বারটি শিংয়ের সমতুল্য হবে। উহার সীনা বাঘের সীনার মত হবে। গায়ের রং চিতা বাঘের গায়ের রংয়ের মত হবে। কোমর বিড়ালের কোমরের মত হবে। উহার লেজ ভেড়ার লেজের মত হবে। পা উটের পায়ের মত হবে এবং প্রতিটি জোড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে বার হাত।

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাব্বাহ ঐ মসজিদের নিকট থেকে বের হবে, যার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকটে

সর্বাধিক। সেই সময় হযরত ঈসা (আঃ) উক্ত মসজিদ তাওয়াফ করতে থাকবেন এবং মুসলমানরা তাঁর সাথে তাওয়াফ করতে থাকবে, সেই সময় ভূ-পৃষ্ঠ কাপতে থাকবে। তখন সায়ী করার পথের স্থানের নিকটবর্তী কোন স্থানে সাফা পাহাড় ফেটে যেয়ে সেই ফাটল হতে দাব্বাহ বের হবে আসবে। সর্বাগ্রে উক্ত প্রাণীর যেই অংশ প্রকাশ পাবে তাহল, উহার উজ্জল ঝলমলে লোমসূহত। অনুসন্ধান ও গ্রেফতারকরী কেউ উহাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আবার উহার নিকট থেকে পলায়নকারী কেউ পালিয়ে আত্মগোপন করতে পারবে না। মানুষের শরীফে কাফির ও মুমিন হওয়ার বিশেষ চিহ্ন এঁকে দিবে। মুমিনদের চেহারা এমন করে দিবে যেন ঝলমলে তারকা, আর তার উভয় চোখের মাঝে মুমিন শব্দ লিখে দিবে। আর কাফিরদের চেহারায় কালো একটি দাগ লাগিয়ে তার উভয় চোখের মাঝে কাফির লিখে দিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইহরাম অবস্থায় স্বীয় লাঠি দিয়ে সাফা পাহাড়কে টোকা দিয়ে ঠকঠক করে বলেছিলেন , নিশ্চয়ই দাব্বাহ আমার এই ঠকঠক শ্রবণ করছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাব্বাহ আবু কায়েসের ঘাঁটি থেকে রের হবে। উহার মাথা মঘের ভিতর পর্যন্ত পৌছাবে এবং উহার মাথা ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজইয়াদ ঘাঁটি খুবই খারাপ। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটে জিজ্ঞাসা করা হল, এমনটি কেন, উত্তরে তিনি বললেন, কেননা এখান থেকে একটি প্রাণী আত্মপ্রকাশ করবে। উহা এমন তিনটি চিৎকার দিবে যা পূর্ব পশ্চিমের প্রত্যেক মানুষ শুনতে পাবে।

কোন আলেম উহার আকার আকৃতি সম্পর্কে বলেছেন যে, উহার চেহারা মানুষের চেহারার মত হবে। উহাছাড়া অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পাখির মত হবে। যেই ব্যাক্তি উহাকে দেখবে, সে উহাকে বলবে, মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদ (সাঃ) ও কুরআনের উপর বিশ্বাস রাখে না।

মাসয়ালা

যদি কোন ব্যক্তির জন্য কোন প্রাণীর ওসীয়ত করা হয়ে থাকে, তাহল ওসীয়াতকারীর উক্ত বক্তব্য ঘোড়া, গাথা ও খচ্চরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেনান দাব্বাহ হলে ভাষাবিদগণ প্রত্যেক ঐ প্রাণী বুঝিয়ে থাকেন যা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে, কিন্তু সাধারণতঃ এই শব্দটি চতুস্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই ওসীয়াতের বাস্তবায়ন সাধরণত ব্যবহারের ভিত্তিতে হবে। আর যখন এক অঞ্চলে যাকে ইহাকে সাধারনত প্রচলন হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন উহা সকল অঞ্চলে সাধারণত প্রচলন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে দাব্বাহ তথা প্রাণীর উপর আরোহন করবে না। কিন্তু যদি সে কোন কাফিরের পিঠে আরোহন করে তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। অথচ আল্লাহ

তাআলা স্বীয় কালামে পাকে কাফিরদেরকে দাব্বাহ বলে সম্বোধন করেছেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ কসম করে যে, রুটি খাবে না। কিন্তু সে যদি চাউলে তৈরী রুটি খায়, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে।

ইবনে সুনাইজ বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত বিষয়টিকে মিশরবাসীদের সাধারণ প্রচলিত নিয়মের অনুকূলে হওয়ার বিষয়ে মত দিয়েছেন। যদি তারা বাহন বলে সকল প্রাণী বুঝিয়ে থাকে তাহলে উহাই ধর্তব্য হবে। অবশ্য যদি এই শব্দের ব্যবহার শুধু ঘোড়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে তাহলে ঘোড়াই দেয়া হবে, যেমন ইরাকে হয়।

দাব্বাহ শব্দের মধ্যে ছোট-বড়, নর-মাদী, ভাল-মন্দ সকল কিছুই অন্তর্ভূক্ত হবে।

এই ধারাবাহিকতায় দাব্বাহর ওসিয়াতে কেমন প্রাণী দেয়া হবে (ঘোড়া, গাধা, খচ্চর)। এই পর্যায়ে মুতাওয়াল্লী বলেছেন যে, ঐ প্রাণী (ঘোড়া, গাধা, খচ্চর) দেয়া হবে, যার উপর আরোহন করা সম্ভব।

মাসয়ালা

কোন প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ সময় বাহনের পশুর উপর বসে থাকা ও কোন প্রয়োজনে উহার পিঠ থেকে অবতরণ না করা মাকরুহ। এই প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে–

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিজ প্রাণীর পিঠকে মিম্বর বানান থেকে বেঁচে থাক বা বিরত থাক। কেননা আল্লাহ তাআলা ঐ সকল প্রাণীকে তোমাদের অনুগত করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, উহা তোমাদের বহন করে তোমাদের এমন স্থানে পৌছিয়ে দেয় তোমরা কেউ কষ্ট করা ছাড়া পৌছাতে না। তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান মজবুত করার জন্য অবলম্বন বানিয়েছেন। সুতরাং উহাদের দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ কর।

প্রাণীর পিঠে প্রয়োজন বশতঃ অবস্থান বা আরোহণ করা জায়েয আছে। যতক্ষণ প্রয়োজন থাকবে ততক্ষণই আরোহণ করবার অনুমতি আছে। আবু দাউদ ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে।

হযরত উম্মে হুসাইন আহমাসিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বিদায় হজ্জ আদায় করেছি, আমি বেলাল ও উসামা (রাঃ)-কে দেখেছি যে, তাদের একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটের রশি ধরে রেখেছেন ও অপরজন কাপড় উঁচু করে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গরম/রৌদ্র থেকে হেফাজত করছেন। এ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামরায় আকাবাতে রমি করলেন।

শায়খ উজ্জুদিন ইবনে আব্দুস সালাম ফাতাওয়ায়ে মুত্তয়াহ্হেলিয়াকে লিখেছেন, চতুস্পদ প্রাণীর উপর আরোহন করা ঐ সময় নিষেধ করা হয়েছে , যখন আরোহণ করার বিশেষ কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য না থাকে। বরং শুধু এমন বিলাস উদ্দেশ্য হয়, তবে যদি বিশেষ উদ্দেশ্যে আরোহণ করতে হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হবে। যেমন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হয়। ইহাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে। যেমন যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার সময় নিজ বাহনে আরোহন করা। এমনিভাবে ওয়াজিব যুদ্ধের মধ্যে বাহনের উপর আরোহন করা ওয়াজিব। ইহা ছাড়াও যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমনের আশংকা থাকে, তাহলে বাহনে আরোহন করি সীমান্ত রক্ষার জন্য অবস্থান করা ওয়াজিব। এই সকল মাসয়ালাতে কার মতানৈক্য নাই।

উম্মে হুসাইনের হাদীস থেকে জানতে পারলাম যে, মুহরিম ব্যক্তি যখন বাহনে আরোহী থাকবে বা বাহন থেকে অবতরণ করবে, তখন ছায়ার মধ্যে দাঁড়াতে পারবে। অধিকাংশ আলেম এই ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহ.) এই সময়ও নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার এক লোককে দেখলেন যে, সে তার হাওদার উপর এমন একটি কাঠ রেখেছে যেন গুলতিন কাঠ। আর সে ঐ কাঠের উপর কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছে। অথচ তিনি মুহরিম ছিলেন। ইমাম ওমর (রাঃ) তাকে এইগুলো নিষেধ করেছিলেন। ইহা থেকে জানতে পারলাম যে, মুহরিম ছায়ায় দাঁড়াতে পারবে না। অপর হাদীসের ব্যাখ্যা যাতে বলা হয়েছে, প্রাণীর পিঠকে মিম্বর বানিও না। এই হাদীস প্রাণীর পিঠে অপ্রয়োজনে আরোহন করতে নিষেধ করেছেন।

রিয়াশী বলছেন, আমি আহমাদ ইবনে মাযালকে ভীষণ গরমের মৌসুমে দেখেছি যে, তিনি রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকে বললাম হে আবুল ফজল! এই মাসয়ালা তো মতানৈক্য পূর্ণ। ইহাই তো ভাল ছিল যে, আপনি সুযোগটি গ্রহণ করবেন। রিয়াশী বলছেন, আমার কথা শ্রবণ করে আহমাদ ইবনে মাযাল এই কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ হল :

রৌদ্রে দাঁড়িয়েছি, যাতে কিয়ামতের দিন ছায়া অর্জন করতে পারি, কেননা কেয়ামতের দিন ছায়ার কোন নাম-নিশানা থাকবে না। পরিতাপের বিষয় হবে, যদি এতকিছুর পরও সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেমন আফসোস হবে যদি হজ্জটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আহমাদ ইবনে মা'যাল বসরার অধিবাসী। বসরার দুনিয়াত্যাগীগণের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার বাই আবদুস সামাদ ইবনে মা'যাল কবি ছিলেন।

২৯৭. الداجن (আদ্ দাজিন্) গৃহপালিত বকরী

দাজেন ঐ বকরীকে বলা হয়, যা মানুষ লালন-পালন করে। তেমনি আরবীতে প্রত্যেক ঐ প্রাণীকে দাজেন বলা হয়, যা ঘরে রেখে দানা-পানি ইত্যাদি খাওয়াইয়া প্রতিপালন করা হয়। তাই সকল প্রকার গ্রহপালিত প্রাণী চাই তা পাখি জাতীয় হোক বা বিচরণশীল প্রাণী হোক সবই ইহার অন্তর্ভূক্ত হবে। সুতরাং উটনী ও গ্রহপালিত কবুতরকেও দাজুন বলা হয়। এর স্ত্রীলিংঙ داجنة আর বহুবচন হল دواجن ভাষাবিদগণ বলেছেন, دواجن البيوت ঐ পাখি বা বকরী ইত্যাদিকে বলা হয়, যারা নিরীহ ও গৃহপালিত হয়। ইবনে সাকিত বলেছেন, شاة داجن ঐ বকরীকে বলা হয় যা গৃহের প্রতি অনুরাগী ও আকৃষ্ট থাকে। কতিপয় আরব داجن শব্দটির শেষে ة ব্যবহার করে থাকে। বকরী ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী যেমন, শিকারী কুকুর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাদীসে দাজেন শব্দের উল্লেখ

সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন এক স্ত্রীর নিকট একটি বকরী ছিল এবং উহা মারা গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উহার চামড়া কেন ছাড়াইয়া রাখলে না, উহা তোমার কাজে আসত।

সুনানে আরবাআ তথা সুনান চতুষ্টয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলছেন যে, রজম ও বড় বাচ্চার দুগ্ধ পান সংক্রান্ত বিষয়ে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তা একটি কাগজে লিখিত অবস্থায় আমার বিছানার নিচে ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু হয়ে গেল তখন আমরা তার দাফন-কাফনে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একটি বকরী (দাজেন) এসে উহা খেয়ে ফেলে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আমার একটি (দাজেন) বকরী ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে অবস্থান করতেন তখন ঐ বকরী বসে থাকত। তখন তিনি বাহিরে চলে যেতেন ঐ বকরীও চলে যেত।

ইমরাত ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আদুবা নামক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটনী ছিল। কোন ঘর ও হাউজ থেকে পানি থেকে পানি পান করতে উহাকে বাধা দেয়া হত না।

পরিশিষ্ট

দুজাইন ইবনে সাবেত আবুল গুসন আমীর বুয়ী আল বসরী আমর ইবনে হিশাম ইবনে ওরওয়া ইবনে যুবায়েরের আযাদকৃত গোলাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত নিম্নরূপ–

(১) ইবনে মুঈন বলেছেন, তার হাদীস কোন কাজের নহে। আবু হাতেম ও আবু যুরআ বলেছেন, সে দুর্বল হাদীস হাদীসে বর্ণনাকারী। ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নহে। দারা কুতনী প্রমুখগণ বলেছেন, সে শক্তিশালী হাদীস বর্ণনাকারী নহে।

ইবনে আদী বলেন, ইবনে মুঈন থেকে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়েছে যে, তিনি বলেছেন যে, দুজাইন (হুজ্জা)-এর নাম। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন যে, দুজাইন ইবনে সাবেত আল-গুসন ঐ ব্যক্তি যে সালমা ও ইবনে মুবারক থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর তার নিকট থেকে ওয়াকী (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেছেন, একবার দুজাইন তথা জাহা আমাদের কাছে বর্ণনা করল যে, حدثنى مولى لعمر بن عبد العزيز "আমার কাছে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের আযাদকৃত গোলাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।" আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের গোলাম তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানা পায় নাই। তখন সে বলতে লাগল, সে তো ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম ছিল।

তিনি বলতে লাগলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার কী হল যে, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করেন না? উত্তরে তিনি বললেন, আমার ভয় হয়, হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও কম বেশী হয়ে যায়। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "যেই ব্যক্তি আমার উপর জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলবে, সে নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।"

হামযা ও ময়দানী আমসালে লিখেছেন যে, "জাহা" হুজ্জা নামে বনি ফারাযাহ গোত্রের এক লোক ছিল, যার উপনাম ছিল আবুল গুসন। সে অত্যন্ত আহম্মক ছিল। সুতরাং তার আহম্মকির কিছু উপমা নিম্নে দেয়া হল।

(১) মূসা ইবনে আল-হাশেমী বলেন, একবার হুজ্জার কাছে জিজ্ঞাসা করা হল. মাটি কেন খনন করছ? সে উত্তরে বলল, আমি এইখানে কয়েকটি দিরহাম পুতে রেখেছিলাম, উহা তালাশ করছি। কিন্তু এখন আমার ঐ স্থানটি স্মরণ নাই। আমি তাকে বললাম, আপনার উচিৎ ছিল পুতে রাখার স্থানের কোন চিহ্ন রেখে দেয়া। সে বলল, চিহ্ন তো রেখেছিলাম; কিন্তু এখন সেই চিহ্নটা পাচ্ছি না।

(২) একদিন হুজ্জা রাত্রের বেলা ঘর থেকে বের হলেন, ঘটনাক্রমে সে তার ঘরের দরজার সামনে এক নিহত ব্যক্তির লাশ পড়েছিল। অন্ধকারের কারণে সে তা দেখতে পায় নাই। ঐ লাশের সাথে ধাক্কা লাগায় সে পড়ে যায়। যখন সে বুঝতে পারল যে, উহা লাশ, তখন সে উহা উঠিয়ে কুপের ভিতর ফেলে দিল। যখন তার পিতা তার এই কাজ সম্পর্কে অবহিত হল, সে তৎক্ষনাৎ কূপ থেকে লাশ তুলে কোথাও দাফন করে দিল। আর একটি ভেড়ার শ্বাসরোধ করে কূপের মধ্যে ফেলে দিল। সকালে নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা নিহত ব্যক্তির সন্ধানে কুফার অলি গলি ও রাস্তায় খুঁজে বেড়াতে লাগল। যখন বিষয়টি জানতে পারল তখন সে তাদের নিকট গিয়ে বলল যে, আমাদের ঘরের কূপের মধ্যে একটি লাশ পড়ে রয়েছে। চল তা দেখে আসবে। হতে পারে উহাই তোমাদের প্রিয়জন। সুতরাং ঐ লোকেরা তার সাথে রওনা হল। উহার বাড়িতে পৌঁছিয়ে তারা হুজ্জাকেই ঐ কূপের মধ্যে নামাল যাতে ঐ লাশ সে তুলে আনতে পারে। জাহা কূপে নেমে দেখতে পেল যে, সেইখানে একটি শিং বিশিষ্ট ভেড়া পড়ে রয়েছে। তখন সে কূপের ভিতর থেকেই চিৎকার করে বলল, তোমাদের লোকের মাথায় কি শিং ছিল? এই কথা শুনে তারা সকলে হেসে উঠল ও ফিরে চলে গেল।

(৩) আবু মুসলিম খোরাসানী যখন কূফায় আসলেন, তখন তিনি তার মজলিশে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কে জাহাকে চেন? উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে ইয়াকতিন নামক এক ব্যক্তি বলল, আমি তাকে চিনি। সুতরাং ইয়াকতিন তাকে ডাকতে গেল। গিয়ে বলল, তোমাকে আবু মুসলিম ডাকছেন। এই কথা বলে সে চলে আসল। কিছুক্ষণ পর উপস্থিত সকলে আবু মুসলিমের নিকট থেকে চলে গেল। শুধুমাত্র আবু মুসলিম ও ইয়াকতিন বসে রয়েছে। ইত্যবসরে জাহা এসে বলল, তোমাদের মধ্যে আবু মুসলিম কে?

جحا 'শব্দের ভাষাগত বিশ্লেষণ

جحا (জাহা) 'গায়রে মুনসারিফ'। কেননা এতে আদল আছে। এটা جاح থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন عمر রূপান্তরিত হয়েছে عامر থেকে। যখন তীর নিক্ষেপ করা হয় তখন বলা হয়—اجحا يجحو جحوا।

২৯৮. الدارم (আদ-দারেম) সজারু

আদ-দারেম সজারুকে বলা হয়। বিস্তারিত আলোচনা قاف অনুচ্ছেদে قنفذ কুনফুজের আওতায় আসবে।

২৯৯. الدباء (আদ-দাব্বাউ) টিড্ডি

উড়তে পারার পূর্বেকার টিড্ডিকে বলা হয় অর্থাৎ টিড্ডি এখনও পর্যন্ত উড়ার যোগ্য হয় নি তাকে আদ দাব্বাউ বলে। এর একবচন হল دباة। রাজ্যের নামী জনৈক কবি বলেন–

كان خوق قرطها المعقوب + على دباة او على يعسوب

যেমন হুদহুদ পাখি, যখন কোন তীর নিক্ষেপকারী উহার ডানায় আঘাত করে তা ভেঙ্গে দিয়েছে, ফলে উহা রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ার চেষ্টা করে কিন্তু উড়তে পারে না।

আরদুন মুদরিয়াতুন বলা হয় অধিক টিড্ডি অবস্থানকারী স্থানকে।

উদাহরণ হিসেবে বলা ارض مدبية অর্থাৎ উহা টিড্ডির চয়েও বেশি।

হাদীসে দাবা তথা টিড্ডির উল্লেখ

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসে আছে– তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহার পর কেমন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, টিড্ডির মত হবে। যার শক্তিশালীরা দুর্বলকে খেয়ে টিড্ডি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা জারাদ শব্দের আওতায় গিয়েছে।

৩০০. الدب (আদ দুব) ভাল্লুক

"আদ দুব ভাল্লুক প্রশিদ্ধ একটি হিংস্র প্রাণী। এর স্ত্রীলিঙ্গ হল دابه। এর উপনাম হল 'আবু জুহাইনাহ', আবুল হাল্লাজ, আবু হামীদ, আবু কাতাদাহ এবং আবুল লাম্মাস। অত্যাধিক ভাল্লুক অধ্যষিত অঞ্চলকে 'আরদুন মুদবানাতুন' বলা হয়। ভাল্লুক একাকী/নির্জনতাপ্রিয় প্রাণী। সুতরাং শীতকাল এলে এরা নিম্নাঞ্চলের নিজ নিজ নির্জনাবাসে ঢুকে পড়ে। আর আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এরা নিজের আবাস থেকে বের হয় না। সুতরাং সে-সময় যখন তাদের ক্ষুধা লাগে, তখন নিজের হাত পা চেটে নেয়। এতে তাদের ক্ষুধা দূর হয়ে যায়। এরপর বসন্তকাল এলে এরা নিজ নিজ আবাস থেকে বের হয়। তখন এরা যথেষ্ট মোটা হয়ে থাকে।

ভাল্লুক ব্যতিক্রমী স্বভাবের হিংস্র প্রাণী। কেননা এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে হিংস্র প্রাণীর খাদ্য এবং গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যসহ মানুষের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য। যেমন ফল-মূল, মধু ইত্যাদি।

ভাল্লুকের আরেকটি স্বভাব হল, সহবাসের প্রয়োজন হলে ভাল্লুক নিজ স্ত্রীকে নিয়ে কোন নির্জন স্থানে চলে যায়। এরপর স্ত্রী ভাল্লুককে চিত করে শুইয়ে সহবাস করে। স্ত্রী ভাল্লুক বাচ্চা প্রসবের পর বাচ্চাটি দেখতে একটি গোশতের স্ত

প মনে হয়। অর্থাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাত-পা) কিছুই চেনা যায় না। ভাল্লুক পিঁপড়ার ভয়ে নিজ বাচ্চাসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। আর বেশি বেশি জিহ্বা দিয়ে লেহন করতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেতে থাকে। বাচ্চা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে। মাদী ভাল্লুক বাচ্চা প্রসবের সময় ভীষণ কষ্ট সহ্য করে। এমনকি অনেক সময় মাদী ভাল্লুকের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। কেউ কেউ মনে করে, ভাল্লুক মুখ দিয়ে বাচ্চা জন্ম দেয়। তাদের আরও ধারণা হল, মাদী সজারু বাচ্চা দেখার অতি আগ্রহে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অসম্পূর্ণ বাচ্চা জন দেয়। কেউ কেউ লোক বলেন, মাদী ভাল্লুকের সহবাসের আগ্রহ থাকে সীমাহীন। তাই সে নিজ আগ্রহ পূর্ণ করার জন্য বাচ্চাকে সময় হওয়ার পূর্বেই জন্ম দিয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন সময় তীব্র যৌনকামনা থাকার কারণে তারা মানুষকেও কাছে পেতে চায়। কখনও এর বিপরীতও হয়। কেননা পুরুষ ভাল্লুক কোন কোন সময় মেয়েদের সাথে সহবাসে আগ্রহী হয়। এমন ঘটনা অনেকবার ভাল্লুক করেছে।

ভাল্লুকেরা বিশেষত শীতকালে খুব মোটা হয়ে থাকে। এ স্থূলতার কারণে তার চলাফেরা খুবই কষ্টকর হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় যখন কোন স্থানে সে বসে পড়ে, তখন একটানা চৌদ্দ দিন পার না হলে সে-স্থান থেকে উঠে যায় না। এরপর তার মধ্যে কিছুটা নড়াচড়া ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আর এ সময়েই মাদী ভাল্লুক বাচ্চা জন্ম দেয়। মাদী ভাল্লুকটি বাচ্চা জন্ম দিয়ে খুব নাজুক অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন সে নিজ বাচ্চাকে সামনে নিয়ে জিহ্বা দিয়ে লেহন করতে থাকে। কোন আশঙ্কা দেখা দিলে তৎক্ষণাত সে বাচ্চা নিয়ে কোন গাছে চড়ে যায়। ভাল্লুক প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুব মেধাবী। তবে তা কঠোরতা ও প্রহার ব্যতীত নিজ প্রশিক্ষকের আনুগত্য করে না।

ভাল্লুকের শরয়ী বিধান

ভাল্লুক খাওয়া হারাম। কেননা এটা একটি হিংস্র প্রাণী; সে শাণিত দন্ত-নখর দ্বারা খাদ্য শিকার করে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, তার শাণিত দন্ত-নখর না থাকলে এটি হালাল হত। কেননা বস্তুর বৈধ হওয়াই আসল। হারামের কোন অস্তিত্ব নেই।

জ্ঞাতব্য

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী 'কিতাবুল আযকিয়া' গ্রন্থের শেষে লিখেছেন : এক ব্যক্তি বাঘের ভয়ে পালিয়ে একটি কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুব সম্ভব কূপটি শুকিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ওই বাঘও ওই ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে উক্ত কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের দু'জনের পূর্বে ওই কূপের মধ্যে একটি ভাল্লুকও পড়েছিল। সুতরাং বাঘ ভাল্লুককে দখে বলল, তুমি এখানে কত দিন যাবত আছ ? ভাল্লুক উত্তরে বলল, আমি কয়েকদিন যাবত এখানে পড়ে আছি। আমি ক্ষুধার তীব্রতায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি। বাঘ বলল, ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ

করায় কী লাভ? আমরা দু'জন মিলে এ লোকটিকে খেয়ে পেট ভরি না কেন ? এ কথা শুনে ভাল্লুক বলল, ধর! আজ আমরা এ লাকটিকে খেয়ে পেট ভরে নিলাম; কিন্তু আগামী দিন কী হবে? আমরা তো এখান থেকে বের থেকে পারব না। তাই আমি বলি কি, চল! আমরা এ লোকটির সাথে সন্ধি করি। তবে তাকে বিশ্বাস করাতেই হবে, আমরা তাকে কোন কষ্ট দিব না। আর সে এ কূপ থেকে আমাদের তিনজনের বের হওয়ার একটা উপায় করবেই। কেননা সে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত। সুতরাং বাঘটি ভাল্লুকের পরামর্শ মেনে নিল। তারা দুজন কসম খেয়ে ওই ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করল। এরপর লোকটি কূয়া হাতড়ানো শুরু করে দিল। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে সে হঠাৎ বড় একটা গর্ত পেয়ে গেল। লোকটি ওই গর্ত আরও বড় করা আরম্ভ করে দিল। গর্ত যখন বেশ বড় হয়ে গেল, তখন সে গর্তের ভিতর দিয়ে মাথা বের করে বের হয়ে আসল। এরপর বাঘ ও ভাল্লুককে বের করে আনল।

এ গল্পের সারমর্ম হল, বুদ্ধিমানের উচিত নিজের সকল কাজে সতর্কতা অবলম্বন করে চলা। নিজের জৈবিক চাহিদার অনুসারী না হওয়া। বিশেষত যখন সে জানে ইচ্ছামত চলায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাই প্রত্যেক কাজের পরিণতি চিন্তা করে তবেই তার পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

কাযবিনী রহ. 'আজায়েবুল মাখলুকাত' (عجائب المخلوقات) গ্রন্থে লিখেছেন, একটি বাঘ জনৈক লোকের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করল। লোকটি ভয়ে পালিয়ে গাছে আরোহণ করল। ওই গাছের একটি ডালে পূর্ব থেকে একটি ভাল্লুক বসে ফল ছিড়ে খাচ্ছিল। বাঘ যখন লোকটিকে গাছের ডালে দেখল, তখন সে ওই গাছের নিচে এসে বসে পড়ল। অপেক্ষা করতে লাগল ওই ব্যক্তির। অনন্তর লোকটির দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ভাল্লুকের ওপর। দেখল ভাল্লুক তাকে আঙুলের ইশারায় বলছে– সে যে পূর্ব থেকে গাছের ডালে বসে আছে তা যেন বাঘটি জানতে না পারে। ওই লোকটি বলেন, আমি বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে ভীত-অস্থির হয়ে পড়লাম কীভাবে এ দু' হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে! ঘটনাক্রমে আমার পকেটে ছোট একটি ছুরি পেলাম। আমি ওই ছুরি দিয়ে ভাল্লুক যে ডালে বসা ছিল, সেটি কাটতে আরম্ভ করলাম। কাটতে কাটতে যখন সামান্য একটু বাকি ছিল, তখন ওই ভাল্লুকের ভারে ডালটি ভেঙ্গে গেল। ডালের সাথে ভাল্লুকও মাটিতে পড়ে গেল। ভাল্লুক মাটিতে পড়ার সাথে সাথে বাঘ তার উপর আক্রমণ করল। উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হওয়ার পর বাঘ ভাল্লুকের উপর বিজয়ী হল। আর তাকে হত্যা করে ফেলল। তার কিছু অংশ খেয়ে সে স্থান ত্যাগ করল। এ গল্পের শিক্ষা হল, মানুষ বিপদের সময় যেন নিজের বুদ্ধিমত্তা না হারায়। আল্লাহর উপর ভরসা করে বিপদ মুক্তির প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিবে। কখনও এ বিষয়ে অসতর্ক হবে না।

প্রবাদ-প্রবচন ও বিংবদন্তি

পিছনে লিখে এসেছি, আরবগণ বলেন : 'আহমাক মিন জাহবার' (احمق من جهبر)'জাহবার থেকে অধিক আহমক/নির্বোধ'। জাহবার বলা হয় মাদী ভাল্লুককে। এমনিভাবে আরবগণ বলেন : 'আলূতুম মির রব্বী' (الوط من رب) 'ভাল্লুকের চেয়ে অধিক লাওয়াতাত/ পুংমৈথুনকারী'। এ কথা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, যে অধিক হারে পুংমৈথুন করে।

চিকিৎসায় ভাল্লুকের উপকারিতা

যদি ভাল্লুকের কর্তনদন্ত (সামনের চার দাঁতের পাশের দাঁত) কোন মহিলা নিজের দুধের মধ্যে ফেলে ওই দুধ বাচ্চাকে পান করায়, তাহলে ওই বাচ্চার দাঁত খুব সহজে বের হয়। ভাল্লুকের চর্বির মালিশ কুষ্ঠ রোগ নির্মূল করে দেয়। ভাল্লুকের ডান চোখ কাপড়ে জড়িয়ে কোন মানুষের বাহুতে বেঁধে দেয়া হলে উক্ত ব্যক্তি হিংস্র প্রাণীকে ভয় পাবে না। এ চক্ষু সর্বদা জ্বরাক্রান্ত কোন ব্যক্তির শরীরে বেঁধে হলে তার এ জ্বর চলে যাবে। ভাল্লুকের পিত্ত মধু-গুয়ামৌরির সঙ্গে মিশিয়ে চোখে সুরমার মত লাগালে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টি দূর হয়ে যাবে। আর এ ঔষধটি চুল পড়া রোগের জন্য মাথায় দেয়া হলে চুল গজায়। ভাল্লুকের পিত্ত দু' দিরহাম পরিমাণ গরম পানি ও মধুর সাথে মিশিয়ে পান করলে অর্শ্বরোগ ও বায়ূ রোগ ইত্যাদি ভলো হয়ে যায়। ভাল্লুকের পিত্ত কোন পুরুষ ডান রানে বেঁধে স্ত্রী সহবাস করলে যতক্ষণ ইচ্ছা সহবাস করতে পারবে। সহবাসের ফলে তার কোন ক্ষতি হবে না। বাচ্চার গায়ে ভাল্লুকের চর্বি মালিশ করলে বাচ্চা সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। ভাল্লুকের চর্বি পুরাতন ক্ষতস্থানে ভরে দেয়া হলে উক্ত ক্ষত ভাল হয়ে যাবে। কোন কুকুরের শরীরে এর চর্বি মালিশ করা হলে উক্ত কুকুর পাগল হয়ে যাবে। কোন অসচ্চরিত্র বাচ্চার গলায় ভাল্লুকের চামড়ার টুকরা জড়িয়ে দেয়া হলে বাচ্চার সচ্চরিত্র পয়দা হবে। ভাল্লুকের রক্ত চোখে লাগিয়ে দেয়া হলে চোখের পর্দার উপর চুল উঠা বন্ধ হয়ে যাবে। ভ্রূতে লাগিয়ে দেয়া হলে তার ভ্রূ আর গজাবে না। ভাল্লুকের ডান চোখ শুকিয়ে যে বাচ্চা ঘুমিয়ে ভয় পায়, সে বাচ্চার গলায় ঝুলিয়ে দিলে তার ভয় দূর হয়ে যাবে।

স্বপ্নে ভাল্লুক দেখার তাবীর

স্বপ্নে ভাল্লুক দেখা অনিষ্ট, কঠোরতা, বিপদ আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারণা ও ধোঁকার আলামত। কখনও এটা স্বপ্নে দেখা কোন স্থূলকায় মহিলার আলামত। যাকে দেখা মাত্র অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং গান-বাদ্য করাই যার কাজ। কখনও স্বপ্নে ভাল্লুক দেখা কয়েদ হওয়া, কয়েদখানা বা প্রতারক, চোর ও শয়তানতুল্য শত্রুর আলামত। সুতরাং যে-কেউ নিজেকে ভাল্লুকের উপর আরোহী দেখতে পাবে, বুঝবে তার বেলায়েত লাভ হবে। তবে তার মধ্যে এর

যোগ্যতা থাকতে হবে। নতুবা এর তা'বীর হল, ভয় ও অস্থিরতা। অবশ্য তা থেকে পরবর্তীসময়ে তার মুক্তি লাভ হবে। কখনও এর তা'বীর করা হয় সফর করা, আবার কখনও ঘরে ফিরে আসা ।

৩০১. আদ- দাবদাব (الدبدب) বন্য গাধা

আদ্-দাবদাব : বন্য গাধা। এর বিশদ বর্ণনা حاء অনুচ্ছেদে গিয়েছে।

৩০২. আদ-দাবারু (الدبر) মৌমাছি

আদ্-দাবারু (الدبر—এর দালে যবর) মৌমাছির দল। সুহাইলী রহ.-এর মতে এটা ভীমরুল। আদ্-দিবারু (الدبر—দালে যের) ছোট টিড্ডি। আসমায়ী বলেন, এ শব্দের কোন একবচন নেই। তবে একবচনের জন্য 'খাশরুমাতুন' (خشرمة) ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন 'দাবূরুন' (دبور)। সুতরাং 'দাবারু' শব্দটি মধু আহরণকারীর গুণগানে কবি হাযালীর নিম্নোক্ত কবিতার ছত্রে 'মৌমাছি' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

اذا لسعته الدبر لم يرج لسعها

'মৌমাছিরা মধু আহরণকারীকে কামড় দিলেও সে তাতে ভয় পায় না।'

আল্লামা দামেরী রহ. বলছেন : কবিতার ছত্রে لم يرد শব্দটি لم يخف অর্থে তথা 'ভয় পায় না' অর্থে ব্যবহৃত। আর এ সূত্রেই পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে—

من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله الات فمن كان يرجوا لقاء ربه

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : নুহহাসের উক্তিমতে সকল মুফাস্সির এ ব্যাপারে একমত যে, উপর্যুক্ত দুটি আয়াতেই رجاء শব্দটি خوف (ভয়) অর্থে ব্যবহৃত। অবশ্য আমাদের দেশে কুরআন শরীফের তরজমাসমূহে رجاء শব্দটি ভয় ও আশা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. প্রথম আয়াতের অর্থ করেছেন 'সুতরাং যে আশা করে আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতের...।' হযরত মাওলান শিব্বির আহমাদ উসমানী রহ. এ আয়াতের ফাওয়ায়েদে লিখেছেন 'যারা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের আশা কিংবা তার সামনে উপস্থাপিত হওয়ার ভয় আছে...।' সুতরাং বুঝা গেল, رجاء শব্দটির উভয় অর্থ গ্রহণ করাই জায়েয। (উর্দু অনুবাদক)

'মৌমাছি' অর্থ হিসেবে হযরত আসেম ইবনে সাবেত আনসারী রাযি.-কে বলা হয়—حمى الدبر (হিমাদ্ দাবুর) তথা মৌমাছিরক্ষিত।

তার ঘটনা হল, মুশরিকরা তাঁকে শহীদ করে যখন তাঁর লাশ বিকৃত করতে মনস্থ করল, তখন আল্লাহ তাআলা মৌমাছির মাধ্যমে কাফরদের এ কুবাসনা থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখেন। কাফেররা মৌমাছির ভয়ে লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ তার লাশ দাফন করেন। হযরত আসেম রাযি. আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন : আমি যেন কোন মুশরিকের শরীরে হাত না লাগাই আর কোন মুশরিকও যেন আমার শরীরে হাত না লাগায়। তাই আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর মুশরিকদের হাত থেকে তাঁকে মৌমাছির মাধ্যমে হেফাজত করেছিলেন।

একটি ঘটনা

হাকিমের 'নিশাপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের শুরুতে সুমামা ইবনে আব্দুল্লাহর একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসটি তিনি হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সুমামা রাযি. থেকে এক জামাআত রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে হযরত আনাস রাযি. বলেন : আমি একবার খোরাসান থেকে আসছিলাম। আমার সাথে এক লোক ছিল। (খুব সম্ভব সে রাফেজী ছিল।) সে হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত ওমর রাযি.-এর খুব খারাপ ভাষায় সমালোচনা করছিল (নাউযুবিল্লাহ)। আমি তাকে বারবার নিষেধ করছিলাম; কিন্তু সে নিষেধ শুনছিল না। একদিন সকালে নাস্তার পর সে বাথরুমের জন্য দূরে গেল। আমি কিছুক্ষণ তার অপেক্ষা করলাম; কিন্তু যথেষ্ট সময় বিলম্বের পরও সে ফিরে এল না। তখন আমি তাকে ডাকার জন্য আমার এক দূত পাঠালাম। কিছুক্ষণ পর দূতটি দৌড়ে এসে বলতে লাগল, সামান্য একটু এগিয়ে আপনার সফরসঙ্গীর দূরবস্থার খবর নিন। এ শুনে আমি দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখলাম, সে একটি গর্তের উপর পায়খানা করার জন্য বসে আছে। আর মৌমাছির পূর্ণ একটি চাক যেন তার শরীরে লেগে রয়েছে এবং মৌমাছিরা তার শরীরকে কাঠের টুকরার মত টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আমরা লোকটির শরীরের হাড়গুলো একত্র করলাম। অথচ মৌমাছি আমাদের স্পর্শ পর্যন্ত করল না। তার শরীরে লেগে রইল।

হাদীস শরীফে এসেছে, 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি মৌচাক পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তাহলে তোমরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে।

'ফায়েক' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, হযরত সাকীনা বিনতে ইমাম হুসাই রাযি. যখন অল্প বয়স্কা ছিলেন, তখন একদিন কাঁদতে কাঁদতে নিজ মাতা উম্মে রবাবের কাছে এলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? হযরত সাকীনা বললেন, একটি মৌমাছি আমার পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে কামড়ে গিয়েছে।

৩০৩. الدبسى (আদ্-দাবুসী) বন্য কবুতর

আদ্-দাবুসী (الدبسى) বন্য কবুতর। দালে যবর, সীনে যের। অবশ্য কারও কারও মতে দালে পেশ হবে। এটা একধরনের বন্য কবুতর। এর গায়ের রং কালো মিশ্রিত লাল। এটা কয়েক প্রকার হয়। যেমন মিশরী, হেজাযী ও ইরাকী। জাহিয বলছেন : 'মানতিকুত তাইর' রচয়িতা বর্ণনা করেছেন, 'দুবুসী' বন্য কবুতর; কমরী ও ফাখতাহর কারণে বলা হয়। এরা শব্দ করার সময় এদেরকে 'হাদাল' আর গান গাওয়ার সময় 'তাখরীদ' বলা হয়। কারও কারও মতে 'হুদায়েল' কবুতরের নাম। হুদায়েলের আলোচনা حاء অনুচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

রাজেয এক কবিতায় বলেন–

كهدل اهدكسر الرماة جناحه + يدعو بقارعة الطريق هديلا

'তীরন্দাজরা ডান ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে (সামান্য উড়ছে বলে) ফরফর শব্দ হচ্ছে। এ জন্যই রাস্তার খাদগুলোকে হুদাইল বলা হয়।'

হাদীসে দুবুসীর উল্লেখ

ইমাম আহমাদ, তাবরানীসহ অনেক মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে আম্মারা থেকে তিনি নিজ দাদা হানশ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : আমি একবার 'আসওয়াফ' অর্থাৎ শক্ত বালিভূমিতে প্রবেশ করলাম। অমনি আমি দুটি বন্য কবুতর ধরে ফেললাম এমতাবস্থায় যে, এদের মা এদের উপর ফরফর করে ঘুরছিল। আমি এদের জবাই করতে চাচ্ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ আমার কাছে আবু হানশ এসে আমাকে খেজুরের শিকড় দ্বারা মারতে মারতে বলতে লাগলেন, তোমার কি জানা নাই রাসূল সা. মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমস্ত প্রাণীকে হারাম করেছেন? 'মুতাইখা' খেজুর গাছের শিকড়কে বলা হয়।

'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, আবু তালহা রাযি. একবার নিজ বাগানে নামায পড়ছিলেন। একটি বন্য কবুতর সামনে দিয়ে উড়ে গেল। এটা তার নিকট ভাল লাগল। কবুতরটি গাছের মধ্যে উড়তে উড়তে বের হওয়ার জন্য রাস্তা অনুসন্ধান করছিল। আবু তালহার দৃষ্টি নামাযের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য তার উপর পড়েছিল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি নামায পড়ছিলেন। আবু তালহা রাযি. রাসূল সা.-এর কাছে যে সমস্যায় তিনি পড়েছিলেন, তা শুনালেন। আর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বাগান আমি সদকা করে দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযি. থেকে আরও বর্ণিত আছে, একজন আনসারী সাহাবী ক্বিফ উপত্যকায় নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন। তখন ছিল

খেজুরের মৌসুম। গাছে ঝুলছিল খেজুরের কাঁধি। তিনি হঠাৎ দেখলেন, একটি বন্য কবুতর ফলের উপর বসে রয়েছে। এ দৃশ্য এ ব্যক্তির নিকটে খুবই ভাল লাগল। এরপর তিনি নামাযে লিপ্ত হলেন; কিন্তু তিনি কত রাকাত নামায পড়েছেন ভুলে গেলেন। সুতরাং তিনি বললেন, এ সম্পদই আমাকে এ ফিতনায় ফেলেছে। এরপর তিনি তৎকালীন খলীফা হযরত উসমান গণী রাযি.-এর কাছে এসে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বললেন, আমি তা সদকা করে দিলাম। আপনি কল্যাণময় কোন কাজে ব্যবহার করুন। হযরত উসমান রাযি. ওই বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দিরহামে বিক্রয় করলেন। এরপর ওই বাগানের নাম 'খমসূন' তথা ৫০ হয়ে গেল। ক্বিফ মদীনার একটি উপত্যকার নাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর নিয়ম ছিল, নিজ সম্পদের মধ্য থেকে যখন কোন কিছু ভাল লাগত, তখন তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। তাঁর গোলাম তাঁর এ অভ্যাসের ব্যাপারে ভাল করে জানতেন। সুতরাং ওই গোলামদের কেউ মুক্ত হতে চাইলে সে সর্বদা মসজিদে উপস্থিত থাকত। তিনি তার এ দীনদারী দেখে তাকে মুক্ত করে দিতেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথীরা বলত, আপনার এ গোলাম আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে। তখন তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আমাদের আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দেয়, আমরা তার ধোঁকায় পতিত হই। একবার ইবনে ওমর রাযি. তাঁর এক গোলামকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করতে চাইলেন। তিনি বললেন, হতে পারে এ দিরহাম আমাকে বিপদে ফেলবে। তাই যে গোলামের বিনিময়ে ইবনে আমর আমাকে তিন হাজার দিরহাম দিতে চান, আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এ কারণেই আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলতেন : ইবনে ওমর ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ নাই, যাকে দুনিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নাই। ইবনে ওমর রাযি. তাঁর সারা জীবেন এক হজার অথবা এক হাজরে বেশি গোলাম আযাদ করেছেন। তাঁর সম্মান এত বেশি যে, কেউই তা ভাবতে পারবে না। হুযাযাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ. বলতেন : সাহাবায়ে কেরাম অর্থহীন চিন্তা-ভাবনার মূলোৎপাটনে এবং নামাযের ক্ষতিপূরণে উপরিউক্ত নেক কাতসমূহ করেছেন। কোন রোগের উৎসকে শেষ করার জন্য এটাই একমাত্র চিকিৎসা। এছাড়া আর কোন ঔষধ উপকারী হবে না।

'দুবুসী'র বৈশিষ্ট্য হল, আজ পর্যন্ত কেউই একে মাটিতে পতিত পায় নাই। গরম ও শীতকালে এরা পৃথক পৃথক বাসায় বসবাস করে। বিশেষত আজ পর্যন্ত কেউই এদের বাসা দেখতে পায় নাই।

দুবুসীর শরঈ বিধান

এটা খাওয়া সর্বসম্মত মতে জায়েয ও হালাল। সুনানে বায়হাকীতে ইবনে আবী লায়লা আতা থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা

করেছেন : যদি ঘুঘু, কবুতর, তোতা ও চকোরী প্রাণী কোন মুহরিম হত্যা করে ফেলে, তবে জরিমানায় একটি বকরী ওয়াজিব হবে।

দুবুসী চিকিৎসা ক্ষেত্রে

'মিনহাজুত তিব' গ্রন্থকার বলেন: বন্য প্রাণীর মধ্যে সর্বোত্তম প্রাণী হল, দুবুসী। এরপর হল শাহরুবের অবস্থান। এটা কালো রঙের সুকণ্ঠী একটি পাখি। এরপর চকোরীর অবস্থান। সর্বশেষ কবুতরের ছোট বাচ্চা। দুবুসীর গোশত গরম ও শুষ্ক।

দুবুসীর স্বপ্নে দেখার তা'বীর

স্বপ্নে বন্য কবুতর দেখার ব্যাখ্যা আকাশী বটীর দেখার মত। বটীরের আলোচনা ইনশাআল্লাহ 'সীন' অনুচ্ছেদে আসবে।

৩০৪. الدجاج (আদ-দুজাজ) মুরগি

আদ দুজাজ মুরগি (দালে যের, যবর ও পেশ যোগে পড়া যায়)। একবচনের জন্য دجاجة ব্যবহৃত হয়। পুং ও স্ত্রী উভয়টার জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইবনে সাইয়িদাহ বলেন : একে 'দাজাজাহ' বলা হয় ধীরে ধীরে চলাফেরার কারণে। মুরগির উপনাম হল, উম্মে ওয়ালীদ, উম্মে হাফসা, উম্মে জাফর, উম্মে উকরা, উম্মে ইহদা ও ইসরীনা, উম্মে কুব, উম্মে নাফে ইত্যাদি। মুরগি বৃদ্ধ হয়ে গেলে এর ডিমে বাচ্চা হওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এর ডিম থেকে বাচ্চা হয় না।

মুরগির একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব হল, যদি এর পাশ দিয়ে কোন হিংস্র প্রাণী যেতে থাকে, তাহলেও সে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। অবশ্য শিয়াল এর কাছ দিয়ে গেলে অথবা সে শিয়ালকে দূর থেকে আসতে দেখলে তৎক্ষণাত নিজেই চিৎকার শুরু করে দেয়। তাই সে-সময় মুরগি ঘরের ছাদের উপর অথবা জংগলে থাকে। শহরের মুরগির ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। তবে শহরের মুরগি বিড়ালকে খুব ভয় পায়। সে বিড়ালকে একবার দেখতে পারে, তাহলে যথেষ্ট আওয়াজে চিৎকার করতে থাকে আর অনেক দেরিতে সে শান্ত হয়। (অনুবাদক)

মুরগির আরেকটি স্বভাব হল, খুবই কম ঘুমায়। যদি ঘুমায় তাহলে দ্রুত জেগে যায়। এর ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া ঠিক শ্বাস আসা-যাওয়ার মত। এর অল্প নিদ্রার কারণ হল, নিজ জীবনের প্রতি ভয়। এর কাছে নিজের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, তা মাটিতে ঘুমায় না বরং বিল্ডিং, দেওয়াল, কোন গাছের ডাল বা এ ধরনের কোন উঁচু স্থানে বসে যায়। সূর্য ডুবে গেলে স্বভাবতই অস্থির হয় এবং ভয় পেতে শুরু করে। মুরগির বাচ্চা যখন ডিম থেকে বের হয়, তখন লোম-চুল-পর ইত্যাদিসহ বের হয়। বের হয়েই চলাচল করতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটা দেখতে খুবই সুন্দর হয়, খুবই ভাল মনে হয়। কাছে ডাকলে কাছে আসে। যখনই একটু একটু করে বড় থেকে থাকে, এর সৌন্দর্য

একটু একটু করে কমতে থাকে। ধীরে ধীরে আসল অবস্থার দিকে যেতে থাকে। মুরগি শুধু ডিম দেয়া বা জবাই করে খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে আসে না।

মুরগি স্বভাবত মিশুক হয়ে থাকে। কেননা এরা গোশত, মাছি, রুটি, ঘাস ইত্যাদিও খায়।

ডিমের ভিতরকার বাচ্চার প্রজাতি নির্বাচনের পদ্ধতি

যদি কোন ব্যক্তি ডিমের মধ্যে মুরগি আছে না মোরগ জানতে চায়, তাহলে ডিমটি ভাল করে লক্ষ্য করবে। যদি ডিমটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে অধিক এবং কিনারা ডাবানো হয়, তাহলে এর মধ্যে মুরগি রয়েছে। আর যদি ডিম গোল হয় ও তার কিনারা উঁচু হয়, তাহলে তার মধ্যে মোরগ রয়েছে। ডিম থেকে বাচ্চা বের করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত মুরগি নিজেই ডিমে তা দিবে। দ্বিতীয়ত ডিম খড়-কুটা বা ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবে বরং কবুতরের নিচে মুরগির ডিম তা দিতে দেয়া হলেও বাচ্চা হবে। আর আজকাল মেশিনের মাধ্যমেও বাচ্চা ফুটানো হয়। (অনুবাদক)

মুরগি সাধারণত বছরে দশ মাস ডিম দেয়। শীতের দু' মাস ডিম দেয় না। ডিমের জন্ম দশ দিনে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কোন কোন মুরগি দিনে দুবার ডিম দিয়ে থাকে। ডিম যখন মুরগির পেট থেকে বের হয়, তখন খুবই নরম থাকে। কিন্তু বের হওয়ার কয়েক মিনিট পরই বাতাসে শক্ত হয়ে যায়। ডিমের ভিতরে হলুদ-সাদা রঙের জিনিস থাকে। সাদা জিনিসটায় উজ্জ্বল ও পাতলা একটা আবরণ থাকে। উক্ত আবরণের উপর শক্ত খোসা থাকে। সাদা জিনিসটা উজ্জ্বল ও তরল হয়ে থাকে। ঠিক যেন খনির মত। হলুদ জিনিসটা তরল ও জমাটবদ্ধ থাকে। একে জমাট রক্তের মত মনে হয়। একে কসুম বলে। এটা ডিমের মধ্যকার বাচ্চার খাবার। ডিমের মধ্যকার সাদা অংশ থেকে চোখ, মগজ মাথা হয়। অবশিষ্ট সাদা অংশ খোলসের আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে বাচ্চার চামড়া হয়। এমনিভাবে কুসুম জড়সড় হয়ে তথা নাড়ীভূড়ি ও আবরণ হয়ে বাচ্চার নাভী হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বাচ্চার খাবার পায়। যেমনি মানব শিশু মায়ের পেটে নাভীর মাধ্যমে হায়েজের রক্ত পান করে। কখনও কখনও একটি ডিমে দুটি কুসুম থাকে। তা খোসামুক্ত করার পর দুটি বাচ্চা হয়ে থাকে। এটাই বাস্তব।

সবচেয়ে সুষম ও খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ ডিম হল, যাতে কুসুম বেশি থাকে। আর যে ডিম মোরগের সাথে মিলন ছাড়া হয়, তাতে খাদ্যপ্রাণ খুবই কম থাকে। আর এমন ডিম থেকে বাচ্চা জন্মে না। বাচ্চা সাধারণত ওই ডিম থেকে জন্ম নেয়, যা চাঁদের হ্রাসকালে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে মুরগি দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ডিম চাঁদের বৃদ্ধিকালে বা শুক্লপক্ষে দিয়ে থাকে, তা পূর্ণরূপে ভর্তি ও তরল থাকে। তাই এতে বাচ্চা হওয়ার যোগ্যতা থাকে না।

মোরগ মুরগি চেনার উপায়

বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই জানা যায়, সেটি মুরগি না মোরগ। এটা চেনার পদ্ধতি হল, বাচ্চার বয়স দশ দিন হলে বাচ্চার ঠোঁট ধরে ঝুলিয়ে রাখবে। এমতাবস্থায় বাচ্চা নড়াচড়া করলে বুঝবে তা মোরগ আর নড়চড়া না করে চুপ থাকলে বুঝবে তা মুরগি।

একটি ঘটনা

হাফেয ইবনে আসাকির নিজ ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান খাওয়ার প্রতি খুবই দুর্বল ছিলেন। সুতরাং তার সম্পর্কে বেশ আশ্চর্যজনক ঘটনা আছে। কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

(১) একদিন সে সকালের নাস্তায় ৪০টি মুরগির রোস্ট, ৪০টি ডিম, ৮৪টি কলিজা চর্বিসহ ৮০টি গুর্দা খেয়েছিল।

(২) একবার খলীফা বাগানে গিয়ে বাগানের দায়িত্বশীলকে বললেন, সর্বোত্তম ও সুস্বাদু ফল ছিড়ে নিয়ে আস। বাগানের রক্ষী ফল এনে দিতে লাগল আর খলীফা ও তাঁর সঙ্গিরা মিলে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খলীফার সঙ্গিরা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু খলীফা আগের মতই খেতে থাকলেন। এরপর তিনি একটি রোস্ট করা বকরী চাইলেন। তা আনলে সেটাও খেয়ে শেষ করলেন। এরপর আবার ফল চাইলেন। ফল আনলে তাও খেয়ে শেষ করলেন। সমস্ত ফল শেষ হয়ে গেলে তার সামনে একটি পেয়ালা রাখা হল, যার মধ্যে একজন মানুষ বসতে পারে। পেয়ালাটি ঘি, ছাতু ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ ছিল। ওই পেয়ালার সমস্ত খাবার খলীফা একাকী খেয়ে শেষ করে ফেললেন। এরপর খলীফা রাজপ্রসাদে ফিরে আসলেন। সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে দস্তরখানা বিছানো হল। খলীফা এখান থেকেও কিছু খেলেন।

(৩) একবার খলীফা হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। হজ্জ শেষে তায়েফ গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ৭০০ আনার (ডালিম), মুরগির রোস্ট এবং এক ঝুড়ি কিসমিস খেয়েছিলেন। কথিত আছে, সুলাইমানের নিকট জনৈক ব্যক্তি এসেছিল। সে এসে সুলাইমানের বাগিচার ফল-ফলাদি ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং তাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিল। সুলাইমান বাগান দেখতে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফল খাওয়া শুরু করে দেয়। এমনকি সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ফল খায়। এরপর ফল ক্রেতাকে ডেকে আরও টাকা অগ্রিম চাইল। সে বলল, আপনার কাঙ্ক্ষিত টাকা বাগানে প্রবেশের পূর্বেই আপনাকে দিয়েছি। এখন বাগানে কী রেখেছেন যে অতিরিক্ত টাকা দিবে?

কথিত আছে, তার মৃত্যুর কারণ ছিল, সে একদিন চারশত ডিম, আটশত জলপাই, চর্বিসহ চারশত কলিজা এবং বিশটি মুরগি খেয়েছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর ওই রোগেই তার মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতব্য

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : কোন কোন আলেম থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ খেল আর তার অসুস্থ হওয়ার ভয় হয় তার উচিত নিজের পেটের উপর হাত বুলাতে বুলাতে নিম্নোক্ত কালেমা তিনবার পাঠ করা। এ আমলটি আশ্চর্যজনক ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত। কালেমা–

اللیلة لیلة عیدی یا کرشی ورضی الله عن سیدی ابی عبد الله القرشی

ইবনে মাজাহ রহ. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ধনীদেরকে বকরী এবং দরিদ্রদেরকে মুরগি পালন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন– যখন ধনীরা মুরগি পালন করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা বসতি ধ্বংস করবার নির্দেশ দেন।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদের মধ্যে আলী ইবনে উরওয়া দামেস্কী আছেন এবং মালেক ইবনে হাব্বান হাদীসসমূহ মওজু' করে থাকেন।

আব্দুল লতিফ বাগদাদী বলেন : ধনীদেরকে বকরী এবং দরিদ্রদেরকে মুরগি পালনের নির্দেশ প্রদানের কারণ হল, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লেনদেন তাদের সাধ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর সে অনুপাতেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এ বিধানের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন উপার্জন-করা ছেড়ে না দেয় এবং উপায় অবলম্বন করা পরিহার করে হাত গুটিয়ে না বসে থাকে। কেননা পরিমিত উপার্জন করা পবিত্র এবং অল্পে তুষ্ট থাকার অন্যতম উপায়। অধিকাংশ সময় এর মাধ্যমে ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে উপার্জন করাকে পরিহার করা এবং তা থেকে বিমুখতা প্রয়োজনকে বড় করে মানুষের সামনে হস্ত প্রসারিত করতে বাধ্য করে । আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বড় নিন্দনীয়। বসতি ধ্বংস হওয়ার যে কথা উল্লেখ হাদীসের দ্বিতীয়াংশে হয়েছে, তার অর্থ হয়তোবা ধনীরা মুরগি পালন করে দরিদ্রদের উপার্জনের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি করল এবং দরিদ্রদের কাজ নিজেরাই করতে লাগল। ফলে দরিদ্রদের উপার্জনের মাধ্যম অর্থহীন হয়ে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর দরিদ্রদের ধ্বংস মূলত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ বিধায় তা মানববসতি ধ্বংসের কারণ হয়।

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী রহ. 'আযকিয়া' গ্রন্থে মিশরের বাদশাহ আহমাদ ইবনে তুলুন সম্পর্কে লিখেছেন : একদিন তিনি কোন পরিত্যাক্ত স্থানে নিজ সাথীবর্গের সাথে খাবার খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি এক ভিক্ষুকের উপর পতিত হয়। সে তখন ময়লা কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং বাদশাহ একটি রুটি, একটি ভুনা মুরগি, এক টুকরো গোশত ও ফালুদা নিয়ে নিজ গোলামকে দিয়ে বললেন, এগুলো ওই ভিক্ষুককে গিয়ে দিয়ে আস। গোলাম ওই খাবার নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে এসে বলল, হুযুর! সে খাবার পেয়ে মোটেও খুশি হয় নাই।

এ কথা শুনে বাদশাহ বললেন, তাকে ডেকে আন। গোলাম ওই ভিক্ষুককে ডেকে আনল। বাদশাহ তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। সে তার উত্তর খুবই চমৎকার পদ্ধতিতে দিল। বাদশাহর প্রভাব এবং চাকচিক্য তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করল না। তখন বাদশাহ তাকে বললেন : তোমার নিকট বিদ্যমান পত্রাবলী আমার হাতে তুলে দাও এবং সত্য করে বল, এখানে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? আমার মনে হয় তুমি গুপ্তচর। এ কথা বলে বাদশাহ তার বেত্রাঘাতকারীকে ডাকালেন। বেত্রাঘাতকারীকে দেখে ওই ভিক্ষুক স্বীকার করল, সে একজন গুপ্তচর।

এ ঘটনা দেখে বাদশাহর সাথী-সঙ্গিরা বলল, হুযুর! আপনি তো জাদু দেখালেন। বাদশাহ বললেন, এখান জাদূর কিছুই নাই বরং সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার ব্যাপার। কেননা আমি তাকে বাহ্যিকভাবে দূরবস্থায় দেখে তার জন্য এমন খাবার পাঠালাম, যা তার উদরপূর্ণ করে দেয় এবং তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। তথাপি সে ওই খাবারের প্রতি কোন আগ্রহ দেখাল না এবং তা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করল না। তারপর আমি তাকে ডেকে এনে কিছু প্রশ্ন করলাম। সে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভয়ে সুন্দররূপে প্রদান করল। সাধারণ কোন ব্যক্তি এমন নির্ভয়ে উত্তর দিতে পারে না।

সুতরাং তার দূরবস্থা এবং আমার প্রশ্নগুলোর উপস্থিত চমৎকার উত্তর প্রদানের বিষয়টি পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্ত উপনীত হলাম যে, নিশ্চয়ই কাবাবে হাড্ডি আছে। এ ব্যক্তি আসলে ভিক্ষুক নয়; একজন গুপ্তচর।

ইবনে খালকান রহ. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তুলুন-এর জীবনীতে লিখেছেন : তিনি মিশরের উপকূলীয় অঞ্চল সিরিয়া ও তার সীমান্তবর্তী দেশসমূহের শাসক ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ন, বীর, বিনয়ী, স্বচ্চরিত্রবান, জ্ঞানান্বেষী এবং দাতা ছিলেন। তার দস্তরখানে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ নাগরিকবৃন্দ খাবার খেতেন। তিনি অধিকহারে দান-খয়রাত করতেন।

এ প্রসঙ্গে একবার তার জৈনেক কর্মচারী বলল, অনেক সময় একজন মহিলা আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা করার জন্য আসে। সে অনেক দামি কাপড় পরিধাণ করে আসে। তার হাতে স্বর্ণের আংটিও থাকে। এমন মহিলাকে কি দান করব? ইবনে তুলুন উত্তরে বললেন– যে কেউ তোমার সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করবে, তাকে অবশ্যই দান করবে। ইবনে তুলুন কুরআনের হাফেয ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি প্রথম শ্রেণীর রক্তপিপাসু ছিলেন। তার তালোয়ার রক্ত প্রবাহিত করার জন্য সর্বদা কোষমুক্ত থাকত। কথিত আছে, তার হাতে নিহত এবং তার বন্দিখানায় মৃত্যুবরণকারী লোকদের সংখ্যা ১৮ হাজার। কথিত আছে, তার কোন সন্তান ছিল না। এ জন্য তিনি ইবনে তুলুনকে লালন পালন করতেন। ইবনে তুলুনের মৃত্যু হয়েছিল ২৭০ হিজরীতে।

কথিত আছে, ইবনে তুলুনের পাশে বসে কেউ প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করত। একবার তিনি ওই কুরআন তেলাওয়াতকারীকে স্বপ্নে বললেন, তুমি আমার কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত করবে না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, কেন? উত্তরে ইবনে তুলুন বলল– কারণ, কোন আয়াত আমার বিপক্ষে গেলেই আমাকে প্রহার করে বলা হয়, তোমার সামনে কি এ আয়াত পৌঁছায় নি? তুমি কি এ আয়াত শুন নাই?

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

আল্লামা দামেরী রহ. লিখেছেন : বিভিন্ন সূত্রে আমি জেনেছি, জনৈক মহিলা নিজ পুত্রকে নিয়ে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নিকটে এসে বলল, আমি আমার এ পুত্রকে আপনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট অনুভব করেছি। তাই আমি একে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের অধিকার থেকে মুক্তার করে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম। আজ থেকে সে আপনার হয়ে গেল। আপনি তাকে গ্রহণ করুন। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাকে গ্রহণ করে নিলেন। এরপর তাকে সুলূক, তরীকত ও মোজাহাদা করার নির্দেশ দিলেন।

কিছুদিন পর ওই ছেলের মা তাকে দেখতে আসল। এসে দেখল, ছেলেটি খুবই শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছে। রাত্রিজাগরণ এবং অনাহারে থাকার কারণে তার গায়ের রং হলুদ হয়ে গিয়েছে। মাতার সামনে এ ছেলের জন্য খাবার হিসেবে আনা হয়েছিল শুধু একটি যবের রুটি। এ অবস্থা দেখে মহিলাটি শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নিকট গেল। তখন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর সামনে একটা পাত্র রাখা ছিল। তাতে একটি ভুনা মুরগি ছিল। তিনি তা খাচ্ছিলেন।

তা দেখে ওই ছেলেটর মা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-কে বলল, শায়খ! আপনি ভুনা মুরগির গোশত খাচ্ছেন আর আমার প্রাণপ্রিয় ছেলেটি খাচ্ছে মাত্র যবের সাধারণ একটি রুটি? এ কথা শোনামাত্র শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর মধ্যে জালালী অবস্থা এসে পড়ল। তিনি তৎক্ষণাত ওই হাড্ডিগুলোর উপর হাত বুলিয়ে বললেন,

قومی باذن الله تعالی الذی یحیی العظام وهی رمیم

"হে মুরগি! আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি দাঁড়িয়ে যাও! যিনি জীর্ণশীর্ণ শুষ্ক হাড়কে জীবিত করে থাকেন।"

সুতরাং মুরগি আগের মত সহজভাবেই দাঁড়িয়ে গেল এবং কড়কড় আওয়াজ করতে লাগল। এরপর শায়খ আবদ্দুল কদের জিলানী রহ. ওই মহিলাকে বললেন : তোমার পুত্র যখন এ অবস্থায় পৌঁছাবে, তখন সে মনে চাইলে এমনই খেতে পারবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ঐতিহাসিক ইবনে খালকান রহ. হিশাম ইবনে আদী-এর জীবনীতে লিখেছেন : পূর্ব যুগের জনৈক ব্যক্তি একবার খাবার খাচ্ছিল। তার সম্মুখে রাখা ছিল একটি ভুনা মুরগি। হঠাৎ তার দরজায় একজন ভিক্ষুক এসে খাবার প্রার্থনা করল। কিন্তু গৃহকর্তা তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল। অথচ সে খাবার খাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে ওই গৃহকর্তার ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ থেকে লাগল। তার নিকট যা কিছু ছিল, তা শেষ হয়ে গেল। এমনকি মূলধন পর্যন্ত খেয়ে ফেলল। এমনকি শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এরপর স্ত্রীর অন্য স্থানে বিবাহ হয়ে গেল।

একদিন ওই মহিলার দ্বিতীয় স্বামী ঘরে বসে খাবার খাচ্ছিল। তার সম্মুখে দস্তরখানার উপর ভুনা মুরগিও ছিল। আহারের মাঝামাঝি একজন ভিক্ষুক দরজায় এসে হাঁক ছাড়ল। মহিলার স্বামী স্ত্রীকে বলল, যাও! এ মুরগিটা ওই ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। মহিলা মুরগিটা নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। দেয়ার সময় ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল, এ ভিক্ষুকটি তারই পূর্বের স্বামী। এরপর মহিলাটি তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, এ ভিক্ষুক আমার প্রথম স্বামী ছিল। এ কথা শুনে দ্বিতীয় স্বামী বলল, আমিও ওই ভিক্ষুক, যাকে সে নিজ দরজা থেকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তার নাশোকরীর কারণে তার ধন-সম্পদ, স্ত্রী সবই তার নিকট থেকে নিয়ে আমাকে দান করেছেন।

হেকায়েত

হিশাম ইবনে আদী বলেন : একবার আমি আমার উটনীর উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করছিলাম। পথিমধ্যে এক বেদুইনের তাবুর নিকটে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি সেখানে অবতরণ করে তাবুর নিকটে গেলাম। সে-সময় তাবুর মধ্যে গৃহকর্তি অবস্থান করছিল। আর বেদুইনটি কোথাও গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বেদুইনটি ফিরে এসে আমাকে দেখে বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি মেহমান। সে বলল, আমার এখানে মেহমানের কী কাজ? এত বড় ময়দান খালি পড়ে আছে! অন্য কোথাও চলে যাও।

এরপর উক্ত মহিলা গম পিষে আটা দ্বারা রুটি বানিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর উক্ত মহিলার স্বামী দুধ নিয়ে এল। এসে সে সালাম করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? উত্তরে আগন্তুক বলল, আমি একজন মেহমান। একথা শুনে লোকটি খুবই খুশি হয়ে মোবারকবাদ জানাল। এরপর একটি বড় পেয়ালা ভর্তি করে দুধ এনে মেহমানকে পান করাল। এরপর মেহমানকে জিজ্ঞাসা করল, আমার মনে হয় আপনি এখানে এসে কিছুই খান নাই। ওই মহিলা আপনাকে কিছুই খেতে দেয় নি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাই নি। এ কথা শুনে লোকটি রাগান্বিত হয়ে মহিলার নিকট গিয়ে বলল, তোমার অকল্যাণ

হোক। মেহমানকে কিছুই খেতে দাও নাই? মহিলাটি বলল, আমি কী করব? আমার খাবারের অংশ তোমার মেহমানকে খাওয়াব? এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে লোকটি মহিলাকে প্রহার করে আহত করে ফেলল। তারপর সে ছুরি নিয়ে আমার উটনী জবাই করে ফেলল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। এ তুমি কী করলে? সে বলল, খোদার কসম! আমার মেহমান রাত্রে অভুক্ত ঘুমাতে পারে না। এরপর সে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল এবং গোশত রান্না করল। এরপর আমার সাথে বসে খেল আর নিজের স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে রিজিক না দিক। ভোর বেলায় লোকটি আমাকে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে বসে রইলাম। দ্বিপ্রহরের সময় সে ঘরে ফিরে আসল। তার সাথে খুবই সুন্দর এবং মোটাতাজা একটি উটনীও আসল। সে আমার নিকট এসে আমাকে বলল, এটা আপনার উটনীর পরিবর্তে। এরপর সে অবশিষ্ট গোশত পথিমধ্যে আমার আহার্যের জন্য সাথে দিয়ে দিল। আমি তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে পথ ধরলাম।

সেদিনও অন্য এক বেদুইনের তাবুর নিকট গিয়ে আমার সন্ধ্যা লেগে গেল। আমি উটনী থেকে নামলাম এবং ভিতরে প্রবেশ করে সালাম করলাম। এখানেও ভিতরে মহিলা ছিল। পুরুষ বাইরে কোথাও গিয়েছিল। মহিলাটি আমার সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাস করল, আপনি কে? আমি বললাম, আমি মেহমান। মেহমানের নাম শুনে সে অত্যন্ত খুশী হল এবং মেহমান আগমনের খুশীতে প্রথা অনুযায়ী সে আমাকে সকল সম্ভাষণ জানাল। এরপর উক্ত মহিলাও আটা ভেঙ্গে খামিরা প্রস্তুত করে রুটি বানাল। এরপর রুটির সাথে কাঁচা ঘি মিশ্রিত করে আমার সম্মুখে উপস্থাপন করল এবং আরেকটি পাত্রে ভুনা মুরগি এনে আমার সামনে রাখল। এরপর সে আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমাকে অপারগ মনে করবেন। আমি আপনার মর্যাদা অনুযায়ী মেহমানদারী করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর কুৎসিত কদাকার একজন বেদুইন আসল এবং আমাকে সালাম করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? আমি উত্তরে বললাম, আমি একজন মেহমান। এ কথা শুনেই সে চেহারা রুক্ষা বলল, এখানে মেহমানের কী কাজ? এরপর সে ভিতরে প্রবেশ করল এবং মহিলার নিকট খাবার চাইল। মহিলাটি বলল, খাবার তো মেহমানকে খাইয়েছি। এ কথা শুনে স্বামী বলল, আমার খাবার তুমি তোমার মেহমানকে খাইয়েছ আর আমি অভুক্ত থাকব অভুক্ত? এ প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি হল এবং মারপিটও শুরু হয়ে গেল।

হিশাম ইবনে আদী বলেন, এ দৃশ্য দেখে আমি খিলখিল করে উচ্চঃস্বরে হাসতে লাগলাম। হাসির আওয়াজ ভিতরেও পৌঁছে গেল। আওয়াজ শুনে

বেদুইন বাইরে এসে আমার কাছে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করল। আমি তাকে পূর্বের বেদুইন এবং তার স্ত্রীর ঘটনা শুনালাম। এ ঘটনা শুনে বলতে লাগল : আমার এ স্ত্রী ওই বেদুইনের বোন, যেখানে আপনি গত রাত্রে অবস্থান করেছিলেন। আর তার স্ত্রী যে আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করে নাই, সে আমার বোন।

হিশাম ইবনে আদী বলেন : এ রাত্রি আমার ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে অতিবাহিত হল। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

মুরগির শরঈ বিধান

মুরগি হালাল এবং পবিত্র, বুখারী এবং মুসলিমে এমনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তিরমিযী এবং নাসায়ী শরীফেও এমনি বর্ণনা আছে।

জুহদ ইবনে মুদরিব আল জারমী বলেন : আমরা হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি.-এর নিকটে বসা ছিলাম। তিনি খাবারের জন্য দস্তরখানা বিছিয়েছেন। তাতে মুরগির গোশতও ছিল। সেখানে বনি তায়েমুল্লাহ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তাকে তিনি দস্তরখানায় খাবারের জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু সে ইতস্তত করছিল। তখন তিনি বললেন, নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় এসে পড়ুন। কেননা রাসূলাল্লাহ সা. মুরগির গোশত খেয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনাতে আরও বর্ণিত আছে : "আমি স্বয়ং রাসূলাল্লাহ সা.-কে মুরগির গোশত খেতে দেখেছি।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : ঐ আগন্তুক ব্যক্তির দ্বিধা সংকোচনের কারণ ছিল, সাধারণত মুরগি নোংরা জায়গা দিয়ে চলাফেরা করে অথবা মুরগির শরঈ বিধান সম্পর্কে তার জানা ছিল না। এ কারণেই তার সংকোচ হয়েছিল যে, মুরগির গোশত হালাল না হারাম। কেননা রাসূলাল্লাহ সা. জিলালার গোশত, দুধ এবং ডিম খেতে নিষেধ করেছেন। জিলালা ঐ প্রাণীকে বলা হয়, যা নোংরা জিনিস ভক্ষণ করে এবং নোংরা স্থানে বসবাস করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : যখন মুরগি খাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন উচিত হল ওই মুরগিকে কয়েকদিন আটক করে রাখা। এরপর মুরগি খাওয়া।

মাসয়ালা-মাসায়েল

(১) ফাতাওয়া কাজী হুসাইন-এ বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে এ কথা বলে যে, যদি তুমি এ মুরগিগুলোকে বিক্রয় না কর, তাহলে তুমি তালাক হয়ে যাবে। এখন যদি ওই মহিলাটি মুরগিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে জবাই করে ফেলে তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সাধারণ আহত করে তাহলে তালাক হবে না। আর যদি এত বেশি আহত হয় যে, ভাল করার কোন উপায় না থাকে তাহলে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে তালাক হয়ে যাবে।

(২) এমন মুরগি যার পেটের মধ্যে ডিম আছে তাকে ডিমের পরিবর্তে বিক্রয় করা নাজায়েয হবে। যেমনিভাবে এমন বকরী যার স্তনে দুধ আছে তাকে দুধের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নাই।

(৩) মৃত পাখির পেট থেকে প্রাপ্ত ডিম সম্পর্কে ফকিহগণের তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথম অভিমত যা মাওয়ারদী, রওয়াই, আবুল কাত্তান, আবুল ফায়াজ প্রমুখগণ উদ্ধৃত করেছেন : যদি ঐ ডিম শক্ত হয়ে যায়, তাহলে পাক হবে; নতুবা নাপাক। দ্বিতীয় অভিমত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর। তিনি বলেন : উক্ত ডিম সাধারণভাবেই পবিত্র। কেননা তা পেট থেকে পৃথক ছিল। সুতরাং তা বাচ্চা সাদৃশ। তৃতীয় অভিমত, উক্ত ডিম সাধারণভাবেই নাপাক। এটা ইমাম মালেক রহ. গ্রহণ করেছেন। কেননা ডিম পেট থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পেটের একটা অংশ বলে গণ্য হয়। এটা ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বক্তব্য।

হাবী গ্রন্থের লেখক বলেছেন, যদি মুরগির ডিম অন্য কোন পাখির পেটে নিচে রেখে তা দেওয়া হয় এবং তার ফলে বাচ্চা জন্ম নেয়, তাহলে ওই বাচ্চা সকলের ঐক্যমতে পাক বলে বিবেচিত হবে। যেমনিভাবে অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চা পাক পবিত্র হয়ে থাকে। এমনিভাবে এ মাসয়ালাতেও কোন মতানৈক্য নাই যে, ডিমের বাইরের অংশটা নাপাক এবং ঐ ডিম যা জীবিত মুরগির পেট থেকে বের হয় তার বাহিরের অংশও নাপাক। তাহলে কি তা নাপাক হওয়ার হুকুম দেয়া হবে? এরপর আরও লিখেছেন : মেয়েদের লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা পবিত্র না অপবিত্র? কেউ কেউ নাপাক বলেছেন, আবার কেউ কেউ পবিত্র বলেছে। মাওয়ারদী বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. নিজের কিছু কিতাবের মধ্যে এটাকে পবিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী রহ. বলেছেন, লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা সাধারণত পবিত্র। চাই তা চতুষ্পদ প্রাণীর হোক অথবা কোন মহিলার হোক। এ বক্তব্য সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর গোসল দেয়া জরুরী নয়।

ইমাম নববী রহ. 'মুহাজ্জাব' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পাত্রসমূহের পরিচ্ছেদের শেষে লিখেছেন : পাত্রের মধ্যে উক্ত আর্দ্রতা পড়ে গেলে পানি নাপাক হবে না। এর কারণ সম্ভবত ঐ আর্দ্রতা বা তরল জিনিস পরিমাণে নাপাক হওয়ার পরিমাণের চেয়ে কম ছিল। কিন্তু বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর তার শরীরে যে তরল পদার্থ লেগে থাকে, তা অপবিত্র। যেমন, ইমাম নববী রহ. মুহাজ্জাব-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং ইমাম রাফেয়ী রহ. 'ছগীর'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরভাগ থেকে যে তরল পদার্থ বের হয়, তা অপবিত্র। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মেয়েদের লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা এবং পুরুষের লজ্জাস্থানের অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতার মধ্যে পার্থক্য হল, পুরুষের অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা পিচ্ছিল হয়। এজন্য তা

শরীরের আর্দ্রতার সাথে মিশ্রিত হয় না। বিধায় এটাকে এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : মহিলাদের লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা মজি (যৌনরস) ঘামের মধ্যকার সাদা পানির মত যেমনটি ইমাম নববী রহ. তাঁর শরহে মুহাজ্জায়ে গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। নোংরা স্থানে বিচরণকারী মুরগি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা 'জালালা'-এর আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রবাদ প্রবচন

আরবগণ বলে থাকে اعطف من ام احدى وعشرون 'অমুক ব্যক্তি একুশ দিনের মা' তথা মুরগির চেয়েও অধিক দয়ালু।

মুরগির ঔষধি গুণ

মুরগির গোশত ভারসাম্যপূর্ণ এবং উত্তম। অল্প বয়স্ক মুরগির গোশত বুদ্ধি এবং মণি (বীর্য) বৃদ্ধি করে। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে। তবে পেটের জন্য কিছুটা ক্ষতিকর। বিশেষত অত্যধিক পরিশ্রমি লোকদের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। এ ক্ষতির লাঘব থেকে পারে তা খাওয়ার পর মধুর শরবত পান করলে। এতে খাদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি হবে। যা মধ্যম স্বভাবের লোকদের জন্য উপযুক্ত। যুবকদের জন্য এর গোশত বসন্তকালে বেশি উপযোগী। মুরগির গোশত তত গরম নয় যে, দেহের পিত্তরস বৃদ্ধি করবে আবার এত ঠাণ্ডাও নয় যে, দেহের কফ বৃদ্ধি করবে বরং এটা ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : আমার আশ্চর্য লাগে কী করে সাধারণ মানুষ এবং ডাক্তারগণ এ বিষয়ে একমত হয় যে, মুরগির গোশত (নোকরাস) রোগ সৃষ্টি করে। মানুষ এ সমস্ত কথা অভিজ্ঞতা ছাড়াই বলে থাকে। অথচ এতে মানুষের গায়ের রং কমনীয়, মেধা ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। এটা মূলত সচ্ছল ও রসনা বিলাসী লোকদের খাদ্য। বিশেষ করে যখন মুরগি ডিম দেয়ার পূর্বে খাওয়া হয়।

মুরগীর ডিম গরম এবং অতিশয় আর্দ্র হয়ে থাকে। তবে বায়ারুক-এর মতে মুরগীর ডিম ঠাণ্ডা প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর কুসুম কলিজার জন্য বেশ গরম হয়ে থাকে। কিন্তু যৌন শক্তিতে অতি উপকারী। মুরগীর ডিম যদি দৈনিক নিয়মিত খাওয়া হলে চেহারাতে দাগ পড়ে যায়। আবার ডিম দেরীতেও হজম হয়। তাই এর ক্ষতির দিক থেকে বাঁচতে হলে এর কুসুম ব্যবহার করতে হবে।

সবচেয়ে ভাল ডিম হল মুরগি এবং তিতিরের ডিম। তবে তা তাজা এবং আধা সিদ্ধ খেতে হবে। শক্ত ডিম তাপ অথবা জ্বর উৎপন্ন করে। ডিম ভালভাবে হজম হলে তা অনেক খাদ্যপ্রাণ তৈরি করে। ডিম সিরকাসহ খাওয়া হলে তা পেটের মধ্যে কাঠিন্য সৃষ্টি করে। সাদা ডিম পেট ও মূত্রথলির উষ্ণতা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী। সবচেয়ে উপকারী সিদ্ধ ডিম।

আল্লামা কাজবীনি রহ. লিখেছেন : যদি মুরগিকে দশটি পিঁয়াজ দিয়ে পাকানো হয় এবং তাতে এক মুষ্ঠি খোসা ছড়ানো তিল দেয়া হয়, তারপর পাতিলের মধ্যে ছনছন আওয়াজ হওয়া পর্যন্ত জ্বাল করে তা খাওয়া হয়, তাহলে এতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। কাজবীনি আরও লিখেছেন : মুরগির পেটের মধ্যে একটি পর্দা আছে। ওই পর্দাটি মৃগি রোগীর শরীরে মালিশ এবং তার গলাতে ঝুলায়ে দেয়া হলে ওই মৃগী রোগীর অনেক উপকার হয়। সুস্থ ব্যক্তির গলায় পড়িয়ে দেয়া হলে তার যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে বদনজর থেকেও নিরাপদ থাকা যায়। উক্ত পর্দা কোন বাচ্চার মাথার নিচে রেখে দেয়া হলে সে ঘুমের মধ্যে আর ভয় পাবে না। কোন কাল মুরগির পায়খানা কোন ব্যক্তির দরজায় লেপে দেয়া হলে ওই ঘরের অধিবাসীরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। যদি কালো মুরগির পিত্ত কোন পুরুষ যৌনাঙ্গে মালিশ করে কোন মহিলার সাথে সহবাস করে, তাহলে উক্ত মহিলা ওই পুরুষ ছাড়া অন্য কাউকেও গ্রহণ করবে না।

কালো মুরগির মাথা নতুন পাত্রে ভরে আপন স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত কোন স্বামীর খাটের নিচে পুঁতে রাখলে উক্ত পুরুষ তৎক্ষণাত তার স্ত্রীর সাথে সন্ধি স্থাপন করবে। কোন পুরুষ চার দিরহাম পরিমাণ কালো মুরগির চর্বি নিজের কাছে রাখলে তার যৌন শক্তিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে।

সম্পূর্ণ কালো মুরগি এবং কালো বিড়ালের চোখ শুকিয়ে চূর্ণ করে সুরমার মত চোখে লাগানো হলে ওই চূর্ণ ব্যবহারকারী আত্মসমূহকে দেখতে পারে। তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর করতে পারে। ইবনে ওয়াহশিয়া লিখেছেন সাপে দংশিত স্থানে মুরগির মগজ লাগালে ওই বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ।)

আমলসমূহ

(১) জাদু-টোনা, বাণ ইত্যাদি দূর করার আমল : যে ব্যক্তির যৌন চাহিদা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অথবা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার জন্য নিম্নবর্ণিত আমলটি বেশ উপকারী। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত বাক্যগুলো তলোয়ারের উভয় পার্শ্বে লিখে উক্ত তলোয়ার দ্বারা একটি কালো ভুনা মুরগি এবং পরিষ্কার একটি ডিম সমান দুভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ নিজে খাবে এবং অন্য ভাগ স্ত্রীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ এতে উপকার পাবে। বাক্যটি হল–

بكصم لا لا ومرماما لا لا ؁؁؁

(২) বন্ধ দূর করার দ্বিতীয় আমল : নিম্নবর্ণিত আয়াতটি কাগজে লিখিয়া পুরুষের গলায় তাবিজ আকারে ঝুলিয়ে দিবে। আয়াতটি হল—

وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجرى باعيننا جزاء لمن كان كفر

(৩) বন্ধ দূর করার একটি পরীক্ষিত আমল : সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে ইখলাস, সূরায়ে ফালাক ও নাছ, যথা–

সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত—

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُها قَاعًا صَفْصَفاً لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدرا

উপর্যুক্ত সূরা ও আয়াতসমূহ কাগজের উপর লিখে সর্বশেষে মহিলা ও পুরুষের নাম লিখবে। এরপর নিম্নলিখিত দুআ পাঠ করে কাগজের উপর দম করবে। এরপর উক্ত তাবিজ পুরুষের গলায় ঝুলিয়ে দিবে। দুআটি নিম্নরূপ :

اللهم انى اسألك ان تجتمع بين فلان ابن فلانة (এখানে পুরুষ এবং তার মায়ের নাম লিখবে) وبين فلانة بنت فلانة (এখানে মহিলার নাম এবং তার মায়ের নাম লিখবে بحق هذه الاسماء والايات انك على كل شيئ قدير।

স্বপ্নে মুরগি দেখার তাবীর

স্বপ্নে মুরগি দেখা লাঞ্ছিত-অপমানিত মহিলার প্রতি ইঙ্গিত। মুরগির বাচ্চা দেখা ব্যভিচারের সন্তান বুঝায়। কখনও কখনও স্বপ্নে মুরগি দেখার তাবীর অধিক সন্তানদাত্রী মহিলা দ্বারা করা হয়। অসুস্থ ব্যক্তি স্বপ্নে মুরগি দেখা সুস্থ হওয়ার আলামত। কখনও কখনও স্বপ্নে মুরগি দেখা বিপদ এবং পেরেশানী হত মুক্তি লাভ, কখনও নির্বোধ সুন্দরী মহিলা বুঝায়। স্বপ্নে অনেক মুরগিকে একদিক থেকে অন্যদিক তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে বন্দি হওয়ার আলামত।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের ঘরে মুরগি ডাকাডাকি করছে দেখা সে পাপী হওয়ার আলামত।

মোরগের পর দেখার ব্যাখ্যা করা হয় ধন-সম্পদ। স্বপ্নে মুরগির ডিম দেখার ব্যাখ্যা মহিলা দেখা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন : كانهن بيض مكنون "যেন তারা সংরক্ষিত ডিম। এ আয়াতে মহিলাদেরকে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাঁচা ডিম খেতে দেখার ব্যাখ্যা হারাম মাল ভক্ষণ করা। কোন গর্ভবতী মহিলা স্বপ্নে তাকে পরিষ্কার ডিম দেয়া হয়েছে দেখলে বুঝবে তার মেয়ে জন্ম নিবে। কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ডিমের খোসা ছাড়িয়ে সাদা অংশ খাচ্ছে এবং কুসুম ফেলে দিচ্ছে দেখলে বুঝবে সে কাফন চোর। যেমন, স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল– আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ডিমের খোসা ছড়িয়ে সাদা অংশ খাচ্ছি আর কুসুম ফেলে দিচ্ছি। এর ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বললেন, তুমি কাফন চোর। পরে যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এ ব্যাখ্যা কেন গ্রহণ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ডিম হল কবর, কুসুম হল শরীর আর সাদা অংশ হল কাফনের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং এ ব্যক্তি মুরদারকে ফেলে দেয় এবং কাফনের মূল্য কাজে লাগায়। সাদা অংশ দ্বারা কাফন বুঝানো হয়েছে।

বর্ণিত আছে, জনৈক মহিলা মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনের নিকটে এসে নিজের এ স্বপ্নের কথা বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে মেয়েদের নিচে ডিম রাখছে এবং উক্ত ডিম থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন এ স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, দূরাচার! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তুমি এমন কাজে লিপ্ত রয়েছ, যা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন অর্থাৎ ব্যভিচার এরপর মজলিসে উপস্থিত লোকজন তাকে বললন, আপনি মহিলাটির উপর অপবাদ দিয়েছেন। আপনি কীভাবে এ ব্যাখ্যা করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআলা এ كانهن بيض مكنون আয়াতের মাধ্যমে মহিলাদেরকে ডিমের সাথে তুলনা করেছেন। অন্য এক আয়াতে মুনাফিকদেরকে কাষ্ঠের সাথে তুলনা করে বলেছেন, كانهن خشب مسندة সুতরাং ডিম দ্বারা মহিলা, কাষ্ঠ দ্বারা পাপাচারী আর বাচ্চা দ্বারা ব্যভিচারের সন্তান বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

৩০৫. الدجاجة الحبشية (আদ-দাজাজাতুল হাবশীয়াহ) চীনা মুরগি

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, মুহরিমের জন্য চীনা মুরগি শিকার করা হারাম। কেননা মূলত বন্য প্রাণী। তবে কদাচ এটা ইহা পোষও মানে।

কাযী হুসাইন বলেন : চীনা মুরগি তিতিরের মত হয়ে থাকে। আর ইরাকবাসীরা একে সিন্ধী মুরগি বলে। যদি মুহরিম ব্যক্তি একে হত্যা করে ফেলে, তাহলে জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু ইমাম মালেক রহ.- এর মতে এর জরিমানা দিতে হবে না। কেননা এটা জনপদে এসে পোষ মেনে থাকে।

সারকথা, ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর নিকটে প্রত্যেক ওই প্রাণীর বিনিময়ে জরিমানা দিতে হবে, যা মূলত বন্য প্রাণী। এটা অবশ্য ঘটনাক্রমেই পোষ মেনে থাকে। ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব এর বিপরীত। তার মতে এটা গৃহপালিত প্রাণীর অনুরূপ। এরা সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। পশ্চিমা দেশে এটা অধিক পাওয়া যায়। এর বাচ্চাও গৃহপালিত মুরগির মত ডিম থেকে বের হয় এবং তৎক্ষণাত খাবার খুটে খেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা ইনশাআল্লাহ গাইন অনুচ্ছেদে غرغر শব্দের অধীনে আসবে।

৩০৬. الدج (আদ্‌দাজ্জু) সামুদ্রিক পাখি

আদ্‌দাজ্জু (বন্য কবুতরের মত একটি সামুদ্রিক পাখি) এর গোশত খুবই ভাল। এটা আলেকজান্দ্রিয়া এবং তদ্রূপ উপকূলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইবনে সাইয়িদা এমনই বলেছেন।

৩০৭. الدحرج (আদ্‌দাহরাজ) একধরনের ছোট চতুষ্পদ প্রাণী

৩০৮. الدخاس (আদ্‌দুখাস) একধরনের ছোট পাখি

আদ্‌দুখাস শব্দটি 'নুহাস' ওজনে ব্যবহৃত। এটা একধরনের ছোট পাখি, যা মাটির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এর বহুবচন دخاسيس (দাখাসিস) আসে।

৩০৯. الدخس (আদ্‌দুখাসু) একধরনের সামুদ্রিক প্রাণী

আদ্‌দুখাসু : (দাল পেশ যোগে এবং 'খা' তাশদীদ যোগে পড়তে হবে)। একে ডলফিনও বলা হয়। যেমনটি ইবনে সাইয়িদা লিখেছেন। এ প্রাণী সমুদ্রের মধ্যে ডুবন্ত মানুষকে নিজের পিঠের উপর আশ্রয় দিয়ে সাঁতরিয়ে তীরে আসতে সাহায্য করে।

৩১০. الدخيل (আদ্‌দুখাল্লু) মেটে রঙের একধরনের ছোট পাখি

আদ্‌দাখাল্লু : (খা তাশদীদ যোগে পড়তে হবে)। এ পাখি গাছে থাকে। বিশেষ করে খেজুর গাছে থাকে। এর বহুবচন دخاخيل দাখাখিল।

৩১১. الدرج (আদ্‌দূরাজু) তিতির

আদ্‌দূরাজ : (দাল পেশ যোগে এবং 'রা যবর যোগে পড়তে হবে)। এর উপনাম হল আবুল হাজ্জাজ, আবুল খাত্তার এবং আবু খাসতা। এটা একটি মুবারক প্রাণী। এরা অনেক বাচ্চা দেয়। এ পাখি বসন্ত কালের সুসংবাদ প্রদান করে। এরা ডাকের সময় বলে– تدوم النعم بالشكر অর্থ, 'আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে নেয়ামত স্থায়িত্ব লাভ করে'। এ বাক্যটি কবিতার পংক্তির মত তার মুখে উচ্চারিত থেকে থাকে। পরিষ্কার এবং উত্তরের হাওয়ায় এরা খুবই দর্শনীয় হয়ে উঠে। কিন্তু দখিনা হাওয়ায় এদের অবস্থা হয় করুন।

এমনকি এরা তখন উড়তে পর্যন্ত অক্ষম হয়ে যায়। তিতিরের পালক কালো হয়। তবে তিতিরের গোশত খুবই ভাল ও পবিত্র।

দূররাজ শব্দ দ্বারা মাদী এবং পুরুষ তিতির উভয়কেই বুঝানো হয়। অবশ্য حيقطان বলা হলে এর দ্বারা বিশেষ করে পুরুষ তিতির বুঝানো হয়। যে ভূমিতে অধিক পরিমাপে তিতির বসবাস করে, তাকে ارض مدرجة বা অধিক তিতির অধ্যুষিত অঞ্চল বলা হয়। সিবওয়াই রহ. বলেছেন, আদ্‌দূরাজ বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর একবচন দারজুজুন। তিতিরকে 'ধিলাম'ও বলা হয়।

ইবনে সাইয়িদাহ বলেন, দূরাজ হাইকাতানের (তিতিরের) মত একধরনের পাখি। এটা ইরাকে পাওয়া যায়। জাহেয বলেছেন : তিতির দেখতে একধরনের কবুতরের মত। কবুতর যেভাবে নিজের বাহু দ্বারা ডিম আড়াল করে রাখে, তেমনি তিতিরও নিজের ডিম একস্থানে থাকতে দেয় না বরং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে থাকে। যাতে এদের আবাসস্থল সম্পর্কে কেউ জানতে না পারে। এদের আরেকটি অভ্যাস হল, পুরুষ তিতির তার মাদী তিতিরের সাথে মিলন করবার সময় নিজেদের বাসায় থাকে না বরং জংগলে গিয়ে সহবাসের ব্যবস্থা করে। আবু তাইয়্যেব মামুনি তিতিরের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছেন :

قد بعثنا بذامت حسن بديع + كنبات الربيع بل هى احسن

فى رداء من جدنا روائس + وقميص من ياسمين وسوسن

"আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক অনুপম সৌন্দর্যে। যেমন বসন্তকালের সতেজতা ও সজীবতা বরং তদপেক্ষা আরও বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে এবং এম্বুশকৃত চাদরের মধ্যে চামিলী এবং গোলাপের জামা পরিহিত অবস্থায়।"

তিতিরের শরঈ বিধান

তিতির হালাল। কেননা এটা কবুতরের বংশধর থেকে অথবা ঘুঘুর বংশধর থেকে সৃষ্ট। আর উভয়টাই হালাল।

প্রবাদ প্রবচন

আরবগণ বলে থাকেন : فلان يطلب الدراج من خبس الاسد 'অমুক ব্যক্তি বাঘের পালের মধ্যে তিতির তালাশ করছে'। এ উপমাটি আরবরা দুষ্প্রাপ্য বস্তু সন্ধানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে।

তিতিরের ঔষধি গুণ

তিতিরের চর্বি কেওড়ার মধ্যে গুলোয়ে ব্যথাযুক্ত কানের মধ্যে তিন ফোঁটা ঢেলে দেয়া হলে ইনশাআল্লাহ ব্যথা তৎক্ষণাত দূর হয়ে যাবে। ইবনে সিনা

লিখেছেন, তিতিরের গোশত খুবই ভাল এবং নরম। এর গোশত জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বীর্য বৃদ্ধি করে থাকে।

তিতির স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে তিতির দেখার দ্বারা ধন-সম্পদ, মহিলা বা দাসী-বাঁদী বুঝানো হয়। স্বপ্নে কেউ তিতিরের মালিক হয়েছে অথবা তিতিরকে নিজের কাছে দেখলে বুঝবে সে মালদার হবে কিংবা কোন মহিলার সাথে তার বিবাহ হবে।

৩১২. الدراج (আদ্‌দারাজ) সজারু

আদ্‌দারাজ (দাল এবং রা যবর যোগে) এটি সারা রাত্রি চলাফেরা করতে থাকে বিধায় একে 'দাবাজ' বলা হয়। ইবনে সাইয়িদা তাই লিখেছেন।

জ্ঞাতব্য

استدراج (অর্থ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অবকাশ লাভ)। 'ইসতেদরাজ' অর্থ– তাই বান্দা কোন পাপ করলে আল্লাহ তাআলা তখন ওই বান্দার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে গাফেল করে দেন। এরপর ধীরে ধীরে তাকে পাকড়াও করেন। হঠাৎ পাকড়াও করেন না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. যুহদ নামক গ্রন্থে উকবাহ বিন আমের রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন : তোমরা যখন দেখবে, আল্লাহ তাআলা কোন মানুষকে তাঁর অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাকে হৃদয়গ্রাহী নেয়ামতসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন, তখন বুঝবে এটা 'ইসতেদরাজ' অর্থাৎ প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে অবকাশ বা ঢিল দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। যার অর্থ, এরপর তারা যখন সে-সমস্ত জিনিস ভুলে থাকল, যা তাদেরকে উপদেশ হিসেবে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য সকল জিনিসের দরজা উন্মুক্ত করে দিই। এমনকি যখন সে-সকল জিনিস যা আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়ে, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি। তখন তারা অস্থির হয়ে পড়ে। –বয়ানুল কুরআন

ইবনে আতিয়া রহ. বলেছেন : কোন কোন আলেম থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতের উপর চিন্তা-ভাবনা করে।

حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتة فاذا هم مبلسون

"এমনকি যে তারা ধোঁকায় পড়ে থাকে সে-সকল জিনিসের মধ্যে, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি। আর তারা নিরাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়।"

মুহাম্মাদ ইবনে নছর বলেছেন, ওই সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা বিশ বছর পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন। হাসান বলেন : আল্লাহ তাআলা যদি কোন ব্যক্তিকে দুনিয়া দান করেন এবং সে কখনও এ চিন্তা না করে যে, এ পার্থিব প্রাচুর্য আমার জন্য একটি পরীক্ষার ফাঁস, তাহলে ওই ব্যক্তির আমলের মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে এবং তার চিন্তা-ভাবনায় ভুল থেকে থাকবে। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছেন এবং সে এ চিন্তা করে যে, তার জন্য এটাই উত্তম, তাহল তার আমল ও চিন্তা-ভাবনায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা হযযরত মূসা আ.-এর উপর অহী প্রেরণ করেছিলেন– যখন তুমি দেখবে দারিদ্র্য তোমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন দেখবে ধন-সম্পদের দরজাও তোমার উপর উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে আর তখন বুঝবে, এমন কোন গুনাহ তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যার শাস্তি দ্রুততার সাথে তোমাকে প্রদান করা হয়েছে।

৩১৩. الدرباب (আদ্দারবাব) বাজ

(বাজ, কবুতরের মত একটি প্রাণী)। এ প্রাণী কাক এবং চিল-এর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। এরিষ্টটল نعوت নামক গ্রন্থে লিখেছেন, এ পাখি মানুষের পোষ মানে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য। এর কণ্ঠস্বর খুবই সুন্দর এবং বিচিত্র। কখনও চাতকের মত সুরেলা কণ্ঠে গান করে, কখনও ঘোড়ার হ্রেষা রবে আওয়াজ করে। আবার কখনও বুলবুলির মত শিস দিয়ে থাকে। এর খাদ্য হল শস্য, ফুল, গোশত ইত্যাদি। এরা অধিকাংশ সময় বাঁশ ঝাড়ে এবং ছোট গাছে বসবাস করে। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী আবু জারক নামক পাখির মধ্যে পাওয়া যায়। এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখিকে কানাকুয়া পাখি বলা হয়। কানাকুয়া পাখি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ক্বাফ অনুচ্ছেদে আসবে।

৩১৪. الدرحرج (আদ্দারহারাজ) একধরনের ছোট পাখি

الدرحرج (আদ্দারহারাজ) কাজবীনী রহ. লিখেছেন, এর পালক লাল এবং কালো হয়ে থাকে। কথিত আছে, এরা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রাণী। কোন ব্যক্তি ভক্ষণ করলে তার মূত্রথলি ফেটে যাবে, তার প্রস্রাব বন্ধ এবং সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তার বুদ্ধিও লোপ পাবে।

আদ্দরহারাজের শরঈ বিধান

এটা ভক্ষণ করা হারাম। কেননা, এটার শরীর ও বুদ্ধি উভয়টার জন্যই ক্ষতিকারক।

৩১৫. الدرص (আদ-দিরছ) ইঁদুর, বিড়াল, খরগোস ইত্যাদির ছানা

الدرص (আদ-দিরছ) (দালে যের) শজারু, খরগোস, ইঁদূর, বন্য ইঁদূর, বিড়াল এবং নেকড়ের বাচ্চাকে বলা হয়। এর বহুবচন--- আসে। সুহাইলি রহ. আত্তারিফ ওয়াল এ'লাম গ্রন্থে লিখেছেন, আরবের অধিবাসীরা আহমক ব্যক্তিকে 'আবু দিরাস' বলে। বন্য ইঁদূরের উপনাম হল উম্মে দিরাস।

প্রবাদ প্রবচন

আরবগণ বলে– ضل دريص نفقه অর্থাৎ 'বেকুফ ব্যক্তি নিজের রিজিক নষ্ট করে ফেলে'। এ প্রবাদটি নিজের লেনদেনে অসচেতন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়।

نما ام درص بارض مضلة + ياغدر من قيس اذا الليل اظلما

অর্থাৎ উম্মে দেরাস ফসলি জমিনের মধ্যে ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি বিচরণ করেছে, রাতের অন্ধকারে কৃষকের অবস্থা যেমন হয়।

৩১৬. الدرة (আদ-দূরাতু) তোতা

الدرة (আদ-দূরাতু) (দালে পেশ) এর বিস্তারিত আলোচনা বা পরিচ্ছেদে --- 'বাবগাউন' শব্দের অধীনে গিয়েছে। শায়খ কামাল উদ্দীন জাফর তার 'আত্ত্বালিউ'ছু-ছাইদ' গ্রন্থে মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ নসবী কাওছি-এর জীবনীতে লিখেছেন : মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ একবার ইজজুদ্দিন বসরাভী-এর মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে অনেক নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শায়খ আলী আল হারীরী এসে বর্ণনা করেন, আমি তোতাকে সূরা ইয়াসীন পড়তে শুনেছি। একথা শুনে নসবী বলেন, কাক সূরায়ে সেজদা তেলাওয়াত করে এবং সেজদার আয়াত তেলাওয়াতের করে এবং এরপর তিনি বললেন سجدك سوادى واطمان باى فوادى অর্থ, আমার ললাট সেজদা করেছে এবং আমার অন্তর তোমারই কারণে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

৩১৭. الدساسة (আদ-দাসাসাতু) সাপ

الدساسة (আদ-দাসাসাতু) দালে যবর হবে। এটা মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, 'দাসাসাতুন' কেঁচোকেও বলা হয়। ইনশাআল্লাহ শীন পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩১৮. العسوقة (আদ-দা'ছুকাতু)
গোবরে পোকার মত একটি প্রাণী

আদ-দা'ছুকাতু العسوقة দালে যবর হবে। গোবরে পোকার মত একধরনের প্রাণীকে বলা হয়। কখনও কখনও খর্বকায় মহিলা ও কন্যাকে উপমা দিতে গিয়ে العسوقة বলা হয়।

৩১৯. العسوس (আদ্দু'মুছুন) পানির কালো পোকা

العسوس (আদ্দু'মুছুন) দালে পেশ হবে। এর বহুবচন دعاميص আসে। সুহাইলী বলেছেন, দু'মুছুন পানির সাপের মত ছোট মাছকে বলা হয়। দা'মিছুন নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এর আলোচনা প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে আসবে। এমনিভাবে বলা হয়ে থাকে, هذا دعميص هذا الامر অর্থ, অমুক ব্যক্তি এ কাজে অভিজ্ঞ।

হাদীসে দু'মুছুনের উল্লেখ

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হাসসান থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-কে বললাম, আমর দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী শুনাবেন, যা তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আমার অন্তর সান্ত্বনার কারণ হবে। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, হ্যাঁ! তোমাদের এ ছোট শিশু জান্নাতে দু'মুছুনের মত হবে। যাদের জান্নাতের যেকোন স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এরপর তারা তাদের পিতামাতা উভয় অথবা যেকোন একজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। এরপর সে তাদের কাপড় হাতে ধরবে। যেমনিভাবে এখন আমি তোমার কাপড় ধরেছি। এরপর সে বলল, ওনি অমুক। এরপর সে থাকবে না। এমনকি সে এবং তার পিতা উভয়ে জান্নাত প্রবেশ করবে।

আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে বিকৃত করে দুমুছুনের আকৃতি বানাইয়া দিয়েছিলেন।

কোন কোন আলেম বলেছেন, দুমুছুন বাদশাহদের দ্বাররক্ষিদেরকে বলা হয়। যেমন, উমিদ ইবনে আবু সালাত বলেছেন—

دعموص ابواب السلوك + وجاجب للخلق فاتح

"রাজা-বাদশাহগণের দরজার প্রহরী, মাখলুককে বাধাদানকারী এবং বাধা উন্মোচনকারী।"

হাফেয মুনযেরী রহ. 'তারগীর ও তারহিব' গ্রন্থে এ হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, دعاميص শব্দটি دعموص এর বহুবচন। দু'মুছুন

এমন একটি ছোট প্রাণী, যার গায়ের রং কালো। জান্নাতে ছোট বাচ্চাদের এ প্রাণীর সাথে তুলনা দেয়ার কারণ হল, এদের ছোট এবং দ্রুতগামী হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, দুমুছুন জনৈক নাম, যে রাজা-বাদশাহদের নিকট অধিক হারে যাওয়া-আসা করত এবং তার প্রহরীদের অনুমতির প্রয়োজন হত না বরং সে যখন যেখানে তাদের মহলের মধ্যে যেতে চাইত, সেখানে যেতে পারত। তার জন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তাই জান্নাতে ছোট বাচ্চাদেরকে তুলনা করা হয়েছে। বাচ্চাদেরও জান্নাতের মধ্যে চলাফেরায় কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তার যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারবে।

আল্লামা হাফেয রহ. বলেছেন, দু'মুছুন বড় হয়ে গেলে তা দা'মিছুন হয়ে যায়। এর জন্ম হয় আবদ্ধ পানিতে। এটা সামুদ্রিক টিড্ডি থেকেও উত্তম। দু'মুছুন এর প্রাথমিক জীবনটা পানিতে অতিবাহিত হয়।

মাসয়ালা

ফাতাওয়ায়ে কাজী হুসাইনে বর্ণিত আছে, পানিতে বসবাসকারী পোকা ফেটে গেলে অথবা চাপ লেগে কুয়ার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসলে ওই পানি দ্বারা অজু করা জায়েয আছে। কারণ, পানিতে বসবাসকারী পোক-মাকড় কোন প্রাণী নয় বরং পানি থেকে যে বাষ্প উঠে, তা জমাট হয়ে পোকার আকৃতি অবলম্বন করে। সুতরাং এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দা'মিছ পানির সাথে গলধঃকরণ থেকে পারে। কিন্তু আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ দা'মিছ হারাম। কেননা এটা জমিনের পোকা-মাকড়ের একটি।

প্রবাদ প্রবচন

আরবগণ বলেন, اهدى من دعا ميص الرمل 'মরুভূমির দা'মিছের চেয়েও অধিক দানকারী'। কথিত আছে, সে ছিল একজন হাবশী গোলাম এবং আশ্রয়হীন ভীত বিহবল। শহরের বসতিতে কখনই আসত না। সে বসন্তকালে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা দিল—

فمن يعطنى تسعا وتسعين بقرة + هجانا دما اهدها اوبار

অর্থ, কে আমাকে ৯৯টি কালো রঙের গাভী দিবে কোন বিনিময় ছাড়াই।

৩২০. الدغفل (আদ্‌দাগফাল) হাতীর বাচ্চা

আদ্‌দাগফাল শব্দটি جعفر ওযনে পড়তে হবে। আদ্‌দাগফাল হাতীর বাচ্চাকে বলা হয়। কেউ কেউ দাগফাল দ্বারা খেঁকশিয়ালের বাচ্চাও বুঝিয়েছেন। দাগফাল ইবনে হানযালা শায়বানী- এর নামটিও এ দাগফাল থেকেই হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী রহ. দাগফাল ইবনে হানযালার সূত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কিছু বাণী বর্ণনা করেছেন। যদিও এ সম্পর্কে তাদের মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, দাগফাল রাসূলুল্লাহ সা.-এর সংশ্রব লাভ করেছেন। মূলত এটা সঠিক নয়।

হযরত হাসান বসরী রহ. দাগফাল থেকে বর্ণনা করেন, দাগফাল বলেছেন: খ্রিষ্টানদের উপর প্রথম এক মাসের রোযা ফরজ ছিল। একবার তাদের বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে মানত করেছিল, যদি আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করে দেন, তাহলে আরও দশ দিন বেশি রোযা রাখব। এরপর খ্রিষ্টানদের অন্য একজন বাদশাহ, যিনি গোশত খুব পছন্দ করতেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে মানত করেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি সুস্থ করে দেন, তাহলে গোশত খাওয়া ছেড়ে দিব এবং অতিরিক্ত আরও আট দিন রোযা রাখব। এরপর খ্রিষ্টানদের তৃতীয় আরেকজন বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি মানত করেন, আমি সুস্থ হলে পূর্ণ পঞ্চাশটি রোযা রাখবেন এবং ওই রোযাগুলো বসন্তকালে আদায় করবেন। এভাবে খ্রিষ্টানদের উপর পঞ্চাশটি রোযা ফরজ হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, দাগফাল একজন আলেম ছিলেন; সাথে সাথে তিনি একজন কামুক আত্মপূজারী লোক ছিলেন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি. তার নিকটে আরবগণের বংশধারা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আরবী এবং কুরাইশদের বংশধারা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। দাগফাল এর যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। এরপর আমীর মু'আবিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি এতকিছু কোত্থেকে শিখেছ? দাগফাল উত্তর দিয়েছিলেন, অধিক প্রশ্নকারীর জিহ্বা এবং ধীমান অন্তর দ্বারা। এ কথা শুনে আমীর মু'আবিয়া দাগফালকে নিজের পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

৩২১. الدغناش (আদ্‌দাগনাশ) একধরনের চড়ুই পাখি

الدغناش (আদ্‌দাগনাশ) একধরনের চড়ুই পাখি। এর পিঠের উপর লাল রঙের রেখা এবং গলায় কালো ও সাদা রেখা থাকে। এর স্বভাব উদ্যত হয়ে থাকে। এর ঠোঁট খুবই শক্ত হয়। এ পাখিগুলো উপকূলীয় অঞ্চলে খুব বেশি পাওয়া যায়। অন্যান্য চড়ুই পাখির মত এটা হালাল ও পবিত্র।

৩২২. الدقيش (আদ্ দুকাইশ) একধরনের চড়ুই পাখি

الدقيش (আদ দুকাইশ) একধরনের চড়ুই পাখি। দাল পেশ যোগে এবং কাফ পেশ যোগে পড়তে হবে। সাধারণ লোকেরা এটাকে দাকনাস বলে থাকে। এর শরঈ বিধান দাগনাশের মত। হয়তো দাগনাশের অপর নাম দুকাইশ। কখনও এটাকে দাগনাশ এবং কখনও দুকাইশ বলা হয়।

সিহাহ সিত্তায় উল্লেখ আছে, লোকেরা কবি আবু দুকাইশ-এর নিকট দুকাইশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি এর বাস্তবতা সম্পর্কে জানি না। মানুষের মুখে শুনেছি এর ভিত্তিতে দুকাইশ নাম রেখেছি।

৩২৩. الدلدل (দুলদুল) দুলদুল

الدلدل (দুলদুল) শব্দের মূল অর্থ হল, অস্থির এবং পেরেশান। এ কারণেই মেঘকে দুলদুল বলা হয়। যখন তা ধারাবাহিকভাবে সঞ্চালিত হয়। রাসূলুল্লাহ সা.-কে মুকাওকাস বাদশাহ যে খচ্চরটি উপহার দিয়েছিল, তাকে তার দ্রুত গতির কারণে দুলদুল বলা হত। যার বিস্তারিত আলোচনা আবু মারসাদ রাযি.-এর হাদীসে আসবে। আল্লাহ বলেছেন, হে তাবুর অধিবাসীরা! এটা দুলদুল (খচ্চর) যা তোমাদের সরদার মুহাম্মাদ সা.-কে নিজের উপরে আরোহণ করায়। একে সজারুর সাথে এ কারণে তুলনা করা হয় যে, তা অধিকাংশ সময় রাতে বের হয় এবং নিজের মাথা বালুর মধ্যে লুকিয়ে রাখে। হাফেয রহ. বলছেন যে, দুলদুল এবং সজারুর মধ্যে এমন পার্থক্য যেমনটি গাভী এবং মহিষের মধ্যে হয়ে থাকে। এ প্রাণী সিরিয়া, ইরাক এবং পশ্চিম শহরগুলোতে অধিকহারে পাওয়া যায়। রাফেয়ী রহ. বলছেন যে, দুলদুল ছাগলের বাচ্চার মত একধরনের প্রাণী, যার অভ্যাস হল দণ্ডায়মান অবস্থায় মাদী দুলদুলের সাথে সহবাস করে। নিজের পিঠ মাদী দুলদুলের পিঠের সাথে মিলিয়ে রাখে। মাদী দুলদুল পাঁচটি ডিম দেয়। এর ডিম মূলত ডিম নয় বরং ডিমের আকৃতিতে গোশতের খিমা। এ প্রাণীর আর একটি বিশেষ অভ্যাস হল, এরা ঘরের মধ্যে দুটি দরওয়াজা তৈরি করে। একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে। যেদিক থেকে বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সাময়িকভাবে ওই দিকের দরজা বন্ধ করে দেয়। এর আরও একটি বিশেষ স্বভাব হল, যখন এরা নিজেদের স্বভাবের পরিপন্থী কোন কিছু দেখে, তখন নিজেকে সংবরণের কারণে তার পিঠের উপর একটি কাঁটা দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং যার শরীরে এই কাঁটা লাগবে, তাকে আহত করে দিবে। এই কাঁটা এক হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই কাঁটা মূলত কাঁটা নয় বরং তার চুল, যা উত্তেজনার তীব্রতার কারণে লোমকূপ থেকে বের হওয়ার সময় শুষ্ক হয়ে কাঁটার আকৃতি গ্রহণ করে।

দুলদুলের শরঈ বিধান

ইবনে মাজাহ রহ.-সহ প্রমুখগণ ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে তা হালাল হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু রাফেয়ী রহ. তাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ওসীত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাফেয়ী রহ. তাকে নোংড়া জিনিসের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইবনে সালাহ রহ. এই বক্তব্যকে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে লিখেছেন : রাফেয়ী রহ. দুলদুলের মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নন। শায়েখ আবু আহমাদ আশনাহী রহ.-এর এ বক্তব্য যে, 'দুলদুল বড় খচ্চরকে বলা হয়' এ কথার ভিত্তিতে তাকে হারাম বলা হয়েছে। অথচ এটা ভুল। সঠিক হল, দুলদুল পুরুষ সজারুকে বলা হয় এবং মাওয়ারদী প্রমুখগণ তা হারাম হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন।

প্রবাদ প্রবচন

আরবরা কারও শ্রবণশক্তির প্রখরতা প্রকাশ করতে বলে থাকে اسمع من دلال 'সজারুর চেয়েও বেশি শ্রবণকারী'। সজারুর ঔষধী গুণ এবং স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ কাফ অনুচ্ছেদের قنفذ (কুনফুজ) সজারুর আলোচনায় বর্ণনা করা হবে।

৩২৪. الدلفين (আদ্‌দালফিন) ঘড়িয়াল মাছ

الدلفين (আদ্‌দালফিন) ঘড়িয়াল মাছ (ডলফীন) এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী, যা ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাইয়া থাকে। উহারা নিজেদের কোমরের সাহায্যে ডুবন্ত মানুষকে সাঁতারাইতে সাহায্য করে। মিসরের নীল নদের যে স্থানে নীল নদ সমুদ্রের সালে মিলিত হয়েছে, সেখানে ডলফিন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কেননা যখন সমুদ্রের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন এরা পানিতে সাঁতার কাটতে কাটতে নীল নদে এসে পড়ে। এদের অবস্থা ওই মেশকের মত যা বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর মাথা খুবই ছোট। সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র ডলফিন ছাড়া অন্য কার ফুসফুস নাই। এ কারণেই এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনা যায়। যদি কোন ডুবন্ত ব্যক্তি সৌভাগ্য বশত এদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে বাঁচানোর জন্য তার চেয়ে শক্তিশালী ও উপযুক্ত মাধ্যম আর নাই। কেননা এরা ওই ডুবন্ত ব্যক্তিকে ঠেলতে ঠেলতে তীরের দিকে নিয়ে আসে। এমনকি তাকে ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ করে। এরা কাউকেও কষ্ট দেয় না। এদের খাদ্য শুধু মাছ। কোন কোন সময় এরা পানির উপর মৃত প্রাণীর মত ভাসতে থাকে। এরা নিজ বাচ্চাদেরকে দুধ পান করায়। যেখানেই যায় বাচ্চাও এদের সাথে থাকে। এরা শুধু গ্রীষ্মকালে বাচ্চা জন্ম দেয়। এরা স্বভাবগতভাবেই মানুষদেরকে এবং বিশেষ করে শিশুদেরকে খুবই ভালবাসে।

যদি কোন শিকারী একে ধরে ফেলে তখন এর সমজাতীয় সকল মাছ ওই শিকারীর সাথে লড়াই করতে চলে আসে। এরা পানির নিচে দীর্ঘ সময় অবস্থান করলে এদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন শ্বাস গ্রহণের জন্য অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পানির উপরে উঠে আসে। সেই সময় তার সম্মুখে কোন নৌকা চলে এলে এরা এত জোড়ে ধাক্কা দেয় যে, নৌকার উপরে এসে পড়ে। পুরুষ ডলফিন কখনও মাদী ডলফিন থেকে পৃথক হয় না।

ডলফিনের শরঈ বিধান

সাধারণ মাছের মত এও হালাল ও পবিত্র।

ডলফিনের ঔষধি গুণ

ডলফিনের চর্বি কোন কাঠের পাত্রে গুলোয়ে কানের মধ্যে দিলে বধিরতার জন্য উপকার হয়। এর গোশত ঠাণ্ডা এবং গুরুপাক। যদি এর দাঁত বাচ্চাদের

গলায় ঝুলায়ে দেয়া হয়, তবে বাচ্চাদের ভয় পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর চর্বি মালিশ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) জোড়াসমূহের ব্যথার জন্য খুবই উপকারী। এর চর্বি এবং চামড়া আগুনে পুড়িয়ে কোন মহিলার চেহারায় মালিশ করলে তার স্বামী তাকে ভালবাসবে এবং তার অনুগত হয়ে যাবে। এর ডান পার্শ্বের চোয়াল সাত দিন পর্যন্ত গোলাপের পানির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে কোন ব্যক্তির চেহারায় মালিশ করা হলে সকল মানুষ তাকে ভালবাসবে। পক্ষান্তরে এর বাম চোয়াল একইভাবে ব্যবহার করলে বিপরীত কাজ হবে।

ডলফিন স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

ডলফিন স্বপ্নে দেখা মাগুর মাছ স্বপ্নে দেখার মত। কখনও এটা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হয় অধিক বৃষ্টি বর্ষণ আবার কখনও ব্যাখ্যা হয় ধোকা; প্রতারণা, চুরি, গীবত ইত্যাদি। কুদসীর বক্তব্য অনুযায়ী কোন ভীতু লোক এটি স্বপ্নে দেখলে তার অর্থ, ওই ব্যক্তির ভয় দূর হয়ে যাবে। এ ব্যাখ্যা দানের কারণ, ডলফিন ডুবন্ত মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তার ভয় ও অস্থিরতা দূর করে। যে প্রাণী জাগ্রত অবস্থায় দেখার কারণে ভয় সৃষ্টি হয়, যেমন– মাগুর মাছ, এমন প্রাণী পানির বাইরে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হয়, শত্রু, যেকোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। কেননা তা আক্রমণ পানির মধ্যে। কিন্তু যখন তা পানির বাইরে চলে আসবে, তখন তার আক্রমণ করার ক্ষমতাও দূর হয়ে যাবে।

৩২৫. الدلق (আদ্‌দালকু) ছামুরের মত একধরনের প্রাণী[১]

الدلق (আদ্‌দালকু) ছামুরের মত একধরনের প্রাণী। দালকু শব্দটি ফার্সি; আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে। এ প্রাণী সম্পর্কে আব্দুল লতিফ বাগদাদী বলেছেন : এরা প্রাণীদের হত্যা করে তার রক্ত পান করে। ইবনে ফায়েজ 'মুজমাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দালকু نمس (নামছ)-কে বলা হয়। নামছ হল ছোট কান ও লম্বা লেজ বিশিষ্ট বিড়ালের মত একধরনের প্রাণী। এরা ইঁদুর সাপ ইত্যাদি ধরে খায়। রাফেয়ী বলেন : দালক ইবনে মোকরেছকেও বলা হয় একধরনের বন্য প্রাণী এবং কবুতরের বড় শত্রু। এটা যে উপত্যাকায় যায়, সেখানকার সমস্ত কবুতর সাফ করে ফেলে। সাপ এর আওয়াজ শুনে ভীত হয়ে যায়। মীম অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত আলোচনা এবং এ সম্পর্কের নববী ও রাফেয়ীর মধ্যে মতানৈক্য উল্লেখ করব। ইবনে সালাহের ভ্রমণ বিবরণীতে বর্ণিত আছে, দলক খাওয়া নাজায়েয। কিন্তু ইবনে সালেহের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, তিনি দালককে মনে করেছেন।

---

[১] খেঁকশিয়ালের মত বরফ অঞ্চলের একধরনের প্রাণী।

দালকের ঔষধী গুণ

জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির গলায় এর ডান চোখ ঝুলিয়ে দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়। যে গম্বুজের মধ্যে কবুতর বসবাস করে, ওই গম্বুজে এর চর্বি পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে সমস্ত কবুতর পালিয়ে যাবে। এর চর্বির ধোঁয়া আহমকের জন্য খুবই উপকারী। এতে মানুষের আহমকী অনেকাংশে দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তির মৃগি রোগ আছে, তার নাকের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ উক্ত প্রাণীর রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে দিলে মৃগি রোগ ভাল হয়ে যায়। শূল বেদনা এবং অর্শ রোগীর জন্য এর চামড়ার উপর বসা খুবই উপকারী।

৩২৬. الدلم (আদ্‌দালামু) একধরনের কীট

الدلم (আদ্‌দালামু) একধরনের কীট। আরবরা বলেন- 'অমুক ব্যক্তি দালাম কীট থেকেও বেশি শক্ত'। এ উপমাটি কঠোরপ্রাণ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়। যেমনি এ কীট কার শরীরের সাথে লেগে গেলে তা ছাড়ানো খুবই কষ্টকর হয়।

৩২৭. الدلهما (আদ্‌দালহামা) মানুষের অনুরূপ একধরনের প্রাণী

الدلهاما (আদ্‌দালহামা) মানুষের অনুরূপ একধরনের প্রাণী। কাজবীনী রহ. লিখেছেন, এটা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে উটপাখির উপর আরোহী মানুষের মত দেখতে পাওয়া যায়। এরা সমুদ্রে নিমজ্জিত মানুষের গোশত খায়। কথিত আছে, একবার সমুদ্রের মধ্যে এরা এক নৌকার সম্মুখে এসে পড়ে। নৌকার আরোহীরা এর সাথে লড়াই শুরু করে। এ পর্যায়ে ওই প্রাণী এমন বিকট আওয়াজে চিৎকার করে যে, তাতে নৌকার সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এরপর বেহুঁশ মানুষদেরকে সে করায়ত্ত করে।

৩২৮. الدم (আদ্‌দিমু) সুসজ্জিতকরণ

الدم (আদ্‌দিমু) সুসজ্জিতকরণ। (দালে যের) আদ্‌দিমু সুসজ্জিত করণকে বলা হয়।

৩২৯. الدنة (আদ্‌দিন্নাতু) পিপীলিকার মত একধরনের প্রাণী

الدنة পিপীলিকার মত একধরনের প্রাণী। নুন তাশদীদ যোগে পড়তে হবে। ইবনে সাইয়িদা বলেন, এটা পিপীলিকা সদৃশ একধরনের প্রাণী।

৩৩০. الدنيلس (আদদুনাইলিস) পানিতে বসবাসকারী এক ধরনের প্রাণী

الدنيلس (আদ্‌দুনাইলিস) পানিতে বসবাসকারী একধরনের প্রাণী। জিবরীল ইবনে নাজতিসু বলেছেন, দানলিস পেট এবং বমির জন্য খুবই উপকারী।

দানলিসের শরঈ বিধান

এটা সামুদ্রিক খাবারের অন্তর্ভূক্ত। এরা সমুদ্রের মধ্যেই জীবন যাপন করে। এটা হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। শায়খ শামসুদ্দিন ইবনে আদলান এবং তাঁর সমসাময়িক আলিমগণও একই ফাতাওয়া দিয়েছেন। শায়খ আইজুদ্দিন থেকে উটা হারাম বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কথাটা সঠিক নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. স্পষ্ট করে বলেছেন : সমুদ্রে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী যা পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, তা সবই হালাল। কুরআনের আয়াতের ব্যাপকতা এবং হাদীস هو الطهور ماؤه ميتته এর আলোকে হালাল। এ প্রসঙ্গে দুটি বক্তব্য রয়েছে। প্রথম বক্তব্য হারাম। কারণ, অন্য স্থানে শুধু মাছকেই হালাল বলা হয়েছে, অন্য কোন প্রাণীকে নয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হল সেই সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর অনুরূপ অথবা সমজাতীয় প্রাণী স্থলভাগের প্রাণীর মধ্যে যা হালাল এবং খাওয়া হয়, যেমন বকরী, গাভী ইত্যাদি সেসকল সামুদ্রিক প্রাণীও খাওয়া হালাল। পক্ষান্তরে যে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর অনুরূপ বা সমজায় স্থলভাগের প্রাণী খাওয়া হারাম, যেমন, শূকর ইত্যাদি। এ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীও খাওয়া হারাম। এমনিভাবে সামুদ্রিক কুকুর এবং গাধাও খাওয়া হারাম। যদিও স্থলভাগের বন্য গাধা খাওয়া হালাল। শায়খ ইমাজুদ্দিন আকফাহাসী তাঁর 'আত্-তিবইয়ানু ফী মা ইয়াহিল্লু ওয়া ইয়াহরুমু মিনাল হায়াওয়ান' গ্রন্থে লিখেছেন, শায়খ আইজুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম দুনাইলিস হারাম হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন। এটা এমন একটি মাসয়ালা যা কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ এ প্রসঙ্গে কোন মতানৈক্য করতে পারে না।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেছেন, এরিষ্টটল তার 'নাউতুল হায়ওয়ানে' গ্রন্থে লিখেছেন, কাকড়া বংশগতভাবে সৃষ্টি হয় না বরং গর্তের মধ্যে জমা পানি থেকে সৃষ্টি হয় এবং পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর গর্ত থেকে বের হয়ে যায়। যেমন, মশা পানির নোংরা আবর্জনা থেকে জন্ম হয়। সুতরাং আমরা এরিষ্টটলের ভাষ্য থেকে বুঝতে পারলাম, দুনাইলিস ও অন্যান্য প্রাণী যা গর্ত ইত্যাদির মধ্যে জন্ম নেয়, তা কাকড়া হয়ে যায়। আর সূত্র হল যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হারাম তার মূল উৎসও খাওয়া হারাম। কতিপয় মুফতির পক্ষে থেকে দুনাইলিস খাওয়া হালাল হওয়ার ফাতাওয়া দিতে শুনা গিয়েছে। এ সমস্ত উলামায়ে কেরাম প্রমাণ দেন নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে 'স্থলভাগের যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল অনুরূপ আকৃতির জলভাগের প্রাণীও খাওয়া হালাল।' কিন্তু এ প্রমাণ প্রদান তাদের মোটা বুদ্ধির নিদর্শন। কেননা উপরিউক্ত বক্তব্যের দুটি দিক রয়েছে। এটা ছাড়াও ওই সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী জবাই করা প্রয়োজন হয় কি-না, তাও লক্ষণীয়। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, সামুদ্রিক প্রাণীকে স্থলভাগের পাথরের সাথেও তুলনা করা হবে। সুতরাং যারা দুনাইলিসকে হালাল বলে এ প্রমাণ দিয়েছেন তারা যেন অপবিত্র জিনিসকে

পবিত্র জিনিসের সালে তুলনা করেছেন। এ ছাড়া আরও আবশ্যক হয় যে, সকল নোংরা এবং গর্তে বসবাসকারী প্রাণী হালাল হোক। কেননা দুনাইলিস ছোট শামুকের খোলের মধ্যে জন্ম নেয় এবং পরে বড় হয়ে বের হয়। সুতরাং দুনাইলিসকে হারাম বলা উচিত ছিল। কেননা দুনাইলিসও নোংরা জিনিসের অন্তর্ভূক্ত। যেমন, কেঁচো ইত্যাদি। কেউ বলেছেন, মাঝি-মাল্লারা গর্তে বসবাসকারী প্রাণী খেয়ে থাকে। হাফেয রহ.-এর বক্তব্যে প্রমাণ হয়, দুনাইলিস হালাল এবং পবিত্র নয়। নতুবা তা খাওয়াকে মাঝি-মাল্লার সাথে বিশেষায়িত করতেন না। মিশরীয়রা সিরিয়াবাসীদেরকে কাকড়া খাওয়ার কারণে তিরস্কার করে এবং সিরিয়াবাসীরা মিশরীয়দেরকে দুনাইলিস খাওয়ার কারণে তিরস্কার করে। মূলত উভয়েই অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত। উভয়েই যেন কবির এ কবিতার লক্ষ্যবস্তু।

ومن العجائب والعجائب جمة ان يلهج لاعمى يعيب الاعمش

অর্থ, আশ্চর্যের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের আশ্চর্যজনক কথা হল অন্ধ চাঁদের দোষ চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে।

৩৩১. الدهانج (আদ্‌দাহানিজ) উট

الدهانج (আদ্‌দাহানিজ) অর্থ, উট। দুই কুঁজ বিশিষ্ট উটকে দাহানিজ বলা হয়।

৩৩২. الدوبل (আদ্‌দুবাল) ছোট গাধা

الدوبل (আদ্‌দুবাল) অর্থ, ছোট গাধা। উপাধিও তা থেকে এসেছে এবং এ সম্পর্কেই জারিরের কবিতা–

بكى دوبل لا يرقئ الله دمعه الا انما يبكى من الذل دوبل

অর্থ : দুবাল (ছোট গাধা) কান্না করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে কান্না করছে। কেননা তার নিজের ক্ষুদ্রতার কারণে কান্না আসছে।

৩৩৩. الدود (আদ্‌দুদ) কীট

الدود (আদ্‌দুদ) অর্থ, কীট। কীট অনেক প্রকার হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত কীট হল– কেঁচো, সিরকার পোকা, ফুলের কীট, দেবদারু গাছে জন্ম গ্রহণকারী কীট, মানুষের পেটে জন্মগ্রহণকারী কীট তথা কৃমি ইত্যাদি।

হাদীসে কীটের উল্লেখ

মানুষের পেটের মধ্যেও কীট জন্মগ্রহণ করে। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর একটি বর্ণনা রয়েছে যা আদী রহ. আছমাহ ইবনে মুহাম্মাদ

ফুজালা-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলাল্লাহ সা.-এর এ বাণী বিদ্যমান আছে, রাসূলাল্লাহ সা. বলিয়াছেন : ভোরে খালি পেটে খেজুর খাও, কেননা তা পেটের কীট মেরে ফেলে।' বায়হাকী রহ. তার কিতাব 'শিয়াব' গ্রন্থে সাদাকা ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত দাউদ আ. একদিন নিজ ইবাদত গৃহে প্রবেশ করার পর একটি ছোট পোকার উপর তাঁর নজর পড়ল। পোকাটিকে দেখে তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদয় হল যে, আল্লাহ তাআলা এ ছোট্ট পোকাটিকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তৎক্ষনাত আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ঐ পোকাটি বাকসম্পন্ন হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, হে দাউদ! আপনার নিকটে কি আপনার জীবন প্রিয়? আমি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও আপনার চেয়েও অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার জিকিরকারী এবং শোকরিয়া আদায়কারী। আর আমার এ দাবীর সত্যায়ন আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা হয়ে থাকে وان من شيئ الا يسبح بحمده অর্থাৎ কোন জিনিস এমন নাই, যা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা এবং প্রশংসার ঘোষণা করে না।

ফলের কীট

ফলের কীট শিরোনামের আওতায় আল্লামা জমাখশারী রহ. কুরআনের আয়াত وانى مرسلة اليهم بهدية অর্থাৎ 'আর আমি তার নিকট একজন উপহার প্রেরণকারী'-এর তাফসীরে বর্ণন করেছেন : সারা সম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী বিলকিস হযরত সুলাইমান আ.-এর নিকটে নিম্নোক্ত হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন– (১) ৫০০ দাস, যারা বাঁদীর পোশাক অলংকার দ্বারা সজ্জিত ছিল। (২) ৫০০ দাসী, যারা দাসদের পোশাক পরিহিত ছিল। এ ৫০০ দাসী খুব উন্নত মানের ঘোড়ায় আরোহী ছিল। যে ঘোড়ার জিন ছিল স্বর্ণের তৈরি। (৩) সোনা-রূপার তৈরি ১০০ ইট। (৪) একটি মুকুট, যাতে হলুদ ইয়াকুত পাথর দ্বারা কারুকাজ করা ছিল (৫) মেশক এবং আম্বর। (৬) একটা ডিব্বা, যার মধ্যে একটি মুক্তা এবং একটি মোহর ছিল। যার কিনারা বাঁধানো ছিল। এ সকল উপহার দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল, যারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনের নাম মুনজের ইবনে আমর এবং অপরজন একজন সর্দার ছিল। রওয়ানা হওয়ার সময় বিলকিস তাদেরকে বলেছিল, যদি তিনি নবী হন তাহলে দাস এবং দাসীদেরকে চিনে ফেলবেন। মুক্তার মধ্যে ছিদ্র করে এবং মোহরের মধ্যে সুতা পরিয়ে দিবেন। এরপর মুনজেরকে বললেন, যদি তিনি (সুলাইমান আ.) রাগান্বিত দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকান, তাহলে তোমরা বুঝে নিবে যে, তিনি একজন বাদশাহ মাত্র। ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি বিনম্র ও সম্মানজনক আচরণ তাঁর পক্ষ থেকে অবলোকন কর, তাহলে তোমরা বুঝে নিবে– তিনি একজন নবী। আল্লাহ তাআলা এ সকল কথা অহীর

মাধ্যমে হযরত সুলাইমান আ.-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং হযরত সুলাইমান আ.-এর নির্দেশে জিনেরা সম্মুখে একটি ময়দানে যা চৌদ্দ মাইল লম্বা ছিল, তাতে সোনা-রূপার ইটের দ্বারা রাস্তা বানিয়ে ওই ময়দানের চতুর্দিকে একটা দেয়াল নির্মাণ করে দিল। দেয়ালের উপর সোনা-রূপার দাসী বানাইয়া দিল। জল এবং স্থলের যত প্রকার উত্তম প্রাণী ছিল তাদেরকে ধরে এনে ওই ময়দানের ডানে এবং বামে সোনা এবং রূপার ইটের সাথে বেঁধে দিল এবং জিনদের সন্তানদের ডেকে এনে ওই রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দিল।

এরপর হযরত সুলাইমান আ. একটি সিংহাসের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর ডানে এবং বামে অন্যান্য আসনগুলা স্থাপন করা হল। শয়তান, জিন এবং মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এমনিভাবে চতুস্পদ প্রাণী, হিংস্র প্রাণী এবং পাখ-পাখালি সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিল। সাবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদল নিকটবর্তী হয়ে দেখল, বন্য প্রাণীরা সোনা-রূপার ইটের উপরে পায়খানা করছে। এ দৃশ্য দেখে সাবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল সোনা-রূপার যেসব ইট উপহার হিসেবে এনেছিল, তা লজ্জায় দূরে ফেলে দিল। এরপর সাবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল সুলাইমান আ.-এর সামনাসামনি হলে তিনি তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করলেন। এরপর তিনি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন : ওই কৌটাটি কোথায়, যাতে অমুক অমুক জিনিস আছে? সুতরাং তারা ওই কৌটা উপস্থাপন করল। হযরত সুলাইমান আ. ভূ-পৃষ্ঠের একটি কীটকে নির্দেশ দিলেন। কীটটি একটি চুল নিয়ে এসে মোতির মধ্যে ছিদ্র করে দিল। এ কারণে তিনি তার রিজিক গাছের মধ্যে নির্ধারণ করে দিলেন। এরপর সাদা একটি পোকা নিজের মুখের মধ্যে সুতা নিয়ে কিনারা বাঁধানো মোহরের মধ্যে পরিয়ে দিল। সুতরাং এ কীটের রিজিক ফলের মধ্যে নির্ধারণ করে দেয়া হল। এরপর সুলাইমান আ. আগন্তুক সাবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদলের দাস এবং দাসীদের মুখ ধোঁয়ার জন্য পানি আনালেন। সুতরাং পানি আনার পর যখন তারা মুখ ধোয়া শুরু করল, তখন তাদের দাসীরা মুখ ধৌত করতে এক হাত থেকে অপর হাতে পানি নিয়ে মুখের মধ্যে ঝাপটা মারল। আর গোলামেরা যে হাতে পানি নিয়েছিল ওই হাত দিয়েই মুখ ধুয়ে ফেলল। মুখ ধোওয়ার এ ভিন্নতা দেখে হযরত সুলাইমান আ. নারী ও পুরুষদেরকে চিনে ফেললেন। এরপর হযরত সুলাইমান আ. উপহার ফেরত দিয়ে দিলেন এবং মুনজেরদেরকে বললেন, ফিরিয়া যাও। ওই প্রতিনিধিদল সাবায় ফিরে গেল এবং মুনজির বিলকিসকে এ সকল ঘটনা শুনাল। তখন বিলকিস বলল, তিনি মূলত একজন নবী। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নাই।

এরপর রানী বিলকিস ১২০০০ সর্দার সঙ্গে নিয়ে হযরত সুলাইমান আ.- এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলেন। ওই প্রত্যেক সর্দারের অধীনে ১২০০০ সৈন্য ছিল।

৩৩৪. دود القز (দুদুল কায) রেশম পোকা

دود القز (দুদুল কায) অর্থ, রেশম পোকা। রেশম পোকা আশ্চর্যজনক একটি সৃষ্টি। এর জন্ম, প্রতিপালন ও জীবন যাপন পদ্ধতি আশ্চর্য ধরনের। তাকে দুদুল হিন্দিয়াও বলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর বীজ একটা দানার মত থাকে। যখন বসন্তকাল পোকার পেট থেকে বের হয়, তখন লাল পিঁপড়ার চেয়ে ছোট এবং ওই রঙেরই হয়ে থাকে। এটা উষ্ণ স্থানে মায়ের প্রতিপালন ছাড়াই এক ঘণ্টার মধ্যেই জন্ম নেয়। কোন কোন সময় এটা বের হতে বেশি সময় লাগে। তখন মহিলারা ওই গুটিগুলোকে নিজেদের আচলের নিচে রেখে গরম করে। এতে আচলের গরম পেয়ে এরা দ্রুত বের হয়ে যায়। বের হওয়ার পর একে সাদা তুঁতর পাতা খাওয়ানো হয়। তখন তারা বড় হতে থাকে। এমনকি বড় হতে হতে আঙুল বরাবর বড় হয়ে যায়। এটা প্রথমে কালো আর পরে সাদা হয়ে যায়। রঙের পরিবর্তন সর্বোচ্চ আট দিনে পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এরপর এ পোকা নিজের মুখের লালা দ্বারা নিজের চতুষ্পার্শ্বে জাল বুনতে শুরু করে। তার পেটের মধ্যে যে পরিমাণ জাল বোনার সামগ্রী থাকে, সবটাই বের করে জাল বুনাতে থাকে। আর জাল বুনা পূর্ণাঙ্গ হলে এটা নাশপাতির মত হয়ে যায় এবং সাত দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত তার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এরপর ভিতর থেকে গর্ত করে বের হয়ে আসে। সে সময় একে একটি সাদা পতঙ্গের মত দেখা যায়। উহার দুটি বাহু থাকে। ভিতর থেকে বের হওয়ার পর তার মধ্যে পাগলামী দেখা দেয় এবং পুরুষ কীট মাদী কীটের লেজের সাথে নিজের লেজ জড়িয়ে দেয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একে অপরের সাথে আলিঙ্গন অবস্থায় থাকে। এরপর মাদী কীটের পেট থেকে বীজ বের হয়, যা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে শুধু বীজ সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য হলে এর নিচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। যাতে সমস্ত বীজ বের হয়ে আসে। এরপর উভয় পোকাই মৃত্যুবরণ করে। আর রেশম সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য হলে যখন এর বীজ বের হয়। তখন একে দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রের মধ্যে রাখা হয়। তারপর তা মৃত্যুবরণ করে।

এ কীটের একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব হল, এরা বজ্রপাতের শব্দ, আতশবাজির শব্দ, সিকার গন্ধ পেলে এবং হায়েজা মহিলা বা নাপাক ব্যক্তির স্পর্শের সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে। ছুচা, চড়ুই, গরম এবং শীতের তীব্রতা, পিঁপড়া ইত্যাদি দ্বারা এদের জীবননাশের আশঙ্কা থাকে। কোন কোন কবি এদের সম্পর্কে কবিতা লিখিয়াছেন :

وبيضه تحضن فى يومين + حتى اذا ديت على رجلين

واستدلت بلونها لونين

"তারা নিজেদের ডিমকে দুই দিন তা দেয় আর যখন নিজ পায়ে ভর করে চলাফেরা করতে পারে, তখন এক রং থেকে আরেক রঙে পরিবর্তন হয়।"

حاكت لها خيسا بلا نير + بلا سماء وبلا بابين

ونقية بعد ليلتين

"তখন এর জন্য এমন গৃহ বানানো হয় যার উপর তারের কোন নাম নিশানা নাই। আসমানও নাই, দরজাও নাই। দুই রাত্র পরে এর মধ্যে ছিদ্র করে ফেলে।"

نخرجت مكحوله العنين + قد صبغت بالنقش حاجبين

قصيرة ضيعة الجنبين

ওই ছিদ্র দ্বারা বের হয়ে আসে। এমতাবস্থায় যে, এর চক্ষু রঙিন হয়ে থাকে। এর ভ্রুর চিহ্নও থাকে, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রশস্ত।

كانها قد قطعت نصفين لها جناح سابغ البردين + ما نبت الا لقرب الحين

"মনে হয় যেন দুটি সমান সমান অংশে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তার দুটি বাহু আছে, যা নিচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"

ان الردى كحل لكل عين

"এটা জন্ম গ্রহণ করে সামান্য সময়ের জন্য, যার মাধ্যমে প্রতিটি চোখের মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তু পৌঁছে দেয়।"

ইমাম আবু তালেব মক্কী তার কিতাব 'কূতয়াতুল কুলুব'-এ উদ্ধৃত করেছেন : কতিপয় বিজ্ঞজন মানুষের উপমা রেশম পোকার সঙ্গে দিয়েছেন অর্থাৎ যেভাবে রেশম পোকা নিজের উপর অজ্ঞতার কারণে জাল বুনে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে তা থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তাই থাকে না। অবশেষে সে ওই জালের খোলের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে এবং এভাবেই অন্যদের জন্য রেশম হয়ে থাকে। ঠিক একই অবস্থা ওই অজ্ঞ মানুষটির যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং ওয়ারিশদেরকে মালদার করে দেয়, এরপর যদি তার ওয়ারিশরা তার ধন-সম্পদকে ভাল কাজে ব্যয় করে, তাহলে তার প্রতিদান বা সওয়াব ওয়ারিশরাই পেয়ে থাকে। আর মালের হিসেব তার থেকেই নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিশরা যদি তার রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় করে, তাহলে ওই গুনাহের একটা অংশ তার আমলনামাতেও লিপিবদ্ধ হয়। কেননা সে-ই ধন-সম্পদ উপার্জন করে ওয়ারিশদের জন্য রেখে গিয়াছে।

সুতরাং বলা যাবে না যে, কোন ধরনের আফসোস তার উপর অত্যাধিক কষ্টদায়ক। নিজ জীবন অন্যের জন্য ধ্বংস করে দেয়া অথবা নিজের ধন-সম্পদ অন্যের উন্নতির পিছনে ব্যয় হচ্ছে দেখে।

এ দিকেই ইঙ্গিত করে আবুল ফাতাহ বস্তী তায় কবিতায় লিখেছেন :

الم تر ان المرء طول حياته + معنى يامر لا يزال يعالجه

দেখ মানুষ নিজের সারাটা জীবনে কষ্ট পরিশ্রমের মধ্যে লিপ্ত থাকে।

كدود كدو القز ينسج دائما + ويهلك غما وسط ما هو ناسجه

যেমন, রেশম পোকা সর্বদা বুনন করতে থাকে, কিন্তু শেষ পরিণতি নিজের বুননকৃত বেষ্টনীর মধ্যে আটকে পড়ে যায়।

لا يغرنك التى لين اللمس + سس فعزمى اذا انتضيت حسام

এ প্রতারণার মধ্যে না থাকা উচিত। আমি কোমল ও দুর্বল শরীরবিশিষ্ট। কেননা যখন আমি কোন কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তখন আমার ইচ্ছা তলোয়ারের মত কেটে দেয়।

انا كالورده راحة قوم + ثم فيه لاخرين كام

আমি ওই গোলাপের মত নই, যার মধ্যে কার জন্য প্রশান্তি এবং কার জন্য বিড়ম্বনা।

يفنى الحريص يجمع المال مدته + وللوارث ما يبقى وما يدع

লোভী ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যেই জীবন শেষ করে দেয় আর যে সম্পদ ছেড়ে যায়, তা উত্তরাধিকারদের হয়ে যায়।

كدودة القز ما تبنية يهلكها + وغيرها بالذى تبنيه ينتفع

রেশমের পোকার মত সে যে জিনিস তৈরি করে, তা-ই তাকে ধ্বংস করে দেয় আর অন্যেরা তার তৈরিকৃত জিনিস দ্বারা উপকৃত হয়।

মাসড়সা ও রেশম পোকার বাক্যালাপ

একবার এক মাকড়সা নিজেকে রেশম পোকার সাথে তুলনা করে রেশম পোকাকে বলল, তোমার এবং আমার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা তুমিও বুনন কর; আমিও বুনন করি। এ কথা শুনে রেশম পোকা উত্তর দিল, আমি রাজা-বাদশাহদের কাপড় বুনন করি আর তুমি মশা-মাছিদের পোশাক বুনন কর। এই একটা পার্থক্যের দ্বারাই তোমার এবং আমার মাঝে এক বিশাল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ জন্যই বলা হয়ে থাকে—

اذا اشتكت دموع فى خدود + تبينن من بكى ممن تباكى

যখন চোখের জল কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, তখন বাস্তবিক ক্রন্দনকারী এবং ভান করে ক্রন্দনকারীর মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট

দেবদারু গাছে ত্রিশ বছরে একবার ফল হয় আর লাউ গাছ দুই সপ্তাহের মধ্যেই আকাশের সাথে কথা বলে থাকে। সুতরাং লাউ গাছ একবার দেবদারু গাছকে বলল, তুমিও একটি গাছ আর আমিও একটি গাছ; কিন্তু তুমি যে দূরত্ব ত্রিশ বছরে অতিক্রম কর, আমি তা দুই সপ্তাহের মধ্যেই অতিক্রম করে ফেলি। এ কথা শুনে দেবদারু গাছ বলল, একটু অপেক্ষা কর এবং প্রলয়ংকারী বাতাস প্রবাহিত হতে দাও! তুমিও আমার মত একটি গাছ– তোমার এ অহমিকা, তখনই তোমার জানা হয়ে যাবে।

মাসউদ, আল্লামা রাবীর জিবনীতে বর্ণনা করেছেন : তিবরিস্তানের এক ধরনের পোকা আছে, যার ওজন এক থেকে তিন মেসকাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সেটা রাত্রি বেলায় বাতির মত চমকাতে থাকে এবং দিনের বেলায় উড়ে থাকে। এদের রং হয় সবুজ। স্পর্শ করলে এর গায়ে পালক আছে বলে মনে হয়। বাস্তবে এর কোন পালক নাই। এদের খাদ্য মাটি। কিন্তু সে এ ভয়ে কখনও পেট ভরে মাটি খায় না যে, হয়ত মাটি শেষ হয়ে যাবে আর তাকে না খেয়ে মরতে হবে। এ পোকার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এটা খুবই উপকারী পোকা সে আলোচনা অতি সত্বর আসবে।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলার বাণী---- এর আলোকে এ দুনিয়ার কোন জিনিসকেই অনর্থক মনে না করা উচিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত যে, পিপীলিকা বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম প্রাণী আর হাতীর মত বিশালাকায় প্রাণী সকলের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা কিছু না কিছু উপকারিতা রেখেছেন। এটাই আমাদের আকিদা বা বিশ্বাস।

পোকার শরঈ বিধান

সব ধরনের পোকা খাওয়া হারাম; তবে যে-সমস্ত পোকা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে জন্ম নেয়, সে-সমস্ত পোকার ব্যাপারে শাফেয়ীগণের তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। (১) যে জিনিসের মধ্যে এগুলো জন্ম নেয়, সে জিনিসের সাথে উক্ত পোকা খাওয়া জায়েয। শুধু পোকা খাওয়া জায়েয নয়। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কথা (২) উক্ত পোকা কোন অবস্থায়ই খাওয়া জায়েয নাই। (৩) সর্বাবস্থায়ই উক্ত পোকা খাওয়া যায়; যে খাদ্যের মধ্যে তা জন্ম নিয়েছে ওই খাদ্যের সাথে অথবা খাদ্য থেকে পৃথক উভয়ভাবেই খাওয়া যায়।

সবধরনের পোকার ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। তবে যে লাল পোকাটি কোন কোন শহরে বালুত নামক গাছের মধ্যে পাওয়া যায়, যার দ্বারা মানুষ রঙের কাজ করে থাকে। সেটার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এমনিভাবে রেশমের পোকার ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয আর তাকে তুঁত গাছের পাতা খাওয়ানো ওয়াজিব। একে রৌদ্রে

ফেলে রাখা জায়েয আছে যদিও তা এর ফলে মৃত্যুবরণ করে। কেননা এতে উপকার আছে।

রেশম পোকার ঔষধী গুণ

যদি রেশম পোকাকে জয়তুনের মধ্যে মিশ্রিত করে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশনকৃত ব্যক্তির শরীরে মালিশ করা হলে ইনশাআল্লাহ তার উপকার হবে। রেশম পোকা কোন মুরগিকে খাওয়ানো হলে ওই মুরগি খুবই মোটা হয়ে যায়।

রেশম পোকা স্বপ্নে দেখার তাবীর

সাধারণত স্বপ্নে এ পোকা দেখার ব্যাখ্যা পরস্পরে শত্রুতা। রেশম পোকা ব্যবসায়ীদের জন্য ক্রেতার আলামত এবং বাদশাহদের জন্য প্রজার সমর্থন পাওয়ার আলামত।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রেশম পোকা ধরে ফেললে বুঝবে সে উপকৃত হবে। কোন কোন সময় সাধারণ পোকামাকড় স্বপ্নে দেখা হারাম সম্পদ অথবা কোন ধরনের ক্ষতির আলামত। সুতরাং স্বপ্নে কোন ব্যক্তির হাত থেকে পোকা ছুটে যাওয়া যেন ওই ব্যক্তি থেকে কষ্ট দূর হয়ে যাওয়া। কখনও কখনও পোকা-মাকড় স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হয় মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া এবং বয়স শেষ হয়ে যাওয়া। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৩৩৫. الدوالة (দাওয়ালাতুন) খেঁকশিয়াল

দাওয়ালাতুন বলা হয় খেঁকশিয়ালকে। খেঁকশিয়ালের এ নাম রাখা হয়েছে তার চাতুর্যের কারণে। কেননা

দাইলানের আসল অর্থ চাতুর্য।

৩৩৬. الدودمس (আদ্ দাওদামছুন) সাপ

الدودمس (আদ্‌দাওদামছুন) বলা হয় সাপকে। ইবনে সাইয়িদা বলেছেন, এ সাপ মারাত্মক বিষাক্ত। যতদূর পর্যন্ত এর নিঃশ্বাস পৌঁছে, ততদূর পর্যন্ত আগুন লেগে যায়। এর বহুবচন دومسات (দাওমাছাতুন) এবং دوميس (দাওয়ামিছ) আসে।

৩৩৭. الدوسر (আদ্ দাওছারু) মোটা উট

الدوسر (আদ্ দাওছারু) মোটা উটকে বলা হয়।

৩৩৮. الدبيسم (আদ্‌দুয়াইছিম) ভাল্লুকের বাচ্চা

الدبيسم (আদ্‌দুয়াইছিম) ভাল্লুকের বাচ্চা। কেউ কেউ একে খেঁকশিয়ালের বাচ্চা এবং কেউ কেউ বলেন, এটা নেকড়ে এবং কুকুরের সঙ্গমে জন্ম নেওয়া বাচ্চা। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এটা ভাল্লুকের বাচ্চা। অবশ্য শ্রুতসিদ্ধ কথা হল, এটা ভাল্লুকের বাচ্চা হোক বা অন্য কোন প্রাণীর, এটা খাওয়া হারাম।

৩৩৯. الديك (আদ্‌দিক) মোরগ

الديك (আদ্‌দিক) মোরগকে বলা হয়। তার বহুবচন ديوك (দুয়্‌কুন) এবং ديكة (দিকাতুন) আসে। এর তাছগীর উদাইকুন আসে। মোরগের উপনাম আবুল হাসান, আবুল হাম্মাদ, আবু সুলাইমান, আবু উকবা, আবু মুদাল্লিজ, আবু নাবহান, আবু ইয়াকুযান, আবু বারায়েল ইত্যাদি। মোরগের বৈশিষ্ট্য হল, তার নিজ বাচ্চার প্রতি মহব্বত থাকে না এবং নিজ সাথী মুরগির প্রতিও মহব্বত থাকে না। সে স্বভাবগতভাবে আহমক। যেমন– সে কখনও কোন দেওয়াল থেকে পড়ে গেলে তার মধ্যে এতটুকু সচেতনতা থাকে না যে, নিজের ঘরে চলে যাবে। অবশ্য তার মধ্যে কিছু ভাল স্বভাবও পাওয়া যায়। যেমন– সে নিজের অধীনস্থ মুরগির মধ্যে সাম্য বজায় রাখে। কোন এক মুরগিকে অন্য মুরগির উপর প্রাধান্য দেয় না। মোরগের সব চেয়ে বড় গুণ সে রাত্রের বেলা সময় চিনতে পারে। সুতরাং ঠিক সময় মতই সে ডেকে উঠে। এতে সে কখনও ভুল করে না। সোবহে সাদেকের পূর্বে এবং সোবহে সাদেকের পরে যথারীতি ডেকে থাকে। এ কারণেই কাযী হুসাইন মুতাওয়াল্লী এবং রাফেয়ী প্রমুখ অভিজ্ঞ মোরগের আওয়াজ দ্বারা নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ করাকে জায়েয ফাতাওয়া দিয়েছেন। মোরগের একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব আছে। যখন সে এমন কোন স্থানে যায় যেখানে অনেকগুলো মুরগি আছে, তখন সে সমস্ত মুরগির সাথেই সঙ্গম করে। আবু বকর সানুবিরী মুরগির প্রশংসা করে নিম্নলিখিত কবিতাগুলো লিখেছেন।

مغرد الليل ما يألوك تغريدا هل الكوى فهو يدعوا الصبح مجهودا

রাত্রের বেলায় সে এমন আহ্বানকারী, যে আহ্বানে কখনও অলসতা করে না। অথচ সে নিদ্রায় বিভোর থাকে। কিন্তু আহ্বানের সময় ঠিকই আহ্বান করে।

لما تطرب هذا العطف من طرب ومد للصوت لما مده الجيدا

খুশিতে সে ছুটাছুটি করে আর কখনও কখনও আহ্বানের সময় আওয়াজ অত্যাধিক দীর্ঘ করে।

كلابس مطرفا مرخ ذوائبه تضاحك البيض من اطرافه السواد

সে আবাকাবা পরিধান করে আছে, যার ঝলম ঝুলে থাকে। তার কালো রঙের পশমের সাথে কানের উপরে দুটি সাদা রেখা আছে।

حالى المقلد بوقيست قلائده بالود قصر عنها لو ردتوريدا

এর গলার মধ্যে হার ঝুলানো আছে, তবে তার হার ফুলের হার বলে অনুমান করা যাবে না।

ইবনে খালকান ইতিহাস গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে মাআন মুহাম্মাদ ইবনে সামাদা মু'তাসিম-এর জিবনীতে আবুল কাশেম আসয়াদ ইবনে বালিত-এর কবিতার এ পংক্তিগুলো মোরগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

كان انو شروان اعطاه تاجه وناط عليه كف مارية القرطا

নওশেরওয়া বাদশাহ তাকে নিজ মুকুটটি দিয়েছেন এবং মারিয়া তার কর্ণে কানের বালি পরিধান করেছেন।

سبى حلة الطاوس حسن لباسه ولم يكفيه حتى سبى المشية البطاء

ময়ূরের পোশাক যেন সে লাভ করেছে; কিন্তু ময়ূরের পোশাকের মধ্যে যে ত্রুটি আছে, সেই ত্রুটি থেকে সে নিজেকে মুক্ত রেখেছে।

হাফেয লিখেছেন, হিন্দুস্তানী মোরগের বিধানের মধ্যে চৌরাশি, নাবতী, সিন্দী এবং হাবশী মোরগও অন্তর্ভূক্ত হবে। অভিজ্ঞজনেরা লিখেছেন, সাদা মোরগ লালন পালন করার অন্যতম উপকারিতা হল এগুলোর ঘর পাহারা দিয়ে থাকে। আরও লিখেছেন, সাদা মোরগ ঘরে জবাই করলে ঘরে অমঙ্গল আসে। হাদীসে মোরগের উল্লেখ রয়েছে।

কতিপয় ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন : "সাদা মোরগ আমার প্রিয়।" কিন্তু এ বাণীটি হাদীসের কিতাবে প্রমাণিত নাই বরং অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দাবলি আছে, "সাদা মোরগ আমার পছন্দনীয়।" শয়তান তাকে অপছন্দ করে। কারণ, সে নিজ মালিককে নামাযের সময় জাগিয়ে দেয় এবং তার ঘরের হেফাজত করে। অন্য এক বর্ণনায় আরও আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ঘর এবং মসজিদে মোরগ লালন পালন করতে বলেছেন।

'তাহজীব' গ্রন্থে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন; সাদা এবং ডোরাকাটা মোরগ আমার বন্ধু জিবরাইলেরও বন্ধু। সে নিজের ঘরসহ ষোলটি প্রতিবেশির ঘর হেফাজত করে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী দুর্বল।

শায়েখ মুহিব্বুদ্দিন তাবারি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি সাদা মোরগ ছিল। সাহাবায়ে কেরাম সফরের মধ্যে নিজেদের সাথে মোরগ নিয়ে যেতেন, যাতে নামাযের সময় জানতে পারেন।

বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত রয়েছে, যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহ তাআলার নিকটে তার করুণা প্রার্থনা করবে। কেননা সে ফেরেশতা দেখে থাকে। আর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহ তাআলার নিকটে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা সে শয়তান দেখে থাকে।

মু'জামে তাবরানী এবং তারিখে ইস্পাহানীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলার একটি মোরগ আছে। তার রং সাদা। তার উভয় বাহু

জবরজদ, ইয়াকুত এবং মোতি দ্বারা সুসজ্জিত। তার এক বাহু প্রাচ্যে এবং অপর বাহু প্রতীচ্যে। তার পা মহাশূন্যে ঝুলন্ত। তার মাথা আরশের নিচে। প্রতিদিন সে ফজরের সময় আযান দেয়। তার আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া আসমান-জমিনের সমস্ত মাখলুক শুনতে পারে। তার আওয়াজ শুনে পৃথিবীর মোরগ উত্তর দেয়। কিয়ামতের দিন নিকটবর্তী হবে আল্লাহ তাআলা ওই মোরগকে নির্দেশ দিবেন, তোমার নিজের বাহু সঙ্কুচিত করে নাও! আওয়াজ বন্ধ করে দাও। সে-সময় মানুষ এবং জ্বিন ছাড়া সমস্ত মাখলুক জেনে ফেলবে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে।

তাবরানী এবং বায়হাকী 'শিয়াব'-এ মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের থেকে হযরত জাবের রাযি.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলার একটি মোরগ আছে, যার পা ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে এবং ঘাড় আরশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে কেউ (ফেরেশতা) বলেন, سبوح قدوس ربنا ورب الملئكة والروح মোরগও তার সাথে সাথে বাগ দিতে থাকে। (কিন্তু যে সকল বর্ণনাকারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তারা মুনকার হাদীস বর্ণনা করে থাকেন)।

হযরত ছাওবান রাযি. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলার একটি মোরগ আছে, যার পা ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে এবং গর্দান আরশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার উভয় বাহু মহাশূন্যে। সকাল হলে সে ডানা ঝাপটায় এবং বলতে থাকে–

سبحان الملك القدوس ربنا الملك الرحمن لا اله غيره

সা'লাবী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলার নিকট তিনটি আওয়াজ খুবই পছন্দনীয়। (১) মোরগের আওয়াজ, (২) কুরআনে কারীম তেলাওয়াতকারীর আওয়াজ, (৩) ভোর বেলায় এস্তে গফারকারীর আওয়াজ। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা রহ. হযরত খালেদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা সে নামাযের সময় জাগিয়ে দেয়।

ইমাম হালিমী রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ বাণীর মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে জিনিস থেকে কোন কল্যাণ অর্জিত হয়, তাকে গালি দেয়া বা অপমান করা অনুচিত বরং তার প্রাপ্য অধিকার হল তাকে সম্মান করা।

হাকিম রহ. মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং তাবরানী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন : আমাকে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিয়াছেন আমি যেন ওই মোরগের আলোচনা করি, যার পা ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে এবং তার গর্দান আরশের নিচে। আর সে বলতে থাকে, سبحانك ما اعظم شانك। অর্থাৎ পবিত্র তোমার সত্তা এবং তোমার মর্যাদা সর্বত্র।

আবু তালেব মক্কী এবং ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন, মায়মুন রহ. বর্ণিত আছে, আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, আরশের নিচে মোরগের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আছে। তার পাঞ্জা মোতির। যখন রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন নিজের ডানা ঝাপটে বলে, রাত্রের ইবাদতকারীদের এখন উঠে যাওয়া উচিত। তার যখন রাত্রের প্রথম অর্ধাংশ গত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয়বার নিজ ডানা ঝাপটে বলে, নামায আদায়কারীদের এখন জেগে উঠা উচিত। আর যখন ভোর হয়ে যায়, তখন আবার নিজ ডানা ঝাপটে বলে, গাফেলদের জাগ্রত হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় যে, তাদের উপর এর বিপদ রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নামাযের জন্য মোরগ জাগিয়ে দেয়, এর অর্থ এই নয় যে, সে বাস্তবিকই বলতে থাকে– উঠো! নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে বরং আল্লাহ তাআলা তার স্বভাবের মধ্যেই এ বিষয়টি রেখেছেন যে, যখন ফজরের নামাযের সময় হয়, তখন সে বার বার বাগ দিতে থাকে। ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তির চোখ খুলে যায় এবং সে উঠে নামাযের প্রস্তুতি নেয়। কাজেই সে নামাযের জন্য উঠার একটি 'কারণ' হয়ে গেছে। আর একেই রূপকার্থে 'ডাকা' বা 'জাগানো' বলা হয়েছে। অন্যথায় যদি সে নামাযের ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন সময় ডাকে, তাহলে তার ডাকে নামায পড়া জায়েয হবে না। কেননা অনেক সময় চাক্ষুষ দেখা গেছে, কোন কোন মোরগ সোবহে সাদেকের পূর্বেই মানুষদের হাঁটা-চলার আওয়াজ শুনে বাগ দিতে থাকে।

সূক্ষ্ম বাণী : সাহাল বিন হারুন ইবনে রাহওয়াই খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারে চাকরি করতেন। তিনি বিজ্ঞ ও উঁচু মানের একজন সাহিত্যিক ও কবি এবং পারস্য বংশোদ্ভূত ও শিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আরবদের সাথে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেন। সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক রচনা আছে। জাহিয তার প্রজ্ঞা, বীরত্ব ইত্যাদির খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তার অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। যেমন–

দাআবাল বলেছেন, একদিন আমরা তার সাথে বসেছিলাম। আমরা পরস্পর গল্প করছিলাম। কথায় কথায় অনেক সময় গড়িয়ে গেল। সুতরাং ক্ষুধার তীব্রতায় তার (সাহাল বিন হারুন) জীবন যেন বের হয়ে যাচ্ছিল। যখন তার আর সহ্য হচ্ছিল না, তখন সে খাদেমকে খাবার আনতে বলল। খাদেম একটা পেয়ালার মধ্যে একটা ভুনা মোরগ এনে হাজির করল। সাহাল পেয়ালার দিকে লক্ষ্য করে দেখে বলল, এ মোরগের মাথা কোথায়? খাদেম উত্তর দিল, আমি তা ফেলে দিয়েছি। এ কথা শুনে সে বলল, আমি মোরগের পা পর্যন্ত ফেলে দেয়া পছন্দ করি না আর তা তো মাথা ছিল। তোমার কি জানা নাই, মাথা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সর্দার এবং এর দ্বারা মোরগ আযানও দেয়। এর মাথার উপরে মুকুট থাকে, যাকে মানুষ বরকতময় মনে করে। তাতে দুটি চোখ থাকে, যা

পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। শরাবের স্বচ্ছতাকে মোরগের চোখের সাথে উপমা দেয়া হয়। ব্যথার স্থানে তার মগজ আশ্চর্যজনক উপকারে আসে। তুমি যদি ভেবে থাক আমি তা খাব না, তাহলে আমার ঘরের অন্যান্য সদস্যরা তা খাওয়ার জন্য উপস্থিত আছে। যাও! এক্ষুনি তা খুঁজে নিয়ে আস। খাদেম উত্তর দিল, আমার মনে নাই তা কোথায় ফেলেছি। উত্তর শুনে ইবনে রাহওয়াই বলল, কমবখত! তুমি কি তা ফেলে দিয়েছ? তুমি তো তা নিজের উদরে প্রবেশ করিয়েছ।

মোরগের শরঈ বিধান

মোরগের বিধান হুবহু মুরগির বিধানই অর্থাৎ তা খাওয়া হালাল। তাকে গালি দেয়া জায়েয নাই। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। কামেল নামক গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের আযাদকৃত গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে' হযরত ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সা. বলেছেন : মোরগ, বকরী এবং ঘোড়াকে খাসী কর না। ইমাম শাফেয়ী রহ.- এর 'মানাকিব' গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, অমুক ব্যক্তি আমার মোরগ খাসী করে দিয়েছে। তিনি বলতেন, এজন্য তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব। মোরগ লড়াইয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা কাফ পরিচ্ছেদে 'কাব্‌শ'-এর অধীনে আসবে।

প্রবাদ প্রবচন

আরবগণ বলেন, اشجع من ديك وافسد من ديك। অর্থাৎ মোরগের চেয়েও বড় বীর এবং মোরগের চেয়েও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী।

ফায়েদা

ইমাম মুসলিম রহ.-সহ আরও অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন : একদিন হযরত ওমর রাযি. খোতবা দিলেন। খোতবাতে হামদ ও সানার পরে বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। তা বুঝে আসে, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। স্বপ্নটি হল, একটি মোরগ আমাকে তিনটি ঠোকর মেরেছে। অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে, যেন ওই লাল মোরগটি আমাকে দু বা তিনটা ঠোকর মেরেছে। আমি এ স্বপ্নটি আসমা বিনতে ওমাইস-এর নিকট বর্ণনা করেছি। সে বলেছে, আপনাকে একজন অনারব হত্যা করবে। হযরত ওমর রাযি. এ খুতবা জুমআর দিন দিয়েছিলেন আর পরবর্তী বুধবার তাঁর উপর আক্রমণ হয়।

হাকেম রহ. সালেম ইবনে জাদ থেকে, তিনি মি'দান ইবনে আবী তালহা থেকে আর তিনি হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মিম্বারের উপর বসে বলেছেন– আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমাকে একটি মোরগ ঠোকর মেরেছে। আমি তার ব্যাখ্যা করেছি, একজন অনারব ব্যক্তি আমাকে হত্যা করবে। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার নিজস্ব বিষয়গুলো ওই ছয় ব্যক্তির

উপর অর্পণ করলাম, যাদের উপর রাসূলাল্লাহ সা. সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা হলেন হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত আবু তালহা রাযি., হযরত যুবায়ের রাযি., হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাযি., হযরত সা'দ ইবনে আবু বকর রাযি.। তাদের মধ্য থেকে যিনি খেলাফতের জন্য নির্বাচিত হবেন তিনিই খলীফা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ইবনে খালকান উল্লেখ করেছেন– যখন হযরত ওমর রাযি.-এর উপরে হামলা করা হয়েছিল এবং তিনি আহত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন সাহাবাগণের মধ্য থেকে ছয়জনের নাম নির্বাচন করেছিলেন। যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী আক্কাস রাযি. সে-সময় উপস্থিত ছিলেন না। হযরত ওমর রাযি. নিজের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে খলীফার পরামর্শদাতা নির্বাচন করেছিলেন; খলীফা প্রার্থীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। মুসাওয়ার ইবনে মাখরামা এবং তিনজন আনসারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি তিন দিনের মধ্যে তাদের কোন একজন খলীফা হওয়ার জন্য নির্বাচিত বা রাজি হয়, তাহলে তো ভাল। নতুবা তাদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দিবে। কেননা তাদের দ্বারা মুসলমানদের কোন কল্যাণের আশা নাই। আর যদি তাদের মধ্যে দু' ভাগ হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষ সমান হয়, তাহলে যেপক্ষে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থাকবেন, সেই পক্ষের অভিমত গ্রহণযোগ্য হবে। এরপর অসিয়ত করলেন, তিন দিন পর্যন্ত সোহাইল রাযি. মুসলমানদের নামাযের ইমামতি করবে। অবশেষে দেখা গেল হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. নিজেকে খেলাফতের পদ থেকে সরিয়ে হযরত উসমান রাযি.- এর হাতে বায়আত হলেন।

হযরত ওমর রাযি.-এর শাহাদাতবরণ ও অন্যান্য ঘটনাবলী হামযা অনুচ্ছেদে 'আওজ' শব্দের আওতায় গিয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। এখানে আলোচনা দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা হয় নাই।

আবু লুলু ফারসী মুগীরা ইবনে শো'বা রাযি.-এর গোলাম ছিল। সে অগ্নিপূজক অথবা খ্রিষ্টান ছিল। সে হযরত ওমর রাযি.-কে শহীদ করেছিল। কথিত আছে, আবু লুলু ওমর রাযি.-এর উপরে আক্রমণ কালে ছুরি দিয়ে তিনটি আঘাত করেছিল। তন্মধ্যে একটা নাভীর নিচে করেছিল। হযরত ওমর রাযি. এর পূর্বেই আক্রমণ হওয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার উপর এক কুত্তা আক্রমণ করেছে। এ কথা বলতে বলতে তিনি জায়নামায থেকে পিছনে সরে আসলেন। আর সাথে সাথে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ জায়নামাযে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায পূর্ণ করলেন। আবু লুলু আক্রমণ করে পালাচ্ছিল। তখন তার এক হাতে এক খঞ্জর ছিল। সেটি সে ডানে বামে ঘুরাচ্ছিল। আবু লুলুর এ চালাকী দেখে এক আনসারি সাহাবী নিজের গায়ের চাদর তার উপর ছুড়ে মারল এবং তাকে ধরে ফেলল। আবু লুলু যখন দেখল ওই চাদর হতে বের থেকে পারবে না, তখন সে নিজের ছুরি দ্বারাই আত্মহত্যা করল। নামাযে লিপ্ত থাকার কারণে

মসজিদের অধিকাংশ মুসল্লি ওমর রাযি.-এর উপর আবু লুলুর আক্রমণের খবর জানতে পারে নাই। কিন্তু নামাযীদের কাছে ওমর রাযি.-এর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ না এলে তাদের অনুভূতি হল। কিন্তু এর কারণ তখনো তারা জানতে পারে নাই। হযরত ওমর রাযি. আহত হওয়ার পর ভীষণ পিপাসিত হয়েছিলেন। তখন তাঁকে নাবিজ পান করানো হয় কিন্তু তা তৎক্ষণাত তা নাভির নিচের আহত স্থান দিয়ে বের হয়ে আসে। তাই কিছু লোক বলতে লাগল, নাবিজ বের হয়ে আসছে। আর কিছু লোক বলতে লাগল, রক্ত বের হয়ে আসছে। সুতরাং পুনরায় তাঁকে নাবিজের পরিবর্তে দুধ পান করানো হল। তাও ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে আসল। এতে লোকেরা তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেল। তারা তাঁকে বলতে লাগল, হে আমীরুল মুমিনীন! সর্বশেষ অসিয়ত বলে দিন! তখন তিনি খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি মূল্যবান ঘোষণা দিলেন। এ হৃদয় বিদারক ঘটনা ২৭ জিলহজ্ব ২৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল আর হযরত ওমর রাযি.- এর মৃত্যু ২৮ জিলহজ্ব ২৩ হিজরীতে হয়েছিল।

কথিত আছে, ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. হুরমুজানের উপর আক্রমণ করেছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল। তাছাড়া একজন খ্রিষ্টানকেও হত্যা করেছিল। নিহত ওই দুজনের স্বজনরা আবু লুলুকে ওমর রাযি.- এর হত্যার জন্য প্রস্তুত করেছিল। আরও বর্ণিত আছে, ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর আবু লুলুর এক সন্তানকে হত্যা করেছিল। পরবর্তী সময়ে তার রক্তপণ হযরত উসমান রাযি. আদায় করেছিলেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. হযরত আলী রাযি.-এর শাসনামলে হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সাথে মিলিত হয়েছিল।

হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফতকালে বড় বড় বিজয় হয়েছিল। তিনি যুদ্ধসমূহকে গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল হিসেবে ভাগ করেছিলেন। হিজরী সাল গণনা তিনিই নির্ধারণ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে সীলমোহর ব্যবহারের প্রচলন করেছিলেন। তবে সীলমোহরের সর্বপ্রথম প্রবর্তক তিনিই বলা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি আংটি ছিল। তিনি তা সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তাঁর শাসনামলে দোররার মাধ্যমে পিটানো শুরু হয়। তিনি স্বয়ং নিজের কাছে একটি লাঠি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম আলী রাযি.-কে এ দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার হায়াত দীর্ঘ করে দিন। মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরানোর ক্ষেত্রে ওমর রাযি. ভূমিকা রেখেছিলেন। নতুবা পূর্বে তা বায়তুল্লাহর একেবারে নিকটে ছিল। তিনিই নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারাবীহর নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন। একজন ইমাম নির্ধারণ করে সবাইকে তার পিছনে এক্তেদা করে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিন। তিনি তার খেলাফতকালে একাধারে দশ বছর হজ্জের আমীর হয়েছিলেন। তার সর্বশেষ হজ্জ ২৩ হিজরীতে হয়েছিল। তার ওই হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র

স্ত্রীগণও ছিলেন। মদীনায় ফিরে এসে তিনি আমাদের উপরিউক্ত স্বপ্নটি দেখেন। তিনি হযরত আলী রাযি.-এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিলেন। তার মোহর ছিল ৪০ হাজার দেরহাম। তিনি আপন পুত্র ওবায়দুল্লাকে মদ্যপানের দায়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। এ শাস্তি প্রদানকালে তখন তাঁর পুত্র চিৎকার করে বলছিল আব্বাজান! আপনি তো আমাকে একেবারে মেরে ফেলবেন। হযরত ওমর রাযি. উত্তরে বলেছিলেন– আল্লাহ তাআলার কাছে বল, এ শাস্তি আমাকে আমার আব্বা দিয়েছেন। কোন কোন বর্ণনামতে মদ্যপানের এ শাস্তি আবু শাহমা (তথা আব্দুর রহমান)-কে দিয়েছিলেন। আবু শাহমার মাতা ছিল হযরত ওমর রাযি.-এর বাঁদি। তার নাম ছিল হাইবাত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে একথা সঠিক নয় যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর দুই ব্যক্তিকে অথবা আবু লুলুর সন্তানকে হত্যা করেছিলেন।

কতিপয় নির্ভরযোগ্য উলাময় কেরামের মতে রুকাইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর গর্ভে ওসমান রাযি.-এর একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। সে কারণেই ওসমান রাযি.-কে আবু আব্দুল্লাহ বলা হত। উক্ত বাচ্চার বয়স সাত বছর হলে এক হিংস্র মোরগ তার চেহারায় সাতটি ঠোকর মারে। এতে তার মাতার ক্রোড়ে ৭ বছর বয়সে ৪র্থ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ কন্যার আর কোন সন্তান জন্ম হয় নি।

হযরত রুকাইয়া রাযি. যখন হাবশায় গেলেন, সেখানকার এক যুবক তার রূপ-লাবণ্য দেখে অস্থির হয়ে পড়ে। হযরত রুকাইয়া রাযি.- এর নিকট ওই যুবকের এ কাজ কষ্টদায়ক ছিল। তাই তিনি ওই যুবকের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। সে যুবকটি বলত, রুকাইয়ার আঘাত মোরগের ঠোকরের মত অনুভব হচ্ছে। এ বিষয়ে জনৈক কবি লিখেছেন–

ويوما كحسو الديك قد بات حصبتى + ينالونه فوق القلاص العياهل

একদিন মোরগের ঠোকরের মত আমাকে কিছু প্রিয়জন ঠোকর মেরেছিল এবং বেশ দ্রুতই মেরেছিল।

মোরগের চোখের স্বচ্ছতা খুবই প্রসিদ্ধ। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা হয় اصفى من عين الديك অর্থাৎ অমুকের চোখ মোরগের চোখের চেয়েও অধিক স্বচ্ছ।

يكسر العاذلون فى وضع الصبح + يقولون لى اما تستفيق

ويلومون فيك يا ابنة عبد الله

তিরস্কারকারীরা বিরক্ত হয়ে আমাকে বলছে, তোমার কি এখনও হুঁশ হবে না, সে আমাকে তিরস্কার করছে অথচ আমার অন্তর তার নিকটে বন্দি হয়ে

আছে। আমি এ কথাও বলতে পারি না যে, সে কি আমাকে শত্রু হিসেবে তিরস্কার করছে, নাকি বন্ধু হিসেবে?

قدمته على عقادر كعين الديك + صفى سلافها الراووق

তর্ক-বিতর্কের মধ্যে সকাল হয়ে গেল। তারপর শরাব প্রার্থনা করল। এক দাসী নিজ হাতে শরাবের পাত্র নিয়ে এল। দাসীটি আসছিল। তখন তার চোখ মোরগের চোখের চেয়েও অধিক স্বচ্ছ ছিল।

মোরগের ঔষধি গুণ

মোরগের গোশত ভারসাম্যপূর্ণ। সাথে সাথে কিছুটা উষ্ণ ও শুষ্ক। যে মোরগের কণ্ঠস্বর ভারসাম্য থাকবে তার গোশত সর্বোত্তম। মোরগের গোশত শূলবেদনার খুবই উপকারী। এটা খেলে শরীরে উত্তম খাদ্যপ্রাণ তৈরি হয়। ঠাণ্ডা মেজাজের অধিকারী এবং বৃদ্ধদের জন্যও এটা উপকারী। শীতকালে এটা খাওয়া বেশি উপকারী। বৃদ্ধ মোরগের গোশত রান্না করার পর তার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অল্প বয়স্ক মোরগের গোশত খিঁচুনি দূর করে। জোড়ায় জোড়ায় বেদনা, পুরাতন জ্বর ইত্যাদির জন্য উপকারী। বিশেষত যখন তাতে বেশি করে লবণ, গোলাপ জল ও লবঙ্গ দিয়ে রান্না করা হবে।

মোরগের বাচ্চা বাগ দেয়ার বয়স হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকলের জন্য একই ধরনের খাদ্যপ্রাণ তৈরি করে। তেমনি মুরগির ডিম দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত উত্তম খাদ্য। এর গোশত নিয়মিত খেলে খুবই ভাল। মোরগের মগজ অথবা রক্ত পোকা-মাকড় দংশিত স্থানে লাগালে খুবই উপকার পাওয়া যায়। মোরগের রক্ত চোখে সুরমার মত ব্যবহার করলে চোখের সাদাটে ভাব দূর হয়ে যায়। মোরগের ঝুঁটি জ্বালিয়ে বিছানায় প্রস্রাবকারী ব্যক্তিকে পান করানো হলে তার এ রোগ দূর হয়ে যাবে। মোরগের মাথার ও ঝুঁটিতে তেল মালিশ করে দেয়া হলে সে বাগ দেয়া বন্ধ করে দেয়।

মোরগের দু বাহুর কিনারে দুটি হাড্ডি আছে। ডান বাহুর হাড্ডি কোন জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির গলায় বেঁধে দিলে তার জ্বর ভাল হয়ে যাবে। মোরগের অণ্ডকোষ পানিতে সিদ্ধ করে বন্ধ্যা বা গর্ভ হয় না মহিলাকে খাওয়ানো হলে তার গর্ভসঞ্চার হবে। অবশ্য এ অণ্ডকোষ এরূপ মহিলা হায়েজ অবস্থায় পরপর তিনদিন খাবে এবং সেসময় স্বামীসহবাসও করবে। যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছুক, সে যেন এ অণ্ডকোষ কাগজের মধ্যে পেঁচিয়ে নিজের বাম বাহুতে বেঁধে রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা বাঁধা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যপাত হবে না এবং সবল থাকবে। কোন পাগল ব্যক্তিকে লাল এবং সাদা মোরগের ঝুঁটির ধোয়া দেয়া হলে আশ্চর্যজনক উপকার পাবে। মোরগের পিত্ত ছাগলের গোশতের ঝোলে মিশিয়ে সকাল বেলা বাসি মুখে পান করানো হলে বিস্মৃত বিষয় তার স্মরণে পড়বে।

মোরগের রক্ত মধুর সাথে মিশিয়ে আগুনের উপর রাখা হয় আর তারপর পুরুষাঙ্গে মালিশ করা, তাহলে তার পুরুষত্ব বৃদ্ধি পাবে। মোরগের অণ্ডকোষ কোন যোদ্ধা মোরগের গায়ে বেঁধে দেয়া হলে কোন মোরগ তার সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারবে না।

স্বপ্নে মোরগ দেখার ব্যাখ্যা

মোরগ স্বপ্নে দেখা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিতবহ। (১) খতীব এবং মুয়াজ্জিন, (২) সুকণ্ঠি কারী, (গানের মত কুরআন তেলাওয়াতকারী), (৩) বে-আমল দাঈ বা যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ করে; কিন্তু নিজে তদানুযায়ী আমল করে না। যেমনি মোরগ সকাল বেলায় আযান দিয়ে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথচ সে নিজে নামায পড়ে না, (৪) কখনও কখনও অনেক বিবাহকারী পুরুষ বুঝায়, (৫) কখনও কখনও বাশি-বাদক এবং মেয়েদের কাছে কারী বুঝায়, (৬) কখনও কখনও পাহারাদার বুঝায়। (৭) কখনও কখনও এমন দানশীলকে বুঝায়, যে নিজে না খেয়ে অন্যদেরকে খাওয়ায়। (৮) কখনও কখনও ঘরের মালিক অথবা অধীনস্থ লোকদের বুঝায়। (৯) কখনও কখনও উলামা এবং বিজ্ঞজনদের সংশ্রব লাভ বুঝায়।

বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের নিকট এসে বলল : আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি মোরগ ঘরে এসে যবের দানা খুঁজে খাচ্ছে। ইবনে সিরীন বললেন, তোমার ঘর থেকে কোন জিনিস হারিয়ে গিয়ে থাকলে তা অনুসন্ধান কর। কিছু দিন পর ওই লোকটি এসে বলল, আমার ঘরের ছাদের উপর থেকে একটি চাটাই হারিয়ে গিয়েছে। ইবনে সিরীন বললেন, সেটি মুয়াজ্জিন চুরি করেছে। সুতরাং খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ঘটনাটি সত্য।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনে সীরীনের কাছে এসে বলল– আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি মোরগ এক ঘরের দরজায় বসে একটি কবিতা পাঠ করছে :

قد كان من رب هذا البيت ما كانا + هو الصحابة يا قوم اكفانا

এ ঘরের মালিকের সামনে যে সমস্যা এসেছে, তার কারণ সমস্যার সময় যেন বন্ধু এসে চিৎকার করে বলে– কঠিন সময় এসে পড়েছে। নিজ কাফনের কাঠি ঠিক করে নাও।

ইবনে সিরীন একথা শুনে বললেন, ওই ঘরের মালিক ৩৪ দিনের মধ্যে মারা যাবে। সুতরাং পরে তা-ই হল। কেননা ديك-এর সংখ্যামান ৩৪ হয়ে থাকে।

এক ব্যক্তি ইবনে সীরীনের নিকট এসে বলল, আমি স্বপ্নে মোরগকে আল্লাহ আল্লাহ বলতে দেখেছি। ইবনে সিরীন উত্তরে বললেন, তোমার জীবন মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট আছে। সুতরাং ওই ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে মরে গেল।

কখনও কখনও মোরগ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হয় অনারব ব্যক্তি বা গোলাম। কার কার মতে মোরগ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হয় মুয়াজ্জিন বা ঘোষক। যার আওয়াজ সর্বদাই মানুষ শুনতে থাকে।

৩৪০. ديك الجن (দিকুল জিন্ন) একটি ছোট প্রাণী

'দিকুল জিন্ন' একটি ছোট প্রাণী। এটা সাধারণতঃ বাগানে পাওয়া যায়। এর বৈশিষ্ট্য হল, একে যদি পুরাতন শরাবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ফেলে রাখা হয়, তারপর ওই শরাবকে পুনঃ ডুমুর ফলে ভরে ঘরের চত্বরে পুঁতে রাখা হয়, তাহলে ওই ঘরে পিপীলিকা জন্মাতে পারে না। কাজবিনী এরকমই লিখেছেন।

আবু মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ছিলেন আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবি। তার উপাধি ছিল দিকুল জিন্ন। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাযি.-এর সম্পর্কে কয়েকটি শোকগাথা রচনা করেন। এ কবি নির্লজ্জ, মন্দস্বভাব এবং খেলাধুলায় মনোযোগী ছিল। তার জন্ম ১৬১ হিজরীতে। তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। তার মৃত্যু হয় মুতাওয়াক্কিলের খেলাফতকালে ২৩৬ হিজরীতে। কথিত আছে, আবু নোয়াস বাদশাহর প্রশংসা করতে গেলে কবি দিকুল জিন্ন তাকে দেখা মাত্র নীরব হয়ে গেলেন। আবু নোয়াস তার বাঁদীকে বললেন, দিকুল জিন্নকে বাইরে আসতে বল। কেননা সে তার এ পংক্তির মাধ্যমে ইরাকিদেরকে ফেতনায় নিমজ্জিত করেছে। কবিতা—

مورّدة من كف ظبي كأنما + تناولها من خدّه قادارها

একটি হরিণের হাতের দ্বারা এভাবে অর্জিত হল, যেন তার কপাল ঘুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বাঁদী দিকুল জিন্নকে এ সংবাদ পৌঁছলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে দাওয়াত দেয়।

তারিখে ইবনে খালকানে উল্লেখ আছে, দা'বাল খাযাঈ যখন মিসরে পৌঁছেন আর দীকুল জিন্নকে তার আগমনের সংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন। এরপর দা'বাল খাযাঈ তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। তখন দিকুল জিন্ন তার বাঁদীকে বললেন, তুমি গিয়ে বল, তিনি গৃহে নাই। দা'বাল খাযাঈ এ উত্তর শ্রবণ করে তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। সুতরাং তাকে বললেন, দিকুল জিন্ন! বের হয়ে আস। কারণ, তুমি নিজের এ পংক্তিগুলোর দ্বারা মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কবি হয়ে গিয়েছে।

পংক্তিগুলো নিম্নরূপ :

فقام يكاد الكاس تحرق كفه + من الشمس او من وجنتيه استعارها

দণ্ডায়মান হয়েছে যে মানুষের হস্তসমূহ প্রজ্বলিত করছে, এ জ্বালানো হয়তো সূর্যের তাপের দ্বারা হয়েছিল অথবা তার চেহারা থেকে সংগৃহীত তাপে।

একটি হরিণের হাতের দ্বারা এভাবে অর্জিত হল, যেন তার কপাল ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩৪১. الدِيلم (আদ্-দীলাম) তিতির পাখি

الدِيلم (আদ্-দীলাম) তিতির পাখিকে বলা হয়। এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

৩৪২. ابن دايَة (ইবনু দাইয়া) সাদা-কালো রেখাবিশিষ্ট কাক

একে 'ইবনু দাইয়া' নামকরণের কারণ, এটা উটের পৃষ্ঠে বা স্কন্ধে ক্ষত দেখলে ওই ক্ষতস্থানে ঠোকরিয়ে ঠোকরিয়ে মেরুদণ্ড পর্যন্ত চলে যায়।

ফায়েদা

স্কন্ধ ও মেরুদণ্ডের হাড়কে دِيات বলা হয়। ইবনুল আরবী তার 'নাওয়াদের' গ্রন্থে লিখেন, উটের কোমরের রেখা সর্বোচ্চ ২১টি হয়ে থাকে। তদপেক্ষা বেশি নয় কিন্তু মানবদেহের ২৪টি রেখা থাকে। জালিনুস লিখেন, মাথার শুরু থেকে নিতম্ব পর্যন্ত মানুষের কোমরের সর্বমোট ২৪টি রেখা থাকে। স্কন্ধে ৭টি, কোমরে ১৭টি। এ ছাড়া ১২টি হাড্ডির মধ্যে এবং ৫টি পিঠে, যাকে নিতম্ব বলা হয়। সুতরাং মানুষের পাজরের সংখ্যাও ২৪টি। উভয় পার্শ্ব থেকে ১২টি করে সর্বমোট ২৪টি। এভাবে মানুষের সর্বমোট হাড়ের সংখ্যা ২৪৮টি। তবে এর বাইরে কলিজায় একটি হাড় পাওয়া যায়।

মানুষের শরীরে ১২টি ছিদ্র রয়েছে। দুইটি কান, দুইটি নাসিকা, একটি মুখ, দুটি স্তন, দুটি গুপ্তাঙ্গ ও একটি নাভি। শরীরের অন্যান্য মুখসমূহ তথা লোমকূপ বলে খ্যাত ছিদ্রসমূহ এ হিসেব থেকে পৃথক। কেননা তা অসংখ্য।

উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের ঘটনা

উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান নিজের ঘরের সদস্যদের থেকে একজনকে দলপতি নির্ধারণ করেন। ওই দলপতি আজদী গোত্রের কোন এক ব্যক্তির উপর নির্যাতন করে। ওই নির্যাতিত ব্যক্তি উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট অভিযোগ করে বলে, (আল্লাহ তাআলা আমীরকে কল্যাণ দান করুন)। আপনি তো আদেশ করেছেন, কোন ব্যক্তি নির্যাতিত হলে সে যেন আমার নিকট এসে অভিযোগ করে। সুতরাং আমি নির্যাতিত ও নিঃস্ব হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। ওই ব্যক্তি উচ্চ আওয়াজে নিজের এ অভিযোগ ব্যক্ত করে। উৎবা তার বক্তব্য শুনে তাকে বলেন : তোমাকে মন্দ স্বভাবের লোক বলে মনে হয়। যার দিন এবং রাত্রের ফরজ নামাযের রাকাতের সংখ্যাও সম্ভব জানা নাই।

নির্যাতিত ব্যক্তি এ কথা শুনে বলল, যদি আমি আপনাকে রাত্র ও দিনের সমস্ত নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিই, তবে কি আপনি আপনাকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রদান করবেন? প্রতিউত্তরে উতবা বললেন,

হ্যাঁ! তুমি আমাকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতে পার। এরপর উক্ত নির্যাতিত ব্যক্তি নিম্নোক্ত পংক্তিটি পাঠ করেন :

ان الصلوة اربع اربع + ثم ثلاث بعدهن اربع

ثم صلوة الفجر لا تضيع

নামাযের রাকাত সংখ্যা হচ্ছে, ৪+৪, ৩+৪ এরপর ফজরের দুই রাকাত যা বিনষ্ট হতে পারে না।

উতবা এ পংক্তি শুনে বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এখন তুমি বল তোমার প্রশ্ন কী? অতএব, নির্যাতিত ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কোমরে কয়টি হাড় আছে? প্রতিউত্তরে উৎবা বললেন, আমার জানা নাই। এরপর নির্যাতিত ব্যক্তি তাকে বললেন, আপনি মানুষের শাসক, অথচ আপনার শরীরের হাড় সম্পর্কে অজ্ঞ। এটা শুনে উতবা আদেশ দিলেন, একে আমার নিকট থেকে বের করে দাও এবং তার ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। উটকে ওই কাক যে পরিমাণ কষ্ট-ক্লেশ দেয়, তার সম্পর্কে সেই অবগত। এ কারণেই সে কাককে ভয় পায়। আরবগণ ওই কাককে 'আ-ওয়া' বলে এবং একে অপয়া মনে করে।

৩৪৩. الدئل (আদ্ দুইলি) বেজী সদৃশ একটি প্রাণী

الدئل (দালের উপর পেশ আর হামযার উপর যের)। হযরত কা'ব ইবনে মালেক আনসারী বলেন :

جاؤا بجيش لو قيس معرسه + ما كان الا كمعرس الدئل

তিনি এ পরিমাণে সৈন্য নিয়ে এসেছেন যে, তাদের আগমনের স্থল পরিমাপ করা হলে তা বেজীর গর্তের সমপরিমাণ হবে।

আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমাদের তাছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ইসিম জানা নাই, যাহা فعل এর ওযনে আসে। আখফাস বলেন : আবুল আসওয়াদ দুইলি কাযী বসরীর উক্ত প্রাণীর নামের সাথে সামঞ্জস্যশীল থাকার কারণে তাকে 'দুইলি' বলা হয়। আবুল আসওয়াদের মূল নাম জালেম ইবনে আমর ইবনে সুলাইমান ছিল। কিন্তু তার নাম ও বংশ সম্পর্কে সমাজে অনেক মতভেদ রয়েছে। তিনি সম্মানিত তাবেঈদের অন্যতম একজন। তিনি হযরত আলী রাযি., আবু মূসা আ., ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আলী রাযি.-এর সৎসঙ্গ লাভ করেছেন। তিনি সিফ্ফীন যুদ্ধেও হযরত আলী রাযি.-এর সাথে যুদ্ধসঙ্গী ছিলেন। তিনি বসরায় বসবাস করতেন। তাকে প্রখর জ্ঞানের অধিকারী এবং বিচক্ষণ বিচারকদের কাতারে গণ্য করা হত। অন্যদিকে তাকে মুহাদ্দেসীন, নাহুবিদ ও কবিগণের মধ্যেও গণ্য করা হত। বিশেষ করে তিনি ইলমে নাহুর ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি

কার্পণ্য এবং প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। সর্বাগ্রে তিনিই এলমে নাহু সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, হযরত আলী রাযি. তাকে একটি বাক্য গঠন করে দিয়েছিলেন। তাতে তিনটি শব্দ ছিল– ইসিম, ফে'ল ও হরফ। হযরত আলী রাযি. এ বাক্য গঠন করে আবুল আসওয়াদকে দিয়ে বলেছিলেন : এ তিনটি শব্দের উপর ভিত্তি করে ইলমে কালামকে পূর্ণতা দান কর।

ইলমে নাহুর নামকরণ

ইলমে নাহুকে 'নাহু' বলার কারণ হল, আবুল আসাদ দুইলি হযরত আলী রাযি.-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন– আমি যেন ঠিক তেমনই বাক্য গঠন করি, যেমন, আপনি গঠন করেছেন। আর যেহেতু আরবী ভাষায় মূলপাঠ ও উদাহরণ বুঝানোর জন্য 'নাহু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, সেহেতু এ এলমের নাম নাহু হয়ে গিয়েছে।

ঘটনাবলি

আবুল আসওয়াদ সম্পর্কে বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। যেমন– (১) একবার তিনি এক ভিক্ষুককে বলতে শুনলেন, আছে কি কেউ এক অনাহারীকে রাতে আহার করাবে? সুতরাং আবুল আসওয়াদ তাকে ডেকে খানা খাওয়ালেন। ভিক্ষুক খানা খেয়ে যাত্রা শুরু করল। তখন তিনি তাকে বারণ করে বললেন : আমি তোমাকে এজন্য আহার করিয়েছি, যেন তুমি রাতে আর কার কাছে সুয়াল করে মানুষকে পেরেশান না কর। তাই এখন তুমি সকাল পর্যন্ত নিজের পায়ে বেড়ী লাগিয়ে বসে থাক।

(২) একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে বললেন, আপনি তো জ্ঞান ও সহিষ্ণুতার আধার। তবে আপনার ভিতরে সামান্য দোষ আছে, আপনি কৃপণ। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, ওই পাত্র কোন কাজে আসবে, যা তার মধ্যে বিদ্যমান জিনিস স্থান দিতে পারে না।

(৩) একবার তিনি ৯টি দীনারের বিনিময়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এরপর সেটি নিয়ে এক টেরা ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ওই টেরা ব্যক্তি ঘোড়ার ক্রয়মূল্য সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এটা কত দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দৃষ্টিতে এর মূলা কত? উত্তরে সে বলল, এর মূল্য সাড়ে চার দীনার হবে। একথা শুনে আবুল আসওয়াদ বলেন : তুমি এর মূল্য নির্ধারণ করতে অক্ষম। কারণ, তুমি তাকে তোমার এক চক্ষু দ্বারা দেখেছ। তাই তুমি এর মূল্য অর্ধেক নির্ধারণ করেছ। যদি তোমার আর অপর চক্ষুটি সুস্থ থাকত, তাহলে তুমি এর সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারতে। একথা বলে তিনি ওই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। বাড়িতে পৌঁছে তা বেঁধে রেখে শয়ন করলেন। শয়ন করার পর হঠাৎ ঘোড়ার চর্বনের আওয়াজ তার কানে আসল। তখন গৃহবাসীকে এর কারণ সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতিউত্তরে গৃহবাসী বললেন, এটা ঘোড়ার খাবার আওয়াজ। একথা শুনে তিনি বললেন : আমি নিজের ধন-সম্পদ এমন ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করি না, যারা তা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আমার এমন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন, যারা তা শুধু বৃদ্ধি করবে। অতএব ওই ঘোড়া তিনি বিক্রয় করে দিলেন আর চাষাবাদ উপযোগী একটি জমি ক্রয় করলেন।

(৪) বসরায় তার প্রতিবেশিরা তার মতাদর্শের বিপক্ষে ছিল। সুতরাং তারা তাকে চতুর্দিক থেকে কষ্ট-ক্লেশে নিমজ্জিত রাখত। রাত্রের বেলায় তার গৃহে পাথর নিক্ষেপ করত। তিনি তাদের কাছে এর অভিযোগ করলে তার প্রতিবেশিরা উত্তর দিত, এ পাথর আমরা নিক্ষেপ করি নাই; আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা মিথ্যুক। কেননা এ পাথর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হলে তা আমার উপরেই পতিত হত। কিন্তু তা আমার নিকটবর্তীও হয় নাই। এটাই প্রমাণ করে, তোমরাই তা নিক্ষেপ করেছ। কিন্তু তার প্রতিবেশিরা তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে নাই। অবশেষে তিনি ওই বাড়িটি বিক্রি করে অন্য এক স্থানে বসবাসের জন্য নির্বাচন করলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন– না, আমি আমার প্রতিবেশিকে বিক্রি করে দিয়েছি।

আবু জাহাম আদভীর ঘটনা

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন : আবুল আসওয়াদের উপরোল্লিখিত ঘটনা আবু জাহাম আদ্‌ভীর ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবু জাহাম আদভীর ঘটনা হল, তিনি নিজের ঘর এক লাখ দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। ঘর বিক্রয় করার পর আবু জাহাম ক্রেতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, বলত তোমরা হযরত সাঈদ ইবনুল আ'স-এর প্রতিবেশিকে কত দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছ? ক্রেতারা তাকে বললেন, কোথাও কি কোন প্রতিবেশি বিক্রয় করা হয়? আবু জাহাম বললেন, আমার ঘর আমাকে ফিরিয়ে দাও আর ঘরের মূল্যও ফেরত নাও। কেননা আল্লাহর শপথ! আমি এমন ব্যক্তির প্রতিবেশিত্ব ত্যাগ করব না, যারা আমি হারিয়ে গেলেও আমাকে সন্ধান করে এবং আমাকে দেখে আনন্দ অনুভব করে। আমি কোথাও সফরে চলে গেলে আমার ঘর সংরক্ষণ করে। আমি উপস্থিত থাকলে আমার নিকট তার হক আদায় করে। আর আমি তাদের নিকট কিছু অন্বেষণ করলে আমার ডাকে সাড়া দেয়। সুতরাং হযরত সাঈদ ইবনুল আ'সকে আবু জাহামের এ সুধারণার সংবাদ দেয়া হয়। তিনি আবু জাহামকে এক লাখ দেরহাম হাদিয়া পাঠান।

(৫) একবার হযরত আবুল আসওয়াদ হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর খেদমতে উপস্থিত হন। উভয়ে কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আবিয়া রাযি. হেসে উঠলেন। আবুল আসওয়াদ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! কার নিকটে এর

পুনরাবৃত্তি করবেন না। এরপর আবুল আসওয়াদ আমীরে মু'আবিয়া রাযি.-এর মজলিস ত্যাগ করে উঠে গেলেন। তখন তার নিকট এলেন ওমর ইবনুল আ'স রাযি.। হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাকে আবুল আসওয়াদের ঘটনা বলে দিলেন। সুতরাং ওমর ইবনুল আ'স যখন আবুল আসওয়াদের সাথে মিলিত হন, তখন তিনি তাকে বলেন– হে আবুল আসওয়াদ! আমীরুল মুমিনীনের সামনে তুমি এমন কাণ্ড ঘটালে? কিছুদিন পর আবুল আসওয়াদ আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সাথে মিলিত হন। তখন তাকে বলেন, আপনার প্রতি দরখাস্ত ছিল ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কার কাছে না করার। আমীরে মু'আবিয়া রাযি. তাকে বললেন, আমি তো শুধু ওমর ইবনুল আ'স-এর নিকটেই বর্ণনা করেছিলাম। আবুল আসওয়াদ বললেন, পূর্ব থেকেই আমার ধারণা ছিল, আপনি খেলাফতের যোগ্য নন। আমীরে মু'আবিয়া রাযি. বললেন, কেন? আবুল আসওয়াদ বললেন– আপনি যখন বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে আমানতদারি রক্ষা করতে পারলেন না, তখন মুসলমানদের জান ও মালের ব্যাপারে কীভাবে বিশ্বাসী হবেন? এটা শ্রবণ করে আমীরে মু'আবিয়া রাযি. হেসে উঠলেন এবং আবুল আসওয়াদকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করলেন।

(৬) কেউ আবুল আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করল, আমীরে মু'আবিয়া কি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন– হ্যাঁ! ছিলেন। তবে খলীফা হিসেবে।

(৭) আবুল আসওয়াদ এক সময় জেয়াদ ইবনে রাবিয়া ইরাকের গভর্নরের ছেলেকে পড়াত। একদিন আবুল আসওয়াদের স্ত্রী জেয়াদের কাছে নিজের ছেলের অভিভাবক হওয়ার দাবি করল। আবুল আসওয়াদের স্ত্রী আমীরের সম্মুখে গিয়ে বলল, ও আমার ছেলে। আমার কাছ থেকে সে একে জবরদস্তি নিতে চাচ্ছে। অথচ আমার পেট ওর বসার স্থান, আমার স্তন তার তৃষ্ণা নিবারণের জায়গা এবং আমার কোল তার বাহন। আবুল আসওয়াদ নিজ স্ত্রীকে বললেন, এভাবে তুমি আমাকে অপদস্থ করতে চাচ্ছ। অথচ আমি এ ছেলেকে তোমার পেটে রেখেছি। তোমার বাচ্চা জন্ম দেয়ার পূর্বে আমার নিজের পেটে আমি তাকে বীর্য আকারে রেখেছি। তারপর আমি একে বীর্য আকারে নির্গত করেছি। স্ত্রী বলল, তোমার এবং আমার ব্যাপারে তুলনা হতে পারে না। কারণ, যে-সময় এ তোমার পেটে ছিল, তখন খুব হালকা ছিল আর যখন তোমার নিকট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আমার পেটে এল, তখন সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বোঝা ভারি হতে লাগল। তোমার পেট থেকে সে যৌনউত্তেজনার সাথে বের হয়েছে আর আমার পেট থেকে বের হয়েছে আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে। আমীর জিয়াদ এর স্ত্রীর কথা শুনে আবুল আসওয়াদকে বলল, আমার কাছে এ মহিলাকে খুবই বুদ্ধিমতি মনে হচ্ছে। সুতরাং তুমি ওই ছেলেকে এনে এ মহিলাকে দিয়ে দাও। সেই একে সুন্দরভাবে লালন পালন করতে পারবে।

আবুল আসওয়াদের ইন্তেকাল হয়েছিল বসরা নগরীতে মহামারীর বছর ৮৫ বছর বয়সে। ওই মহামারীতে বসরা নগরীতে অনবরত লোকেরা মৃত্যুবরণ করছিল। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর ৩০জন ছেলে উক্ত মহামারীতে ইন্তেকাল করেছিল।

بَابُ الذَّالِ

পরিচ্ছেদ : যাল

৩৪৪. ذَوَالَةٌ (জোয়ালাতুন) নেকড়ে বাঘ

ذَوَالَةٌ (জোয়ালাতুন) নেকড়ে বাঘ। এটা ذَالَانٌ (জালান) থেকে নির্গত। অর্থ, হালকাভাবে চলাফেরা করা। যেহেতু নেকড়ে বাঘ খুব হালকা পায়ে চলাফেরা করে, তাই তাকে জোয়ালাতুন বলে।

হাদীসে নেকড়ের উল্লেখ

রাসূলুল্লাহ সা. এক দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে নিজ পুত্রকে এই শব্দাবলী দিয়ে ধমকাচ্ছিল যে, হে নেকড়ে বাঘ! হে বংশের সন্তান! হে নেকড়ে বাঘ! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : জোয়ালাতুন বলো না। কেননা এটা সবচেয়ে খারাপ প্রাণী। এখানে বংশ বলতে বংশের সর্দারকে বুঝানো হয়েছে।

৩৪৫. الذَّرَاحُ (আজ্জার্‌রাহ) উড়ন্ত কীট

الذَّرَاحُ (আজ্জার্‌রাহ) লাল রঙের উড়তে সক্ষম একধরনের বিষাক্ত কীট। এ কীট সাধারণত বাগানে দেখা যায়। তার বহুবচন ذَرَارِيحُ (জারারিহ) আসে। এটা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোনটা কলা থেকে জন্মগ্রহণ করে। তার পাখায় হলুদ রঙের ডোরা কাটা থাকে। তার শরীর লম্বা হয়ে থাকে।

আজ্‌জার্‌রাহ-এর শরঈ বিধান

এটা নোংড়া হওয়ার কারণে খাওয়া হারাম।

জার্‌রাহ-এর ঔষধি গুণ

তা চুলকানী এবং সমস্ত চর্ম রোগের জন্য খুবই উপকারী। সউদ, দাস, শ্বেত-কুষ্ঠ রোগের ঔষধের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাজী রহ. বলেছেন যে, চোখের মধ্যে সুরমার মত তা ব্যবহার করলে চোখের মধ্যে জমিয়ে থাকা রক্ত বের হওয়ার জন্য খুবই উপকারী। মাথার মধ্যে মালিশ করলে সমস্ত উকুন শেষ হয়ে যায় এবং জয়তুনের তেলের মধ্যে রান্না করে মালিশ করলে চুল পড়া রোগ ভাল হয়ে যায়। পুরাতন ডাক্তারদের অভিমত, যদি লাল কাপড়ের মধ্যে তা পেচিয়ে কোন জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে তার জ্বর দূর হয়ে যাবে।

৩৪৬. الاراح (আজ্‌জারাহ) নীল গাই-এর বাচ্চা

৩৪৭. الاعلب (আজ্‌জা'লাব) দ্রুতগামী উটনী

৩৪৮. الاباب (আজ্‌জুবাব) মাছি-মক্ষী

الاباب (আজ্‌জুবাব) মাছি-মক্ষী। এটা একটি প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত প্রাণী। এটার একবচন হল ذبابة জুবাবাতুন। তার বহুবচন হল আজবাতুন এবং জিব্বানুন। যেমন নাবেগার বক্তব্য, হে মানুষকে চলাচলের জন্য উট প্রদানকারী। যা সীমাহীন চলতে পারে। যা ধারাবাহিকভাবে চলাচলের কারণে মাছি তার ঠোঁটের সামনে ভন ভন করতে থাকে। মাছির বহুবচন (জুবাবাত), কর্জ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। যেমন রাজেয়-এর বক্তব্য او يقضى الله ذبابات الديون অর্থ, আল্লাহ তাআলা কি কর্জের মাছিদেরকে শেষ করে দিবেন?

مذبة : মীম এবং জালকে যবরযোগে পঠিত হলে এর অর্থ ঐ স্থানকে বুঝাবে, যেখানে অধিক পরিমাণে মাছি থাকে। যেমনিভাবে যেস্থানে অধিক পরিমাণে বন্য প্রাণী থাকে সেই স্থানকে ارض موحوشة বলা হয়।

মাছিকে জুবাব এই জন্য বলা হয়, তা অধিক নড়াচড়া করে থাকে অথবা যখনই কোন নড়াচড়া হয় তখনই তা উড়ে যায়। তার উপনাম আবু হাফস, আবু হাকিম, আবুল হাদরাস। সৃষ্টিকূলের মধ্যে মাছিই সবচেয়ে আহাম্মক। কেননা এটা নিজেই নিজের জানকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেয়। উড়ন্ত প্রাণীর মধ্যে মাছি ছাড়া আর কোন প্রাণী এমন নাই যে খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে নিজের মুখ ডুবিয়ে দেয়। 'আইন' পরিচ্ছেদে 'আনকাবূত'-এর আলোচনায় আফলাতূনের এই বক্তব্য আছে যে, মাছি সর্বাধিক লোভী প্রাণী। বিস্তারিত সামনে আসবে।

মাছির চোখের পর্দা নাই। এজন্য তার চোখের বৃত্ত খুবই ছোট। চোখের পর্দার কাজ হল, তা চোখের মণিকে ধুলাবালি হতে নিরাপদ রাখে। তাই আল্লাহ তাআলা ঐ পর্দার পরিবর্তে মাছিকে দুটি হাত দিয়েছেন, যদ্বারা সে সর্বদা নিজের চোখকে পরিস্কার করে থাকে। সুতরাং আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন– মাছি সর্বদা নিজের চোখের উপর নিজের হাত বুলাইতে থাকে। মাছির অনেকগুলো প্রকার এমন আছে, যাদের জন্ম নোংড়া স্থান থেকে হয়ে থাকে।

হাফেয বলেছেন যে, আহলে আরবদের নিকট মাছি শব্দের ব্যবহার বল্গা, মৌমাছি, সমস্ত প্রকার মশা, উকুন, কুকুর মাছি ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। যখন দক্ষিণের হাওয়া প্রবল হয়, তখন মাছি বৃদ্ধি পায় আর যখন উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে, তখন মাছি কমে যায়। মাছিরও মশার মত শুড় আছে,

যদ্বারা সে দংশন করে। মানুষের কাছাকাছি বসবাসকারী মাছি কখনও স্ত্রী মাছি পুরুষ মাছির সহবাসের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে এবং কখনও এটা শরীর হতে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং বলা হয়ে থাকে– যদি কলা কোন জায়গায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তখন তার মধ্যকার সকল মাছি উড়ে যায়। আর শুধুমাত্র খোসাটাই অবশিষ্ট পড়ে থাকে।

হাদীস শরীফে মাছির উল্লেখ

হাকেম রহ. নো'মান ইবনে বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন : নো'মান ইবনে বশীর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শুনে রাখ, দুনিয়া শুধু এতটুকু অবশিষ্ট আছে, যতটুকু একটা মাছি মহাশূন্যের মধ্যে উড়তে পারে। সুতরাং তোমরা নিজেদের কবরবাসী ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কেননা তোমাদের আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

আবু ইয়ালা রহ. হযরত আনাস রাযি.-এর এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : মাছির বয়স ৪০ রাত্র। সমস্ত মাছির বয়স ৪০ রাত্র পর্যন্ত হয়ে থাকে। মৌমাছি ছাড়া সমস্ত মাছি দোযখে যাবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দেসীনগণ বলেন, মাছি দোযখে প্রবেশ করবে এটা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য নয় বরং দোযখবাসীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। যাতে তারা জাহান্নামীদেরকে কষ্ট দিতে পারে।

নাসায়ী এবং হাকেম আবুল মুলাইছেহ থেকে তারা নিজেদের পিতা ওসামা ইবনে ওমায়ের আল আকিস থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একই বাহনে বসা ছিলাম। আমাদের বাহন উটটি পাথরে হোঁচট খেল। এরপর আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে এমন হোঁচট খাওয়ান। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : এমনটি বল না। কেননা এমন বলার দ্বারা তা ফুলে মোটা হয়ে যায় আর বলতে থাকে, এটা আমার অভ্যন্তরীণ শক্তির কারণে হয়েছে বরং এই কথা বলবে যে, بسم الله। এই কথা বলার দ্বারা শয়তান ক্ষুদ্র হতে থাকে, অবশেষে তা মাছির মত হয়ে যায়।

تعس : এটার অর্থ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তা ধ্বংস হওয়ার অর্থ দেয়। কেউ কেউ পতিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ পিছলে যাওয়ার অর্থ করেছেন। কেউ কেউ ক্ষতি অবধারিত হওয়ার অর্থ করেছেন। উক্ত শব্দটির আইন যবর এবং যের উভয়টার সহযোগই পড়া যায়। তবে যবরযোগে প্রসিদ্ধ।

তাবারানী ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবুল উমামা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : মুমিনকে ১৬০জন ফেরেশতার

নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। ওই ফেরেশতাগণ মুমিন বান্দাকে যথাসাধ্য নিরাপত্তা দিতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে ৭ জন ফেরেশতা মানুষের নিরাপত্তা এভাবে দিতে থাকে, যেভাবে মাছি মধুর পেয়ালার উপর বেষ্টন করে থাকে। যদি তোমরা তাদেরকে দেখতে, তাহলে তোমরা পাহাড়, সমভূমি সকল স্থানেই তাদেরকে দেখতে পেতে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের হস্ত প্রসারিত করে রেখেছে এবং মুখ উন্মুক্ত করে রেখেছে। যদি একটি মুহূর্তের জন্য মানুষকে তার নিজ হস্তে তথা নিজ দায়িত্বে সমর্পন করা হয় বা ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে শয়তান তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

মাছির একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব হল, সে সাদা জিনিসের উপর কালো এবং কালো জিনিসের উপর সাদা পায়খানা করে। এ ছাড়াও একটি বিশেষ কথা হল, মাছি লাউ গাছের উপর কখনও বসে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী হযরত ইউনুস আ.-এর শরীরে ছায়া দেয়ার জন্য লাউ গাছ উদগত করে দিয়েছেন, যাতে মাছির কষ্ট থেকে তিনি নিরাপদ থাকেন। মাছি দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে অধিক হয়ে থাকে। মাছির জন্ম দুটি জিনিস থেকে হয় অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে অথবা পুরুষ মাছি এবং স্ত্রী মাছির মিলনের ফলে। কোন কোন সময় পুরুষ মাছি স্ত্রী মাছির উপর সারাদিন চড়ে থাকে।

মাছি সূর্যালোকের প্রাণীসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কেননা শীতকালে যতক্ষণ পর্যন্ত রৌদ্রের তাপ প্রখর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা লুকিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালে এবং বিশেষ করে বর্ষাকালে তাদের অধিক পরিমাণে চলাচল লক্ষ্য করা যায়।

মাছির অন্যান্য প্রকার যেমন- মশা, উকুন, ছারপোকা ইত্যাদির আলোচনা ইনশাআল্লাহ নিজ নিজ পরিচ্ছেদে আসবে।

কবি আবুল আ'লা মারি নিজ কবিতায় মাছির উল্লেখ করেছেন–

يا طالب الرزق الهنؤ بقوة + هيهات انت بباطل مشغوف

হে সহজভাবে অর্জনযোগ্য রিযিককে অত্যন্ত শক্তি ব্যয় করে অনুসন্ধানকারী! দূর হয়ে যাও। তুমি ভুল কাজে মশগুল রয়েছ।

راعت الاسود بقوة جيف الغلاء + ورعى الذباب الشهيد وهو ضعيف

কালো চিতা শক্তি প্রয়োগ করে মৃত গাধা খায়, আর মাছি মধু খায়। অথচ সে খুবই দুর্বল।

আবু মুহাম্মাদ আন্দালুসি এ জাতীয় কবিতা লিখেছেন–

مثل الرزق الذى تطلبه + مثل الظل يمشى معك

যে রিযিক তুমি অনুসন্ধান করছ, তার উপমা হল ওই ছায়ার মত, যা তোমার সাথে সাথেই চলে।

انت لا تدركه متبعا + واذا وليت عنه تبعك

তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকে করায়ত্ত করতে পারবে না। কিন্তু যখন তুমি ঘাড় ফিরিয়ে উল্টাদিকে চলতে থাকবে তখন সে তোমার পিছে পিছে আসতে থাকবে।

ওয়াসেতীর লেখক আবুল খায়ের-এর কবিতাও একই রকম–

جرى قلم القضاء بما يكون + فسيان التحرك والسكون

যে জিনিস যার ভাগ্য হবে তাকদীরের কলম পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। সুতরাং এখন নিরব থাকা আর দৌড়ঝাপ করা উভয়টাই সমান।

جنون منك ان تسعى لرزق + ويرزق عشاوته الجنين

রিযিকের জন্য দৌড়াদৌড়ি করা তোমার পাগলামী, আল্লাহ তাআলা গর্ভস্থ ভ্রূণের খাবার তার গর্ভাশয়ের মধ্যেই রেখেছেন।

সাইফুদ্দীন আলী ইবনে ফুলাইহ যাহেরী নিজ শত্রুকে ছোট মনে না করা সম্পর্কে কতই না সুন্দর কবিতা বলেছেন–

لا تحقرن عدوا لان جانبه + وان تراه ضعيف البطش والجلد

কখনই শত্রুকে দুর্বল মনে কর না, যদিও তাকে তুমি কোন একদিক থেকে দুর্বল চামড়া ও দুর্বল ক্ষমতা সম্পন্ন দেখতে পাও।

فللذبابة في الجرح المديد + تنال ما قصرت عنه يد الاسد

কেননা মাছিও পুরাতন ক্ষতের মধ্যে এমন জিনিস লালন-পালন করে, যে স্থানে বাঘের হাত পর্যন্ত পৌঁছায় না।

ইমাম ইউসুফ ইবনে আইউব হামদানীর ঘটনা

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ-এর বর্ণনা, খলীফা আবু জাফর মানসুর আব্বাসী একবার বসে ছিলেন, হঠাৎ একটি মাছি এসে তার মুখের উপর বসে গেল এবং তাকে অস্থির করে তুলল। খলীফা খাদেমদেরকে নির্দেশ দিলেন, দেখ! দরজার কাছে কেউ আছে কি? খাদেম উত্তর দিল, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান আছে। খলীফা নির্দেশ দিলেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। যখন মুকাতিল খলীফার সামনে আসল তখন খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলতে পার যে, আল্লাহ তাআলা মাছি কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? মুকাতিল উত্তরে বলল, জ্বি হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মাছি এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তার মাধ্যমে অত্যাচারী ও নির্যাতনকারীদের অপদস্থ করবেন। এ উত্তর শোনে খলীফা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান কালামুল্লাহর তাফসীর লেখার কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে

ছিলেন। তিনি সাহাবীগণের একটি জামাআত হতে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বাণী, সমস্ত মানুষ তিন ব্যক্তির পরিবারভূক্ত। তাফসীরের ক্ষেত্রে মুকাতিল ইবনে সোলায়মানের, কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে যুহাইর ইবনে আবী সালামার এবং ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার।

কথিত আছে, মুকাতিল ইবনে সোলয়মান রহ. বলতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলার আরশ ব্যতীত আমার কাছে যা কিছু ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করে নাও। এ পর্যায়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, যখন হযরত আদম আ. প্রথমবার হজ্জ করলেন তখন তিনি মাথার চুল ফেলে দিয়েছিলেন কি না? এ কথা শুনে মুকাতিল উত্তর দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। এরপর তিনি বললেন, আমি নিজেই নিজের আত্মতৃপ্তির কারণে নিজেকে এ পরীক্ষার মধ্যে লিপ্ত করেছি। এরপর একদিন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, লাল পিপীলিকার পাকস্থলি তার সম্মুখ অংশে না পিছনের অংশে? মুকাতিল তাকে কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কিন্তু এটা এক ধরনের তিরস্কার ছিল, যার মধ্যে তিনি নিজেই নিজেকে ফেলেছেন। সুতরাং এ পর্যায়ে কবি আবুল আ'লা বলেছেন–

من تجلى بغير ما هو فيه + فضحته شواهد الامتحان

যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দাবি করে যা তার নিকটে নাই, তাহলে পরীক্ষার সময় বিপদে পতিত হতে হয়।

মুকাতিলের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এক পক্ষ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অপর পক্ষ তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসসমূহ বর্জন করেছেন। তারা বলেন, সে কুরআনের তাফসীরের মধ্যে ইহুদী খ্রিষ্টানদের বর্ণনাসমূহ হতে কিছু সংযোজন করেছেন। কিন্তু ইবনে খালকান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এ অভিমত খণ্ডন করেছেন। মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ১৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী ও মামুনুর রশীদের ঘটনা

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর 'মানাকিব'- এ লিখা আছে : তার নিকটে খলীফা মামুনুর রশীদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা মাছি কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, বাদশাহগণকে অপদস্থ করার জন্য। এ কথা শোনে মামুন হেসে উঠলেন আর বলতে লাগলেন, আপনি আমার শরীরে মাছি বসতে দেখেছেন। ইমাম সাহেব বললেন, জ্বি হাঁ, যখন আপনি আমার নিকট প্রশ্ন করেছিলেন তখন আমার নিকটে এটার কোন উত্তর ছিল না। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আপনার শরীরের এমন অংশে মাছি বসে আছে যে স্থানে কার পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তখন আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করে দিলেন। খলীফা মামুনুর রশীদ হেসে বললেন, আপনি খুব ভাল বলেছেন।

তারিখে ইবনে বুখার এবং শিফাউস সুদূর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র শরীরে এবং কাপড়ে মাছি বসত না।

মাছির শরয়ী বিধান

সকল প্রকার মাছি খাওয়া মাকরুহে তাহরিমী। যদি তরকারী অথবা অন্য কোন পবিত্র জিনিসের মধ্যে মাছি পড়ে যায় তাহলে তা উক্ত জিনিসের মধ্যে ডুবিয়ে উঠিয়ে ফেলে দেয়া উচিত। কেননা তার ডান বাহুতে রোগমুক্তি ও বাম বাহুতে রোগের জীবানু থাকে। তা যখন কোন খাবারে বা অন্য কিছুর উপর বসে, তখন ডান বাহু উঁচু রাখে ও বাম বাহু ডুবিয়ে দেয়। অর্থাৎ রোগের জীবানু বহনকারী বাহু খাদ্যের মধ্যে বা পানীয়ের মধ্যে ডুবিয়ে থাকে।

শাখা মাসয়ালা

"আল ইয়াহইয়া" নামক গ্রন্থে হালাল ও হারাম অধ্যায়ে লেখা আছে : যদি মাছি অথবা পিপীলিকা তরকারী ইত্যাদিতে পড়ে যায়, তাহলে উক্ত মাছি বা পিপীলিকা ঐ জিনিসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে হালাল হয়ে যাবে, তা খাওয়া মাকরুহ হবে না। কেননা মাছি হারাম বা মাকরুহ হওয়ার কারণ হল তার প্রতি ঘৃণা। আর এ অবস্থায় তার প্রতি ঘৃণা থাকে না। মানুষের গোশতের টুকরা যদি কোন খাবারের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে উক্ত জিনিস খাওয়া হারাম হবে। এমনকি যদি ঐ গোশতের টুকরা ছোট্ট একটি শস্য-দানা পরিমাণও হয়। কেননা মানুষের গোশত হারাম নোংরা মিশ্রণ ও ঘৃণার কারণে হয়নি বরং মানুষের মর্যাদার কারণে হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর থেকে সংগৃহিত। কিন্তু মুহায্যাব নামক গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে, বিশুদ্ধ মত হল, মানুষের গোশতের সামান্য অংশ পতিত হওয়ার কারণে তা খাওয়া হারাম হবে না। কেননা ঐ সামান্য অংশ ঐ খাদ্যের মধ্যে পতিত হয়ে মিশ্রিত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। যেমন পেশাবের মাসয়ালা। যদি দুই মষকি পরিমাণ পানিতে পেশাব পতিত হয় তাহলে তা নাপাক হবে না। কেননা যে সামান্য পরিমাণ পেশাব ঐ পানিতে পড়েছে, তা পানির সাথে মিশে অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে।

বুখারী, আবু দাউস, নাসায়ী, তিরমিযী ইত্যাদিতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কার পাত্রে মাছি পড়ে যায়, তাকে ঐ পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিবে। কেননা তার এক বাহুতে রোগের জীবানু এবং অপর বাহুতে রোগের শিফা রয়েছে। আর তা জীবাণু বহনকারী বাহু প্রথমে পাত্রে ডুবিয়ে থাকে।

এ হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেছেন, কতিপয় মূর্খরা এ হাদীসের সমালোচনা করে থাকে যে, মাছির বাহুতে রোগের জীবাণু ও রোগের চিকিৎসা কী করে থাকতে পারে? মাছি কীভাবে তা জানতে পারে যে, জীবাণুবাহী বাহু আগে ডুবাতে হবে

আর জীবাণুরোধক বাহু উঁচু রাখতে হবে। বিশুদ্ধ কথা হল একটি প্রাণী দুটি জিনিসের মধ্য হতে রোগজীবাণু ও রোগমুক্তি অস্বীকার না করা উচিত। চিন্তা করা উচিত যে, যে আল্লাহ তাআলা মৌমাছিকে এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, সে একটি আশ্চর্যজনক ঘর নির্মাণ করবে, তাতে মধু সঞ্চয় করবে। যে সত্তা মৌমাছিকে নিজের রিজিক অর্জন করার ও তা সঞ্চয় করার পরামর্শ প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য দিয়েছেন সেই সত্তাই মাছি সৃষ্টি করেছেন। তাকে এ অনুভূতি দান করেছেন যে, একটি বাহুকে প্রথমে স্থাপন করবে এবং অপর বাহু পরে স্থাপন করবে।

হাদীস থেকে এ কথাও বুঝে আসে যে, যদি মাছি পানিতে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ঐ পানি নাপাক হবে না। কেননা তার রক্ত প্রবাহমান নয়। এ মাসয়ালাটি প্রসিদ্ধ মাসয়ালা। যদিও একটি অভিমত নাপাক হওয়া সম্পর্কেও আছে। অন্য একটি অভিমত এমন আছে যে, যদি এমন প্রাণী পানিতে পড়ে যায়, যা ব্যাপক নয়- যেমন, বিচ্ছু ইত্যাদি; তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ মতানৈক্য ঐ প্রাণীর ক্ষেত্রে যে প্রাণী পানিতে জন্মায় না। কিন্তু যদি এমন প্রাণী যা উক্ত জিনিসের মধ্যেই জন্ম নেয় যেমন ফুলের পোকা, সিরকার পোকা ইত্যাদি। এ জাতীয় পোকা উক্ত জিনিসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার কারণে তা অপবিত্র হবে না।

শাখা মাসয়ালা

যদি বল্লা, পিপীলিকা ইত্যাদি খাবার জিনিসের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে কি হাদীসের ব্যাপকতার কারণে তাকে ডুবাতে নির্দেশ দেয়া হবে? কেননা ঐ সকল জিনিস তথা বল্লা, পিপীলিকা ইত্যাদি আভিধানিক অর্থের বিবেচনায় যুবার শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়। যেমন– ইতিপূর্বে হাফেযের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আলী রাযি. মধু সম্পর্কে বলেছেন তা মৌমাছির সঞ্চয়। আর বর্ণিত আছে সমস্ত মাছি জাহান্নামে যাবে শুধুমাত্র মৌমাছি ছাড়া। বাহ্যিকভাবে ঐ বক্তব্য হতে বুঝে আসে, ডুবানোর বিধান শুধু মৌমাছি ছাড়া অন্য সকল মাছির জন্য ব্যাপক। কেননা অধিকাংশ সময় ডুবানোর কারণে মৃত্যু হতে পারে। মূলত অনর্থক কোন উপকারী প্রাণী হত্যা করা হারাম।

প্রবাদ-প্রবচন

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলা মাছির দ্বারা উপমা দিয়েছেন। "হে লোক সকল! একটি আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। সুতরাং তা মনোযোগ দিয়ে শোন। এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়ে যায়।

আরবরা বলে থাকে اطيش من الذباب واخطا من الذباب অর্থাৎ মাছির চেয়েও অধিক ভ্রমণকারী এবং দ্রুততাকারী" এ উপমা এ কারণে বলা হয় যে, অধিকাংশ সময় মাছি গরম জিনিসের মধ্যে বসে পড়ে। যা থেকে মৃত্যু ছাড়া মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। আরবরা এ উপমাও দিয়ে থাকে যে, اوغل من الذباب অর্থাৎ মাছির চেয়েও অধিক বিনা দাওয়াতে আগমনকারী। যেমন আমাদের দেশে বলা হয় "অনাহুত অতিথি" এ উপমাটিকে কবি নিজ কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন—

اوغل فى التطفيل من الذباب + على طعام وعلى شراب

অর্থ : খাদ্য এবং পানীয়ের উপর মাছির চেয়েও অধিক হারে আগমনকারী অনাহুত অতিথি। যদি মেঘমালার মধ্যেও রুটি দেখতে পায়, তাহলে কোন পর্দা করা ছাড়াই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে।

আবু উবায়দা বলেছেন, কুফাতে তুফায়েল ইবনে দলাল নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে আব্দুল্লাহ ইবনে গাতফানের বংশের লোক ছিল। যেখানেই অলীমা ইত্যাদি খাবার আয়োজন থাকত সেখানেই বিনা দাওয়াতে গিয়ে উপস্থিত হত। তাই লোকেরা তাকে طفيل الاعراس অর্থাৎ বিবাহ-শাদীতে বিনা দাওয়াতী আগমনকারী তুফাইলী নামে ডাকতে লাগল। এ সময় থেকে তার নাম প্রবাদ হয়ে যায়। যে কেউ কোন দাওয়াত ব্যতীত কোন বিবাহ-শাদীতে বা মেহমানদারীতে উপস্থিত হলে তাকে "তুফাইলী" বলা হত।

আরবরা এ উপমাও দিয়ে থাকে যে, اصابه ذباب لادغ এ উপমা বা প্রবাদ বাক্য ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহার করে থাকে, যার সামনে এমন কোন বড় বিপদ এসেছে যা শুনে প্রতিটি লোকের অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তেমনি কোন নিম্নমানের জিনিসকে তুলনা করার জন্যও বলা হয়ে থাকে।

পুরুষাঙ্গের মধ্যকার ঐ ক্ষুদ্রাকার শিরা-উপশিরাকে متك বলা হয়, যা সুতার মত হয়ে থাকে।

ইবনে যাফরের 'আন-নিসাহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক উজির স্বীয় বাদশাহকে পরামর্শ দিল সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য। আর বলল, আল্লাহ না করুক, যদি প্রজারা আপনার প্রতি বিরূপ হয়ে যায় ও অনাস্থা জ্ঞাপন করে তখন আপনি তাদের একত্রিত করতে চাইলে ঐ ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাদের একত্রিত করতে পারবেন। বাদশাহ বললেন আমাকে এ কথার কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবেন? উজির এক পাত্র মধু এনে বাদশার নিকট রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ঐ পাত্রের উপর এ পরিমান মাছি একত্রিত হল যে, সমস্ত ঘরের

মধ্যে মাছি ভনভন করে উড়ে বেড়াতে লাগল। আর ঐ মধুর পাত্রের মধ্যে ডুব দিতে লাগল। এরপর উজির বাদশাহকে বললেন, দেখুন আমার পরামর্শ সঠিক না ভুল? বাদশাহ স্বীয় উজিরের পরামর্শ মত কাজ করার পূর্বে নিজের ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর সাথে পরামর্শ করলেন। বন্ধুটি বাদশাহকে উজিরের পরামর্শ মত কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, মানুষের অন্তর সম্পদের লোভ দিয়ে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নাই। কেননা যে সময় আপনি তাদের একত্রিত করতে চাইলেন, তারা সম্পদের লোভে একত্রিত হবে, এটা নিশ্চিত নয়।

বাদশাহ ঐ বন্ধুর কাছেও এ বিষয়ে প্রমাণ চাইলেন। বন্ধুটি বললেন, রাত হতে দিন। আমি আপনাকে প্রমাণ দিব। সুতরাং যখন রাত হল, তখন সে এক পাত্র মধু এনে বাদশার নিকট রেখে দিল। কিন্তু এক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও একটি মাছিও আসল না। সুতরাং বন্ধুর নিকট প্রমাণ পেয়ে বাদশাহ উজিরের মতামতের সাথে ঐক্যমত হলেন না।

মাছির চিকিৎসা সেবা

যদি মাছি মাথা হতে আলাদা করে বল্লা দংশনের স্থানে ডলে দেয়া হয়, তাহলে ব্যথা হ্রাস পাবে। যদি মাছি পোড়ে মধুর সাথে মিশিয়ে টাক মাথায় মালিশ করে দেয়া হয়, তাহলে উক্ত টাক মাথায় ভাল চুল জন্মাবে। মৃত মাছির উপর যদি লোহার জং ইত্যাদি ছিটিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা তৎক্ষনাৎ জীবিত হয়ে যাবে।

যদি মাছি মাথা আলাদা করে শুধু শরীর পরচূলা বা অবাঞ্ছিত লোক জন্ম নেয়ার স্থানে মালিশ করে দেয়া হয়। তাহলে উক্ত স্থানে আর অবাঞ্ছিত লোম জন্ম নিবে না। যদি কোন ব্যক্তি চিৎকার চেঁচামেচি জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তার জন্য উচিত হল কয়েকটি মাছি ধরে কাতান কাপড়ে (কাগজের মত পাতলা এক ধরনের কাপড় যা তাবীজ লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়) প্যাচিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলে ইনশাআল্লাহ চিৎকার চেঁচামেচি রোগ ভাল হয়ে যাবে। যদি মাছির মাথা আলাদা করে অবশিষ্ট শরীর চোখ উঠা রোগীর চোখে লাগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে চোখ উঠা দূর হয়ে যাবে।

কাজবিনী রহ. বলেছেন : আমি চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকে দেখেছি যদি কোন ব্যক্তির দাঁতে ব্যথা থাকে তাহলে মাছি বাহুতে বেধে রাখলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তিকে পাগলা কুকুরে কামড়ায় তাহলে ঐ ব্যক্তির নিজ চেহারা মাছি দ্বারা ঢেকে রাখা উচিত, নতুবা তার ফলে কষ্ট পোহাতে হবে। (আল্লাহ সঠিক জানেন)

মাছির প্রকোপ দূর করার উপায়

নতুন লাউ, হলুদ হরিতকি সমপরিমাণে নিয়ে পিষে নিতে হবে, তা জংলী পিঁয়াজের রসে মিশিয়ে এবং তৈল মিশিয়ে তার মূর্তি বানাবে। আর যখন খাবার

খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন ঐ মূর্তিটি দস্তরখানের উপর রেখে দিবে। যতক্ষণ ঐ মূর্তি দস্তরখানে থাকবে ততক্ষণ কোন মাছি দস্তরখানের নিকটবর্তী হবে না। যদি দুধ কদুর সাথে মিশিয়ে ঘরের মধ্যে পূঁতে দেয়া হয়, তাহলে ঘরে মাছি প্রবেশ করবে না। লাউয়ের পাতার ধোঁয়া ঘরে দিলেও মাছি ঘরে প্রবেশ করবে না।

স্বপ্নে মাছি দেখা

স্বপ্নে মাছি দেখলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলী বুঝাবে। শত্রুতা, হিংসা, দুর্বল, সৈন্য, আবার কোন সময় স্বপ্নে মাছি দেখা পবিত্র রিজিক সঞ্চয় করার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় অসুস্থতা, ঔষধ ও বদ আমলেরও ইঙ্গিত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় তা স্বপ্নে দেখা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবাহী হয়ে থাকে যা দুঃশ্চিন্তা, অপদস্ততা ও লজ্জিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

অর্থ : এটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ তা একটি ছোট মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়ে নেয়। আর যদি মাছি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তথাপি সে তা ছাড়িয়ে নিতে পারে না। এমনি বান্দাও অক্ষম, তার মা'বুদও অক্ষম।

৩৪৯. الذر (আয্-যার) লাল পিঁপড়া

"আয যার" লাল পিপড়াকে বলা হয়। এর একবচন হল ذرة। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ان الله لا يظلم مثقال ذرة "আল্লাহ্ তাআলা কার উপর অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।" আলেমগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন কোন নেক আমলের মধ্যে লাল পিপড়ার ওযন পরিমাণও কম করবেন না। সালাবা নামক জনৈক আলেমের নিকটে 'যাররাতুন' এর ওযন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেন, একশত পিপড়ার ওযন এক দানা পরিমাণ হবে।

কথিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি রুটি রেখে দিয়েছিল। তাতে এই পরিমাণ পিপীলিকা জমা হয়েছিল যে, সম্পূর্ণ রুটি ঢেকে ফেলেছিল। তখন ঐ পিপীলিকাসহ রুটিটি ওজন করা হলেও দেখা গেল রুটির ওযন একটুও বৃদ্ধি পায় নাই।

আরও বলা হয় যে, যাররা ঐ ধুলাকে বলা হয় যা কোন ছিদ্র পথে সূর্যের আলো এসে পড়ার সময় যে ধুলা দৃষ্টি গোচর হয়, ঐ ধুলার কোন ওযন থাকে

না। সহীত মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত হাদীস যা কিয়ামতের দিন রাসূল (সা.)- এর শাফায়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন "কিয়ামতের দিন দোযখ হতে ঐ সকল কালিমা পাঠকারীদিগকেও বাহির করা হবে যাদের অন্তরে এক যাররা পরিমাণ ঈমান আছে। مثقال ذرة কেউ কেউ ثقال ذرة পড়িয়াছেন, ইবনে বাত্ হাম্বলী এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন যে, مثقال শব্দটি ثقل শব্দ হতে উৎকলিত مفعال এর ওযনে এসেছে। আর ذرة ঐ পিপীলিকাকে বলা হয় যার এক বছর বয়স হয়েছে, কেননা এটা 'আফয়া' সাপের মত যতই বয়স হতে থাকে ততই ছোট হতে ও হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং আরববাসীরা বলে যে, افعى جارية অর্থাৎ সে পুরাতন সাপ, যা বয়স হওয়ার কারণে ছোট হয়ে গিয়েছে, এই সাপ খুবই বিষাক্ত হয়ে থাকে।

কবিতার অর্থ : দৃষ্টি নতকারী যদি ঘুরিয়া যায়, তথাপি তার পদাংক মাটিতে বহাল থাকে। محمول ঐ জিনিসকে বলা হয় যার বয়স এক বছর হয়ে গিয়েছে।

اتب ঐ কাপড়কে বলা হয় যা মহিলারা গলায় ঝুলিয়ে রাখে।

হাস্সান বলেছেন-

অর্থ : যদি সে আমার আশপাশে পিপীলিকার মত চলাচল করে, তাহলে অবশ্য তার চলার চিহ্ন সর্বদা বহাল থাকবে।

সুহাইলী প্রমূখগণ বলেছেন যে, জুরহাম সম্প্রদায়কে আল্লাহ পিপীলিকা ও নাকসীর রোগের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। ঐ সম্প্রদায়ের সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী লোকটি একজন মহিলা ছিল। যাকে তার সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখা গিয়েছে। ঐ মহিলার শারীরিক গঠন দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে পড়ত। সুতরাং কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মানুষ নাকি জিন? সে উত্তরে বলল, আমি জুরহাম গোত্রের একজন মহিলা। এটার পর ঐ মহিলা খয়বর যাইবার উদ্দেশ্যে জুহাইনা গোত্রের দুই ব্যক্তির নিকট হতে একটি উট ভাড়া করল। উটের মালিকেরা যখন তাকে খায়বর পৌছাইয়া দিল তখন তারা দুজনেই ঐ মহিলার নিকট পানি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইল। মহিলাটি তাদেরকে বলল, অমুক স্থানে পানি আছে। সেই স্থান হতে পানি সংগ্রহ করে নিন। সুতরাং যখন ঐ দুজন লোক মহিলাটির নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল, তখন একটি লাল পিপীলিকা এসে তার শরীরের সাথে জড়াইয়া রইল এবং চলতে চলতে তার নাকের ছিদ্র পথে প্রবেশ করে গলার ভিতরে পৌছাইয়া গেল। আর তাকে ধ্বংস করে ফেলল।

ইয়াযিদ ইবনে হারুন ذرة এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যাররা একটি লাল রঙের কাপড় কিন্তু তার এই বক্তব্য সঠিক নয়। জনৈক আলিম বলেছেন, যদি আমার পুণ্য তন্মধ্যেকার সকল কিছু হতে প্রিয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

"যে কেউ যাররা পরিমাণ তথা অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা দেখতে পাইবে এবং যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ করলে তাও দেখতে পাবে।"

রাসূল সা. এই আয়াতটিকে অর্থের বিবেচনায় স্বতন্ত্র বলেছেন।

হাদীসে ذر পিপীলিকার উল্লেখ

বায়হাকী রহ. শুয়াবুল ঈমানে সালেহ আল মারয়ীর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত। রাসূল সা.-এর কাছে একজন ভিক্ষুক আসল। রাসূল সা. তাকে একটি খেজুর দান করলেন। ভিক্ষুক বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ একজন নবী একটিমাত্র খেজুর দান করেছেন। রাসূল সা. তাকে বললেন, তোমার কি জানা আছে, এই একটি খেজুরে কি পরিমাণ কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে? কিছুক্ষণ পর আরও একজন ভিক্ষুক আসল। রাসূল সা. তাকেও একটি খেজুর দান করলেন। সে বলল, আল্লাহর নবীর বরকতময় হাত হতে একটি খেজুর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সারা জীবনে আমি এটাকে আমার কাছ ছাড়া করব না। রাসূল সা. তাকে আরও দিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক বর্ণনাতে আছে রাসূল সা. দাসীকে বললেন, উম্মে সালমার নিকট যাইয়া বলবে সে যে চল্লিশ দিরহাম তার নিকটে আছে তা এই ভিক্ষুককে দিয়ে দিবে। হযরত আনাস রাযি. বলেছেন, অল্প দিনের মধ্যেই এই ভিক্ষুক ধনী হয়ে যায়।

ইমাম আহমাদ হাম্বল রহ. স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকূলের একজনের অপরজনের নিকট হতে বদলা লইয়া দেয়া হবে। এমনকি শিং বিহীন প্রাণীকে শিং ওয়ালার নিকট হতে এবং লাল পিপীলিকাকে অন্যান্য পিপীলিকার নিকট হতে বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করাইয়া দেয়া হবে।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস রাযি. কোন জনৈক ভিক্ষুককে দুটি খেজুর দান করতে অগ্রসর হলে, ঐ ভিক্ষুক হাত গুটাইয়া লইল। এটা দেখে হযরত সাদ রাযি. বললেন, ওহে ভিক্ষুক! এটা গ্রহণ করে লও। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট হতে যাররা তথা অণু পরিমাণ জিনিসও কবুল করে লইয়াছেন। হযরত আয়েশা রাযি.-ও আঙ্গুরের একটি দানা সম্পর্কে এমনই বলেছেন।

সা'সায়া ইবনে আককাল তামিমী রাযি. রাসূল সা.- এর নিকটে فمن يعمل এই আয়াত শুনে বলেছিলেন, আমার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট। যদি এই আয়াত ছাড়া অন্য কোন আয়াত নাও থাকত তথাপি কোন পরওয়ানা নাই। হযরত হাসান বসরী রহ.- এর নিকটে এই আয়াত শ্রবণ করে জনৈক ব্যক্তি বলল, উপদেশ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এটা শ্রবণ করে হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, এই ব্যক্তি ফকীহ হয়ে গিয়েছে।

হাকেম রহ. মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আবু আসমা রাযি.- এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই সূরা (যিলযাল) অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. রাসূল সা.-এর সাথে খানা খাইতেছিলেন। এই আয়াত শ্রবণ করে তিনি খানা খাওয়া বন্ধ করে কান্না শুরু করে দিলেন। রাসূল সা. তার নিকটে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কি অণু পরিমাণ জিনিস সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? রাসূল সা. বললেন, কোন অপসন্দনীয় জিনিস লক্ষ্যই করা হয় নাই। অণু পরিমাণ মন্দ বা পাপের উল্লেখই করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আখিরাত পর্যন্ত তোমাদের জন্য অনেক অণু পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় করে রাখবেন। ইমাম আহমাদ "কিতাবুযুহুদে" হযরত আবু হুরাইয়া রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সা. বলেছেন, অহংকারী ও গর্বকারীদের কিয়ামতের দিন লাল পিপীলিকার মত ক্ষুদ্রতর আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। লোকেরা তাদেরকে পদদলিত করতে থাকবে। এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে ছোট মনে করেছিল। হিসাব সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের একই অবস্থা থাকবে। অতঃপর তাদেরকে " নারুল আনইয়ার"-এ লইয়া যাওয়া হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! " নারুল আনইয়ার" কি জিনিস? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, তা দোযখীদের ঘাম। এই হাদীসটি তারগীব ও তারহীবের লেখকও বর্ণনা করেছেন।

আমর ইবনে শুয়াইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি নিজ দাদা হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিদেরকে ছোট ছোট পিপীলিকার মত ক্ষুদ্রাকৃতির মানব হিসেবে একত্রিত করা হবে। সকল দিক হতে তাদেরকে অপমান বেষ্টন করে লইবে। তাদেরকে জাহান্নামের ঐ বন্দিখানার দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হবে। যার নাম 'বুলিস'। তাদের ওপর জাহান্নামের আগুন তীব্র বেগে জ্বালাইয়া দেয়া হবে। তাদেরকে 'তিনাতুল খাবাল' তথা জাহান্নামীদের ঘাম পান করানো হবে। ইমাম তিরমিযীও এই হাদীসকে হাসান ও গরীব বলেছেন।

ইমাম বায়হাকী রহ. " শুয়াবুল ঈমান" নামক গ্রন্থে আসমায়ী রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন, জঙ্গলে এক বেদুইনের সাথে সাক্ষাৎ হল :

নারিকেল পাতার ঘরে বসিয়াছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে বেদুইন! এখানে তোমাকে আকৃষ্টকারী এমন কোন জিনিস আছে? সে উত্তরে বলল, এখানে আমার হৃদয় আকৃষ্টকারী ঐ জিনিস যা কবরে মৃত খাবার সংগ্রহ পরিতৃপ্ত করবে। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথা হতে খাবার সংগ্রহ করে থাক? এটার উত্তরে সে বলল, যে সত্তা লাল পিপীলিকার (যা আমার চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র) রিজিকদাতা সেই সত্তা আমারও রিজিকদাতা।

আল্লামা আবুল ফারজ ইবনে জাওযী রহ.- এর মাদহাশ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, এক অনাবর ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে বাহির হল। চলতে চলতে পথিমধ্যে একটি পাথরের টুকরার উপর তার দৃষ্টি পড়ল। যাতে লাল পিপীলিকা চলাফেরা করিতেছিল, তিনি ঐ পাথরটি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, পিপীলিকা চলার কারণে ঐ পাথরের উপর দাগ পড়িয়া গিয়েছে। এটা দেখে সে চিন্তা-ভাবনা করে দেখল যে, এই শক্ত পাথরের উপর পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র প্রাণী বারবার চলাচলের কারণে যদি দাগ পড়িয়া গিয়ে থাকে, তাহলে আমি এই কথার বেশি উপযুক্ত যে, আমি ইলম অর্জনে সর্বদা লিপ্ত থাকব। হয়ত এভাবেই আমি আমার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হব। সুতরাং এই বিষয়টি প্রত্যেক দ্বীন ও দুনিয়াকে জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত ব্যক্তির এবং বিশেষ করে মারেফাতের অন্বেষীদের জন্য আবশ্যক। আর তাহলে সে জ্ঞান অন্বেষণে অলসতা করবে না। নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কেননা এই পন্থাতেই হয়তো সফলতা তার পদচুম্বন করবে। অথবা তার শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ হবে।

সহীহ মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে যাররা তথা অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা শ্রবণ করে জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই আকাঙ্খা থাকে যে, আমার পোশাকটা সুন্দর হত, আমার জুতাটা সুন্দর হত। এটা শ্রবণ করে রাসূল সা. বললেন, আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে তিনি পছন্দ করেন। (অহঙ্কারের অর্থ হল নিজেকে বড় মনে করা ও অন্য লোকদের ছোট মনে করা)

কতিপয় মুহাদ্দিসগণ এই স্থলে অহঙ্কার বলে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট অহঙ্কার অর্থ করেছেন। অর্থাৎ যার অন্তরে এ জাতীয় অহঙ্কার থাকবে সে নিশ্চিতরূপে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের সময় তার অন্তরে অহঙ্কার থাকবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন– "আর আমি তাদের অন্তর হতে বক্রতা বাহির করে লইব। কিন্তু এই উভয় ব্যাখ্যা মূল অর্থ হতে অনেক দূরে। কেননা নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যদের নীচ মনে করা।

সঠিক অর্থ এটাই, যা কাযী আয়ায রহ. ও অন্যান্য মুহাক্কিক আলিমগণ গ্রহণ করেছেন। আর তাহল, অহঙ্কারী স্বীয় অহঙ্কারের শাস্তি পাওয়া ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অথবা প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসূল সা.-এর অন্য এক হাদীসে অহঙ্কারের এই অর্থ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, অহঙ্কার হল আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে সে যেন আমার চাদর লইবার জন্য টানাটানি করার চেষ্টা করল। এই হাদীসের আলোকে অহঙ্কারীকে কঠোর সাবধান বাণী ও শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই অধিক বিশুদ্ধ কথা হল, অহঙ্কারী শাস্তি পাওয়া ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাদীসে যে "লোকটি বলল" এসেছে, সেই লোকটি হল মালেক ইবনে মুরাবা রিবাবী। যেমনটি কাযী আয়ায রহ. ও ইবনে আব্দুল বার রহ. অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবুল কাশেম খালফ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে বিশকুয়াল বলেছেন যে, এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথম এই হাদীসে লোকটি বলে আবু রায়হানা (যার নাম শামউন)-কে বুঝানো হয়েছে। অথবা রাবীয়া ইবনে আমেরকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ সায়াদ ইবনে ওমর, কেউ মুয়ায ইবনে জাবাল এবং কেউ কেউ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি.কে বুঝানো হয়েছে বলেছেন।

আর রাসূল সা.-এর বাণী : ان الله جميل—আল্লাহ সুন্দর—এ কথার অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সকল কাজ সুন্দর ও উত্তম। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী রহিয়াছে। কেউ কেউ বলেছেন, সুন্দর অর্থ সুন্দরময় ও সম্মানিত। যেমনি سميع وكريم শ্রোতা ও সম্মানিত. অর্থ শ্রবণ ও সম্মান। আবুল কাসেম কুশাইরী এটার অর্থ "মর্যাদাপূর্ণ" বলেছেন। কেউ কেউ এই অর্থ করেছেন যে, বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণ উত্তম অর্থাৎ তিনি বান্দাদেরকে সহজ কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আবার তা সম্পাদনের জন্য বান্দাদের সহায়তা করে থাকেন। তদুপরি তা সম্পাদনের পর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আরও একটি অভিমত এই আছে যে, তার অর্থ নূর ও ঔজ্জ্বল্যের মালিক।

শায়খুল ইসলাম ইয়াহইয়া নববী রহ. লিখেছেন যে, এই নামটি সহীহ হাদীস ও আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনাতে বর্ণিত হয়েছে। যদিও কোন কোন আলিম তা অঙ্গীকার করেছেন। ইমামুল হারামাইন লিখেছেন যে, যা শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা আল্লাহ তাআলার প্রসঙ্গে ব্যবহার করাকে জায়েয সাব্যস্ত করে থাকি। আর যে সকল বিষয়ে জায়েয ও নামাযের কোন কিছুই বর্ণিত হয় নাই, আমরাও তা সম্পর্কে জায়েজ ও নামাযের কোন সিদ্ধান্ত দেই নাই। কেননা শরীয়তে বিধানাবলির সম্পর্ক শরীয়ত প্রবর্তকের সাথে। তাই যদি আমরা বৈধ বা অবৈধের সিদ্ধান্ত দিয়ে দেই তাহলে আমরা শরীয়তের নির্দেশনা ব্যতীত একটি বিধান প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাব।

ইমাম নববী রহ. লিখেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলার নাম, গুণাবলী এবং তাঁর প্রশংসা এমন শব্দাবলীতে করা যা সম্পর্কে শরীয়তে কোন ইতিবাচক বা নেতিবাচক মন্তব্য নাই। তা কি জায়েয নাকি না জায়েয? এক দলের অভিমত হল তা জায়েয এবং অপর দল তা নাজায়েয বলে অস্বীকার করছে। তাদের মতে শুধু ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করা সঠিক হবে যা আল্লাহর কিতাব ও মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অথবা তা ব্যবহারের ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন শব্দের প্রমাণ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা হয়, তাহলে সেই শব্দ সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেছেন, ঐ শব্দ দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করা জায়েয। কেননা তা আমলেও অন্তর্ভূক্ত। আর খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা জায়েয। কোন কোন আলিম তাকেও নিষেধ করেছেন। কেননা, সূক্ষ্মভাবে তার সম্পর্ক আকীদার সাথে।

কাযী লিখেছেন, সঠিক হল তা নাজায়েয। কেননা তা আমলের অন্তর্ভূক্ত। এটা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার ঘোষণা রহিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঐ সকল নামে আল্লাহ তাআলাকে আহ্বান কর।

غمط : হাদীসে যে غمط শব্দ এসেছে তার অর্থ হল, মানুষকে ছোট মনে করা। কোন কোন বর্ণনায় শব্দ এসেছে। এটা একই অর্থবোধক।

স্বপ্নে পিপীলিকা দেখিবার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে পিপীলিকা দেখিবার ব্যাখ্যা বংশধারা দ্বারা করা হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

واذ اخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم

"আর যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানের পিঠ হতে তাদের সন্তান বাহির করলেন।"

আবার তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দুর্বল লোক দ্বারা করা হয়। কখনও সৈন্যবাহিনী দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয়।

৩৫০. الذئب (আয-যি'বু) নেকড়ে বাঘ

আয-যিবু নেকড়ে বাঘ। এটার স্ত্রীলিঙ্গ ذئبة ব্যবহৃত হয়। এটার বহুবচন اذوب এবং ذئاب ব্যবহৃত হয়। তাকে হাতিফ, সাইয়্যেদ, সারহার, যাওয়ালাতুন, আমলাস, সালাক এবং সিমসামও বলা হয়। তার উপনাম " আবু মাযকাহ" বলা হয়।

সুতরাং কবি বলেছেন–

حتى اذا جن الظلام واختلط + جاؤ بمذق هل رأيت الذئب قط

এমনকি যখন অন্ধকার আবৃত করে এবং অন্ধকারই অন্ধকার হয়ে গেল, তখন সে আসিল চিৎকার করতে করতে। তখন কেউ কি নেকড়ে বাঘকে দেখেছে?

তার প্রসিদ্ধতম উপনাম আবু জা'আদাহ। তাই তো যখন মুনযির ইবনে মাউসসামা মালেক যখন আবু উবায়দাহ ইবনে আরবাসকে হত্যা করার ইচছা করল, তখন সে এই কবিতা পাঠ করেছিল।

وقالوا هى الخمر تكنى الطاء + كما اذئب يكنى ابا جعدة

লোকেরা বলে যে শরাবের উপনাম 'তলা'। কিন্তু এই উপনামটি ঐ রকম, যেমন নেকড়ে বাঘের উপনাম আবু জানাদাহ।

কবি এখানে উপমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই উপমা প্রদানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বাহ্যত আপনি খুব সম্মান করে থাকেন। কিন্তু মনে মনে আমাকে হত্যার নিয়ত করেছেন। সুতরাং এটা এমন উপমা হয়ে গেল যে, শরাব খুবই খারাপ জিনিস, কিন্তু এটা 'তলা' নামেও সম্বোধন করা হয়, অথচ 'তলা' খুবই ভাল জিনিস। এমনিভাবে নেকড়ে বাঘ যা একটি নিকৃষ্ট, হিংস্র প্রাণী, কিন্তু তাকে একটি সুন্দর উপনামে ডাকা হয়। জাআদাহ এক ধরনের বকরীকে বলা হয় এবং এক প্রকার সুগন্ধী বুটির নামও জাআদাহ। যা বসন্তকালে জন্ম নেয় এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়।

মুতআ সম্পর্কে ইবনে যুবায়েরের বক্তব্য : যখন ইবনে যুবায়েরের কাছে মুতআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে, নেকড়ে বাঘের উপনাম আবু জাআদাহ। এটার অর্থ হল মুতআ, নাম হিসেবে ভাল। কিন্তু অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে নিকৃষ্ট। যেমনি নেকড়ে বাঘের উপনাম খুবই সুন্দর, কিন্তু স্বয়ং নেকড়ে বাঘের কাজ খুবই নিকৃষ্ট।

নেকড়ে বাঘের উপনাম আবু সুমামা, আবু জায়েদ, আবু রা'লা, আবু সালয়ামাহ, আবু আতলাস, আবু কাসেব এবং আবু সালমাও ব্যবহৃত হয়। তার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ নাম উওয়াইলিস। কবি হাযলী বলেছেন–

يا ليت شعرى عنك والامر عمم + ما فعل اليوم اويس بالغنم

কতই না ভাল হত, যদি আমার উপলব্ধি হত তোমার কথাগুলী। অথচ বিষয়টা খুবই সাধারণ ছিল। আজ নেকড়ে বাঘগুলী বকরীগুলীর সাথে কেমন ব্যবহার করল।

নেকড়ে বাঘের রঙের মধ্যে মেটে রঙের মিশ্রণ রহিয়াছে। যার আরবী হল غبش গবশুন। তাই পুরুষ নেকড়ে বাঘের বিশেষণ اغبش আগবাশ এবং স্ত্রী

নেকড়ে বাঘের বিশেষণ غبشا গাবশা আসে। সুতরাং বলা হয় ذئب اغبش অর্থাৎ মেটে রঙের নেকড়ে বাঘ।

ইমাম আহমাদ রহ. আবু ইয়ালা মুসলি এবং আব্দুল বাকী ইবনে কানে' হতে বর্ণনা করেছেন। কবি আ'শা মাযেনী হুরমুযানী, যার আসল নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আওয়ার ছিল। তার স্ত্রীর নাম মুআযাহ ছিল। রজব মাসে কবি আ'শা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বাহির হল। তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী মুআযাহ পলায়ন করল এবং নিজ গোত্রের মুতরিফ ইবনে বাহসান ইবনে কা'ব নামক এক ব্যক্তির নিকটে আশ্রয় লইল। মুতরিফ তাকে একটি রুমের পিছনে লুকাইয়া রাখল। অতঃপর যখন আ'শা খাদ্য-পানীয় লয়ে ঘরে ফিরিয়া আসল, তখন স্ত্রীকে ঘরে পাইল না। কেউ তাকে বলল, তার স্ত্রী ঘর হতে পলায়ন করে অমুক ব্যক্তির নিকটে চলে গিয়েছে। তাই আ'শা মুতারিফের নিকটে যাইয়া নিজ স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিতে বলল, কিন্তু মুতরিফ ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করল। মুতরিফ স্বীয় গোত্রে আ'শার চেয়েও অধিক সম্মানিত ছিল বিধায় আ'শা রাসূল সা.- এর নিকটে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে এই কবিতা পাঠ করল–

يا سيد الناس وديان العرب + اشكوا اليك ذرية من الذرب

হে মানুষের নেতা এবং আরববাসীদের অনুগতকারী। আমি আপনার নিকটে একটি নির্লজ্জ বা কলঙ্কজনক কাজের অভিযোগ লইয়া এসেছি।

كالذئبة الغبشاء فى ظل السرب + خرجت ابغيها الطعام فى رجب

আমি রজব মাসে মেটে রঙের নেকড়ে বাঘের মত পথিমধ্যে গাছের ছায়ায় তার জন্য খাদ্য-পানীয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম।

فخالفتنى بنزاع وهرب + وقد فتنى بين عيص وموتشب

আমার স্ত্রী আমার বিরুদ্ধাচারণ করল, আমার নিকট হতে পালাইয়া গেল। আমাকে ঘণ মনের মধ্যে ফেলিয়া গেল অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে পালাইয়া গেল।

اخلفت الهدو لطت بالذنب + وهن شر غالب لمن غلب

সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আমার নিকট হতে সে এমনভাবে আত্মগোপন করেছে, যেমনি উটনী নিজ লেজ দ্বারা যৌনাঙ্গ এমনভাবে ঢাকিয়া রাখে যেন উট সঙ্গম করতে না পারে, আর মেয়েদের কূট কৌশল এতখানি প্রবল যে, যাকে ইচ্ছা করে তাকে পরাজিত করতে পারে।

রাসূল সা. আ'শার কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করলেন, আর মুতারিফের নামে চিঠি লিখাইলেন, যাতে আ'শার স্ত্রীকে ফেরত দিতে বলেছিলেন। আ'শা

রাসূলের সা. চিঠি নিয়ে মুতরিফের নিকটে পৌঁছাইল এবং তাকে পাঠ করে শুনাইল। মুতরিফ মহিলাটিকে এই বিষয়ে অবহিত করাইয়া বলল, আমি রাসূল সা.- এর কারণে তোমাকে স্বামীর নিকট ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছি।

এরপর মহিলাটি বলল, প্রথমে আ'শার নিকট হতে আমার মারপিট না করার অঙ্গীকার লও এবং এই অঙ্গীকারের বিপরীতে জামানত লও। সুতরাং আ'শা ঐ শর্ত অনুমোদন করল। আর মুতরিফ মহিলাটিকে তার কাছে সোপর্দ করে দিল। এটার পর আ'শা কবিতা আবৃত্তি করল–

لعمرك ما حبى معاذة بالذى + يغيره الواشى ولا قدم العهد

তোমার প্রাণের শপথ! আমার ভালবাসা মুয়াযার প্রতি এমন নয়, যা কটুকথা ও সময়ের তিক্ত কথা পরিবর্তন করে দিতে পারে।

ولا سوء ما جاءت به اذا زلها + غواة رجال ادينا جونها بعدى

আর এ ভালবাসা ঐ অপকর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে না যাতে মুয়াযাহ লিপ্ত হয়ে পড়বে। আমার অনুপস্থিতিতে দুষ্কর্মপরায়ন লোকদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া

এই আয়াত ان كيدكن عظيم এর তাফসীরে আল্লামা যামাখশারী রহ. বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মহিলাদের প্রতারণার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট ও বড় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও পুরুষের মধ্যে ধোকা-প্রতারণার স্বভাব রয়েছে, কিন্তু মহিলাদের ধোকা-প্রতারণা পুরুষদের ধোকা-প্রতারণার চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সহজে অনুভব করা যায় না। আর তাদের কৌশল পুরুষদের উপর খুব দ্রুত কার্যকরী হয়। এই ব্যাপারে মহিলারা কোমল ব্যবহার করে থাকে। আর এই কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে খুব দ্রুত পুরুষের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, ومن شر النفاثات فى العقد অর্থাৎ আর আমি আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি ঐ সকল মহিলাদের ধোকা-প্রতারণা হতে যারা গিরাসমূহে ফু দিয়ে থাকে। نفاثات 'নাফ্ফাসাত' বলা হয় ঐ সকল মহিলাকে যাদের কঠোরতা ও মন্দ স্বভাব অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। সুতরাং এই প্রসঙ্গে জনৈক আলেমের বক্তব্য, আমি শয়তানের ব্যাপারে এতটা ভীত নহি যতটা মহিলাদের ব্যাপার ভীত। কেননা শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ان كيد الشيطان كان ضعيفا অর্থ : নিশ্চয়ই শয়তানের চাল বা প্রতারণা দুর্বল। পক্ষান্তরে মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ان كيدكن عظيم অর্থ : নিশ্চয় তোমাদের চাল বা প্রতারণা বড়।

মহিলাদের সতর্কতার একটি ঘটনা

ইবনে খালকান ঐতিহাসিক গ্রন্থে ওমর ইবনে রবীয়ার জীবনীতে লিখেছেন যে, সে একবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতেছিল। তাওয়াফ করা অবস্থাতেই এক মহিলার উপর তার দৃষ্টি পতিত হল যে মহিলাও তাওয়াফ করিতেছিল। সে ঐ মহিলাকে দেখেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং তার সাথে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। উক্ত মহিলা বসরার অধিবাসী ছিল। ইবনে রবীয়াহ তার সাথে কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঐ মহিলা তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না। বরং তাকে বলতে লাগল, আপনি আমার নিকট হতে দূরে থাকুন। কেননা আপনি পবিত্র হারাম শরীফে অবস্থান করছেন। এটা এমন একটি স্থান যার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকটে অনেক বেশি। কিন্তু যখন দেখল যে, ইবনে রবীয়াহ তার পিছু ছাড়িতেছে না এবং তাকে তাওয়াফ করিতে দিতেছে না, তখন সে তার কোন এক মাহরাম পুরুষের কাছে গিয়ে তাকে তাওয়াফ করতে সাহায্য করার অনুরোধ জানাইল। অতঃপর যখন ইবনে রবীয়া দেখল যে, তার সাথে তার কোন প্রিয়জন রহিয়াছে, তখন সে সেই স্থান হতে চলিয়া গেল। এটার পর ঐ মহিলা যবরকান ইবনে বদর সাদীর এই কবিতা পাঠ করল–

تعدو الذئاب على من لا كلاب له + وتتقى مريض المستأسد الضارى

খেঁকশিয়াল ঐ জিনিসের পিছনে দৌড়াইতে থাকে, যার সাথে কুত্তা নাই, আর নেকড়ে ক্ষতিকর প্রাণীর বাসস্থানের ধারে কাছেও যায় না।

যখন মানসুরের কাছে এই ঘটনা বলা হল তখন তিনি বললেন, আমার কাছে যথাযথ মনে হচ্ছে যে, কোন পর্দানশীলা মহিলাই যেন এই ঘটনা শ্রবন করা হতে বাদ না যায়।

যেই রাত্রিতে হযরত ওমর ফারুক রাযি.- এর উপর খঞ্জর দিয়ে আক্রমন করা হল ঐ রাত্রিতে আমর ইবনে রবীয়াহ জন্মগ্রহণ করে।

উমর ইবনে রবীয়াহ সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শত্রুপক্ষ তার জাহাজ জ্বালাইয়া দেয়। আর এটারই প্রতিফল দাঁড়ায় যে, তারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ধ্বংস হইয়াছিল। যখন হাসান বসরীর সামনে উমর ইবনে রবীয়ার উল্লেখ হইত তখন তিনি বলতেন اى حق رفع واى باطل হে সত্য সমুন্নাতকারী আর মিথ্যা ধূলিস্যাৎকারী। উমর ইবনে রবীয়াহ ৮০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

নেকড়ে বাঘ ও সিংহের মাঝে ক্ষুধার্ত কালে ধৈর্য ধারণের যে পরিমাণ যোগ্যতা আছে তা দ্বিতীয় আর কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিংহ চূড়ান্ত পর্যায়ের লোভী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ক্ষুধার্তাবস্থায় থাকতে সক্ষম। আর বাঘ সিংহ অপেক্ষা নিম্ন ধাপের এবং অভাবী। কিন্তু দৌঁড় পাল্লায় সিংহকে ছেড়ে

যায়। যদি কোন খাবার না পায় তখন সে শুধুমাত্র সুগন্ধবহ বায়ুর উপর নির্ভর করে দিনাতিপাত করে। আর যেখান হতে হউক খাদ্য সংগ্রহ করে। বাঘের পাকস্থলি খুবই শক্তিধর হাড়কে হজম করতে সক্ষম। কিন্তু তার মধ্যে খেজুরের বীচি হজম করার মত যোগ্যতা নাই। সঙ্গম অর্থাৎ কুত্তী ও বাঘিনীর অজিফা পূর্ণকালে যে নির্দিষ্ট আকৃতির কুত্তা ও বাঘের সৃষ্টি হয় তা দ্বিতীয় আর কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। বাঘ-বাঘিনী পরস্পরে মিলিত হওয়ার ফলে ঐ নির্দিষ্ট আকৃতির ফন্দিতে আটকাইয়া পড়ে। যদি ঐ মুহূর্তে তাদের উপর অতর্কিত করে হত্যা করতে চেষ্টা করে তবে অতি সহজেই হত্যা করা যাবে। কিন্তু এই অবস্থায় তাদের পাওয়া প্রায়শঃ খুবই দুষ্কর। কেননা, এরা সঙ্গম করার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করে নেয় যেখানে কোন মানুষ গমন করতে পারে না।

প্রথমত বাঘ স্বীয় স্ত্রীকে চিৎ করে শুয়াইয়া সঙ্গম করে। পুনরায় পরস্পরে প্রবেশ করার পর এরা উভয়ে পাল্টিয়ে যায় এবং তাদের একে অপরের চেহারা ভিন্নমুখী হয়ে যায়। যেমন কুকুরের সঙ্গমকালে উভয়ের চেহারা ভিন্নমুখী হয়। বাঘ সে একাকিত্বের গুণে গুনান্বিত। যখন এটা পলায়ন করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন লম্ফ দিয়ে পলায়ন করে এবং যদি এই প্রাণী একবার শিকার করে পেট পুরিয়া আহার করতে পারে তবে দ্বিতীয়বার শিকারের নিকটেও গমন করে না। তখন বিরল এক বৈশিষ্ট্য হল, এটা এক চক্ষু দিয়ে নিদ্রা যায় অপর চক্ষু সজাগ থাকে। যখন এক চক্ষুর নিদ্রা পূর্ণ হয়ে যায় তখন এটা খুলিয়া দেয়, অপর চক্ষু যা সজাগ ছিল তা বন্ধ করে দেয়। এটা করার কারণ হল, বন্ধ চক্ষু দ্বারা স্বস্তি লাভ করে আর জাগ্রত চক্ষু হেফাজতের কাজে নিয়োজিত থাকে।

সুতরাং হুমাইদ ইবনে সওরের নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ বাঘের গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ–

ونمت كنوم الذئب فى ذى حفيظة + اكلت طعاما دونه وهو جائع

"সচেতন ব্যক্তির পার্শ্বে বাঘের মত নিদ্রা যাই, আমি তার পার্শ্বে আহার করেছি আর সে অনাহারি থাকে।"

بنام باحدى مقلتيه ويتقى + باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع

"নেকড়ে এক চক্ষু দিয়ে ঘুমায় অপর চক্ষুকে শত্রুর কবল হতে হেফাজতের জন্য নিয়োজিত রাখে। সুতরাং সে একই সময় ঘুমায় ও সজাগ থাকে।"

বাঘ সকল প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুধার্ত ও কথোপকথনকারী প্রাণী। কিন্তু যখন সে বন্দি হয়ে যায় তখন তাকে মারিয়া ও তরবারি দ্বারা টুকরো টুকরো করার পরও কখনও কথা বলবে না, এমনকি সে এভাবেই মৃত্যুবরণ করবে।

আল্লাহ তাআলা এই প্রাণীকে প্রখর ঘ্রাণশক্তি দান করেছেন। এটারা বহু মাইল দূর হতেও ঘ্রাণ শুঁকতে পারে। ছাগল শিকার করার জন্য এটা সাধারণতঃ

প্রাতঃকালে বাহির হয়। কেননা এটাদের ধারণা যে, কুকুর রাত্রভর পাহারা দিয়ে হয়তো এখন ঘুমাইবে।

এটার ভিতর আশ্চর্যজনক একটি বিষয় হল, যদি ছাগলের চামড়া আর এটার চামড়া একত্রে রাখা হয় তবে ছাগলের চামড়ার চুল ঝরিয়া যায়। ইহাছাড়া এক শক্তিধর বিষয় হল, যদি বাঘের পা বন্য পিঁয়াজের পাতায় লাগিয়া যায় তবে তাৎক্ষনিক এটা ধ্বংস হয়ে যায়। বাঘ যখন ক্ষুধার তাড়নায় দুর্বল হয়ে যায়, তখন সে চিল্লাইয়া উঠে। তার আওয়াজ শ্রবণে বনের সকল বাঘ দলবদ্ধ হয়ে তার নিকটে এসে উপস্থিত হয় এবং যে সকল বাঘ এই ক্ষুধার্ত বাঘের নিকটবর্তী হয়, সমস্ত বাঘেরা তার উপর আক্রমন করে তাকে ভক্ষণ করে। বাঘ যখন কোন মানুষের সামনে আসে এবং সে নিজেকে মানুষের সাথে মোকাবেলা করতে অক্ষম মনে করে, তখন চিল্লাইতে শুরু করে, যার দ্বারা বনের সকল বাঘেরা একত্র হয়ে মানুষের মোকাবেলা করে। যদি মানুষ এটাদের মধ্যে হতে কোন একটিকে আহত করে তবে সকল বাঘেরা ঐ আহত বাঘটিকে ভক্ষণ করার জন্য ঘিরিয়া বসে আর মানুষকে ছেড়ে দেয়। এই বিষয়টিকে কবি স্বীয় প্রবন্ধে আলোকপাত করেন। এই পংক্তিগুলী কবি নিজের এমন বন্ধু যাকে সে সাহায্য করেছিল তাকে নিন্দা করণার্থে উল্লেখ করেন—

وكنت كذئب السوء لما راى دما + بصاحبه يوما احال على الدم

"তোমার দৃষ্টান্ত এমন মন্দ খেকো বাঘের মত, যে বাঘ স্বীয় কোন আঘাতপ্রাপ্ত সাথীকে দেখে তার রক্ত পানে লিপ্ত হয়।"

বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেন যে, একদা ইসমায়ী এক গ্রামাঞ্চলে পৌঁছান। সেথায় একজন বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেন এবং তার সম্মুখে নিক্ষেপিত একটি মৃত ছাগল রহিয়াছে। আর পার্শ্বেই একটি বাঘের শাবক দাঁড়াইয়া আছে আর বৃদ্ধ ঐ শাবককে গালি দিতেছে। বৃদ্ধা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি কি জানেন এটার ব্যাখ্যা কী? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করি। তখন বৃদ্ধ বলেন, এই বাঘ যা দাঁড়াইয়া আছে এটাকে শাবক অবস্থায় ধরিয়া নিয়া লালন-পালন করি। আর ঐ ছাগলের দুধ দ্বারা তাকে লালিত-পালিত করি। এখন যেহেতু এই বাঘ ঐ ছাগলের দুধ পান করে যুবক হয়েছে সেহেতু সে এই ছাগলকে চিড়িয়া ফেলিতেছে। সুতরাং আমি তার গাদ্দারীর উপর ভিত্তি করে কয়েকটি পংক্তি পাঠ করেছি। আমি বললাম যে, আমাকে ঐ পংক্তিগুলীর সামান্য কয়টি পংক্তি শোনান, তখন বৃদ্ধ নিম্নোক্ত পংক্তিগুলী পাঠ করেন–

بقرت شويهتى وفجعت قلبى + وانت لشاتنا ولد ربيت

"তুমি আমার ছাগল চিড়িয়া আমাকে কষ্ট দিয়েছ, অথচ তুমি আমারই ছাগলের দ্বারা প্রতিপালিত।"

غذيت بدرها وربيب فينا + فمن ابناك ان اباك ذئب

"তুমি ও তোমার পরিবার আমাদের এখানেই প্রতিপালিত হইয়াছ, তোমাকে কে সংবাদ দিয়েছে যে তোমার বাবা বাঘ।" ---------

اذا كان الطباع طباع سوء + فليس بنافع فيها الا ديب

"যখন জন্মগত স্বভাব মন্দ প্রকৃতির হয়, তখন কেউ তার সংশোধন করতে পারে না।"

মানুষ যখন যাঘের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, বাঘ তখন মানুষকে পরিবেষ্টনকারী হয়। আর যদি মানুষ তার মোকাবেলায় নির্ভীকতার পরিচয় দেয়, তবে সে বিচলিত হইয়া যায়। বাঘ নিজের মুখ দ্বারা হাড্ডি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তরবারির মত এত সহজভাবে তা টুকরা টুকরা করে যে, হাড়ের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায় না। বলা হয় যে, বাঘ কুকুরের মত ভেউ ভেউ করে। সুতরাং কবির পংক্তি—

عوى الذئب فاستانست للذئب اذ عوى + وصوت انسان فكدت اطير

"বাঘ চিল্লায়, অথচ তার আওয়াজ অন্য বাঘেরা সম্বন্ধযুক্ত হয়, পক্ষান্তরে মানুষের আওয়াজ এরকম হয় যে, তা শ্রবণ করে এটারা সকলেই পলায়ন করে।"

অপর এক কবি এই অর্থেই বলেন—

ليت شعرى كيف الخلاص من الناس + وقد اصبحوا اذئاب اعتداء

"এ বিষয়টি আমার বুঝের বহির্ভূত যে, কীভাবে মানুষদের হতে মুক্তি পাওয়া যাবে, অথচ মানুষ অত্যাচারের ব্যাঘ্র সাজে।"

قلت لما بلاهم صدق خبرى + رضى الله عن ابى الدرداء

"আমি বলি যখন তারা আমার সংবাদটি সত্যায়িত করতে ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ তাআলা আবু দারদা রাযি.- এর প্রতি সন্তুষ্ট যে, তার উপদেশাবলী বড়ই মূল্যবান।"

কবি নিজের পংক্তিতে হযরত আবু দারদা রাযি.- এর এ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

اياكم ومعاشرت الناس فانهم ما ركبوا قلب امرى الا غيروه ولا جوار الا عقروه ولا بعيرا الا ادبروه۔

"তোমরা মানুষদের সাথে মিলন হতে বাঁচিয়া থাক। কেননা তাদের সওয়াব কার অন্তরে এমনভাবে আরোহন করে যে, তার অন্তরে পরিবর্তন সাধন করে ছাড়ে। আর সওয়ার হয় কোন উন্নত ঘোড়ার উপর যারা পা কাটিয়া দেয়া হয়েছে।

সুহাইলী রহ. বর্ণনা করেন যে, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর জন্ম গ্রহণ করেন তখন রাসূল সা. তাকে দেখে বলেন, কাবার প্রভুর শপথ! এইতো সেই শিশু। তার মাতা আছমা রাযি. এই শব্দ শ্রবণ মাত্রই তাকে দুধ পান করানো হতে বিরত রহিলেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, হে আছমা! তাকে দুধ পান করাও। যদিও তোমাদের চোখের পানির নয়, এই ছেলে ঐ সব বাঘের মধ্যে যারা মানুষের সংশ্রবে হয়েছে তা ভেড়া হবে। এই ছেলেটি বাইতুল্লাহর সংরক্ষক বা তার পাশেই শহীদ হবে।

ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী কা'ব ইবনে মালেক রাযি. হতে এটা বর্ণনা করেন এবং এই বর্ণনাকে হাদীসে সহীহ ও হাসান স্বীকৃতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘ যারা ছাগলসমূহকে একটি পশু পালে ছেড়ে যায়, এটাতে এত পরিমাণ ফাসাদ সৃষ্টিকারী হবে না যে পরিমাণ কোন পার্থিব প্রসিদ্ধি ও ধন-লোভী ব্যক্তি তার ধন ও প্রসিদ্ধির লোভের হেতু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। লোভের তিরস্কার বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

আর আপনি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের আশাবাদী দেখতে পাইবেন, এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিক। তাদের মধ্য হতে কেউ আশা করে যদি তাকে এক হাজার বছর আয়ু দেয়া হত। অথচ দীর্ঘ জীবন তাদেরকে শাস্তিমুক্ত করতে পারবে না, আর তাদের কার্যাবলী আল্লাহ তাআলা দেখেন।

ইবনে আদী আমর ইবনে হানিফের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তাতে একটি বাঘ দেখি। আমি বললাম যে, জান্নাতে বাঘ? তখন বাঘটি বলল যে, আমি একজন সিপাহীর ছেলেকে ভক্ষণ করেছি। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এটাই যদি কারণ হয় যে, বাঘ তার ছেলে ভক্ষণ করেছে : যদি স্বয়ং সিপাহীকে ভক্ষণ করত তবে তাকে ইল্লিয়্যিনে পৌঁছান হত।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমি এই হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল তুছীর জীবদ্দশায় তারীখে নিশাপুর গ্রন্থে দেখেছি, অথচ এই হাদীসটি মওজু বা জাল হাদীস।

মুসতাদরেক গ্রন্থে হাকীম হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হুররা এলাকায় এক রাখাল ছাগল চরাইতেছিল। অতর্কিতে একটি বাঘ এক ছাগলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। রাখাল ছাগল ও বাঘের মধ্যকার পর্দা হয়ে যায়। সুতরাং বাঘ স্বীয় নিতম্বের উপর বসিয়া বলে যে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার ও ঐ রিযিকের মধ্যে পর্দা হয়ে গিয়েছ, যা আল্লাহ

তাআলা আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। লোকটি বলল যে, আশ্চর্য বিষয় আমার সাথে বাঘ কথোপকথন করছে। আবার সেই বাঘ বলল যে, আমি কি তোমাকে এটার তুলনায় আরও আশ্চর্য ঘটনা বলব না যে, রাসূল সা. হুররাইতাইন (দুই উত্তপ্ত এলাকার)- এর মধ্যবর্তী স্থানে অতিক্রান্ত ঘটনাবলীর সংবাদ শ্রবণ করেন। অতএব ঐ রাখাল নিজের ছাগলসমূহ মদীনায় একত্র করে সে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনার সংবাদ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ বাহির হয়ে ইরশাদ করেন যে, ঐ সত্তার শপথ যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই রাখাল সত্য বলেছে।

ফায়েদা

ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি.- এর মধ্য হতে তিনজন সাহাবী বাঘের সাথে কথোপকথন করেন, সেই সম্মানিত নামসমূহ এই :

১। রাফে' ইবনে উমাইরাহ, ২। সালমা ইবনে আকওয়া ৩। ইহবান ইবনে আউছ আল-আছলামী।

ইহবান ইবনে আউছের ঘটনা হল, একদা তিনি বনে ছাগল চরাইতেছিলেন। হঠাৎ এক বাঘ তার ছাগলের উপর আক্রমন করে। তিনি চিল্লাইতে শুরু করেন। তখন বাঘটি দাঁড়াইয়া বলে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তুমি কেন আমাকে ঐ রিযিক হতে বাঁধা প্রদান কর? এটা শ্রবণ করে হযরত ইহবান ইবনে আউছ অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলেন, বাঘও কথা বলে। অতঃপর বাঘ উত্তর করল যে, তুমি কি আমার কথা বলার উপর আশ্চার্যান্বিত হয়েছে? অথচ রাসূল সা. ঐ খেজুরের মাঝে (মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি ইঙ্গিত করে) অতীত, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সংবাদ বলেছেন, আর মানুষদিগকে আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিতেছেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করে না। হযরত ইহবান বলেন, আমি বাঘের কথোপকথন শ্রবণ করে রাসূল সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঐ বাঘের কথোপকথন সম্পর্কিত ঘটনা ব্যক্ত করে মুসলমান হয়ে যাই। রাসূল সা. বলেন যে, এই ঘটনা লোকসমাজে শোনাইয়া দাও। এই জাতীয় আরও দুটি ঘটনা বাকি দুই সাহাবাদের সাথেও ঘটিয়াছিল।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমাদিগকে সংবাদ দিয়েছেন, শোয়াইব- যুহরী হতে এবং তারা আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান হতে, হযরত আবু হোরায়রাহ রাযি. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন- ছাগল পালে এক রাখাল ছিল। হঠাৎ বাঘ তার ছাগলের পালে আক্রমন করে একটি ছাগল লইয়া গেল। রাখাল তার কাছে ঐ ছাগল অন্বেষণ করলে বাঘ তার প্রতি লক্ষ্য করে বলে যে, সপ্তম দিবসে কে তার সংরক্ষক হবে? যদিও আমি ছাড়া আর কেউ সংরক্ষক হবে না। এদিকে এক ব্যক্তি গরুর উপর বোঝা হবে? যদিও আমি ছাড়া আর কেহ সংরক্ষক হবে না। এদিকে এক ব্যক্তি গরুর উপর

বোঝা চাপাইয়া যাইতেছিল। সুতরাং সেই গরু ঐ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল যে, আমি এই উদ্দেশ্যে জন্ম নেই নাই; বরং চাষাবাদের জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব লোকেরা বলল যে, সুবহানাল্লাহ! বাঘ ও গরু কথোপকথন করে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, আমি, আবু বকর এবং ওমর এটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। ইবনুল আরাবী বলেন, 'সাবউন' এমন স্থানের নাম যেথায় কিয়ামত দিবসে হাশর হবে। من لها يوم السبع দ্বারা উদ্দেশ্য হল, من لها يوم القيامة কিয়ামত দিবসে মুহাফিজ কে হবে)? কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, এই তাফসিরের পূর্বের বাক্যের দ্বারা বাতিল বলিয়া গণ্য হবে। কেননা কিয়ামত দিবসে বাঘ তার মুহাফিজ বা সংরক্ষক হতে পারে না। কোন কোন উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, يوم السبع দ্বারা يوم الفتن উদ্দেশ্য। সেইদিন হিংস্ররা তার রাখাল হবে। এটাই যদি উদ্দেশ্য ধরা হয় তবে سبع বা باء এর উপর পেশের সাথে স্বয়ং বাক্যের উদ্দেশ্য আসন্ন ক্ষতি। ফেৎনাসমূহের প্রতি ভয়সূচক হবে যে, ঐসব ফেৎনার মাঝে লোকেরা নিজেদের প্রাণীদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিবে যেন হিংস্ররা বিনা বাধা-প্রতিবন্ধকতায় ঐ প্রাণীর জান কবজকারী হবে।

ইবনে মাশকী আবু উবাইদাহ মামারের অভিমত হল, يوم السبع আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ঈদ স্বরূপ। এই দিনে কাফেরেরা খেলাধুলা, খানাপিনার মধ্যে মত্ত থাকবে, আর বাঘ এসে তাদের ছাগল নিয়ে যাবে। এই সুরতে سبع শব্দ হিংস্র প্রাণী উদ্দেশ্য হবে না। হাফেয আবু আমের এই শব্দকে باء এর উপর পেশের সাথে লিখেছেন। আবু আমের উপযুক্ত ও বিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ছহিহাইনে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, দুইজন মহিলা ছিল- আর এই দুই মহিলার সঙ্গে তাদের ছেলে ছিল। বাঘ এসে তাদের মধ্য হতে একজনের ছেলেকে লইয়া গিয়েছে। যার ছেলে লইয়া গিয়েছে সেই মহিলা নিজের সাথের মহিলাকে বলে যে, বাঘ তোমার ছেলেই নিয়াছে। উভয়ে সম্মিলিতভাবে ফয়সালার উদ্দেশ্যে হযরত দাউদ আ.- এর খেদমতে হাজির হয়। তিনি বড় মহিলার পক্ষে ফয়সালা প্রদান করেন (অর্থাৎ যার ছেলে লইয়া গিয়েছে তার পক্ষেই)। অতঃপর উভয়ে হযরত সুলাইমান আ.- এর খেদমতে হাজির হয় এবং তার নিকট ঘটনা খুলিয়া বলেন। তিনি তাদের বক্তব্য শোনার পর বলেন, আমাকে ছুরি দাও যেন এই ছেলেকে দুই টুকরা করে অর্ধেক অর্ধেক তোমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দিব। এটা শ্রবণ করে মিথ্যুক মহিলা মূলতঃ যার সেই বাচ্চা ছিল, সে বলল যে, আল্লাহ আপনার উপর

রহমত নাযিল করুন, এমনটি করিবেন না। এই ছেলে আমার নয়; বরং তারই। ছেলের মায়ের এই বক্তব্য শ্রবণ করে তিনি এই মহিলার পক্ষেই ফয়সালা করেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. বলেন, আমরা ইতিপূর্বে ছিক্কীন سكين শব্দ কখনও শুনি নাই, আমরা এখনও ছুরি জন্য হামদিয়া বলি। সেসব উলামা জায়েযের প্রবক্তা যে, মহিলা পাওয়া সন্তানকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং সে তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে সেই সব উলামা এই হাদীস হতে দলীল পেশ করেন। কেননা এটাও মাতাপিতার মধ্যে গণ্য। এই মাযহাব তাকরীবেব প্রণেতা সুরাইজ হতে বর্ণনা করেন। মূলতঃ বিশুদ্ধ হল, সেই বাচ্চা এই মহিলার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা যখন সে ঐ বাচ্চাকে নিজের দাবী করবে, তখন জন্মের ক্ষেত্রেই উপস্থিতিদের কার সাক্ষ্য উপস্থিত করতে সক্ষম, পুরুষ এটার পরিপন্থী যে, সে এ ব্যাপারে অক্ষম। এই মাসয়ালায় তৃতীয় আরও একটি অভিমত হল, যে মহিলার স্বামী নাই তার সাথে সম্পৃক্ত হবে, না স্বামী বিশিষ্ট মহিলার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এই জন্য যে, স্বামী বিহীন মহিলার সঙ্গে সম্বন্ধ তার স্বামী ব্যতীত হতে পারে না। যাই হউক সুস্পষ্ট উক্তি এটাই যে, যখন এমন মহিলা যার স্বামী আছে, সে নিজের প্রতি বাচ্চাকে সম্পৃক্ত করতে ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তা সম্পৃক্ত হবে না। আর স্বামী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি এই মহিলার যার জন্য বিছানা স্বরূপ। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার বিবাহ বন্ধনে এই মহিলা বর্তমান। যদি পতিত সন্তানের বংশ কোন মহিলার ক্ষেত্রে সাক্ষীর মাধ্যমে বংশ প্রমাণিত হয় তবে তার স্বামীর জন্যও প্রমাণিত হবে। তাই ঐ মহিলা ঐ পুরুষের বিবাহের ক্ষেত্রে হউক বা ইদ্দতের ক্ষেত্রে।

ইমাম আহমাদ এবং তাবারানী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, শয়তান মানুষের জন্য বাঘ স্বরূপ, যেভাবে ছাগলের জন্য বাঘ আছে যে, পাল হতে পৃথক ছাগলকে ধরিয়া নেয়। তোমরা খানকাস্থ হতে বাঁচিয়া থাক। গোটা উম্মতের জামাত এবং মসজিদকে আবশ্যক করে আকড়াইয়া ধর।

তারীখে ইবনে বুখার গ্রন্থে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ হতে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক মহিলা সমুদ্র উপকূলে দাঁড়াইয়া কাপড় ধৌত করিতেছিল এবং তার নিকটেই তার ছেলে খেলাধুলা করিতেছিল। ইতিমধ্যে ভিক্ষুক এসে মহিলার নিকট সওয়াল বা ভিক্ষা চাহিল। মহিলার কাছে শুধুমাত্র একটি রুটি ছিল, তা হতে ভাঙ্গিয়া এক লুকমা ভিক্ষুককে দান করল। স্বল্প সময় পর এক বাঘ এসে তার বাচ্চা নিয়ে যায় আর মহিলাটি বাঘের পিছনে 'আমার ছেলে, আমার ছেলে' বলে দৌড়াইতেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এক ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন আর এই ফেরেশতা বাচ্চাকে বাঘের মুখ হতে উদ্ধার করে মহিলার সম্মুখে রাখেন এবং বলেন, এটাই সেই লোকমার প্রতিদান যে লোকমা তুমি এখনই

ভিক্ষুককে দান করেছিলে। ইমাম আহমাদ রহ. যহুদ গ্রন্থে সালেম ইবনে আবুল জায়াদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মহিলা নিজের বাচ্চা নিয়ে বাহিরে কোথাও গিয়েছে। পথিমধ্যে এক বাঘের সাক্ষাত হলে বাঘ তার নিকট হতে বাচ্চা ছিনাইয়া লইয়া যায়। মহিলা বাঘের পিছনে দৌড়াইতে থাকে। পথিমধ্যে এক ভিক্ষুকের সাথে সাক্ষাত হয়। মহিলাটি নিজের পার্শ্বে উপস্থিত থাকা এক রুটি ভিক্ষককে দান করিল। কিছুক্ষণ পরই বাঘ ফিরিয়া আসিল এবং বাচ্চাকে তার সম্মুখে ছেড়ে দিল।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর ন্যায় বিচারের প্রভাব

ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর খেলাফতকালে মূসা ইবনে আইয়ান কারমানে ছাগল চরাইতেছিলেন। ছাগল, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরা পাশাপাশি বিচরণ করিতেছিল। একদিন হঠাৎ করে রাত্রিতে এক বাঘ আসিল এবং একটি ছাগল লইয়া গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমরা বলতে লাগলাম যে, মনে হয় সেই সৎ ব্যক্তি যার এই বরকত ছিল হয়তো তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

সুতরাং আমরা যখন প্রাতঃকালে এটার তাহকীক করি তখন জানতে পারলাম যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. পৃথিবীতে আর নাই। তিনি ২০শে রজব ১০১ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আহমাদ রহ. যহুদ গ্রন্থে একটু বাড়াইয়া বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীজ রহ. খলীফা হইলেন তখন রাখালেরা বলিতেছিল যে, এই সৎ ব্যক্তি কে? যিনি আমাদের বাদশাহ হয়েছেন? কেউ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমরা কীভাবে এই ব্যাপারে অবগত হইলে? তখন রাখালেরা উত্তর দেয় যে, যখন হইতে সেই সৎ পুরুষটি খলীফা হন তখন হইতেই আমাদের ছাগলসমূহ সিংহ ও বাঘের ভয় হইতে নিরাপদ হয়েছে এবং তখন আমরা অবগত হই যে, ছাগল, বাঘ ও সিংহ এক সাথে আছে। কিন্তু আমাদের ছাগলেরা ঐ হিংস্র প্রাণীদের থাবা হইতে মুক্ত।

শরীয়তে বাঘের হুকুম

বাঘের গোশত খাওয়া হারাম, কেননা এটা হিংস্রদের মধ্যে পরিগণিত।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরববাসী বাঘকে বিভিন্ন বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং বলা হয় اغدر من ذئب (বাঘ অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতক), اخبث من ذئب (বাঘ অপেক্ষা অধিক বদচরিত্র), اجول من ذئب (বাঘ অপেক্ষা অধিক ঘূর্ণনকারী), اظلم من ذئب (বাঘ অপেক্ষা অধিক নির্ভীক এবং অত্যাচারী), ايقظ

من ذئب (বাঘ অপেক্ষা অধিক জাগ্রত)। আরববাসীদের নিকট এই একটি উদাহরণ অধিক প্রচলিত যে, من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم اى ظلم الغنم যে ব্যক্তি বাঘের দ্বারা ছাগলের রাখাল বানাইবে সেই ব্যক্তি জালেম। হয়তো এই জুলুম ছাগলের উপর হবে এইভাবে যে, আল্লাহ না করুন বাঘ ছাগল ভক্ষণ করবে অথবা বাঘের উপর হবে এইভাবে যে, বাঘকে এমন বস্তুর রক্ষক বানানো হচ্ছে যা তার খাদ্য।

এই উদাহরণ সর্বাগ্রে ব্যবহারকারী ব্যক্তি আকতাম ইবনে সাইফী, তারপর হযরত ওমর রাযি. ছারিয়া ইবনে হাসানের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তার ঘটনা হল, একদা হযরত ওমর রাযি. মসজিদে নববীতে জুমার খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। অতর্কিতে নিজের মুখ হতে এই বাক্য বাহির হয়—

يا سارية ابن حصن الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم

অর্থাৎ হে ছারিয়া! তুমি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর, যারা বাঘ দ্বারা রাখাল রাখার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা জালেম। খুতবার মধ্যে হঠাৎ করে এমন শব্দ শ্রবণ করে লোকেরা একে অপরের দিকে ঘুরিয়া দেখতে থাকে। কিন্তু কার এটার উদ্দেশ্য বুঝে আসে না। নামাযান্তে হযরত আলী রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনিও কি এই বাক্যগুলী শ্রবণ করেছেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আমিই বলেছি সকল মানুষ শুনিয়াছে। হযরত ওমর রাযি. বলেন, ঐ সময় আমার হৃদয়ে তাৎক্ষণিক এই বিষয় আসল যে, মুশরিকরা আমাদের ভাইদেরকে পরাজিত করেছে এবং তাদের মর্যাদা ছিনাইয়া নিয়াছে। মুসলমানেরা একটি পাহাড় অতিক্রম করছে। যদি তারা এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়া যুদ্ধ করে তবে সফলতার মুখ দেখতে পারিবে। আর যদি পাহাড় হতে সম্মুখে অগ্রসর হয় তবে ধ্বংস হবে। এই কারণে খুতবার মধ্যবর্তী সময়ে আমার মুখ হতে অনায়াসে এই শব্দগুলী নির্গত হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর এক দূত জয়ের সুসংবাদ বহন করে মদীনায় আগমন করে। সে বর্ণনা করে যে, অমুক দিন অমুক সময় যখন আমরা এক পাহাড় অতিক্রম করিতেছিলাম তখন আমরা একটি আওয়াজ শ্রবণ করি যা হযরত ওমর রাযি.- এর আওয়াজের সাদৃশ্য ছিল। আর ঐ আওয়াজে ঐ শব্দই ছিল যা হযরত ওমর রাযি. খুতবার মধ্যে অনায়াসে উচ্চারণ করেছিলেন। অতএব আমরা ঐ শব্দসমূহ শুনে তার উপর আমল করেছি এবং আমরা বিজয় লাভ করেছি।

আল্লামা দামেরী রহ. লিখেন যে, এই বর্ণনা তাহযিবুল আছমা তবকাতে ইবনে সায়াদ এবং আসাদুল গাবাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সারিয়ার পূর্ণ নাম

সারিয়া ইবনে যুনাইম ইবনে আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের। এই উদাহরণের সমর্থনে কবির এই পংক্তি—

وراعى الشاه يحمى الذئب عنها + فكيف اذا الرعاة لها ذئاب

"ছাগলের রাখাল যে বাঘ হতে ছাগলদের রক্ষা করবে, কিন্তু যদি রাখালই বাঘ সাজে তবে হেফাজত কী করে সম্ভব?"

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাজী রহ. স্বীয় যুগের ধর্মীয় উলামাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের বাসস্থান অট্টালিকা, তোমাদের গৃহ ক্ষতিসম্পন্ন, তোমাদের পোশাক তালুতের, তোমাদের মোজা জালুতের, তোমাদের বাসনপত্র ফেরাউনের, তোমাদের আরোহণ কারুণের, তোমাদের দস্তরখানা জাহিলিয়্যাতের, তোমাদের মাযহাব শয়তানের। তবে এখন বল তোমাদের কোন বস্তু মুহাম্মাদের?

চিকিৎসায় বাঘের উপকারিতা

যদি বাঘের মাথা ঐ চূড়ায় যেথায় কবুতর থাকে সেথায় ঝুলিয়ে রাখা হয় তবে সেখানে বিড়াল এবং অন্য কোন কষ্টদায়ক প্রাণী আসবে না। যদি বাঘের ডান পাঞ্জা তরবারির মাথায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তবে এই তরবারি যার হাতে থাকবে কোন বিরোধী আন্দোলন তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিবে না। যদি কোন ব্যক্তি বাঘের চক্ষু নিজের শরীরে ঝুলায় তবে তার হিংস্র প্রাণীদের কোন ভয় থাকবে না। তার অন্ডকোষ চূর্ণ করে তাতে সামান্য লবণ ও পাহাড়ী পুদিনা মিশিয়ে এক মিসকাল (সরিষা পরিমাণ) লিঙ্গমুল(এক ধরনের তরকারী) যা পানিতেও হয় তা মিশিয়ে পান করা হয় তবে যৌন রোগের জন্য খুবই উপকারী এবং নিউমোনিয়া রোগের জন্য বিশেষ উপকারী। নিউমোনিয়া রোগের ক্ষেত্রে তার ব্যবহারে গরম পানি এবং মধু মিশ্রিত করতে হবে। আর যদি বাঘের রক্ত আখরোটের তৈলে মিশিয়ে শ্রবণ শক্তিহীন ব্যক্তির কর্ণে ঢালিয়া দেয়া হয় তবে শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইবে। যদি বাঘের দেমাগ সবজিমূলে ও মধুতে মিশ্রণ করে শরীরে মালিশ করা হয় তবে ঠান্ডা হতে উৎপন্ন যত সব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রোগ নিরাময় হবে। বাঘের দাঁত এবং চক্ষু যদি কোন ব্যক্তি নিজের পার্শ্বে রাখে তবে সেই ব্যক্তি সবার নিকট প্রিয় ও শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে। বাঘের গুর্দা মানুষের গুর্দার জন্য উপযোগী। বাঘের বংশবিস্তারক অঙ্গ কড়াইয়ে ভাজিয়া খেয়ে ফেললে যৌন শক্তিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বাঘের পিত্ত পানিতে মিশিয়ে সঙ্গমের মুহূর্তে নির্দিষ্ট অঙ্গে মালিশ করা হয় তবে স্ত্রী তাকে অত্যন্ত মহব্বত করবে। যদি বাঘের লেজ গরুর চারণ ভূমিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তবে সেই চারণ ভূমিতে বাঘ প্রবেশ করতে পারে না, সে যতই ক্ষুধার্ত হউক। যদি বাঘের লেজের ধোয়া কোন স্থানে দেয়া হয় তবে ঐ স্থানে ইঁদুর আসবে না।

অনেকের বক্তব্য যে, সকল ইঁদুর ধোঁয়া দেয়ার স্থানে একত্রিত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি লাগাতার বাঘের চামড়ায় বসবে সেই ব্যক্তি শূল বেদনা রোগ হতে হেফাজতে থাকবে। যদি বাঘের লেজ কোন বাদ্যযন্ত্রের উপর বাঁধিয়া দেয়া হয় তবে ঐ বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। ঢোল নির্মাণকারী ও বিক্রেতার দোকানে বাঘের চামড়ার ধোয়া দিলে সকল ঢোল ফাটিয়া যাবে। বাঘের চর্বি থেকশিয়ালের রোগের প্রতিষেধক। বাঘের পিত্ত আমাশয় রোগের কবল হতে রক্ষা করে। আর যদি বাঘের পিত্ত পুরুষাঙ্গে মালিশ করে স্ত্রীসঙ্গম করে তবে বিনাশ্রমে বীর্যপাত বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ইচ্ছাকৃত সঙ্গম করতে সক্ষম হবে। যদি বাঘ এবং গাধার পিত্ত চামেলী তৈলে মিশিয়ে তৈল প্রস্তুত করে নেয় তবে তা ব্যবহারে যৌন শক্তিতে অধিক শক্তি সঞ্চিত হবে। আর যদি বাঘের পিত্ত মগজের তৈলে মিশ্রণ করে স্বীয় ভ্রূতে লাগাইয়া কোন মহিলার নিকট গমন করে তবে সেই মহিলা তাকে অত্যন্ত মহব্বত করবে। বাঘের পায়খানায় যে হাড় পাওয়া যায় সেখান হতে একটি হাড় নিয়ে ব্যথিত দন্ত বা চোয়ালের দাঁত খিলাল করলে ব্যথার উপশম করা যায় (এই চিকিৎসা খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল)।

হাকীম জালিনুছের বক্তব্য যে, পুরাতন মাথা ব্যথার রোগীর জন্য বাঘের পিত্ত বেগুনি তৈলে মিশ্রণ করে নাকে ছিটাইয়া দেয়ার দ্বারা তার যত সব পুরাতন মাথা ব্যথা হউক নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যদি ঐ বিচূর্ণ শিশুর নাকে ফোঁটা দেয়া হয়, তবে সেই শিশু জীবন ভর মৃগী রোগ হতে হেফাজতে থাকবে। আর যদি বাঘের পিত্ত এবং সমপরিমাণ মধুসহ চোখে ব্যবহার করা হয় তবে চোখের ঝাপসা ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে অভাবনীয় উপকার সাধিত হবে। তবে শর্ত হল মধু যেন উত্তপ্ত না হয়। কোন মহিলার নাম লইয়া যদি বাঘের লেজে গিরা লাগায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গিরা খোলা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পুরুষ ঐ মহিলাকে পরাজিত করতে পারবে না। যদি বাঘের পিত্ত মধুর সাথে মিশিয়ে জননেন্দ্রিয়তে মালিশ করে আপাততঃ মহিলার সাথে সঙ্গম করে তবে সেই মহিলা তার স্বামীকে অধিক মহব্বত করবে।

বাঘদের একত্র করার ম্যাজিক

বাঘের একটি ছবি তামার দ্বারা প্রস্তুতকৃত (শরীর) বানাইবে এবং এই দৃষ্টি রাখবে যেন শরীরের ভিতর ফাঁপা থাকে। অতঃপর ঐ ছবিতে (বাঘের উল্লেখ করে নাট্যচিত্র বাজাইবে। সুতরাং বনে অবস্থানরত যেসব বাঘের কানে এই নাট্যচিত্রের আওয়াজ পৌঁছিবে সেই সব বাঘেরা সেথায় আসবে।

বাঘদের তাড়ানোর ম্যাজিক

যদি ঐ ছবিতে (প্রতিকৃতি) বাঘের পায়খানা রেখে ঐ প্রতিকৃতিটি কোথাও দাফন করে দেয়া হয়, তবে পুনরায় ঐ স্থানে আর বাঘ আসবে না।

স্বপ্নে বাঘ দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে বাঘ দেখলে মিথ্যা, শত্রুতা এবং বাহানার দলীল। এটাও বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে বাঘ দেখার ব্যাখ্যা চূড়ান্ত পর্যায়ের জালিম, চোর দ্বারা সম্বন্ধকৃত এবং বাঘের শাবক দেখার ব্যাখ্যা চোরের সন্তানাদি দ্বারা দেয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বপ্নে বাঘের শাবক দেখবে তখন এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে, সেই ব্যক্তি কোন পরিত্যক্ত বাচ্চার লালন-পালন করবে, যে বাচ্চা বড় হইয়া চোর হবে। স্বপ্নে যদি বাঘ এমন কোন প্রাণীর সাথে পরিবর্তিত হইয়া যায় যা মানুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, তবে এটার দ্বারা এমন চোর উদ্দেশ্য, যে তাওবা করবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বাঘকে দেখে তবে সেই ব্যক্তি স্বয়ং কোন মানুষের উপর অপবাদ আরোপ করবে। আর অপবাদী ব্যক্তি অব্যহতি প্রাপ্ত হবে। এই ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফ আ.- এর ঘটনার আলোকে দেয়া হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কুকুর ও বাঘকে এক সঙ্গে দেখে তবে এটার দ্বারা নিফাক, গাদ্দাফী এবং প্রতারক উদ্দেশ্য।

৩৫১. الزِّئْبُ (আয-যি'খু) বেজী

الزِّئْبُ যাল যেরের সাথে; স্ত্রীলিঙ্গ ذِئْبَةٌ বহুবচন ذِئَابٌ، ذِيَبٌ এবং ذِيخَةٌ আসে।

হাদীসে বেজীর উল্লেখ

ইমাম বুখারী রহ. মানাকেবে আম্বিয়া গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. হতে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন- কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম আ. নিজের পিতা আজর-এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত হবে যে, আজরের চেহারা ধুলাবালি মিশ্রিত হবে। তিনি স্বীয় পিতাকে বলবেন যে, আমি কি আপনাকে আমার পরিপন্থী চলতে নিষেধ করি নাই এবং আমার কথা গ্রহণ কর)? আজর বলবে যে, আজ আমি তোমার কথা গ্রহণ করব না।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আ. নিজের প্রভুর দরবারে আরজ করবেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আপনি আমাকে অপমান করবেন না। আজ এটার চেয়ে সীমাতিক্রম করে আরও কোন অপমান হবে যে, আমার পিতা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন যে, আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে রেখেছি। পুনরায় ইব্রাহীম আ.-কে বলেন, ইব্রাহীম! তোমার পায়ের নিচে কী বস্তু রহিয়াছে দেখলেই তুমি বুঝতে সক্ষম হবে যে, রক্তাক্ত বেজী পড়ে আছে। এটার পর ধরিয়া এটাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ইসায়ী বাযযার এবং হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.- এর এই রেওয়াতের বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন- কিয়ামত

দিবসে এক ব্যক্তি নিজের পিতার হাত ধরবে যেন জান্নাতে প্রবেশ করায়। উপস্থিত এক আওয়াজ আসবে যে, জান্নাতে কোন মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের উপর জান্নাত হারাম করেছেন। সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে আরজ করবেন যে, হে আমার রব! সে আমার পিতা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার মুশরিক পিতাকে এমন এক মন্দ ও ঘৃণ্য আকৃতিতে পরিবর্তন করেন যা হতে দূর্গন্ধ বাহির হয়। এই অবস্থা জান্নাতী ছেলে পর্যবেক্ষণ করে তাকে ছাড়িয়া চলে যাবেন।

উল্লেখিত বর্ণনাকারী হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, রাসূল সা. এটার চেয়েও অতিরিক্ত আর কিছু বলেন নাই। তবে আমরা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই জান্নাতী দ্বারা হযরত ইব্রাহীম আ.-কে উদ্দেশ্য করেছি।

হাকিম এই হাদীসকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রহ.- এর ব্যাখ্যাকে সহীহ স্বীকৃতি প্রদান করেন। হাকীম হাম্মাদ ইবনে সালমা হতে, তারা আয়ুব ও ইবনে সীরিন রহ. হতে এবং তারা হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন- কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তি তার পিতার সাথে মিলিত হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে যে, আব্বাজান! আমি আপনার কেমন সন্তান ছিলাম (অনুগত অথবা নাফরমান)। পিতা বলবে যে, তুমি অনেক উত্তম সন্তান ছিলে। অতঃপর ছেলে বলবে যে, আজ আমার কথা গ্রহণ করবে? পিতা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই গ্রহণ করব। অতঃপর সন্তান বলবে যে, ঠিক আছে- আপনি আমার কষ্ট উত্তোলন করুন। সুতরাং পিতা তার কষ্ট উত্তোল্ন করবে এবং সন্তান তাকে সহ আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে। তখন আল্লাহ এবং রাসূল সা.- এর মধ্যকার মানুষের মোকদ্দমা শুনানি হইতেছিল। আল্লাহ তাআলা সন্ত ানকে বলবে যে, হে আমার বান্দা! তোমার যে দরজা ইচ্ছা সেই দরজা দিয়ে স্বীয় পিতাকে সাথে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সেই সন্তান বলবে যে, হে আমার রব! আমি কি আমার পিতাসহ জান্নাতে যাব? কেননা আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কিয়ামত দিবসে আমাকে অপমানিত করবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাআলা তার পিতাকে বেজীর আকৃতিতে রূপান্ত রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, ইনিই তোমার পিতা? সে বলবে যে, আপনার ইজ্জতের কসম! ইনি আমার পিতা নন।

উল্লেখিত হাদীস মুসলিম রহ.-এর শর্তানুযায়ী সহীহ বলা হয়েছে।

আজরকে কিয়ামত দিবসে বেজীর রূপে রূপান্তরিত করার কারণ এই বর্ণনা করেন যে, বেজী সবচেয়ে নির্বোধ প্রাণী। তার নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ হল, যে কর্মে সজাগ, সতর্কতা প্রকাশ করা সমীচিন সেই কর্মে এটা অলসতার সাথে কাজ করে। এই কারণেই হযরত আলী রাযি. বলেন, (গন্ডার) বেজীর মত নয়,

যেহেতু বেজী অতি ধীর ও মন্থর গতিতে নিজের বাসা হতে বাহিরে আসে এবং শিকার হয় অর্থাৎ অতি সহজে শিকার হয়। সেহেতু আজরও এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল অর্থাৎ দুনিয়ায় হযরত ইব্রাহীম আ.-এর উপদেশ বর্জন করে এবং নিজের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু শয়তানের শিকার হয়েছে, এইজন্য সে নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে বেজীর সাদৃশ্য হয়েছে। শিকারী মানুষ শিকার করার ইচ্ছা করলে তখন তার গর্তে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সে এটা ভাবে যে, হয়তো কোন শিকারী তাকে ধরার জন্য বাহিরে আসে এবং শিকার করার স্থলে নিজেই শিকার হয়ে যায়। এটা ব্যতীত শিকারী যখন তাকে শিকার করার ইচ্ছা করে তখন তার বাসায় দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত শব্দগুলী পাঠ করেন—

اطوفى ام طريق خامرى ام عامر البشرى لجراد عطى وشاذ هزلى

এই শব্দগুলী অবিরাম বলতে থাকে যে, শিকারী তার বাসায় হাত প্রবেশ করে এবং রশি দ্বারা তার হাত পা বেঁধে তাকে বাহির করে নেয়। ধরিয়া নেয়া যাক, যদি আজরকে কুকুর বা শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হত তবে এই মন্দাকৃতির হেতু হযরত ইব্রাহীম আ.- এর অপদস্তের কারণ হত। তার দরুন আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্ধুর সম্মানার্থে তাঁর পিতাকে মধ্যবর্তী স্তরের প্রাণীর রূপে রূপান্তরিত করবেন। আল্লাহ সঠিক বিষয়ে অধিক অবগত।

باب الراء

পরিচ্ছেদ : 'রা'

৩৫২. الراحلة (আররাহিলাতু) সওয়ারী উট

জাওহারী বলেন, রাহিলা এমন উটকে বলে যা ভ্রমণ করতে সক্ষম এবং رحول উল্লেখিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। রহিলা—সওয়ারী উটকে বলে আর তা পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়টিই সম্ভাবনা রাখে। রাহিলার শেষের تاء টি মুবালেগার জন্য এসেছে। যেমন داهية উট উটনীকে রাহিলা বলার কারণ হল, তাদের পিঠের উপর হাওদা বাঁধা হয়, এটা ফায়েল, তবে মাফয়ুলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আসন্ন আয়াতে পাওয়া যায়, فهو فى عيشة راضية তাতে راضية শব্দটি مرضية অর্থে এসেছে। এছাড়া এ জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় যেমন, لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم এ আয়াতে عاصم (আছেম) معصوم (মাছুম)-এর অর্থে এসেছে এবং

ماء دافق এর মধ্যে دافق (দাফিক) مدفوق (মাদফূক) অর্থে ও حرما امنا-এর মধ্যে امنا (আমিনা) مامون (মামুন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে তার পরিপন্থী অর্থাৎ মাফয়ুল ফায়িল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حجابا مستورا-এর মধ্যে مستورا (মাছতুরা) ساتر (ছাতিরা)-এর অর্থে তেমনিভাবে كان وعده ماتيا-এর মধ্যে ماتيا টি اتيا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও রাহিলা দ্বারা জুতা বুঝানো হয়। এটার স্বপক্ষে কবির একটি পংক্তি—

رواحلنا ست ونحن ثلاثة + نجنبهن الماء فى كل مورد

"আমাদের জুতা ছয়টি আমরা সংখ্যায় তিনজন এজন্যে আমরা প্রতিটি ঘাটে ঐ জুতাকে পানি থেকে হেফাজত করি।"

জুতাকে রাওয়াহিল বলার কারণ হল, জুতা মানুষের পায়ের আরোহণ।

হাদীসে রাহিলার উল্লেখ

বায়হাকী স্বীয় গ্রন্থে ঈমানের শাখায় পঁচিশ নং অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি নিজের আরোহণ হতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া ছয় মাইল অতিক্রম করে তবে সেই ব্যক্তি যেন একটি কৃতদাস আযাদ করল। বুখারী মুসলিম রহ. অন্যান্যরাও জুহুরীর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মানুষ ঐ একশত উটের মত যাদের মধ্যে রাহিলা নাই। বায়হাকী ঐ হাদীসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, মানুষ ধর্মীয় হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে সমান অবস্থান। তাতে অভদ্রের উপর ভদ্র ব্যক্তির নিম্নমানের উপর উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিত্বের কোন প্রাধান্য নাই। যেমনিভাবে সেই সব একশত উট যাতে কোন রাহিলা (অর্থাৎ সওয়ারী যোগ্য) উট নাই যে একটি অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ করে না।

ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত যে, উবাইদাহ ইবনে হুযাইফা যিনি সেইকালের বিচারক হিসেবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, একদা তিনি আগুন জ্বালাইতেছেন ইতিমধ্যে ভদ্র এক ব্যক্তি তার নিকট আগমন করলেন এবং কোন এক সামান্য উপস্থাপন করেন, প্রতি উত্তরে তাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, আপনার একটি আঙুল এই আগুনে প্রবেশ করান, সেই ব্যক্তি উত্তর দেন যে, এটা কীভাবে সম্ভব হবে? এটা শোনার পর তিনি তাকে বলেন, আপনি আমার প্রীতিতে সাধারণত একটি আঙুল আগুনে প্রবেশ করাইতে কার্পণ্য করছেন, আর আমার প্রতি আপনি আশা করেন যে, আমি আপনার জন্যে আমার সমস্ত দেহটাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করি। ইবনে কুতাইবা বলেন, রাহিলা এমন সম্ভ্রান্ত বংশের উটকে বলে যাকে অনেকগুলী উটের মধ্য হতে আরোহন ও অন্যান্য কাজের

উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হয়। এই উটকে পূর্ণ গুণ সম্পন্ন ধরা হয়, আর যদি এই জাতীয় উটকে প্রচুর পরিমাণ উটের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাৎক্ষণিক তাকে চিহ্নিত করে লওয়া হয়, যার দরুন উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সমগ্র মানবগোষ্ঠি পরস্পরে সমান, তাদের মধ্যে কেউ অন্যের উপর বংশগত কোন প্রাধান্য নাই, বরং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন একটি দল উটের মত যা এক অপরের সাদৃশ্য। এই ব্যাপারে আযহারীর বক্তব্য হল, আরববাসীদের নিকট رَاحِلَة দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ পুং অথবা স্ত্রীলিঙ্গ উট যা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, আর ء মোবালিগার জন্য। অতএব আয্হারীর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে কুতাইবার হাদীসের কৃত ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয়, এবং হাদীসের উদ্দেশ্য হল, দুনিয়া সাধক সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্বীয় সাধনায় অস্তিত্ব পূর্ণতা আনে, এবং পরকালের প্রতি আগ্রহী হয়, এবং রাহিলার মত এমন ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব অপ্রতুল। ইমাম নববী বলেন, পূর্ণ গুণ বিশিষ্ট মানব, যাদের সমস্ত কথা কাজ পছন্দনীয় এবং রাহিলার মত মানব সমাজে সফলতা অর্জিত হয়।

কোন কোন উলামায়ে কেরামগণ বলেন, রাহিলা দ্বারা এমন উট উদ্দেশ্য যা অত্যধিক সুন্দর বোঝা বাহক এবং সফরে খুব শক্তিধর। আল্লামা হাফিজ আবুল আস কুরতুবী যিনি স্বীয় যুগে শায়খুল মুফাস্সিরীন ছিলেন, তিনি বলেন, আমার ঐ হাদীস শরীফের রাহিলার সাথে দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যতা এমন ব্যক্তির প্রতি ধারণা হয় যে ব্যক্তি দয়ালু, উদারতা সম্পন্ন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমস্যার সমাধান বাহক, এবং তাদের পরকাল তথা জবাবদিহির দিবসও কষ্ট-ক্লেশ উত্তোলনের বোঝা নিজের উপর নিয়ে নেয়, কিন্তু এমন ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুস্কর বরং আমার নিকট এমন ব্যক্তি অস্তিত্বহীন। আল্লামা দামেরী বলেন, আমার নিকট কুরতুবীর ব্যাখ্যাই উত্তম। (আল্লাহ তাআলা সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।)

৩৫৩. الرال (আর-রায়ালা) উট পাখির শাবক

الرال উট পাখির শাবককে বলে। তার স্ত্রীলিঙ্গ رَالَة রায়ালা আসে, আর তার বহুবচন رِئَلان ও رال ব্যবহৃত হয়। অধিক ব্যাখ্যা نعام শব্দের অধীনে নুন পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩৫৪. الراعى (আররায়ী) ঘুঘু ও কবুতরের বাচ্চা

الراعى ঘুঘু ও কবুতরের মিলনে সৃষ্ট প্রাণীকে বলা হয় যার আকৃতি খুবই আশ্চর্য এবং দীর্ঘ বয়সের অধিকারী, যেমন কাযবীনি বর্ণনা করেন জাহেয বলেন, এই প্রাণী কবুতর ও ঘুঘুর তুলনায় বিশাল শরীর বিশিষ্ট, আর অধিক হারে বাচ্চা

প্রদান করে এবং তার আওয়াজ কবুতর ও ঘুঘুর ব্যতিক্রমধর্মী এবং উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে। যার দরুন তার মূল্যও অধিক এবং মানুষেরা তাকে শিকার করতে খুবই আগ্রহী। কতক হযরত তাকে راعى-এর স্থানে زاعى লিখেছেন, যা অত্যন্ত ভুল।

৩৫৫. الربى (আররুবী) ছাগল শাবক

فعلى : الربى এর ওজনে ঐ সদ্য বাচ্চা জন্মদাতা ছাগলকে রুবী বলা হয়, যদি শাবকের মৃত্যুও হয় তবুও তাকে রুবী বলা হয়। কার ধারণা যে, শাবক প্রসব করার বিশদিন পর ছাগলকে রুবী বলা হয় এবং কার ধারণা যে, শাবক প্রসব করার দুই মাস পর্যন্ত রুবী বলা হয়। আবু যায়েদ রুবীকে শুধু ছাগলের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন, এবং কতক ঐ শব্দকে ভেড়ার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন, আবার কতকের ধারণা যে, ছাগলের জন্যে রুবী আর ভেড়ার জন্যে যাগুছ ব্যবহৃত হয়; রুবীর বহুবচন রুবার আসে।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, فعال এর ওজনে পনেরোটি শব্দের বহুবচন আসে, যা এই— (১) ربى এর বহুবচন رخل (২) رباب এর বহুবচন رخال (৩) نزال এর বহুবচন نزل (৪) رذال এর বহুবচন رذل (৫) بساط এর বহুবচন بسط (৬) راع এর বহুবচন رعاء (৭) قمى এর বহুবচন قما (৮) جمل এর বহুবচন جمال (৯) عرق এর বহুবচন ظئر (১০) عراق এর বহুবচন ثنى (১১) ظؤار এর বহুবচন ثناء (১২) فرير এর বহুবচন عزاز (১৩) توام এর বহুবচন فرار (১৪) سح এর বহুবচন سحاح (১৫) توام এর বহুবচন غزيز আসে।

৩৫৬. الرباح (আর-রাবাহ) বিড়াল সাদৃশ্য এক প্রাণী

راء ও باء এর উপর যবর-বিড়াল সাদৃশ্য প্রাণীকে বলে, যা হতে এক প্রকার সুগন্ধী নেয়া হয়, আর এ সংজ্ঞাই সঠিক। ইমাম জাওহরী স্বীয় গ্রন্থে কলমী মাখতোতায় এই সংজ্ঞাই উল্লেখ করেন যে, রাবাহ ঐ প্রাণীকে বলে যা হতে কাফুর অর্জন করা যায়, ঐ সংজ্ঞায় ইমাম জাওহারী ভুল করেছেন, কেননা কাফুর হিন্দুস্থানী একটি বৃক্ষের আঠা, আর রাবাহ কাফুর সাদৃশ্য সুগন্ধির নাম। ঐ ভুলের কারণ, ধারণাতীত এটা হবে যে, জাওহরী যখন শোনলেন যে প্রাণী হতে সুগন্ধি নেওয়া যায় তখন মাওছুফের ব্রেন কাফুরের প্রতি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাতায়ার' দৃষ্টি যখন জাওহারীর বর্ণিত ভুল বুঝার উপর পরে, তখন না মাওছুফ সঠিক করতে গিয়ে বলেন, রাবাহ একটি শহরের নাম যেথায়

কফুর তৈরি করা হয়, বস্তুত এটাও একটি ভ্রান্ত ধারণা কাফুর সেই আঠাকে বলে যা লাকরীতে শুকিয়ে থাকে, আর ঐ লাকরীকে নড়াচড়া দেয়ার দ্বারা তা বাহির হয়ে আসে। পক্ষান্তরে রাবাহ-এর বিপরীত যে, রাবাহ ঐ সুগন্ধির নাম যা প্রাণী হতে গ্রহণ করা হয়। কবি ইবনে রশীকে স্বীয় পংক্তিতে উন্নতমানের কিছু কথা উল্লেখ করেন—

فكرت ليلة وصلها فى صدها + فجرت بقايا او معى كالعندم

"সে যখন রাত্রিতে বাসায় আসে আর বাসায় বসে যায় তখন আমার অবশিষ্ট অশ্রু তাও গড়াইয়া পড়ে।"

فطفقت امسح مقلتى فى نحوها + اذ عارة الكافور امساك الدم

"আমি আমার চক্ষুকে মলিতেছি আর যেহেতু কাফুরের বৈশিষ্ট্য রক্ত ঝরাকে বাধা প্রদান করে, সেহেতু আমি নিজের অশ্রুকে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করি।"

৩৫৭. الرباح (আর-রুবাহ) নর বানর

'রা'-এর উপর পেশ 'বা'-এর উপর তাশদীদ বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। এটা ভীরুতার ক্ষেত্রে উদাহরণ। আরববাসী বলে, অমুক বানরের তুলনায় অধিক ভীরু।

৩৫৮. الربع (আর-রুবহু) উষ্ট্রীর শাবক

'রা'-এর উপর পেশ এবং 'বা'-এর উপর যবর, উষ্ট্রী বা গাভীর শাবক যা নিজের মা হতে পৃথক হয়ে যায়।

৩৫৯. الربية (আর-রুবাইতু) জমিনের পোকা-মাকড় জাতীয় এক প্রাণী

'রা'-এর উপর পেশ। ইবনে সায়্যিদাহ বলেন, ইঁদুর ও টিকটিকির মধ্যবর্তী একটি প্রাণী এবং কেউ বলে, এটা ইঁদুরের দ্বিতীয় আরেকটি নাম।

৩৬০. الرتوت (আর-রাতুতু) নর শুকর

الرتوت হল رت এর বহুবচন এবং رت-এর অর্থ, رئيس বা সরদার এবং শুকর আসে। বলা হয় هؤلاء رتوت البلاد এদের শহরের সরদার ও মুহকিম বলে। رت একটি প্রাণীর নাম যা শুষ্কের শুকর সাদৃশ্য এবং কতক উলামায়ে কেরাম বলেন, নর শুকরের দ্বিতীয় একটি নাম। তাদের বিশদ আলোচনা خاء পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

৩৬১. الرئيلا (আর-রুছাইলা) বিষাক্ত প্রাণী

الرئيلا (রা-এর উপর পেশ এবং ছা-এর উপর যবর) বিষাক্ত একটি প্রাণীর নাম। বিস্তারিত আলোচনা শিকারী পরিচ্ছেদের শেষ প্রান্তে আসবে। জাহেয বলেন, রুছাইলা মাকড়সার একটি প্রকার মাত্র। তার দ্বিতীয় আরেকটি নাম আকরাবুল হায়াতও কেননা এটারা সাপদের মারিয়া ফেলে। আবু মুছা কুরতুবী ইসরাইলী বলেন, রুছাইলার প্রয়োগ ভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রাণীর উপর হয়, কতক বলেন, ছয় শ্রেণীর, আবার কেউ আট শ্রেণীতে গণনা করেন। আর এই সবগুলীই মাকড়সার শ্রেণীভূক্ত। চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শীগণের বক্তব্য যে, ঐ সব শ্রেণী হতে সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল মিসরী মাকড়সা, আর গৃহে অবস্থানকারী মাকড়সার অনিষ্ট খুবই কম, এবং তার অবশিষ্ট প্রকার সবুজ শ্যামল স্থানে পাওয়া যায়। তাদের মধ্য হতে এক প্রকার তুলতুল হয়, মিসরবাসী এই শ্রেণীকে আবু ছুফা নামে অভিহিত করেন, এবং ঐসব মাকড়সার ছোবল এমন কষ্টদায়ক, যেমন বিচ্ছুর হুল ঢুকানোর দ্বারা হয়, এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনা সামনে শিকারী পরিচ্ছেদে আসন্ন ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসায় রুছাইলা

তার মস্তিষ্ক মরিচের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে বিষের প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়।

স্বপ্নে রুছাইলার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে তাকে দেখার ব্যাখ্যা ফেৎনা-ফাসাদে এবং কষ্ট প্রদানকারিনী মহিলা দ্বারা করা হয়। কখনও শত্রুও উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন।

৩৬২. الرخل (আর-রাখলু) ভেড়ার নারী শাবক

الرخل ভেড়ার নারী শাবককে বলে, তার বহুবচন رخال আসে।

৩৬৩. الرخ (আর-রুখ্খু) সামুদ্রিক পাখি

الرخ সামুদ্রিক একটি বড় পাখি যা চীন সাগরে পাওয়া যায়, যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দশ হাজার বা (দুই হাতের মধ্যবর্তী প্রশস্ততাকে বলে)। আবু হামিদ উন্দুলুছী তিনি একজন পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, সেই ব্যবসায়ী চীন দেশে সফর করেছিলেন, এবং সে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেথায় অবস্থান করেন, তার নিকটে রুখ পাখির একটি বাহুর ডানার পর ছিল (যার দ্বারা উদ্দেশ্য ডানার ঐ অংশ, যার সাথে গোশত মিলিত থাকে) যার মধ্যে এক মশক পানি অতি সহজেই সঞ্চিত হয়। পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীর বর্ণনা যে, একদা জাহাজের সাহায্যে চীন যাইতেছি ইতিমধ্যে উল্টো বাতাসের দমকা

হাওয়ায় জাহাজটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে, আর জাহাজের মুসাফিরগণ দ্বীপে নামিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনীয় পানি-লাকরী ইত্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হল, সম্মুখ পানে দেখা যায় একটি গম্বুজ সাদৃশ্য উঁচু টিলা, যার উচ্চতা শতাধিক হাত। তাতে আলোকজ্জ্বল মনে হয়। মুসাফিরগণ আশ্চর্যবোধ করল, যখন নিকটে গিয়ে পৌছিল তখন মনে হল যে, তা একটি রুখার ডিম। সুতরাং সবাই তাকে লাঠি, কোদাল পাথর দ্বারা ভাঙিতে শুরু করল। পরিশেষে তা ফাটিয়া তার মধ্য হতে একটি বাচ্চা বাহির হয়ে আসে। শারীরিক গঠনের দিক হতে একটি পাহাড় ধারণা হইতেছিল, আর সমগ্র মুসাফির তার উপর চড়াও হল এবং বাহু আরও অন্যান্য অঙ্গগুলী টানিতে লাগিল। যার দরুন তার বাহু ভাঙ্গিয়া যায়, আর ডানা ঝড়িয়া পড়ে, এবং এই ডানার জোড়ায় আমার হাত লাগিয়া যাওয়ার দরুন এই কথা স্পষ্ট যে আজ পর্যন্ত এই বাচ্চা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। অতঃপর তাকে জবাই করা হল, এবং প্রত্যেক মুসাফির সাধ্যানুযায়ী গোশত নেয়, কতক মানুষ ঐ দ্বীপেই তার গোশত ভুনা করে ভক্ষণ করে। আর ভক্ষকদের মধ্যে উমর রছিদাহ হযরতও অন্যতম ছিলেন, যার চুল সাদা হয়ে গিয়াছিল, যখন তিনি এই রাত্রিতে রুখের গোশত ভক্ষণ করে শয়নে যান এবং সকালে জাগ্রত হয়ে আশ্চর্য হয়ে যান যে তার চুল কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা ঐ গোশতের কোন বৈশিষ্ট্য নয় বরং এটা লাকরীর কারণে এমনটি হয়েছে। যার সাহায্যে মুসাফিরগণ নিজেদের হাড়িতে গোশত রান্না করেন। জঙ্গলে পাকানোর উপযুক্ত খড়ি সাথে ছিল না যা হস্তগত হওয়ায় তা দ্বারা রান্নার কাজ চালাইয়া নেয়, গোশত রান্নার জন্য নিম্নভূমির একটি বৃক্ষের শাখা মিলিয়া গিয়েছে, আর তারই এমন গুণ যে, তা সাদা চুলকে কালো করে দেয়।

অতএব যখন আমরা ফারেগ হইলাম আর গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া জাহাজে আরোহণ করলাম, তখন হঠাৎ এক আশ্চর্যজনক কিছু একটি দেখতে পাই যে, রুখ মেঘ পানে উড়িয়া আমাদের দিকে আসিতেছিল, এমতাবস্থায় তার পাঞ্জায় বিশাল বড় ভারী একটি পাথর ছিল, তার গঠনাকৃতি জাহাজ অপেক্ষা বড় ছিল, যখন তা একেবারেই জাহাজের সন্নিকটে উপস্থিত হইল তখনই দ্রুত বেগে পাথরটি নিজের পাঞ্জা হতে ছেড়ে দেয়। আল্লাহর কুদরত যে, আমাদের জাহাজটি আগেই চলে গিয়েছে আর পাথরটি সমুদ্রে পড়িয়া গিয়েছে। আল্লাহ তাআলার অসীম দয়ায় আমাদের সবাইকে তার শাস্তি হতে নিরাপদে রাখেন কারণ সে তার প্রতিশোধ নিতে কোন ত্রুটি করে নাই। رخ রুখ দাবারক ছকের একটি শহরেরও নাম, তার বহুবচন رخاخ এবং رخخة আসে। কবি সিররীয় রফা অনেক উন্নত মানের পংক্তি বলেন—

وفتية نهر الاداب بينهم + ابهى والضر من زهر الرباحين

"এবং কতিপয় যুবক যাদের চলার পদ্ধতি সমগ্র মহল্লার মধ্য হতে উত্তম, আর তারা টগবগে এমনকি সতেজ ফুলের ফুটন্ত কলি হতেও অধিক সুন্দর।"

راحوا الى الراح مشئ الرخ والضرفوا + والراح يمشى بهم مشى البراذين

"তারা মদ্যপান গৃহে যায় ও দাবারক খেলায় মনোনিবেশ করে আর যখন সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাদের চলন এমন থাকে যেমন দাবারকের গুটি বিশেষ।"

ঐ কবির উন্নত মানের পংক্তি আরও হল -----

بنفسى من اجود له بنفسى + ويبخل بالتحية والسلام

"আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় জীবন কুরবান করি। আর তোমরা সালামের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য কর।"

وحتفى كامن فى مقلتيه + كمون الموت فى حد الحسام

"আমার মৃত্যু তার নয়নে এমনভাবে লুকায়িত আছে, যেমন তরবারির ধারের মাঝে মৃত্যু গোপন থাকে।"

স্বপ্নে রুখ-এর ব্যাখ্যা

স্বপ্নে রুখের ব্যাখ্যা আশ্চর্য ও সূক্ষ্ম সংবাদ প্রদান দ্বারা করা হয় এবং কখনও দুরপ্রান্তের সফরের ইঙ্গিত বহন করে এবং কখনও অকেজো কোন বার্তার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কাল্পনিক অমর পক্ষীরও এটাই ব্যাখ্যা। কাল্পনিক অমর পক্ষীর বিস্তারিত আলোচনা আইন পরিচ্ছেদে আসবে।

৩৬৪. الرخمة (আর-রাখমাতু) শুকনি সাদৃশ্য পাখি

শুকনি সাদৃশ্য এক প্রাণী, যার উপনাম উম্মু জারান, উম্মু রিসালাহ, উম্মু আযীবাহ, উম্মু কায়েছ এবং উম্মু কবীর। তার বহুবচন رخام আসে আর تاء তাতে جنس এর জন্যে। কবি আশী তাকে স্বীয় পংক্তিতে উল্লেখ করেন—

يا رخماء قاظ على مطلوب + يعجل كف الخارى المطيب

"হে রাখামা প্রাণী! পাহাড়কে দ্রুত নিয়ে আস আর এই কাজটি এমন দ্রুত হতে হবে, যেমন পাখিরা দ্রুত ইস্তিঞ্জা করে।"

মাতলুব দ্বারা পাহাড় উদ্দেশ্য আর মুতির দ্বারা ইস্তিঞ্জা উদ্দেশ্য। এ পাখি সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও বোকামির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

কবি কিমিয়াত বলেন—

وذاتى اسمين والالوان شتى + تحمق وهى كيسة الحويل

"তা দুই নাম বিশিষ্ট রং-বেরঙের পাখি; বুদ্ধি-বিবেক থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ ধরা হয়।"

ইমাম শায়াবী- এর মজলিসে যখন রাওয়াফেজ সম্পর্কে আলোচনা হত তখন তিনি বলতেন যে, যদি এটারা চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য হতে হয় তবে গাধা হত, আর যদি পাখিদের মধ্য হতে হয় তবে রখম (অর্থাৎ মৃত খেকো) হত। ঐ সব পাখিদের বিশেষ একটি অভ্যাস ছিল যে তারা পাহাড়ে জনমানবশূন্য একটি স্থান নির্বাচন করে নেয়।

আবার এমন স্থান অন্বেষণ করে যেথায় পাথর থাকে ও অধিক বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই জন্যে আরববাসী উদাহরণের মাঝে তাকে পেশ করে যে اعز من بيض الانوق (অর্থাৎ অমুক বস্তু রুখের ডিম হতে দূর্লভ) তার লজ্জাস্থানের নিজের স্বামী (নর রখম) ছাড়া অন্য কাউকে সুযোগ প্রদান করে না এবং তা শুধুমাত্র একটি ডিম দেয়, আর তাকে মন্দ দোষী পাখিদের মধ্যে গণনা করা হয়। আর এটারা সংখ্যায় তিনটি (১) পেচা (২) কাক (৩) শুকনি সাদৃশ্য পাখি।

রখমাতুর শরয়ী হুকুম

তা খাওয়া হারাম, কেননা সে মৃত খায়। জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা খাইতে নিষেধ করেছেন, বায়হাকী হযরত আকরামা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) رخمة—শুকুনী সাদৃশ্য পাখি খাইতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা কুরতুবী পবিত্র আয়াত كالذين اذو موسى (উদাহরণ স্বরূপ সে-সব লোক যারা হযরত মূসা আ.-কে কষ্ট দিয়েছে) সম্পর্কে বলেন, হযরত মূসা আ.-কে কষ্ট দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বনী ইসরাইলরা হযরত মূসা আ.-এর উপর অপবাদ দিয়েছিল যে, আল ইয়াযুবিল্লায হযরত মূসা আ. নিজের ভাই হারুন আ.-কে হত্যা করেছেন আর ফেরেশতাদের মাঝে তার মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু শুকনী সাদৃশ্য পাখি তার সমাধি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা রুখমাকে বহেরা, বোবা বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা যামাখশারী বলেন, এ পাখি স্বীয় আওয়াজে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলে।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

এটা বোকামির ক্ষেত্রে উদাহরণযোগ্য। বলা হয়, অমুক ব্যক্তি শুকনী সাদৃশ্য পাখির চেয়েও বেশি বোকা। সমস্ত পাখির মধ্যে তাকে বোকা পাখি হিসেবে নির্দিষ্ট করার কারণ হল, এটা নিকৃষ্ট পাখি, নাপাককে পছন্দ করে, আর নাপাকই সে ব্যবহার করে। স্বয়ং আরববাসীদের প্রবাদ বাক্য—انطق يا رخم فانك من طير الله (হে শুকনি সাদৃশ্য পাখি! তুমিই বল কেন তুমি আল্লাহ তাআলার পাখি) এ প্রবাদের মূল উৎপত্তিস্থল হল, জঙ্গলে যখন পাখিরা স্ব স্ব আওয়াজ বের করে, তখন এটাও তাদেরকে দেখে বলতে আরম্ভ করে- পাখিরা বিদ্রুপ করে তাকে বলে যে, তুমি নিরব থাক কেন? তুমিও বল কারণ তুমিও তো আল্লাহ তাআলার

সৃষ্টি। এ উদাহরণ মূলত ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে ব্যক্তি কার সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং কার সাথে কথোপকথনও করে না। যেমন উর্দূ ভাষায় এ জাতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার গাভী।

চিকিৎসায় রাখামাহ্

তার ডানার ধোঁয়া দেয়ার দ্বারা পোকা-মাকড় ধ্বংস হয়। কুষ্ঠ রোগীর মাথায় তার পায়খানার প্রলেপ ও কুষ্ঠ স্থানে পায়খানার প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য লাভ হয়। তার কলিজা ভুনা করে শুকিয়ে হালকা চূর্ণ করার পর কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে কোন পাগল মাতাল মানুষকে ধারাবাহিক তিনদিন সেবন করানো হয়, তবে তার পাগলামি শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তার মাথা তাবিজ করে এমন মহিলার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যার বাচ্চা প্রসবে খুব কষ্ট অনুভব হচ্ছে তাহলে অতি সহজে বা অনায়াসে দ্রুত বাচ্চা প্রসব হয়ে যাবে।

রুখম-এর নাড়িভূড়ি হলুদ রং বিশিষ্ট পাতলা চামড়া শুকানোর পর হালকা চূর্ণ করে মধুতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয় তবে সর্বপ্রকার বিষের প্রতিরোধকের কাজে আসবে। মাথা ব্যথার নিষ্কৃতির লক্ষ্যে তার মাথার হাড্ডিকে মাথায় রাখলে অনেক উপশম লাভ করা যায়।

স্বপ্নে রুখামাহ্র ব্যাখ্যা

রুখামার স্বপ্নের ব্যাখ্যা নির্বোধ বোকা মানুষ দ্বারা প্রদান করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রুখামাকে পাকড়াও করতে দেখে তবে সে ব্যক্তি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শরীক হবে। কখনও কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। খ্রিষ্টবাদ বলে যে, যদি কেউ স্বপ্নে অধিক হারে রুখামা দেখে তবে তার দ্বারা সৈন্যদল উদ্দেশ্য। আরতামিদুরছ বলে যে, রুখামাকে স্বপ্নে দেখা, সে ব্যক্তির জন্যে মঙ্গলজনক যে ব্যক্তি শহরের বাইরে কর্মে লিপ্ত। কেননা রুখামা শহরে প্রবেশ করে না, বরং শহরের বাইরে অবস্থান করে এবং রুখামাকে স্বপ্নে দেখার দ্বারা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয় এবং কবরস্থানে থাকে। কারণ, রুখামা মৃত খেকো এবং শহরে প্রবেশ করে না। আর যদি কোন ব্যক্তি রুখামাকে গৃহে দেখে, তবে দুই অবস্থা– হয়তো গৃহের ভিতরে কোন রোগী আছে, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর যদি রোগী না থাকে, তবে গৃহে মালিকের কোন কঠিন রোগের অথবা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

৩৬৫. الرشاء (আর-রাশায়ু) হরিণ শাবক

الرشاء (راء এর উপর যবর) তার ব্যবহার হরিণের সে শাবকের উপর হয়, যার মাঝে নিজের মাতার সাথে চলাফেরা ও নড়াচড়া করার যোগ্যতা অর্জন হয়েছে। তার বহুবচন ارشاء আসে। নিম্নের পংক্তি যাতে আর-রাশায়ু হরিণের

শাবক সংক্রান্ত আলোচনা আল্লামা জামালুদ্দীন আব্দুর রহীম শোনান এবং তিনি বলেন, আমি এ পংক্তি শায়খ আশির উদ্দীন আবু হানীর নিকট শুনেছি এবং তারা আবু জাফর হতে আর তারা আবুল খাত্তাব ইবনে খলীল হতে এবং তারা ধারাবাহিকভাবে আবু হাফছ উমর ইবনে উমর ইবনে উমর (যার পংক্তি) হতে শুনেছেন। ঐ সব পংক্তিগুলীর দৃশ্যপট বর্ণনা করা যায় যে, আবু হাফছ উমর ইবনে উমর-এর নিকট একবার হাদিয়া হিসেবে একটি বাঁদী নিয়ে আসে, যার মাতার সঙ্গে তিনি সঙ্গম করেছেন। তাই তিনি তাকে ফেরত পাঠালেন এবং এ পংক্তিগুলী পাঠ করেন—

يا مهدى الرشا الذى الحاظه + تركت جفونى نصب تلك الاسهم

"হে হরিণ হাদিয়াদাতা! তুমি আমার চোখের পাপড়িকে তীরের সমাধিস্থ করেছ।"

ريحانة كل المسنى فى شمها + لو لا المهيمن واجتباب المحرم

"তা শুকার দ্বারা প্রত্যেক কাঙ্খিত বস্তুর সুঘ্রাণ অনুভব হয় নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম যদি তার শিকার হারাম না হত।"

ما عن قلى صرفت اليك وانما + صيد الغزاله لم يبح للمحرم

"আমি আমার চক্ষু, যা তোমা হতে সরাইয়া নিয়াছি কারণ ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ।"

يا ويح غنترة يقول وشفة + ما شفى وجدا وان لم اكتم

"মশার যন্ত্রণায় সে বলে যে, আমি চিন্তা-ভাবনা গোপন করতে সক্ষম আর তা প্রকাশের মাঝেও আমার আরোগ্য নাই।"

يا شاة ما قنص لمن حلت له + حرمت على وليتها لم تحرم

"হে ছাগল! তুমি যার জন্য হালাল সে তোমাকে শিকার করে না আর আমার জন্যে শিকার হারাম, আফসোস! যদি আমি ইহরাম অবস্থায় না থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে শিকার করতাম।"

আবুল ফাতাহ আল বস্তী অনেক উত্তম পংক্তি পাঠ করেন—

من اين للرشا الغدير الاحور + فى الخد تثلى عذارك المنحدر

"হরিণের চক্ষুকে সেই সৌন্দর্যতা বলে যা মাহবুবার মুখমন্ডলের পশমে আছে।"

رشا كذان بعارضية كليهما + مسكا نساقط فوق ورد احمر

"হরিণ নিজের উভয় গন্ডদেশের সুগন্ধি রক্ত ঝড়ায়, যার লালিমা গোলাপ ফুলের লালিমা অপেক্ষা অধিক।"

২৬৬. الرشك (আর-রুশক) বিচ্ছু

الرشك (রা-এর উপর পেশ, শীন সাকিনের সাথে) উর্দু ভাষায় رشك বিচ্ছুকে বলা হয়। কাজী আবুল ওয়ালিদ ফরাজী স্বীয় গ্রন্থ আল আশকাবু ফি আছমায়ী নকলাতিল হাদীস نقلة الحديث الالقاب فى اسماء এবং খতীব আবু আলা আল গাস্তানী স্বীয় গ্রন্থ তাকীদুল মুহমাল এবং কাজী আবুল ইয়াজ ইবনে মুছা মুশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থে এবং তারা ছাড়া হাফেজ আবুল ফরাহ ইবনে জাওযী এটা বর্ণনা করেন যে, ইয়াজীদ ইবনে আবু ইয়াজীদ যার নাম সুদান সবয়ী যিনি رشك রুশক নামে প্রসিদ্ধ। তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হল, তার দাড়ি সাধারণের তুলনায় অধিক লম্বা ছিল। একদা তার দাড়িতে বিচ্ছু ঢুকিয়া গিয়াছিল। ধারাবাহিক একসাথে তিনদিন পর্যন্ত দাড়িতে লটকাইয়া ছিল। কিন্তু তার দাড়ি বিস্তৃত হওয়ার দরুন তাতে বিচ্ছু প্রবেশ হওয়ার সাধারণত কোন ধারণা ছিল না। ইবনে দাহিয়াহ স্বীয় গ্রন্থ আল ইলমুল মানসুর-এ উল্লেখ করেন যে, আশ্চর্য! তিনদিন পর্যন্ত কষ্টদায়ক প্রাণী মানুষের দাড়িতে বিদ্যমান থাকবে, আর মানুষ তা অনুভব করবে না। কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য অজু করা হয় তাতেই তো অনুভব করা উচিত ছিল। সে কি অজু করার সময় নিজের দাড়ি খিলাল করে না, অথবা বিচ্ছু কি এত ক্ষুদ্র যে চুলের ভিতর হারাইয়া গিয়েছে? তিন দিন নির্দিষ্ট করা সঠিক মনে হয় না। কারণ যদি প্রথমেই দাড়িতে বিচ্ছু প্রবেশের জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে পরবর্তীতে দিন নির্ধারিত করা ঠিক নয়। আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট তার ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, সে এমন স্থানে গিয়েছে যেথায় বিচ্ছু অধিক হারে পাওয়া যায়, আর সেথায় সে তিন দিন অবস্থান করে, এটার ভিত্তিতেই তারা তিনদিন নির্দিষ্ট করেন। আল্লাহ তাআলাই সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আর এটাই ঐ ঘটনার মিথ্যারোপ হওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম ব্যাখ্যা। নচেৎ ঐ বর্ণনার বর্ণনাকারীদের উপর মিথ্যার অপবাদ আবশ্যক হয়। হাকীম আবু আব্দুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ উলুমুল হাদীস-এ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন হতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াজীদ ইবনে আবু ইয়াজীদ একদা নিজের দাড়ি খিলাল করিতেছিলেন। ইতিমধ্যেই তার দাড়ি হতে একটি বিচ্ছু বাহির হয়ে আসে, সেই সময় হতেই তার উপাধি রুশক বিচ্ছু হইয়া গিয়েছে।

আল্লামা দামেরী(রহঃ) বলেন, রুশক- এর অর্থ বসরীদের পরিভাষায় কাচ্ছাম (অর্থাৎ অধিক বণ্টনকারী) আসে। আর ইয়াজীদ ইবনে ইয়াজীদ সবরায়, জমিন ঘর বন্টন করার লক্ষ্যে আদিষ্ট ছিলেন যার দরুন তাকে রুশক নামে নামকরণ করা হয়েছে। পরিশেষে ১৩০ হিজরী সনে বসরা নামক স্থানে

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার নিকট হতে মুহাদ্দিসীনদের একটি দল হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযি আবু ঈসা তিনি স্বীয় প্রসিদ্ধ তিরমিযি শরীফে বাবু মা যাআ ফি সাওমে ছালাছাতু আইয়্যামিন মিনকুল্লি শাহর শিরোনামের অধীনে, হাদীসের ধারাবাহিক যে সনদ বর্ণনা করেছেন, তাতে তারও নাম এসেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমাদের হতে মাহমুদ ইবনে গাইলান হতে আবু দাউদ হতে শুবাহ হতে ইয়াজীদ বর্ণনা করেন যে, আমি মায়াজ রাযি. হতে শ্রবণ করেছি, সে বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.- এর প্রতি রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, প্রতি মাসে কি তিনটি করে রোজা রাখতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। তাতে সেই বর্ণনাকারী ইয়াজীদ রুশকের নাম এসেছে। তা দ্বারা উদ্দেশ্য আবু ইয়াজীদ দবয়ী যাকে ইয়াজীদ কাসেম বলা হয়। কেননা রুশকের অর্থ বসরীদের পরিভাষায় কাচ্ছাম আসে যার আলোচনা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

৩৬৭. الرفراف (আর-রাফরাফ) এক পাখি

এক জাতীয় পাখি যাকে মুলাইবু বিল্লিই ও কাতিফু যিল্লাইও বলা হয়। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা মীম পরিচ্ছেদে আসবে। ঐ পাখির নাম রাফরাফ রাখার কারণ হল, রাফরাফ-এর অর্থ কম্পন। যেহেতু শত্রুদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এই পাখি অত্যাধিক কাঁপিতে থাকে। এই জন্য তাকে রাফরাফ করে নামকরণ করা হয়েছে। ইবনে সায়্যিদাহ বলেন রাফরাফ একটি মাছের নাম।

৩৬৮. الرق (আর-রিক্কি) কুমীর সাদৃশ্য সামুদ্রিক প্রাণী

(রা ও ক্বফ-এর উপর যের) সামুদ্রিক প্রাণী যা কুমীর সাদৃশ্য হয়ে থাকে। এ প্রাণী কচ্ছপের তুলনায় বড়। এর বহুবচন رقوق আসে। জাওহরী একটি দুর্বল রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে মদীনায় ফকিরগণ তাকে ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং তাকে ব্যবহারও করতেন। এ শব্দে দুটি ইরাব রয়েছে, (১) راء-এর উপর যের, (২) راء-এর উপর যবর। কিন্তু অধিকন্তু যেরই প্রাধান্য।

৩৬৯. الركاب (আর রিকাব) সওয়ারী উট

রা-এর উপর যের, সওয়ারী উট। তার বহুবচন ركائب আসে।

হাদীসে রিকাবের উল্লেখ

হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) কায়েছ ইবনে সায়াদ ইবনে উবাদার নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, আর তারা জিহাদ করে, এবং নয়টি উট জবাই করে ফেলে।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, উদারতা এই গৃহের ২য় প্রকৃতি" রিকাব- এর বহুবচন ركب-ও আসে, এবং كوبة-এর অর্থ সাওয়াবর "আরববাসী কার অভাবী অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ما له ركوبة ولا حلوبة ولا حمولة তার নিকট সওয়ারী কোন উট নাই ও দুধ দানকারিনী কোন উষ্ট্রী এবং ভারি বোঝা বহনকারী প্রাণী আছে।

৩৭০. الركن (আর-রাক্‌নু) ইঁদুর

ركن ইঁদুর এবং রুকাইয়্যিনুন ركين তাছগিরের ছিগার সাথেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইবনে সায়্যিদা লিখেছে।

৩৭১. الرمكة (আর-রামাকাতু) তুর্কি ঘুড়ি

الرمكة তুর্কি ঘুড়ি। তার বহুবচন رماك، رمكات এবং ارماك আসে। যেমন, اثمار-ثمار।

মাসয়ালা

আলবাছিত নামক গ্রন্থে, কিতাবুল বুয়ু- এর ২য় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, যদি কেউ বলে যে, আমি এই ভেড়া তোমার নিকট বিক্রি করলাম এবং সামনে তুর্কি ঘুড়ি উপস্থিত থাকে, তখন এক ভাষ্য অনুযায়ী বিক্রয়টি এমন অংশের দিকে ফিরবে যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রেতাকে তুর্কি ঘুড়ি দেয়া হবে। ২য় ভাষ্য হল, যার স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে ঐ অংশের দিকেই ফিরবে কেননা তুর্কি ঘুড়ি ভেড়ার সাদৃশ্য নয়।

৩৭২. الرهدون (আর-রাহদুন) চড়ুই পাখির সাদৃশ্য পাখি

الرهدون (রা-এর উপর যবর) এটা حمرة অর্থাৎ এটা লাল প্রাণীর সামঞ্জস্যশীল। এর বহুবচন رهادن আসে। এটাদেরকে মক্কায় মসজিদে হারামে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং চড়ুই পাখির সাদৃশ্য হয়। সারকথা তার রং কালো হয়ে থাকে।

৩৭৩. الروبيان (আর-রুবিয়ান) ক্ষুদ্র লাল রঙের মাছ

الروبيان অত্যন্ত ছোট লাল রঙের মাছকে বলা হয়।

চিকিৎসায় রুবিয়ান

যদি কোন ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয় তবে তার মদে জুবিয়ানের পা ঢালিয়া দিবে তখন সেই ব্যক্তি মদ্যপান হতে কঠোরভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার

স্কন্দের ধোয়া, যদি কোন গর্ভধারিনী মহিলাকে দেয়া হয় তাহলে গর্ভ বিনষ্ট হয়ে যাবে। যদি কোন কাটা, তীর বিদ্ধ হয়, তাহলে তাকে উপস্থিত পিষে প্রলেপ দেয়ার দ্বারা সেই তীর, কাটা অতি সহজে বের হয়ে আসবে। আর যদি কালো চানাবুটের সাথে তাকে পিষে নাভীতে প্রলেপ দেয়া হয়, তবে কষ্টদায়ক বস্তু পাকস্থলি হতে বের হয়ে যাবে, তদ্রূপ তা অম্লরসের সাথে মধু চিনি মিশ্রিত উপকরণ বিশেষের সাথে পিষে নেওয়ার দ্বারা একই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। আর যদি তা শুকিয়ে হালকা পিষে সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে চোখের ঝাপসা রোগ দূর হয়ে যাবে।

৩৭৪. الريم (আর-রাইমু) হরিণ শাবক

الريم হরিণের শাবক তার বহুবচন ارام আসে। কবি বলেন—

بها العير والارام يمشين خلقه + واطلاوها ينهضن من كل مجم

"ঐ স্থানে বন্য গাধা ও হরিণ অগ্রে পশ্চাতে আসা-যাওয়া করে, আর তাদের শাবকেরা প্রত্যেক স্থানে আনন্দের উত্তালে নৃত্য করে ঘুরে।"

ইসমাঈল বলেন, আরাম; সাদা হরিণদেরকে বলে। তার বহুবচন الريم আসে। এই প্রাণী রেগুস্থান এলাকায় থাকে। ভেড়ার মত মাংস হয়। ঐ প্রাণীর চর্বি গোশত অন্যান্য হরিণদের অপেক্ষায় বেশি হয়। সাকীউদ্দীন ইবনে কাসিম আবুল ফজল কতীলুর রাইম ও আছিরুল হাওয়া قتيل لريم واسير الهوا নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৫৪৬ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তারই নিম্নোক্ত পংক্তি—

لى مهجة كادت بحر كلومها + للناس من فرط لجوى تتكلم

"আমার একটি প্রেমিকা আছে নিকটে, তার আঘাত সাগরের অমানুষিক চিন্তার কারণে মানুষদের সঙ্গে কথা বলে না।"

لم يبق منها غير ارسم اعظم + متحدثات للهوى تتظلم

"তার মাঝে হাড্ডির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই আর সেই হাড্ডিই বক্তা, এবং প্রেমের অভিযোগকারী।"

৩৭৫. ام رباح (উম্মি রাবাহ) বাজপাখি সাদৃশ্য পাখি

বাজপাখি সদৃশ্য শিকারী পাখি। ام رباح 'রা'- এর উপর যবর, বা باء সাকিনের সাথে। বাজপাখির সাদৃশ্য একটি শিকারী পাখি। তা মাটি রঙের আর তার পিষ্ঠদেশ ও বাহু লাল রঙের হয়। এই প্রাণীরা আঙুর ফল খায়।

৩৭৬. ابو رباح (আবু- রিবাহ) একপ্রকার পাখি

ابو رباح (রা-এর উপর যের এবং ইয়া সাকিনের সাথে) তার বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থের শেষ দিকে 'ইয়া' পরিচ্ছেদের ইউ ইউ يوبو-এর আলোচনায় আসবে।

৩৭৭. دورميح (যাওরামিহ) ইঁদুর সাদৃশ্য এক প্রাণী

ইঁদুর সাদৃশ্য একটি প্রাণী যার সামনের পা গুলী ছোট আর পিছনের পা গুলী লম্বা হয়ে থাকে।

باب الزاء

পরিচ্ছেদে : 'যা'

৩৭৮. الزاغ (আয-যাগ) শুরাব কাক

এটা এক শ্রেণীর কাক যাকে শুরার যারয়ীও বলা হয়। তার রং কালো এবং দেহের উচ্চতার দৃষ্টিকোন হতে খাটো। এবং কতকস্থানে তার ঠোঁট, পা লাল হইয়া থাকে, তাকে গুয়াবুয যাইতুনও বলা হয়। কেননা এটারা যাইতুন খায়। এই কাকের চেহারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুদর্শনীয় হয়। কিন্তু আযাইবুল মাখলুকাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, গুরাব যরয়ী কালো ও বড় হয়, তা সহস্রাধিক বয়স লাভ করে। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, এটা শুধুমাত্র কাল্পনিক। সহীহ তাই যা উপরোল্লেখিত আছে।

আশ্চর্য কাহিনী

আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, আমি হাফিজুচ্চলফীর ইন্তিখাবুল মুন্বতাকী নামক গ্রন্থে এবং আযাইবুল মাখলুকাতের শেষ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আছআদীর এক বর্ণনায় দেখেছি তিনি বলেন, একদা কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম আমাকে আহ্বান করে, সুতরাং আমি সেই আহবানে সাড়া দেই, এবং যখন তাদের সন্নিকটে পৌছলাম, তখন তার ডান পার্শ্বে একটি বাক্স রাখা আছে। কাজী সাহেব আমাকে বসাইলেন এবং ঐ বাক্সটি খোলার আদেশ দেন, যখন তা খুলিয়া দিলেন তখন কোন এক প্রাণী নিজের মাথা বাহির করল মাথা তো মানুষের মাথার মত কিন্তু নাভী হতে নিম্নভাগ পর্যন্ত কাকের শরীরের মত ছিল। তার সীনা আর পিঠে দুটি ফোঁড়া ছিল, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল তিনি তা দেখামাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কাজী ইয়াহইয়া আমাকে দেখে হাসতে লাগল। কাজী সাহেব দরখাস্ত করেন আর বলেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভাল করুক। আপনি বলুন, এটা কী? কাজী সাহেব বলেন তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে

নিজেই নিজের নাম-ঠিকানা বলে দিবে। সুতরাং আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি কে? এটা শোনার পর চারুবাক-বাগ্নি ভাষায়, নিম্নোক্ত পংক্তি পাঠ আরম্ভ করে—

انا الزاغ ابو عجوه + انا ابن الليث والبلوه

আমি কাক, যার উপনাম আবু আজুয়াহ, আমি বাঘ বাঘিনীর সন্তান।

احب الراح والريحان + والقهوة والنشوة

আমার নিকট মদ্যপান, সুগন্ধিযুক্ত ফুল, কফি ও সুগন্ধি এবং অন্যান্য বস্তু অপেক্ষায় অধিক প্রিয়।

فلا عدوى يدى تخشى + ولا يحذر لى سطوة

আমার হাত কোন প্রকার সংক্রমণ নাই, না আমার হাত বিস্তৃত যার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যাবে।

ولى اشياء تسظرف + يوم العرس والدعوة

আমার মাঝে বুদ্ধি সম্পন্ন কথা আছে, যার বিবাহ ও অন্যান্য দাওয়াত দিবসে প্রকাশ ঘটে।

فمنها سلعة فى فى الظهر + تسترها الفروة

তাদের অবাক, আমার পিঠে একটি ফোঁড়া, যা চুলে ঢাকে না এবং দ্বিতীয় আরেকটি ফোঁড়া আছে।

واما السلعة الاخرى + فلوكان لها عروة

আর যদি পর ফোঁড়াটি উন্মুক্ত করা হয়, তাহলে তা পেয়ালা হওয়ার ক্ষেত্রে।

لماشك جميع الناس + فيها أنها ركوة

মানুষের সন্দেহ সংশয় থাকবে না।

অতঃপর সে কাক কাক সংশয় বলে চিল্লাইয়া বাক্সে প্রবেশ করল। আমি কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছামকে বললাম যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করুন। মনে হয় আমি এটার আশেক। তিনি বলেন, যা আছে আপনি তাই দেখেছেন তার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই।

সারকথা

এতটুকু আমি জানি যে, কেউ আমীরুল মোমিনীন (মামুনুর রশীদ)- এর নিকট গিয়েছিল আর তার সাথে সিল বিহীন একটি চিঠি ছিল। যাতে তা সম্পর্কে লিখা ছিল। কিন্তু আমার জানা নাই কী লিখা ছিল। আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, মূলত এই কাকের ঘটনাই তবে বর্ণনাকারীদের পার্থক্যের সাথে হাফেয আবু আহমাদ ইবনে দাউদ- এর নিকট যেতেন আর সুয়াল জওয়াব করতেন।

মাওরিখে ইবনে খালকান, তিনি কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছামের জীবনীতে লিখেন যে, যে সময় তাকে বসরার হাকীম হিসেবে নিয়োগ করা হয়, সেই সময় তার বিশ বছর বয়স হয়েছিল। বসরা অধিবাসীরা তাকে স্বল্প বয়সী মনে করে জিজ্ঞাসা করে যে আপনার বয়স কত? তিনিও বুঝতে পারলেন যে, লোকেরা আমাকে স্বল্প বয়সী মনে করে এমন প্রশ্ন করেছে। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আমি ইতাব ইবনে আছিদ রাযি. যাকে রাসূল সা. মক্কার বিচারক বানাইয়া প্রেরণ করেছিলেন। তা হতে ও মায়ায ইবনে জাবাল রাযি. হতে যাকে মুহাম্মদে আরাবী সা. ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং কায়ার ইবনে সূর হতে যাকে ফারুকে আযম রাযি. বসরার বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। বয়সের দিক হতে বেশি? এই উত্তর তিনি বিদ্রুপের ভঙ্গিতে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ নিয়ে খলীফা মামুনুর রশীদ-এর নিকটে যেত, তখন তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম-এর সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করত। অতএব খলীফা তাকে ডাকেন। যখন সে তার সামনে আসেন তখন খলীফা তার খারাপ চেহারার ভিত্তিতে খাটো করে দেখেন। তিনি এটা বুঝিয়া খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমীরুল মোমিনীন! যদি কোন ইলমী মাসয়ালার প্রয়োজন হয় তবে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি আমার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করবেন না। সুতরাং খলীফা তাকে কিছু প্রশ্ন করেন এবং স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাওয়ার পর তাকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করেন। খলীফা মামুনুর রশীদের যুগে কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আখছাম এবং আহমাদ ইবনে আবি দাউদ মুতাযিলীর যে প্রভাব খলীফার উপর লাভ করেছিল সেই প্রভাব দ্বিতীয় আর কেউ লাভ করতে পারে নাই। ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম হানাফী মাযহাবের ছিলেন, কিন্তু হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল- এর উপর খলকে কুরআন সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক কঠোরতা আর কেউ করে নাই। কাফ পরিচ্ছেদে কালব- এর আলোচনার মাঝে বিস্তারিত আলোকপাত করা হইবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

ফিকাহ সম্পর্কে যে কিতাব কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম লিখেছেন, সেই কিতাব সম্মানজনক ছিল। তবে দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুন মানুষেরা ছাড়িয়াছেন, ঐ লিখা আমলহীন হইয়া রয়েছে। কাজী ইয়াহইয়ার ইসলামে এমন এক কঠিন দিবস এসেছিল, যা দ্বিতীয় আর কার আসে নাই। তাহল, একদা খলীফা মামুনুর রশীদ শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, পথিমধ্যে তাকে শিয়া আলেমগণ উত্তেজিত করার কারণে তিনি নিজেই হুকুম দেন যে নিকাহে মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) হালাল। কোন আলেম ছিল না যে, সে খিফার নিকট নির্ভীকতার সাথে অস্থায়ী বিবাহ হারাম করতে প্রমাণ পেশ করবে। কিন্তু কাজী ইয়াহইয়া তিনি এমন নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন যে, মামুনুর রশীদের ঐ নাজায়েজ হুকুম প্রকাশ করার অপপ্রয়াসের স্থিমিত করে দেন। এবং মুতার (অস্থায়ী বিবাহ)

হারাম প্রমাণ করে তাকে প্রশান্ত করলেন। অতএব মামুনুর রশীদ তাওবা করেন এবং দ্বিতীয়বার ঘোষণা করেন যে, নিকাহে মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) হারাম।

বর্ণিত আছে ,যে কোন ব্যক্তি কাজী সাহেবকে প্রশ্ন করেন যে, মানুষের জন্যে কতটুকু পরিমাণ খানা খাওয়া উচিত। কাজী সাহেব উত্তর দেন যে, ক্ষুধা নিবারণ হয় এই পরিমাণ, কিন্তু উদর ভর্তি যেন না হয়। পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, কতটুকু হাসা উচিত? উত্তরে বলেন, যতটুকু সম্ভব আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা উচিত। আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, কতটুকু পরিমাণ আমল গোপন করা উচিত? সাধ্যানুযায়ী এবং তা প্রকাশ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর উত্তর দেন যে, আমলকে এতটুকু পরিমাণ প্রকাশ কর না স্থলভাগে অবস্থানকারী জিন মানব সবাই তোমার অনুকরণ করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার ইলমের প্রশংসা করেন।

কথিত আছে যে, কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছামের মাঝে এই দোষ ছাড়া আর কোন দোষ ছিল না যে, সে ছেলেদের সাথে মুহাব্বত রাখতেন এবং উচ্চ স্থানের আকাঙ্ক্ষাকারী হিসেবে মানব সমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার নীতি ছিল যে, যখন তিনি ফকিহ্- এর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি তাকে হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। আর যদি কোন মুহাদ্দিসের সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তার সাথে নাহুর মাসায়িল সম্পর্কে কথোপকথন করতেন। আর যদি কোন নাহুবীর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তার সাথে ইলমে কালাম সম্পর্কে মোনাজেরায় লিপ্ত হতেন। এটার দ্বারা উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিজের প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করে লজ্জিত করতেন। একদা ঘটনাক্রমে খোরাসানী কোন ব্যক্তি তার নিকট আগমন করলেন। তিনি খুব জ্ঞানী ও হাফিজুল হাদীস ছিলেন। কাজী সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি তো হাদীস পড়িয়াছ! প্রতিউত্তরে বলেন, জি হাঁ পড়িয়াছি। অতঃপর কাজী সাহেব তাকে প্রশ্ন করেন যে, তোমার উছুলে হাদীস সম্পর্কে কেমন ধারণা আছে? সে উত্তর দিল যে, আমি শরীক হতে সে আবু ইসহাক হতে এবং সে হারস হতে শুনিয়াছি যে, হযরত আলী রাযি. এক লুতীকে শূলিতে চড়ান। এটা শোনার পর তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর কথা বলেননি। কাজী ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম ৩০ অথবা ৪০ হিজরী সনে যুবদাহ নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। যুবদাহ মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। যা হাজীদের রাস্তায় পড়ে। এটা সেই স্থান যে স্থান হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. হযরত আবুজর গিফারী রাযি.-কে নির্বাসিত করেছিলেন, সেথায় তার মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য যে, কাজী সাহেবের মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে যে, কেমন কাটিতেছে? কাজী সাহেব উত্তর দেন যে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণও হয়েছে। আমি আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করেছি যে, হে আল্লাহ! আমি তো একটি হাদীসের উপর ভরসা করে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। হাদীসটি হল, আমার হতে

আবু মুয়াবিয়া দরীর, তার নিকট হতে আমাশ, তার নিকট হতে আবু সালেহ, তার নিকট হতে আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, " জনাব রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, আপনি বৃদ্ধ মুসলমানকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন।" আল্লাহ তাআলা বলেন - রাসূল সা. সত্য বলেছেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

কাকের শরয়ী হুকুম

কাক খাওয়া হালাল। ফকিহ রাফীর নিকট এটাই প্রাধান্য এবং এটারই তিনি প্রবক্তা। হযরত হাকেম এই মাযহাবকেই গ্রহণ করেছেন। হযরত হাম্মাদ, হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রহ. হযরত ইমাম বায়হাকী(রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত হাকেমের নিকট কাকের হালাল ও হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি বলেন, কালো ও উচ্চ দেহ বিশিষ্ট কাক মাকরূহ আর ছোট দেহ বিশিষ্ট কাক যাকে যাগ বলা হয়, তবে এই জাতীয় কাক খাওয়াতে কোন দোষ নাই।

চিকিৎসায় কাক

যদি কাকের রসনা শুষ্ক করে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয় তবে তার তৃষ্ণা নিবারণ মিটিয়া যাবে ভীষণ গরমের মাঝেও। এটাই কাকের কলিজার বৈশিষ্ট্য। কেননা এই পাখি প্রচণ্ড গরমেও পানি ব্যবহার করে না। আর যদি কাক ও মোরগের পিত্ত মিশিয়ে চোখে লাগানো হয় তবে অস্পষ্ট দৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তা চুলে লাগানো হয় তবে চূড়ান্ত পর্যায়ের কালো হবে, তার পাকস্থলি প্রাথমিক পানি নির্গত হওয়ার প্রতিবন্ধক।

স্বপ্নে কাকের ব্যাখ্যা

স্বপ্নে যদি কোন ব্যক্তি লাল ঠোঁট বিশিষ্ট কাককে দেখে তবে তার ব্যাখ্যা হামলাকারী এবং কৌতুকানন্দ দ্বারা দেয়া হয় এবং আরতামিদুরুস- এর বক্তব্য যে, স্বপ্নে কাক দেখা এমন ব্যক্তিবর্গের আলামাত যারা সহচরত্বকে বহাল রাখে। কখনও তার ব্যাখ্যা দারিদ্রতা দ্বারা দেয়া হয়। এটাও বলা হয়েছে যে স্বপ্নে তার ব্যাখ্যা জারজ সন্তান দ্বারাও করা হয়; অথবা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার মেজাজে ভাল মন্দ উভয়টি বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

৩৭৯. الزق (আযযাকী) মোগর

الزق এর বহুবচন زواق আসে زقا يزقو বাবে نصر ينصر হতে আসে, যার অর্থ চিৎকার ও রাগান্বিত। জাওহরী বলেন, প্রত্যেক চিৎকারকারী প্রাণীকে যাক বলা হয়। পেচার আলোচনায় ইবনে হামিরের এ পংক্তি অতিবাহিত হয়েছে—

ولو ان ليلى الاخيلية سلمت + على ودونى جندل وصفائح

"লায়লা আমাকে সালাম করিল এমতাবস্থায় আমাদের উভয়ের মধ্যকার বিশাল মরুভূমি ও বড় পাথরের পর্দা ছিল।"

اسلمت تسليم البشاشه اونقا + اليها صدى من جانب القبر صائح

"তখন আমিও তার নিকট গিয়ে সালাম করি এমতাবস্থায় যে, পেচা কবরস্থান হতে চিৎকার করিতেছিল।"

তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সোয়াদ পরিচ্ছেদে صدى শব্দের আলোচনায় আসবে, ইনশাআল্লাহ।

৩৮০. الزامور (আযযাম্মুর) মানবদেহ প্রাণী মাছ

الزامور তাওহিদী বলেন, এটা একটি ছোট শ্রেণীর মাছ। যা মানুষের আওয়াজের প্রতি মুগ্ধ থাকে। তা মানুষের আওয়াজ শ্রবণের প্রতি এত উচ্চ পর্যায়ের প্রেমিক যে, তা যদি কোন জাহাজ আসতে দেখে, তখন তার সাথে সাথে সঙ্গ দেয়। যদি কোন বড় মাছকে দেখে যে, তা জাহাজের সাথে ঘর্ষণ ও তাকে ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হয় তখন এটা লম্ফ দিয়ে তার কর্ণে ঢুকিয়া পড়ে এবং অবিরাম পাখা ঝাড়িতে থাকে, বড় মাছটি ব্যর্থ হয়ে কোন পাথর বা গহবর অন্বেষণে সমুদ্র উপকুল পানে যায়, আর যখন কোন বস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হয় তখন তাতে নিজের মাথা দ্বারা আঘাত করে মৃত্যুবরণ করে। এইজন্য জাহাজ ওয়ালাগণ তার সাথে অগাধ ভালবাসা কায়েম করে। এবং তাকে আহার করান, আর তার উপস্থিতিতে তাকে অন্বেষণ করে, যেন তার সাহায্যে আক্রমণকারী অনিষ্ট হতে সংরক্ষিত থাকা সম্ভব হয়। আর যদি জাল ফেলার কারণে সেই মাছ জালে আবদ্ধ হয় তবে তার কারামতের কারণে তাৎক্ষনিক তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

৩৮১. الزبابة (আয-যাবাবাতু) বন্য ইঁদুর

الزبابة (যা এর উপর যবর) এটা একপ্রকার বন্য ইঁদুর যা প্রয়োজন অপ্রয়োজনে কোন বস্তু চুরি করে। এটাও বলা হয় যে, এই ইঁদুর অন্ধ ও বয়রা হয়। কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে এটার সাথে তুলনা করা হয়। সুতরাং হারস ইবনে কালাদাহ- এর পংক্তি—

ولقد رائيت معاشرا + جمعوا لهم مالا وولدا

"আমি বহু মানুষ এমন দেখেছি যে, যাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের নিকট ধন ও সন্তান রয়েছে।"

وهم زباب حائر + لا تسمع الاذان رعدا

"তারা এমন দুর্বল ইঁদুরের মত যাদের কর্ণ বজ্রপাত ও মেঘগর্জনের আওয়াজ শোনতে সক্ষম।"

কবি এই পংক্তিতে زباب এর সিফাত حائر বর্ণনা করেন, অর্থাৎ অন্ধ-বোবাকেও অধিকন্তু দুর্বলের মধ্যে গণ্য করা হয়। কবির উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা যুক্তির অনুসরণে রিযিক বন্টন করেন নাই। পংক্তিতে যে بلد শব্দ ব্যবহার হয় ঐ ওয়াওতে পেশের সাথে আর দ্বিতীয় অংশে যে দুটি পংক্তি لا تسمع الاذان رعد الاذان মূলত اذانهم অর্থাৎ মুযাফ ইলাইতে উল্লেখযোগ্য। মুযাফ ইলাই বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে আলিফ লাম উল্লেখ করা যায়, যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন যে, فان الجنة هى الماوى (বেহশতই মুমিনের ঠিকানা)।

الماوى মূলে ماواهم ছিল। এখানে মুযাফ ইলাইকে বিলুপ্ত করে তার শুরুতে আলিফ লাম সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম সালাবী বলেন, কর্ণে শ্রবণ না করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদি কর্ণশক্তি স্বল্প পরিমাণ হ্রাস পায়, তবে তাকে وقر বলে, আর যদি পূর্বাপেক্ষা বেশি হ্রাস পায় তবে তাকে সীমে বহেরা বলে আর যদি একেবারে কর্ণশক্তিহীন এমনকি বজ্রপাত ও মেঘ গর্জনের শব্দও কর্ণপাত না করে তবে তাকে সলখ বলে।

বন্য ইঁদুরের শরয়ী হুকুম ফা পরিচ্ছেদের অধীনে 'ফা' শব্দে আলোচনা করা হবে।

বন্য ইঁদুরের উদাহরণ

যদি কোন ব্যক্তিকে চোরের দ্বারা উপমা প্রদান করা হয় তবে বলিত اسرق من زبابة অমুক ব্যক্তি বন্য ইঁদুর অপেক্ষাও অধিক চোর, কেননা বন্য ইঁদুর প্রয়োজনীয় বস্তু চুরি করে নিয়ে যায়।

৩৮২. الزبزب (আয-যাবযাব) বিড়াল সাদৃশ্য এক প্রাণী

الزبزب বিড়াল সাদৃশ্য এক প্রাণী। কামেল ইবনুল আসীর-এর আকস্মিক দুর্ঘটনা ৩০৪ হিজরী চলমান সময়ে লিখেছেন যে, বাগদাদ অধিবাসীরা যাবযাব নামক প্রাণীর কারণে বিড়াল বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। তা রাত্রিতে তাদের ঘরের ছাদে আঘাত করত আর তাদের ছোট শিশুদের ভক্ষণ করত। কখনও শায়িত পুরুষ অথবা মহিলাদের হাত কর্তন করে ভক্ষণ করত। তাদের ভয়ে ভীত-সন্তস্ত হয়ে সারা রাত্র জাগ্রত থাকত এবং নিজেদের সন্তানদের হেফাজত

করত এবং ঐ সব প্রাণীদেরকে তাড়ানো এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বাসন-পত্র ইত্যাদি বাজাইত। ঐ প্রাণীদের কারণে বাগদাদে দীর্ঘ দিন গন্ডগোল থাকে। পরিশেষে একদিন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে ঐ সব প্রাণীদের গ্রেফতার করা হয়। ঐ প্রাণীদের রং সাদা-কালো মিশ্রিত ছিল, এবং তাদের হাত-পা ছোট ছোট ছিল। তা হত্যা করে সর্ব সাধারণের দৃষ্টিতে লটকাইয়া দেয়া হয়। এই দৃশ্য দেখে মানুষেরা সুখ নিদ্রায় শয়ন করে।

৩৮৩. الزخارف (আয-যুখারুফ) পানির উপর উড়ন্ত কেন্নো

الزخارف বহুবচন, এটার একবচন যুখরুফ আসে। ঐ প্রাণীকে বলা হয় যার মানব দেহের তুলনায় ছোট এবং পানির উপর উড়ে। আউছ ইবনে হজরের কবিতা—

تذكر عينا من عمان وماؤها + له حدب تستن فى الزخارف

"আমার চক্ষু অসম্মান ও তার নয়নকে স্মরণ করে যাতে যুখরুফও পাখির জন্য উড়ে।"

৩৮৪. الزرزور (আয-যুরযুর) চড়ুই সাদৃশ্য এক পাখি

الزرزور (যা-এর উপর পেশ) এটা চড়ুই সাদৃশ্য এক পাখি। কারণ এটার আওয়াজে এক শ্রেণীর যুরযিয়াত পাওয়া যায়। এইজন্য এটার নাম যুরযুর হয়ে গিয়েছে।

জাহেয বলেন, প্রত্যেক সেই পাখি যে পাখি কছরুজ জিনাহ্ অর্থাৎ যার বাহু ছোট যেমন যারাযীর ও আছাফির (চড়ুই পাখি) যদি উহাদের পা কাটিয়া দেয়া হয়, তবে তা উড়তে অক্ষম হয়ে যাবে, তেমনিভাবে মানুষের পা কাটিয়া দেয়া হয় সে দৌড়ানোর যোগ্যতা রাখে না। শরয়ী হুকুম আইন পরিচ্ছেদে আসফুরের অধীনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ফায়েদা

তাবরানী ইবনে শায়বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, মোমিনের রূহ যারাযিরের মত, যেমনিভাবে তা পাকস্থলীতে থাকে এবং একে অপরকে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয় এবং বেহেশতের ফুল তারা ভক্ষণ করতে পারে। আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, আমাদের শায়েখ বুরহানুদ্দীন কিরাতী যুরযুর সম্পর্কে চমৎকার উক্তি করেন—

قد قلت لما مر بى معرضا + وكفه لحمل زرزورا

"যখন সে আমার নিকট হতে মুখ ফিরায় এমতাবস্থায় তার হাতে একটি যুরযুরা ছিল।"

يا ذا الذى عذبنى مطله + ان لم تزر حفا فزر زورا

"তখন আমি বলি যে, হে সেই ব্যক্তি! যার ফাঁকি আমাকে অনেক কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছে, যদি তুমি বাস্তবে আমার সাক্ষাত প্রত্যাশী না হও তবে পদ্ধতিগতভাবে সাক্ষাতে আস।"

প্রথম পংক্তিতে যুরযুর পাখির নাম, আর দ্বিতীয় পংক্তিতে জুমলায়ে ফেলিয়া দিয়েছে ইনলাইয়া। মানাকেবে ইমাম শাফী (রহঃ) মুসান্নিফা আব্দুল মুহসিন ইবনে উসমান ইবনে গানামে লিখেন যে, রোমানদের ম্যাজিক পৃথিবীর আশ্চর্যের অন্যতম। তা উদারময়ী একটি যুরযুর চড়ুই পাখি। ঐ চড়ুই সারা বছর একদিন ডাকে, এটার আওয়াজ তার স্বজাতীয় চড়ুই, অর্থাৎ এমন কোন যুরযুর অবশিষ্ট থাকে না যাদের ঠোঁট যয়তুনের দানা বিহীন। আর এই দানাসমূহ উদারময়ী চড়ুই- এর সামনে রাখে। অতঃপর ঐগুলী একত্রিত করে যয়তুনের তৈল বাহির করা হয় আর এই তৈল রোমানদের সারা বছরের ব্যয় বহন করে।

শরীয়তে যুরযুর

এটা খাওয়া হালাল। কেননা এটারা চড়ুই পাখিদের মধ্য হতে এক প্রকার পাখি।

চিকিৎসায় যুরযুর

এটার গোশত খাওয়াতে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। যদি তার রক্ত ফোঁড়ায় লাগানো হয়, তবে অতি দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। আর তা প্রজ্বলিত করে তার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগাইলে তবে অতিদ্রুত আরোগ্য লাভ করা হয়।

স্বপ্নে যুরযুরের ব্যাখ্যা

স্বপ্নে যুরযুর দেখা সফরে সন্দেহ সৃষ্টির প্রমাণ বহন করে। স্থলপথের বা সামুদ্রিক উভয় পথের সফর উদ্দেশ্য। কখনও তা দেখার দ্বারা সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সফর করে। যেমন গাধা ভাড়ায় গ্রহন করে একস্থানে অবস্থান করে না বরং কখনও ভাল-মন্দ কাজের প্রতি দৌড়ায় অথবা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ধনী গরিবও নয়, ভদ্র নয় অভদ্র নয়।

৩৮৫. الزرق (আয-যুরাক) শিকারী পাখি

الزرق এক শিকারী পাখি। ইবনে সায়্যিদাহর বক্তব্য যে, এটা বাজপক্ষী সাদৃশ্য শিকারী পাখি। ফাররা বলেন, এটা সাদা বাজ পাখিরই এক প্রকার। যাই হউক মেজাজে শুস্ক ও গরম হয় এবং বাহু শক্ত হওয়ার দরুন দ্রুত বেগে উড়তে ও শিকারের উপর অতর্কিত হামলা করতে পারে। তার বহুবচন زارِيق আসে।

পিষ্ঠদেশ কালো ও বক্ষদেশ সাদা এবং চক্ষু লাল বর্ণের হয়। হাসান ইবনে হানী এটার প্রশংসায় নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ পাঠ করেন—

قد اغتدى بصفرة معلقة + فيها الذى يريد من مرفقد

তা বিছানো দস্তরখানা হতে খাবার সংগ্রহ করেছে। এমন দস্তরখান যেথায় সমগ্র উদ্দিষ্ট বস্তুর সমাহার ছিল।

مبكرا بزرق او زرقه + وصفته بصفة مصدقة

সত্য যে, যুররাক নামক প্রাণী প্রভাতে যখন বাহির হয়, তখন তার অবস্থা এমন হয় যেন ন্যায়পরতা।

كان عينه لحسن الحدقه + مرجستة ثابتة فى ورقه

তার চোখের পাপড়ির সৌন্দর্যতার ভিত্তিতে এইরূপ অনুভব হয়, যেন নার্গিস ফুল ডালে খেলা করছে।

ذو منسر مختصب بعقله + كم وزة صدنابه ولقلقه

সবুজ খচিত বড় ডানা বিশিষ্ট, আর তার সাথে স্কন্ধের মাংস লটকানো রয়েছে।

سلاحه فى لحمها مفرقه

এবং ঐ যুররাফের হাতিয়ার স্বীয় দেহের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান।

শরীয়তে যুররাক

এটা ভক্ষণ করা হারাম, যার বিস্তারিত আলোচনা বাজপক্ষীর পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

৩৮৬. الزرافة (আয-যারাফফাত) উট সাদৃশ্য এক প্রাণী

الزرافة (যা-এর উপর যবর; পেশেরও সম্ভাবনা আছে।) তার উপনাম উম্মু হীনি। এক সৌন্দর্য চতুস্পদ জন্তু। এটার সামনের পা লম্বা ও পিছনের পা খাটো হয়, এটার চার হাত পা সমষ্টি প্রায় দশ গজ পরিমাণ দীর্ঘ। তার মাথা উটের মাথার মত এবং তার শিং গাভীর শিং-এর মত। তার চামড়া, চিতাবাঘের চামড়ার মত, আর তার হাত-পা খুর গাভীর নয়; লেজ হরিণের লেজের মত; তার হাঁটু পিছনের পায়ে হয় না বরং সামনের পায়ে হয়। আর যখন এটারা চলাচল করে, তখন এটাদের চলন অন্যান্য জন্তুর চলনের পরিপন্থী। বাম পা পিছনে রাখে, হাত অগ্রে প্রেরণ করে। এটার স্বভাব আল্লাহ তাআলা প্রীতি ভালবাসা গচ্ছিত করেছে। এই প্রাণী চর্বন করে ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে। যখন আল্লাহ তাআলা এটাদেরকে এই বিষয়ের জ্ঞান দান করেন যে, তাদের রিযিক

বৃক্ষ ক্ষয়সালা হয়েছে, স্বভাবতঃই তাদের সম্মুখের পা পিছনের পায়ের তুলনায় লম্বা বানাইয়াছেন, যেন এটার সাহায্যে সহজে বৃক্ষ চিরিতে সক্ষম হয়।

তারিখে ইবনে খালকান গ্রন্থে কবি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আতবী আল বসরী আল আখরারি প্রসিদ্ধ লাভের মুহূর্তে লিখেন যে, তিনি যুরাফ্ফা সম্পর্কে বলেন, তিন জন্তু দ্বারা এটার জন্ম হয়। এটা হল, (১) নাকাহে অহশী—বন্য উট (২) বাকারায়ে অহশী—বন্য গাভী ও নরবিচ্ছু (এক গোশত খেকো প্রাণী যার চক্ষু ছোট হয়) যখন উষ্ট্রীর উপর উঠে, তখন শাবক উষ্ট্রী অথবা গোধ খেকো- এর আকৃতিতে সৃষ্টি হয় আর যদি শাবকটি নর পুংলিঙ্গ হয় বন্য গাভীর সাদৃশ্য হয়। এই আমল বন্যপ্রাণীদের দেশে অব্যাহত, এইজন্য তাকে যুরাফফা বলা হয়। কারণ যুরাফফার আভিধানিক অর্থ জাসাত আর যেহেতু এই প্রাণীর জন্ম কতিপয় জন্তুর কারণে হয়, সেহেতু তাকে যুরাফফা বলা হয়। অনারবীগণ এটাকে উষ্ট্রী গাভী এইজন্য বলে যে, এটার জন্ম সংক্রান্ত তিনটি প্রাণীর সংমিশ্রণে হয়েছে। কতক মানুষের ধারণা যে, তাকে জন্ম দিতে বিভিন্ন তিন জন্তুরও অধিক জন্তুর সংমিশ্রণ হয় এটার কারণ এই হবে যে, গ্রীষ্মকালে চতুষ্পদ জন্তু এবং বন্য প্রাণীরা পানি পান করার লক্ষ্যে একত্রিত হয় এবং এক স্থানেই পরস্পরে সঙ্গম করে। কতক প্রাণীদের ঐ সঙ্গমের কারণে দেহের কিছু অংশ গর্ভে রয়ে যায়, আর কতক প্রাণীর থাকে না। এবং কখনও এমন হয় যে, এক স্ত্রীলিঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীরা সঙ্গম করে আর তাদের বীর্য পরস্পরে মিশ্রণ হয়ে, বিভিন্ন রং রূপ বিশিষ্ট প্রাণীর জন্মের কারণ হয়। কিন্তু জাহেয এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক অজ্ঞতা মনে করেন কারণ তার বক্তব্য হল, আল্লাহরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় এই জন্যে তিনি বলেন, যুরাফফা এমন শ্রেণীর জন্তুর মধ্যে হতে যারা শরীক বিহীন প্রতিষ্ঠিত।

শরীয়তে যুরাফফা

শাফী রহ.-এর মাযহাবে তার হালাল হারাম নিয়া মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সতর্ককারীর তা এক ভাষ্য মতে হারাম। আর ইমাম নববী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে শরহে মুহাযযাব-এর মধ্যে বর্ণনা করেন যে, তা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। দ্বিতীয় বক্তব্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে, কেননা তার সঙ্গম ও সৃষ্টির মাঝে যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ সেসব প্রাণীর অংশও রয়েছে। এটারই ভিত্তিতে তাকে হালালের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। এবং জাহেযের উপরোল্লিখিত ভাষ্যানুযায়ী নিঃসন্দেহে হালাল। কিন্তু ঐ উক্তির ভিত্তিতে জায়েজ উভয় শ্রেণী হতে হয়, এটা নিয়ে উলামায়ে শাফীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, আর হাম্বলীদের মধ্য হতে আবুল খাত্তাব তা হারাম হওয়ার প্রবক্তা। আর উলামায়ে আহনাফের নিকট হালাল। এটার উপর শায়খ ওকী উদ্দীন ইবনে আবিদামুবী আল হামুবী ফতওয়া প্রদান করেন। আর এই উক্তিকেই

কাজী হুসাইন বর্ণনা করেন এবং আবুল খাত্তাবের দুই উক্তির মধ্য হতে এটাও একটি উক্তি। এই মাসয়ালার পক্ষপাত এই অংশ দ্বারাও হয় যে, পাতিহাঁস যুরাফফা, যদি ইহরাম অবস্থায় ধ্বংস হয়, তবে তার ফিদয়া ছাগল বা তার মূল্য দ্বারা আদায় করতে হয়, আর ফিদয়া যে সব প্রাণী খাওয়া বৈধ ঐ সব প্রাণীরই ফিদয়া দিতে হয়। অতএব বুঝা যায় যে, এই প্রাণী খাওয়া হালাল।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, হারাম হওয়ার কোন কারণ আমাদের বুঝে আসে না। হারামের কোন কারণ তাতে বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে হারামজনিত বক্তব্য যা পূর্বে সতর্ককারী ও ইমাম নববী হাওলায় বর্ণনা করা হয়েছে ঐ ব্যাপারে শায়খ তাকী উদ্দীন ইবনে আবিদামুবী আল হামুবী লিখেন যে, সতর্ককারী যা বর্ণনা করেন, তা ফিকাহর গ্রন্থে উল্লেখ নাই। অথচ কাজী হুসাইন ফকিহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হালালের প্রবক্তা। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, সতর্ককারী এবং ইমাম নববী (রহঃ) হয়তো ভাষাবিদদের হতে শ্রবণ করেছেন যে, যুরাফফা হিংস্র প্রাণীদের মধ্য হতে, আর এটার উপরেই ভিত্তি করে হারাম হওয়ার ফাতাওয়া প্রকাশ করেন। এই কারণেই কিতাবুল আইনে লিখক তাকে হিংস্রদের মধ্যে গণনা করেন। যদি মুতাওয়ালিদাইনিল মাকুল ও গাইরিল মাকুল অর্থাৎ তার জন্ম মাংস খাওয়ার উপযোগী প্রাণী ও অনুপযোগী প্রাণীদের মিলনকে মানিয়া নেয় তবে হারাম হওয়ার কোন কারণ থাকে না। এভাবে যে, শাবকের মাথা কুকুরে মাথার সাদৃশ্য, আর অন্যান্য অঙ্গসমূহ ছাগলের সাদৃশ্য। এমতাবস্থায় শাবকের সম্মুখে ঘাস ও মাংস রাখা হবে, যদি শাবক মাংস ভক্ষণ করে তাহলে তা খাওয়া বৈধ নয় কেননা কুকুরের প্রাধান্য হয়েছে। আর কুকুর হারাম। আর যদি ঘাস খায় তবে ঐ শাবক জবাই করে তার মাথা ফেলিয়া দিয়ে দিবে আর বাকী অংশ খাওয়া জায়েজ হবে, আর যদি তা ঘাস ও মাংস উভয়টি আহার করে তবে ঐ শাবক হালাল হারাম হওয়ার ভিত্তি হল, যদি তা ছাগলের আওয়াজের মত আওয়াজ করে তবে ঐ শাবকের মাথা ফেলে দিবে অন্যান্য অঙ্গগুলী ব্যবহার করবে অন্যথায় নয়। আর যদি কুকুর ছাগল উভয়টির আওয়াজের মত আওয়াজ করে তবে লক্ষণীয় যে, পেটে শুধুমাত্র নাড়িভুড়ি অথবা পাকস্থলি যদি শুধু নাড়িভুড়ি হয়, তবে তা খাওয়া বৈধ নয়। আর যদি পাকস্থলি হয়, তবে ঐ মাথা ছাড়িয়ে অন্যান্য অঙ্গসমূহ খাওয়া বৈধ হবে। আল্লাহই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তবে এই মাসয়ালা হতে বুঝা যায় যে, যদি ঐ প্রাণীর আবেগে বৃক্ষের শস্য হয়, তবে তা খাওয়া জায়েজ কেননা তার খাদ্য বৃক্ষের পাতা, এবং এটা চর্বন ও বিষ্ঠা করে। এজন্য অন্যান্য মুষিকের মত এটা হালাল ও এটা খাওয়া জায়েজ।

যা হউক এই প্রাণী সংক্রান্ত ফকিহ ও উলামাগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়; আর তা হালাল হারাম সম্পর্কে আল্লাহর পরিস্কার কোন হুকুম

নাই। যার দরুন এই সব প্রাণীকে সেই সব প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে যে সব প্রাণী সম্পর্কে শরীয়তে কোন স্পষ্ট হুকুম আরোপ হয় নাই। এবং এটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অকাট্য প্রমাণ ওয়াও পরিচ্ছেদে অরল-এর অধীনের শিরোনামে আসবে। সেথায় আলোচনা করা হবে, যাদের সম্পর্কে শরীয়ত নিরবতা অবলম্বন করেছে। তবে তার হালাল-হারাম মাপকাঠি যাই হউক এতটুকু স্মরণ রাখা উচিত যে, হানাফিদের উসুলে ফিকার দৃষ্টিকোন হতে এই প্রাণী হালাল।

স্বপ্নে যুরাফফার ব্যাখ্যা

যুরাফফাকে স্বপ্নে দেখা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কখনও সুন্দর নারী দ্বারাও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদি কেউ স্বপ্নে যুরাফফা দেখে তবে সেই ব্যক্তি আশ্চর্য ও দুর্লভ সংবাদ পাবে যার ভিতরে উত্তম কোন কিছু থাকবে না। কখনও তা স্বপ্নে দেখা এমন নারী আলামত, যে স্বামীর সাথে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

৩৮৭. الزرياب (আয যারয়াব) চড়ুই পাখি

الزرياب চড়ুইয়ের তুলনায় সামান্য বড় এক পাখি। এটাকে আবু যুরাইক বলে। মাস্তেকুত তাইর গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন– এক ব্যক্তি বাগদাদ হতে বাহিরে কোথাও যাইতেছিলেন। তার সাথে মাত্র চারশত দিরহাম ছিল, এটা ছাড়া তার আর কোন ভরসা ছিল না। পথিমধ্যে সে যারয়াবের বাচ্ছা বেচা-কেনা দেখে ঐ চারশত দিরহামের বিনিময়ে ঐ সবগুলী বাচ্চা ক্রয় করে বাগদাদে চলে আসেন। যখন সকাল হল তখন সে স্বীয় দোকান খুলেন আর বাচ্চাদের খাঁচা দোকানে লটকাইয়া দেন। ঘটনাক্রমে ঠান্ডা লাগার হেতু সেসব বাচ্ছা মারা গিয়েছে, শুধুমাত্র একটি বাচ্চা যা তাদের মধ্যে সব চেয়ে দুর্বল তা প্রাণে বেঁচে যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা তার জন্য বিপদগ্রস্থ প্রমাণিত হল। এবং নিজেকে গরিব অভাবগ্রস্থ হিসেবে পূর্ণ বিশ্বাস হল। সারারাত্র আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেছে তার ভাষায় বলিতেছে যে, يا غياث المستغيثين اغثنى। যখন সকাল হল এবং ঠান্ডা স্থগিত হয়ে গিয়েছে তখন বাচ্চারা ডানা ঝারিতে ঝারিতে স্বীয় স্পষ্ট ভাষায় বলতে আরম্ভ করে يا غياث لمستغيثين এই আওয়াজ শ্রবণ করে লোকেরা দোকানে এসে একত্রিত হয়। আর ঐ পাখির ভাষা গভীর আগ্রহের সাথে শ্রবণ করে। ঘটনাক্রমে এই মুহূর্তে আমীরুল মোমিনের একজন দাসী অতিক্রম করে, আর সে ঐ বাচ্চাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়। আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সামনে আন্তরিকভাবে ক্রন্দনের ফল মাত্র যে, স্বল্প সময়ে তার ক্ষতির

তুলনায় অধিক লাভ দান করেন। সুতরাং যে ব্যক্তিই এমন করবে, সেই সফলতা অর্জন করবে।

৩৮৮. الزغبة (আয্-যুগবাতু) ইঁদুর সাদৃশ্য এক প্রাণী

الزغبة ইবনে সায়্যিদার উক্তি যে, এটা এক প্রকার পোকা যা ইঁদুর সাদৃশ্য হয়। আরবে এটার দ্বারা মানুষের নামকরণও করা হয়। তাই ঈসা ইবনে হাম্মাদ আল বসরীকে যুগবাহ বলা হয়। রশীদ ইবনে সা'য়াদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব এবং লাইছ ইবনে সা'য়াদ হতে বর্ণিত আছে, ঐব হযরত হতে মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ বর্ণনা করেন যে, তার মৃত্যু ২৪৮ হিজরী সনে হয়েছে।

৩৮৯. الزغلول (আয-যুগলুল) কবুতরের বাচ্চা

الزغلول (যা-এর উপর পেশ) কবুতরের বাচ্চা যতক্ষণ পর্যন্ত চক্ষু দ্বারা খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া খায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে যুগলুল বলা হবে। সুতরাং যখন কোন পাখি স্বীয় বাচ্চাকে শস্য দেয় এবং আহার করায়, তখন মানুষ বলে ازغل الطائر فزحه পাখি নিজের বাচ্চাকে খাবার তুলিয়া দেয়। ছাগল বা উটের শাবক যারা দুগ্ধ পান করার প্রতি আগ্রহী নয়। এবং মানুষের মধ্য হতেও যে ব্যক্তি দুর্বল তাকে যুগলুল বলে।

৩৯০. الزغيم (আয্-যাগীম) একপ্রকার পাখি

الزغيم একপ্রকার পাখি। ইবনে সায়্যিদাহ এটাকে راء مهمله এর সাথে বর্ণনা করেন।

৩৯১. الزقة (আয-যুক্কাতু) সামুদ্রিক পাখি

এই পাখি পানিতে ডুব দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভাসে।

৩৯২. الزلال (আয্-যুলাল) বরফের এক পোকা

এটা একটি পোকা যা বরফে লালিত-পালিত হয়, এটার শরীরে হলুদ বর্ণের ফোঁটা বিশিষ্ট হয়, আর পরিমাণের দিক হতে এটারা আঙুলের সমপরিমাণ। যেহেতু এটারা অধিক ঠান্ডা হয়; সেহেতু মানুষেরা এটাকে এটার বাসস্থান হতে বাহির করে তার পাকস্থলি পানি পান করে। এইজন্যে উপমা স্বরূপ ঐ পানিকে যুলাল বলে। ছিহাহ ছিত্তায় যুলালেল অর্থ আবে শীরি লিপিবদ্ধ আছে। আর এটাই জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ। সুতরাং সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ও আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্য হতে সম্মানিত এক সাহাবী তারা বলেন,

واسلبت وجهى لمن اسبلت + له المزن تحمل عذبا زلالا

"আমি সেই ব্যক্তির অনুগত ও অনুকরণ করি যার অনুগত সেই মেঘমালা করে যার মধ্যে আবে শীরি ভরপুর।"

কবি হারেছের পংক্তি—

قد كنت التى اسطو بها + ويدى اذا خان الزمان وساعدى

"তুমি আমার হাতিয়ার, হাত ও বাহু হও যার সাহায্যে আমি আক্রমণ করিব; যুগ যখন আমার প্রতি ভূমিকাহীন হবে।"

فرميت منك بضد ما املته + والمرء يشرق بالزلال البارد

"তখন আমি তোমারই সাহায্যে সে ব্যক্তির আশার বিরুদ্ধে তীর ছুড়িব যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভুল আশা পোষণ করে, আর মানুষ আগ্রহী ঠান্ডা পরিস্কার পানির প্রতি।"

অপর কবির পংক্তি—

ومن بك ذا فم مر مريض + يجد مر ابه الما الزلالا

"যে ব্যক্তির স্বাদ পীরিতের হেতু তিক্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তির নিকট আবে শীরি (মিষ্টি পানিও) তিক্ত অনুভব হয়।"

ওয়াজিহুদ্দাওলা আবুল মাতায়া ইবনে হাম্মাদানিল যার উপাধী যুলকারনাইন একজন উচ্চমানের কবি। ৪২৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

কতই না সুন্দর পংক্তি বলেছেন—

قالت لطيف خيال ذارتى ومضى + بالله صفه ولا تنقص ولا تزد

"এই মহিলা বলে যে, রাত্রিতে আমার হৃদয়ে কোন কিছুর চাহিদার আগমন হয় ও প্রস্থান হয়ে যাইতেছিল, অর্থাৎ আমি তা ভুলিয়া যাই, তাই তুমি আল্লাহর জন্যে তার বিশুদ্ধ পরিচয় দাও তা কি ছিল এবং তাতে কম-বেশি করিও না।"

فقال البصر نه لومات من ظما + وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

সেই সম্বোধিত ব্যক্তি উত্তর প্রদান করেন যে, আমি বুঝতে পারিয়াছি যে এটাই তার চাহিদা ছিল যার পিপাসায় কাতরাইতেছে যদি তাকে বলা হত যে, ঠান্ডা পানি পান করাইলে তা প্রস্থান করবে, তবে কখনও সে তার ইচ্ছা করবে না।"

قالت صدقت او فانى الحب عادته + يا برد ذلك الذى قالت على كبدى

এই উত্তর শ্রবণ করে সেই মহিলা বলে যে, তুমি সত্য বলেছ। ভালবাসার পূর্ণ অবস্থান তার স্বভাবে বিরাজমান। হায়! যদি তুমি আমার স্থান বেষ্টন করে থাকত।"

উল্লেখিত কবির উন্নত মানের পংক্তির মধ্য হতে এটাও একটি পংক্তি—

ترى الثياب من الكتان يلمحها + نور من البدر احيانا فيبليها

"তুমি দেখবে যে, এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড় কখনও চৌদ্দ তারিখের রজনীর জ্যোৎসনার আলো পড়ার দ্বারা পুরাতন হয়ে যায়।"

فكيف تنكر ان تبلى معاصرها + والبدر فى كل وقت طالع فيها

"তবে তুমি কীভাবে অস্বীকার করতে পার তার সম মর্যাদা সম্পন্ন এর প্রতি, অথচ তার চেহারার চন্দ্র, সর্বদা তার ভিতরে দ্বীপ্তিমান।"

অপর কবির পংক্তি—

لا تعجبوا من بلا عتلانه + قد زرازاره على القمرى

"তুমি তার কাপড় পুরাতন হওয়ার উপর অবাক হইও না কেননা চাঁদের আলো ঐ কাপড় পরার হেতু পুরাতন হয়েছে।"

আল্লামা দামেরী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত ঐসব পংক্তিগুলী দ্বারা এই বিষয় আলোকপাত হয় যে, চাঁদের আলো সূক্ষ্ম কাপড়ে পড়ার কারণে ঐ কাপড় পুরাতন হয়ে যায়, এটাই বিজ্ঞদের অভিমত। আর এই প্রতিক্রিয়া সেই সময় প্রকাশ পায়, যখন চন্দ্র সূর্যের একত্রিত হওয়ার মুহূর্তে কাপড় পানিতে রাখা হয়। আর ঐ ঐক্য বিশ তারিখ হতে ত্রিশ-এর মধ্যবর্তী সময়ে। তাই রয়িছুল হুকামা ইবনে সীনা স্বীয় পংক্তিতে তার প্রতি ইঙ্গিত করেন-

ولا تعسلن تبابك الكتانا + ولا تصد فيها كذا الحيتانا

"চাঁদের সুরুজের ঐক্য মুহূর্তে সূক্ষ্ম কাপড় ধৌত করবে না। এবং ঐ মুহূর্তে মৎস্যও ধরবে না।"

عند اجتماع النيرين تبلى + وذا صحيح فاتخذه اصلا

"কেননা ঐ মুহূর্তে ধৌত করার দ্বারা কাপড় পুরাতন হয়ে যায় এটাই সঠিক। এটাকে উছুল হিসেবে গ্রহণ করা।"

আল্লামা দামেরী (রহ) বলেন, চন্দ্র সূর্যের সমাবেশ মুহূর্তে ধৌত করা হতে পলায়ন করা উচিত।

শরীয়তে যুলাল

বরফের পোকার পানি পবিত্র।

৩৯৩. الزماج (আয-যুমাজ) এক পাখি

الزماج (রুমান এর ওজনে) একটি পাখি। কবি বলেন—

اعلى العهد اصبحت ام عمرو + ليت شعرى ام غالبها الزماج

"উম্মে আমর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কারিনী হয়েছে, আফসোস! যদি জানতে পারতাম কেন যুমাজ তার মূল্য বৃদ্ধি করেছে।"

৩৯৪. الزمج (আল যুম্মাজ) এক শিকারী পাখি

الزماج এটা একটি প্রসিদ্ধ পাখি। রাজা বাদশাহগণ এই পাখি শিকার করতেন। বযদরাবাসীদের নিকট এই পাখি অন্যান্য শিকারী পাখিদের চেয়ে দুর্বল মনে হয়, যার প্রমাণ তাদের চক্ষুও চালচলন দ্বারা বুঝা যায়। এটা তেজস্বীর সাথে শিকার করে, পাশাপাশি তার মধ্যে গাদ্দারী ও সন্ধি অপূর্ণকারীর দোষ বিদ্যমান কেননা তার স্বভাব ঘনত্বের প্রতি ধাবিত। তাকে যুগভর ট্রেনিং দিতে হয়। স্বভাবতঃই যমীনে শিকার করে, তার সৌন্দর্যতায় লালিমার প্রবেশ আছে। এটা বিচ্ছুরও একটি প্রকার। আবু হাতেমের ভাষ্য মতে এটা নর বিচ্ছু। কিন্তু লাইছ বলেন, এটা বিচ্ছু ছাড়া অন্য এক পাখি তার শরীরে লালিমার প্রাধান্য বিস্তার। অনারবীগণ এটাদেরকে দুই ভাই বলে; কেননা এটার ভিতর প্রশংসার গুণ সমাহার যে, যদি শিকার করার ক্ষেত্রে এটা অক্ষম হয়, তবে স্বজাতীয় ভাই এসে এটাকে সাহায্য করে এবং শিকার ধরিয়ে দেয়।

শরীয়তে যুম্মাজ

অন্যান্য শিকারী পাখিদের মত তাকে খাওয়া জায়েয।

চিকিৎসা. যুম্মাজ

এটার গোশত ধারাবাহিক ব্যবহার করলে হৃদকম্পন রোগ নিরাময় হয়। আর যদি তার পিত্ত সুরমায় মিশ্রণ করে চোখে ব্যবহার করা হয় তবে ঝাপসা দ্রষ্টা ও ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য অনেক উপকার সাধিত হয়। তার পায়খানার দ্বারা চেহারার দাগ শেষ হয়ে যায়।

৩৯৫. زمج الماء (যুম্মাজুল মাআ) কবুতর সাদৃশ্য পাখি

এই পাখিকে মিসরবাসী নুরস বলে। সাদা রং বিশিষ্ট ও কবুতরের সমপরিমাণ, অথবা তার অপেক্ষায় সামান্য বড় হয়। এটার বিশেষ অভ্যাস হল, এটা বাতাসে উপরে উঠে পানিতে ডুব দেয় এবং মাছ শিকার করে। সে মৃত কিছু ভক্ষণ করে না; মৎস্য এটার আহার।

শরীয়তে যুম্মাজুল মাআ

এটা খাওয়া হালাল, কিন্তু রুদইয়ানি জমেরী হতে বর্ণনা করেন যে, যত সব সাদা পাখি যারা পানিতে বাস করে তা খাওয়া হারাম। কারণ এটাদের গোশতে নাপাক থাকে এবং রাফে বলেন, বিশুদ্ধ মত হল, প্রাণীর সমস্ত পাখি হালাল। শুধুমাত্র সারস ব্যতীত যার বিস্তারিত বিবরণ লাম অধ্যায়ে আসবে ইনশাল্লাহ।

৩৯৬. الزنبور (আল জুম্বুর) ভিমরুল

এটা স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য এবং زنابير-ও ব্যবহৃত হয়। কখনও মৌমাছির উপরও ভিমরুলের প্রয়োগ হয়। এর বহুবচন زنابير আসে। ইবনে খালুবিয়াহ স্বীয় গ্রন্থে লিখেন যে, আমি এটার উপনাম সম্পর্কে শুধু আবু উমর ও যায়েদ ব্যতীত কার নিকট শুনি নাই। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর— (১) জাবালী (২) সাহলী।

জাবালী ঐ ভিমরুলকে বলে, যা পাহাড়ে বাস করে। সাহলী ঐ ভিমরুলকে বলে যা সমতল ভূমিতে বাস করে। ভিমরুল জন্মের শুরু লগ্নে পোকা সাদৃশ্য হয়; পুনরায় গঠন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ভিমরুলে রূপান্তরিত হয়। তা সাদা-কালো রং বিশিষ্ট, মৌমাছির মত ভিমরুলও চাক মাটিতে নির্মাণ করে। তাতে চারটি ফটক রাখে যেন চতুষ্পার্শ্বের বাতাস সেথায় পৌছে। এটারা হুল বিশিষ্ট যার সাহায্যে কর্তন করে। ফল-ফুল এটাদের খাদ্য। এটাদের নর-নারী পরিচয় হল, পুংলিঙ্গ ভিমরুল দেহের কিদ হতে স্ত্রীলিঙ্গ ভিমরুল অপেক্ষায় বড় হয়। এটা যমীন হতে মাটি বাহির করে স্বীয় চাক নির্মাণ করে। যেভাবে পিপীলিকা স্বীয় বাসা বানায়। এটারা শীতকালে মুখ ঢাকা দেয় কারণ যদি শীতকালে বাহির হয় তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এইজন্য যতক্ষণ শৈত্য প্রবাহ থাকে ততক্ষণ সে মৃত্যের মত শায়িত থাকে। পিপীলিকাদের মত শীতকালের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে না। যখন বসন্তকালের আবির্ভাব ঘটে তখন স্ব স্ব নিদ্রাস্থান হতে শুষ্ক লাকড়ী হয়ে বাহির হয়; আল্লাহ তাআলা তাদের শরীরে দ্বিতীয় বার রূহ প্রদান করে, এবং পূর্বের মত মোটা তাজা হয়। এটারা কয়েক শ্রেণীর এবং রং দেহে পরস্পরে ভিন্ন ধরনের হয়, কতকের শরীর লম্বা হয়, ভিমরুল লোভী ও অকল্যাণকর হয়। রান্না ঘরে গিয়ে যা কিছু দৃষ্টিতে পড়ে তাই আহার করে। মিষ্টি দ্রব্য ও টক ও ঝাঁজ যুক্ত পানীয় (সিরকার জন্য) জীবন কুরবান দেয়। যখন সিরকার সুগন্ধি দূর হতে এটার নাসিকায় পৌঁছে তখন বহুসংখ্যক সেথায় এসে একত্রিত হয়, এটা একটি ঘর ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে উড়তে থাকে, তার শরীর দুভাগে বিভক্ত। এজন্য যে, এটা পেট হতে শ্বাস গ্রহণ করে না, যদি এটাকে তৈলে ফেলিয়া দেয়া হয়। ততক্ষণ নড়াচড়া করতে না পারার কারণে নিরব থাকে যতক্ষণ সেথায় পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি এটাকে সিরকায় ফেলিয়া দেয়া হয়, তবে জীবিত হয়ে উড়িয়া যাবে। এটার উদ্দেশ্য এই যে, এটার জীবন লাভ ও উড়িয়া যাওয়ার খুবই আশা থাকে- এটারই সূত্র ধরে আল্লামা যমখশারী (রহ) সূরা আ'রাফের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, কখনও আশান্বিত বস্তুকে বাস্তব রূপ দেয়া হয়। অর্থাৎ যা ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাময়ী তাকে

এমন মনে করা হয় যে, তা হইয়া গিয়েছে। যেমন দুআর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের স্থলে অতীতের ছিগা ব্যবহার করা হয়।

অতএব এটার স্বপক্ষে তারা কবি হাসান ইবনে সাবিত আল আনছারী- এর ছেলে হযরত আব্দুর রহমানের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একদা আব্দুর রহমানের শৈশবকালে মৌমাছি তাকে হুল ফোঁটায়। সে ক্রন্দন করতে করতে তার সম্মানিত পিতা হযরত হাসান রাযি.-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন কাঁদছ? প্রতিউত্তরে বলে, ভিমরুল প্রাণী আমাকে হুল ফোঁটাইয়াছে। তা আমার হলুদ চাদরে শায়িত ছিল। একথা শোনে হযরত হাসান রহ. বলেন, يا بنى قلت الشعر আশাবাদী যে, তুমি অচিরেই একজন কবি হবে। এখানে কুল্লাত-এর অর্থ ছাতাকুলু অর্থাৎ মাজীর ছিগাকে মুস্তাকবেলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন এক কবি, ভিমরুল ও বাজ পক্ষী সম্পর্কে চমৎকার পংক্তি পাঠ করেন—

وللزنبور والبازى جميعا + لدى الطيران اجنحة وخفق

ভিমরুল ও বাজপক্ষী উভয়েই ডানা বিশিষ্ট। উড়ন্ত কালে তাদের হতে কম্পনের শব্দ বাহির হয়।

ولكن بين ما يصطادبار + وما يصاده الزنبور فرق

তবে বাজপক্ষী ও ভিমরুলের শিকারের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

শায়খ জহীর উদ্দীন ইবনে আসকার স্বীয় পংক্তিতে চমৎকার নৈপূন্য প্রকাশ করেন—

فى زخرف القول تزئلين لباطله + والحق قد يعتريه سوء تغيير

সাজানো কথা, যেন মিথ্যাকে সুসজ্জিত করা, আর সত্য কথার মন্দ ব্যাখ্যা যেন সত্য হতে দুরে অবস্থানের পরিচায়ক।

تقول هذا مجاج النحل تمدحه + وان ذممت فقل فى الزنابير

সুতরাং যখন তুমি মধুর প্রশংসা কর, তখন তুমি বল যে, এটা মৌমাছির মুখের লাল থুথু, আর যখন দোষ চর্চা কর তখন বল যে, এটা মৌমাছির বমি।

مدحا وذما غيرت من صفة + سحر البيان يرى الظلماء كالنور

কার প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যাই হউক মুখের গুণ পরিবর্তন এটা এমন শ্রেণীর যাদু যার দ্বারা অন্ধকারকে আলোকিত করা।

করফুদ দাওলা ইবনে মুনাক্কির ভিমরুল ও মৌমাছি সম্পর্কে বলেন---

ومعزدين ترنما فى مجلس + فنفاهما لأذاهما الاقوام

কোন সমাবেশে মৌমাছি ও ভিমরুল গুঞ্জন করছে। সমাবেশ সদস্যগণ কষ্ট পাওয়ার হেতু তাকে বাহিরে নিক্ষেপ করেছে।

هذا يجود بما يجود بعكسه + هذا فيحمد ذا وذلك يلام

মৌমাছি উপস্থিতি ভিমরুলের উপস্থিতির পরিপন্থী। মৌমাছি মধু প্রদান করে। আর ভিমরুল বিষ প্রয়োগ করে, তাই মৌমাছির প্রশংসা আর ভিমরুলের তিরস্কার করা হয়।

ইবনে আবিদদীনা মুখতারে তামেমী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা আমরা কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে বাহির হই। আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি ছিল সেই ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ও উমর রাযি. সম্পর্কে খারাপ চর্চা করছে। আমরা তাকে বুঝানোর সর্বোপরি প্রচেষ্টা করি, কিন্তু সে কোনক্রমেই পক্ষে আসে না। একদিনের ঘটনা যে, সে প্রয়োজনের চাহিদা পূরণার্থে জঙ্গলে যায় তখন সেথায় তাকে লাল ভিমরুল ঘিরিয়ে বসল, সে চিল্লাইল কিন্তু ভিমরুল তার পিছন ত্যাগ করে নাই, এমনকি তার মাংস নখের সাহায্যে আচড়াইয়া তাকে শেষ করে দেয়। এই ঘটনাই ইবনে সাবা শাফায়চ্ছুদুর গ্রন্থে লিখেন যে, সেথায় কিছু ইবারত বুদ্ধিও করা হয়েছে যে, আমরা তাকে দাফন করার লক্ষ্যে কবর খুঁড়িতে যাই; কিন্তু যমীন অত্যধিক শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, আমরা অক্ষম। যার দরুন আমরা যমিনে এমনি করেই ছেড়ে তাতে গাছের পাতা পাথর দ্বারা ঢাকি। তাদের হতে একজন বর্ণনা করেন যে, আমাদের মধ্য হতে একজন সেখানেই বসে প্রস্রাব করতে শুরু করে। এক ভিমরুল এসে ঐ প্রস্রাবের স্থানে বসে, কিন্তু তাকে হুল ফোঁটায় না। এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভিমরুলরা আল্লাহর পক্ষ হতে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের জন্যে আদিষ্ট ছিল।

হযরত ইবনে মুয়িন বলেন, ইয়ালা ইবনে মনসুর রাজী বড় উলামাদের মধ্যে অন্যতম এবং হযরত ইমাম মালেক(রহ) ইমাম লাইছ হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি নিজের ঘটনাই ব্যক্ত করেন যে, একদা আমি নামাযরত ছিলাম হঠাৎ একটি ভিমরুল এসে আমার মাথায় বসে। আমি তার প্রতি সাধারণত দৃষ্টি দেয় নাই, নামায হতে ফারেগ হইয়া দেখিতে পাই যে, আমার মাথা ফুলিয়া বড় হয়ে গিয়েছে, তার হুল ফোঁটানোর কারণে।

শরীয়তে ভিমরুল

এটা খাওয়া হারাম, মারা মোস্তাহাব। সুতরাং ইবনে আদী, মুসলিম ইবনে আলীর মধ্যস্থতায় হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. নির্দেশ প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি ভিমরুল হত্যা করল, সেই ব্যক্তি যেন তিনটি সওয়াব অর্জন করল। কিন্তু তার বাসা আগুন দ্বারা প্রজ্জলিত করা মাকরুহ। এটা খাত্তাবিরও অভিমত। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে এটাদের

বাসার নিচে আগুনের ধোঁয়া দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, যদি এটার দ্বারা কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে কোন দোষ নাই কিন্তু আমার নিকট ধোঁয়া দেয়া প্রজ্জলিত করার তুলনীয় উত্তম।

চিকিৎসায় ভিমরুল

যদি ভিমরুল তৈলে রাখা হয় তবে মারা যায় আর সিরকায় রাখলে জীবিত থাকে। যদি এটার বাচ্চা চাক হতে বাহির করে তৈলে ভাঁজিয়া পুনরায় তাতে সবজি ও গরম মশলা বিশেষের সাথে মিশ্রণ করে নেয় তাহলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদি ভিমরুলের হুল ফোঁটানোর ক্ষতস্থানে সবজীর নির্যাস মালিশ করে তবে প্রশান্তি লাভ করা যায়।

স্বপ্নে ভিমরুলের ব্যাখ্যা

স্বপ্নে ভিমরুল দেখা শত্রুতা, ক্ষুদ্র যুদ্ধ, দস্যু, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার অথবা হারাম সম্পদ অর্জনের প্রমাণ বহন করে। কখনও তা স্বপ্নে দেখার দ্বারা বিষ পান করার আলামত বা পূর্বাভাস।

৩৯৭. الزندبيل (আল যানদাবীল) বড় হস্তী

এই ব্যাপারে ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনের পংক্তি—

وجائت فريش قريش البطاح + اليناهم الدول الجالية

"আমাদের মাঝে মক্কা শরীফের কুরাইশ গোত্রের আগমন ঘটিয়াছে, আর এটা জাহিলিয়াতের সর্ব প্রকার রাজত্বের অবসান ঘটাইয়াছে।"

يقوم هم الفيل والزندبيل + وذو الضرس والشفة العالية

"আর এটাদের নায়ক হচ্ছে, আব্দুল মালেক ও আব্বান ইবনে বশীর এবং খান্দানে ইবনে মছলিমাহ মাখযুমী। এই পংক্তিতে ফিল ও যানদাবিল দ্বারা উদ্দেশ্য নেতা। আব্দুল মালেক ও আব্বান ইবনে বশীর যিনি বশীর ইবনে মারওয়ানের ছেলে। যিনি ইবনে হুবাইরাহের সাথে হত্যা করেছিলেন, যুদারছ, ও শাফাতুল আলীয়া দ্বারা উদ্দেশ্য খালেদ ইবনে মাছলামাহ মাখযুমী যিনি ফা ফা আল-কুফী নামে প্রসিদ্ধ। তার হতে মুসলিম এবং চারজন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন এই ব্যক্তি মুরজিয়াদের সাথে সম্পর্ক আর আলী রাযি.- এর প্রতি বিদ্বেষ রাখে। এই ব্যক্তিকে ইবনে হুবাইয়ার সাথে গ্রেফতার করা হয়েছে, এবং খলীফা আবু মনসুর তার রসনা কর্তন করে হত্যা করেন।

৩৯৮. الزهدم (আয-যাহাদামু) বাজ পাখির বাচ্চা

الزهدم (যা-এর উপর যবর হা সাকিন দাল-এর উপর যবর) যাহদম গাধা ও শক্তিশালী শিকারী পাখি ছাড়া অন্যান্য শিকারী পাখিকে বলা হয়। অন্য

উক্তিতে বাজ পাখির বাচ্চার নামও যাহদম। আর এই নামের সঙ্গ দিয়ে যাহদম ইবনে মুযাররব- এর নামকরণ করা হয়, যার হতে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী হাদীস বর্ণনা করেন, এবং বনী আব্বাসের দুই ভাইয়ের নাম যাহদামান অর্থাৎ যাহদাম ও করদম এই দুই ভাই সম্পর্কে কায়স ইবনে যুহাইর- এর এই পংক্তি পাঠ করেন—

جزانى الزهدمان جزاء سوء + وكنت المزيجزى بالكرامة

যাহদামান আমাকে অপমান করেছে অথচ আমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

৩৯৯. ابو زريق (আবু যুরাইক) চড়ুই সাদৃশ্য পাখি

ابو زريق চড়ুই সাদৃশ্য এক প্রকার পাখি। এটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যুরইয়াব-এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে। এই পাখি মানুষের সাথে মুহাব্বত রাখে। ট্রেনিং গ্রহণ করে। যে প্রশিক্ষণ এটাকে প্রদান করা হয়, তা দ্রুত শিক্ষা লাভ করে। কখনও এই গুণে তোতা পাখিকেও ছাড়াইয়া যায়, কেননা এটা তোতা পাখির তুলনায় সম্ভ্রান্ত বংশধর এবং যে শব্দ এটাকে শিক্ষা দেয়া হয় সেই শব্দ এমন স্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি করে- শ্রোতাগণ মনে করে যে, এটা মানুষ আবৃত্তি করছে।

শরীয়তে আবু যুরাইক

এটা খাওয়া হালাল; কেননা সে নাপাক কিছু আহার করে না।

৪০০. ابو زيدان (আবু যাইদান) এক জাতীয় পাখি বিশেষ

৪০১. ابو زياد (আবু যিয়াদ) গাধা

ابو زياد এটা গাধার একটি উপনাম। সুতরাং কোন এক কবির পংক্তি—

زياد لست ادرى من ابوه + ولكن الحمار ابو زياد

"আমার তো জানা নাই যে, যিয়াদের বাবা কে? তবে এতটুকু জানি যে, গাধা আবু যিয়াদ বা যিয়াদের পিতা।"

অপর কবির পংক্তি—

تحاول ان تقيم ابا زياد + ودون قباعه شيب الغراب

"যিয়াদ দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই তুমি চল কেননা সে কাক সাদা হওয়ার কালে দণ্ডায়মান হয়।"

باب السين
পরিচ্ছেদ : 'সীন'

৪০২. سابوط (ছাবুত) সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষ

৪০৩. ساق حر (ছাকিহির) পুং ঘুঘু পাখি

এই পাখিটি পংলিঙ্গ ঘুঘু পাখি হিসেবে কার দ্বিমত নেই। কিমিয়াত সাহেবের পংক্তি—

✪ ঘুঘু যখন গাছের ডালে বসে গান গায়, সঙ্গ দেয় তখন তার সাথে অন্য সকল পাখিরাও দৃষ্টিহীন তার কণ্ঠ মিলের সাথে।

বর্ণিত পংক্তিকে প্রথম ছিক দ্বারা ঘুঘু পাখি আর দ্বিতীয় ছিক দ্বারা বৃক্ষ শাখা উদ্দেশ্য।

হুমাইদ ইবনে সাওর হেলালী ছিকে হির সম্পর্কে বলেন-- (বঙ্গানুবাদ)

✪ উৎসাহিত করে নাই ঐ আগ্রহকে তবে একটি মাদী ঘুঘু মনতুষ্টির জন্য একটি পুরুষ ঘুঘুকে ডাকিয়া আনিল, অতঃপর উভয়ে একত্রে মিলিত হয়ে সমস্বরে গান গাহিতে শুরু করল।

✪ সেই ঘুঘুটি গলাবদ্ধ ও চমকিত কপাল বিশিষ্ট এবং গায়ক সাজে সে শীত-বসন্তের সুচনায় এবং বৃক্ষ শাখার বিদীর্ণ মুহূর্তে।

✪ সে গলাবদ্ধ কিন্তু তাবিজ পরিহিত নয়, এমনকি তার নিম্নদেশে ঝুলন্তও নয়।

✪ যখন বাতাস তাকে আন্দোলিত করে বা সে নিজেই আন্দোলিত হয়, তখন সে কাত হয়ে,কখনও সোজা হয়ে গান গাইতে থাকে।

✪ আমি অবাক যে, এমন সুমধুর কণ্ঠের গান সে কোথা হতে শিখিয়াছে? অথচ তার ওষ্ঠ এই উদ্দেশ্যে বানানো হয় নাই।

✪ আমি আদৌ এমন সুমধুর কণ্ঠ শুনি নাই, এমনকি এমন কোন আরবীর সাক্ষাতও পাই নাই যার কণ্ঠ অনারবীর মত হৃদয়গ্রাহী।

ইবনে সায়্যিদাহ বলেন, এই ঘুঘু পাখি তার কণ্ঠে ছাকি হির আওয়াজ সম্পর্কিত থাকার কারণে তাকে ছাকি হির বলে ডাকা হয়। কেননা, সে যখন গান গায় তখন তার মুখ হতে ছাকি হির ছাকি হির--- শব্দ বাহির হয়। এটারই ভিত্তিতে তাতে ইরাব বসে না। তাই গাইরি মুনছারিফ--- হিসেবে পড়া হয়। এটার বিস্তারিত আলোচনা ক্বাফ- পরিচেছদে ঘুঘু পাখির আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪০৪. السالخ (আছ ছালিখু) কালো সর্প

এর প্রয়োগ সাপসমূহের মধ্য হতে কালো সাপের ক্ষেত্রে হয়। আর এটার বিস্তারিত বিবরণ হামযাহ পরিচেছদের ইফতা এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

৪০৫. سام ابرص (ছাম্মু আবরাছ) বড় টিকটিকি

তাশদীদযুক্ত মীম। ভাষাবিদদের অভিমত যে, এটা একটি বড় ধরনের টিকটিকি। এই নামটি যৌথ দুইটি নামের মুরাককাবে একটি ইসিম বা নাম হয়েছে। এই শব্দদ্বয়কে উচ্চারণের দুইটি পন্থা অবলম্বনীয়। (১) হয়তো উভয়টি যবরের উপর মাবনীর ভিত্তিতে, যেমন— خمسة عشر। অথবা প্রথমটিকে মুরাব ধরিয়া দ্বিতীয় ইসিমের প্রতি ইযাফতের মাধ্যমে, আর মুযাফ ইলাই গায়রি মুনছারিফ হওয়ার ভিত্তিতে যবর বিশিষ্টই থাকবে।

এই শব্দ বর্তমান অবস্থায় দ্বিবচন ও বহুবচনও আসে না। যদি দ্বিবচন নেওয়া হয় তবে এভাবে বলা হবে যে, هذان ساما ابرص বহুবচন এভাবে যে, هؤلاء سوام ابرص অথবা পূর্ব সুরতে একটু ব্যতিক্রম করে বলা হবে যে, هؤلاء السوام শুধু ابرص বিলুপ্ত করেও বলা যায়। নিঃসন্দেহে هؤلاء البرصة বলা যায়। যেমন কবি স্বীয় পংক্তিতে উল্লেখ করেন—

والله لو كنت لهذا خالصا + ما كنت عبدا اكل الا بارصا

"আল্লাহর শপথ যদি এই লেনদেনে অকপট হতাম, তবে কখনও টিকটিকির ভর্তি করতে হত না।"

তাকে ছাম করে নামকরণ করার কারণ হল, আল্লাহ তাআলা তার ভিতরে ছাম অর্থাৎ বিষ রেখেছেন। আর আবরাস করে নামকরণের কারণ হল, তার শরীরে কুষ্ঠ রোগ সাদৃশ্য দাগ রয়েছে।

২য় আরও একটি কারণ হল, এ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য যে, যদি এটাকে লবণের সাথে মিলানো হয় তবে সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়।

ছাম্মু আবরাসের শরয়ী বিধান

এটা খাওয়া হারাম, যেহেতু তার মাঝে বিষ বিদ্যমান। যেহেতু এটাকে হত্যা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এটারা সেই সব প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত যেসব প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, যার দরুন এটা খাওয়া হারাম।

চিকিৎসায় ছাম্মু আবরাসের উপকারিতা

ছাম্মু আবরাসের রক্ত চুল পরা ব্যক্তির মাথায় মালিশ হিসেবে ব্যবহার করার দ্বারা চুল পরা বন্ধ হয়ে যায়। এটার কলিজা দাঁত ব্যথার প্রতিষেধক। আর যদি এটার গোশত বিচ্ছুর দংশিত স্থানে রাখা হয় তবে ব্যথার প্রশান্তি লাভ হয়। এটার চামড়া মাথার অপক্ক চুলে রাখা হয় তবে সেই রোগ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। আর যে গৃহে জাফরানের সুগন্ধি থাকে, সেই গৃহে এটারা প্রবেশ করে না।

ছাম্মু আবরাসকে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

এটাকে স্বপ্নে দেখা চোগলখোর, ফাছেক-ফাযেরের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আরতামিদুরুস এটাকে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা করেন দরিদ্রতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করার দ্বারা।

৪০৬. السانح (আছ ছানিহ) এক জাতীয় পাখি

এটা سنوح মাসদার হতে ইসমে ফায়েলের ছিগা। সুনুহ এর অর্থ বামপার্শ্ব দিয়ে আসা। তাই ছানিহ ঐ প্রাণীকে বলে, তাই হরিণ অথবা অন্য কোন পাখি যাকে শিকার করা হয়। যার শিকারীর বামপার্শ্ব দিয়ে আগমন করে। জাহিলিয়াত যুগে এই সব প্রাণীকে ধন্য মনে করত। আর যারা ডানপার্শ্ব দিয়ে আগমন করে, তাদেরকে বারিহ বলে। এসব প্রাণীদেরকে কু-লক্ষণ মনে করত। কেননা এই ভ্রান্ত আকিদা মানুষদিগকে ঐসব প্রাণী হতে অর্জিত উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। যার দরুন রাসূলুল্লাহ সা. কু-লক্ষণের নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঐ সব ভ্রান্ত আকিদার মুলোৎপাটন করেন এবং পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা প্রদান করেন যে, ছানিহের উপকার ও অপকারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আরবের প্রসিদ্ধ কবি লবিদের ভাষ্য—

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصا + ولا زاجرات الطير ما الله صانع

তোমার জীবনের শপথ! যেমনিভাবে প্রস্তর কংকরময় ভূমির অধিবাসীরা রাত্রিতে আগন্তুক সম্পর্কে অজ্ঞ, তেমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে ব্যক্তি পাখিদের তাড়াইয়া কু-লক্ষণ দূরীভূত করতে অজ্ঞ যে, আল্লাহ তাআলা কী করতে পারেন।

কু-লক্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 'তোয়া' ও 'লাম' পরিচ্ছেদে তাইর ও লকহা এর আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪০৭. السبد (আছ-ছুবাদু) অধিক চুল বিশিষ্ট পাখি

(সিনের উপর পেশ, বা-এর উপর যবর) এর বহুবচন سبدان আসে। কবি রাজিয বলেন—

اكل يوم عرشها مقيلى + حتى ترى المئزر ذالفضول

مثل جناح السبد الغسيل

আমি স্বীয় চক্ষুর পার্শ্ব খেকো যেন সে দুরবর্তী দৃশ্য দর্শন করতে পারে, যেভাবে পানিতে ভিজা বাহু আন্দোলিত করা যায়।"

ঘোড়ার যখন ঘর্ম আসে তখন আরববাসী ঐ পাখির সাথে তুলনা করে, অতএব, তুফাইলুল আমের বলেন كانه سبد بالماء مغسول।

৪০৮. السبع (আছ-ছুবউ) হিংস্র জন্তু

السبع (বা-এর উপর পেশ সাকিন)-এর প্রয়োগ সেসব প্রাণীর মধ্যে হয়, যেসব প্রাণী চিড়িয়া-ফাড়িয়া আহার করে। এর বহুবচন اسبع ও سباع আসে। যেসব স্থানে অধিক পরিমাণে হিংস্র জন্তু বাস করে সেসব স্থানকে ارض لسبعه বলা হয়। অর্থাৎ হিংস্র জন্তুবিশিষ্ট জমি। হাসান ইবনে হায়াত কালামে পাকের আয়াত পেশ করেন وما اكل السبع, যেথায় 'বা'-কে সাকিনের সাথে পড়েন, এটাই নজদ অধিবাসীদের ভাষ্য। সুতরাং হাচ্ছান ইবনে সাবেত আল আনছারী রাযি. উতবা ইবনে আবু লাহাব সম্পর্কে বলেন—

من يرجع العام الى اهله + فما اكيل السبع بالراجع

"অত্র বছর নিজের পরিবারের পার্শ্বে কে ফিরিবে? হিংস্র জন্তু থেকো ফিরতে পারে না।"

এই পংক্তিতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. اكيله السبع পড়েছেন। হিংস্র জন্তুকে আরবী ভাষায় سبع বলার কারণ হল, سبع-এর অর্থ সাত। সাধারণত পাখিরা মাতৃগর্ভে সাত মাস অবস্থান করে এবং জরায়ু সাতের উর্ধ্বে বাচ্চা প্রদান করে না এবং পুংলিঙ্গ পাখি সাত বছর বয়সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার যোগ্যতা রাখে। এই জন্য এটাকে سبع দ্বারা সংস্থাপিত করা হয়। আবু আব্দুল্লাহ ইয়াকুত হামুবী মুশতারিক গ্রন্থে লিখেন যে, আল গাবা একটি স্থানের নাম। যা মদীনা মুনাওয়ারা হতে চার মাইল দূরে শাম দেশের পার্শ্বে অবস্থিত। রাসূল সা.-এর গযওয়া সমূহের ধারাবাহিকতায় এটার নাম আসে। ঐ স্থানে রাসূল সা.-এর বরকতময় দরবারে হিংস্রদের একটি দল আগমন করে, যেন তিনি তাদের আহার নির্দিষ্ট করে দেন।

হাদীসে ছুবউ-এর উল্লেখ

তবকাতে ইবনে সায়াদ-এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানতাব হতে বর্ণিত যে, রাসূল সা. মদীনা মুনাওয়ারার অভ্যন্তরীণ সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে তাশরিফ আনলেন। ইতিমধ্যে একটি নেকড়ে বাঘ সম্মানিত দরবারে এসে উপস্থিত হল এবং রাসূল সা.- এর সামনে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় ভাষায় কিছু একটা বলতে শুরু করল। রাসূল সা. সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলিলেন যে, এটা হিংস্রদের বার্তাবাহক। সে তোমাদের নিকট আগমন করেছে। যদি তোমরা ইচ্ছা পোষণ কর তবে হিংস্রদের জন্যে কোন খাবার নির্দিষ্ট করে দাও। আর যদি ইচ্ছা না হয় তবে তাদেরকে বর্তমান অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং এটাদের হতে নিরাপদে

থাক। কেননা এটারা যা কিছুর সন্ধান পাবে তাই খাইতে শুরু করবে। এই কথা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের অভিপ্রায় নয় যে আমরা তাদের জন্য খাদ্য নির্দিষ্ট করি। এই উত্তর শোনার পর রাসূল সা. স্বীয় হস্ত মোবারকের তিনটি আঙ্গুলের সাহায্যে এটাদেরকে চালিয়া যাওয়ার ইঙ্গিত করার পর এটারা স্থান ত্যাগ করে চলিয়া গেল। যাল পরিচ্ছেদের ذئب শব্দের আলোচনায় নেকড়ে বাঘের বিস্তারিত বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।

বসরার নিকটবর্তী একটি স্থান ছাআ রাকাহ গোত্রের রাস্তায় সেথায় ওয়াইল ইবনে কাছেত আছমা বিনতে রুইয- এর পার্শ্বে অতিক্রমকালে সেই মেয়েটিকে দেখা মাত্র তার অন্তরে খারাপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা দেখে সেই মেয়টি বলল যে, যদি তুমি আমার সাথে মন্দ কর্মের ইচ্ছা পোষণ কর, তবে হিংস্রদিগকে ডাকিয়া লও। প্রতিউত্তরে সে বলল যে, আমি তো তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখিতেছি না। এটা শোনার পর সেই মেয়েটি নিজের সন্তানদিগকে এসব নামসমূহ দ্বারা ডাকতে শুরু করল। يا كلب হে কুকুর! يا ذئب হে বাঘ! يا فهد হে চিতা বাঘ! يا دب হে পোকা! يا سرحان হে বাঘ! يا اسد হে সিংহ! سبع হে হিংস্র! يا نمر হে চিতা! يا ضبع হে গাধা! এইরূপ আহ্বান শুনিয়া এটারা সকলেই হাতে তরবারী লইয়া দৌড়াইয়া আসল। সে এই ঘটনা দেখে বলে উঠে যে, ما هذا الا وادى السباع অর্থাৎ এটা তো হিংস্র এলাকা! ---- এটার পর হতেই সেই স্থানটি 'ওয়াদিয়ে ছাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ছহীহাইনে উল্লেখ আছে যে, রাসূল সা. মুসল্লিগণকে সিজদায় স্বীয় হাতকে হিংস্রদের মত বিস্তার করতে নিষেধ করেছেন।

তিরমিযী ও হাকীম রহ. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, জনাবে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন যে, ঐ সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ, লোকেরা হিংস্রদের সাথে কথোপকথনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তার চাবুক ও জুতার ফিতা তাদের সাথে কথোপকথন না করবে। সে তাকে ভবিষ্যদ্বানী করবে যে, তোমার অবর্তমানে তোমার পরিবারে কী কী নতুন বিষয় আবিস্কার হবে।

অতঃপর তিরমিযী ও হাকীম বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি হাসান ও ছহীহ এবং গরীবও। তবে আমরা এই হাদীসটি কাসেম ইবনে ফজল হতে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাকে হাদীস বিশারদগণ ছিকার অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

রাসূল সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করতে পারব কি না? প্রতিউত্তরে তিনি ইরশাদ করেন যে,- وبما افضلت السباع অর্থাৎ গাধার উচ্ছিষ্ট পানি হইতেও।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা। কেননা وبما افضلت السباع এর মধ্যে যে واو সে واو টি تصديق এর উপর প্রমাণ করে। যেমন আয়াতে কারীমার মধ্যেও এটার প্রমাণ বিদ্যমান যে, وثامنهم এর মধ্যে যে واو সেটি প্রবক্তাদের সত্যায়িত করার লক্ষ্যে এসেছে। ঐসব আসহাবে কাহাফ পরস্পরে আটজন ছিল।

উদাহরণস্বরূপ কেউ কেউ বলেন, زيد شاعر যায়েদ কবি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার বলেন, ফকিহও।

কুরাইশী স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ণ সৌন্দর্যের অবস্থা আলোকপাত করেন। একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অলৌকিকতার অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। একদা তাকে কোন হিংস্র জন্তুর সামনে রাখা হয়, তখন হিংস্র জন্তুটি আপনাকে শুঁকিতে থাকে। কিন্তু কোন ধরনের কষ্ট তাকে দেয় নাই। অতঃপর যখন সেই হিংস্র জানোয়ারটি চলে যায়, তখন লোকেরা সেই বুযুর্গকে প্রশ্ন করে যে, যখন হিংস্র জন্তুটি আপনাকে শুঁকিতে ছিল, তখন আপনার অবস্থা কেমন হইয়াছিল? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তখন আমি হিংস্রদের سور السبع অর্থাৎ হিংস্রদের উচ্ছিষ্ট পানির হুকুম সম্পর্কিত উলামায়ে কেরামগণের মতবিরোধের উপর গবেষণা করিতেছিলাম।

কথিত আছে যে, সুফিয়ান সাওরী রহ. শায়বানুর রায়ীর সাথে হজ্জে গমন করেন। পথিমধ্যে কোথাও একটি হিংস্র জন্তু তার দৃষ্টিতে পড়া মাত্র সুফিয়ান সাওরী শায়বান আর রায়ীকে বলেন, এই তো সামনে হিংস্র প্রাণী দণ্ডায়মান। শায়বা আর রায়ী তাকে বলেন, ভয় নাই। অতঃপর শায়বান ঐ হিংস্র জন্তুর নিকট গিয়ে তার কর্ণ ধরিয়া তাতে আরোহণ করেন আর সেই হিংস্র প্রাণীটি লেজ নাড়াইতে থাকে। হযরত সুফিয়ান সাওরী বলেন, আপনি এই কেমন প্রসিদ্ধির কাজ করলেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, যদি প্রসিদ্ধির ভয় না হত তবে আমি নিজের সকল উপকরণ বহন করাইয়া মক্কা মুকাররমা নিয়ে পৌঁছিতাম।

হাফেয আবু নাঈম বর্ণনাযুক্ত তালিকায় লিখেন যে, শায়বান আর রায়ী তার যদি কখনও ফরজ গোসলের প্রয়োজন হত, আর তার নিকট যদি পানি না থাকত, তবে তিনি আল্লাহর দরবারে পানির জন্য প্রার্থনা করতেন। অতএব মেঘমালার একটি খণ্ড তার উপর বৃষ্টি বর্ষন করত, আর তিনি গোসল করতেন। গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর মেঘমালা চলে যেত। আর যখন তিনি জুমার নামায পড়াইতে গমন করতেন তখন ছাগলদেরকে একটি বেষ্টনী জনিত রেখা টানিয়া গমন করতেন। নামাযান্তে প্রত্যাবর্তনকালে ছাগলদের ঐ রেখার ভিতরেই পাইতেন।

ইমাম আবুল ফরজ ইবনে জাওযী এবং অন্যান্যগণ উল্লেখ করেন যে, একদা ইমাম শাফী রহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. শায়বান আর রায়ী- এর পার্শ্ব অতিক্রম করিতেছিলেন। ইমাম আহমাদ বলেন, ঐ রায়ী (রাখাল)-এর প্রতি কিছু প্রশ্ন করতে ইচছা হয়। ইমাম শাফী রহ. বলেন, ভাবিতে সুযোগ দাও। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, অবশ্যই আমি প্রশ্ন করব। সুতরাং উভয় সঙ্গী একত্রে তার নিকট গিয়ে ইমাম আহমাদ তাকে প্রশ্ন করেন যে, এই মাসয়ালা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? যদি কোন ব্যক্তি চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযের নিয়ত করার পর মাত্র তিন রাকয়াত পূর্ণ করে চতূর্থ রাকয়াতে সিজদাহ করতে ভুলিয়া যায়, তখন তার হুকুম কী? প্রতিউত্তরে শায়বান তাকে প্রশ্ন করেন যে, তোমার মাযহাব অনুপাতে উত্তর দিব, না আমার মাযহাব অনুপাতে? হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, মাযহাব কি দুটি? শায়বান বলেন হাঁ, আমার মাযহাব একটি আর আপনার মাযহাব অন্যটি। আপনার মাযহাবের হুকুম হল, যেহেতু এই ব্যক্তি অন্তর কলঙ্কিত, সেহেতু তার উচিত যে, সর্বাগ্রে নিজের অন্তরকে শাস্তি প্রদান করবে, যেন ভবিষ্যতে এমনটি আর না হয়। পুনরায় ইমাম সাহেব তাকে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করেন— এক ব্যক্তির মালিকানায় চল্লিশটি ছাগল রয়েছে এবং এই সংখ্যায় এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে এটার উপর কী পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হবে? প্রতিউত্তরে শায়বান বলেন, আপনার মাযহাবে একটি ছাগল দেয়া ওয়াজিব। আর আমাদের মাযহাবে মনীবের উপস্থিতিতে গোলাম কোন বস্তুর মালিক নয়, যার দরুন তার উপর সামান্যও ওয়াজিব হবে না। এই উত্তর শোনার পর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বিষন্ন হইয়া অজ্ঞান হয়ে যান, জ্ঞান ফিরিয়া পাওয়ার পর উভয় ইমাম তার নিকট হতে বিদায় নেন।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমি কতক গ্রন্থে দেখেছি যে, ইমাম শাফী রহ. শায়বান আর রায়ীর নিকট গিয়ে বসে থাকতেন আর তার নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। দামেরী রহ. বলেন, শায়বানী অশিক্ষিত ছিলেন, আর অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যদি জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এমন সম্মানিত হয় তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে কত বড় সম্মানী হওয়া উচিত।

হযরত ইমাম শাফী রহ. বাতেন উলামায়ে কেরামগণের ফজিলতের পরিচায়ক ছিলেন। হযরত ইমাম শাফী রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. উভয়েরই বক্তব্য যে, যদি ধরায় ধর্মীয় উলামায়ে কেরাম আর আওলিয়াগণ না থাকেন, তবে কে থাকবে?

আবুল আব্বাছ ইবনে শুরাইহ যখন মানব সমাজে কোন সূক্ষ্মজ্ঞান আলোকপাত করতেন তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদেরকে সম্বোধন করে বলতেন যে, তোমরা কি অবগত যে, আমার এই সমৃদ্ধি কোন ব্যক্তি হতে অর্জিত হয়েছে?

পুনরায় বলেন, আমার যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা সবই হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর সংশ্রবের অবদান মাত্র। হযরত শায়বান আর রায়ী অধিকন্তু নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন—

يا ودود، يا ودود، يا ذو العرش المجيد المبدى يا معيد يا فعال لما يريد اسئلك بعزك الذى لا يرام وبملك الذى لا يزال وبنور وجهك الذى ملاء اركان عرشك وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك ان تكفينى شرا الظالمين اجمعين.

কোন কবি অলিদের প্রশংসনীয় একটি কবিতা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন যেথায় হযরত শায়বান আর রায়ীও অন্যতম। উক্ত কবিতার একটি পংক্তি হল—

شيبان قد كان راعى + وسر سره ما اختفى

সে ছিল দলের পর্যবেক্ষক, আর তার গুপ্ত ভেদ গোপন করা থাকে নাই।

فاجهد وخل الدعاوى + ان كان لك شيئ بان

তবে তুমিও অনুরূপ হওয়ার প্রচেষ্টা কর, এই শর্ত সাপেক্ষে কর, এই শর্ত যে, তোমার এটার সাধ থাকিতে হবে।

আওলিয়াদের ঘটনাবলী

১। রিসালাহ গ্রন্থে আওলিয়াদের কারামত অধ্যায়ে লিখেন যে, হযরত সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ তাশতরীর গৃহে একটি হুজরা ছিল। যাকে মানুষ বাইতুছ ছাবা বলে। হিংস্র জন্তুরা তার নিকট আসত, তিনি এটাদেরকে ঐ হুজরায় নিয়ে যাইতেন আর গোশত ইত্যাদি আহার করতেন। অতঃপর বিদায় দিতেন।

২। হযরত সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ তশতরীর যমীনে বসে বসে অন্য স্থানে যাওয়ার ঘটনাঃ কেফায়াতুল মুক্তাদার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি নিজেই বলেন, একদা আমি অজু করে জুমুআর নামায আদায় করার জন্যে জামে মসজিদে পৌঁছিলাম। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, মুসল্লিদের আধিক্যে মসজিদ ভরপুর, আর খতীব সাহেব মেহরাবে খুতবা দেয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করছেন। এমতাবস্থায় আমার পক্ষ হতে এই অভদ্রতা প্রকাশ পায় যে, আমি কাতার ভঙ্গ করে এবং মানুষের স্কন্ধ ডিঙ্গাইয়া সামনের কাতারে গিয়ে বসি। আমার দৃষ্টি ডান পার্শ্বে একটি যুবকের প্রতি পড়ে, যে যুবক সংকীর্ণ পকেট বিশিষ্ট স্বল্প মূল্যের চমৎকার পোশাক পরিহিত ছিল। তার শরীর হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। যখন সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহর মেজাজ কেমন? প্রতিউত্তরে বললাম যে, উদারময়ী। আমি এটা শ্রবণ করে মনের অতল গহ্বরে প্রশ্ন উত্থাপন করি যে, আমি তো এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ, আর সেই ব্যক্তির আমার নাম জানা আছে। আমি এমন চিন্তা-ধ্যাণে মগ্ন হই যে, হঠাৎ করে আমার

ভীষণ প্রস্রাবের তাড়ায় আমার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যদি আমি বসিয়া থাকি তবে আমার নামায হয় না। আর যদি সেই তাড়ায় সাড়া দেই তবে মুসল্লিদের মাথা ডিঙ্গায়া যেতে হবে। আমার এই করুন দৃশ্যটি সেই যুবকের দৃষ্টিতে পড়ে। জিজ্ঞাসা করা হল, কী সাহাল! প্রস্রাব করার প্রয়োজন আছে? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, এটা শুনিয়া নিজের হাঁটুর নিচ হতে একখানা কম্বল বাহির করে আমার উপর ছড়াইয়া দিয়ে বললেন, অতি দ্রুত প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও অযু সম্পন্ন করে নামাযে শরীক হইয়া যাও। এই দিকে যুবক আমার উপর কম্বল ছড়াইয়া দিল আর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়িলাম। অতঃপর আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসার পর চোখ খোলা মাত্রই একটি দরজা দেখিতে পাইলাম। কেউ বলল, আপনি ভিতরে চলে আসুন। হতে পারে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিবদ্ধ হবে। সুতরাং আমি দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম ও বিশাল আকৃতির এক মহল দেখতে পেলাম। যাতে রোপণ করা হয়েছে একটি খেজুরের বৃক্ষ, যার নিকটে বিদ্যমান রয়েছে একটি অজুখানা, যাতে পানি ভরপুর। আর সেই পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্টি। তার এক পাশে পানি প্রবাহিত হওয়ার একটি নালা স্থাপিত।

গোসলখানায় একটি তোয়ালে ঝুলানো আছে, আর তার তাকে রাখা আছে একটি মেসওয়াক। আমি কাপড় খুলিয়া গোসল সম্পন্ন করলাম এবং তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া শরীর শুকিয়ে কাপড় পরিধান করে নিলাম। অতঃপর আমি নিজ কানে শুনতে পেলাম যে, আওয়াজ আসিল, হে সাহল! তোমার প্রয়োজন পুরা হলে অবহিত করবে। আমি হ্যাঁ বললাম (অর্থাৎ আমার প্রয়োজন পুরা হয়েছে)। আমার জবাব শুনে ঐ তরুন আমার উপর হতে কম্বল উঠিয়ে নিল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি পূর্বের জায়গাতেই অবস্থান করছি। আর আমার অন্তরে বারবার এই বিষয়টিই জাগ্রত হইতেছিল যে, আসলে ব্যাপারটা কী?

অতঃপর নামাযের জামাত দাঁড়াইয়া গেল। আমি জামাতের সাথে নামায আদায় করলাম। কিন্তু আমার মনে শুধু ঐ বিষয়ের চিন্তা বারবার উদিত হইতেছিল যে, ঐ তরুন কে, তার পরিচয় কী? অতঃপর নামায শেষ করার পর আমি তার পিছনে পিছনে ছুটলাম। সে এক রাস্তা অতিক্রম করতে করতে আমাকে বলল, হে সাহল! যা কিছু আপনি দেখিতেছেন তার উপর আপনার দৃঢ় ইয়াকীন হয় নাই? আমি বললাম না (বিষয়টি এমন নয়)। এটা শুনিয়া ঐ তরুন বলল, আচ্ছা এখন আপনার দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম সেই পূর্বের মহল (অট্টালিকা) এবং পূর্বের দরজা। তোয়ালেটি ঐভাবে ঝুলানো আছে। মোদ্দাকথা প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, ঐখানে আমি ভালভাবে চোখ রগড়াইয়া অতঃপর চোখ খুলিয়া তাকাইয়া দেখলাম যে, সেখানে ঐ তরুন ও মহল কোনটিই নাই। আল্লামা দামেরী রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি এই আশ্চর্য ঘটনা আমার কিতাবে এই জন্য

অন্তর্ভূক্ত করেছি যে, আমাদের জামাত ব্যতিত কিছু লোক বুযুর্গদের কারামতকে অস্বীকার করে এবং তাঁদের মর্যাদার অবস্থান ব্যাখ্যা করে এভাবে যে, সম্ভবত অজ্ঞান অবস্থায় তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এটা একটি অবান্তর ধারা মাত্র। প্রকৃত কথা হল- আল্লাহর ওলীদের কারামত সত্য।

৩। আমাদের শায়েখ ইয়াফেকী হযরত সাহল সম্পর্কে অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াকুব ইবনে লাইছ যিনি খুরাসানের আমীর, তিনি এমন এক রোগে আক্রান্ত হলেন যে, দুনিয়ার সকল ডাক্তার তার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হল। (তাকে সুস্থ করা সম্ভব হল না)। সাধারণ লোকজন বাদশাহকে অবহিত করল, আপনার রাজ্যে এক পুণ্যবান ব্যক্তি আছে তাকে ডেকে এনে আপনি যদি আপনার রোগ মুক্তির জন্য দুআ করান, তবে আশা করা যায় আপনি এই কঠিন রোগ হতে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

আমীর জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ মহান ব্যক্তি কে? উত্তরে বলা হল, তিনি হলেন- সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত্ তছতরী র.। সুতরাং বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং রোগ মুক্তির জন্য তার নিকট দুআ প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার প্রার্থনা আপনার পক্ষে আল্লাহর নিকট কীভাবে কবুল হবে? আপনি তো সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচার-জুলুমের স্টীম রোলার চালান। আপনি হলেন জালিম। তাঁর এই বক্তব্য শুনে বাদশাহ তৎক্ষনাৎ তাওবা করলেন এবং এই অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও কার উপর জুলুম করবেন না। সুতরাং তিনি কারাগারে আবদ্ধ অনেক কয়েদীকে মুক্ত করে দেন, যাদেরকে অন্যায়ভাবে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল। তারপর সাহল বিন আব্দুল্লাহ বাদশাহর রোগ মুক্তির জন্য দুআ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যেমনি তাকে পাপের অপমান প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, ঠিক তেমনি আপনি তাকে আনুগত্যের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করান। এটা শুনামাত্র তিনি রোগমুক্ত হয়ে দাঁড়াইয়া গেলেন। অতঃপর বাদশাহ তাকে উপঢৌকন হিসেবে অনেক সম্পদ দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পথিমধ্যে লোকজন তাকে বলল, যদি আপনি ঐ সম্পদগুলী গ্রহন করতেন তাহলে তা দ্বারা দারিদ্র মানুষের অনেক উপকার করতে পারতেন। এটা শুনে তিনি বালু ও পাথর কণার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, ফলে তৎক্ষনাৎ তা মণি-মুক্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের যার যত প্রয়োজন এখান হতে উঠিয়ে নাও। তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, যার নিকট এই বৈশিষ্ট্য ও বুযুর্গী বিদ্যমান রয়েছে, তারা খুরাসানের বাদশাহর সম্পদের প্রতি কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

৪। কালবুল আ'ইয়ান গ্রন্থে এই জাতীয় আর একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যা শায়েখ ঈসা হুতাকেহ হতে বর্ণিত। একবার সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী

রহ. এক বেশ্যা মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাকে বললেন, আমি রাত্রের বেলা এশার নামাযের পর তোমার নিকট আসব। এটা শুনে ঐ মহিলা অত্যাধিক খুশী হল এবং সাজ-গোজ করে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় বসে রইল। কথামত এশার নামাযের পর তিনি ঐ বেশ্যার বাড়িতে পৌঁছিলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে চাইলে সে মহিলা বলল, আপনি কি চলে যাইতেছেন? আপনি আমার কাছে আসার লাভ কী? তিনি বললেন, আমার আসার উদ্দেশ্য যা ছিল তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। তিনি ফিরিয়া আসার পর ঐ মহিলার পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন আসল এবং পূর্বের পেশা পরিহার করে শায়েখ-এর হাতে তাওবা করে ভবিষ্যতে ঐ কাজ না করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। তারপর কোন এক ফকির ব্যক্তির সাথে ঐ মহিলার বিবাহ দিয়ে দিলেন। তারপর শায়েখ সাহেব তাদেরকে ওলীমার খানা পাকাইবার নির্দেশ দিলেন, আর (সালুন) তরকারী বাজার হতে ক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন। খাদেমগণ ওলীমার খানা তৈয়ার করে শায়েখের সামনে উপস্থিত করল এবং দরিদ্র মানুষগুলী ওলীমার দাওয়াত খাইতে বসে গেল। কিন্তু শায়েখ সাহেব কোন এক আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঐ মহিলার বিবাহের ওলীমার সংবাদ এমন এক বাদশাহ পাইলেন যার সাথে এই মহিলার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে রসিকতা করে দুই বোতল মদ দূত মারফত শায়েখ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আর দূতকে এই বলে পাঠাইলেন যে, আমি বিবাহের বিষয়ে জানিয়া খুব খুশি হইয়াছি। আর যেহেতু আমরা জানিয়াছি যে, ওলীমার জন্য সালুন নাই, তাই আমরা সালুন পাঠাইতেছি। যখন ঐ দূত শরাবের বোতলগুলী লইয়া আসল, তখন শায়েখ সাহেব বললেন, আপনি অনেক বিলম্ব করে ফেলিয়াছেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ যাবত তার অপেক্ষায় ছিলাম। অতঃপর শায়েখ সাহেব এক বোতল শরাব লইয়া তাকে খুব নাড়াচাড়া করলেন। তারপর যখন তাকে পিয়ালায় রাখা হল তখন তা উৎকৃষ্ট মানের মধু হয়ে বাহির হল।

এটার পর শায়েখ সাহেব দ্বিতীয় বোতলের সাথে পূর্বের আচরণই করলেন। এটাতে দেখা গেল মদের বোতল হতে স্বচ্ছ ঘি বাহির হয়ে আসিল।

শায়েখ সাহেব সেই দূতকেও খানা খেতে বসাইলেন। যখন সে খানা খাইতে বসল ও মধু পান করল, সেই মধু স্বাদে, গন্ধে ও রঙে এতটাই উৎকৃষ্ট মানের ছিল যে, ইতিপূর্বে সে আর কখনও এমন স্বাদের মধু পান করে নাই। দূত দাওয়াত খেয়ে ফিরিয়া গেল এবং বাদশাহর নিকট গিয়ে তার চোখের সম্মুখে ঘটিয়া যাওয়া সকল ঘটনা বর্ণনা করল। তার বক্তব্য বাদশাহ বিশ্বাস করতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি নিজে আসলেন এবং খানা খাওয়ার পর শায়েখ সাহেবের এই কেরামত দেখে অবাক হইয়া গেলেন এবং নিজের ভলের জন্য লজ্জিত হলেন। অতঃপর শায়েখ সাহেবের হাতে তাওবা করলেন।

৫। এই জাতীয় আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে যা এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে একটি কাঁটাদার বৃক্ষ হতে তাজা খেজুর খাইতেছে। আমি তার নিকটে গিয়ে তাকে সালাম করলাম। সে আমার সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে বলল, কাছে আস এবং তুমিও খাও। সুতরাং আমিও গাছ হতে খেজুর সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। কিন্তু খেজুর আমার হাতে আসার সাথে সাথে কাঁটায় পরিণত হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে ঐ ব্যক্তি মুচকি হাসলেন এবং বলতে শুরু করলেন, তুমি যদি নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করতে তাহলে তিনি তোমাকে পাক, খেজুর খাওয়াইতেন।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আল্লাহর ওলীদের কেরামতের ঘটনা অগণিত, যা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। যে পরিমাণ আমি এই কিতাবে বর্ণনা করলাম তা বিশাল সমুদ্র হতে এক ফোঁটা পানি উঠানোর মত। উপরোল্লিখিত সকল ঘটনা বর্ণনার সারমর্ম হল আল্লাহর ওলীদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকিকত হল- এক বৃদ্ধা মহিলার মত যার নিকট হতে তিনি সেবা গ্রহণ করেন।

৬। শায়খ আবুল গাইস-এর ঘটনা। একবার তিনি লাকড়ি কুড়াইবার জন্য জঙ্গলে গেলেন। লাকড়ি কুড়াইতেছিলেন এমন সময় এক হিংস্র প্রাণী তার গাধাকে আক্রমন করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। তিনি এ দৃশ্য দেখে হিংস্র প্রাণীকে সম্বোধন করে বললেন- স্বীয় রবের সম্মানের কসম করে বলি, আমিও লাকড়ির গাট্টিটি (বোঝা) তোমার পিঠে উঠিয়ে নিয়া যাইব। এ কথা শুনিয়া প্রাণীটি কোমর ঝুঁকাইয়া দিল। তিনি হিংস্র প্রাণীর উপর লাকড়ির বোঝা উঠিয়ে শহরে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়ে তার পিঠ হতে বোঝা নামাইয়া ঐ প্রাণীকে বিদায় করে দিলেন।

৭। বর্ণিত আছে যে, শাওয়ানাহ এক বাচ্চা জন্ম দিল। সেই বাচ্চাকে তারা উত্তমরূপে লালন পালন করিতে লাগল। যখন ঐ বাচ্চা বড় হল তখন একদিন তার পিতাকে বলতে লাগিল- আব্বাজান! কত সুন্দর হত যদি আপনি আমা ক আল্লাহর পথে দান করে দিতেন। ছেলের এই আরজি শুনিয়া পিতা জবাবে বলল, বাদশাহর সেবায় সেই সকল লোককে নিযুক্ত করা হয়, যারা ভদ্র ও মুত্তাকী হওয়ার যোগ্য হয়। আর তুমি তো অল্প বয়স্ক মানুষ, তোমার দ্বারা কী কাজ নেওয়া যাবে? সুতরাং এই সময় এটা সম্ভব নয়।

ছেলে পিতার জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল। একদিন সে গাধা নিয়ে লাকড়ি কুড়াইতে চলে গেল। গাধাটাকে কোথাও বেঁধে লাকড়ি কুড়াইতে শুরু করল। লাকড়ি সংগ্রহ করে যখন গাধার কাছে আসল তখন সে দেখতে পেল যে, এক হিংস্র প্রাণী গাধাকে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। তখন সে বলল, স্বীয় রবের শপথ! তোমার উপরে লাকড়ি উঠিয়ে নিয়ে যাব। হিংস্র প্রাণীটি সম্মুখে মাথা বাড়য়ে দিয়ে বসে গেল। আর লাকড়ির বোঝা তার পিঠের উপর

উঠিয়ে দিয়ে সম্মুখে মাথা বাড়াইয়া দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসল এবং দরজার সামনে স্তুপ দিতে লাগিল। অতঃপর তার পিতা দরজা খুলিয়া দেখে যে, হিংস্র প্রাণীর উপর লাকড়ির বোঝা বাঁধা। তার মাতাও এই দৃশ্য দেখে বলল, বৎস! এখন তুমি বাদশাহর খেদমত করার যোগ্য হয়েছো। সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিলাম। তার মায়ের বক্তব্য শোনার পর ছেলে মায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

৮। মুনাকেবে আবরাব গ্রন্থে প্রণেতা শাহ কিরমানী সম্পর্কে লিখেছেন, একদা তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হলেন এবং শিকারের খোঁজে জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে গেলেন। সেখানে তার সাথে এক যুবকের সাক্ষাৎ ঘটল, যিনি কোন হিংস্র প্রাণীর উপরে আরোহী ছিলেন। তার চার পার্শ্বে অনেক হিংস্র প্রাণী অবস্থান করিতেছিল। যখন হিংস্র প্রাণীরা বাদশাহকে দেখিল তখন তাকে আক্রমন করতে চাইল। কিন্তু ঐ যুবক তাদেরকে বাঁধা দিলেন। ইত্যবসরে একজন বৃদ্ধলোক আগমন করল, যার হাতে ছিল শরবতের পিয়ালা। ঐ বৃদ্ধ লোকটি শরবতের পিয়ালা সেই যুবককে দিয়ে দিল।ঐ যুবক শরবত পান করল এবং বাকি যা অবশিষ্ট ছিল তা বাদশাহর হাওলা করে দিল। বাদশাহ ঐ শরবত পান করে বলল, আমি এমন সুস্বাদু ও মিষ্টি শরবত ইতিপূর্বে আর কখনও পান করি নাই। এটার পর ঐ বৃদ্ধলোকটি উধাও হয়ে গেল। আর সেই যুবক বাদশাহকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, এই বৃদ্ধলোকটি দুনিয়া ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। আমার যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন হয়, আর আমার মন তা কামনা করে, এই বৃদ্ধলোকটি তা লইয়া এসে আমাকে দিয়ে যায়। এটা শুনে বাদশাহ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এটার পর বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে ঐ যুবক বলল, আপনার কি এই বিষয়ে ধারণা নাই যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে এই কথা বলে দিয়েছেন যে, হে দুনিয়া! যে আমার খেদমত করবে, তুমি তার খেদমত কর। আর যে ব্যক্তি তোমার খেদমত করে তুমি তাকে তোমার গোলাম বানাইয়া লও। এটার পর যুবক বাদশাহকে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ দান করলেন, যা তার তাওবার কারণ (উপকরণ) হয়।

৯। ইহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইবরাহীম আরকা হতে বর্ণিত ,তিনি বলেন, আমি ابو الخير الديلمى التيناتى-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। যখন আমি তার নিকট পৌছিলাম তখন তিনি মাগরিবের নামায আদায় করতে ছিলেন। আমি দেখলাম যে, তিনি সূরা ফাতিহা বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করছেন না। তার ব্যাপারে আমার এই ধারণা ছিল যে, আমার সফরটাই বোধ হয় ব্যর্থ। কারণ জঙ্গলে এমন ব্যক্তির নিকট হতে আমি কি শিক্ষা গ্রহণ করব? তবুও সেখানে রাত্রি যাপন করলাম। যখন সকাল হল আমি ইস্তিঞ্জা করতে বাহির

হলাম, তখন দেখলাম এক বিশাল হিংস্র প্রাণী আমাকে আক্রমণ করতে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি ফিরে এসে বিষয়টি শায়খ আবুল খায়ের দাঈলাগী রহ. কে অবহিত করলাম। এটা শুনে শায়খ বাহিরে আসলেন এবং হিংস্র প্রাণীকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি নাই যে, আমার-মেহমানদিগকে কষ্ট দিবে না?

হিংস্র প্রাণীটি এটা শুনে চলে গেল। আমি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে ফিরে আসলাম, তখন শায়খ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার প্রকাশ্য অবস্থাকে ঠিক করতে মনোযোগ দাও, তাই তোমরা হিংস্র প্রাণীকে দেখে ভয় পেয়ে থাক। আর আমি অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করতে মনোযোগ দেই, তাই বাঘ, সিংহ আমাকে ভয় পায়।

ইমাম আল্লামা জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আসয়াদ আল-ইয়াফিয়ি আল্লাহর ওলীদের কারামত বর্ণনা করতে গিয়ে কবিতা লিখেছেন—

هم الاسد ما الاسد الاسودتها بهم + وما النمو ما اظفار فهدونابه

তারা সিংহ এবং সিংহ কি? তারা সিংহকে ভয় পায় এবং চিতা বাঘ কি? চিতা বাঘের নখ এবং তার বিষ দাঁত কি?

وما الرمى بالنشاب ما الطعن بالقنا + وما الضرب بالماضى الكهى ما ذبابه

তীর চালনা করা কী এবং কামান হতে তীর নিক্ষেপ করা কী? তলোয়ারের ফলা দ্বারা হতাহত করার পরিস্থিতি কী?

لهم هم للقاطعات قواطع + لهم قلب اعيان المراد انقلابه

প্রশংসিত ব্যক্তিদের হিম্মত কী? তাদের সাহস কুচকাইয়া যাওয়ার মত। আর তাদের অন্তর ভীরুত্বের খনি।

لهم كل شيئ طائع ومسخر + فلا قط يعصيهم بل الطوع دابه

প্রতিটি বস্তু তাদের মুখে আনুগত্যের মাথা নত করে, কোন বস্তুই তাদের অবাধ্যতা করে না। বরং তাদের অবস্থা হল আনুগত্য করা।

من الله خافو الاسواه مخافهم + سواه جمادات الورى ودوابه

তারা আল্লাহর পবিত্র সত্তা ব্যতীত আর অন্য কিছুকে ভয় পায় না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সমস্ত জিনিস তাদের নিকট জড় পদার্থ ও চতুষ্পদ জন্তুর মত। এটারা তাদেরকে দেখে ভয় পায়।

لقد شمروا فى نيل كل عزيزة + ومكرمة ما يطول حسابه

তারা সর্ব প্রকার বুযুর্গী ও সম্মান হাসিল করার পিছনে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। যার পরিমাণ নির্ণয় করা মানুষের চিন্তাশক্তির বহির্ভূত।

الى أن جنوا ثمر الهوى بعد ما جنى + عليهم وصار الحب عذبا عذابه

তারা নিজেদের প্রবৃত্তির সকল ফলাফল হাসিল করেছে, প্রতিটি মনের বাসনা তাদের জন্য সুমিষ্ট পানির মত প্রতীয়মান হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.- এর প্রতি ওহী পাঠাইলেন যে, হে দাউদ! তুমি আমাকে এমন ভয় করতে থাক, চিড়িয়া ফাড়িয়া খায় এমন হিংস্র প্রাণী হতে যেমন ভয় করা হয়। এটার অর্থ হল, আমার ভীতি প্রদর্শনকারী গুণাবলী অর্থাৎ বুযুর্গী, মাহাত্ম্য, বড়ত্ব, কঠোর, কঠিন এই সকল গুণাবলীর প্রতি এমন ভয় করতে থাক যেমন ক্ষতিকারক কোন হিংস্র প্রাণীর কঠিন দেহ, ভয়ানক বিষদাঁত, নিষ্ঠুর আত্মা ও ভয়ানক আকৃতি দেখে ভয় পাও।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমাদিগকেও আল্লাহ তাআলাকে এমন ভয় করতে হবে, যেমন ভয় করা দরকার। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়ার সমস্ত কিছু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, দুনিয়ার সব কিছু তার আনুগত্য করে।

হিংস্র প্রাণীর শরয়ী বিধান

হিংস্র প্রাণীর শরয়ী হুকুম 'হামযাহ'- এর পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা মাকরূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা হতে নিষেধ করেছেন। আর অনর্থক হিংস্র প্রাণীর বেচাকেনা করা বিধিসম্মত নয়। তবে যে সকল হিংস্র প্রাণী হতে উপকৃত হওয়া যায়, সেগুলীর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে।

৮০৯. السبنتى والسبندى (আছ-ছিবানতী ওয়াছ ছিবানদী)

চিতা বাঘ

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি.- এর ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে জান্নাতকে তার উপর ক্রন্দন করতে শোনা গিয়েছিল। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছেন—

أبعد قتيل بالمدينة أظلمت + له الارض تهتز العضاه بأسوق

কি ঐ ব্যক্তির পর যারা মদীনায় নিহত হয়েছে, হযরত ওমর এবং যাদের জন্য সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাছন্ন হয়ে গিয়েছে, বড় বড় খেজুর বৃক্ষ, শস্য-শ্যামলও আন্দোলিত হতে লাগিল।

جزى الله خير امن امام وبارکت + يد الله فى ذاك الاديم الممزق

আল্লাহ তাআলা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাযি.-কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং তাঁর শরীরের ঐ চামড়াও যা খঞ্জরের দ্বারা ছিলানো হয়েছিল।

فمن يسع أبركب جناحى نعامة + ليدرك ما قدمت بالامس يسبق

যে ব্যক্তি দ্রুত চলে অথবা উট পাখির বাহুর উপর আরোহণ করে চলে, যাতে সে ঐ আমলসমূহ হাসিল করে যা ওমর রাযি.- এর সময়ের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তবে সে ওমর রাযি. হতে পিছে পড়িয়া থাকবে।

قضيت امورا ثم عادرت بعدها + بوائق اكمامها لم تفتق

তিনি তাঁর খিলাফত আমলে অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর পরে তার দাসদের মধ্যে এমন মুসিবত রেখে দিলেন, যা আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

وما كنت اخشى ان تكون وفاته + يكفى شبنتى ازرق العين مطرق

আমার এই ভয় ছিল না যে, তার মৃত্যু এক অত্যাচারী, নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী চিতা বাঘের মাধ্যমে হবে।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আল্লামা জাওহারী ঐ পংক্তিগুলীকে (সিমাখ)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অথচ এই কবিতাগুলী তার সম্বন্ধে ছিল না। সিমাখ ছিল তিন ভাই, আর তিন ভাই-ই ছিলেন কবি। (চিতা বাঘের বর্ণনা نون পরিচ্ছেদে نمير এর বর্ণনায় আসবে।)

৪১০. السبيطر (আছ-ছুবাইতর) একটি পাখির নাম

السبيطر একটি পাখির নাম। سين ও ياء এর উপর যবর। ঐ طاء مهمله দুটির মধ্যে ياء এবং راء মুহমালাহ। তার শেষ العنثيل এর ওজনে। একটি পাখি, যার ঘাড় লম্বা হয়। সবসময় তাকে পানির উপরে দেখা যায়।

আল্লামা জাওহারীর ভাষ্যমতে তার উপনাম ابو العيزار। আইন পরিচ্ছেদে العنثيل এর বর্ণনায় তার বিস্তারিত বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪১১. السحلة (আছ-ছাহলাহ) খরগোস-এর বাচ্চা

খরগোসের ছোট বাচ্চাকে বলে, যে তার মা হতে পৃথক হয়ে স্বাভাবিক চলে ফিরে নিজের খাবার নিজে সংগ্রহ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

৪১২. السحلية (আছ-ছুহলাইয়াহ) টিকটিকির সাদৃশ্য একটি প্রাণী

السحلية টিকটিকির সাদৃশ্য একটি প্রাণী। سين-এর উপর পেশ হবে। ইবনে সালাহ এর ভাষ্যমতে, টিকটিকের সাদৃশ্য অথবা তা হতে বড় এক প্রকার

প্রাণী। আর-রাওজা কিতাবের মধ্যে তাকে টিকটিকির মত এক প্রাণী বলে গণ্য করা হয়েছে। তাকে খাওয়া হারাম। তার বিস্তারিত বর্ণনা عين পরিচ্ছেদে العظاية এর বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪১৩. السحا (আছ-ছাহা) বাদুড়

السحا এর সিনের উপর যবর অর্থ বাদুড়। তার অন্য একটি নাম نضير ابن شميل, আর এটার একবচন السحاة আসে। বাদুড়ের বর্ণনা خا পরিচ্ছেদে خفاش শব্দের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

৪১৪. سحنون (ছাহনুন) একটি পাখির নাম

سحنون সিনের উপর যবর ও পেশ দুইটাই পড়া যায়। এটা একটি পাখির নাম। যে মেধার দিক হতে অনেক প্রখর তথা প্রখর মেধার অধিকারী। যেহেতু سحنون এর অর্থ زبرك তথা বুদ্ধিমান, সুরিপুর্ণও আসে, সেহেতু এই পাখিকে এই নামে ভূষিত করা হয়। سحنو بن سعيد التوخى কে এ নামে ডাকা হয়। অথচ তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুস সালাম, যিনি ছিলেন ইবনে কাশিম-এর শিষ্য। যিনি মৃত্যুবরণ করেন ২৪০ হিজরীর রজব মাসে। আর ১৬০ হিঃ রমজান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।

৪১৫. السخله (আছ-ছাখলাহ) বকরীর বাচ্চা

الخسله বকরীর বাচ্চাকে বলে। তাই বকরী হতে আসুক বা ভেড়া হতে, নর হউক বা মাদী হউক সর্বাবস্থায় তাকে سخله বলা হয়। তার বহুবচন سخل، سخال হয়ে থাকে। যেমন কবির ভাষায়—

فللموت تغذوا الوالدات سخالها + كما الدور تبنى المساكن

বকরী নিজের বাচ্চাকে মৃত্যুর জন্য খাদ্য দিয়ে থাকে- যেমন কোন বাসস্থান নির্মাণের পর হতে ধ্বংসের জন্যই নির্মাণ করা হয়। অন্য আরেকটি কবিতা এই কবি হতেই রচিত------

اموالنا لذى اميراث نجمعها + ودورنا لخراب الدهر نبينها

আমরা স্বীয় ধন-সম্পদ নিজের সন্তানদের জন্যই সঞ্চয় করি, এবং আমাদের বাসস্থান নির্মাণের সময় হতে তা নষ্ট হওয়ার জন্যই নির্মাণ করি।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, যদিও বাসস্থান নির্মাণের উদ্দেশ্য তা ধ্বংস করা

থাকে না, অবশ্য তার ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হওয়াই হইয়া থাকে। সুতরাং কবির ভাষায়—

فان يكن الموت أفناهم + فللموت ما تلد الوالدة

যদিও মৃত্যু তাকে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু মাতা যে সন্তান জন্ম দেয় তা মৃত্যুর জন্যই জন্ম দেয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির পরিশেষ হল মৃত্যু।

আবু যায়েদ বর্ণনা করেন, বকরীর বাচ্চা চাই নর হউক বা মাদী, যখন সে নিজের মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাকে ছাখলাহ বলা হয়। আর যখনি তার বয়স হয়ে বড় হতে থাকে, তখন তার নামও পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং ছাখলাহ পরবর্তী সময় তা বলা হয়। যা একবচনে আসে। আর যখন চার মাস হয়ে দুধ ছাড়িতে থাকে তখন তাকে جفر বলা হয়। এরপর নিম্নেরগুলী ধারণ করে—

(১) যখন একটু বড় হয়ে শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মাঠে বিচরণ করে খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায় তখন তাকে عريض বলা হয়। আর এই সময় নরকে হাদী এবং মাদীকে ইনাফ বলা হয় এবং অন্য নামেও ডাকা হয়। আর ঐ নাম ততক্ষণ পর্যন্ত চালু থাকে যতক্ষণ না এক বছর পূর্ণ হয়।

(২) আর যখন পূর্ণ এক বছর হয়ে যায়, তখন নরকে تيس এবং মাদীকে عنز বলে।

(৩) আর যখন দু বছর পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দাঁত পড়িতে থাকে, তখন নরকে جذع আর মাদীকে جذعة বলে।

প্রকাশ থাকে যে, السخلة-এর আলোচনা হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে।

হযরত ইমাম আহমাদ ও আবু ইয়ালা মুসিলী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে এক হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাকে তার মালিক খোস-পাচড়ার কারণে ঘর হতে বের করে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, দেখ এই বকরীর বাচ্চা তার মালিকের নিকট যেমন তুচ্ছ, দুনিয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চেয়েও তুচ্ছ।

হযরত বাযযার রহ. মুছনাদ কিতাব-এর মধ্যে আবু দারদা রাযি. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. কোন এক সম্প্রদায়ের ময়লার স্তুপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেছিলেন, যেখানে একটি মৃত বকরীর বাচ্চা পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে দেখে বলেন, এই মৃত বাচ্চার মালিকের কি ইহার কোন প্রয়োজনই নাই?

তখন সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মালিকের যদি এই বাচ্চার প্রয়োজন হত তবে তাকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. শপথ করে বলেন, এই মৃত বাচ্চা তার মালিকের নিকট যেমন তুচ্ছ ও মূল্যহীন, ঠিক তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ ও মূল্যহীন আল্লাহর নিকট দুনিয়া। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা দুনিয়ার সাথে মুলাকাত করবে না।আর যে দুনিয়ার সাথে মুলাকাত করবে সে ধ্বংস করবে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে।

উসরাতে ইবনে হিসামে উল্লেখ আছে- যখন রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গী হয়ে বদরের যুদ্ধে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, পথিমধ্যে এক গ্রাম্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত ঘটে। সাহাবায়ে কেরাম ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট হতে বিরোধী কাফিরদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যাতে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সম্পর্কে গ্রাম্য ব্যক্তি কিছুই জানত না। সাহাবাগণ ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সা.-কে সালাম কর। তখন গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, তোমাদের সাথে কি রাসূলুল্লাহ সা.-ও উপস্থিত আছেন? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, তখন সে রাসূলুল্লাহ সা. কে সালাম করল এবং বলতে শুরু করল, আপনি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাসূল হন, তবে অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে, আমার উটনীর পিঠে কী? তখন সালমা বিন সালমা ইবনে ওয়াক্কাস যে তখন ছোট বাচ্চা ছিল, সে বলতে শুরু করল, তুমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে এই জাতীয় প্রশ্ন করবে না এবং আমার সম্মুখে আস, আমি বলে দিব উটের পিঠে কী আছে। তার পেটে একটি سخلة (বাচ্চা) আছে। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. সালমা বিন সালমা ওয়াক্কাসকে বললেন, তুমি চুপ থাক, তুমি তার সম্মুখে অশ্লীল কথা বলিতেছ? অতঃপর তিনি সালমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আল্লামা হাকেম মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীসকে কিছু অংশ অতিরিক্ত করে বর্ণনা করেন। আর ঐ অতিরিক্ত অংশ হল, রাসূলুল্লাহ সা. সালমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবার পর তার সাথে আর কথা বলেন নাই। মাকামে রাওহা এর মধ্যে মুসলমানগণ লোকদের সাধুবাদ জানাইলেন, তখন সালমা বিন সালমা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট মুবারকবাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা.- এর উত্তরে বললেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচক্ষণতা রয়েছে, আর তা শুধু ঐ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই জানে। অতঃপর হাকিম ঐ হাদীস উল্লেখ করার পর বললেন, এই হাদীসটি সহীহ মুরসাল।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন বিচক্ষণতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর বক্তব্য হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, মানুষের মধ্যে সবচাইতে বিচক্ষণ তিন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন। এরা—

(১) আযীয মেছের অর্থাৎ মিশরের সম্রাট যখন ইউসুফ আ.-কে দেখলেন তখন তার বিচক্ষণতার সাহায্যে ইউসুফ আ.-এর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো স্বীয় স্ত্রীকে বলেছিলেন, এটাকে অত্যাধিক সম্মানের সাথে লালন-পালন কর। হতে পারে সে আমাদের অনেক বড় উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে লইব।

(২) হযরত শুয়াইব আ.-এর ঐ কন্যা, যিনি হযরত মূসা আ.-কে দেখে পিতাকে বলেছিলেন, يابت استاجروه হে পিতা! তাকে আমাদের কৃতদাস হিসেবে নিয়োগ করুন। কারণ তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

(৩) হযরত আবু বকর রাযি. যখন তিনি হযরত ওমর রাযি.-কে তাঁর ইন্তে কালের সময় নিজের স্থলাভিষিক্ত এবং খলীফা নির্বাচন করেছেন।

এটার পর হাকিম লিখেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঐ বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

বকরীর শরয়ী বিধান

বকরীর বাচ্চা যদি কুকুরের দুধ দ্বারা লালিত পালিত হয়, তবে তার বিধান হল جلالة প্রাণীর বিধান- এর অনুরূপ। অর্থাৎ তার ব্যবহার মাকরূহ। এক বর্ণনা অনুযায়ী (كراهت تنزيه) যাকে (الشرع الكبير ورضه) এর লিখক এবং المنهاج-এর লিখক গ্রহণ করেছেন। আর এ মতের প্রবক্তা ইরাকের উলামায়ে কেরাম।

جلالة ঐ প্রাণীকে বলে যারা ময়লাযুক্ত স্থানে বিচরণ করে, চাই তা উট হউক, বলদ অথবা গাভী-মুরগি হউক না কেন।

جلالة এর শরয়ী বিধান دال পরিচ্ছেদের الدجاج-এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে। আর এই হাদীসও অতিবাহিত হয়েছে যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সা. যখন মুরগি খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন কয়েকদিন তাকে বেঁধে রেখে হেফাজত করতেন, তারপর তা খাইতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. جلالة প্রাণীর গোশত ও দুধ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। আর খাইতে চাইলে কয়েকদিন তাকে বেঁধে রেখে হেফাজত করতে বলেছেন। কোন প্রাণী جلالة হতে হলে কী পরিমাণ নাপাকীর সাথে সংমিশ্রণ থাকতে হবে তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

কিছু প্রশ্ন فقهاء كرام বলেন, যদি কোন প্রাণীর অধিকাংশ খানা-পিনা ও বিচক্ষণ নাপাকীতে হয়, তাহলে তা جلالة এর হুকুমের পর্যায়ভূক্ত হবে, অন্যথায়

নয়। সাথে সাথে এই বিষয়টা স্পষ্ট থাকতে হবে, যদি এই প্রাণীটি ماكول اللحم (তথা যার গোশত খাওয়া হালাল) হয় তাহলে এই বিধান। আর যদি প্রাণী غير ماكول اللحم হয় তাহলে তা আলোচনার বাহিরে। কারণ এটার গোশত ব্যবহারই করা যাবে না।

কতিপয় ফোকাহায়ে কেরাম জানোয়ার جلالة ও غير جلالة হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন—

যদি তার গোশতের মধ্যে নাপাকীর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তবে তা جلالة এর অন্তর্ভূক্ত। আর যদি নাপাকীর গন্ধ গোশতের মধ্যে অনুভূত না হয় তাহলে غير جلالة।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত جلالة ঐ প্রাণীকে বলে, যার সমস্ত গোশতের মধ্যে অথবা গোশতের অধিকাংশের মধ্যে নাপাকীর গন্ধ অনুভূত হয়। আর যদি অল্প অংশের মধ্যে নাপাকী পরিলক্ষিত হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসয়ালা

যদি কোন جلالة প্রাণী নির্দিষ্ট সময় পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার কারণে গোশতের মধ্যে যেকোন ধরনের গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে, তবে বুঝতে হবে তার গোশত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং এই জাতীয় প্রাণী ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে জায়েয, মাকরূহ ছাড়াই। পবিত্র খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের সময় কোন যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং যতদিন পর্যন্ত তার গোশত পবিত্র না হবে, ঐ সময় পর্যন্ত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করাইতে হবে। যদিও কতিপয় উলামা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করানো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তারা বলেন جلالة প্রাণী উট অথবা গাভী, বলদ হয় তাহলে ৪০ দিন পর্যন্ত পবিত্র খাদ্য খাওয়াইতে হবে। তাহলে ঐ প্রাণী جلالة এর হুকুম বহির্ভূত হবে। আর বকরী হলে সাত দিন, আর মুরগি হলে তিনদিন পবিত্র খাদ্য খাওয়াইতে হবে। তাহলে তা غير جلالة এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

جلالة প্রাণীর চামড়ার ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ তার চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে না কি হবে না?

এর বর্ণনা অনুযায়ী جلالة প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করলেও পবিত্র হবে। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, বিশুদ্ধ কথা হল, তার চামড়া দাবাগাত দ্বারাও পবিত্র হবে না।

৪১৬. السرحان (আছ-ছারহান) নেকড়ে বাঘ

السرحان শব্দের سين এর নিচে যের দিয়ে। অর্থ নেকড়ে বাঘ। তার বহুবচন سراحين، سراح আসে। আর তার স্ত্রীলিঙ্গ আসে سرحانه | هذيل সম্প্রদায়ের ভাষায় سرحان সিংহকে বলে। ابو المثلم নামে এক কবি এক ব্যক্তির শোকগাথা কথাগুলী কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন যেখানে একটি شعر এমন রয়েছে যার মধ্যে سرحان কে সিংহের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা—

هباط اودیه جمال الویة + شهادا ندیه سرحان فتیان

উপত্যকার সম্রাট যুদ্ধে ঝান্ডাকে উত্তোলনকারী। মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা যুবকদের সিংহ।

ইলমে নাহুর ইমাম سيبويه বলেন سرحان; فعلان এর ওজনে نون অতিরিক্ত গণনা করা হয়েছে।

আল্লামা কাযরিনী রহ. عجائب المخلوقات-এর মধ্যে কোন এক রাখালের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ঐ রাখাল বকরীর এক পাল নিয়ে পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছিল। সেখানে এক নেকড়ে বাঘ তার একটি বকরী উঠিয়ে চলে গেল। আর ঐ রাখাল উপত্যকায় দাঁড়িয়ে সুউচ্চ আওয়াজে বলতে শুরু করল, হে উপত্যকায় বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ! তার প্রতিউত্তরে বাঘের কানে আওয়াজ ভেসে আসল-কে যেন বলিতেছে যে, হে নেকড়ে বাঘ! তুমি তার বকরী ফিরিয়ে দিয়ে যাও। সুতরাং এই কথা শুনে বাঘ বকরী ফিরিয়ে নিয়ে আসল এবং তার সম্মুখে রেখে গেল। বাঘের শরয়ী হুকুম, ডাক্তারী উপকারিতা এবং ব্যাখ্যা ذئب শব্দের অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

নেকড়ে বাঘের দৃষ্টান্ত এবং প্রবাদসমূহ

আরববাসীগণ বলেন— سقط العشاء به على سرحان সে নেকড়ে বাঘের রাত্রের লোকমায় পরিণত হল। ঐ প্রবাদের বাস্তবতা হল-এক ব্যক্তি রাত্রের বেলা খাবার সন্ধানে বাহির হল। হঠাৎ করে সে এক বাঘের সম্মুখে পড়ে গেল, আর ঐ বাঘ তাকে রাত্রের খাবার বানিয়ে নিয়ে।

হযরত আসমায়ী রহ. বলেন, ঐ প্রবাদের প্রকৃত অবস্থা হল, প্রাণী রাত্রের বেলা খাদ্যের অন্বেষণে বাহির হল। রাস্তায় তাকে বাঘে পেয়ে বসল, অতঃপর তাকে খেয়ে ফেলল।

ইলমুল আরবী বলেন, سرحان নামে আরবে এক বীর পুরুষ ছিল। মানুষের মনে তার সম্পর্কে ভীতি ছিল এবং মানুষ তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। একদিন এক ব্যক্তি বলল, আমি ঐ উপত্যকায় উট চড়াইব এবং সে কসম খেয়ে বলল, আমি سرحان بن هرله নামের বীর পুরুষকে একেবারেই ভয় পাই না। سرحان-ও তার সম্পর্কে অবগত হয়েছে। সুতরাং সে আসল এবং তার উট ধরে নিয়ে গেল। তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করল—

ابلغ نصيحه ان راعى ابلها + سقط العشاء به على سرحان

উপদেশ হিসেবে এই কথা পৌঁছিয়ে দাও যে, উটের রাখাল বীর পুরুষের রাত্রের খাবারে পরিণত হয়েছে।

سقط العشاء به على متنمر + طلق اليدين معاور لطعان

সে এমন ব্যক্তির খাদ্যে পরিণত হয়েছে, যে চিতা বাঘের মত শক্তিশালী ছিল। আর যে নেকড়ে বাঘের মত طعان কে ফিরিয়ে দিতে পারত।

উল্লেখিত দৃষ্টান্ত এমন প্রয়োজন অন্বেষণ-এর সময় বলা হয়, যার প্রয়োজন অন্বেষণকারীর ধ্বংসের কারণ।

৪১৭. আছ-ছারতান (السرطان) কাঁকড়া

السرطان - راء ও سين -তে যবর যোগে। অর্থ কাকড়া। এ একটি প্রসিদ্ধ প্রাণী। তার অন্য আরেকটি নাম হল عقرب الماء তথা পানির বিছা। তার উপনাম ابو تحر অর্থাৎ সমদ্রের পিতা। এ প্রাণীটির জন্ম যদিও জলে হয়, কিন্তু সে স্থলে বসবাস করার যোগ্যতা রাখে। দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষেত্রে খুব দ্রুতগামী হয়। তার দুটি কণ্ঠতালু আছে। পাঞ্জা এবং নখ খুব ধারালো হয়। অনেকগুলী দাঁত থাকে। কোমর খুব শক্তিশালী হয়। যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে দেখে, তাহলে ধারণা করবে যে, এ প্রাণীর না মাথা আছে আর না লেজ আছে।তার চক্ষুগুলী রানের মধ্যে এবং তার মুখ সিনা বরাবর হয়ে থাকে। তার উভয় তালুর দুই দিক প্রশস্ত হয়। তার আটটি পা আছে। এ একদিক পানি ও বাতাসকে চিড়ে চলে। এ বৎসরে কয়েকবার শরীরের চামড়া পরিবর্তন করে এবং তার বসবাসের স্থানে দুটি দরজা থাকে। একটি দরজা থাকে পানির দিকে আর অপরটি স্থলভাগের দিকে। এ যখন চামড়া পরিবর্তনের প্রস্তুতি নেয় তখন পানির দিকের দরজা বন্ধ করে দেয়, যাতে পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর অনিষ্টতা হতে রক্ষা পায়। আর স্থলভাগের রাস্তা খুলে রাখে যাতে বাতাস ঢুকতে পারে। যার দ্বারা তার শরীরের আর্দ্রতা শুষ্ক হয়ে শক্ত হয়ে যায়। যখন তার শরীরে শুষ্কতা চলে আসে তখন খাদ্য গ্রহণ করার জন্য পানির দিকের দরজা খুলে দেয়।

حكيم ارسطا طاليس তার স্বরচিত গ্রন্থ كتاب النعوت -এ লিখেছেন, সাধারণ মানুষের ধারণা এরূপ যে, কোন গর্তে যদি কাকড়া মরে চাট লেগে থাকে, তবে যে শহর বা যে স্থানে এ অবস্থায় পাওয়া যাবে, সে এলাকার লোকজন আসমানী বালা মুসিবত হতে রক্ষা পাবে।

আর যদি কাকড়া কোন ফলদার বৃক্ষে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তবে ঐ বৃক্ষে প্রচুর পরিমাণ ফলন হবে। কোন এক কবি কাকড়ার গুণাগুণ বয়ান করে কবিতা রচনা করেছেন। কবির কবিতা–

فى سرطان البحر عجوبه + ظاهرة للخلق لا تخفى

* সামুদ্রিক কাকড়ার মধ্যে আশ্চর্য বিষয় বিদ্যমান রয়েছে, যা মানুষের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট, কার কাছে অস্পষ্ট নয়।

مستضعف المشة لكنه + البطش من جاراته كفا

* যদিও তার চলাফেরার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার বাচ্চাদের মধ্যে সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীদেরকে কঠিনভাবে ধরার শক্তি অত্যধিক।

يسفر للناظر عن جملة + متى مشى قدرها نصفا

* তা দেখার সময় দর্শকের পরিপূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যখন চলে, তখন মনে হয় نصف তথা অর্ধেক।

বলা হয়, চীন সাগরে প্রচুর পরিমাণ কাকড়া রয়েছে। যখন সেগুলী সাগর হতে উঠে স্থলভাগের দিকে আসে তখন তারা পাথরের নিচে আত্মগোপন করে। ডাক্তারগণ সেগুলীকে ধরে সুরমা তৈরী করে, যা চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে অনেক উপকারে আসে। কাকড়ার সৃষ্টি স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে হয় না, বরং তা শামুক হতে বের হয়।

কিতাবুল হুলয়িয়া-এর মধ্যে আবুল খায়ের দাইলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি এক তাঁতীর নিকট বসাছিলাম। ইত্যবসরে তার কাছে এক মহিলা আসল এবং বলতে শুরু করল, আমাকে উত্তম রুমাল বানিয়ে দিন এবং বলেন, তার মজুরি কত টাকা হবে ? তিনি প্রতিউত্তরে বলেন, দুই দেরহাম। অতঃপর মহিলা বলল, এ মুহূর্তে তো আমার কাছে দেরহাম নেই, তো আমি আসব এবং সাথে করে রুমাল বানানোর মজুরি এবং তার কাপড় নিয়ে আসব। তখন তিনি বললেন, আগামীকাল যদি আমাকে বাড়ি পাওয়া না যায়, তাহলে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হল কাপড় এবং দুটা দেরহাম এক সাথে পেচিয়ে দজলা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিতে হবে। তাহলে দুটো জিনিসই আমি পাব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং পরের দিন এ মহিলা আসল এবং তিনি বাড়িতে ছিলেন না। অতঃপর কিছু সময় তিনি তার অপেক্ষায় বসে রইলেন। কিন্তু যখন তার

আসার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন ঐ মহিলা দুটি দেরহাম কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে দজলা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিলেন। সমুদ্রে নিক্ষেপ করা মাত্রই একটি কাকড়া পানিতে ভেসে উঠল আর সে ঐ কাপড়টাকে পানি হতে আত্মপ্রকাশ করল এবং অতি দ্রুত গতিতে পাড়ের দিকে অগ্রসর হল। তার কোমরে কাপড়ের ঐ পুটলি রাখা ছিল। অতঃপর সে হস্ত প্রসারিত করে কাপড়ের ঐ পুটুলিটি নিয়ে নিল, আর কাকড়া চলে গেল।

আবুল খায়ের বর্ণনা করেন, ঐ শায়েখ যখন নিজের দোকানে এসে বসে গেলেন আমি তখন তার নিকট বললাম, আমার দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করে। তিনি বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ঐ বিষয়ে আমার পুরা জিন্দেগীতে কোন আলোচনা হবে না, কার সাথে আলাচনা না করা। অতঃপর তিনি বললেন, অনেক ভাল ইনশাআল্লাহ। এমনই হবে।

কাকড়ার শরয়ী বিধান

কাকড়া খাওয়া জায়েয নাই। কারণ ইহা নাপাক। رافعی -এর বক্তব্য মতে, কাকড়া খাওয়া ঠিক নয় এ কারণে যে, তা খাওয়াতে ক্ষতি হয়। ইমাম মালেক রহ.-এর মাজহাব অনুযায়ী কাকড়া খাওয়া হালাল।

কাকড়ার ডাক্তারী উপকারিতা

কাকড়া খাওয়াতে কোমরের ব্যথায় উপকার হয়। কোমর শক্তিশালী হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কাকড়ার মাথা নিজের শরীরে লটকিয়ে রাখে, আর যদি রাত্রে গরম থাকে তাহলে তার কোন ঘুম হবে না। আর যদি গরম না হয় তাহলে ঘুম আসবে।

আবার যদি কাকড়াকে আগুনে জ্বালিয়ে তার ছাই অর্শ রোগে সংমিশ্রণ করা হয়, তাহলে অর্শ রোগ চলে যাবে। সে রোগের অবস্থা যেমন হোক না কেন।

আর যদি তার পা কোন গাছে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ঐ গাছের ফল কোন কারণ ছাড়া ঝড়ে যাবে। কাকড়ার গোশত ফুসফুসে ক্ষত রোগীদের অনেক উপকার হয়। যদি কাকড়া তীরের আঘাতে বেঁধে দেয়া হয় তাহলে তীরের ফলা ইত্যাদি ক্ষতস্থান হতে বের হয়ে আসে। সাপ, বিচ্ছু দংশন করলে ক্ষতস্থানে কাকড়া বেধে দিলে অনেক উপকারে আসে।

কাকড়া স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

কাকড়াকে স্বপ্নযোগে দেখা হল কোন সাহসী অথবা প্রতারক ব্যক্তির দলীল। আর স্বপ্নে তার গোশত খাওয়া ঐ কতার প্রমাণ বহন করে যে, স্বপ্নে যিনি দিখলেন, তার দূরের কোন দেশ হতে সম্পদ হাসিল হবে। আবার কখনও কাকড়াকে স্বপ্নে দেখা হারাম সম্পদের নিদর্শন। –আল্লাহ ভাল জানেন

৪১৯. আছ-ছারফুত (السرفوت) এক প্রকারের কীট পতঙ্গ

سين-السرفوت -এর উপর যবর, فاء এর উপর পেশ, আর راء -এর উপর সাকিনযোগে গঠিত। যার অর্থ এক প্রকার কীট। তা শীশার মধ্যে অবস্থান করে এবং তার নিজের বাসস্থান তৈরি করে। সেখানেই ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা দেয়। তার বসবাসের ঠিকানা এমন জায়গায় তৈরি করে যেখানে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। ইবনে খল্লিকান صابر يعقوت -এর অবস্থার ব্যাপারে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

৪২০. আছ-ছুরফাহ (السرفة) এক প্রকারের কীট-পতঙ্গ

سين-السرفة -এর উপর পেশ, راء -এর উপর ساكن যোগে গঠিত যার অর্থ ইবনে সাকিত-এর বক্তব্য মোতাবিক এক প্রকারের কীট-পতঙ্গ। যার মাথাটা কালো, আর শরীরের বাকি অংশ লাল। সে নিজের বাসস্থান চার কোণা আকৃতির 'বানায় এবং পাতলা পাতলা লাকড়ী নিয়ে নিজের মুখের লালা দিয়ে তার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে। অতঃপর সেখানে বসে পড়ে এবং মারা যায়। سرفة -এর আলোচনা হাদীসেও এসেছে। যথা–

হযরত ওমর রাযি. এক ব্যক্তির সাথে বয়ান করেছেন যে, যখন তুমি مهنى নামক স্থানে পৌঁছবে এবং অমুক অমুক জায়গায় আসবে তো সেখানে তুমি একটি বৃক্ষের সন্ধান পাবে। যার পাতা কখনও ঝরে যায় না, তা হতে কোন টিড্ডিও পড়ে না এবং কোন سرفة যাতায়াত করে না আর কোন উট তাকে স্পর্শ করে না। তুমি ঐ বৃক্ষের নিচে কিয়াম করবে। কেননা ঐ বৃক্ষের নিচে সত্তর জন ফেরেশতা কিয়াম করেছেন।

ছুরফাহ-এর শরয়ী হুকুম

তা ভক্ষণ করা হারাম, কেননা তা حشرات -এর অন্তর্ভূক্ত।

দৃষ্টান্ত উপস্থাপন

আরব ভাষাভাষীগণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন এভাবে– فلان اضيع من سرفة

এর বিস্তারিত বর্ণনা همزة -এর পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

৪২১. আছ-ছারমান (السرمان) ভিমরুল

السرمان -এটা ভিমরুলের এক প্রকার, যা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। হলুদ রঙেরও হয় আবার কালোও হয়।

৪২২. আছ-ছারদাহ (السردة) স্ত্রী টিড্ডি

৪২৩. আছ-ছারমাহ (السرماح) পুরুষ টিড্ডি

৪২৪. আছ-চুইদানাহ (السعدانة) কবুতর

৪২৫. আছছি'লাত (السعلاة) জঙ্গলের ভূত

السعلاة -এটা জঙ্গলের ভূতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম একটি শ্রেণী। এর বৈশিষ্ট্য হল, এরা কখনও দীর্ঘ আবার কখনও মোটা হয়ে যায়। এর বহুবচন سعال আসে। আরববাসীগণ কোন দুশ্চরিত্র নারীকে দেখলে তাকে سعلاة অর্থাৎ দুশ্চরিত্রের অধিকারিণী হয়ে গিয়েছে বলে। কবির পংক্তি—

* সন্ধাকালে আমি একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখি যে, পাঁচজন বৃদ্ধা নারী যাদেরকে গর্ভবতী মনে হয়।

* আমি যা কিছু রান্না করি সবগুলী তারা নীরবে বসে ভক্ষণ করেছে। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের চোয়াল ও দন্ত ভেঙ্গে দেন।

* হে আল্লাহ! বনি ছি'লার সাথে মন্দ ব্যবহার করুন, কেননা আমর ইবনে ইয়ারবু মন্দ প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব।

يسوا عفا ولا اكياث তাদের ক্ষমা এবং অবকাশও না দেয়া। কথিত আছে যে, উমর ইবনে ইয়ারবু যাকে কবি শারারুন নাত বলেছেন, মানুষ ও ছি'লাতদ্বয়ের সহবাসে জন্ম হয়।

কথিত আছে যে, ফেরেশতাদের মধ্য হতে কোন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার দরুন আল্লাহ তাআলা তাকে হারূত, মারূতের মত জমিনে প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে আগমনের পর তারও সম্পর্ক নারীদের সাথে গড়ে উঠে। এ গোত্র হতেই জুরহুম গোত্রের সৃষ্টি হয়। কথিত আছে যে, সাবার বাদশাহ বিলকিস ও সিকান্দর যুলকারনাইন এ শ্রেণীরই পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্ট। বাদশাহ যুলকারনাইনের সম্পর্ক বহুল পরিচিত যে, তার মাতা মানুষের মধ্য হতে, আর পিতা ফেরেশতা ছিলেন।

উল্লেখিত অপবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বর্জন পূর্বক আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, বিশুদ্ধ বক্তব্য হল, ফেরেশতাগণ আম্বিয়া আ.-এর মত ছোট বড় গোনাহসমূহ হতে সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র। এর প্রবক্তা কাজী ইয়াজ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম জুরহুম গোত্র ও ফেরেশতা বিলকিস এবং বাদশাহ যুলকারনাইন সম্পর্কে যেসব মানবদের ভুল ধারণা, তা সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত নিষেধারোপ করেন। সুতরাং হারূত-মারূতের ঘটনা দ্বারা এর উপর প্রমাণ পেশ করা অনর্থক।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর অভিমত যে, বাবেল শহরে হারূত-মারূত নামে দুইজন যাদুকর ছিল, যারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত।

হাসান বসরী রহ. বলেন, এই দুইজন মন্দ প্রকৃতির লোক ছিল, যারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত। নিঃসন্দেহে তারা ফেরেশতা ছিল না। কারণ যাদু শিক্ষা দান করা ফেরেশতাদের কোন কাজ নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হাসান বসরী রহ. আসন্ন কালামে পাক দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন–

وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت۔

ملكين -এর লামকে যবরের স্থলে যের পড়েছেন।

হারূত-মারূত সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 'কাফ' পরিচ্ছেদে كلب -এর অধীনে আসন্ন।

যুলকারনাইনের নাম ও বংশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইরতেলাউল আখইয়ার গ্রন্থের প্রণেতা বলেণ যে, যুলকারনাইনের নাম ইস্কান্দর ছিল। তার পিতা তারকারাজি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আকাশের প্রভাব সম্পর্কে এত পারদর্শী ছিলেন যে, সময়যুগে তার মত দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। এক রজনীতে নিজের স্ত্রীর সাথে বলতেছেন যে, জাগ্রত থাকতে থাকতে আমার স্বভাব বিনষ্ট হয়ে গেছে। যার দরুন এখন আমার মনে ইচ্ছা যে, চক্ষু লাগিয়ে নাও, যেন আমার পরিবর্তে তুমি জাগ্রত থাকবে, আর আসমান পানে তাকিয়ে থাকবে। যখন একটি নক্ষত্র অমুক স্থানে (আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে স্থান নির্দিষ্ট করে বলেন) উদিত হয় তখন তুমি আমাকে জাগ্রত করবে। আর আমি জেগে তোমার সাথে সহবাসে লিপ্ত হব। সে সময় হতে তুমি গর্ভ ধারণ করবে এবং তোমার গর্ভ হতে এমন একটি সন্তান জন্মলাভ করবে যে সন্তান শেষ যুগ পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে। এ বক্তব্য প্রদান করে সে শুয়ে যায়।

ঘটনাক্রমে আবু সেকান্দরের শালিকা অর্থাৎ যুলকারনাইনের খালা নিজের ভগ্নিপতির এ বক্তব্য শোনছিল, সে স্বীয় স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়টি বর্ণনা করে। যখন ঐ নক্ষত্র নির্দিষ্ট স্থানে উদিত হল তখন শালিকা জাগ্রত হয়ে তাৎক্ষণিক স্বীয় স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম করে। ফলে গর্ভধারণ করে এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তার একটি ছেলে সন্তান জন্মলাভ করে। যার নাম খিযির রাখা হয়। অপরদিকে সেকান্দরের মাতা আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে, আর তার স্বামীর চক্ষু খুলে যায়। সে উঠে দ্রুত গতিতে আসে এবং নক্ষত্র দেখতে থাকেন, কিন্তু ঐ মুহূর্তে নক্ষত্র স্বীয় স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, তুমি কেন আমাকে জাগ্রত কর নাই ? প্রতিউত্তরে স্ত্রী বলেন, আমি ঐ কাজের উদ্দেশ্যে জাগ্রত থাকতে লজ্জাবোধ করি। ইহা শোনার পর স্বামী বলেন, আমি আজ হতে চল্লিশ বৎসর যাবত ঐ তারকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ, তুমি আমার

সমস্ত কষ্ট সাধনা নিরর্থক করে দিলে ? মঙ্গল এখন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এক ঘড়ির পর দ্বিতীয় নক্ষত্রটি উদিত হবে, আর সে সময় তোমার সাথে সঙ্গম করব এবং এ গর্ভধারণ দ্বারা এমন সন্তান জন্ম লাভ করবে যে সূর্যের উভয় প্রান্তের বাদশাহ হবে। এমনটি হয়েছে যে, সেকান্দর যুলকারনাইন ঐ মুহূর্তে গর্ভধারণ হতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে তার খালার গর্ভ হতে খিযির আ. জন্ম লাভ করেন।

যুলকারনাইন সম্পর্কে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহের বর্ণনা পূর্বোল্লিখিত আলোচনার বিরোধীতা করে বলেন, যুলকারনাইন একজন রোমান ব্যক্তি। সে একজন বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান ছিলেন, মূল নাম সেকান্দর। যেহেতু সে একজন নেক পুরুষ ছিলেন সেহেতু আল্লাহ তাআলা সে যুবক হওয়ার ভিত্তিতে তাকে যুলকারনাইন শব্দ দ্বারা ভূষিত করেন এবং বলেন, হে যুলকারনাইন ! আমি তোমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন যে, হে প্রভু! আমি এত বিশাল বড় দায়িত্বের যোগ্যতা রাখি না এবং আমার মধ্যে এমন কোন মূল শক্তি নাই যার সাহায্যে আমি তাদের মোকাবেলা করব এবং ভাষা শক্তিও নাই, যার দ্বারা আমি তাদের সাথে কথোপকথন করব। আর ধৈর্য শক্তিও নাই যার দ্বারা তাদের জুলুমের সময় ধৈর্য ধারণ করব এবং তাদের ভাষাও বুঝি না যার সাহায্যে তাদের কথাবার্তা বুঝব। আমার নিকট কোন দলিল-প্রমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধি নাই। এমনকি এমন কোন বস্তু আমার মাঝে নাই যার কারণে বলে যেতে পারে যে, আমি ঐ বিশাল বড় কাজের যোগ্যতা রাখতে সক্ষম। আপনি ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু, আপনি দুর্বল বান্দার প্রতি দয়া করুন। স্বয়ং আপনার সম্মানিত বাণী যে, আমি কোন বান্দার উপর তার শক্তি সামর্থে অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপিয়ে দেই না। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার বক্ষদেশ ইলম ও হিকমত দ্বারা ভরপুর করে দিব, প্রত্যেক প্রকারের শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব।

ইবনে হিশাম বলেন, যুলকারনাইন সয়াব ইবনে যি মুরতাদাল হুমাইরীর উপাধি যিনি ওয়াইল ইবনে হুমাইরের বংশধরদের মধ্যে অন্যতম।

ইবনে ইসহাক বলেন, তার মূল নাম যাবাল ইবনে মরদুইয়া। সায়ের অধিবাসী বর্ণনা করে যে, সেকান্দর ইউনান ইবনে ইয়াফতের সন্তানদের মধ্যে এক ব্যক্তি, তার নাম হরমুছ ছিল এবং তাকে হরদীসও বলা হত।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে অনুসন্ধানে এ বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, সেকান্দর নামক দুইজন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন যুগে অতবাহিত হয়েছে। (১) হযরত ইব্রাহীম আ. এর সমসাময়িক যুগের, (২) হযরত ঈসা আ.-এর নিকটতম যুগে অতিবাহিত হয়েছে। এটিও অনস্বীকার্য যে, যুলকারনাইন পারস্য দেশে বাদশাহর উপাধি, যিনি হযরত ইব্রাহীম আ.-এর সমসাময়িক যুগের অথবা তার পূর্বে হত্যাকৃত এক বিদ্রোহী বাদশাহ ছিল।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, সেকান্দর বাদশাহকে যুলকারনাইন উপাধিতে ভূষিত করার কারণ সম্পর্কে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (১) যেহেতু তিনি রোম-পারস্য দেশের বাদশাহ ছিলেন সেহেতু তাকে যুলকারনাইন উপাধি প্রদান করা হয়। (২) করনুন (قرن) অর্থ শিং, আর যুলকারনাইন অর্থ দুই শিং বিশিষ্ট, যেহেতু তার মাথায় শিং-এর মত দুটি কোন বস্তু ছিল সেহেতু তাকে যুলকারনাইন উপাধি দেয়া হয়। (৩) এক রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সূর্যের উভয় পার্শ্ব বেষ্টন করেছেন। যার ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, তিনি পূর্ব-পশ্চিম ভ্রমণ করবেন। (৪) তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যখন একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করেন, তখন নিজের সম্প্রদায়বৃন্দ তার কান এবং মাথার মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করে। (৫) তার পিতা-মাতা উভয়ের বংশের দিক হতে সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল, এ কারনে যুলকারনাইন বলা হয়। (৬) তিনি স্বীয় বয়স দুই শতাব্দী পূর্ণ করেছেন যার দরুন তাকে যুলকারনাইন বলা হয়। কেননা করনুন-এর অর্থ শতাব্দীও আসে। (৭) তিনি যখন হত্যা করতেন তখন হাত-পা এবং সওয়ারীর দ্বারা হত্যা করতেন। (৮) তার অত্যন্ত সুন্দর দুটি চুলগুচ্ছ ছিল, এ কারণে তাকে যুলকারনাইন বলা হয়। কেননা করনুন অর্থ চুলগুচ্ছও আসে। কবি রায়ী নিম্নোক্ত পংক্তিতে করনুনকে যুলফ (زلف) অর্থে ব্যবহার করেন–

فلثمت فاها اخذ ابقرونها * شرب النزيف لبور ماء الحشرج

আমি তার মুখ বন্ধ করেছি এবং চুলগুচ্ছ ধরেছি, সে বিশুদ্ধ পানি পান করেছে স্বীয় কলিজা ঠাণ্ডা করার জন্য।

এছাড়া ইহাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ইলম দেয়া হয়েছে এবং তিনি ইস্কান্দরের একজন ব্যক্তি ছিলেন আর তার নাম ইস্কান্দর আর পিতার নাম ফায়লাবিশ, রূমী এবং হযরত ঈসা আ,-এর যুগের পরবর্তী যুগ ছিল তার যুগ। মুজাহিদ রহ. বলেন, ধরাপৃষ্ঠে চারজন বাদশাহ ছিল-দুজন মু'মিনদের মধ্য হতে আর দুজন কাফির। মু'মিন দুজন হল –

(১) হযরত সুলাইমান আ. (২) অপরজন বাদশাহ যুলকারনাইন। কাফেরদের মধ্য হতে (১) নমরুদ, (২) বখতে নসর এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে পঞ্চম একজন বাদশাহ হবেন, তিনি হচ্ছেন ইমাম মাহদী আ.। যুলকারনাইনের নবুওয়াতের ক্ষেত্রে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যারা তার নবুওয়াতের প্রবক্তা তারা এ পবিত্র আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন– قلنا يا ذالقرنين। আর যারা তার নবুওয়াতের প্রবক্তা নয় তারা বলেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ নেক বান্দা ছিলেন এবং এ উক্তিটিই আল্লামা দামেরী রহ.-এর নিকট বিশুদ্ধ। তার নবুওয়াতের প্রবক্তাদের ভাষ্য যে, যে ফেরেশতা তার নিকট

আগমন করেন সে ফেরেশতার নাম কায়ায়িল (قيائل)। আর এ ফেরেশতা যিনি কিয়ামত দিবসে যমীন জড়ো করবেন এবং সমস্ত সৃষ্ট জীব হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। এখন মূল বিষয়বস্তুর প্রতি জাহেয বলেন, জন্ম ও বংশ ধারাবাহিকতা মানুষ ও জ্বিনের মধ্য হতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেণ যে, " وشاركهم فى الاموال والاولاد " অর্থাৎ তাদের ধন-সন্তানের মধ্যে শরিক হও। তবে এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীক স্থাপন হওয়া সম্ভব এবং এর কারণ এও হতে পারে যে, মহিলা জিন পুরুষ মানুষের উপর কামভাবের উদ্দেশ্যে মুগ্ধ হয়। এমনিভাবে পুরুষ জিন মহিলা মানুষের উপর একই উদ্দেশ্যে মুগ্ধ হয়ে থাকে। যদি এ অবাস্তব হয় তবে পুরুষ জিন মহিলা মানুষের উপর আনন্দিত হয়, আর মহিলা জিন পুরুষ মানুষের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে।

আল্লাহ তাআলা সূরা আর রাহমানে বলেন, " لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان " ঐ সব হুরদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ ও জিন হাত দ্বারা স্পর্শ করে নাই। এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, যদি পুরুষ জিনেরা মহিলা মানুষদের সাথে মুহাব্বত করার ইচ্ছা না থাকত, তবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র আয়াতে কারিমায় জিন্নাতিউ جنتيون কে এ ধরনের ইয়াকীন কেন প্রদান করলেন।

সুহাইলি ভূত ও দানবের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন যে, ভূত দিনে দানব ও রাত্রিতে মানুষের নিকট প্রকাশ পায়।

আল্লামা কাযবিনী রহ. বলেন, ভূত দানবের বিপরীতমুখী এক শ্রেণীর শয়তান। কবি উবাইদ ইবনে আউয়ূব বলেন–

وساحرة عينى لوان عينها * رات ما الاقيه من العزل جنت

ভূত রাত্রিতে নিজের সাথে অন্ধকার নিয়ে আগমন করে এবং অন্ধকারও জমকালো আঁধার।

ভূত অধিকন্তু জঙ্গলে পাওয়া যায় এবং যখন সে কোন মানুষকে নিজের মুষ্টিতে নেয় তখন তাকে খুব শক্তিশালী করে এবং ক্রীড়া করায়। কখনও তাকে বাঘ বলা হয়, আর বাঘ যখন তাকে ধরে তখন তা চিৎকার করে উঠে যে, বাঁচাও! বাঘ আমাকে চিড়ে ফেলতেছে এবং কখনও সে এও বলে যে, আমার নিকট এক হাজার দিনার আছে, যে ব্যক্তি আমাকে বাঁচাবে সে ব্যক্তিকে আমি এক হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করব। মানুষ তা হতে পলায়ন করে, যেহেতু ভূতের আওয়াজ এবং তার প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত, সেহেতু তাকে কেউ বাঁচাতে যায় না। পরিণাম এ হত যে, বাঘ তাকে ভক্ষণ করত।

৪২৬. আছ-ছাফনাজ (السفنج) এক প্রকার পাখি

السفنج ঃ সীনের উপর পেশ, ফা ছাকিন ইহা মুলহিক বাখুমাছি (ملحق بخماسى) এবং তৃতীয় হরফটি তাশদীদযুক্ত। এক প্রকার পাখিকে বলা হয়।

৪২৭. আছ-ছাকবু (السقب) উষ্ট্রী শাবক

السقب ঃ উষ্ট্রী শাবক। এর বহুবচন سقب , سقاب , سقوب আসে। স্ত্রীলিঙ্গ سقبه এবং মাতার নাম مسقب। আরববাসী উপমা পেশ করে যে, " اذل من السقبان " অমুক ব্যক্তি উষ্ট্র অপেক্ষাও অধিক দুর্বল।

৪২৮. আছ-ছাকর (السقر) শকুনী সাদৃশ্য এক পাখি

السقب ঃ আল্লামা কাযবিনী রহ. বলেন, ছাকর শকুনী সাদৃশ্য একটি পাখি। শকুন অপেক্ষা তার পা মোটা। শুধুমাত্র শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যায়। সুতরাং তুর্কী শহরে অধিক পরিমাণে সমাহার। এ পাখির নিয়ম যে, যখন এ পাখি পাখা ছেড়ে যায় তখন তার চতুর্দিকে রেখা সাদৃশ্য চক্কর লাগায়, আর যখন সে যেথা হতে চক্কর সূচনা করেছিল সেথায় গিয়ে পৌছে তখন সমস্ত পাখিরা ঐ বেষ্টনীতে আগমন করে ধীরে ধীরে নিম্নদেশে অবতীর্ণ হয়। এমনকি তারা যমীনের সাথে লেগে যায়, পুনরায় তাদেরকে কোন শিকারী ধরে নিয়ে যায়। একটিও বাঁচতে পারে না।

৪২৯. আছ-ছাকানকুর (السقنقور) এক প্রাণী বিশেষ

السقنقور : এ প্রাণী ছাকানকুর নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ এবং এরা দুই শ্রেণী–১। হিন্দী ও ২। মিশরী। ছাকানকুর কুলযুম সমুদ্রে পাওয়া যায় যেথায় অভিশপ্ত ফেরআউনকে ডুবানো হয়েছিল। আর হাবশা শহরে জন্মে। পানিতে মৎস্য ও স্থলে বিড়াল শিকার ধরে সর্পের মত তা গিলে ফেলে। এদের জরায়ু বিশটি করে ডিম দেয়, আর ঐ ডিম বালুকায় ঢেকে রাখে, এই তার ডিমে তা দেয়া। তামিমী বলেন, এ স্ত্রী প্রাণীর দুটি জরায়ু থাকে, আর পুং প্রাণীর দুটি জননেন্দ্রিয় থাকে। হাকীম আরাছতু বলেন, ছাকানকুর এক শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী। সাগরের ঐ স্থানে জন্মে যেথায় বিদ্যুতের আলো সৃষ্টি হয়। এ প্রাণীর ভিতর আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, যদি ইহা মানুষকে দংশন করে তবে মানুষ যদি ঐ প্রাণী অপেক্ষা পূর্বে পানিতে যায় তাহলে প্রাণীটি মারা যাবে, আর যদি ছাকানকুর অগ্রে পানিতে যায় তবে মানুষটি মারা যাবে। সর্প ও ছাকানকুর উভয়ের মধ্যে স্বভাবগত বিদ্বেষ, যে যার উপর বিজয় লাভ করে সে নিজের প্রতিপক্ষকে হত্যা করে।

ছাকানকুর আর গো-সাপের মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। (১) গো-সাপ স্থলের প্রাণী আর সে স্থলেই বাস করে। ছাকানকুর সামুদ্রিক প্রাণী, সে পানি অথবা পানির নিকটবর্তী স্থানে বাস করে। (২) ছাকানকুরের চামড়া গো সাপের চামড়ার তুলনায় বেশি কোমল। গো-সাপের পৃষ্ঠদেশ মাটির রং বিশিষ্ট আর সহিষ্ণুও এবং ছাকানকুরের পৃষ্ঠদেশ হলুদ-কালো রং বিশিষ্ট। ছাকানকুরের পুংলিঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ যৌন শক্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে, যা স্ত্রলিঙ্গে পাওয়া যায় না। আর এ উপকার বাস্তব অভিজ্ঞতায় অর্জিত হয়েছে। বিশুদ্ধ বক্তব্য হল যে, ছাকানকুর এ চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট। তার দেহের ঐ অংশ যা কটিদেশ হতে লেজের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় দুই গজ দৈর্ঘ্য ও অর্ধগজ প্রস্থ, তা উল্লেখিত যৌন শক্তির উপকার সাধনকারী বস্তু।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আমাদের যুগে ছাকানকুর মিসর দেশের ফায়ূয শহর ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া দুষ্কর। তার সন্ধান শুধুমাত্র ঐ শহরে করা হয়। আর শীতকালে তাকে শিকার করা হয়, কারণ তারা শীতকালে স্থলে আগমন করে।

ছাকানকুরের শরয়ী বিধান

ইহা খাওয়া হালাল। কেননা ইহা মাছেরই একটি শ্রেণী বিশেষ। সম্ভবত কোন কারণ বশত তা হারামও হতে পারে। কেননা যদি গো-সাপের সাথে তুলনা করা হয় তবে হারাম হবে এবং হামযাহ পরিচ্ছেদে আলোচিত ছাকানকুরের অন্য আরেকটি শ্রেণী তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা তার জন্ম কচ্ছপ হতে, আর কচ্ছপ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

চিকিৎসায় চাকানকুরের উপকারিতা

হিন্দুস্তানী ছাকানকুরের গোশত তাজা থাকা পর্যন্ত গরম থাকে এবং এ ছাকানকুরের গোশতের সাথে লবণ মিশ্রিত করলে আরও অধিকতর উত্তপ্ত হয়। এর মধ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ অতি নগন্য। বিশেষত ছাকানকুর লটকানো অবস্থায় দীর্ঘ দিন রাখার পর তা ভক্ষণ করা সব লোকের জন্য নিরাপদ নয়, যাদের মস্তিষ্ক চড়া। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অধিকারী সে ব্যক্তির জন্য অধিক উপকারী। যদি দুই ব্যক্তি যাদের পরস্পরে বিদ্বেষ তাদের উভয়কে একত্রিত করে তার গোশত খাওয়ানো হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং একে পরের মাঝে মহব্বতের প্রাচীর নির্মিত হবে।

ছাকানকুরের গোশত, চর্বির বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তা আহার করার দ্বারা কামভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং পরিবারের সকলের ঠাণ্ডা রোগের জন্য তা উপকারী। আর যদি স্বতন্ত্রভাবে কেউ ব্যবহার করে তবে অধিক উপকার সাধন করবে। আর যদি তা অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রণ করে ব্যবহার করে তবে তুলনামূলক ফলপ্রসূ কম। ব্যবহারকারী যে নিজের মস্তিষ্ক, বয়স, মৌসুম

অনুপাতে এক হতে তিন সরিষা পরিমাণ সেবন করার দ্বারা অনেক উপকার লাভ করা যায়।

হাকীম আরাছতুর ভাষ্য যে, ছাকানকুরের গোশত ভক্ষণ করার দ্বারা শরীর মোটা হয় এবং কটিদেশ ও মূত্যাশয়ের ব্যথা উপশম হয়। যদি এর কটিদেশের মধ্যভাগ কার কটিদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তবে তার জননেন্দ্রিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এবং যৌন শক্তি বৃদ্ধি করবে।

স্বপ্নে ছাকানকুর দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে ছাকানকুর দেখা এমন ঈমান ও আলেমের প্রতীক যিনি অন্ধকার যুগের পথ প্রদর্শক। কেননা তার চামড়া অন্ধকারকে আলোকিত করে, আর তা ভক্ষণে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

৪৩০. আছ-ছুলাহফাতুল বারিয়্যাহ (السلحفة البرية) স্থলের কচ্ছপ

السلحفة البرية (আছ-ছুলাহফাতুল বারিয়্যাহ) স্থলের কচ্ছপ। (লামের উপর যবর) এর বহুবচন ছুলাহফু (سلحف) আসে। বর্ণনাকারীর মতে এর একবচন سلحفة আসে। এ প্রাণী স্থলে ডিম পাড়ে, আর এ ডিম হতে যেটি সমুদ্রে পড়ে যায় তা হতে সামুদ্রিক কচ্ছপ জন্ম লাভ করে, আর অবশিষ্টটি স্থলের ডিম হতে স্থলের কচ্ছপ জন্মলাভ করে। উভয় শ্রেণী বড় হতে হতে উট ছাগলের শাবকের সমপরিমাণ হয়। পুরুষ কচ্ছপ কামভাব প্রকাশে যখন স্ত্রী কচ্ছপের অসম্মতি দেখতে পায় তখন সে এক শ্রেণীর ঘাস মুখে করে নিয়ে আসে। যার সুঘ্রাণ শুঁকলে সে স্ত্রী কচ্ছপ সঙ্গমে সম্মতি প্রদান করে। ঐ ঘাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা যে ব্যক্তির নিকট থাকবে সে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান করবে। এ ঘাস সম্পর্কে ধারণা অল্প লোকেই রাখে।

মাদী কচ্ছপ যখন ডিম দেয় তখন সে ঐ ডিমকে সরাসরি দেখতে পায়, আর এ দর্শনেই ডিমে তা দেয়া হয়ে যায়। এ কারণে তার নিম্নভাগ খুব শক্ত হয়, আর এ শক্ত হওয়ার দরুন তার গরম অনুভূত হয় না। কখনও কখনও কচ্ছপ সাপের লেজে ধরে এর মাথা কেটে লেজের দিকে চিবিয়ে ফেলে। সাপ তার নিজের লেজ দিয়ে কচ্ছপের মস্তকের উপরিভাগে আঘাত করে, এতে কচ্ছপও মরে এবং নিজেও মরে যায়। কচ্ছপ শিকার ধরার আশ্চর্যজনক কৌশল অবলম্বন করে। শিকার ধরার সময় হলে সে পানি হতে উপরে উঠে আসে এবং তার শরীর মাটি দ্বারা আবৃত থাকে। অতঃপর সে চুপচাপ এক স্থানে বসে থাকে যেখান দিয়ে পাখিরা পানিতে যাওয়া আসা করে। মাটি দ্বারা আবৃত থাকার কারণে পাখিরা তাকে চিনতে পারে না। তখন সে লম্ফ দিয়ে শিকার ধরে পানিতে নিয়ে যায় এবং সেখানে বসে তা ভক্ষণ করে। এদের পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের দুটি করে জননেন্দ্রিয় ও জরায়ু থাকে। পুরুষ কচ্ছপ স্ত্রী কচ্ছপের উপর মধ্যবর্তী সময়

পরিমাণ সঙ্গমে অবস্থান করে। কচ্ছপ সাপ খেতে খুব ভালবাসে। সাপের বিষ হতে বাঁচার জন্য সে পুদিনা পাতা খেয়ে থাকে। কোন কোন কবি তার গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত চমৎকার পংক্তি পাঠ করেন–বঙ্গানুবাদ

✪ ধ্বংস করুক আল্লাহ তাআলা ঐ প্রাণীকে যার মুখ থাকা সত্ত্বেও বোবা আর সামান্য শ্রমে তার শঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

✪ স্বীয় বর্ম নিজের কটিদেশে ঝুলিয়ে দেয় এবং স্বীয় চামড়া হতে আপন মাথা বের করে।

✪ কেননা, ভয় তাকে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত করে। আর এ ভয়ই তার নিঃশ্বাস সংকীর্ণ করে ফেলে।

✪ তখন স্বীয় স্কন্ধ হতে সে থাবা গ্রহণ করে এবং মাথাকে চামড়ার ভিতরে গুটিয়ে নেয়।

কচ্ছপের শরয়ী বিধান

ইমাম বগভী কচ্ছপকে হালাল বলেন, আর ইমাম রাফেয়ী হারামের প্রবক্তা। কেননা সে সাপ খায়। ইবনে হযম বলেন, স্থল-জল উভচরের কচ্ছপ হালাল।

আল্লাহ তাআলা হালাল-হারাম প্রাণীদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার পর বলেন–كلو مما فى الارض حلالا طيبا

"যমিন হতে হালাল উত্তম বস্তু আহার কর।"

পূর্বে বলেছেন যে– قد فصل لكم ما حرم عليكم

হারামসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ঐ ব্যাখ্যায় হারাম প্রাণীদের তালিকায় কচ্ছপের উল্লেখ নাই। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভচর কচ্ছপ হালাল।

প্রবাদ বাক্য

আরববাসীগণ উপমা পেশ করেন যে– فلان ابلد من سلحفاة সে কচ্ছপ অপেক্ষাও বেশি বোকা।

চিকিৎসায় কচ্ছপের উপকারিতা

আল্লামা কাযবিনী রহ. বলেন, যদি কোন স্থানে অধিক ঠাণ্ডা অনুভুত হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের আশংকা হয়, তাহলে একটি কচ্ছপ ধরে তাকে উল্টাভাবে চিৎ করে মাটিতে শুয়াবে, যেন তার হাত-পা আকাশের দিকে উঠে থাকে, তবে ঐ স্থানে আর ঠাণ্ডার প্রভাব বিস্তার করবে না এবং তার হাত-পায়ের রক্ত ভাঙ্গা হাড়ের জোড়ার কাজে আসে। আর যদি তার রক্ত লাগাতার মালিশ করে, তবে হাত-পায়ের ফাঁটা, পেশী সংকোচনে ফলদায়ক ভূমিকা রাখবে। এর গোশত খাওয়ার দ্বারা এমন উপকার হয় এবং যদি তার গোশত শুকিয়ে চূর্ণ করে প্রদীপে জ্বালানো হয়, তবে প্রজ্জলিতকারীর গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নির্গত হবে, ইহা

পরীক্ষিত আমল। মানুষের যে অঙ্গে ব্যথা অনুভব হয়, কচ্ছপের সে অঙ্গটি ব্যথিত অঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়ায় আল্লাহর হুকুমে উপশম লাভ করবে। কচ্ছপের উত্তেজনা মুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তি তার লেজের পার্শ্ব নিয়ে নিজের শরীরে জুলায় তবে সে ব্যক্তির যৌনশক্তি উত্তেজিত হবে। যদি কচ্ছপের মস্তিষ্কের উপরিভাগ ভুনা করে হাড্ডিতে প্রলেপ দেয়া হয়, তবে সে হাড্ডি কোন পীড়ায় আক্রান্ত হবে না।

কচ্ছপ স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কচ্ছপ দেখা এমন রমণীর উপমা যে রমণী অধিক সাজ-সজ্জা করে কোন পুরুষের অন্বেষণকারিণী, চাই সে ব্যক্তি আলেম অথবা কোন বিচারকদের বিচারক হউক। কেননা তা সমুদ্রের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, কচ্ছপের অনেক যত্ন করা হচ্ছে, তবে সেথায় উলামায়ে কেরামগণ অনেক বিনয় ও সম্মানের অধিকারী হবে। স্বপ্নে কচ্ছপের গোশত খেতে দেখা জ্ঞানী হবে। খ্রিষ্টবাদের উক্তি যে, সে জ্ঞানী ও ধনী হবে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

৪৩১. ছুলাহফাতুল বাহরিয়্যা (السلحفاة البحرية) সামুদ্রিক কচ্ছপ

السلحفاة البحرية ঃ সামুদ্রিক কচ্ছপ। লুজাত (لجاث) এর দ্বিতীয় নাম। অতএব এর বিস্তারিত বিবরণ লাম পরিচ্ছেদে আসবে।

জাওহারী রহ. বলেন যে, কোন সিপাহীর কন্যার স্বীয় গলার হার সামুদ্রিক এক কচ্ছপকে পরিধান করায়। সে কচ্ছপ হার নিয়ে সমুদ্রে ডুব দিয়ে চলে যায়। অতঃপর সে কন্যা আহ্বান করে যে– হে সামুদ্রিক গোষ্ঠি! সমুদ্রে অঞ্জলি পরিমাণ পানি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সমস্ত পানি বের কর। এ কচ্ছপের মস্তকের উপরিভাগকে আরবী ভাষায় যবল (ذبل) বলা হয় এবং এর মস্তিষ্কের উপরিভাগ দ্বারা চিরুনী তৈরি করা যায়। আর এ চিরুনীর বৈশিষ্ট্য যে, যদি এ চিরুনীর সাহায্যে চুল আচড়ায় তবে মাথায় আর ছোট উকুন থাকবে না।

যদি তার মস্তিষ্কের উপরিভাগ জ্বালিয়ে ভস্ম করে ঐ ভস্ম ডিমের সাদা অংশের সাথে মিশ্রণ করে গোড়ালি ও হাতের ফাটলে ব্যবহার করলে অনেক উপকৃত হওয়া যায়। কোন কোন উলামায়ে কেরামের অভিমত যে, হিন্দুস্তানী কচ্ছপের মস্তিষ্কের উপরিভাগকেও যবল (ذبل) বলে

ফায়েদা

রাসূল সা.-এর নিকট আ'জের একটি চিরুনী ছিল। আজ (عاج হস্তীদন্ত) দ্বারা উদ্দেশ্য যবল (ذبل) এবং তার দ্বারা চিরুনী তৈরি করা যায়। হাদীসে বর্ণিত

আছে যে, রাসূল সা. হযরত ছাওবান রাযি.-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সে যেন হযরত ফাতেমা রাযি.-এর জন্য দুটি চিরুনী ক্রয় করেন।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, আ'জ হাতের হাড়কেও বলা হয়, আর ইহা হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর নিকট নাপাক বা অপবিত্র। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট পাক বা পবিত্র এবং এর চিরুনী চুলে ব্যবহার করা বৈধ।

৪৩২. আছ-ছিলফান (السلفان) চকোর পাখির শাবক

السلفان (ছিনের উপর যের) চকোর পাখি। এর একবচন سلف, صرد -এর ওজনে আসে। আর এর স্ত্রীলিঙ্গের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আবু উমর বলেন, এর স্ত্রীলিঙ্গ سلفة আসে না। কেউ কেউ বলেন, سلفة, سلكه -এর ওজনে আসে।

৪৩৩. আছ-ছিলকু (السلق) বাঘ

السلفاق (ছিনের নিচে যের) বাঘ। এর স্ত্রীলিঙ্গ ছিলকাহ سلقه আসে। এ শব্দ পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণিত আয়াত–

فاذا جاء الخوف سلقوكم بالسنة حداد

৪৩৪. আছ-ছিলকু (السلك) চকোর পাখির শাবক

السلك ঃ চকোর পাখির শাবক। কার কার বক্তব্য যে, চকোর পাখির শাবককেও سلك বলে। এর স্ত্রীলিঙ্গ سلكة আসে এবং বহুবচন سلكان আসে। একবচনে سلكانه আসে। আরববাসীগণ ছলিক ইবনে ছিলকা দ্বারা উপমা পেশ করে তাকে। এ একজন মানুষের নাম, যিনি ছুলাইকুল মাকালিব নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ। কবি নিম্নোক্ত পংক্তির অংশ এ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

الى الهو لى امضى من سليك المقانب

এ ব্যক্তি আরবের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অন্যতম। যার আলোচনা 'আইন' পরিচ্ছেদে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৪৩৫. আছ-ছিলকুত (السلكوت) এক জাতীয় পাখি

السلكوت এক জাতীয় পাখির নাম।

৪৩৬. আছ-ছালওয়া (السلوى) এক বিখ্যাত ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির মত একটি পাখি

السلوى ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির মত একটি সাদা পাখি, এর একবচন سلوى আসে। سلوى -এর দ্বিতীয় নাম মধুও আসে। সুতরাং কবি খালেদ ইবনে যুহাইরের পংক্তি–

وقاسمها بالله جهدا لا انتم + الن من السلوى اذا مانشورها

"আর উভয়ে আল্লাহর শপথ করে, অত্যন্ত কঠোর শপথ করিয়েছে ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির পন্থায় যখন তা হতে উন্নত মধু সংগ্রহ করা হয়।

এ পংক্তিতে سلوى দ্বারা মধু উদ্দেশ্য। কিন্তু যুজাজী বলেন, কবি খালেদ এ পংক্তিতে ভুল করেছেন যে, سلوى -কে মধু অর্থে গ্রহণ করেছেন। অথচ ছলওয়া (سلوى) একটি পাখির নাম। কোন কোন উলামায়ে কেরাম ছলওয়া (سلوى)-কে গোশতের অর্থে গ্রহণ করেন। এর কারণ দর্শইয়া হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, মানুষের সর্ব শ্রেণীর তরকারীর বহিষ্কারক, লোকেরা এর নাম قاطع الشهوات স্বাদ কর্তনকারী দিয়েছেন। কারণ এ ব্যবহার করার পর দ্বিতীয় আর কোন তরকারীর স্বাদ বাকি থাকে না।

আল্লামা কাযবীনী রহ. বলেন , ছলওয়া (سلوى)-এর একবচন সুনানে আসে নাই। সম্ভবত দিফলীর (دفلى) মত এটিই একবচন ও বহুবচন এবং এসব পাখিরা বারো মাস সমুদ্রে স্থান করে। শিকারী পাখি যথা বাজ ও অন্যান্য পাখিরা যখন বলিজার রোগে আক্রান্ত হয় তখন ছালওয়া (سلوى) সে পাখি যা আল্লাহ তাআলা মান্নার (من) সাথে বনী ইস্রাঈলদের উপর অবতীর্ণ করেন, আর তা মধুবিশেষ ছিল না, যা খালেদ ভুলবশতঃ গ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীতে হাদীসুল আম্বিয়া ও মুসলিম শরীফে বিবাহ অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইবনে রাফে'-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমার হতে আবদুর রাজ্জাক, তার নিকট হতে মা'মার রাযি, তার নিকট হতে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ রাযি, তার নিকট হতে আবু হুরায়রাহ রাযি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে যদি বনী ইসরাঈল না হত তবে গোশত কভু পঁচন ধরিত না। আর যদি হাওয়া আ. না হতেন তবে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর কভু খিয়ানত করত না।

উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মান্না-ছালওয়া নাযিল করেন, তখন বনী ইসরাঈলদেরকে মান্না-ছালওয়া সঞ্চয়

করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার নিষেধের পরিপন্থী কাজ করে এবং তা সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে, যার দরুন সে মুহূর্ত হতেই গোশত পঁচতে তাকে।

ইবনে মাজাহ হযরত আবু দারদা রাযি হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম সা. ইরশাদ করেন যে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের প্রধান খাদ্য গোশত। আর ইহাও বর্ণিত যে, রাসূল আকরাম সা.-এর নিকট যখন কোথাও হতে হাদীয়া স্বরূপ গোশত আসত তখন তিনি তা গ্রহণ করতেন। আর যদি তাঁকে গোশতের দাওয়াত দেয়া হত তবে তিনি সে দাওয়াত মঞ্জুর করতেন।

আরও এক বর্ণনায় রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও উন্নত মানের হল গোশত। পশ্চাৎ দেশের শায়খ বুরহানুদ্দীনের ভাষ্য যে–

لما رايت سلوى عر مطلبه + عنكم وعقد اصطبارى مار محلولا

এবং যখন আমি দেখতে পাই যে, তোমা হতে সালওয়া পাওয়া দুষ্কর, আর আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে।

دخلت بالرغم من تحت طاعتكم + ليقض الله امر كان مفعولا

আমি অসন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের অনুসরণ করি, যেন আল্লাহ তাআলা প্রত্যাশিত বিষয়টি পূর্ণ করেন। এটা খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হালাল।

চিকিৎসায় সালওয়া

যদি কোন ব্যক্তি চক্ষু জাপসা রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সালওয়ার চক্ষু তার শরীরে জুলিয়ে দেয়ায় তা সুস্থ হয়ে উঠবে। আর যদি তার চক্ষু সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে কলিজা রোগের উপকারে আসবে। তার পায়খানা শুকিয়ে চূর্ণ করে খোস-পাঁচড়া জনিত ক্ষতস্থানে মালিশ করলে অনেক উপশম লাভ করা যায়। আর যদি তার মাথা কবুতরের আড্ডায় দাফন করা হয় তবে ঐ স্থান হতে যত সব পোকা-মাকড় পলায়ন করবে এবং তার ধোয়া গৃহে দেয়ার দ্বারা যতসব পোকা-মাকড় সেখান হতে বিতাড়িত হবে।

স্বপ্নে সালওয়া দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে সালওয়া দেখার ব্যাখ্যা স্বল্প পরিসরের বিদায়, শত্রু হতে নিরাপদ, কল্যাণ এবং রিযিক অনায়াসে অর্জিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। স্বপ্নে তা দেখার ব্যাখ্যা-দানের অপব্যবহার, মসিবত হতে হেফাজত, সংকীর্ণ জীবন ব্যবস্থার পরিচয়। কেননা যখন বনী ইসরাঈলেরা মান্না-সালওয়া পরিবর্তনার্থে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, হে আমাদের প্রভু! তার প্রতি আমাদের অনীহা, আমাদেরকে অন্য কোন বস্তু যথা পিয়াজ, শশা ইত্যাদি নিয়ামত দান করুন। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে,

اتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير

তোমরা উত্তম বস্তুকে তার নিম্নমানের বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করতে চাও? আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

৪৩৭. আছ-ছুমানী (السمانى) ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখি

السمانى (ছিনের উপর পেশ এবং নুনের উপর যবর) এক উক্তি অনুপাতে زبيدى ইহা حبارى এর ওজনে আসে। এ প্রাণী জমিনে থাকে, নিজ হতে এ প্রাণী উড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত একে উড়ানো না হয়। এ প্রাণীকে আরববাসী فى قتيل ارعد -ও বলে। কেননা ইহা বজ্র গর্জনে মারা যায়। বলা হয় যে, ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির বাচ্চা ডিম হতে বের হয়ে উড়তে থাকে। এর মধ্যে আশ্চর্য এক বিষয় হল, এরা শীতকালে নীরব থাকে, বসন্তের আগমনকালে এ পাখি বলা শুরু করে। এদের খাদ্য দুটি মারাত্মক বিষাক্ত কাবাব। যার আরবী নাম আবেশ, বিশা بيشاء, ابيش। ইহা সে সব পাখির মধ্য হতে যাদের সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত নয় যে, সে কোথা হতে আসে। কেউ কেউ ধারণা করে যে, এ লড়াইবাজ পাখি লবণাক্ত সমুদ্র হতে আসে। কেননা তাকে ঐ সমুদ্রে উড়তে দেখা যায় এবং এও দেখা যায় যে, এর এক বাহু পানিতে ডুবানো অপর বাহু পানিমুক্ত। মিসরবাসীদের নিকট তা অধিক প্রিয়, তারা চড়া মূল্যে ক্রয় করে।।

ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির শরয়ী বিধান

সর্বসম্মতিক্রমে ইহা খাওয়া হালাল।

চিকিৎসায় ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখি

এর গোশত শুস্ক। তবে এর তাজা গোশত খুবই উত্তম। ইহা ভক্ষণ করলে জোড়া ব্যথা দূরীভূত হয়। কিন্তু গরম মেজাজ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কলিজার জন্য ক্ষতিকর। তবে এর প্রতিষেধক ধনিয়া এবং সিরকা। এর গোশত গরম রক্ত সৃষ্টি করে। ঠাণ্ডা মেজাজবিশিষ্ট ও বৃদ্ধদের জন্য উপযোগী। ইহা ধারাবাহিক ব্যবহারে মূত্রথলীর পাথর শেষ হয়ে যায় এবং প্রস্রাব পরিষ্কারভাবে হয়। যদি এ পাখির গোশত লাগাতার ভক্ষণ করে তবে হৃদয়ের কঠোরতা দূরীভূত হয়ে কোমলতা সষ্টি হয়। বলা হয় যে, এ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র এ পাখির কলিজার জন্য প্রযোজ্য।

স্বপ্নে ক্ষুদ্র লড়াইবাজ পাখির ব্যাখ্যা

একে স্বপ্নে দেখা চাষীদের জন্য লাভবান ও উন্নতি বহন করে। কখনও খেলাধুলা এবং অমিতব্যয়িতার প্রমাণ বহন করে। স্বয়ং দ্রষ্টা এ শাস্তির কবলে নিমজ্জিত হওয়ার পরিচায়ক, যার ফল দাঁড়ায় বাধ্যতা।

৪৩৮. আছ-ছামহাজ (السمحج) মাদী গাধা

السمحج : দীর্ঘ পৃষ্ঠবিশিষ্ট মাদী গাধা অথবা ঘোড়ী উভয়কে বোঝায়। তবে পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার হয় না।

৪৩৯. আছ-ছিমঈ (السمع) নেকড়ে বাঘের শাবক

السمع : (ছিন যেরের সাথে, মীম সাকিনের সাথে এবং শেষে আইন মুহমেলাহ)। এ নেকড়ে বাঘের শাবক। যা বেজীর সাথে সঙ্গমে জন্ম হয়। এ এমন এক হিংস্র প্রাণী যার ভিতরে বেজীর কঠোর শক্তি এবং বাঘের সাহসিকতা সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়। জাওহারী বলেন سمع এমন বাঘ যা ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। তার উরুতে গোশত পরিমাণে স্বল্প হয়। জাওহারী এ কথাও বলেন, প্রত্যেক বাঘ স্বভাবতঃই দুর্বল। এ গুণটি তার জন্য আবশ্যকীয়। যেমন হায়েনার গুণ লেংড়া হওয়া। কবি বলেন–

قراه حديد الطرف ابلج واضحا + اغر طويل الباء اسمع من سمع

তুমি তাকে দেখতে পাবে গভীর দৃষ্টিপাতকারী ও প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রবণকারী। বলা হয় এর লাফ বিশ, ত্রিশ গজ দৈর্ঘ্যের কম নয়; বরং অধিকন্তু এর চেয়েও বেশি ছেড়ে যায়।

ইবনে যুফার স্বীয় "খাইরুল বাশার বি খাইরিল বাশার নামক গ্রন্থে রবীয়াহ ইবনে আবি নাযযার হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার মামা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন হুনাইন যুদ্ধে রাসূল সা.-কে বিজয় দান করলেন,তখন আমরা উপত্যকায় আশ্রমে বসি এবং আমাদের মাঝে এত আপন মঙ্গল কামনাকারী ছিল যে, বন্ধু বন্ধু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তিনি বলেন, আমি যখন একটি উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন একটি মেয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে, যাকে সাদা কালো সাপ পেঁচিয়ে রাখছিল আর বালিকাটি কোন দিকে লক্ষ্য না করে দৌড়াতে ছিল। আমি এ দৃশ্য দেখে একটি পাথর উঠিয়ে সাপের দিকে ছুড়ে মারি এবং পাথর ঐ সাপকে আঘাত করে খণ্ড খণ্ড করল, আর আমি উঠে বালিকাকে দেখতে যাই। সেখানে যেয়ে দেখি যে, বালিকা তো আমার পৌছার পূর্বেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, আর সাপটি ধড়ফড় করছিল।

হঠাৎ এক আহ্বানকারী আমাকে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজে আহ্বান করছে যে ভয়ঙ্কর আওয়াজ ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। সে বলছে– তুমি এক সরদারকে হত্যা করেছ এবং তোমার ইহা ভুল পদক্ষেপ। তারপর সে ইয়া দাসির, ইদা দাসির (يا داثر , يا داثر) বলে ডাকতে শুরু করল। অপরদিক হতে একজন উত্তরদাতা উত্তর দিল– আমি হাজির, আমি হাজির (لبيك , لبيك) অতঃপর ঐ ব্যক্তি উত্তরদাতাকে সম্বোধন করে বলল যে, বনী গাদাফের নিকটে দ্রুতবেগে চলে যাও এবং বল যে এই কাফের কী সর্বনাশ করে ফেলেছে। আমি চিৎকার করে তাকে বললাম যে, ভলবশতঃ আমার পক্ষ হতে ইহা হয়ে গিয়েছে, আমি তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমরা আমাকে দয়া কর। প্রতিউত্তরে

তিনি বলেন– কখনও এমনটি করতে পারি না। আমি এক মুসলমানের হত্যাকারী এবং গাইরুল্লাহর পূজারীকে কখনও আশ্রয় দিতে পারি না। অতঃপর আমি উচ্চ আওয়াজে বললাম যে– আমি মুসলমান হতে আগ্রহী। সে বলল যে, যদি তুমি মুসলামন হও তবে তোমার উপর আরোপিত কেসাসের হুকুম উঠে যাবে এবং তুমি মুক্তি লাভ করবে। আর যদি এমনটি না কর তবে যেকোন সময় তোমার জান চলে যাবে। আমি তাৎক্ষণিক কালেমা শাহাদাত পাঠ করে নিলাম। অতঃপর আওয়াজ আসে–তুমি মুক্ত ও হেদায়েত লাভ করেছে। আর যদি তুমি মুসলামান না হতে তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতে। এখন তুমি যেখান হতে আগমন করেছ সেখানে চলে যাও।

অতএব আমি নিজের পদচিহ্ন অনুসরণ করে প্রত্যাবর্তন করি এবং তাকে বলতে শুনেছি যে–

امتط السبع الازل + يعل بك التل

"এক দ্রুত চলন্ত বাঘের উপর সওয়ার হও, সে তোমাকে এক উপত্যকায় পৌছিয়ে দিবে।"

فهناك ابو عامر + يتبع بك الفل

"যেথায় তুমি আবু আমিরের সাক্ষাত লাভ করবে, সে উড্ডিয়মান অসি নিয়ে তোমার পিছনে চলবে।"

আমি ফিরে দেখি যে, সত্যিই সেখানে একটি বড় বাঘ দণ্ডায়মান।

সুতরাং আমি তার উপর সওয়ার হই। সে আমাকে নিয়ে চলতে শুরু করে এবং এক উপত্যকায় পৌছে। তার মাথার খোঁপায় উঠিয়ে সেখান হতে আমাকে মুসলিম সৈন্য দেখিয়ে দেয়। তার উপর হতে মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে সৈন্যদের দিকে গমন করি। যখন সৈন্যদের নিকটবর্তী হই তখন সৈন্যদের মধ্য হতে এক সিংহারোহী বের হয়ে সম্মুখে আসে এবং বলতে থাকে যে, হাতিয়ার ফেলে দাও, আমি হাতিয়ার ফেলে দেই। পুনরায় সে আমাকে প্রশ্ন করে যে, তুমি কে? প্রতিউত্তরে আমি বললাম যে, আমি মুসলমান। এ শুনে সে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু বলে। আমি উত্তরে ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু বলি এবং আরও প্রশ্ন করি যে, তোমাদের মধ্যে আবু আমের কে? সে উত্তর দেয় যে, আমাকেই আবু আমের বলে। এ শুনে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি। পুনরায় তিনি বললেন যে, তোমার কোন ভয় নাই, সম্মুখে এরা সকলেই তোমার মুসলমান ভাই। পুনরায় তিনি বলেন, আমি তোমাকে উপত্যকায় সওয়ার দেখেছি, সে ঘোড়া কোথায়? আমি তাকে পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি, যারা শ্রবণ করেছেন তারা প্রত্যেকে আশ্চর্য বোধ করেন। অতঃপর আমি মুসলমানদের সঙ্গে মিলে হাওয়াযিন গোত্রের সন্ধানে বের হই। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আশা পূর্ণ করেন। হাওয়াযিন গোত্রকে পরাজয় ভোগ করিয়ে মুসলমানদের বিজয় সাধিত হয়।

শরীয়তে নেকড়ে বাঘের শাবক

একে ভক্ষণ করা হারাম। যদি মুহরিম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তাকে হত্যা করে তবে তার ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে কি না এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল কাসাস বলেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে, এর হেতু মুহরিমের জন্য অন্তরায় করা জায়েয নয়।

উদাহরন ও প্রবাদ বাক্য

ক্ষীণ ও দুর্বলের উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় اسمع من سمع অমুক ব্যক্তি বাঘের শাবকের অপেক্ষা অধিক দুর্বল। বাঘের শাবক দ্বারা উদাহরণ পেশ করার কারণ হল, বাঘের শাবকের জন্য দুর্বলতা আবশ্যক, যদিও বেজীর জন্য ল্যাংড়া হওয়া আবশ্যক।

৪৪০. আস-সামায়িম (السمائم) আবাবিল সাদৃশ্য এক প্রকার পাখি

৪৪১. আছ-ছিমছাম (السمسم) খেঁকশিয়াল

খেঁকশিয়ালের আলোচনা সামনে আসন্ন।

৪৪২. আছ-ছিমছুমাহ (السمسمة) লাল পিপীলিকা

السمسمة (ছিনের নিচে যের) ইহা লাল পিপীলিকা। এর বহুবচন سماسم আসে। ইবনে ফারেছ স্বীয় মুযমাল গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, السمسمة ছোট পিপীলিকাকে বলে। এ অর্থেই হাদীসের ব্যাখ্যা করেন, যা হযরত ইমাম মুসলিম রহ. হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণনা করেন–রাসূল আকরাম সা. ইরশাদ করেন, শাস্তি ভোগ করার পর মুসলমানদের একটি দলকে জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে। ঐ সময় তাদেরকে কালো লাকড়ি সাদৃশ্য মনে হবে। তারা জান্নাতের এক নহরে গোসল করবে। গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন সাদা কাগজ। عيدان السماسم সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নববী রহ. বলেন, سماسم , سمسم -এর বহুবচন আর ছিমছুম প্রসিদ্ধ এক বীচ, যার তৈল নির্গত করা যায়। (একে হিন্দুস্তানে তিলও বলা হয়)।–অনুবাদক মুহাম্মাদ ইরফান সরদহনী।

আবু সায়াদত ইবনুল আছির বলেন, سماسم , سمسم -এর বহুবচন। তিল বৃক্ষের কাণ্ড বিশেষ। যখন ইহা হতে বীজ বের করে রাখা হয়, ঐ সময় তা অনেক তরল হয়, আর এমন পরিমাণ কালো হয় যেন মাত্র আগুন হতে বের করা হয়েছে।

ইমাম নববী রহ. বলেন, আমি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ কাল পর্যন্ত এ শব্দের বিশুদ্ধ অর্থের অনুসন্ধানে ছিলাম এবং লোকদের নিকট বহু জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কার নিকট হতে মনঃপূত কোন সমাধান পাই নাই। সম্ভবতঃ এ শব্দ রচিত হয়েছে কখনও عيدان السماسم দ্বারা কালো লাকড়ি উদ্দেশ্য। যেমন আনুছ ইত্যাদি।

কাজী ইয়াজ এবং অন্যান্য উলামাদের একই বক্তব্য। উল্লেখিত শব্দার্থ জানা যায় নাই। হয়তো এমন লাকড়িকে বলা হয় যা কালো, যেমন আনুছ ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

৪৪৩. আছ-ছামাক (السمك) মৎস্য

السمك : মৎস্য পানিতে সৃষ্ট প্রসিদ্ধ এক প্রাণী। একবচন سمكة বহুবচন اسماك ও اسموك আসে। ইহা পানির বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এরই বিন্যাস হাদীস শরীফে টিড্ডির আলোচনার নিম্নাংশে আলোচিত হয়েছে। সেথায় রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্ট জীব এক হাজার গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে ছয়শত পানিতে আর চারশত মাটিতে বিস্তার করান। এক শ্রেণীর মৎস্য এমন রয়েছে যে, তার শুরু এবং শেষ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদের বিস্তৃতির কারণ এবং এমন ক্ষুদ্র হওয়ার কারণ এই যে, দৃষ্টি তাদের দর্শনে অক্ষম। ঐসব শ্রেণীর বাসস্থান পানিতে। তারা পানিতে এমনভাবে শ্বাস গ্রহণ করে যেমন মানুষ ও অন্যান্য স্থলভাগের প্রাণীরা বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করে। মৎস্য স্বীয় জীবন ধারণের জন্য বাতাসের প্রতি অমুখাপেক্ষী, তবে মানুষ ও প্রাণীসমূহ বাতাসের প্রতি মুখাপেক্ষী। এর কারণ হল, মৎস্য জাতিগতভাবে ভূমিজগত হতে, হাওয়া জগতের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নাই।

জাহেযের বক্তব্য যে, মৎস্য পানির তলদেশে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ করে, ভাসমান পানিতে নয়। শুষ্ক মৃদুমন্দ বাতাস যেসব প্রাণীর জীবন পরিবেষ্টন করে রয়েছে, যদি তা এক ঘণ্টাও মৎস্যের উপর জারি করা হয় তাহলে তাদের জীবন বিনাশ ঘঠবে। সুতরাং কোন কবির পংক্তি–

تغمة النشوة والنيسم + ولا يزال مغرقا يعوم

"সুঘ্রাণ ও সুগন্ধবহ বায়ু তাকে চিন্তায় ফেলে দেয়, এজন্য সেখান হতে স্থান্যুত হয় না, আর তাকে আহার করে।"

উপরোল্লিখিত পংক্তিতে মৎস্য সংক্রান্ত উম্ম (ام) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং বুঝা যায় যে, মানুষ ব্যতীতও উম্ম শব্দ ব্যবহার করা জায়েয। কবি বলেন, মৎস্য তাকে আহার করে ফেলে, এরই ভিত্তিতে কতক মৎস্য এমনও

আছে যে, তাদের রিযিক মাছই হয়ে থাকে। এজন্য কতক তাদের কতককে আহার করে। এরই ভিত্তিতে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীবের মধ্যে মৎস্য সবচেয়ে অধিক।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, জাহেযের বক্তব্য যে, মৎস্য বাতাসের কারণে মারা যায়, সাধারণত এ উক্তিটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা আল্লামা ইমাম গাযযালী রহ. কতক মৎস্যসমূহকে এ পদ্ধতিতে পার্থক্য করেন যে, অর্থাৎ মায়ের কতক শ্রেণী এমন রয়েছে যে, তারা বাতাসে জীবিত থাকতে সক্ষম। এক শ্রেণীর মৎস্য এমন যারা সমুদ্রের পানির উপর উড়তে থাকে আবার কিছুদূর গিয়ে গিয়ে পড়ে ডুবে যায়। কবি বলেন–

ليس الجواشن خرف الودى + عليهن من فوقهن الخوف

"মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে, আর মাথায় পরে লোহার টুপি।"

فلما اتيح لها اهلكت + ببرد النسيم الذى يستلذ

"কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত তখন ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস নিক্ষেপে তাকে হত্যা করে, অথচ এ নিক্ষেপই প্রাণের প্রশান্তি।"

মৎস্যের পাকস্থলি তার মুখের সন্নিকটে হওয়ার কারণে সে ঠাণ্ডা মেজাজ প্রকৃতির হয়। এরই কারণে সে অধিক আহার করে। মৎস্য স্কন্ধহীন, আর তার পেটে বাতাস একেবারেই প্রবেশ করে না এবং সে কথাও বলতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, মৎস্যের ফেপরা হয় না। প্রসিদ্ধ বিষয় যে, ঘোড়ার প্লীহা ও উটের পিত্ত এবং হাঁসের গোর্দা হয় না। বড় মৎস্য ছোট মৎস্যকে ভক্ষণ করে। এজন্য ছোট মৎস্য চত্বরে স্বল্প পানিতে চলে আসে। কেননা বড় মৎস্য স্বল্প পানিতে অবস্থান করতে অক্ষম। মৎস্য সর্পের মত দ্রুত গতিতে চলে। কিছুসংখ্যক নর ও মাদী মৎস্যের সঙ্গমে সৃষ্টি হয়, আর কিছু সংখ্যক কাদা হতে সৃষ্টি হয়। আর মৎস্যের ডিম সাদা হয় না, হলুদও হয় না, বরং ভিন্ন এক রঙের হয়।

মৎস্যও পাখির মত কাওয়াতি (قواطع) ও আওয়াবিদ (اوابد) হয়। قواطع (কাওয়াতি) ঐসব প্রাণীকে বলা হয় যারা সর্বাবস্থায় একস্থানে অবস্থান করে। এ কারণে কিছু সংখ্যক মৎস্য কোন মৌসুমে আসে এবং কোন মৌসুমে আসে না। মৎস্য শ্রেণীতে ছাকানকুর, ডলফিন, আম্বর ইত্যাদিও শামিল যার আলোচনা জাগায় জাগায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

এক শ্রেণীর মৎস্য যারা সর্প আকৃতির হয়, এ শ্রেণীর মৎস্যকে লোকেরা সচরাচর মৎস্য মা বলে থাকে–অনুবাদক। এক শ্রেণীর মৎস্য যাকে আরবী ভাষায় رعادة গর্জনকারী মৎস্য বলে। এ একটি ছোট মৎস্য। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য

এই যে, এরা যখন জালে আবদ্ধ হয় আর যদি জালটি শিকারীর হাতে থাকে, তখন তার হাত কম্পমান থাকে। শিকারী যেহেতু এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সেহেতু যদি কখনও এ জাতীয় মাছ জালে আসে তখন তার রশি কোন বৃক্ষের সাথে বেঁধে রাখে। ঐ রশি ততক্ষণ পর্যন্ত খুলে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাছ না মারা যায়। কারণ তার মৃত্যুর পর এ বৈশিষ্ট্য আর বাকি থাকে না।

শায়খ শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বুসাইরী, কাসিদায়ে বুরদাহর লিখক শায়খ জয়নুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে রিয়াদ সম্পর্কে চমৎকার কথা বলেন–

لقد عاب شعرى فى البرية شاعر + ومن عاب اشعارى فلابد ان يهجى

"মানুষদের মধ্য হতে শুধুমাত্র এক কবি আমার পংক্তিতে দোষ লাগায়, আর যে ব্যক্তি আমার পংক্তিতে দোষ লাগাল তার বিদ্রুপ করা উচিত।"

فشرى بحر لا يرى فيه ضفرع + ولا يقطع الرعاديوما له لجا

"আমার পংক্তিগুলী সমুদ্রের মত যেথায় ব্যাঙের নাম ও চিহ্নমাত্র নাই।"

আর রায়াদ মৎস্য (ইবনে রায়াদ উল্লেখিত কবি উদ্দেশ্য) তার ধ্বংস কোন দিনও বন্ধ করতে পারবে না। হিন্দুস্থানের হাকীম এ মৎস্যকে এমন রোগের জন্যে ব্যবহার করে যে রোগ প্রচণ্ড গরমের কারণে হয়। ইবনে সায়িদাহ বলেন, যদি এ মৎস্য কোন مصروع অর্থাৎ মৃগী রোগীর পার্শ্বে রাখা হয় তাহলে অনেক উপশম লাভ করবে। যদি কোন মহিলা এ মৎস্যের অংশবিশেষ নিজের শরীরের কোথাও ঝুলিয়ে রাখে, তবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে না। আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের মধ্যে এত পরিমাণ আশ্চর্য ও বিরল বস্তু রেখেছেন যার পরিবেষ্টন অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা.-এর এ হাদীস যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।–

حدثوا عن البحر ولا حرج

"সমুদ্র সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নাই। এক ধরনের মাছ যাকে শায়খুল ইয়াহুদী বলে, এর বর্ণনা 'শীন' পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

একটি আশ্চর্য কাহিনী

কাযবিনী রহ. আজাইবুল মাখলুকাত গ্রন্থে লিখেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে হারুন আল মাগরাবী বর্ণনা করেন যে, একদা আমি পাশ্চাত্যের সমুদ্র জাহাজে সওয়ার হই। আমাদের সঙ্গে সাকলিয়া স্থানে অবস্থানকারী একটি ছেলে ছিল, তার নিকট মাছ ধরার রশি ও বড়শি ছিল। আমাদের জাহাজ যখন বরতুন নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন ঐ ছেলেটি রশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল তাতে বিঘত ভর্তি মৎস্য আসল, ছেলেটি তা বের করল। আমরা যখন ঐ মৎস্য দেখি তখন

আমরা অনুভব করি যে, তার ডান কানের উপরের দিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لااله الاالله) এবং নিচের দিকে মুহাম্মাদ (محمد) এবং তার বাম কর্ণের নিচে رسول الله ص লেখা ছিল।

আবু হামেদ ইন্দুলুছি তুহফাতুল আলবাব গ্রন্থে লিখেছেন যে, রোম সাগরে একটি মৎস্য আছে যাকে তলব (تلب) বলে। যদি তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয় যতক্ষণ তা বন্ধি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা মারা যাবে না' বরং লাফালাফি করতে থাকবে। আর যদি তাকে কর্তন করে এক টুকরা আগুনে রাখা হয় তৎক্ষণাত তা লম্ফ দিয়ে বাইরে চলে আসে। কখনও এত দ্রুত লম্ফ দিয়ে বাইরে আসে যে, পার্শ্বে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদের বক্ষে এসে লাগে। যখন এ মৎস্যকে কোন পাতিলে রান্না করা হয় তখন লোহা অথবা পাথর দ্বারা পাতিলের মুখ ঢেকে দিবে, যেন তার কোন অংশ পাতিল হতে বের হয়ে না আসে। তা পরিপূর্ণ রান্না না হওয়া পর্যন্ত মরবে না, চাই তাকে সহস্র টুকরা টুকরা করা হউক তবুও মারা যাবে না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. যুহুদ গ্রন্থে নওফ বকালী হতে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি মুমিন ও কাফির উভয়ে মিলে একত্রে মাছ শিকার করতে গমন করে। কাফের স্বীয় দেবতা ও মুমিন স্বীয় আল্লাহর নাম নিয়ে জাল ফেলে। কাফের মৎস্য শিকারী যতবার নিজের জাল বের করে, মৎস্য দ্বারা ভরপুর বের করে। আর মুমিন যখন জাল বের করে তখন একবারে মাছশূন্য জাল বের করে। সন্ধা পর্যন্ত এক অবস্থায় চলে। চলন্ত পথে একটি মাছ মুমিনের হস্তগত হয়, সেটিও হাত হতে ছুটে পানিতে পড়ে যায়, ফলে মুমিন একবারে মৎস্যশূন্য হাতে ছিল। আর কাফিরের থলি ছিল মৎস্যে ভরপুর।

মুমিনের ফেরেশতা এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে আফসোস করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে যে, হে আমার প্রভু! মুমিন বান্দা যে আপনারই নাম নেয়, সে তো শূন্য হাতে ফিরতেছে। আর কাফির যে আপনার বিপক্ষে অন্যের উপাসনা করে, সে তো থলি ভর্তি মৎস্যসহ ফিরতেছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনের বাসস্থান জান্নাত আর কাফিরের বাসস্থান জাহান্নাম দেখিয়ে ইরশাদ করেন যে, জান্নাতের এ বাসস্থানের বিনিময়ে (যখন সেথায় সে অবস্থান করবে) দুনিয়ার এ হস্ত সংকীর্ণতায় তার কোন ক্ষতি হবে না। এখন তুমি বল কাফেরকে তার ধন-সম্পদ এ বিশাল শাস্তি হতে সামান্য পরিমাণ দিবে? ফেরেশতা প্রতিউত্তরে বলেন, হে প্রভু! কখনও নয়।

সাফওয়াতু সফওয়া গ্রন্থে আবুল আব্বাস ইবনে মাছরুক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন–আমি ইয়ামানে ছিলাম। সেথায় আমি একজন মৎস্য শিকারীকে সমুদ্র উপকূলে বসে মৎস্য শিকার করতে দেখি এবং তার এক পার্শ্বে তার একটি ছোট কন্যা বসা ছিল। যখন সে ছোট মৎস্য ধরে জমিনে রাখেন তখন কন্যা

তাকে ধরে পিতার অজান্তে সমুদ্রে ছেড়ে দেয়। একবার ঐ শিকারী পেছনে ফিরে দেখতে ইচ্ছা করে যে, কতগুলী মৎস্য হয়েছে? সে দেখল যে, তার থলি একেবারে শূন্য। সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করল যে, হে কন্যা! সে মৎস্য কোথায় গিয়েছে? কন্যা প্রতিউত্তরে বলে যে, আব্বাজান! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন– মৎস্য যখন জালে উঠে আসে তখন তারা আল্লাহ তাআলার যিকির হতে গাফেল থাকে। ইহা আমার নিকট অপসন্দনীয় যে, আমি এমন প্রাণী আহার করব, যারা আল্লাহ তাআলার যিকির হতে গাফেল হবে। কন্যার এ উত্তর শ্রবণ করে সে জলস্রোতে পড়ে যায় আর জাল নিক্ষেপ করে দেয়। সওয়াব গ্রন্থ হযরত নাফে' রাযি হতে বর্ণিত যে, হযরত উমর রাযি. অসুস্থাবস্থায় তাজা মৎস্র খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত নাফে' রাযি. বলেন, আমি শহরে বহু সন্ধান করেছি কিন্তু তা পাই নাই। দীর্ঘদিন পর মৎস্য পাওয়া গেল। আমি দেড় দিরহাম মূল্যে ক্রয় করি এবং তাকে ভাজা করে একটি রুটি সহ তাঁর সামনে নিয়ে যাই। এ মুহূর্তে এক সওয়ালকারী দরজায় এসে সওয়াল করে। তিনি দাসকে বলেন, মৎস্যতে রুটি বিছিয়ে এ সওয়ালকারীকে প্রদান কর। দাস প্রার্থনা করে বলে যে, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। দীর্ঘকাল ধরে আপনি মাছ খাওয়ার আশা করেন, আর মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন যেহেতু অনেক প্রচেষ্টার ফলে হস্তগত করে দেড় দিরহাম মূল্যে ক্রয় করে আপনার জন্য রান্না করি, আর আপনি সওয়ালকারীকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা কখনও এ মৎস্র দিব না; বরং এর পরিবর্তে মৎস্যের মূল্য সওয়ালকারীকে দিয়ে দিব। কিন্তু তিনি গোলামের কোন কথায় কর্ণপাত না করে পুনরায় একই নির্দেশ দেন যে, রুটিসহ মাছটি ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। অতএব গোলাম রুটি ও মৎস্য নিয়ে ভিক্ষুকের নিকট আসেন এবং এর পরিবর্তে তাকে এর মূলের উপর রাজি করান এবং মূল্যও পরিশোধ করেন। পুনরায় সে গোলাম মৎস্য নিয়ে হযরত উমর রাযি.-এর খেদমতে হাজির হয়ে দরখাস্ত করেন যে, আমি ভিক্ষুক হতে মৎস্র এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছি, এখন আপনি ইহা ভক্ষণ করুন। ইহা শ্রবণ করে তিনি তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করেন এবং পুনরায় ঐ বক্তব্যই প্রদান করেন যে, এ রুটিসহ মাছ ভিক্ষুককে দিয়ে দাও এবং যে মূল্য তুমি তাকে প্রদান করেছ তা আর ফিরত নিবে না। কেননা আমি নবী করীম সা.-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যদি কার কোন কিছু খাওয়ার সাধ জাগে, আর সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিয়ে কোন অভাবীকে দান করে তবে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

হযরত নাফে' রাযি. হতে বর্ণনা করেন। তা এই যে, তিনি কোন এক সময় রোগাক্রান্ত হন আর তার আঙ্গুর খাওয়ার সাধ জাগে। সুতরাং এক দিরহামের বিনিময়ে আঙ্গুর গুচ্ছ ক্রয় করে তার নিকট নিয়ে আসেন। এ মুহূর্তে এক ভিক্ষুক আগমন করে, আর তিনি ঐ আঙ্গুর গুচ্ছ ভিক্ষুককে দান করেন। উপস্থিত

লোকদের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তি আঙ্গুর গুচ্ছ এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে পুনরায় তার সম্মুখে পেশ করেন। তিনি পুনরায় তা সদকা করেন। ফলে তিনবার এভাবে দেয়া হয়েছিল, চতুর্থবার তিনি ভক্ষণ করেন। যদি তার জানা থাকত যে, ইহা ভিক্ষুক হতে ক্রয় করা হয়েছে তবে তিনি কখনও তা ভক্ষণ করতেন না। সুরাইজ ইবনে ইউনুছ বলেন, একদা আমি জুমার নামায পড়ার জন্য যাচ্ছিলাম। এক দোকানে দুটি রাজা মাছ দেখতে পাই। তা দেখামাত্র শিশুদের জন্য ক্রয় করার আগ্রহ জন্মে, কিন্তু আমি কিছুই না বলে সোজা নামাযে চলে যাই। নামাযান্তে গৃহে ফিরে আসা মাত্রই কে যেন দরজায় নাড়া দেয়। লক্ষ্য করে দেখি যে, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান এবং তার মাথায় একটি বড় পাত্র রয়েছে, যাতে রাজা মাছ, সিরকা এবং পাকা সামান্য খেজুর ছিল। সে এ পাত্র আমাকে প্রদান করে বলেন, হে আবুল হারস! ইহা নাও এবং শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আহার কর। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমি সুরাইজ ইবনে ইউনুছকে এ বলতে শুনেছি যে, আমি রাব্বুল ইজ্জাতকে স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেন, হে সুরাইজ! তোমার প্রয়োজন আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি প্রার্থনা করি যে, হে আমার প্রভু! ছের বছের প্রণেতা বলেন, ছের বছের আজমী শব্দ, যার অর্থ রাছুন বরাছুন (راس براس)।

তারিখে ইবনে খালকান গ্রন্থে সুরাইহ ইবনে ইউনুছ, আবুল আব্বাস, যিনি ইমামুল ফুকাহের দাদা ছিলেন।

মৎস্যের শরয়ী বিধান

সকল শ্রেণীর মৎস্য জবাই করা ব্যতীত হালাল, চাই তা মৃত হউক বা না হউক। মৃত্যুর প্রকাশ্য কারণ উপস্থিত হউক যেমন জালে পেচিয়ে মরণ। অথবা প্রকাশ্য মরার কোন কারণ না হউক সর্বাবস্থায় হালাল। কেননা এর পূর্বে এ হাদীস অতিবাহিত হয়ে গেছে।

احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال.

জনাব রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দুটি মৃত হালাল করে দেন, অর্থাৎ মৎস্য ও টিড্ডি এবং দুটি রক্ত হালাল করে দেন, যকৃৎ ও প্লীহা।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জবাইকৃত ব্যতীত মৎস্য ভক্ষণ করা হালাল। তা হালাল হওয়ার দ্বিতীয় দলিল এই যে, মুসলিমগণ এর উপর ঐক্যমত যে, মৃত মৎস্য পবিত্র। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ 'আইন' পরিচ্ছেদে ঐ হাদীসের অধীনে আলোচনা করা হবে। আবু উবাইদাহ রাযি. একটি মৎস্য লাভ করেন যা হতে জনাব নবী করীম সা.-ও আহার করেন।

ফেকায় মৎসের মাসয়ালা

১। মাসয়ালা : অগ্নিপূজকের শিকারকৃত মৎস্য পবিত্র। তার হতে ক্রয় করে তা ভক্ষণ করা জায়েয।

দলিদ : হযরত ইমাম হাসান রাযি. বলেন, আমি সত্তরজন সাহাবীকে দেখেছি যে, তারা অগ্নিপূজকের নিকট হতে মৎস্য ক্রয় করে ভক্ষণ করতেন এবং তাদের অন্তরে কোন কিছুর খটকা ছিল না।

উল্লেখিত হুকুম শুধুমাত্র মাছ সম্পর্কে মুত্তাফাকুন আলাইহি। তবে ইমাম মালেক রহ. টিড্ডি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

২। মাসয়ালা : মাছ জবাই করা মাকরূহ, তবে যদি মাছটি বড় আকৃতির হয় তাহলে জবাই করে নেওয়া মুস্তাহাব, যেন তার রক্তাকৃতির অপবিত্রতা বের হয়ে আসে।

৩। মাসয়ালা : যদি চোট আকৃতির মাছ তার অপবিত্রতা পরিষ্কার করা ব্যতীত রান্না করার পর তার পাকস্থলির অপবিত্রতা বের হয় নাই, তবুও তা ভক্ষণ করা জায়েজ, তা পবিত্র।

৪। মাসয়ালা : মৎস্য ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণীদের ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া জায়েয কি না? কোন কোন ফকিহগণ তাদের অভিমত পেশ করেন যে, ব্যাঙ ব্যতীত অন্য সব সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া জায়েয, যদি তা মানুষের আকৃতির সাদৃশ্য না হয়। শাফেয়ী মাযহাবের পূর্ববর্তীগণের মধ্য হতে আবু আলী আত-তিবী তিনি এ মাযহাবকে গ্রহণ করেন। শরহুল কানিহ গ্রন্থে উল্লেখিত যে, আবু আলী আত তিবীর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি ঐ সামুদ্রিক প্রাণী মানুষের আকৃতির হয়, তবে তা খাওয়া জায়েয? প্রতিউত্তরে বলেন, হ্যাঁ, জায়েয; যদি আরবী ভাষায় কথোপকথনে সক্ষম না হয় এবং বলে যে, অমুক অমুক ইবনে অমুক, তার এ কথা সত্যায়িত করা যাবে না।

কোন কোন ফকিহগণ বলেন, সামুদ্রিক সমগ্র প্রাণী ব্যবহারযোগ্য, তবে সেসব প্রাণী বহিরাগত যেসব প্রাণী শুকর, কুকুর, ব্যাঙ আকৃতির হয়। কোন কোন ফকিহগণ এ উছুল বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক সেসব স্থলের প্রাণী যা জবাই করে খাওয়া যায়, সুতরাং তাদের সাদৃশ্য সামুদ্রিক সকল প্রাণীও হালাল হবে। এ উছুলের ভিত্তিতে এ মাসয়ালা বের হয়ে আসে যে, সামুদ্রিক কুকুর, শুকর এবং সামুদ্রিক গাধা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা এ প্রাণী এবং তার সাদৃশ্য স্থলের প্রাণী হারাম।

কোন কোন ফকিহগণ বলেন, কাঁকড়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ব্যতীত সামুদ্রিক সকল প্রাণী হালাল, চাই তা কুকুর, শুকর অথবা মানুষ এদের মধ্য হতে কার আকৃতির অথবা অন্য কোন আকৃতির হউক, প্রত্যেক আকৃতির ক্ষেত্রে এ জায়েযের হুকুম প্রযোজ্য।

৫। মাসয়ালা : যদি কেউ শপথ করে বলে যে, আমি একেবারেই গোশত ভক্ষণ করব না, তবে মৎস্য ভক্ষণ করাতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা জনসাধারণের মাঝে মাছের উপর গোশত প্রয়োগ হয় না। যদিও আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে তার উপর লাহম (لحم) গোশত ব্যবহার করেন। এ মাসয়ালাটি এমন পর্যায়ের যেমন কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, আমি প্রদীপের আলোতে বসব না এবং সে সূর্যকে প্রদীপ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় মাসয়ালার যুক্তি এটিই যে, জনসাধারণের মধ্যে সূর্যের জন্য প্রদীপ ব্যবহার হয় না। আর শপথের ক্ষেত্রে জনসাধারণ ধর্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, আমি বিছানায় বসব না, তবে জমিনে বসার হেতু তার শপথ ভঙ্গ হবে না। এর কারণ এই যে, জনসাধারণ বিছানা দ্বারা জমিন বুঝে না, যদিও আল্লাহ তাআলা জমিনকে বিছানা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– الم نجعل الارض مهادا ছামাক (سمك) (মৎস্য) শব্দ সম্পর্কে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় যে, সমগ্র সামুদ্রিক প্রাণীর উপর তার প্রয়োগ হবে, অথবা শুধু মৎস্যের উপর প্রয়োগ হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, سمك সমগ্র সামুদ্রিক প্রাণীর উপর প্রয়োগ হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, احل لكم صيد البحر وطعامه আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ করা হালাল করেছেন। طعام (ভক্ষণ দ্বারা) সমগ্র সামুদ্রিক প্রাণী উদ্দেশ্য।

মিনহাজ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, سمك -এর প্রয়োগ শুধু মৎস্যের উপর প্রয়োগ হয়।

৬। মাসয়ালা : শুধু শৎস্য ও টিড্ডির ক্ষেত্রে বায়ে সলম (بيع سلم) জায়েয, যেহেতু ব্যাপকহারে এ প্রথা প্রচলিত আছে। যে শ্রেণীর মৎস্য তলব করা হয় তা একত্রিত করা হবে। সুতরাং যে মৎস্য পানিতে আছে আর পানিতেই রেখে তা বিক্রয় করা জায়েয নাই। কেননা ইহা বায়ে মাজহুল (بيع مجهول) , অজ্ঞাত ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। সুতরাং ইমাম আহমাদ, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ হতে, আর তিনি ইয়াজীদ ইবনে আবু যীয়াদ হতে এবং তিনি মুছায়্যিব ইবনে রাফে' হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সা. ইরশাদ করেন যে, তোমরা পানিতে মৎস্য রেখে ক্রয়-বিক্রয় কর না। কেননা ইহা এক ধরনের প্রতারণা বিশেষ। কতিপয় প্রাণী এমন রয়েছে যে, যারা জল-স্থল উভয় চরে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাঙ, মশা-মাছি, সর্প, কাঁকড়া, কচ্ছপ এসব প্রাণী হারাম। এ জাতীয় কিছুসংখ্যক প্রাণীর আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং কতিপয় তারা স্ব স্ব স্থানে আসন্ন।

চিকিৎসায় মৎস্য

মৎস্যের গোশত ঠাণ্ডা এবং ভিজা। সামুদ্রিক মৎস্য সর্বাপেক্ষা উন্নত মৎস্য। যার পৃষ্ঠদেশে নকশা থাকে, আকৃতির দিক হতে ক্ষুদ্র, ইহা ভক্ষণে শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। সাধারণ মৎস্য ভক্ষণে অধিক তৃষ্ণা লাগে এবং মিশ্র শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়। তবে গরম মেজাজ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যুবকদের জন্য তা ভক্ষণ করা উপকারী। ঐ মৎস্য যা গরম মৌসুমে খাওয়া হয় এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্ম নেয় যা খুবই উত্তম মৎস্য। মৎস্য বিভিন্ন শ্রেণীর,তন্মধ্যে যেসব মৎস্য কালো ও হলুদ রং বিশিষ্ট হয় তা ভাল নয় এবং পাশাপাশি যা গোশত খেকো তাও ভাল নয়। ইব্রামিছ এবং সন্দ নামক মৎস্য পাকস্থলির জন্য ক্ষতিকারক। তা ভক্ষণে ব্যথা ও ক্রোধ সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহা খাওয়ার উপযোগী নয়। নদীর মৎস্য মসৃণ ও ভিজা জাতীয় হয়। সামুদ্রিক মৎস্য তার বিপরীতধর্মী এবং সালুর নামক মৎস্য যাকে হিবরীও বলা হয়, অধিক খাদ্যবর্ধক। পাকস্থলি ও ফপরার জ্বালা-পোড়ায় আরোগ্য দান করে এবং আওয়াজ সুস্পষ্টকারী। মারহী মৎস্য বীর্য বৃদ্ধি করে।

হাকীম ইবনে সীনা বর্ণনা করেন যে, মাছের গোশত মধুসহ ভক্ষণ করলে অবিরাম প্রস্রাবের জন্য ফলদায়ক এবং দৃষ্টিশক্তি তীব্র করে। একজন বিখ্যাত হাকীমের উক্তি যে, মাছের গোশত যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে। আল্লামা কাযবিনী বলেন, তাজা মৎস্য তাজা পিঁয়াজসহ ভক্ষণ করলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে এবং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। গরমাবস্থায় ভক্ষণ করলে উপকার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মৎস্য শুকে তবে তার নেশা দূরীভূত হয় ও জ্ঞান ফিরে আসে। মৎস্য ও সামুদ্রিক কাকের পিত্ত মিশ্রণ করে কোন কাগজে লৌহ কলম দ্বারা লেখা হয় তবে সোনালি হরফ দেখতে পাবে। মৎস্য ও চকোর পাখির পিত্ত মিশিয়ে চোখে ব্যবহার করলে প্রস্রাব বন্ধ হয়। মৎস্যের পিত্ত পানিসহ পান করাতে হৃদকম্পন রোগ নিরাময় হয়। চিনি মিশিয়ে গরগরা করলে উল্লেখিত উপকার সাধিত হয়।

মৎস্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য দেখে ও গণনা করে যদি চারটি দেখে তবে তারা তার চারজন স্ত্রী, আর যদি চারের অথিক হয়, তবে তা গনীমতের মাল। কেননা আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وهو الذى سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طريا۔

"তিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন যেন, তাতে তাজা মৎস্য আহার করতে পারো।" স্বপ্নে মৎস্য দেখার ব্যাখ্যা বাদশাহর উজীর দ্বারা করা হয়। যদি কেউ স্বয়ং মৎস্য ধরতে দেখে তবে ইহা এমন বিষয়ের পরিচায়ক যে, বাদশাহর সেনাবাহিনী দ্বারা মাল অর্জিত হবে। যদি কেউ স্বপ্নে নিজেকে কূপের ভিতর মৎস্য ধরতে দেখে তখন এর ব্যাখ্যা হবে যে, স্বপ্ন দ্রষ্টা একজন লোভী অথবা

এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, সে নিজের দাসকে কার হাতে বিক্রি করবে। খ্রিষ্টবাদের আকীদা যে, যদি ঘোলাটে পানিতে মৎস্য ধরতে দেখে তবে ইহা ভাল ও মঙ্গলের আলামত। যদি কোন শয্যাশায়ী স্বপ্নে বিছানায় মৎস্য দেখে তবে এর ব্যাখ্যা এই যে, তার রোগ আর্দ্রতা হেতু হয়েছে। মুসাফির যদি স্বীয় বিছানার নিচে মৎস্য দেখে তবে সফরে পেরেশানীর সম্মুখীন হওয়ার আলামত। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে পরিষ্কার পানিতে মৎস্য শিকার করতেছে, তাহলে সে ব্যক্তি সৎ সন্তানের জনক হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত।

লবণাক্ত পানির মৎস্য দেখা বাদশাহর পক্ষ হতে চিন্তাযুক্ত সংবাদের আলামত। অপর বক্তব্য অনুপাতে কল্যাণকর সংবাদের আলামত। কেননা লবণ মৎস্য বিনষ্ট হওয়া হতে হেফাজত রাখে। কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, লবণাক্ত পানির মৎস্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা রাষ্ট্রীয় পক্ষ হতে চিন্তাযুক্ত সংবাদের আলামত এবং তাজা মৎস্য স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা স্বপ্ন দ্রষ্টা ইলমের উদ্দেশ্যে সফর করবে। স্বপ্নে যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, তার জননেন্দ্রিয় হতে মৎস্য বের হচ্ছে, আর যদি তার স্ত্রী গর্ভধারিণী হয়, তবে সে কন্যা সন্তান প্রসব করবে। কেননা হযরত ঈসা আ. আল্লাহর দরবারে দুআ করেছিলেন আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দুআ কবুল করেন এবং হযরত ঈসা আ.-এর দস্তরখানায় ভাজা মৎস্য নাযিল করেন। বড় মৎস্য দেখা গনীমতের মাল হাসিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে এবং ছোট মৎস্য দেখা বেদনাভার ও মসিবতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা ছোট মৎস্যের গোশতে অতিরিক্ত কাঁটা থাকে, আর ছোট মৎস্য খাওয়ার সময় অধিক পেরেশানী ভোগ করতে হয়।

স্বপ্নযোগে মৎস্য দেখার ব্যাখ্যা কখনও শপথের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা এর শপথ করেছেন। কখনও নেককারদের উপাসনালয় উদ্দেশ্য হয়। কখনও মসজিদ উদ্দেশ্য, কেননা হযরত ইউনুস আ. মৎস্যের উদরে গিয়ে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন এবং মসজিদেও আল্লাহ তাআলার যিকির হয়। অধিকন্তু দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তাযুক্ত প্রতিশ্রুতি দূরীভূত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদ গোষ্ঠীর উপর আযাব নাযিল করেছেন এবং শনিবার দিন মৎস্য শিকার করতে হারাম করেছেন। হযরত ইউনুস আ. বলেন, যদি কোন ভীরু ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য দেখে তবে সে ভয় হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি ভিক্ষুক দেখে তবে সে ধনী হবে। আর যদি পেরেশানিযুক্ত ব্যক্তি দেখে তবে তার পেরেশানী দূরীভূত হবে। এ জাতীয় ব্যাখ্যা ঐ যুগে দেয়া হত। যদি কোন ব্যক্তি হযরত ইউনুস আ.-কে কারাগারে দেখে ও আসহাবে কাহাফের গুহা এবং নূহ আ.-এর উনুন দেখে তবে ভীরুর ভীরুতা দূরীভূত হবে। অভাবী ধনী হবে, পেরেশানযুক্ত ব্যক্তির পেরেশানী দূর হবে।

মৎস্য সম্পর্কিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সময় তার অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মৎস্যের অবস্থার দ্বারা ব্যাখ্যার পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ মাছটি তাজা কি পঁচা? লবণাক্ত না মিষ্টি পানিতে ? শব্দ করে না শব্দহীন ? এ মৎস্য সাদৃশ্য কোন প্রাণী স্থলভাগে আছে কি নাই ? এ মৎস্যকে মৎস্য যন্ত্র দ্বারা শিকার করেছে কি না ? অতএব প্রতিটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা , সে ব্যক্তি সমুদ্রে মৎস্য যন্ত্রের সাহায্যে শিকার করতেছে স্বপ্নে দেখে তবে এর ব্যাখ্যা, সে ব্যক্তি হালাল রিযিকের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করতেছে এবং তা অর্জন করবে। পাশাপাশি স্বপ্ন দ্রষ্টা অবস্থার প্রতিও বিশেষ নজর রাখা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি মৎস্য শিকার করা দেখে তবে সে ভাল করতেছে, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা অবিবাহিত হয় তবে সে ব্যক্তি বিবাহ করবে। আর যদি বিবাহিত হয় তবে নেক সন্তানের সুসংবাদ এবং মহিলা স্বয়ং মৎস্য শিকার করতে দেখা তো তার স্বামী অথবা তার পিতার সম্পদ অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর দাসের মৎস্য শিকার করতে দেখা তার মনীবের পক্ষ হতে সম্পদ অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

যদি কোন শিশু স্বপ্নে দেখে যে, সে মৎস্য শিকার করতেছে, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দৌলত দ্বারা পুরষ্কৃত করবেন। অথবা তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে আবাবিল পাখি বা সমুদ্রগভীরে অবস্থানকারী প্রাণী শিকার করতেছেন, তবে স্বপ্নদ্রষ্টা বিপদাপদ হতে মুক্তি লাভ করবে। সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 'ফা' (فاء) পরিচ্ছেদে ফারছল বাহার-এর অনুচ্ছেদের অধীনে আসবে ইনশাআল্লাহ। কোন ব্যক্তি যদি লবণাক্ত পানিতে মৎস্য শিকার করতে দেখে তবে তার অনেক ফায়দা হাসিল হওয়ার আশা আছে। অথবা কোন অনারবী বা বিদয়াতী হতে ইলম অর্জন করার আলামত। স্বপ্নযোগে মৎস্য শিকার করা এবং মৎস্যটি কাঁটাবিশিষ্ট হওয়া প্রোথিত কোন সম্পদ ভাণ্ডারের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যদি মৎস্যের চামড়া না থাকে তবে তার আমল বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর যদি স্বপ্নে মিষ্টি পানির নদীর মৎস্য লবণাক্ত পানির নদীতে স্থানান্তর হতে দেখে অথবা এর বিপরীত দেখে, তবে সৈন্যদলে নেফাক প্রবেশের আলামত। আর যদি পানির উপরাংশে মৎস্যকে দেখে, তবে কাজ সহজে সমাধা করার আলামত। যদি নিজের কাছে ছোট বড় মৎস্য দেখে তবে আনন্দ উৎসবের প্রতি ইঙ্গিতবহ। যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষ বা পাখি সাদৃশ্য মৎস্য দেখে তবে এর উদ্দেশ্য এই যে, সে ব্যক্তি এমন ব্যবসায়ীর সাক্ষাত লাভ করবে, যে স্থল ও জলপথে সফর করে। অথবা বিভিন্ন ভাষাবিদের সাথে পরিচয় হতে পারে। স্বপ্নে সাধারণত গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর আকৃতিতে দেখার উদ্দেশ্য গরিব ফকিরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যদি কোন ব্যক্তি বড় সমুদ্রে মৎস্য শিকার করতে দেখে তবে কর্ম ও রিযিক অর্জনের

আলামত। অথবা বাদশাহর মাল হতে অন্তরায় করার প্রতি ইঙ্গিতবহন, স্বপ্ন দ্রষ্টা চোর বা গোয়েন্দা। আর যদি বিস্তৃত সমুদ্র হতে মৎস্য আহার করতে দেখে তবে আল্লাহ তাআলা গায়েবী ইলম দ্বারা পুরস্কৃত করবেন এবং তার জন্য ধর্ম সুস্পষ্ট করে দিবেন। আর সঠিক পথ দান করবেন। পরকালে তার উত্তম ঠিকানা হবে।

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, মৎস্য সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন করছে, তবে সে ব্যক্তি আল্লাহর অলিদের সংশ্রব লাভ করবে এবং তাদের নিকট হতে এমন বিষয় জানতে পাবে যার কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই। আল্লাহই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

৪৪৪. আছ-ছামানদাল (السمندل) অগ্নিপ্রাণী

السمندل : ছিন ও মীম যবরের সাথে ও নুন সাকিন, দাল মুহমালা। জাওহারী একে মীম বিহীন سندل পাঠ করেন। আর ইবনে খালকান লাম বিহীন سمند উল্লেখ করেন। ইহা এমন একটি প্রাণী যার খাবার বিশটি। ইহা এক ধরনের বিষাক্ত পক্ষী শাবক, যা চীন দেশে জন্মে।

চীনা লোকেরা একে ভিজা ও শুষ্ক উভয় ছুরতে ভক্ষণ করে এবং ইহা বিষাক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষতিকারক নয়। এর এ খাদ্যের বৈশিষ্ট্য চীনে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য। আর যদি কেউ তা চীন হতে একশত হাত দূরে কোথাও সংগ্রহ করে ভক্ষণ করে, তবে সাথে সাথে সে মৃত্যুবরণ করবে। ছামানদাল সম্পর্কিত আশ্চর্য বিষয় এই যে, তার আগুনের সাথে ভাল একটি ভাব আছে। আর তা সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর যখন তার গায়ে ময়লা লাগে, তখন তা আগুন ব্যতিরেকে আর কোন বস্তু দ্বারা পরিষ্কার হয় না। ছামানদাল হিন্দুস্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা জমিনে বিচরণকারী একটি প্রাণী বিশেষ, যা খেঁকশিয়াল অপেক্ষা ছোট। এর রং খিলিঞ্জী, চক্ষু লাল এবং লেজ দীর্ঘ। এর চুল দ্বারা রুমাল তৈয়ার করা যায়।

যখন এ ময়লাযুক্ত হয় তখন তাকে অগ্নিতে ফেলে দেয়া হয়। তবে প্রজ্জ্বলিতহীন আগুনের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, হিন্দুস্থানের শহরের এক পাখি, যা আগুনে ডিম দেয় এবং আগুনেই বাচ্চা প্রসব করে, তাতে আগুন কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমনকি তার ডানা দ্বারাও রুমাল তৈয়ার করা হয়। তা শাম দেশে রপ্তানি হয়। তাও যখন ময়লাযুক্ত হয় তখন তাকে আগুনের মাঝে নিক্ষেপ করে পরিষ্কার করা হয়, আগুন তাতে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে না।

মাওরাখ ইবনে খালকানের বর্ণনা যে, আমি ছামানদালের চুল দ্বারা বানানো একটি কাপড় দেখেছি যা কোন প্রাণীর কাপড়ের রীতিতে তৈরি করা হয়েছিল। মানুষেরা একে অগ্নিতে ফেলে যাচাই করে, তবে আগুন তাতে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে নাই। পুনরায় তা তৈলের এক পার্শ্বে ডুবিয়ে প্রদীপ

হিসেবে রাখে আর তা দীর্ঘ সময় প্রজ্জ্বলিত থাকে, যখন প্রদীপ গোল করে দেয়া হয়েছে তখন ঐ কাপড় আসল অবস্থায় বহাল ছিল, তাতে কোন ধরনের পরিবর্তন আসে নাই।

ইবনে খালকান এক নয়ন জুড়ানো ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আমি আমার শায়খ আল্লামা আবদুল লতীফ ইবনে ইউসুফ বাগদাদীর হাতের একটি রচনা দেখতে পাই। যেথায় লিখা আছে, মালেকুজ জাহের ইবনে মালিকুন নাসের সালাহউদ্দীন হলবের বাদশাহর সামনে এক খণ্ড সামানদাল পেশ করা হয়, যা এক গজ প্রস্থ ও দুই গজ দৈর্ঘ্য ছিল। ঐ খণ্ডটি তৈলে ভিজিয়ে বানানো হয় আর তা তৈল অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত জ্বলতেছিল। যখন তৈল ফুরিয়ে গেল তখন তা পূর্বের মত সাদা হয়ে যায়।

এ ঘটনাটি ইবনে খালকান ইয়াকুব ইবনে জাবেরের জীবনীতে রচনা করেন। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পংক্তিও উল্লেখ করেন, যা 'আইন' পরিচ্ছেদে মাকড়সার আলোচনায় উল্লেখ করা হবে। আল্লামা কাযবীনী বলেন, ছামানদাল এক জাতীয় ইঁদুর যা আগুনে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তা একটি পাখি। আল মাছালেক ওয়াল মামালেক গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ আছে।

চিকিৎসায় ছামানদাল

ছামানদালের পিত্ত এক চীনাবুট পরিমাণ বের করে পরিষ্কার পানিতে মিশিয়ে দুগ্ধসহ এমন ব্যক্তিকে বারংবার পান করাবে যার গায়ে অগ্নিশিখা লেগেছে, তবে সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে। যদি এর মস্তিষ্ক ইস্পাহানী সুরমার সাথে মিশ্রণ করে চোখে লাগায় তবে চক্ষু ছানি রোগ সুস্থ হয়ে যাবে। অতঃপর চক্ষুর যাবতীয় রোগ হতে হেফাজত থাকবে। যদি এর রক্ত কুষ্ঠ রোগীর গায়ে মালিশ করা হয়, তবে তার রং পরিবর্তন হবে। যদি কোন ব্যক্তি ছামানদাল-এর কলিজার কিছু অংশ গিলে ফেলে, তবে সে যেসব কথা শোনবে সেসব কথা তার মুখস্ত হয়ে যাবে। যে স্থানে চুল গজায় না সে স্থানে এর পিত্ত ব্যবহার করলে চুল গজাবে, যদিও হস্ততালু হয়।

৪৪৫. আছ-ছাম্মুর (السمور) বিড়াল সাদৃশ্য প্রাণী

السمور : (ছীনের উপর যবর, মীমের উপর তাশদীদযুক্ত পেশ; سفود -এর ওজনে) বিড়াল সাদৃশ্য স্থলভাগের প্রাণী। কার অভিমত যে, ইহা বেজী বিশেষ। যেস্থানে ইহা থাকে সেস্থানের প্রভাবে নিজস্ব রং পরিবর্তন হয়। আব্দুল লতীফ বাগদাদী বলেন, ইহা একটি সাহসী প্রাণী। মানুষের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা নির্ভীক আর কোন প্রাণী নাই। একে ধরার কৌশল অবলম্বন করতে মৃত উট জমিনে দাফন করে এক ধোকা দেয়ার মাধ্যমে শিকার করা যায়। এর গোশত গরম। তুর্কীস্থানীরা ইহা ভক্ষণ করে।

অন্যান্য চামড়ার মত এর চামড়াকে চামড়া পরিশোধন দেয়া যায় না। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন–আশ্চর্য যে, ইমাম নববী রহ. স্বীয় তাহযীবুর আছমা

ওয়াল লুগাত গ্রন্থে ছাম্মুরকে কীভাবে পাখি লিখেছেন ? সম্ভবত কলমের দুর্ঘবোধকতার কারণে এমনটি লিখেছেন। এর অপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্যজনক খায়েজ ইবনে হিশামের বর্ণনা, যা সে শরহুল ফসিহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন–ছাম্মুর জিনের এক শ্রেণী বিশেষ। এ প্রাণীর নিজের পাতলা চামড়া কোমলতা এবং সৌন্দর্যের জন্য নির্দিষ্ট। এর চুল দ্বারা তৈরিকৃত কাপড় বাদশাহ এবং নেতারা ব্যবহার করেন। মুজাহিদ বলেন, আমি শায়াবীকে ছাম্মুরের কাপড় পরিধান করতে দেখেছি।

ছাম্মুর শরয়ী বিধান

ইহা খাওয়া হালাল, কেননা এরা নাপাক ব্যবহার করে না।

স্বপ্নে ছাম্মুরের ব্যাখ্যা

স্বপ্নে ছাম্মুরের ব্যাখ্যা একজন জালেম চোর দ্বারা প্রদান করা হয়। কার সাথে যার সম্পর্ক থাকতে পারে না। আল্লাহই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত।

৪৪৬. আছ–ছামাইতর (السميطر) এক শ্রেণীর পাখি

السميطر : عسطيل এর ওজনে, এক শ্রেণীর পাখি। যার স্কন্ধ দীর্ঘ হয়। ইহা সর্বক্ষণ অগভীর পানিতে দেখা যায়। এর উপনাম আবুল আইযার, শাবইতর নাম দ্বারাও প্রসিদ্ধ। এর বিশদ ব্যাখ্যা 'মীম' পরিচ্ছেদে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪৪৭. আছ–ছামানদর ও ছামাইদর (السمندر والسميدر) এক শ্রেণীর প্রাণী

السمندر والسميدر : হিন্দুস্থান ও চীনের অধিবাসীর নিকট ইহা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত এক প্রাণী।

৪৪৮. সিনাদ (سناد) গণ্ডার

سناد : গণ্ডার, অন্য বর্ণনায় করকদন। কাযবিনী বলেন, এ প্রাণী বলদ অপেক্ষা বড় আর হাতী হতে শারীরিক দিক দিয়ে ছোট। ইহা হাতির মত দেখায়, এর শাবক জন্ম হওয়ার পরই বিচরণ শুরু করে এবং যখন চলাফেরার যোগ্যতা অর্জিত হয় তখন ইহা স্বীয় মা হতে দূরে পলায়ন করে ইহা ভয় করে মায়ের চুল চাটাকে, যা অধিকন্তু প্রাণী নিজের শাবকদেরকে রসনা দ্বারা আদর করে। এ জন্য যে, এর রসনা কাঁটার মত, আর এ ভয় ধারণাতীত নয় বরং বাস্তবেই হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সে তার শাবককে লালন-পালন করে, তাহলে নিজের রসনা দ্বারা এমনভাবে চাটে যে, ঐ শাবকের গোশত পৃথক হয়ে যায়, শুধুমাত্র হাড়ের কাঠামো অবশিষ্ট থাকে। এ প্রাণী হিন্দুস্থানে অধিক হারে পাওয়া যায়।

৪৪৯. আছ-ছানজাব (السنجاب) ইঁদুর সাদৃশ্য প্রাণী

السنجاب : ইহা ইঁদুরের উচ্চতায় এবং প্রতিষ্ঠিত এক প্রাণী, যা ইঁদুর অপেক্ষা বড়। তার চুল খুব কোমল। প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ এর চামড়ার কোট পরিধান করে। ইহা অত্যন্ত চতুর যখন কোন মানুষ দৃষ্টিতে আসে তখন কোন উচ্চ বৃক্ষে উঠে। বৃক্ষই এর আবাসস্থল। এ প্রাণী সাকালিয়া শহরে এবং তুর্কীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। যেহেতু তার চলন মানুষ অপেক্ষা খুব দ্রুত, সেহেতু তার মেজাজ চড়া। ইহার চামড়া অতি উন্নত যা নীল রং বিশিষ্ট এবং প্রবাযুক্ত। কোন কবির চমৎকার পংক্তি–

كلما ازرق لون جلدى من البرد + دتخيلت انه سنجاب

কখনও যখন ঠাণ্ডার দরুন আমার রং নীল বর্ণ হয়, তখন নিজেকে ভাবি যে, আমার চামড়া ছানজাব।

ছানজাবের শরয়ী বিধান

ইহা খাওয়া জায়েয, কেননা ইহা হালাল ও উত্তম। হাম্বলী মাযহাবে ইহা খাওয়া হারাম।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, ছানজাব হালাল-হারাম সম্পর্কে উলামাদের বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। যখন কোন বিষয়ে হালাল-হারাম একত্রিত হয়, তখন হালালটিই প্রমাণিত হয়। কেননা শরীয়তে মূল হচ্ছে হালাল। যদি ছানজাব শরীয়তের ভিত্তিতে জবাই করা হয়, তবে তার চামড়ার কাপড় পরিধান করা জায়েয। কেননা এ চামড়া জবাই করার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। তবে চামড়া পরিশোধন দ্বারা তার চুল পাক হবে না। এজন্য যে, পরিশোধন চুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার হয় না। কোন কোন ফকিহগণ বলেন, পরিশোধন দ্বারা চুলও পাক হয় চামড়ার অনুপাতে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এক বর্ণনা এই যে, এ মাসয়ালার সত্যায়ন করেছে উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারায়িনী এবং রুবিয়ানী ও ইবনে আবু আসরিনু প্রমুখ; সকলেই এক বাক্যে এ মাসয়ালাকেই পসন্দনীয় বলেন কেননা সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমর রাযি.-এর যুগে ঘোড়ার চুলের তৈরি কাপড় বণ্টন করতেন, অথচ ঐসব ঘোড়া অগ্নিপূজকেরা জবাই করেছে। অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী জবাই না হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহাবায়ে কেরাম পাক ধরেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে আবুল খায়ের মুরশিদ ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস, তিনি বলেন–আমি আলী ইবনে ওয়ালাকে এ শ্রেণীর কাপড় পরিধান করতে দেখেছি। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমরা যখন পশ্চিম দেশে সফরে গমন করি, তখন অগ্নি পূজক ভেড়া জবাই করলে আমরা তা ব্যবহার করি নাই।

প্রতিউত্তরে ইবনে আব্বাস রাযি বলেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূল সা.-কে প্রশ্ন করেছি, আর তিনি ইরশাদ করেন যে, যেসব প্রাণী অমুসলিম জবাই করে সে প্রাণীর চামড়া পরিশোধন করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে।

চিকিৎসায় চানজাবের উপকারিতা

যদি ছানজাবের গোশত কোন পাগলকে খাওয়ানো হয় তবে তার পাগলামী দূরীভূত হবে এবং যে ব্যক্তি মাদকাসক্তিতে নিমজ্জিত সে ব্যক্তি ইহা ভক্ষণে উপকৃত হবে।

কিতাবুল মুফরাদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ছানজাবের মধ্যে গরম কম, কেননা তার মেজাজে ভিজার প্রাধান্য বেশি। গরম হওয়ার কারণ এই যে, এর খাদ্যে ফল-ফলাদির সমাহার। এ জন্যই যুবক, মেজাজ চড়া ব্যক্তিত্বের জন্য ছানজাবের কাপড় পরিধান করা উপযোগী, তাতে সহনশীল ও উষ্ণতা বিদ্যমান।

৪৫০. সানদাওয়াতুস সিন্নাহ (السندواة السنة) মাদী বাঘ

السندواة السنة : মাদী বাঘকে বলা হয়।

৪৫১. আছ-ছানদাল (السندل) অগ্নি প্রাণী

سندل : ইহা সে প্রাণী যাকে ছামানদালও বলা হয়। যার আলোচনা এ তো মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

উপম ইবনে কবছ মক্কীরও উপাধি ছনদাল। মুহাদ্দীসগণের নিকট তার হাদীস বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। ইবনে মাজাহ তার নিকট হতে মাত্র দুটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেন।

৪৫২. আছ-ছিন্নাউর (السنور) বিড়াল

سنور : (ছিনের নিচে যের, নূনের উপর তাশদীদ) এর একবচন سنانير আসে। এ প্রাণী অনুগতশীল, মানব গৃহে লালিত হয়। আল্লাহ তাআলা এ প্রাণীকে ইঁদুর ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আরবী ভাষায় এর অনেকগুলী নাম রয়েছে। এর উপনাম আবু খাদ্দামা, আবু গযওয়ান, আবুল তাশিম, আবু শামাখ। বিড়াল এবং আরবীর ঘটনা তার নামসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ও প্রসিদ্ধ। তাহল, কোন আরবী একটি বিড়াল ধরল, কিন্তু তার জানা ছিল না যে, এটি কী প্রাণী। যে ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয় সে ব্যক্তিকে এর নাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি এর বিভিন্ন নাম বলেন যা নিম্নে বর্ণিত হল–

১। প্রথম ব্যক্তি ইহা ছিন্নাউর, দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহা হিব্বাহ, তৃতীয় ব্যক্তি ইহা কাত্যু, চতুর্থ ব্যক্তি ইহা দয়ূন, পঞ্চম ব্যক্তি ইহা খায়দা, ষষ্ঠ ব্যক্তি ইহা খাইতাল, সপ্তম ব্যক্তি ইহা দম নামে অভিহিত করেন।

এ আরাবি লক্ষ্য করল যে, যে প্রাণীর এত বিপুল পরিমাণ নাম, সে প্রাণীর মূল্যও চড়া হবে। সুতরাং সে এ বিড়াল বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করে। সেথায় কোন ক্রেতা এ বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আরাবি একশত দিরহামের উল্লেখ করেন। ক্রেতা ইহা শ্রবণ মাত্র আশ্চর্যবোধ করেন, আর বলেন– একশত দিরহাম ? ক্রেতা বলেন, যদি এর অর্ধেক দিরহাম হয় তবেই তো অনেক। আরাবি ইহা শ্রবণ করে বিড়ালটি নিক্ষেপ করে দেন এবং বলেন, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, এতো নাম আর এমন দাম, অর্থাৎ নামের অপেক্ষা দাম কিছুই নয়।

ইবনে কুতাইবা রহ. বলেন, স্ত্রীলিঙ্গের জন্য سنورة শব্দ আসে, যে নিয়মে ছফাদি صفادع (ব্যাঙ)-এর স্ত্রীলিঙ্গ ضفدعة আসে।

হাদীসে বিড়ালের উল্লেখ

হাকীম হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. আনসারদের গৃহে তাশরিফ আনয়ন করতেন আর তাঁর সন্নিকটে অন্যান্যদের গৃহে যেতেন না। অন্যান্য গৃহবাসীরা রাসূল সা.-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, আপনি সেথায় তো আগমন করেন, আর আমাদের এখানে আপনার ভারাক্রান্ত কদম ফেলেন না। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের এখানে কুকুর থাকে, এ কারণে আমি আসি না। তারা প্রশ্ন করেন যে, তাদের ঐখানে তো বিড়াল থাকে। তিনি ইরশাদ করেন যে, বিড়াল তো سبع সাত, অর্থাৎ বিড়াল আর কুকুর এক হুকুমের অধীনে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

নাঈম ইবনে হাম্মাদ কিতাবুল ফিতানে আবু শুরাইহাতুল গিফারী রাসূল সা. হতে বর্ণনা করেন– রাসূল সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে নাম নিয়ে গোত্রে দুই ব্যক্তি সর্বশেষে আগমন করবে। সে এক পাহাড় হতে যেথায় সে লুকায়িত ছিল, সেখান হতে বের হয়ে একটি স্থানে আসবে। সেখানে এসে মানুষের স্থলে সে বন্য প্রাণী দেখবে। সেখান হতে বের হয়ে মদীনামুখী হবে। যখন কর্ষিত ভূমির নিকটবর্তী হবে তখন পরস্পরে বলাবলি করবে যে, লোকটি কোথায় গিয়েছে, এখানে তো দেখা যায় না। একজন বলবে যে, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। অতএব সে তার গৃহে গিয়ে দেখতে পাবে যে, বিছানায় মানুষের জায়গায় সে খেঁকশিয়াল ও বিড়ালসমূহ। তাদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, আমার ধারণা মানুষ কেনা-কাটা করার জন্য বাজারে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে দেখা উচিত। এ ধারণায় সে ঘর হতে বের হয়ে এসে বাজারে গিয়ে মানুষদের সন্ধান

করবে। যখন কাউকে পাবে না তখন সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে চলতে চলতে মদীনার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যাবে। দরজায় দুজন ফেরেশতা দণ্ডায়মান পাবে সে তাদের পায়ের নলা টেনে ধরে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

খলীফা রুকনুদ্দৌরার একটি বিড়াল ছিল, যা তার বৈঠকখানায় উপস্থিত থাকত। যদি কেউ প্রয়োজনের তাগিদে তার সাক্ষাতের জন্য আসত এবং তার সাথে সাক্ষাতের কোন মাধ্যম না পেত তখন সে একটি কাগজে নিজের প্রয়োজন লিখে বিড়ালের গলায় জুলিয়ে দিত, আর বিড়াল তা নিয়ে রুকনুদ্দৌলার নিকট পৌছিয়ে দিত। তিনি ঐ কাগজ পড়ে তার উত্তর লিখে বিড়ালের গলায় বেঁধে দিতেন, বিড়াল তা নিয়ে সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দিত।

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত নূহ আ.-এর জাহাজের অধিবাসীরা ইঁদুরের উপদ্রবে নির্যাতিত হয় তখন তিনি সিংহের কপালে হস্ত বুলান। এতে সিংহের হাঁচি আসে এবং হাঁচির সাথে বিড়াল বের হয়। এরই ভিত্তিতে বিড়ালের আকৃতি সিংহের সাথে অধিক সাদৃশ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা বিড়ালকে না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিংহের অনুভব করতে পারে না। বিড়ালের সৌন্দর্য ও বুদ্ধির প্রমাণ এই যে, বিড়াল নিজের মুখের লালা দ্বারা শরীর পরিষ্কার করে। যদি তার গায়ে কোন ময়লা লাগে তবে তাৎক্ষণিক একে চেটে ফেলে।

শীতকালের শেষের দিকে পুরুষ বিড়ালের কামভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আর মাদি বিড়াল প্রসবের সময় প্রসব বেদনায় অনেক চিল্লায়। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তি লাভ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব না হয়। বিড়াল তার ক্ষুধার্তকালে নিজের বাচ্চাদের আহার করে। ইহাও বর্ণিত যে, অগাধ মহব্বতের কারণে এমনটি করে। অতএব জাহেযের বক্তব্য–

جاءت مع الاشفين فى هودج + تزجى ان تاكل اولادها

সে দুটি প্রতীক নিয়ে হাওদা করে আগমন করেছে এবং নিজের সৈন্যদের জয়যুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

كانها فى فعلها + تريد ان تاكل اولادها

কেমন যেন সে নিজের এ কর্মে বিড়ালের মত যে, সে নিজের বাচ্চাদের আহার করার ইচ্ছা পোষণ করে।

বিড়াল যখন প্রস্রাব করে তখন তা ঢেকে দেয়, যেন ইঁদুর তা শুকতে না পারে এবং শুঁকে যেন পলায়ন না করে। কেননা ইঁদুর বিড়ালের প্রস্রাব-পায়খানার ঘ্রাণ বুঝে। বিড়াল প্রস্রাব-পায়খানা করে নিজেই তা শুঁকিয়ে লয় এবং যখন সে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভব করে তখন তা মাটি ইত্যাদি দ্বারা ঢেকে দেয়, যেন দুর্গন্ধ ও অপরাধ উভয়টিই গোপন থাকে।

আল্লামা জামখশরী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা বিড়ালকে এ জ্ঞান দান করার কারণ এই, যেন মানুষ তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের প্রস্রাব-পায়খানা ঢেকে রাখতে পারে। বিড়াল যখন কার গৃহে প্রতিপালিত হয়, সে গৃহে দ্বিতীয় আর কোন বিড়াল আসতে বাধা দেয়। যদি এসেই পড়ে তবে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এর কারণ সাধারণত এই বুঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। গৃহে অবস্থানকারী বিড়াল ধারণা করে যে, মালিক হয়তো অন্য বিড়ালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে আর আমার খাদ্যে তাকে শরীক বানাবে। আর যদি শরীক নাও বানায় তবুও মালিকের ভালবাসায় ফাটল ধরাবে। যদি বিড়াল মালিকের কোন বস্তু চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে মালিকের প্রহার হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে দূরে পলায়ন করে। মালিক যখন তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় তখন বিড়াল তোষামোদ করা শুরু করে আর নিজের শরীর দ্বারা মালিকের পায়ে স্পর্শ করে। সে এমন করার কারণ হল, তার ধারণা তোষামোদ দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে সমাধান পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা হাতীর অন্তরে বিড়ালের ভয় রেখেছেন। কেননা হাতী যখন বিড়ালকে দেখে তখন সে পলায়ন করে। ইহা প্রসিদ্ধ যে, হিন্দুস্থানের সৈন্যদল যাতে হাতীও ছিল, বিড়ালের বদৌলতে পরাজয় বরণ করে।

বিড়াল প্রাণী তিন শ্রেণীর– (১) ابلى গৃহপালিত (২) وحشى বন্য বিড়াল (৩) سنورالزباد বিড়াল জাতীয় প্রাণী।

গৃহপালিত ও বন্য বিড়ালের মধ্যে সাধারণত বৈরী ভাব বিদ্যমান। জীবিত প্রাণীকে এরা চিড়ে আহার করতে সক্ষম। কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিড়াল মানুষের সাদৃশ্য। যেমন, মানুষের মত করে এরা চিৎকার করে ও হাই তোলে শরীর মোচড়ায় এবং হাত বাড়িয়ে কোন বস্তু গ্রহণ করে। বিড়াল বৎসরে দুবার বাচ্চা দেয়। এর গর্ভ ধারণের মেয়াদ পঞ্চাশ দিন। বন্য বিড়ালের দেহের আকৃতি গৃহপালিত বিড়াল অপেক্ষা বড় হয়ে থাকে।

জাহেয বলেন, ধর্মীয় উলামাদের উক্তি যে, বিড়াল পালন করা মুস্তাহাব। মুজাহিদের বক্তব্য যে, এ ব্যক্তি কাজী শুরাইহ-এর আদালতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপর বিড়ালের বাচ্চার মালিকানা সম্পর্কিত দাবি উত্থাপন করেন। কাজী সাহেব দাবিদারকে সাক্ষী তলব করতে আদেশ দেন। সে বলল যে, আমি এরকম বিড়ালের জন্য সাক্ষী কোথা হতে সংগ্রহ করব ? এতটুকুই জানি যে, তার মাতা আমাদের গৃহে তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর কাজী সাহেব আদেশ করেন যে, উভয়ে এ বাচ্চাকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে যাও। যদি সে তাকে দেখামাত্র কোথাও না গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় অতঃপর তা দুগ্ধ পান করাতে শুরু করে, তবে এ বাচ্চা তোমারই। আর যদি লোমহর্ষণ করে রাগান্বিত হয় এবং পলায়ন করে তবে এ বাচ্চা তোমার নয়।

বিড়ালের শরয়ী বিধান

বন্য ও গৃহপালিত বিড়াল খাওয়া হারাম। দলিল : আসন্ন হাদীস, যেখানে রাসূল সা. ইরশাদ করেন, বিড়াল হিংস্রদের মধ্য হতে। এর দ্বারা রাসূল সা.-এর উদ্দেশ্য হুকুম বর্ণনা করা। যে পদ্ধতিতে হিংস্রদের গোশত খাওয়া হারাম, সে পদ্ধতিতেই বিড়ালের গোশতও খাওয়া হারাম। বায়হাকী প্রমুখ আবু যুবাইর হতে, তিনি হযরত জাবের রাযি.হতে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. বিড়ালের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং সুনানে আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ আছে যে, রাসূল সা. বিড়াল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম এ হাদীসকে বন্য বিড়ালের উপর সাবেত করেছেন। তাদের বক্তব্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের নিষিদ্ধ হুকুমটি বন্য বিড়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন কোন ফকিহ বলেন, নিষেধ তাহরিমী নয় বরং তানজিহী। এমনকি যদি মানব সমাজে এর প্রচলন হাদীয়া বা অন্য কিছু আদান-প্রদানের ছুরতে হয়, অথবা মানুষ একে মার্জনীয় দৃষ্টিতে গ্রহণ করে, তবে ইহা সে শাখা হতে হবে যার মধ্যে কোন ফায়েদা নাই। এ ছুরতে বিক্রয় জায়েয হবে এবং তার মূল্যও হালাল হবে। ইহাই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতামত। باب الهاء 'হা' পরিচ্ছেদে বিড়ালের আলোচনায় এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা আসবে।

বন্য বিড়াল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ রেওয়ায়েত তা হারাম হওয়ার উপর মত প্রদান করে, আর গৃহপালিত বিড়াল হারাম।

বিড়ালের উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরববাসীদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ যে– اثقف من سنور সে বিড়াল অপেক্ষা অধিক দ্রুত গ্রেফতারকারী। اثقف -এর অর্থ–ধরার ক্ষেত্রে দ্রুত করা। رجل ثقف ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে লম্ফ দানে দ্রুত গতি সম্পন্ন। অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে যে– كانه سنور عبدالله সে আবদুল্লাহর বিড়াল। এ উদাহরণ সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি সরল, স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। যেমনিভাবে উর্দু ভাষায় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বাক্যালাপ যে, সে আল্লাহ তাআলার গাভী। কবি বাশার ইবনে বারদ এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত পংক্তি পাঠ করেন–

ابا مخلف مازلت نباح غمرة + صغيرا فلما شبت خبت بالشاطى

আবু মুখলিফ শৈশবে সর্বক্ষণ চিল্লাইতেন, যৌবনে সমুদ্রে উপকূলে তাঁবু স্থাপন করেন।

كسنور عبدالله بيع بدرهم + صغيرا فلما شب بيع بقيراط

যেভাবে আবদুল্লাহর বিড়াল যা শৈশবে এক দিরহামের বিনিময়ে কেনা হয়েছে, আর যখন বড় হয়েছে তখন এক কিরাতের বিনিময়ে বেচা হয়েছে।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, উল্লেখিত প্রবাদ বাক্য যা কবি নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন, ইহা আরবী ভাষায় মেজাজের সাথে গরমিল; বরং বানোয়াট মনে হয়। ইবনে খালকান বলেন, আমি এ প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে যথেষ্ট জানা-বুঝা করেছ, কিন্তু কোথাও এর অনুসন্ধান পাই নাই। অতঃপর প্রসিদ্ধ কবি ফরাযদকের একটি কবিতা পাওয়া গিয়েছে–

رايت الناس يزدادون يوما + فيوما فى الجميل وانت تنقص

আমি মানুষদেরকে দেখি যে, মানুষেরা দিন দিন নেক কাজে অগ্রসর, কিন্তু তোমার অবস্থা হল, তুমি উন্নতির স্থলে অবনতি ঘটাচ্ছ।

كمثل الهرة فى صغر ينغالى + به حتى اذا ما شب يرخص

অথবা তোমার উদাহরণ স্বল্প বয়সী বিড়ালের মত, যার মূল্য বৃদ্ধি পায়, আবার যখন সে বৃদ্ধ হয়, তখন তার মূল্য হ্রাস পায়।

চিকিৎসায় বিড়াল

যদি গৃহপালিত বিড়ালের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি কোন বিড়ালের গোশত ভক্ষণ করে, তবে তার উপর কোন যাদুর প্রভাব ফেলতে পারবে না। যদি বিড়ালের প্লীহা দশ দিনের উর্ধ্বে রক্ত স্রাব হয় এমন মহিলার কোমড়ে বেঁধে দেয়া হয়, তবে রক্তস্রাব বন্ধ হবে। বিড়ালের দুটি চক্ষু শুকিয়ে তার ধোঁয়া কোন ব্যক্তি গ্রহণ করলে সে ব্যক্তি যা আশা করবে তা পূর্ণ হবে। আর তার কর্তনকৃত দন্ত নিজের নিকটে রাখলে রাত্রিতে ভয় পাওয়া হতে মুক্ত থাকবে। বিড়ালের কলিজা তারই চামড়ার মধ্যে বিছিয়ে নিজের নিকট রাখলে শত্রু বিজয় লাভ করতে পারবে না। বিড়ালের পিত্ত চোখে লাগানোর দ্বারা রাত্রিতে দিনের মত দেখতে পাবে। আর তা লবণ, জিরার সহিত মিশিয়ে পুরাতন এবং সার্বক্ষণিক জাতীয় ক্ষতস্থানে মালিশ করার দ্বারা ক্ষত ভাল হয়ে যাবে। সঙ্গমকালে বিড়ালের জননেন্দ্রিয় মালিশ করার দ্বারা মাফউলে বিহি (স্ত্রী অন্যান) কর্তা স্বামীর অপেক্ষা বেশি মহব্বত করবে। যদি বিড়ালের গুর্দা দ্বারা কোন গর্ভধারিণী মহিলাকে ধোঁয়া দেয়া হয় তবে অসম্পূর্ণ বাচ্চা পরে যাবে।

আল্লামা কাযবিনী রহ. বলেন, যদি কালো বিড়াল, কালো মুরগির পিত্ত নিয়ে উভয়টি শুকিয়ে অতঃপর তা চূর্ণ করে সুরমায় মিশিয়ে চোখে ব্যবহার করে তাহলে তাকে জ্বিনে দেখা দিবে এবং তার খেদমত করতে থাকবে। এ আমল পরীক্ষিত। কালো বিড়ালের পিত্ত অর্ধ দিরহাম পরিমাণ জয়তুনের তৈলে মিশিয়ে মুখ ঝলসান রোগী নিজের নাসিকায় প্রবেশ করানোর দ্বারা আরোগ্য লাভ করবে। বন্য বিড়ালের হাড্ডির মজ্জা প্রস্রাবের কাঠিন্যতার জন্য অভাবনীয় ফলদায়ক। একে চুনের পানিতে গুলিয়ে আগুনের তাপে গরম করে বাসি মুখে কুলি করলে বহুমূত্র রোগ ভাল হয়ে যাবে।

ইমাম কাযবিনী রহ.-এর উক্তি, কোন মহিলা বিড়ালের মস্তিষ্কের ধোঁয়া গ্রহণ করার দ্বারা গর্ভাশয় হতে বীর্য বের হয়ে যাবে।

স্বপ্নে বিড়ালের ব্যাখ্যা

ক্বাফ পরিচ্ছেদে قط (কাত্তুন) শব্দের আলোচনায় আসন্ন।

তৃতীয় শ্রেণীর জংলী বিড়াল গৃহপালিত বিড়ালের মত মোটাতাজা হয়। কিন্তু এর দেহ আকারে বড় আর লেজ দীর্ঘ হয়, আর এর চুলের রং কালোর প্রতি ধাবিত, কখনও সাদা-কালো মিশ্রিত হয়। ইহা হিন্দুস্থান ও সিন্ধু শহর হতে সংগ্রহ করা হয়। 'যুবাদ' এক জাতীয় ময়লা, যা তার বগল ও দুই উরু এবং পায়খানার রাস্তার চতুর্দিকে পাওয়া যায়। তার ভিতরে সুগন্ধি বিরাজমান। এ উল্লেখিত তিনটি অঙ্গ হতে একটি চামচের সাহায্যে বের করা হয়। তার সম্পর্কে সামান্য আলোচনা الزمين পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

ছিন্নাউরের শরয়ী বিধান

জংলী বিড়াল খাওয়া হারাম। উপরোল্লেখিত দুই শ্রেণী যে পদ্ধতিতে খাওয়া হারাম, সে পদ্ধতিতে ইহাও খাওয়া হারাম। তবে ঐ যুবাদ যা হতে এক জাতীয় সুগন্ধি আসে তা পাক।

মাওয়ারিদী ও রুবিয়ানী বলেন, যুবাদ সামুদ্রিক বিড়ালের দুধ বিশেষ, যা মেশকের মত অর্জন করা হয়। সমুদ্রকূলের অধিবাসী ইহা ব্যবহার করে। এ বিষয়ের উদ্দেশ্য হল, এটা পবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গোশত খাওয়া জায়েয নাই এমন যেসব প্রাণী সমুদ্রে থাকে তাদের দুধ পবিত্র কি না ? যদি পবিত্র মেনে নেয়া হয় তবে ইহাই বক্তব্যে উদ্দেশ্য যে, ছিন্নাউর যুবাদ শুষ্ক ভূমির না সামুদ্রিক ? সহীহ এই যে, ইহা শুস্কের প্রাণী।

৪৫৩. আছ-ছুনুনু (السنونو) আবাবীল পাখি

السنونو : (ছীনের উপর পেশ) একবচন سنونو আসে। আবাবীলের এক শ্রেণী; এ ব্যাপারে জামালুদ্দীন রাওয়াহা চমৎকার পংক্তি বলেন–

وغربية حنت الى وكرلها + فانت اليه فى الزمان المقبل

বন্য পশুর মত যে নিজের বাসায় পৌঁছে, তুমিও ভবিষ্যতে আসবে সে পদ্ধতিতে।

فرست جناح الانبوس وفقت + بالعاج تو تقهقهت با الصندل

তোমার বাহু আনুছের পদ্ধতিতে, আর তার উপর হস্তিদন্ত, যা বন্ধকৃত। আর এই বন্ধের উপর চন্দন দেয়া হয়েছে।

আবাবিল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা خاء 'খা' পরিচ্ছেদে খতাফ خطاف-এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে, সেথায় অনুসন্ধানীয়। আবাবিলের উভয় চক্ষু নিয়ে কাপড়ের কোন একটা টুকরায় পেঁচিয়ে কোন কাঠ বা চৌপায়ায় জুলিয়ে দিয়ে যে তার উপর শয়ন করবে তার ঘুম আসবে না। যদি চড়ুই পাখির অবস্থানের স্থানে ধোঁয়া দেয়া হয় তবে সমস্ত চড়ুই পাখি পলায়ন করবে। জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে এর ধোঁয়া গ্রহণ করার দ্বারা জ্বর চলে যাবে।

৪৫৪ সাওদানিয়াহ ও সাওয়াদিয়া (السودانية والسوادية) এক শ্রেণীর চড়ুই পাখি

السودانية والسوادية : ইবনে সাইয়্যিদাহ-এর বক্তব্য হল ইহা আঙ্গুর খেকো চড়ুই পাখি।

ঘটনা

রোম দেশে এক পিপুঁল বৃক্ষে একটি দুর্বল চড়ুই পাখি ছিল, যার ওষ্ঠে যয়তুন ফল ছিল। তার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য যে, যয়তুন ফলের মৌসুমে এ চড়ুই পাখি আওয়াজ করে, যার দরুন ঐ মহল্লার এ জাতীয় যত সব চড়ুই পাখি ছিল, সে সব চড়ুই পাখি তার সম্মুখে তিনটি করে যয়তুন ফল নিত। একটি তার ওষ্ঠে আর দুটি নিজের পাঞ্জায় চাপা দিয়ে নিয়ে সে দুর্বল চড়ুই পাখির উপর বৃষ্টির মত নিক্ষেপ করত, আর শহরবাসী প্রয়োজন মাফিক উঠিয়ে নিতেন। আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, এ চড়ুইকে সে চড়ুই মনে হয়, যাকে যুরযুর বলা হয় এবং যার আলোচনা 'যা' পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

চিকিৎসায় সাওদানিয়া

চড়ুই পাখির গোশত ঠাণ্ডা, শুষ্ক, নষ্ট হয়। বিশেষ করে এদের মধ্য হতে যে পাখি দুর্বল উত্তম গোশত তারই হয়। যা জালের সাহায্যে শিকার করা হয়। তার গোশত মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু ঝোল বিশেষ খাদ্যের দ্বারা এর ক্ষতিটা পরিমাণে কম হয়। তা ভক্ষণে এমন বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় যা ঠাণ্ডা ও বৃদ্ধদের মস্তিষ্কের জন্য উপযোগী। বসন্তকালে তা খাওয়া খুবই উপকারী। যদিও এই চড়ুই পোকা-মাকড় এবং টিড্ডি আহার করে। এ জন্য এর গোশত খাওয়া মাকরূহ। এরই ভিত্তিতে এর গোশতে তীব্রতা এবং দুর্গন্ধ হয়। রউফছ নামক এক ব্যক্তি পাখিদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তার বক্তব্য যে, শুষ্কের পাখিদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মন্দ প্রকৃতির পাখি এগুলী–

(১) رخ রুখ, (২) شحرور শাহরুর, (৩) سمانى সুমানী, (৪) حجل হজল, (৫) دراج দরাজ, (৬) طيهوج ত্বাইহুজ, (৭) شفنين শাফানাইন, (৮) فخر

الحام ফখরুল হাম, (৯) فاخته ফাখতাহ এবং (১০) سلوى সালওয়া। আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত।

৪৫৫. সাওযানিক (السوذنيق) বাজ পাখি

السوذنيق : বাজ পাখিকে বলা হয়।

৪৫৬. সাওয়াসা (السوس) কীট বিশেষ

السوس : কীট, ইহা সে কীট যা তরকারী ও পশমী সুতায় জন্মে। সুতরাং যে শস্যে ইহা জন্মে, আরববাসী একে (طعام مسوس) কীটযুক্ত খাদ্য বলে এবং طعام مدود অর্থাৎ কীট নিক্ষেপিত খাদ্য। কোন কবির কবিতা–

قد اطعمتنى دقلا حرليا + مسوسا مدودا حجريا

"তুমি আমাকে সারা বৎসর পুরাতন শস্য ভক্ষণ করিয়েছ বা এমন খাদ্য যাতে তিক্ততা এসেছিল, কীট লেগে অকেজো হয়ে গিয়েছিল।"

মুজাহিদ, কাতাদাহ আল্লাহ তাআলার ঐ বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, يخلق مالا تعلمون অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সেসব বস্তু সৃজন করেন, যার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নাই। তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত যে,. এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফল ও কাপড়ের কীট।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আরশের ডান পার্শ্বে একটি নহর বিদ্যমান, যার প্রশস্থতা সাত আকাশ ও সাত জমিন অপেক্ষা আরও সত্তর গুণ বেশি। প্রত্যহ প্রভাতে হযরত জিব্রাইল আ. সেথায় ডুব দিয়ে গোসল করেন। এর দ্বারা তাঁর শরীর নূরে নূরান্বিত হয় এবং তাঁর সৌন্দর্য ও শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি নিজের ডানাগুলী ঝাড়া দেন এবং প্রত্যেক চুল হতে সত্তর হাজার ফোঁটা পানি নির্গত হয়। আর প্রত্যেকটি ফোঁটা হতে আল্লাহ তাআলা সত্তর হাজার ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মুরে এবং সত্তর হাজার কা'বা গৃহে প্রবেশ করে। পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আর এ পালা আসবে না। ত্ববয়ী বলেন, مالا تعلمون দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অন্তরে প্রক্ষিপ্ত ঐ বিষয় যা জিনদের উপর হয় এবং যা কোন চক্ষু দেখে না, কোন কর্ণও শ্রবণ করে না। এমনকি অন্তরেও এর ভাব ও চিন্তা হয় না।

হারেছ ইবনে হিকাম হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ তাআলা পূর্বের গ্রন্থসমূহে যেসব আয়াত নাযিল করেছিলেন, তাতে এ বিষয় উল্লেখ ছিল যে, انا الله لا اله الا

لا। যদি আমি শস্যে কীট সৃষ্টি না করতাম তবে রাজা-বাদশাহগণ তা গুদামে জমা করে রাখত। যদি মৃত লাশে দুর্গন্ধ সৃষ্টি না করতাম তবে তাকে গৃহবাসীরা গৃহে রেখে দিত। من انا لا اله لا الله দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশে শস্যের প্রাচুর্য করা হয়, শস্যের বাজারে মূল্যাধিক্য সৃষ্টি করি।শস্য স্তুপীকৃত থাকে। (انا لا اله لا الله) যদি আমি অন্তঃকরনে আশা সৃষ্টি না করতাম তাহলে মানুষ চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত।

উমর ইবনে হিন্দ যখন মুতালাম্মিছকে ইরাকের শস্য হতে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তিনি বলেন–

اليت حب العراق الدهر اطعمه + والحب يا كلمه فى القرية السوس

"তুমি কি শপথ করেছ যে, সারা বৎসর ইরাকের শস্য ভক্ষণ করবে অথচ কোন শহরে যে শস্য উৎপন্ন হয় তা কীটই ভক্ষণ করে।"

বায়হাকী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি যোগ্যতা রাখে যে সে আকাশে বা অন্য এমন জাগায় শস্য রাখবে যেখানে চোরের পদচারণা নাই এবং তাতে কীটও নাই, তবে সে ব্যক্তির উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের গুদামের প্রতি সজাগ থাকে।

শায়খুল আরেফ আবুল আব্বাস বলেন, এক মহিলা আমার নিকট বর্ণনা করে যে, আমাদের নিকট কীটযুক্ত গম ছিল। আমরা তা পিষিয়েছি এবং তার সাথে সাথে কীটও পিষে গিয়েছে। আমাদের এখানে কীট লেগেছিল, আমরা তা চালুনির সাহায্যে চেলে নেই তখন কীট জীবিতাবস্থায় বের হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে বলি যে, সম্মানিত আকাবির অথবা বড়দের সংশ্রব শান্তির কারণ।

এর নিকটতম আরও একটি ঘটনা যা ইবনে আতীয়াহ সূরা কাহাফের তাফসীরে বর্ণনা করেন– আমার পিতা হতে আবুল ফজর জওহারী বর্ণনা করেন যে, আমি নিজের বয়ানের মজলিসে এ বলেছি যে, যে ব্যক্তি ভালদের সঙ্গ গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি তার বরকত লাভ করবে। সুতরাং আসহাবে কাহাফের কুকুর নেককারদের সঙ্গ গ্রহণ করেছে, যার বরকতে আল্লাহ তাআলা তার আলোচনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের রসনায় পাঠ থাকবে। এ কারণেই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জাকেরীনদের মজলিসে বসবে সে আলস্য হতে বিমুখ থাকবে। আর যে ব্যক্তি বা যারা নেককারদের খেদমত করবে সে ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত হবে।

ফায়েদা, আশ্চর্য ও বিরল

আল্লামা দামেরী রহ. "হায়াতুল হায়াওয়ানের" লিখক বলেন, কোন কোন উলামাদের নিকট হতে ফায়েদা হাসিল করেছি, যদি মদীনা মুনাওয়ারার সাত

ফকিহের নাম কোন কাগজে লিখে গমের মধ্যে রেখে দেয়া হয়, তবে কীট হতে নিরাপদ থাকবে। এ নামসমূহ নিম্নের পংক্তিতে একত্রিত করেন–

الاكل من الا يقتدى بايمة + فقمته ضيزى عن الحق خارجه

"চিন্তা করে শুন যে, যারা ইমামদের অনুসরণ করে না তার ভাগ্য মন্দ, আর সে সত্য হতে বহিরাগত।"

فخذهم عبيدالله عروة قاسم + سعيد , سلمان , ابوبكر , خارجه

সুতরাং তাদের অনুসরণ কর-উবাইদুল্লাহ, ওরওয়া, কাসেম, সাঈদ, সালমান, আবু বকর ও কাজো। যদি এসব নাম কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয় বা মাথায় ফুৎকার দেয়া হয় তবে মাথা ব্যতার উপশম হবে। মাথা ব্যথার উপশমকারী আয়াতসমূহ 'জীম' পরিচ্ছেদে বজারাদ-এর অধীনে অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, কোন কোন উলামায়ে কেরাম হতে আমার এ ফায়েদাও অর্জন হয়েছে যে, নিম্নোক্ত নামসমূহ লিখে ঝুলিয়ে দিবে, তবে মাথা ব্যথা, অর্ধমাথা ব্যথা ভাল হবে। নামসমূহ এই–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ احدا عليه يا داس ـ بحق من خلق فمك الانسان والاضراس وكتبه والكتبه بلاقلم ولا قرطاس قوبقرار الله اسطن واهدا بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا با لله العلى العظيم الم ترالى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا اسكن ايها الوجع والصداع والشقيقة والضربان عن حامل هذه الاسماء كما سكن عرش الرحمن وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم وننزيل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم ـ

আমল–২ : এ আমলটি কোন কোন উলামাদের নিকট হতে সংগৃহীত এবং পরীক্ষিত আমল। কাষ্ঠ কন্দরে এমন একটি স্থান যেথায় সূর্যের আলো পৌঁছে না এবং লিখা ও কাঠ নিয়ে যাওয়ার সময় যেন সূর্যের আলো না পড়ে। এ আয়াত লিখে গম বা যবের ভিতরে ঢেকে রাখবে, তাহলে তাতে কীট-মাকড় স্পর্শ করবে আয়াত গুলো না এই–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا كذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن

الله تعالى اخرج ايها السوس الفراش باذن الله تعالى عاجلا والا خرجت من ولا ية امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد اليك انك شرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلوة والسلام ـ

কীটের শরয়ী বিধান

ইহা খাওয়া হারাম, যেহেতু ইহা এক ধরনের কীড়া।

কীটের উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরববাসীগণ বলে যে, العيال سوس المال। খালেদ ইবনে সফওয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তোমার ছেলে কেমন ? প্রতিউত্তরে সে বলে যে, সে স্বীয় সমবয়স্ক যুবকদের নেতা। আবার প্রশ্ন করেন যে, প্রতিদিন তাকে কী খেতে দেন ? প্রতিউত্তরে বলেন, এক দিরহাম। অতঃপর তাকে বলা হল যে, তুমি তো শুধুমাত্র প্রতি মাসে ত্রিশ দিরহাম দাও, অতএব মাস ভিত্তিক শুধুমাত্র ত্রিশ রুপিয়া ব্যয় হয়। সফওয়ান উত্তরে বলেন, এই ত্রিশ দিরহাম বিনষ্ট হওয়া ঐ পশমের কাপড়ে কীট লেগে দ্রুত খাওয়া অপেক্ষা কম ক্ষতিকর।

এ বক্তব্য যখন হাসান বসরী রহ.-এর সম্মুখে পেশ করা হল তখন তিনি বলেন, আমি ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, খালেদ ইবনে সফওয়ান বনী তামিমের বংশের লোক এবং বনী তামীম কৃপণ, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকীর্ণমনার অধিকারী ছিল।

৪৫৭. আছ-ছীদ (السيد) বাঘ

السيد : (ছীনের নিচে যের, ইয়ার উপর সাকিন) ইহা বাঘদের নামসমূহ হতে একটি নাম বিশেষ। আর এ নামটি তো আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়্যিদ বজনুয়ূযীর দাদার নাম ছিল। এ আবু মুহাম্মাদ একজন প্রসিদ্ধ আভিধানিক নাহুবিদ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ৪৪৪ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন, আর ৫২১ হিজরী সনে রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৫৮. আছ-ছিদাহ (السيدة) মাদী বাঘ

السيدة : (ছীনের নিচে যের, ইয়া সাকীন, দালের উপর যবর) ইহা ব্যাঘ্রের মাদী– এ নামে নাহুর ইমাম ও ভাষার ইমাম, মুহাক্কিক আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল ইবনে সায়্যিদাহ নামে ভূষিত। ইলমে নাহু ও ইলমে লুগাতে তার ইমামের আসন অর্জিত হয়। এ বিষয়ে তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল মাহকাম ওয়াল মুখাসসাছ লিপিবদ্ধ করেন। তার পিতামাতা উভয়ে অন্ধ ছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে ৪৫০ হিজরী সনে রবিউল আওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

৪৫৯. সাইফানাতু (سيفنة) এক পাখি বিশেষ

মিশরী এক পাখি। এর বৈশিষ্ট্য হল, যদি এর সম্মুখে পাতা ফেলে দেয়া হয় তাহলে এ সবগুলী পরিষ্কার করে এমনভাবে যে, একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ প্রাণীর দ্বারা আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল হামদানীকে উপমা করা হয়। কেননা তাদের সম্মানিত অভ্যাসও এটাই ছিল যে, যখন তারা কোন মুহাদ্দিস হতে হাদীস শ্রবণ করেন তখন তারা ঐ সময় পর্যন্ত তাদের হতে পৃথক হন না যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র হাদীস জানা শেষ না হয়।

৪৬০. আবু সিরাস (ابو سيراس) এক ধরনের প্রাণী বিশেষ

ابو سيراس : কাযভিনীর মতানুযায়ী এ একটি প্রাণীবিশেষ, যা জঙ্গলে থাকে। এর নাকের বাঁশিতে বারোটি ছিদ্র হয়। যখন এ শ্বাস গ্রহণ করে তখন এ নাক হতে হৃদয়গ্রাহী বাঁশির সুরের মত বের হয়। এমনকি জঙ্গলের প্রাণী পর্যন্ত এ শ্রবণের জন্য তার এদিক সেদিক জড়ো হয় এবং কোন কোন প্রাণী এর সুরে উন্মাত্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। এরা তাদেরকে ধরে আহার করে। যদি কখনও কোন প্রাণী তার খাদ্যের উপযোগী না হয় তবে সে অস্থির হয়ে যায় এবং এমন ভয়ানক বিকট শব্দ বের করে, প্রাণীরা ভয়ে তার নিকট হতে পালিয়ে যায়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

باب الشين
পরিচ্ছেদ : 'শীন'

৪৬১. আশ-শাদিন (الشادن) হরিণ

الشادن : (দালের নিচে যের) এ শব্দের প্রয়োগ ঐ পুরুষ হরিণের ক্ষেত্রে হয় যার শিং বের হয়েছে। হরিণ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা 'যোয়া' ظاء পরিচ্ছেদে যবইয়ুন-এর আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪৬২. শাদ হাওয়ার (شادهوار) এক ধরনের প্রাণী বিশেষ

شادهوار : এ এক ধরনের প্রাণী যা রোম শহরে পাওয়া যায়। কাযভিনী স্বীয় আশকাল গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এর একটি শিং রয়েছে, যার মধ্যে বাহাত্তরটি শাখা আছে, যার ভিতরে ফোকলা হয়। যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন এর শিং হতে এমন হৃদয়গ্রাহী আওয়াজ বের হয়, যা শ্রবণের জন্য জঙ্গলের প্রাণীরা সব একত্রিত হয়ে যায়।

কাযভিণী রহ. কোন এক বাদশাহের ঘটনা উল্লেখ করেন যে, তার নিকট কোথাও হতে এ প্রাণীর শিং সংগ্রহ করে দেয়া হয়। যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন একে নিজের সামনে রাখেন। এর মধ্য হতে এমন আশ্চর্য ও বিরল

আওয়াজ বের হয় যে, কোন কোন শ্রবণকারী এর উপর দিওয়ানা হয়ে যায়। আর যখন এ গুছিয়ে রেখে দেয়া হয় তখন এ হতে এমন চিন্তিতের আওয়াজ বের হয় যে, লোকেরা এ শ্রবণ মাত্র ক্রন্দনের নিকটবর্তী হয়।

৪৬৩. আশ-শারিফ (الشارف) উট

الشارف : উট। এ ব্যাপারে হযরত আলী রাযি.-এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালসমূহ হতে আমার ভাগে একটি উট আসে এবং রাসূল সা. এ উট পঞ্চমাংশের মাল হতে আমাকে দান করেছিলেন। যখন হযরত ফাতেমা রাযি.-এর সাথে আমার বিবাহ সংঘটিত হয়, আর আমি ওলিমার ইচ্ছা পোষণ করি, তখন আমি আমার স্বর্ণালংকারসমূহ স্বর্ণকারের নিকট বিক্রি করে দেই যেন ওলিমার নির্ধারিত দিনে এর সাহায্য নিতে পারি। এ ইচ্ছায় বনী কায়নুকার এক স্বর্ণকারের সাথে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হই যে, আমার সঙ্গে এসে অলংকার নিতে। আর যখন আমি নিজের উভয় উটের হাওদায় মাল-সামানা আনার জন্য বাইরে যাই, তখন দুটি উটকে এক আনসারীর গৃহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রেখে গমন করি। আমি লাকড়ী ইত্যাদি নিয়ে ফেরত এসে দেখি যে, এদের কুঁজ ও পিঠের গোশত কেটে নেওয়া হয়েছে। এদের কলিজা পর্যন্ত বের করে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থা দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি তখন বললাম যে, আমার উটের সাথে এমন আচরণ কে করেছে ? লোকেরা আমাকে বলল যে, এ কাজটি হামযাহ রাযি.-এর হবে। আর সে ঐ স্থানেই আনসারদের নিয়ে মদ্যপান করেছে। আর এক গায়িকা এ দলে গান গাইতেছিল এবং পাঠ করতেছিল যে— বঙ্গানুবাদ

✪ হে হামযাহ! প্রসিদ্ধির জ্ঞান সম্পন্ন সে উটসমূহ মাঠে বন্দি।

✪ আপনি এদের গলায় ছুরি লাগান এবং এদের চিড়ে ফেড়ে রক্তাক্ত করুন।

✪ এবং এদের শরীরের উন্নত অঙ্গসমূহের গোশত ভুনা করে শরাব খানার জন্য প্রস্তুত করুন।

✪ আর আপনি তো আবু উমারা–আমরা আশাবাদী যে, আপনি আমাদের হতে যতসব কষ্ট-মসিবত দূরীভূত করবেন।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, হযরত হামযাহ সাইয়্যিদুশ শোহাদা রাযি. এ কাজ মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে করেছিলেন, সে সময় মদ্য পান বৈধ ছিল। ওহুদ যুদ্ধের পর মদ্য পান হারাম হয়েছে।

৪৬৪. আশ-শাত্ব (الشاة) ছাগল

الشاة : পুরুষ, স্ত্রী উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। شاة মূলে شاهية এজন্য যে, এর তাসগীর شوهيه আসে। আর তাসগীর দ্বারা বাক্যের মূল হরফসমূহের ঠিকানা চলে যায়। বহুবচন شاة আসে। সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন হতে দশ পর্যন্ত বহুবচন ব্যবহৃত হয়, আর বলা হবে এভাবে যে, ثلاث او اربع شياة -আর যদি সংখ্যা দশের চেয়ে বেশি হয় তবে এভাবে বলা হবে– هذه شياء كثير -কোন কবির উক্তি–

لاينفع شاوى فيها شاته * ولا حمار اه ولا غلاته

"ভুনা বকরীর গোশত দ্বারা উপকার পৌঁছাতে পারে না এবং গাধাও নয়, শস্যও নয়।"

কামেল ইবনে আদী গ্রন্থে খারেজা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালমানের অবস্থা সম্পর্কে আবদুর রহমান ইবনে আমেদ হতে বর্ণিত যে, রাসূল আকরাম সা. ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তির কাছে ছাগল রয়েছে আর সে ছাগলের দুধ প্রতিবেশি ও মিসকিনদের কাছে পৌঁছে না, তবে সে ছাগল জবাই করা অথবা বিক্রি করে দেয়া উচিত।

হাকীম লুকমানের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা, তার পূর্ণ নাম লুকমান ইবনে আন্‌কা ইবনে বাইরুন। তিনি আবলা শহরে বাস করতেন। ঘটনা, এই যে, একদা তার মালিক তাকে একটি ছাগল দিলেন আর বললেন যে, একে জবাই করে এর গোশতের সে অংশটুকু নাও যা সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং তিনি ছাগল জবাই করেন এবং এর কলিজা, জিহ্বা বের করে মালিকের সম্মুখে পেশ করেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাকে একটি ছাগল দিয়ে বলেন, এর গোশতের সে অংশটুকু নাও যা সবচেয়ে মন্দ। তিনি সেটিকেও জবাই করেন এবং এর কলিজা, জিহ্বা বের করে মালিকের সামনে পেশ করেন। মালিক আশ্চর্যবোধ করেন এবং প্রশ্ন করেন যে, একই অংশ ভাল এবং মন্দ হয়, এ কী করে সম্ভব। তিনি উত্তর দেন যে, কলিজা ও জিহ্বা উভয়টি উত্তম বস্তু। শর্ত এই যে, তার জাত যদি ভাল আভিজাত্য হয় এবং এ উভয় বস্তু মন্দ হবে যখন তার জাত ভাল ও আভিজাত্যের পরিপন্থী হয়।

আল্লামা দামেরী রহ. বলেন, রাসূল সা.-এর হাদীসের উদ্দেশ্য হল, মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে এক টুকরা গোশত রয়েছে, যদি তা পবিত্র হয় তবে সমস্ত শরীরই পবিত্র থাকে। আর যদি তা কলুষিত হয় তখন সারা শরীরই কলুষিত হয়, আর তা হচ্ছে কলব বা অন্তঃকরণ।

একদিন হাকীম লুকমানের মালিক পায়খানায় যান। সেখানে দীর্ঘ সময় বসেছিলেন। তিনি ডেকে বলেন, পায়কানায় দীর্ঘ সময় বসে থাকা অনুচিত। ঐ স্থানে দীর্ঘ সময় বসে থাকার কারণে কলিজা ফেটে যায় এবং অন্তঃকরণ মারা যায় এবং প্রতিক্রিয়াশীল দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

হযরত হাকীম লুকমান নিজের সন্তান সারানকে ওসিয়ত করেছেন যে, হে বৎস! অসৎ সঙ্গ হতে বেঁচে থাকবে। যখন তুমি তার সম্মান করবে এবং সৎ লোকের নিকট হতে যখন তুমি তাদের অপমান করবে। আত্ম জ্ঞানী লোক হতে যখন তুমি তার দুর্নাম করবে এবং নির্বোধ হতে যখন তুমি তার সাথে ঠাট্টা করবে। আর মূর্খ লোক হতে যখন তুমি তার সঙ্গ দিবে এবং দুশ্চরিত্রের নিকট হতে যখন তুমি তার সাথে ঝগড়া করবে। হে বৎস! তিনটি বিষয় সৌন্দর্যনীয়– (১) কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নেক ধারণায় স্বরণ করা, (২) ভাইদের ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে বহন করা, (৩) অভাবাবস্থায় বন্ধুকে সাহায্য করা।

প্রথমেই রাগ করা পাগলামীর নামান্তর এবং এর পরিসমাপ্তি তিরস্কার ও লাঞ্ছনার দ্বারা শেষ হয়। তিনটি বিষয় এ হল, যার মধ্যে হেদায়েত লুকায়িত আছে, (১) নিজের মঙ্গল কামনায় পরামর্শ করা উচিত (২) শত্রু ও হিংসুকের সাথে কল্যাণকর আচরণের সাথে পেশ হওয়া (৩) প্রত্যেকের সাথে মুহাব্বতের সাথে সাক্ষাত লাভ করবে।

তিনটি বিষয়ের উপর ভরসা করবে তো প্রতারিত হবে (১) না দেখে কার সত্যায়ন করা, (২) ভরসাহীন ব্যক্তির উপর ভরসা করা, (৩) এমন বস্তু আশা করা যা হস্তগত হবে না। যদি তুমি হেকমতের শক্তিতে বলীয়ান হতে চাও তবে নারীদেরকে নিজের জীবনের মালিক বানাবে না। কেননা নারী জাত এমন এক যুদ্ধ বিশেষ যার সাথে সন্ধি করা অসম্ভব। নারীদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যদি সে তোমাকে মুহব্বত করতে শুরু করে তবে তোমাকে আহার করে ছাড়বে। আর যদি তোমার সাথে ক্রোধ ভাব থাকে তবে সে তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

আল্লামা যামখশরী স্বীয় গ্রন্থ আল আবরারে লিখেন যে, আমার নিকট যদি একটি হালাল রুটি পৌঁছে তবে আমি তাকে ভস্মিভূত করে রোগীদের রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতাম। তিনি বলেন, একবার কুফার ছাগলসমূহ বন্য ছাগলদের সাথে মিশে গিয়েছিল, তখন ইমাম আবু হানিফা রহ. জিজ্ঞাসা করেন যে, ছাগলের বয়স কত ? মনে হয় সাত বৎসর। অতএব তিনি সাত বৎসর পর্যন্ত ছাগলের গোশত ব্যবহার করেন নাই। মুবাররাদের পংক্তি— বাঙ্গানুবাদ

✪ কভু যখন মনের ইচ্ছা আমাকে কোন মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে ইচ্ছা পোষণ করে তখন আমার উদারতা ও লজ্জা তার নাফরমানী করে।

✪ এজন্য আমি আমার হাত প্রসারিত করি নাই এবং কোন মন্দ কাজে পা ফেলি নাই।

তারিখে ইবনে খালকানে উল্লেখিত যে, একদা খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক আ'মাশ সে চিঠি দুত হতে নিয়ে পড়েন এবং পড়ে ছাগলের মুখে দেন, ছাগল তা চর্বন করে। অতঃপর বার্তাবাহককে উদ্দেশ্য করে বলেন, খলীফার নিকট গিয়ে বলবে যে, আমি যা কিছু বলেছি এই তার পত্রের উত্তর। এ শ্রবণমাত্র বার্তাবাহক চলে যান। সামান্য দূরে যেয়ে আবার ফিরে এসে বলেন, খলীফা শপথ করেছেন যে, যদি তুমি কোন উত্তর না নিয়ে আস তবে আমি তোমাকে হত্যা করব। বার্তাবাহক নিজের ভাইদেরকে মধ্যস্থতায় ফেলে দেন। তারা আ'মাশকে তোষামোদ করে উত্তর লিখার উপর উদ্বুদ্ধ করেন। অতএব তিনি খলীফার নামে চিঠি লিপিবদ্ধ করেন। তার বক্তব্য এ ছিল যে–

যদি হযরত উসমান গনী রাযি.-এর সমগ্র দুনিয়ার সুনাম থাকে তবে তাতে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। ধরা যাক, যদি হযরত আলী রাযি.-এর দুনিয়া ভর্তি বদনাম থাকে, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। যার দরুন আপনার মনে মনে ভাবা উচিত।

আ'মাশের নাম সুলাইমান ইবনে যিহরান ছিল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক ও আবু বকর আস সাকাফী রাযি.-এর দর্শন লাভ করেন। আবু বকর সাকাফী রাযি.-এর সওয়ারীর জীনের সঙ্গে পদদ্বয় রাখার স্থানের আংটি ধরেছিলেন এবং তিনি বলেন, হে বৎস! তুমি আমার পদদ্বয় রাখার স্থানের আংটি ধরলে কেন ? অথচ তুমি নিজের প্রভুর সম্মান করেছ। আ'মাশের চরিত্র পূতঃপবিত্র এবং উন্নত মেজাজের অধিকারী ছিলেন। সত্তর বৎসর পর্যন্ত তার তাকবীরে উলা ছুটে নাই। তার সম্পর্কে আশ্চর্য ও বিরল প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে।

একদা তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। তার বিবি সাহেবা কুফার নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী ছিলেন। আর স্বয়ং আ'মাশ তুলনামূলক অনেক কম সুন্দর ছিলেন। ইতিমধ্যে আবুল বালাদ নামে এক ব্যক্তি হাদীস পড়ার জন্য তার নিকট আগমন করেন। তিনি তাকে বলেন, আমার ও আমার বিবির মধ্যকার সম্পর্ক প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার নিকট গিয়ে বল যে, মানব সমাজে আমার স্থান কেমন এবং এর বাস্তবতা কতটুকু। সুতরাং তিনি বিবি সাহেবাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার ভাগ্য খুবই কল্যাণকর বানিয়েছেন যে, আপনার ও তার মধ্যকার বিবাহ বন্ধন হয়েছে। আমাদের শায়খের উদ্দেশ্য, তার নিকট হতে আমরা ধর্মীয় উসুল, হালাল-হারামের আহকাম শিক্ষা লাভ করি। সুতরাং আপনি তার ক্ষীণ দৃষ্টি, নষ্ট পায়ের কারণে প্রতারণায় গ্রেফতারিত হবেন না। এ ব্যক্তির শেষ বাক্য শ্রবণ করে আ'মাশ ক্রোধান্বিত হয়ে লাল হয়ে গেলেন এবং তাকে বলতে শুরু করেন যে, দুষ্ট! আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরকে অন্ধ করুক। তুমি তার কাছে আমার দোষ প্রকাশ করেছ। এ বলে তাকে ঘর হতে বের করে দেন।

একদা ইব্রাহীম নাখয়ীর সাধ জাগল যে, আ'মাশের সাথে কোথাও সফর করবেন। অতঃপর আ'মাশ বলেন, যখন লোকেরা আমাদেরকে একসাথে দেখবে তখন তারা বলবে যে, কানা আর অন্ধ এক সঙ্গে যাচ্ছে। ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন, এতে দোষ কিসের ? লোকেরা আমাদেরকে কানা, অন্ধ বলে নিজেরাই গোনাহগার হবে। আ'মাশ বলেন, এতে আপনার সমস্যা কী যে, তারা গোনাহ হতে আর তাদের দৃষ্টিতে আমাদের দোষ প্রকাশ হওয়া হতে হেফাজত থাকবে।

একদা আ'মাশ এমন স্থানে বসা ছিলেন যে, তার ও আগন্তুকের মধ্যে বর্ষিত পানির উপসাগরের ব্যবধান ছিল। আ'মাশ লোমের পুরাতন কোর্ট পরিহিত ছিলেন। হঠাৎ মুহূর্তের ভিতর কেউ তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসে। মধ্যভাগে পানির বাঁধা দেখে বলেন, সামান্য উঠে আমাকে পার করে দেন। সুতরাং আ'মাশ কাঁধ ধরে নিজের দিকে টেনে নেন এবং তাকে নিজের কোমরে বসালেন। যখন সে তার কোমরে সওয়ার হন তখন তিনি উপহাস হিসেবে পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতখানা তেলাওয়াত করেন, যা সওয়ারীর সময় পাঠ করা হয়। অর্থাৎ–

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔

আ'মাশ যখন তাকে নিয়ে চলছিলেন এবং পানির মধ্যভাগে পৌঁছেন তখন তাকে ফেলে দেন এবং এ আয়াত পাঠ করেন–

قل رب انزلنى منزلا مباركا وانت خير المنزلين۔

"উল্লেখিত আয়াত সওয়ারী হতে অবতরণের সময় পাঠ করতে হয়।"

অতঃপর তিনি নিজের সওয়ারীকে ছেড়ে দিয়ে একাই পানি হতে বের হয়ে আসেন।

এক ব্যক্তি তার সন্ধানে এসে জানতে পারেন যে, তিনি বিবি সাহেবাকে নিয়ে মসজিদে গিয়েছেন। সুতরাং সে-ও মসজিদের দিকে যান। পথিমধ্যে তার সাথে সাক্ষাত ঘটে। সে ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনাদের মধ্যে আ'মাশ কে ? তিনি বিবি সাহেবার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, সে আ'মাশ।

একদা তিনি পীড়িত হন আর লোকেরা তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য আসা শুরু করে। কিছু সংখ্যক লোক তার নিকট দীর্ঘ সময় বসে থাকেন। আর যখন তারা চলে যাওয়ার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করছেন না তখন আ'মাশ জোরপূর্বক স্বীয় ঠেস উঠিয়ে দাঁড়ান এবং এ বলে চলে যান যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থতা দান করুক।

একদিন কেউ তার সম্মুখে জনাব রাসূল সা.-এর এ সম্মানিত ইরশাদ পাঠ করেন যে, যে ব্যক্তি কিয়ামে লাইল ছেড়ে শয়ন করে তখন সে ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করে দেয়। এ শ্রবণ করে তিনি বলেন, আমার চোখে যে

অস্পষ্টতা এসেছে তা এ কারণে যে, শয়তান আমার কানে প্রস্রাব করে গিয়েছে। তিনি কোন মুসলমান ভাইয়ের সমবেদনাময়ী পত্র লিখেন, যাতে নিম্নর পংক্তিগুলী–বঙ্গানুবাদ

✪ আমরা যারা আপনার সমবেদনা দিতেছি, তা এই কারণে নয় যে, আমাদের ভরসা আপনার জিন্দেগীর উপর; বরং সমবেদনা পকাশ করা সুন্নত।

✪ মৃত্যুর পর সমবেদনা ও সমবেদনাকারী কেউ তো, যদ্যপি সে উভয় বার্ষিকী জীবিত থাকে।

আ'মাশের মৃত্যু সন ১৪৭-১৪৮ অথবা ১৪৯ হিজরী।

তারিখে ইবনে খালকানে এও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে যখন মক্কা মুকাররমার খলীফা নিযুক্ত করা হয় তখন তিনি নিজের ভাই মাসয়াব ইবনে যুবাইরকে মদীনার গভর্নর নির্বাচিত করেন এবং মারওয়ান ইবনে হিকামকে তার ছেলেসহ সেখান হতে বহিষ্কার করে দেন, সে শাম দেশে চলে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ৬৪ হিজরী হতে ৭২ হিজরী সন পর্যন্ত মানুষকে সরাসরি হজ্জ করান। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান যখন খলীফা হিসেবে নিযুক্ত হন তখন তিনি শামবাসীদেরকে হজ্জ করা হতে বাধা দান করেন। কেননা, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. যারা হজ্জ সমাপন করে এসেছে তাদের নিকট হতে নিজের জন্য বাইয়াতে খেলাফত গ্রহণ করতেন। যখন শামবাসীদের উপর এ নিষেধাজ্ঞা জারি হল তখন আবদুল মালেক উন্মুক্ত প্রান্তরে একটি পাথরের গম্বুজ স্থাপন করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, লোকেরা আরাফায় অবস্থানের দিন বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে অবস্থান করবে, অতএব শামবাসী এর উপর আমল করেছে।

বলা হয় যে, বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য শহরের মসজিদে উকুফে আরাফা করার প্রথা এ সময় হতেই শুরু হয়েছে। বসরাবাসীদের উকূফে আরাফা করার প্রথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যুগ হতে শুরু হয় এবং মিসরে আব্দুল আজীজ ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে শুরু হয়। আবদুল মালেক মাসয়াব ইবনে যুবাইরকে হত্যা করে প্রত্যাবর্তন করার মনস্থির করেন, তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ খলীফার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ধরে তার চামড়া টেনে বের করেছি। সুতরাং আপনি তাদের সাথে লড়াই করার সুযোগ আমাকে সোপর্দ করুন। অতএব আবদুল মালেক শাম দেশের একটি বড় জামাতের সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা করে দেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কা মুকাররমা বেষ্টন করে রাখে এবং কাবা শরীফের উপর ক্ষেপনাস্ত্র দ্বারা পাথর বর্ষণ শুরু করে। এ কার্যকলাপ চলাকালীন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল এবং বিকট আওয়াজ সৃষ্টি হয়। শামে সৈন্যরা এ অবস্থা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

অতঃপর হাজ্জাজ বিকট শব্দ করে আহ্বান করে যে, তোমরা ভয় পেও না। এ তিহামার বিদ্যুৎ, এরকম সব সময়ই হয়। আমি এখানে আছি, আমার এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কথা বলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ দাঁড়িয়ে পাথর বর্ষণ শুরু করে। ইতিমধ্যেই আসমান হতে বিদ্যুৎ এবং গর্জনের সমাগম বেধে যায় এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দলের ১২জন লোক মারা যায়। হাজ্জাজ স্বীয় দলের শক্তি-সাহস বৃদ্ধির সুযোগের সন্ধান পায়। সুতরাং সে স্বীয় দলের লোকদের ভয় প্রদর্শন করে আহ্বান করল যে, দেখ নাই আমাদের শত্রুরাই তো এ বিপদে গ্রেফতার। অর্থাৎ আসমানের বিদ্যুৎসমূহ তাদের উপরেই বিকট শব্দ করতে থাকে। হাজ্জাজ অবিরাম কাবা শরীফের উপর কংকর নিক্ষেপ করতে থাকে এবং একে ধ্বংস করে ছাড়ে। অতঃপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ শুরু করে, যার ফলে কাবা শরীফের চাদর পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. কাবা শরীফের এ অবস্থা অবলোকন করে ধারণা করেন যে, যখন কাবা শরীফকে এ মমতাহীন ধ্বংস করতে পারে তখন আমি যদি তাদের হস্তগত হই, তখন আমার অবস্থা কী হবে ? এ প্রশ্ন উদয় হওয়ার পর তিনি স্বীয় সম্মানিতা মাতা হযরত আসমার নিকট আরজ করেন যে, যদি আমি মারা যাই তাহলে এ লোকসকল আমাকে নাক কান কর্তন করে শুলিতে চড়াবে। সম্মানিতা মাতা বললেন যে, বৎস! যখন ছাগলকে জবাই করে দেয়া হয়, তখন চামড়া বের করার কারণে তার কষ্ট হবে না। এ উত্তর শুনে সম্মানিতা মাতার নিকট হতে বিদায় নিয়ে বের হয়ে শত্রু দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য করেন। শত্রুপক্ষ তার চেহারার উপর কংকর নিক্ষেপ করতে শুরু করে, যার দরুন তার চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে যায়। যখন তিনি নিজের চেহারায় রক্তের উত্তপ্ততা অনুভব করলেন তখন নিজের মুখ হতে এ পংক্তি বের হল–বঙ্গানুবাদ

✪ আমরা সেসব লোক নয় যে, আমাদের পৃষ্ঠদেশের উপর ক্ষতস্থানে রক্ত প্রবাহিত হয়; বরং আমরা সেসব লোক যে আমাদের বক্ষদেশ দিয়ে আমাদের রক্ত ঝরে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর একটি পাগল বাঁদী ছিল, সে যখন তাকে পড়ে যেতে দেখেন তখন তার দিকে ইঙ্গিত করে চিল্লিয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করে এবং তার মুখ হতে এ শব্দ বের হয়– وامير المؤمنين

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. ১৩ই জুমাদাল উখরা ৭৩ হিজরী সনে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। যখন তার শাহাদাতের খবর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছে পৌঁছে তখন সিজদায়ে শুকুর আদায় করেন। অতঃপর সে এবং তারেক নামক এক ব্যক্তি উঠে তার মৃতদেহের নিকট আসে। তারেক তাকে দেখে বলে যে, নারীগণ আপনার অপেক্ষা অধিক জিকিরকারী কাউকেই জানে না। এ শ্রবণ করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলতে শুরু করে যে, তুমি এমন ব্যক্তির প্রশংসা করছ, যে আমীরুল মু'মিনীনের বিরোধী ছিল। প্রতিউত্তরে তারেক বলল

যে, আপনার প্রশংসা করব সে আমাদের নিকট দুর্বল ছিল। যদি খেলাফতকালে বিরোধী না হত, তাহলে আমাদের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করার বৈধতার কোন পথ ছিল না। আমরা তাকে বেষ্টন করেছি অথচ তাদের পক্ষ হতে আমাদের প্রতি কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি ছিল না। তারা আমাদের সাথে ৮মাস যাবত আধাআধির মোয়ামেলা করছিল; বরং আমাদেরকে অর্ধেকের চেয়েও বেশি দিয়েছিল। যখন খলীফা আবদুল মালেক এ কথোপকথনের সংবাদ প্রাপ্ত হন তখন তিনি তারেকের ভাষ্য পছন্দ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের-এর মাথা মুবারক খলীফার নিকট দামেস্কে প্রেরণ করেন। সে একে আবদুল্লাহ ইবনে হাযেম আল আছলামির নিকট প্রেরণ করেন, যিনি ইবনে যুবাইরের পক্ষ হতে খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। খলীফা মস্তক বহনকারীর মারফত এ চিঠি প্রেরণ করেন যে, যদি তুমি আমার আনুগত্য কর, তাহলে আমি তোমাকে খোরাসানের ৭ বৎসরের আয়-উন্নতি প্রদান করব। আবদুল্লাহ ইবনে হাযেম খলীফার বার্তাবাহককে লক্ষ্য করে বললেন যে, যদি এ আইনটি পাস না করা থাকত যে, দূতদেরকে হত্যা করার বিধান নাই, তাহলে আমি এ মুহূর্তেই তোমার স্কন্ধ উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখে এ পরিমাণ কঠোর হতে পারি যে, তুমি তোমার মনিবের চিঠি চিবিয়ে খেয়ে যাও। সুতরাং সে এমন করল ছাগলের মত চিঠি চিবিয়ে খেল। আবদুল্লাহ ইবনে হাযেম ঐ মাথাকে নিয়ে গোসল দেন এবং তাকে কাফন পড়িয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দাফন করে দেন। এও একটি বর্ণনা যে, আবদুল্লাহ ইবনে হাযেম ঐ মাথা ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর পরিবার পরিজনদের উদ্দেশ্যে আসমা রাযি. ইবনে যুবাইর রাযি.-এর শাহাদাতের পাঁচ দিন পর এ ধরা হতে প্রস্থান করেন। তার বয়স একশ বৎসর হয়েছিল।

জাহেয ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেন যে, এর পূর্বে আরও একবার কাবা শরীফের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়। এ সে সময় হয়েছিল যখন ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া রাযি. -এর রাজত্বকাল ছিল। মুসলিম ইবনে ওয়ালিদ স্বাধীনতার পর মক্কা মুকাররমা পরিবেষ্টন করেছিলেন। কিন্তু সে সময় ইয়াযীদের মৃত্যু হয়, তখন মুসলিম পরিবেষ্টন পরিহার করে নিজের দেশ শামদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণনা যে, আমি কুরবানী ঈদের দিন নিজের মাতার নিকট বসেছিলাম। আমি একটি রমণীকে ময়লা পোশাক পরিহিতা অবস্থায় আসতে দেখি। আমার মাতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি তাকে চিনতে পেরেছ সে কে? আমি না বোধক উত্তর দেই, তখন মাতা বলেন, আমি শুধুমাত্র এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করব যা হতে শিক্ষা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কুরবানীর ঈদের দিন ছিল। আমার এখানে সওয়ালকারীদের সমাগম বেঁধে থাকত। আমার চতুষ্পার্শ্বে আমার চারশত খেদমতকারিণী

বাঁদীদের সমাবেশ থাকত। আজ আমার স্মরণ হচ্ছে যে, আমার পক্ষ হতে আমার সন্তান জা'ফর কুরবানী করেছিল। কিন্তু আফসোস আজ সে দিন যে, আমি তোমরা লোকসকলের নিকট দুটি ছাগলের চামড়া নেওয়ার জন্য ভিক্ষুক হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। এ শ্রবণ করে তাকে পাঁচশত দিরহাম দান করি। আমাদের এখানে তার আগমন প্রস্থানটি সহজ ছিল এ পর্যন্ত যে, তার মৃত্যু হয়েছে। জা'ফর বারমাকীর হত্যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ ইকাব (عقاب) এর অধীনে আসবে।

সুনানে ইবনে মাযাহ ও কামেল ইবনে আদী গ্রন্থে আবু যর ইবনে আব্দুল্লাহর অবস্থা বর্ণনায় হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন যে, ছাগল জান্নাতের চতুষ্পদের মধ্য হতে। হাফেয আবু উমর ইবনে আবদুল্লাহ আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে আবু রেজা আল আতারবীর অবস্থা সম্পর্কে লিখেন যে, আরববাসীদের প্রথা ছিল যে, তারা সাদা ছাগল নিয়ে তার প্রতিপালন করতেন। যখন বাঘ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তখন দ্বিতীয় আরও একটি আনয়ন করে খাড়া করেন। সুনানে বায়হাকী এবং হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূল আকরাম সা. জবাইকৃত ছাগলের সাথে অঙ্গসমূহ খাওয়া মাকরূহ মনে করেন এবং সে অঙ্গসমূহ এ যে, বংশবিস্তারক অঙ্গ, অণ্ডকোষ, রক্ত, পিত্ত, গুর্দা, লজ্জাস্থান, বক্ষ। আর ছাগলের ঊর্ধ্বতন স্থান অধিক পছন্দ ছিল।

হযরত উম্মে সালমা রাযি. বলেন, আমাদের এখানে রাসূল আকরাম সা. তাশরীফ আনয়ন করেন, আর একটি ছাগল এসে আমাদের মটকার নিচে নিজের ক্ষুর দ্বারা মাটি খনন করতে শুরু করে। আমি এর স্কন্ধ ধরি, তখন তিনি বলেন, আমি এ আশা করি নাই যে, তুমি এর স্কন্ধ ধরবে। সুনানে আবু দাউদ এবং আরও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত যে, খয়বরে এক ইহুদী নারী ছাগলের গোশতের সাথে বিষ মিশ্রণ করে রাসূল সা.-এর খেদমতে প্রেরণ করে সাহাবীদের মধ্য হতে বিশির ইবনে বারার ইন্তেকাল হয়। তিনি ঐ মহিলাকে ডেকে আনতে বলেন। যখন সে মহিলা আসল তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ ? প্রতিউত্তরে সে বলল যে, আমি এ ভেবে এমনটি করেছি যে, আপনি যদি সত্য নবী হন তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে আমরা আপনার নিকট হতে পিছু হটব। এ স্বীকারক্তির পর তাঁর নির্দেশে সে মহিলাকে হত্যা করে দেয়া হয়। আল্লামা দামেরী রহ.বলেন, হত্যার বর্ণনা মুরসাল, কারণ জাওহারী রহ. এ হত্যার ব্যাপারে হযরত জাবের রাযি. হতে কিছু শোনেন নাই। কিন্তু সংরক্ষিত বর্ণনা এ যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আপনি কি এ মহিলাকে হত্যা করবেন না ? তখন তিনি উত্তর প্রদান করেন যে, না। ইমাম বুখারী রহ. এভাবেই বর্ণনা করেন। কিন্তু বায়হাকী উভয় রেওয়ায়েতে এভাবে একত্রিত করেন যে,

প্রথমত তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু বায়হাকী উভয় রেওয়ায়েতে এভাবে একত্রিত করেন যে, প্রথমত তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন বিশিরের মৃত্যু তখন তিনি হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। এ মহিলার নাম যয়নব বিনতে হারস। ইবনে ইসহাকের উক্তি যে, এ মহিলা মারহাব ইয়াহুদীর বোন ছিল এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ যুহুরী হতে বর্ণনা করেন যে, সে মহিলাটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সহীহ বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজায় উল্লেখ আছে যে, জনাব রাসূল সা. ওরওয়াহ ইবনুল জাদাহ এবং অন্যদের বক্তব্য যে, আবুল জা'দাকে এক দিনার প্রদান করেন ছাগল ক্রয় করার জন্য। ওরওয়াহ ঐ এক দিনার দ্বারা দুটি ছাগল ক্রয় করেন। এর মধ্য হতে একটি ছাগল এক দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করেন। এক ছাগল ও এক দিনার নিয়ে রাসূল সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং ছাগলসমূহ ক্রয় করার ঘটনা শোনান। রাসূল সা. তাতে তার হাতে বরকতের দুআ করেন।

অতঃপর হযরত ওরওয়াহ কুফার কিনাছায় (একটি স্থানের নাম) বের হন এবং ব্যবসার মালে লাভবান হন। ক্রমে ক্রমে কুফার সম্পদশালীদের মধ্যে সেও গণ্য হতে শুরু হয়। শাবীব ইবনে গারকাদ বলেন, সে ওরওয়াহর গৃহে জিহাদ ফি ছাবীলিল্লাহর সত্তরটি ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখেন। ওরওয়াহ ইবনে আবুল জা'দ রাসূল সা. হতে তেরোটি হাদীস বর্ণনা করেন। সর্বাগ্রে তিনি কুফার কাজীর পদমর্যাদা লাভ করেন।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তাকে শুরাইহ-এর পূর্বে কুফার কাজী নিযুক্ত করেন।

আশ্চর্য ঘটনাবলি

ইবনে আদী হাসান ইবনে ওয়াকেদ আল কাযযাব হতে বর্ণনা করেন যে, আবু জাফর জাওয়াহিল ভাল মুত্তাকী লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি একটি ছাগল জবাই করার উদ্দেশ্যে যমীনে শয়ন করাই। আইয়ূব সখতিয়ানি সেস্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমি ছোরা যমীনে রেখে দেই আর তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথোপকথন করতে শুরু করি। ছাগল চিল্লিয়ে দেয়ালের গোড়ায় স্বীয় ক্ষুরের সাহায্যে একটি গর্ত খনন করে এবং ছুরি পা দ্বারা গড়িয়ে ঐ গর্তে ফেলে দিয়েছে এবং তার উপর মাটি চাপিয়ে দেয়। আইয়ূব সখতিয়ানি বলতে থাকে, তোমরা দেখ ছাগল কী করছে ? এ দৃশ্য দেখে আমি শক্ত অঙ্গীকার করি যে, ভবিষ্যতে কোন প্রাণীকে নিজের হাতে জবাই করব না।

হেফাজতের জন্য আমল

আবু মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাশিম আল মাসয়াবী ইমাম শাফী রহ.-এর মধ্য হতে একজন বড় ইমাম এবং নেক আলেম ছিলেন। তার বর্ণনা যে, একবার কিছু সংখ্যক লোক আমার উপর আক্রমণ করে এবং তরবারি দ্বারা

আঘাত করে। কিন্তু আমার উপর তরবারির সামান্য প্রভাব পড়ে নাই। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে সময় পবিত্র কুরআনে কারীমের এ আয়াত পাঠ করছিলাম–

ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ـ ويرسل عليكم حفظة ان ربى على كل شىء حفيظ فالله خير حافظا وهو ارحم الرحمين ـ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا من كل شيطان ماردو حفظا ذالك تقدير العزيز العليم وربك على كل شىء حفيظ الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان كل نفس لما عليها حافظ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدى ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فى تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ ـ

দ্বিতীয় আমল :

হাফেয আবু যারাআহ রাজী বলেন, একবার জুরজান শহরে আগুন লাগিয়েছিল। সেখানে ৯ হাজার গৃহ জ্বলে গিয়েছিল এবং ঐসব গৃহসমূহের সাথে ৯ হাজার নুসখাও আগুনের ভিতরে চলে যায়। কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ঐসব নুসখায় প্রজ্বলিত হয় নাই; বরং সংরক্ষিত থাকে। আয়াতসমূহ এই–

ذالك تقدير العزيز العليم وعلى الله فليتوكل المؤمنين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه تنزيلا ممن خلق الارض والسموات لاعلى الرحمن على العرش الستوى له ما فى السموات ومما فى الارض وما بينهما وما تحت الشرى يوم لاينفع مال ولا بنون الامن اتى الله بقلب سليم اتينا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما باريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القة المتين وفى لاسماء رزقكم زما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ـ

অর্থ : এ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং মুমিনদের উচিত যেন তারা আল্লাহর উপরই শুধু ভরসা করবে। আর তোমরা আল্লাহ

তাআলাকে জালেমদের কার্যাবলি সম্পর্কে অজ্ঞ মনে কর না। আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত নেয়ামতকে তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না এবং তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর দ্বিতীয় কার ইবাদত কর না। আর এ এমন সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ যিনি এ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে সৃজন করেছেন। মেহেরবান প্রভু আরশের উপর সমাসীন। আসমান যমীনে যা কিছু ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ যা কিছু সবই তাঁর অধীন।

কিয়ামত দিবসে মুক্তি লাভের জন্য কোন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, তবে সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে যে ব্যক্তি কুফর-শিরক হতে অন্তর পবিত্র করে আল্লাহর নিকট আসবে। তোমরা আনন্দ চিত্তে অথবা জোরপূর্বক আসবে, উভয়ে আরজ করেন, আমরা আনন্দচিত্তে উপস্থিত। আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃজন করেছি। আমি তাদের নিকট সৃষ্ট জীবের রিযিক তলব করি না। এমনকি আমার নিজের খাবারের জন্যও দরখাস্ত করি না। শক্তিধর আল্লাহ্ তাআলা, তিনি নিজেই সকলকে রিযিক দান করেন। আর তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতি কিয়ামত সংক্রান্ত যে প্রতিশ্রুতি করেছেন সবই আকাশে নির্ধারিত।

অতএব নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের শপথ যে, তিনি সত্য-যা তোমরা কথোপকথন কর। বলা হয় যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহ যদি কোন মাল, দোকান এবং গৃহে রাখা হয় তবে এ আয়াতের বরকতে আল্লাহ্ তাআলা তার হেফাজত করবেন। আমি লিখকের অভিমত যে, এ আয়াতগুলী পরীক্ষিত।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

সায়ালাবি ইবনে আতিয়া, কুরতুবি এবং আমরা অনেকেই সালেম ইবনে আবুল জায়াদ হতে বর্ণনা করেছি, কিন্তু এ আয়াতটি অবশিষ্ট ছিল– الا الى الله تصير الامور - সাবধান! সমস্ত কার্যাবলি তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এমনিভাবে এক নমুনা –পবিত্র কুরআন পানিতে ডুবে দিয়েছিল, তবুও এ আয়াতটি সংরক্ষিত থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত আয়াত মুছে গিয়েছিল।

ধনী হওয়া. ঋণ আদায়. শত্রুর উপর জয়লাভ এবং মসিবত হতে হেফাজত থাকার আমল

ইমাম আরিফ বিল্লাহ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আশআদ ইয়াফি বর্ণনা করেন যে, ইমাম আরিফ বিল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল ফারসি হতে আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, তাদের নিকট তাদের উস্তাদ শায়খ আবু রবি আল আলকি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ধন ভাণ্ডারের সংবাদ দিব না যে, তোমরা সেখান হতে ব্যয় করতে থাকবে কিন্তু হ্রাস পাবে না। তারা আরজ করল যে, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, এ পাঠ কর–

يا الله يا واحد يا احد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذالطول يا غنى يا مغنى يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السموات والارض يا ذوالجلال والاكرام يا حنان يا منان انفحنى منك ينبنفعة خير تغننى بها عمن سواك ان تستفتحوا فقد جائكم الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا نصر منالله وفتح قريب اللهم يا غنى يا حميد يا مبدى يا معيد يا ودود يا ذالعرش المجيد يا فعالا لما يريد اكفنى بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك واحفظنى بما حفظت به الذكر وانصرنى بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير۔

অর্থ : হে আল্লাহ, হে ওয়াহেদ, হে আহাদ. হে বিদ্যমান, হে জাওয়াদ, হে বাছেদ, হে করিম, হে অধিকদাতা, হে শক্তিধর, হে অমুখাপেক্ষী, হে অমুখাপেক্ষিকারী, হে প্রশস্তকারী, হে রিযিকদাতা, হে জ্ঞানী, হে বিজ্ঞ, হে জীবিত, হে কাইয়্যুম হে রহমান, হে রাহীম, হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে উপমাহীন সৃষ্টিকারী, হে মহিমান্বিত, হে সম্মানিত, হে হান্নান, হে বহু দয়ালু, আমাকে আপনার পক্ষ হতে কল্যাণের একটি অংশ দান করুন, যা দ্বারা আমাকে আপনি ছাড়া অন্যদের হতে অমুখাপেক্ষী করে। যদি তোমরা লোকসকল সমাধান চাও তাহলে এ সমাধান তো তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করব। আল্লাহ তাআলার সাহায্য এবং বিজয় অতি নিকটে। হে আল্লাহ , হে ধনী, হে প্রশংসিত, হে সৃষ্টিকারী, হে ফিরাইয়া দাতা, হে বহু মুহাব্বতকারী, হে সম্মানিত আরশের মালিক, প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণকারী, আপনার হালাল রিযিক হতে আমাকে যথেষ্ট দান করুন এবং হারাম হতে রক্ষা করুন। আমাকে আপনার অনুগ্রহ দ্বারা, যার দ্বারা পবিত্র কুরআনকে হেফাজত করেছেন এবং আমাকে ঐ শক্তি দ্বারা সাহায্য করুন যা দ্বারা রাসূলদেরকে সাহায্য করেছেন, নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোপরি শক্তিধর।

উল্লেখিত আয়াতগুলী যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ করে জুমুআর নামাযের পর ধারাবাহিক পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত ভয়ানক বস্তু হতে হেফাজত করবেন এবং দুশমনদের বিরোধে সাহায্য করবেন, আর তাকে দৌলত দান করবেন এবং এমনভাবে সে রিজিক প্রাপ্ত হবে যা সে ভাবতেও পারে নাই এবং তার জিন্দেগী সুখময় হবে, আর তার ঋণ পরিশোধের রাস্তা খুলবে, চাই সে ঋণ পাহাড় পরিমাণ হোক।

ইসমে আজম

ইবনে আদী, আবদুর রহমান আল কারশী, তারা মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ইবনে মা'রুফ হতে, হাসসান সে নিজের পিতা হতে, তারা সাবেত বানানী হতে,

তারা হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন–আমি আল্লাহর নিকট ইসমে আজম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। সুতরাং আমার নিকট হযরত জিবরাইল আ. মাথায় টিকিয়া–যার অঙ্গ বিশেষ নিয়ে আগমন করেন–তাহল, হে আল্লাহ! আমি তোমার ইসমে আজম শিখে উসিলার মাধ্যমে প্রার্থনা করব, যা গুপ্ত, পাক ও পবিত্রকারী এবং বরকতপূর্ণ, জীবিত চিরঞ্জীব।

হযরত আয়েশা রাযি. আরজ করেন যে, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমাকেও ইসমে আজম শিক্ষা দান করুন। তখন নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যে, নারী, শিশু ও অবুঝ লোকদেরকে ইহা শিক্ষা দেয়া সম্পর্কে আমাকে নিষেধ করেছেন।

প্রসব বেদনায় আমল

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. হতে বর্ণিত যে, হযরত ঈসা আ. হযরত ইয়াহইয়া আ. সহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি ছাগলকে প্রসব বেদনা আক্রান্ত দেখেন। তখন হযরত ঈসা আ. হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে বলেন, আপনি ছাগলের নিকট গিয়ে এ বাক্যগুলী পাঠ করুন–

حنة ولدت يحى ومريم ولدت عيسى الارض تدعوك يا ولد اخرج يا ولد

"হযরত হান্না ইয়াহইয়া আ.-কে প্রসব করেন, মরিয়ম ঈসা আ.-কে প্রসব করেন, হে বাচ্চা! জমিন তোমাকে আহ্বান করতেছে যে, বের হয়ে আস।"

হযরত হাম্মাদ বলেন, মহল্লায় যদি কেউ প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হয় তখন সামান্য সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ বাক্যগুলী পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়। হযরত ঈসা আ.-এর উপর সর্বাগ্রে হযরত ইয়াহইয়া আ. ঈমান গ্রহণ করেন। তারা উভয়ে খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া আ. হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা আকাশে উঠিয়ে নেন।

প্রসব বেদনার ২য় আমল

اللهم انت عدتى فى كربتى وانت صاحبى فى غربتى وانت حفيظى عند شدتى وانت ولى نعمتى۔

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার মসিবতের সময় অঙ্গিকারকারী, অভাবে তুমি আমার বন্ধু, সকল পেরেশানীতে তুমি আমার হেফাজাতকারী, আর তুমি আমার নিয়ামতের মালিক।

সহজ প্রসবের প্রেসক্রিপশন

কোন কোন আরবদের হতে বর্ণিত যে, যদি সমুদ্রের ফেনা প্রসব বেদনায় আক্রান্ত মহিলার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তবে সহজে বাচ্চা প্রসব করবে।

এমনই প্রতিক্রিয়া ডিমের খোসার। যদি ডিমের খোসা হালকা চূর্ণ করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে এ শ্রেণীর মহিলাকে পান করাবে। এ প্রেসক্রিপশন একাধিকবার পরীক্ষা করার পর এ উপকারই প্রমাণিত হয়েছে।

হাদীসে ছাগলের উল্লেখ

মুমিনের উপমা সে ছাগলের মত যে ছাগল খাদ্যের সাথে সুই গিলে ফেলেছে, আর তা তার পাকস্থলিতে বিদ্ধ হয়ে আছে, যার দরুন সে কোন কিছু খেতে পারছে না। যদি আহার করে তবে তা আর হজম হয় না। এও এসেছে যে, মুনাফিকের উপমা সে ছাগলের মত, যে ছাগল দুই পালের মধ্যে ঘূর্ণন করতে থাকে, অর্থাৎ এ দিকে থাকবে না সে দিকে। রাবেদা (رابضه) সে ফেরেশতাকে বলা হয় যে ফেরেশতা হযরত আদম আ.-এর সাথে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং পথভ্রষ্ট লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করত। জাওহারী বলেন, রাবেদা প্রমাণ বহনকারী ফেরেশতা, যাদের দ্বারা পৃথিবী ভরে রাখা হয়েছে।

শরীয়তে ছাগলের হুকুম

সমগ্র উম্মতের নিকট এর গোশত হালাল। যদি কোন ব্যক্তি ছাগলের দ্বারা অসিয়ত করে, তবে সে অসিয়তে ছোট-বড়, সুস্থ-রুগ্ন, দুম্বা সব শ্রেণীর গণ্য হবে। কেননা শা'ত (شاة) শব্দ উল্লেখিত সকল শ্রেণীর উপর প্রয়োগ হয়।

মাসয়ালা

কুরবানী সুন্নত, ওয়াজিব নয়। সুতরাং কুরবানী শুধুমাত্র চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা হবে। দুম্বা কুরবানীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে উপনীত হতে হবে, এর কম বয়সের দুম্বা দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না। (গ্রন্থ প্রণেতা যেহেতু শাফী মাযহাবের সেহেতু তিন শাফী মাযহাব বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় হানাফী মাযহাবে এ ক্ষেত্রে ছাগলের পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী। আর দুম্বা যদি ছয় মাসের হয়ে সপ্তম মাসে উপনীত হয় এবং এ পরমিাণ হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, পূর্ণ এক বছরের মনে হয়, তবে এর দ্বারা কুরবানী বৈধ হবে। কুরবানী সুন্নত এর প্রবক্তা শাফী মাযহাব, হানাফী মাযহাব কুরবানী ওয়াজিব বলেন।) স্বয়ং কুরবানীর পশু প্রত্যেক এমন দোষ হতে মুক্ত হতে হবে যে, যা গোশতের জন্য ক্ষতিকারক।

সুতরাং দুর্বল প্রাণী, কানা, লেংড়া, রুগ্ন, শিং ভাঙ্গা, কান কাটা প্রাণী এবং খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত প্রাণী। অনুরূপভাবে এমন প্রাণীর কুরবানী বৈধ নয় যা জন্মগতভাবে কর্ণহীন। আর যে প্রাণীর কান কাটা সে প্রাণী সম্পর্কে জায়েয না জায়েয উভয় ছুরত বর্ণিত আছে। যেহেতু কানা প্রানীর কুরবানী সহীহ নয়, সেহেতু অন্ধ প্রাণী কুরবানী উত্তম পন্থায় সহীহ হবে না।

সারকথা

ক্ষীণ দৃষ্টির পরিমাণ কম, এক চক্ষু বা উভয় চক্ষুর হক, নিষেধ নাই। অনুরূপভাবে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাণীর কুরবানী সহীহ হবে এবং রাতকানা অর্থাৎ যে প্রাণী রাতে দেখে না বরং দিনে দেখে, এ প্রাণীর ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ প্রাণীর কুরবানী সহীহ হবে।

পাগল প্রাণী যা চারণ ভূমি হতে পশ্চাদ্ধাবন করে ঘাস না খেয়ে এবং দুর্বল হয়ে যায়, এ জাতীয় পশুর কুরবানী নিষিদ্ধ। যে প্রাণীর কান কর্তিত হওয়ার পর শরীর হতে পৃথক হয় নাই বরং সেখানেই লেগে থাকে, তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী এ জাতীয় প্রাণীর কুরবানী জায়েয হবে। কফাল বলেন জায়েয নয়, যদি কান কর্তিত হওয়ার পর শরীর হতে পৃথক হয়, তবে এ ছুরতে যদি কর্তিত অংশ অধিক হয় তবে জায়েয হবে না। আর যদি কর্তিত অংশ পরিমাণে কম হয়, নির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী এ জাতীয় পশুকে কুরবানী করা জায়েয হবে না। কম-বেশির ভিত্তি এ যে, যদি দূর হতে ঘাটতি দৃষ্টিতে পড়ে তবে অধিক, অন্যথায় কম গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি এক-তৃতীয়াংশের কম কাটা হয়, তবে কুরবানী জায়েয। ছোট কান বিশিষ্ট প্রাণীর কুরবানী জায়েয। যে ছাগলের রান হতে বাঘ এক উপযুক্ত পরিমাণ কেটে নিয়ে যায়, এর কুরবানী জায়েয নাই। যে পশুর অন্ডকোষ কেটে নিয়ে যায় সে পশুকে কুরবানী করা জায়েয নাই। সে ছাগলের জন্মগত স্তন অণ্ডকোষ নাই সে ছাগল কুরবানী করা সহীহ সূত্র অনুযায়ী জায়েয। স্তন অণ্ডকোষের অংশ বিশেষ কর্তন, পূর্ণ কর্তনের হুকুম রাখে। অনুরূপভাবে যে পশুর জিহ্বা কর্তন করা হয়েছে তার দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। যে পশুর বংশবিস্তারক অঙ্গ কর্তন করা হয়েছে বা খাসীর কুরবানী নির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী জায়েয। ইবনে কায এ সংক্রান্ত স্বীয় বিবরণ মাযহাব হয়ে নাজায়েযের বক্তব্য পেশ করেন। যে ছাগলের শিং নাই বা শিং ভেঙ্গে গেছে, চাই তা সেরে উঠুক বা না উঠুক, নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী কুরবানী সহীহ হবে। মহামনি লুবাব গ্রন্থে সহীহ না হওয়ার দাবি করেন, যা এইমাত্র আলোচিত হয়েছে। কুফাল বলেন, ভাঙ্গার কষ্টের প্রভাব যদি গোশতের উপর না হয় তবে সহীহ হবে, অন্যথায় খোস-পাঁচড়ার হুকুমে পরিগণিত হবে। শিংহীন ছাগলের পরিবর্তে শিং বিশিষ্ট উত্তম। যদি পশুর কিছু দাঁত পড়ে যায় তা দ্বারা কুরবানী জায়েয।

ফায়েদা

আল্লামা জাওহারী লিখেন যে, উযহিয়ার (اضحية) -এর মধ্যে চারটি লুগাত আছে। (১) اضحية (হামযায় পেশ) (২) اضحية (হামযায় যের) উভয়টি বহুবচনে اضاحى আসে। (৩) ضحية এর বহুবচন ضحايا আসে (৪) ارطاة।

اضحاة -এর ওজনে আসে। এর বহুবচন اضحى , ارطى -এর ওজনে আসে। এরই অনুপাতে কুরবানী ঈদকে ঈদুল আযহা বলে।

মাসয়ালা

কুরবানীর ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। নিয়তকে কুরবানীর পূর্বে করা নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী সহীহ। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি এ ছাগলকে কুরবানীর পশু স্থির করেছি, তাহলে এ নির্ধারণ ও নিয়তের ইচ্ছায় জবাই ব্যতীত যথেষ্ট হবে কি না ? সহীহ উক্তি অনুযায়ী সহীহ হবে না। কেননা পূর্বে উল্লেখিত যে, কুরবানী সুন্নত এবং নৈকট্য। সুতরাং এতে নিয়ত শর্ত। ইমাম গাযযালী রহ.-এর অভিমত যথেষ্ট, তবে নিয়তের নবায়ন মুস্তাহাব।

মাসয়ালা

কুরবানীকারী সে নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব। অপরের হস্তে তুলে দেয়া জায়েয। যে ব্যক্তির জবাই হালাল, কুরবানী সে ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করাও জায়েয। কিন্তু উত্তম হল সে ব্যক্তি মুসলমান হওয়া এবং ফকিহ হওয়া। কেননা যে এর পদ্ধতি ও শর্ত সম্পর্কে জ্ঞাত। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের নায়েব স্থির করা জায়েয। ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট সহীহ নয় এবং এ সুরতে কুরবানী সহীহ হবে না। তবে গোশত হালাল হবে। মওফিক ইবনে ত্বাহের হাম্বলী ও ইমাম আহমাদ রহ. হতে এই বর্ণনা করেন। কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, এক-তৃতীয়াংশ গরিবদের মধ্যে সদকা করবে। কতকের বক্তব্য যে, অর্ধেক নিজের জন্য এবং অর্ধেক গরিবদের মাঝে সদকা করবে। যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত গোশত নিজেই ব্যবহার করে, সদকা না করে তবে সহীহ মাযহাব অনুযায়ী সে এ পরিমাণের জামিন হবে যা যথেষ্ট, অর্থাৎ সর্বনিম্ন এ পরিমাণ যার উপর সদকা প্রয়োগ হয় এবং এক উক্তি হল, জামিন হবে না। আরও এক উক্তি যে, মুস্তাহাব পরিমাণের জামিন হবে, অর্থাৎ অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশের জামিন হবে। কুরবানীর পশুর কোন অংশ বিক্রি করা জায়েয নয় এবং তা হতে কসাইকে এর মজুরি প্রদান করা সহীহ হবে না; বরং কসাইয়ের মজুরি কুরবানীকারীর উপর ওয়াজিব, যেমনিবাবে ফসল কর্তনকারীর মূলী চাষীর জিম্মায়।

মাসয়ালা

সমগ্র উলামায়ে কেরামের নিকট কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশি জমা করে রাখা নিষিদ্ধ। সম্পূর্ণ গোশত ভক্ষণ করতে পাবে কি না এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। (১) ভক্ষণ করতে পারবে। ইবনে যুরাইজ ইবনুল কায, ইবনুল অকিল একে গ্রহণ করেন। যেহেতু কুরবানীকারী অধিকাংশ অংশ ভক্ষণ করতে পারে সেহেতু সে সম্পূর্ণ ভক্ষণ করতে পারে। আর কুরবানীর সওয়াব কুরবানীর নিয়তে রক্ত প্রবাহিত করার দ্বারা হাসিল হবে। যেমন আয়াতে

কারীমায় এর প্রতি ইঙ্গিত করে। হাম্বলীল মোয়াফেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মাযহাবই বর্ণনা করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বক্তব্য এই যে, কুরবানীর গোশত বুঝা যায়, এ পরিমাণ সদকা করা জরুরী।

মাসয়ালা

যদি কেউ বলে, আমি এ ছাগলটি কুরবানীর জন্য নির্ধারিত করেছি অথবা কোন নির্দিষ্ট ছাগলের কুরবানীর মান্নত করে তবে এ ছাগল হতে তার মালিকানা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। এখন এ ছাগলের এ ব্যক্তির কোন বিক্রয়, দান, পরিবর্তন ইত্যাদির কোনরূপ হস্তক্ষেপ চলবে না। যদিও এ হস্তক্ষেপ কোন অংশে হোক। শায়খ আবু আলী আযহাহ হতে বর্ণিত যে তার মালিকানা এ ছাগল হতে দূরীভূত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে একে জবাই করে সদকা না করে। যেমন কোন ব্যক্তি এ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এ গোলামকে আমার আযাদ করা ওয়াজিব, তবে এ গোলাম হতে মুনিবের মালিকানা আযাদ করার পূর্ব পর্যন্ত দূরীভূত হবে না। ইমাম আযম রহ.-এর মাযহাব এই যে, মালিকানা দূরীভূত হবে না, সুতরাং এ পরিবর্তন করা, বিক্রি করা জায়েয হবে।

যদি কোন নির্ধারিত গোলাম আযাদ করার মান্নত করে তবে এর দ্বারা মালিকানা দূরীভূত হবে না এবং ইহা বিক্রয়, দান, পরিবর্তন কোনটাই করা জায়েয হবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এই যে, এ গোলাম বিক্রয় ও পরিবর্তন করা জায়েয, যদি ইহা বিক্রয় করে দেয় তবে তা ফেরত আনা যাবে। আর যদি মূল অবশিষ্ট থাকে এবং বিক্রয়কারী একে বিনষ্ট করে ফেলে অথবা তার নিকট হতে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তবে করজ এবং ক্ষতিপূরণের মধ্যবর্তী সময়ের অনুসরণে সে ব্যক্তি মূল্যের জামিন হবে। দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের কুরবানীর পশু জবাই করে তবে তাদের মধ্যে এক জন মধ্যবর্তী মূল্যের জামিন হবে, অথবা কুরবানী হয়ে যাবে।

মাসয়ালা

মুহামেল বর্ণনা করেন যে, উষ্ট্রের ক্ষেত্রে নহর করতে হবে এবং ছাগল জবাই করবে। সুতরাং যদি উটের ক্ষেত্রে নহরের স্থলে জবাই করে অথবা ছাগলের ক্ষেত্রে জবাইর স্থলে নহর করে তবে সহীহ হবে। সুন্নাত অনুযায়ী নহরের স্থান লুব্ব (لبه) আর জবাই করার স্থান উভয় চোয়ালের একত্রিত হওয়ার স্থান হতে নিচে এবং পরিপূর্ণ জবাই এই যে, হলকমমরী (حلقم مرى) ও অদ্দজয়ন (ودجين) কাটা। জবাই সহীহ হওয়ার নিম্ন কাজ হল হলকম ও গ্রন্থি কাটতে হবে।

মাসয়ালা

যে পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হয়েছে, যদি সে কুরবানীর পশুর পেটে বাচ্চা থাকে তবে ঐ বাচ্চাকেও জবাই করতে হবে। যদি কুরবানীর পশু দুধ দেয় তবে কুরবানীকারী বাচ্চার খাবারের পর অতিরিক্ত দুধ পান করতে পারবে।

উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্য

আরববাসীগণ বলেন– كل شاة معلقة برجلها (প্রত্যেক ছাগল নিজের পায়ের উপর ঝুলে থাকে)। এ প্রবাদ বাক্য সর্বাগ্রে ওয়াকি ইবনে মাসলামা জহির ইবনে আয়াদ ব্যবহার করেন, যিনি জুরহাম-এরপর বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লি ছিলেন মক্কার নিম্ন ভূমিতে তিনি একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং সেখানে হাজুরা নামক একজন বাঁদী রাখেন। এ কারণেই সে ঘরের নামকরণ করা হয়। মক্কার যে হজুরা এবং সে ঐ গৃহের ভিতর একটি সিঁড়ি নির্মাণ করেন। ঐ সিঁড়ির উপর আরোহণ করে স্বীয় প্রভুর নিকট মুনাজাত করতেন এবং অনেক উন্নত মানের বাক্য বলতেন। আরবের আলেমগণ তাকে সত্যবাদিদের মধ্যে গণনা করেন। তার মৃত্যুর সময় সন্তানদেরকে একত্র করে বলেন, তোমরা আমার অসিয়ত শোন, যে ব্যক্তি হেদায়েতের রাস্তায় চলবে তার অনুসরণ কর। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তাকে পরিত্যাগ করবে এবং প্রত্যেক ছাগল নিজের পায়ের উপর লটকিয়ে থাকবে। সুতরাং এ সময় হতে এ উপমা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মের প্রতিদান পাবে এবং কেউ কার বদ আমলের বোঝা গ্রহণ করবে না।

চিকৎসায় ছাগলের উপকারিতা।

ছাগলের তাজা চামড়া নিয়ে যদি এমন ব্যক্তিকে পরানো হয়, যাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে, তবে তার কষ্ট দূর হয়ে প্রশান্তি অনুভব করবে।

৪৬৫. আশ-শামুরক (الشامرك) একপ্রকার মুরগি

যে মুরগি ক'দিন পরেই ডিম দিবে, তাকে শামুরক (شامرك) বলা হয়। ডিম পাড়ার বয়সে উপনীত মুরগি। এর উপনাম আবু ইয়ালাহ।

৪৬৬. আশ-শাহিন (الشاهين) বাজপাখি

এর বহুবচন شياهين ও شواهين। এটা আরবী শব্দ নয়, কিন্তু আরবগণ একে নিজেদের ভাষায় ব্যবহার করেন। সুতরাং জনৈক কবি বলেন–

✪ "কবুতরকে তার দ্রুততা থেকে কেউ বাঁধা দেয় নি; সে বাজপাখি হতে ভীতুও নয় বরং অবিরাম সে উড়ছে।"

অপর এক পংক্তিতে شواهين শব্দও ব্যবহার হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন–

✪ "মানুষ তো দোকান খোলে ব্যবসার জন্যে আর আমি তোমার জন্য খুলেছি ধর্মের দোকান।"

✪ "বাদশাহদের দরবারেও কিছু দোকান খোলা আছে। সেখানে দ্বীনের বদলে গরিবদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ প্রদান করা হয়।"

✪ "তোমার দীন-ধর্ম বাজপাখির মত, যার দ্বারা শিকার করা হয়। অথচ বাজপাখির মালিক সফলকাম হয় না।"

'বা' পরিচ্ছেদে 'বাযি'র আলোচনায় আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর এরূপই কিছু পংক্তি বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের আরেকটি উক্তি হল—

✪ "আমরা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছি। অথচ ইলম আমাদেরকে দুনিয়া বর্জনের পথ প্রদর্শন করেছে।"

শাহীন তিন শ্রেণীর—১. শাহীন, ২. কিতামী, ৩. রায়ক্কী। শাহীন অতি শুষ্ক-ঠাণ্ডা মেযাজের পাখি। এজন্য শাহীনের অবতরণ উপরের দিক হতে নিচের দিকে তীব্র গতিতে হয়।

শাহীন ভীতু হওয়া সত্ত্বেও শিকারির পিছনে শক্তভাবে ছুটে। কখনও এ দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে মাটির সাথে ধাক্কা খেয়ে সে মারা যায়। সকল শিকারী পাখির তুলনায় এর হাড় অত্যন্ত শক্ত। বলা হয়, শাহীন গুণগতভাবে স্ব নামের পরিচায়ক অর্থাৎ 'শাহীন' অর্থ 'পাল্লার ডাণ্ডি'। সুতরাং পাল্লার ডাণ্ডি যেভাবে সামান্য কম-বেশির কারণেও সমান হয় না, তেমনিভাবে শাহীনও সামান্য ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করতে পারে না।

শাহীনের প্রশংসিত গুণ

শাহীনের কিছু উত্তম গুণাবলী হল— ১. বড় মাথা। ২. বড় বড় চক্ষু। ৩. চওড়া বুক। ৪. দেহের মধ্যভাগ প্রশস্ত। ৫. গোশতপূর্ণ উরু। ৬. ছোট পায়ের গোছা। ৭. কম পালক। ৮. ক্ষীণ লেজ।

শাহীনের বাহু শক্ত হলে আর তা কোনরূপ বৃদ্ধি পায় না। এ বয়সে শাহীন বড় পাতিহাঁসও শিকার করে ফেলে।

সর্বপ্রথম বাজপাখি দ্বারা শিকারকারী

কথিত আছে, সর্বপ্রথম রোমের বাদশাহ কুসতুনতুনিয়া বাজপাখি দ্বারা শিকার করেন। তিনি কিছু বাজপাখিকে আশ্চর্য প্রশিক্ষণ দেওয়ান। সুতরাং তিনি যখন সওয়ার হয়ে কোথাও গমন করতেন, তখন ওইসব বাজপাখি তার উপর

ঘূর্ণন করত ও তাকে ছায়া দিত। কখনও নিচে অবতরণ করত আবার কখনও উপরে উঠত। একদিন আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ একটি পাখি মাটি থেকে উপরে উড়তেই তৎক্ষণাত একটি বাজপাখি শিকার করে নিয়ে আসে। বাদশা কুসতুনতুনিয়া এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যবোধ করেন এবং সে-দিন হতেই এদের দ্বারা শিকার শুরু করেন।

শরীয়তে বাজপাখির হুকুম

এর শরয়ী বিধান 'ছোয়াদ' পরিচ্ছেদে 'ছাকার' শিরোনামে আসবে।

আল্লামা দামেরী রহ.-এর একটি ছন্দময় চিঠি

আল্লামা দামেরী রহ. চিঠিখানা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে নিজের ভাই ফারেস উদ্দীন শাহীনকে লিখেছিলেন :

✪ 'সালাম—প্রস্ফুটিত, চকচকে ও দিগন্তে উজ্জ্বল ফুলের মত।'

✪ 'তুমি আমার লিখা পড়ার সময় লোকে বলবে— এ মাটিতে মিশ্‌ক মিশানো হয়েছে।'

✪ 'দ্বীনের অশ্বারোহী, যিনি মিসরের বাদশাদের খেদমতে সফরে ব্যস্ত।'

✪ 'যখন বাদশাহর গোলামদের তালিকা তৈরি করা হবে, তখন মামদুহের উল্লেখ এমন হবে, যেমনি প্রাণীকুলের মধ্যে বাজপাখি।'

✪ 'আমিও তার সাক্ষাতে অধীর আগ্রহী; আমার হৃদয় তার প্রেমে পাগল।'

✪ 'আমার প্রচেষ্টা এ আশায় ব্যয় হচ্ছে, যেন তার সাথে সাক্ষাৎ লাভ হয়। আমি তাই সর্বক্ষণ তার জন্য মাথা উঁচু হওয়ার প্রার্থনা করি।'

✪ 'এবং যেন সর্বকালে তার নিয়ামতরাশি অব্যাহত থাকে।'

✪ 'তিনি আছেন এক সুউচ্চ-মহান মসজিদে, সম্মান যার বিশ্ব জুড়ে।'

যেস্থানে শাহীন থাকে, সেখানে বিচ্ছু পাওয়া যায় না। শাহীনের স্কন্ধ অত্যন্ত সুন্দর এবং তার ডানা পুণ্যময়। সুতরাং যার নিকট এ ডানা রয়েছে সে কল্যাণ হাসিল করেছে। কোন শাহীন বাদশাহগণের হস্তগত হলে এর দ্বারা তারা দীর্ঘকাল শিকার করেন। শাহীনের অনন্য একটি গুণ হল, এটা অনেক উপরে উড়তে পারে এবং নিজের মালিকের অনুগ্রহ ভুলে না। একে পাখিদের মধ্যে উচ্চ বংশধর মনে করা হয়। এটা কয়েক শ্রেণীর হয় এবং তার একটিকে অন্যটির তুলনায় উন্নত মনে করা হয়। তেমনিভাবে আমার মামদূহ তথা প্রশংসিত ব্যক্তিত্বও নিজ এলাকায় উচ্চদৃষ্টিতে বিখ্যাত আর বংশগুণেও অতি মহান। তার কাছ থেকে কোন সওয়ালকারী শূন্য হাতে ফিরে আসে না। আল্লাহ তাআলা তার উপর আপন নেয়ামতরাশি পূর্ণ করে দিন এবং নিজ অনুগ্রহ-দয়ায় তাকে তার জনসাধারণ ও সৃষ্টিজীবের উপর মহানুভবতা প্রদর্শনের উত্তম প্রতিদান দিন!

স্বপ্নে শাহীন দেখার ব্যাখ্যা

এর ব্যাখ্যা ছোয়াদ পরিচ্ছেদে 'ছাকার' শিরোনামে আসবে।

৪৬৭. আশ-শাবাবু (الشبب) বৃদ্ধ গাভী

এভাবে شباب ও شبوب -এর অর্থও 'বৃদ্ধ গাভী'।

৪৬৮. আশ-শাবাছু (الشبث) মাকড়সা

মুহকাম গ্রন্থে লিখা আছে, শাবাছুন একটি প্রাণী বিশেষ। এর লম্বা লম্বা ছয়টি পা রয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশ হলুদ, মাথা কালো আর চক্ষু নীল বর্ণের। কেউ কেউ বলেন, 'শাবছুন' বহু পা বিশিষ্ট জন্তুবিশেষ। এর মাথা বড়, মুখ প্রশস্ত ও পশ্চাৎ অংশ উত্থিত থাকে। মাটি খোঁড়া এদের স্বভাব। এদেরকে شحمة الارض তথা 'মাটির পোকা'ও বলে। এর বহুবচন اشياث ও شيشان আসে। জাওহরী বলেন, شبث ('বা' হরকত বিশিষ্ট) বহু পা বিশিষ্ট একটি প্রাণীর নাম। শব্দটিকে ياء সাকিনের সাথে পড়া বিশুদ্ধ নয়। এর বহুবচন شيثان আসে। যেমন, خرج-এর বহুবচন خربان আসে।

শরীয়তে শাবছুনের হুকুম

এটা ভূমির পোকা-মাকড়ের অন্তর্ভূক্ত বিধায় খাওয়া হারাম।

৪৬৯. আশ-শিবছান (الشبثان) একটি সরীসৃপ

কুতাইবা 'আদাবুল কাতিব' গ্রন্থে লিখেন, শিবছান এক বহু পা বিশিষ্ট প্রাণী। বাস করে বালিতে। এ নামকরণের কারণ হল, শাবছুন অর্থ জড়িয়ে থাকা। আর এ সরীসৃপ প্রাণীটিও মাটি জড়িয়ে বিচরণ করে।

শরীয়তে শিবছানের বিধান

এটাও ভূমির পোকা-মাকড়ের অন্তর্ভূক্ত বিধায় খাওয়া হারাম।

৪৭০. আশ-শিবদি (الشبدع) বিচ্ছু

এর বহুবচন শিবাদি আসে। (শীন ও দাল যেরের সাথে) আবু আমর এবং আসমায়ী এভাবেই লিখেছেন।

হাদীসে শিবদির উল্লেখ

من عض على شبدعه سلم من الاثام —'যে ব্যক্তি নিজের বিচ্ছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারল, সে গোনাহমুক্ত হল।' অর্থাৎ যে ব্যাক্তি নীরব থাকল এবং বাচালদের সাথে বাচালতায় লিপ্ত হল না, সে ব্যক্তি সকল গোনাহ হতে মুক্ত

থাকল। জিহ্বা দ্বারা যেহেতু মানুষ কষ্ট পায়, এজন্য তাকে ক্ষতিকারক বিচ্ছুর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

৪৭১. আশ-শাবারবাছু (الشبربص) ছোট উট

৪৭২. আশ-শাবলু (الشبل) সিংহ শাবক

শিকার ধরার বয়সে উপনীত সিংহ শাবক। এর বহুবচন اشبال এবং شبول আসে।

৪৭৩. আশ-শাবওয়াতু (الشبوة) বিচ্ছু

বহুবচন شبوات আসে। কবি রাজেয বলেন–

قد جعلت شبوة تزبئر + تكسواستها لحما و تقمطر

৪৭৪. আশ-শাবুত (الشبوط) একপ্রকার মাছ

شروط : শব্দটি سفو ওজনে ব্যবহৃত হয়। একপ্রকার মাছ। লাইস বর্ণনা করেন, এক বাচনরীতি سبوط ব্যবহৃত হয়। এর লেজ সরু-চিকন, শরীরের মধ্যভাগ মোটা এবং মাথা ছোট। ধরতে পিচ্ছিল মনে হয়। এ মাছের নর অধিক; মাদী কম। তাই এর ডিম পরিমাণে কম হয়। শিকারীগণ বলেছেন, এ মাছ যখন জালে বন্দি হয় আর বুঝতে পারে, এখান থেকে বের হওয়া দুষ্কর, তখন স্বভাবতই সে অনুভব করে, লাফ দেয়া ছাড়া এ জাল হতে বের হওয়ার আর কোন পথ নাই। কাজেই সে এক বল্লম পরিমাণ পিছনে সরে আসে এবং দেহকে সঙ্কুচিত করে লাফ দেয়। তার এ লাফ সাধারণত উচ্চতায় দশ হাতের অধিক হয়। তার এ লাফের দ্বারা জাল ছিড়ে যায় এবং সে বের হয়ে যায়। এ মাছের গোশত যথেষ্ট পরিমাণ হয়। দজলা নদীতে এটা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪৭৫. আশ-শিজা' (الشجاع) অজগর সাপ

এ শব্দটি শীনে যের-পেশ দুটি সহই ব্যবহৃত হয়। এ সাপটি বনে বাস করে। এটা আরোহী ও পদচারি যেকোন লোকের উপর আক্রমণ করে এবং নিজ লেজের উপর দাঁড়িয়ে যায়। কখনও অশ্বারোহীর মাথার উপরেও পৌঁছে যায়।

মালেক ইবনে আদহামের ঘটনা

কথিত আছে, মালেক ইবনে আদহাম একবার শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। চলতে চলতে তিনি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন, যেখানে ঘাস-পানি ও খাদ্য কিছুই ছিল না। সেখানে গিয়ে তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে গেলেন। তার সাথী-বন্ধুগণ সকলেই পানির সন্ধান করল; কিন্তু পানি পাওয়া গেল না কোথাও। তারা

সেখানে অবস্থান করে মালেকের জন্য একটি তাবু তৈরি করল। মালেক সফরসঙ্গীদেরকে পানি ও শিকার খোঁজার হুকুম দিলেন। তখন তারা বের হয়ে একটি গুইসাপ মেরে নিয়ে এল। মালেক তাদেরকে বললেন, এটা না ভেজে সিদ্ধ করে আনো এবং আহার কর! এতে হয়তো তোমাদের পিপাসা একটু হ্রাস পাবে। তারা তা-ই করল। এরপর আবার তারা শিকারে বের হল। এবার বিরাট এক অজগর সাপ পেল। তারা সেটি ধরার জন্য ধাওয়া করল; কিন্তু অজগরটি প্রাণ নিয়ে পালাল এবং মালেকের তাবুর ভিতরে ঢুকে পড়ল। মালেক সঙ্গীদেরকে বললেন : অজগরটি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এসেছে। তোমরা একে কিছুই বলো না। এ কথা শুনে তারা সাপটিকে বধ করল না। সাপ সেখান হতে বের হয়ে গেল। এরপর মালেক নিজেই সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির সন্ধানে বের হলেন। হঠাৎ তাদের কর্ণে ভেসে এল অজ্ঞাত কে যেন ডেকে বলছে :

✪ "হে লোকসকল! তোমরা কখনও পানি পাবে না, যদিও তোমরা নিজের সওয়ারীগুলীকে সারাদিন পরিশ্রান্ত রাখ।"

✪ "অবশ্য তোমরা ডান দিকে ঘুরে পানি খুঁজলে টিলায় পানির ঝর্ণা পাবে, সেখানে পানি পর্যাপ্ত ও স্বচ্ছ-উৎকৃষ্ট মানের; তা পান করলে রোগ-ব্যাধিও নিরাময় হয়ে যায়।"

✪ "যখন তোমরা সে ঝর্ণা হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, তখন নিজ নিজ সওয়ারীকেও পানি পান করাবে এবং পাত্রগুলো ভরে নিবে।"

এ আওয়াজ শুনে মালেক আপন সঙ্গীদের নিয়ে সেদিকেই চললেন, আহ্বানকারী তার ছন্দে যেদিকটি চিহ্নিত করেছিলেন। সুতরাং নিকটেই একটি ঝর্ণা পেলেন। ব্যাস, সবাই তৃপ্তিসহ পানি পান করলেন, পশুদেরও পান করালেন। এরপর নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে নিলেন। যখন তারা সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করে ফেললেন, তৎক্ষণাত ঝর্ণাটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর পুনরায় কানে ভেসে এল ওই আহ্বানকারীর ডাক। তিনি বলছিলেন:

✪ 'হে মালেক! মহান আল্লাহ আমার পক্ষ হতে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি এখন তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার শেষ সালাম নাও!'

✪ 'কার সাথে সদ্ব্যবহারে কখনও অনাগ্রহী না হওয়া উচিত। কেননা যে ব্যক্তি কাউকেও সদাচরণ হতে বঞ্চিত করবে, সে নিজেই বঞ্চিত হবে।'

✪ 'নেক কাজ চিরঅম্লান, এর ফল যদিও দীর্ঘকাল অদৃশ্য থাকে। আর যে হবে দুরাচারী, সে চিরনিন্দিত—মানুষ তাকে দুষ্টুলোক বলেই জানে।'

হাদীসে অজগর সাপের উল্লেখ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মালের যাকাত আদায় করল না, কিয়ামত দিবসে তা এমন এক অজগর আকৃতি ধারণ করে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে, যার মাথা হবে টেকো এবং তার চোখে থাকবে দুটি ভয়ানক প্রতীক। ধনবান ব্যক্তিরা তখন ভয়ে পলায়ন করবে। এমনকি এ সাপ তার গলায় পেঁচাবে। মুসলিম শরীফের ভাষ্য এরূপ—অজগরটি মুখ খুলে তার পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর অজগরটি যখন ওই ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে চলে আসবে, সে ভয়ে পলায়ন করতে থাকবে। পুনরায় অজগরটি আওয়াজ দিবে, হে তুমি তোমার সেসব সম্পদ নিয়ে যাও, যা তুমি গচ্ছিত রেখেছিলে। এ আওয়াজ শুনে সে ব্যক্তি বুঝতে পারবে, এর হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। সে নিজের হাত সাপের মুখে প্রবেশ করাবে আর সে অজগর তার হাতটি ষাঁড়ের মত চর্বন করবে।

পুনরায় তার উভয় চোয়াল ধরে বলবে, আমিই তোমার সম্পদ! আমিই তোমার সম্পদ! আমিই তোমার ধনভাণ্ডার! এরপর সে তেলাওয়াত করবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত—

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم من فضله هو خيرا لهم ؛ بل هو شر لهم ؛ سيطوقون ما بخلوبه يوم القيامة .

"আল্লাহ তাআলার করুণায় প্রাপ্ত সম্পদে কৃপণ মানুষ ধারণা করে না যে, এ কৃপণতা কি তার জন্য মঙ্গলজনক? অথচ এটা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। কিয়ামত দিবসে সে এ গচ্ছিত সম্পদ দ্বারা গলাবদ্ধ হবে।"

'আকরা' (اقرع) ওই সাপকে বলে, যার মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং বিষের কারণে মাথা সাদা বর্ণের হয়ে গিয়েছে। 'যবিবতান' (زبيبتان) বলা হয় এটির মুখের উভয় পাশের ওই দুটি চুলকে, যা তার অধিক বিষের কারণে হয়। বেশি কথা বলার সময় মানুষের মুখের দু'পাশে এরূপ দুটি লোম দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, زبيبتان দ্বারা এটির চক্ষুর দু'বিন্দু উদ্দেশ্য। এধরনের সাপ থেকে বিপজ্জনক আর কোন সাপ হয় না।

কেউ কেউ বলেন, زبيبتان সাপের মুখে প্রাপ্ত দু'কীলকের নাম। يقضم শব্দটি باب سمع يسمع হতে ব্যবহৃত। অর্থ, দাঁতের পার্শ্ব দিয়ে খাওয়া। এর বিপরীত শব্দ خضم। অর্থ, পূর্ণ মুখে আহার করা। কার কার মতে قضم শব্দটি 'শুষ্ক বস্তু আহার করা' আর خضم শব্দটি 'আর্দ্র বস্তু আহার করা' বুঝাতে ব্যবহার করা হয়।

আরবদের ধারণায় কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকলে তার পাকাশয়ে একটি সাপ জন্ম নেয়। একে شجاع ও صفر বলে। যেমন, আবু খারেশ তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন :

'আহা! তুমি যদি জানতে, আমি নিজের شجاع بطن তথা পেটের ক্ষুধা দমন করি আর তোমার বংশধরকে নিজের খাবার আহার করাই।'

✪ 'আমি যখন দেখি কোন রুচিহারা ব্যক্তির কাছে খাবার রুচিকর মনে হচ্ছে, আমি তাকে নিজের খাবার আহার করতে দিই আর নিজে আহার করা থেকে বিরত থাকি এবং স্বচ্ছ পানি পান করে শয়ন করি।'

অপর এক কবি বলেন :

✪ 'ব্যাস, সে অজগরের মত মাথা নত করেছে; আহা! যদি অজগরের কঠোরতা এবং স্বচ্ছ দন্ত সে দেখত!!'

এ পংক্তিটি হারছ ইবনে কা'ব গোত্রের বাচনরীতি অনুযায়ী। কেননা لصبا শব্দে যের প্রদানকারী লাম থাকা সত্ত্বেও দ্বিবচনের আলিফ বাকি আছে। অথচ প্রসিদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী এ আলিফ বা (ياء) দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু কুফা এবং উক্ত গোত্রের বাচনরীতিতে দ্বিবচনের আলিফ যবরযুক্ত ও যেরযুক্ত অবস্থায়ও বহাল থাকে। এ নিয়মানুসারেই পঠিত হয় আল্লাহ তাআলার বাণী– ان هذان لساحران।

অজগর স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে অজগর সাপ দেখা নির্ভীক ছেলে ও একগুঁয়ে মেয়ের ইঙ্গিত।

৪৭৬. আশ-শাহরুর (الشحرور) সুরেলা পাখি

(চড়ুই হতে বড় কালো রঙের সুরেলা একটি পাখি)। এ শব্দটি عصفور ওজনে ব্যবহৃত হয়। এ পাখি বিভিন্ন স্বরে ডাকে। (এটা ইবনে সাইয়িদার উক্তি।) শায়খ আল্লামা আলাউদ্দীন বাজী (মৃত্যু–৭১৪ হিজরী) এর সম্পর্কে অনেক চমৎকার এক কবিতা আবৃত্তি করেছেন :

✪ 'বুলবুলি, হাজার ও সুরেলা পাখির মনমাহিনী সুরে ব্যথিত-আহত প্রাণ আনন্দিত হয়ে যায়।'

✪ 'সুতরাং দ্রুত উঠ এবং নিয়তির হাত অনুকম্পার যে বারি বর্ষণ করছে, তা লুফে নাও!'

এ পাখির প্রশংসায় আরেক কবি দারুণ বলেছেন :

✪ 'আর সে বাগিচা—যার ডালে ডালে পুষ্প দোলে, পাখিরা সাবলীল এবং যেখানে সিঞ্চনের দায়িত্ব নিয়েছে মেঘমালা।'

✪ 'যেখানে সুরেলা পাখি গাইছে সুমধুর গান, তার সম্পর্কে তো মনে হয় কোকিল বাঁশি বাজায় আর তার বাঁশিটিও মনোহারি।'

অপর কবি তার সম্পর্কে চমৎকার কবিতা বলেছেন :

✪ 'প্রিয়ার গোলাপরাঙা গালে একটি তিলক, যার উপর তার গণ্ডদেশের সৌন্দর্য ঘূর্ণয়মান।'

✪ 'যেমনিভাবে সুরেলা পাখি ভয়ে শিকারীর চোখ থেকে আঙ্গুরের থোকায় লুকিয়ে যায়।'

শরীয়তে শাহরুরের হুকুম

عصفور (চড়ুই)-এর বর্ণনায় আসবে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ হালাল।

স্বপ্নে শাহরুরের ব্যাখ্যা

স্বপ্নে শাহরুর দেখা বাদশাহর মুখপাত্র, নাহুবিদ এবং সাহিত্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ। কখনও এর দ্বারা বুদ্ধিমান-মেধাবী লোক উদ্দেশ্য হয়। কখনও শিশু পাঠশালার প্রতি ইঙ্গিতবহ হয়।

৪৭৭. শাহমাতুল আরদ (شحمة الارض) কেঁচো

এটা একটি কীট বিশেষ, যা মানুষের স্পর্শে শামুকের মত হয়ে যায়। এটা সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়–

১. কাযবীনী 'আল-আশকাল' গ্রন্থে লিখেন : 'শাহমাতুল আরদ' বলে কেঁচোকে। এটা লাল বর্ণের একটি কীট এবং আর্দ্র জায়গায় পাওয়া যায়।

২. জমাখশরী র. 'যবিউল আবরার' গ্রন্থে লিখেন : এটা লাল বিন্দুযুক্ত একটি কীট বিশেষ। দেখতে একে একটি সাদা মাছ মনে হয়। মহিলাদের হাতের তালুর সাথে তুলনা করা হয়।

৩. হরমুজ বলেন : 'শাহমাতুল আরদ' সুগন্ধিময় একটি কীট বিশেষ। আগুন এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আগুনে একদিক দিয়ে প্রবেশ করে, অপর দিক দিয়ে এটা বের হয়ে যায়।

চিকিৎসায় কেঁচোর উপকারিতা

কেউ যদি এটার চর্বি শরীরে মালিশ করে আগুনে প্রবেশ করে, তবে আগুন তাকে জ্বালাতে পারবে না। কেঁচো শুকিয়ে কোন দ্রব্যের সাথে এক দিরহাম পরিমাণ মিশিয়ে প্রসব বেদনায় আক্রান্ত মহিলাকে পান করালে তাৎক্ষণিক বাচ্চা প্রসব করবে। কাযবিনী লিখেন : এটা রান্না করে রুটির সাথে ভক্ষণ করলে মূত্রথলির পাথর চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা শুকিয়ে কোন পাণ্ডু রোগীকে পান করালে তার হলদে বর্ণ শেষ হয়ে যাবে। কেঁচো পোড়া ছাই-ভস্ম তৈলে মিশিয়ে

কার টাক মাথায় মালিশ করলে তার টাক দূর হয়ে চুল গজাবে। এটা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা এবং শরঈ হুকুম কীটের আলোচনায় গত হয়েছে। এটা নোংরা প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় হারাম।

৪৭৮. আশ-শিযা (الشذا) কুকুরের মশা

কখনও شذا শব্দটি একটি উটনী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪৭৯. আশ-শারান (اشران) মশা সাদৃশ্য প্রাণী

মশা সাদৃশ্য এক প্রাণী। এটা মানুষের মুখ ঢেকে ফেলে।

৪৮০. আশ-শারশাক, শাকরাক, শারশুর/ চড়ুই সাদৃশ্য এক পাখি

আশ-শারশাক, শাকরাক, শারশূর (الشرشور - الشرشق - الشقراق) : চড়ুই সাদৃশ্য একটি পাখি। এটার কিছু অংশ মেটে, কিছু অংশ লাল, বাকি নিচের অংশ কালো হয়। এটা ডানা খুললে বিচিত্র রঙের দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যসব চড়ুই পাখির মত এটাও হালাল।

৪৮১. আশ-শারগু (الشرغ) ব্যাঙ

এটার বিশদ ব্যাখ্যা ضاد পরিচ্ছেদে ضفدع শিরোনামে আসবে।

৪৮২. আশ-শারনবী (الشرنبى) এক প্রসিদ্ধ পাখি

৪৮৩. আশ-শাছারু (الشصر) হরিণের শাবক

شاصر শব্দের অর্থও এটাই। যেমনটি আবু উবাইদাহ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৪. আশ-শা'রাউ (الشعراء) নীল/ লাল মশা বিশেষ

الشعراء : এ শব্দে শীনের উপর যবর-যের উভয়টি ব্যবহৃত হতে পারে। নীল বা লাল বর্ণের মশাকে বলে। এটা উট, গাধা, কুকুরের উপর বসে তাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেয়।

হাদীসে নীল/ লাল মশার উল্লেখ

যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে লিখা আছে, মক্কার মুশরিকরা বুধবার দিন উহুদ পাহাড়ে পৌঁছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আসার সংবাদ পেলে পরামর্শের উদ্দেশ্যে সাহাবাগণকে একত্র করেন। উক্ত পরামর্শ সভায় তিনি (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকেও ডাকেন। অথচ ইতোপূর্বে কখনও তাকে পরামর্শ সভায় ডাকে নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথেও প্রতিরোধ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা.!

আপনি মদীনায় অবস্থান করেই প্রতিরোধ করুন; বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবেন না। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, যখন কোন শত্রু সৈন্য মদীনায় চড়াও হয়েছে, তখন আমরা মদীনায় অবস্থান করেই তাদের প্রতিরোধ করেছি। আর জয় হয়েছে মদীনাবাসীরই। আর যখন কখনও আমরা বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছি, তখন ফল হয়েছে বিপরীত। আর এখন যেহেতু আপনি আমাদের সাথে আছেন, সেহেতু আমাদের পাল্লা আরও অনেক ভারি থাকবে। সুতরাং আপনি ওই মুশরিকদের ভয় করবেন না। তারা অবস্থান করলে আপনার জন্য ক্ষতিকর। তারা আমাদের উপর চড়াও হলে পুরুষ মুখোমুখী লড়াই করবে। মহিলা ও শিশুরা উপর থেকে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। এতে তারা পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর অনায়াসে আমরা সফল হব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মতটিকেই পছন্দ করলেন। কোন কোন সাহাবী রাযি. এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আরজ করলেন : ওহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে এসব কুকুরের প্রতিরোধে বাইরে নিয়ে চলুন। যেন তাদের এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, আমরা তাদের মোকাবেলায় অক্ষম ও দুর্বল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি, গাভী জবাই করা হচ্ছে। আমি এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি 'মঙ্গল'। তারপর আমি দেখেছি, আমার তরবারির তেজ বিনষ্ট। এর ব্যাখ্যা আমি 'পরাজয়' ধরেছি। এরপর আমি আমার হাতকে ক্ষুদ্র বস্তুতে প্রবেশ করিয়েছি। এর ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করেছি 'মদীনা'। এখন যদি তোমাদের অভিপ্রায় মদীনায় থাকা হয়, আমি তাহলে এখানেই থাকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশা ছিল, মুশরিকরা মদীনায় প্রবেশ করুক আর তাদের সাথে গলিতেই মোকাবেলা হোক।

কিন্তু যেসব সাহাবী বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নাই আর আল্লাহ তাআলা উহুদ যুদ্ধে তাঁদেরকে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করিয়ে সম্মানিত করতে চান, তারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদেরকে আল্লাহর ওই দুশমনদের মোকাবেলা করার জন্য বাইরে নিয়ে চলুন।

এটা শুনে তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন এবং হাতিয়ার নিয়ে বের হন। সাহাবা রাযি. তা দেখে লজ্জিত হলেন এবং পরস্পরে বলাবলি শুরু করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর তো প্রত্যাদেশ এসেছে আর আমরা কি-না তাঁর মর্জির বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছি! কাজটি আমাদের ভাল হয় নাই। সুতরাং তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অপারগতা স্বীকার করেন এবং দরখাস্ত করেন—আপনার যা মর্জি হয়, তা-ই করুন। তিনি বললেন : যখন আল্লাহর নবী হাতিয়ার নিয়েছেন, তখন তাঁর জন্য যুদ্ধ ব্যতিরেকে হাতিয়ার তুলে রাখা শোভনীয় নয়।

মক্কার মুশরিকরা বুধ ও বৃহস্পতিবার উহুদ প্রান্তরে অবস্থান করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন জুমার নামাযের পর তাদের মুকাবেলা করার লক্ষ্যে রওয়ানা করেন এবং শনিবার সকাল বেলায় উহুদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন। এটা ৩হিজরী ১৫ই শাবান অনুষ্ঠিত হয়। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল ৭০০জন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-কে (অর্থাৎ খাওয়াত ইবনে যুবাইরের ভাই) পঞ্চাশজন তীরন্দাজের আমীর নিযুক্ত করেন এবং পাহাড়ে অবিচল থাকার নির্দেশ প্রদান করে বলেন : যখন শত্রুপক্ষ আমাদের পশ্চাৎ দিয়ে আক্রমণ করবে, তখন তোমরা তীর দ্বারা তাদের প্রতিহত করবে। আমাদের জয় হোক বা পরাজয়; বিনা অনুমতিতে তোমরা স্বস্থান ত্যাগ করবে না।

এরপর কুরাইশরা সম্মুখে অগ্রসর হয়। তাদের ডান পার্শ্বে ছিল খালেদ ইবনে ওয়ালিদ আর বাম পার্শ্বে ইকরামা ইবনে আবু জাহল। (তখনো তাঁরা ইসলামে দাখিল হন নি; পরবর্তীসময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।) তাদের সঙ্গে মহিলারাও ছিল, যারা ঢোল বাজিয়ে গাচ্ছিল। যুদ্ধ শুরু হল এবং ঘোরতর লড়াই হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি হাতে তুলে নিলেন। বললেন : কে এ তরবারি নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করবে?

এটা শুনে হযরত আবু দাজানা সামাক ইবনে খুরশিদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাত থেকে তরবারিখানা লুফে নিলেন। মাথায় বাঁধলেন একটি লাল পাগড়ি। বীর দর্পে এগিয়ে গেলেন তরবারি হাতে। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও এরূপ হাঁটাচলা আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দ নয়।' এ তরবারি দ্বারা আবু দাজানা রাযি. কত কত নাফরমানের শিরোচ্ছেদ করেছেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পর্যদস্ত করে দেন। কাফেরদের এ পরাজয় দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন তীরন্দাযগণ গনীমত গনীমত বলে ডাকতে লাগল এবং বলতে লাগল, আমরাও তাদের সাথে গনীমতের মাল কুড়াব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. অনেক বার তাদেরকে নিষেধ করলেন; কিন্তু তারা তাঁর নিষেধ মানল না। ছুটে গেল গনীমতের মাল কুড়াতে। শুধু দশজন সঙ্গী তার সাথে রইলেন। আর বাকিরা সবাই চলে গেলেন। হযরত খালেদ রাযি. যখন দেখলেন, এদিকে মাঠ খালি আর তীরন্দাযগণ ব্যস্ত গনীমতের মাল সংগ্রহে, তখন তিনি তার আরোহী যোদ্ধাদেরকে ফিরিয়ে এনে সে পথে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেন, যেখানে তীরন্দাযগণ সর্বাবস্থায় অবস্থান করতে আদিষ্ট হয়েছিল। অবশেষে তিনি তাদেরকে পরাভূত করেন।

(এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি.-সহ দশজন তীরন্দাজ শহীদ হন।) আব্দুল্লাহ ইবনে কুমিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তাঁর সম্মুখের দাঁত মোবারক শহীদ হয়। পবিত্র নাক-মুখ রক্তে রঞ্জিত হয়। জখমের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। পড়ে যান পার্শ্ববর্তী এক গর্তে। তাঁর সাহাবাগণ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। (কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাহাবী তাঁর নিকটেই ছিলেন)। তিনি একটি পাথরের সাহায্যে ওই গর্ত হতে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু তখনো তিনি দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। বিধায় এর ভারের কারণে তিনি গর্ত থেকে বের হতে পারছিলেন না। তাই হযরত তালহা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিচে বসে গেলেন। তার সাহায্যে তিনি উপরে উঠে আসেন। হিন্দা এবং আরও ক'জন মহিলা মিলে শহীদের নাক-কান কর্তন শুরু করে। হিন্দা ওই কর্তিত অঙ্গসমূহ দ্বারা একটি মালা বানিয়ে হামযাহ রাযি.-এর শহীদকারী ওয়াহশীকে প্রদান করে আর হযরত হামযাহ রাযি.-এর কলিজা ছিড়ে চর্বন করতে থাকে। কিন্তু গিলতে না পেরে বাইরে ফেলে দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে কুমিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাধারী হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর রাযি. তাকে প্রতিহত করেন। কিন্তু কুমিয়া মুসয়াব রাযি-কে শহীদ করে দেয়। ইবনে কুমিয়ার ধারণা ছিল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করেছে। অতএব সে নিজের সৈন্যদলে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের ঘোষণা করে। এরপর এক ঘোষক (বস্তুত শয়তান) চিৎকার করে বলতে থাকে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (নাঊযুবিল্লাহ) শহীদ করা হয়েছে। এগুজব শুনে কিছু মুসলমান পশ্চাদ্ধাবন করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। এ আহ্বানে ত্রিশজন সাহাবী এসে তাঁর পাশে উপস্থিত হয় এবং কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে প্রতিহত করেন।

হযরত তালহা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। তাঁর হাত আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ রাযি-এর চক্ষু বের হয়ে তাঁর গণ্ডদেশে এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হস্ত মোবারক দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে স্বস্থানে বসিয়ে দেন। এতে তাঁর সে চক্ষুটি পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তিমান হয়ে উঠে। (কুরাইশ কাফেরদের অন্যতম নেতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদ্বেষী) উবাই ইবনে খালফ হাযমী রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসে বলতে লাগল– আজ যদি মুহাম্মাদ আমার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায়, তাহলে আমি বাঁচব না। সাহাবায়ে কেরাম চাচ্ছিলেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার পূর্বেই তাকে এ ধরা হতে বিদায় করে দিবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে আমার কাছে আসতে দাও। ইতোপূর্বে যখনই তাঁর সঙ্গে উবাই ইব্ন খালফের সাক্ষাৎ হত, সে বলত— 'আমি একটি ঘোড়া পালন করছি। তার উপর সওয়ার হয়ে আমি আপনাকে হত্যা করব'। প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব। সুতরাং সে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারছ ইবনে আলকামাহ হতে একটি বল্লম নিয়ে উবাই ইবনে খালফের উপর ছুঁড়ে মারেন। এ আক্রমণের মুহূর্তে আমরা সাহাবাগণ তাঁর থেকে দূরে ছিলাম। যেমনি লাল মশা উটের পিঠ হতে দূরে অবস্থান করে। তিনি তাকে সাধারণ একটি আঘাত করলেন। এতে সে নিজের ঘোড়া হতে পড়ে গেল এবং ষাঁড়ের মত গর্জন করে 'মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে' বলতে বলতে কাফির সৈন্যদলের দিকে ছুটল। লোকজন তাকে দেখে বলল, আরে! তোমার এ আঘাত তো সাধারণ। সে বলল, তোমরা জান কী বলছ!? এ আঘাত রবিয়া ও মুজারের হলে নিশ্চয় আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলতাম। কিন্তু এ আঘাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের। তোমাদের কি জানা নাই, আমাকে তিনি বলেছিলেন—'আমি তোমাকে হত্যা করব'। আল্লাহর শপথ! এ কথার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবু আমি মৃত্যুবরণ করতাম। এরপর একদিন গত হতেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ শত্রু জাহান্নামে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে হযরত হাসান রাযি. তার সম্পর্কেই নিম্নোক্ত ছন্দ আবৃত্তি করেন :

لقد ورث الضلالة عن ابيه * ابى حين بارزه الرسول

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে খালফের সাথে যুদ্ধ করেন, নিশ্চয় উবাই পথভ্রষ্টতা পেয়েছিল নিজ পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে।"

اتيت اليه تحمل رمح عظم * وتوعده وانت به جهول

"তুমি তাঁর নিকট এসেছ স্বদেহে পঁচা হাক নিয়ে, তখন তাঁকে ধমক দিচ্ছিলে আর নিজের পরিণতি সম্পর্কে ছিলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কিয়ামত দিবসে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হবে সে ব্যক্তির, যেকোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন।

কেননা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, নবী কাউকেই হত্যা করেন না। আর এমনটি সৃষ্টকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ ব্যক্তির বেলায়ই ঘটে।

৪৮৫. আশ-শাগওয়া (الشغواء) ঈগল পাখি

عقاب : এ শব্দে শীনে যবর, গাইন সাকিন আর আলিফ মদসহ পঠিত হয়। অর্থ, ঈগল পাখি। এ নামকরণের কারণ হল, شغاء يشغوا অর্থ— এক দাঁত অপর দাঁত অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং شغوا অর্থ হল— ছোট-বড় দাঁতবিশিষ্ট। আর ঈগল পাখির উপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁট থেকে বড় হয়। এজন্য একে شغوا বলা হয়। জনৈক কবি বলেন–

شغواء بوطن بين الشيق والنيق

"সেসব লোক নিজ আবাসভূমি পাহাড়ের চূড়ায় বিজয় লাভ করেছে।"

৪৮৬. আশ-শিফদা' (الشفداع) ব্যাঙ

এটা ইবনে সাইয়িদাহ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৭. আশ-শিফনীন (الشفنين) বন্য কবুতর

আশ-শিফনীন (الشفنين/ দুটি হালাল পাখির বংশধর) : এটা يشنين শব্দের ওজনে শীনের উপর যেরে সাথে পঠিত হয়।

কথিত আছে, দুটি হালাল পাখির প্রজননক্রিয়ায় সৃষ্ট একটি হালাল পাখি আছে। জাহেয বলেন : এটা কবুতরের এক শ্রেণীবিশেষ। কেউ কেউ বলেন, শিফনাইন হল বন্য কবুতর। এর স্বর সারিন্দার মত মোহনীয় ও বিষাদময়। এর বহুবচন شفنين আসে। অন্ধকারে এর ডাক বেশি মোহনীয় শোনায়। এর বিশেষ অভ্যাস হল, কখনও এর স্ত্রী নিখোঁজ হলে বা মারা গেলে আমৃত্যু সে নিঃসঙ্গ থাকে। অন্য কার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করে না। একই অবস্থা হয় এর স্ত্রীরও। এটা কখনও অধিক মোটা হয়ে গেলে তার পালক পড়ে যায় ও সঙ্গম করা ছেড়ে দেয়। এরা অত্যন্ত নির্জনতাপ্রিয় এবং শত্রুদের থেকে খুবই সতর্ক।

শরীয়তে শিফনীনের হুকুম

সর্বসম্মতিক্রমে এটা খাওয়া হালাল।

চিকিৎসায় শিফনীন

এর গোশত গরম ও শুষ্ক হয়। এজন্য এর ছোট বাচ্চা ব্যবহার করা উচিত। এর দ্বারা সৃষ্ট শরীরের রক্তও শুষ্ক-গরম হয়। অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে ঘি মিশিয়ে ব্যবহার করলে তার উত্তাপ ও শুষ্কতা বেশ হ্রাস পায়। যয়তুনের তৈলের সাথে তার ডিম ব্যবহার করলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। এর পায়খানা গোলাপজলে মিশিয়ে নারীগণ ব্যবহার করলে তার গর্ভাশয়ের ব্যথার জন্য উপকার হবে। চোখের পানি পড়া এবং ফোলার জন্য যদি এর গরম রক্ত ড্রপ হিসেবে দেয়া হয়, তাহলে অশেষ উপকার সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যদি এর ডিমের সাদা অংশ এবং গোলাপজলে তুলা ভিজিয়ে চোখের উপর রাখা হয়, তবে চক্ষুউঠা বা চোখের পানি পড়া এবং ফোলা রোগ ভাল হয়। এ অত্যন্ত পরীক্ষিত চিকিৎসা।

৪৮৮. আশ-শাক (الشاق) মানুষ সদৃশ

কাযবিনী বলেন : 'শাক' শয়তান জাতি। এর দেহের উপরিঅংশ মানুষ সদৃশ। কার কার ধারণামতে 'নাছনাছ' (نسناس) তথা বনমানুষ বস্তুত মানব ও শাক দুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি। এটা বন সফরে মানুষের সামনে হঠাৎ দেখা দেয়। কথিত আছে, আলাকা ইবনে ছফওয়ান ইবনে উমাইয়া এক রাতে বাইরে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানে পৌছেন। তখন তার 'শাক'-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। আলাকা বলেন : হে শাক! তোমার-আমার শত্রুতা কী? (আমাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই।) সুতরাং তুমি আমার থেকে মুখ লুকাও এবং নিজের তীর তুনীরে রাখ। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যে তোমায় হত্যা করতে ইচ্ছুক নয়? শাক উত্তরে বলল : আরে! আসনা, একটু হাতাহাতিই হয়ে যাক। আচ্ছা! তোমার মধ্যে উত্তেজনা না আসা পর্যন্ত আমি দাঁড়ালাম। কোনক্রমেই শাক মানল না, তখন আলকাও তৈরি হলেন। তারপর পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন। অবশেষে 'শাক' মরে লুটিয়ে পড়ল।

আরবের প্রসিদ্ধ দুই গণক

শাক ও ছাতিহ নামে আরবের দুই বিশ্বখ্যাত গণক ছিল। 'শাক' ছিল অর্ধমানুষ। তার হাত, পা ও চোখ ছিল একটি একটি। অন্যদিকে ছাতিহের দেহে কোন হাড় ও আঙুল ছিল না। সে হুবহু বিছানো চাটাইয়ের মতই মাটিতে শুয়ে থাকত। শাক ও ছাতিহের জন্ম হয় সে-দিন, যে-দিন আমর ইবনে আমেরের গণক স্ত্রী তরিফার মৃত্যু হয়। গণক তরিফা নিজের মৃত্যুর দিন মৃত্যুর পূর্বে নবজাতক ছাতিহকে ডেকে পাঠায়। তাকে তার সামনে উপস্থিত করা হলে সে নিজ মুখের লালা ওই নবজাতকের মুখে ঢেলে দেয় আর বলে, এ শিশু জ্যোতির্বিদ্যায় আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ছাতিহের চেহারা ছিল তার বক্ষদেশে। তার ঘার এবং মাথা ছিল না। এরপর ওই মহিলা 'শাক'কেও ডেকে পাঠায়। তার সঙ্গেও ছাতিহের সাথে কৃত আচরণ করে। এরপর সে মারা যায়। তাকে দাফন করা হয় হাজফা নামক স্থানে। হাফেয আবুল ফারজ ইবনে জাওযী লিখেন : খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ফাহরী এ শাকেরই এক সন্তান ছিলেন।

ইয়ামানের বাদশাহর দুঃস্বপ্ন এবং শেষ নবীর পূর্বাবাস

'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত—ইয়ামানের বাদশা মালেক ইবনে নসর লখমী একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য তার প্রজাদের মধ্যে যত জাদুকর ও জ্যোতির্বিদ ছিল, সকলকে তলব করেন। তারা সকলেই একত্র হলে বাদশাহ বললেন, আমি একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। তার প্রতিক্রিয়া এখনও আমার উপরে রয়েছে। তারা বলল, আপনি আমাদের নিকট স্বপ্নটি খুলে বলুন! তাহলে আপনাকে তার ব্যাখ্যা আমরা বলতে পারব।

বাদশাহ বললেন, যদি আমি নিজেই তোমাদের সামনে স্বপ্নটি বর্ণনা করি, তবে তোমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় আমি পরিতৃপ্তি লাভ করব না। আমি শুধু সে ব্যক্তির ব্যাখ্যা দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করব, যে ব্যক্তি আমার বলার পূর্বে নিজেই স্বপ্নটি ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করবে। এ কথা শুনে তারা সবাই পরস্পরে পরামর্শ করল। বলল– বাদশাহ হ যে প্রশান্তি চাচ্ছেন তা শাক-ছাতিহ ব্যতীত আর কেউই বলতে পারবে না। সুতরাং বাদশাহ তাদেরকে ডাকতে একজন দূত প্রেরণ করলেন। অনন্তর তারা এসে উপস্থিত হলে বাদশাহ প্রথমেই ছাতিহকে স্বপ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। সে উত্তর দিল– জাঁহাপনা! আপনি স্বপ্নে একটি খুপরি বা মস্তকের উপরিভাগ দেখেছেন। সেটি অন্ধকারে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং অন্য সব খুপরিকে খেয়ে ফেলেছে। বাদশাহ এটা শুনে বললেন, তুমি একদম সত্য বলেছ। এখন তুমি এর ব্যাখ্যা দাও! ছাতিহ বলল : ওই দু'হাররা তথা কৃষ্ণপাথুরে ভূমিতে বিচরণকরী প্রাণীদের শপথ করে বলছি, আপনার রাষ্ট্রে হাবশীদের আগমন ঘটবে। তারা 'আবীন' এবং 'জারশ'-এর মধ্যবর্তী সমুদয় ভূমির মালিক হবে। বাদশাহ এটা শুনে বললেন : ছাতিহ! এ তো তুমি নেহাৎ মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক ব্যাখ্যা দিলে। আচ্ছা! বলত, এ ঘটনা কবে নাগাদ ঘটবে? আমার রাজত্বকালে, না-কি পরবর্তীকালে। সে উত্তরে বলল, আপনার ষাট-সত্তর বৎসর পরে এ ঘটনা ঘটবে। তারপর হাবশীদের সাথে যুদ্ধ হবে। তারা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হবে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন : তাদেরকে কে বিতাড়িত করবে? উত্তরে ছাহিত বলল, ইবনে যী ইয়াযন আদন তাদের বিতাড়িত করবেন। তাদের কাউকেই তিনি ইয়ামানে রাখবেন না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা

করলেন : ইবনে যী ইয়াযনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, না-কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে? শেষ হয়ে গেলে তা কে শেষ করবে? গণক প্রত্যুত্তরে বলল, একজন নবী—যার উপর তাঁর এবং বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রত্যাদেশ আসবে—তিনি তাদের ধ্বংস করবেন। বাদশাহ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এ নবী কোন্ সম্প্রদায় হতে হবেন? ছাতিহ বলল, এ নবী হবেন গালেব ইবনে ফহর ইবনে মালেক ইবনে নসরের বংশধর। আর অবশেষে এ বংশের শাসনই বহাল থাকবে। বাদশাহ বললেন, তাঁর যুগ কি কখনও শেষ হবে না? জবাবে ছাতিহ বলল, হ্যাঁ! নিশ্চয় শেষ হবে। সেদিন পূর্বাপর সর্বযুগের সবাইকে সমবেত করা হবে। সৎকর্মশীলগণ হবে আনন্দিত আর পাপাচারীরা দুরাবস্থায় নিপতিত।

পুনরায় বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, ছাতিহ! এতক্ষণ তুমি যা কিছু বললে সবই কি সত্য? ছাতিহ প্রত্যুত্তরে বলল, 'শাফক' (شفق), 'গাছক' (غسق) এবং পূর্ণিমা চাঁদের শপথ! যা কিছু আমি বলেছি, সম্পূর্ণই সত্য। এরপর তিনি 'শাক'কে ডাকেন এবং তার কাছেও একই প্রশ্ন করেন। সুতরাং শাক বাদশাকে বলল– আপনি একটি খুপড়ি/ মস্তকের উপরিভাগ দেখেছেন। এটা অন্ধকার থেকে উদ্ভাসিত হয়ে বাগান ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যেক প্রাণীকে খেয়ে ফেলেছে। বাদশাহ যখন শাক-এর কথা শুনে বললেন, তুমি সম্পূর্ণ সত্য বলেছ। এখন তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। 'শাক' বলল, ওই পাহাড়ে বাসকারী লোকদের শপথ! আপনার দেশে একসময় হাবশীরা আসবে। তারা সকলের উপর জয় লাভ করবে। আবীন হতে বাখরান পর্যন্ত চলবে তাদের রাজত্ব। বাদশা বললেন, আমার পিতা তোমার উপর উৎসর্গিত হোক হে শাক! এ তো ভয়ানক এক সংবাদ!! এটা কখনও ঘটবে? আমার যুগে, না-কি আমার পরবর্তী যুগে? শাক বলল, আপনার পর নির্দিষ্ট একসময়ে এ ঘটনা ঘটবে। এরপর তাদের মধ্য হতেই একজন মহান ব্যক্তি আপনাদেরকে মুক্তি দিবেন আর হাবশীদেরকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, ওই মহান ব্যক্তি কে হবেন? শাক বলল, ইয়ামানের এক ক্রীতদাস। সে ইবনে যবী ইয়াযনের গৃহ হতে বের হবে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন– তার বাদশাহী কি অব্যাহত থাকবে, না শেষ হয়ে যাবে? উত্তরে শাক বলল, হ্যাঁ, সমাপ্তি ঘটবে। আর তা শেষ করবেন সর্বশেষ নবী। তিনি ধর্ম ও প্রাচুর্যের মধ্যে ন্যায়বিচার ও সত্য নিয়ে আগমন করবেন। তাঁর উম্মতের মধ্যে রাজত্ব কায়িম থাকবে।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, يوم فصل —বিচ্ছেদ দিবস কী? উত্তরে শাক বলল, এটা সেই দিন, যেদিন লোকদের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং আকাশ হতে আহ্বান করা হবে। সে আহ্বান জীবিত ও মৃত সকলেই শোনবে। সেদিন সমগ্র

মানুষকে একত্র করা হবে। সৎকর্মশীলগণ মঙ্গলের দ্বারা সফলতা অর্জন করবে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কথা কি সত্য? শাক বলল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অধঃ ও উচ্চতার শপথ! যে সংবাদ আমি প্রদান করেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে কোনরূপ সংশয়- সন্দেহের অবকাশ নেই। বাদশাহ এ দুই জ্যোতির্বিদের পূর্বাভাষে অভিন্নতা লক্ষ্য করলেন। এতে তাদের প্রদত্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল। হাবশীদের ভয়ে তিনি নিজের গৃহ বহীরা নামক স্থানে স্থানান্তর করেন।

রাসূল সা.-এর শুভজন্মে কেসরার প্রাসাদে কম্পন

'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্ম হয় সে রজনীতে পারস্য বাদশাহর মহলে কম্পন সৃষ্টি হয়। ফলে তার মহলের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসে পড়ে। সে-সময় পারস্যের রাষ্ট্রনায়ক কেসরা নওশেরওয়া ন্যায়বিচারক ছিলেন। এ ঘটনায় তার উপর ভীতি সঞ্চার হয়। তিনি একে অশুভ বলে মন্তব্য করেন। তাই তিনি তার রাষ্ট্রের সকল সভাসদকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা সমীচীন মনে করেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী, কাজী, আমীর-উমারা প্রমুখকে একত্র করে প্রাসাদের কম্পন ও তার গম্বুজ ধসে পড়ার সংবাদ দেন। এটা শ্রবণ করে রঈছ মুযীবান বলেন : আমিও স্বপ্নে দেখেছি, একটি উট ঘোড়াদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং দজলা নদী অতিক্রম করে পারস্যে বিস্তার করেছে। উপস্থিত সভাসদস্যগণ জানালেন, এক হাজার বৎসর পূর্ব হতে প্রজ্বলিত রাখা পারস্যের সেই অগ্নিকুণ্ড আজ রজনীতে মুহূর্তেই নির্বাপিত হয়ে গেছে। এসব ঘটনা শুনে সম্রাট নওশেরওয়াসহ উপস্থিত সভাসদবৃন্দ আতংকিত হয়ে পড়েন। এসব ঘটনার উপযুক্ত কোন কারণ তারা নির্ণয় করতে পারল না। সকলেই পেরেশান হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। এদিকে রাষ্ট্রের প্রত্যেক এলাকা থেকে অদ্য রজনীতে অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার সংবাদ নওশেরওয়ার নিকট আসতে লাগল। আরও সংবাদ এল, এ রাতেই সাদা ছোট সমুদ্রের পানি শুকিয়ে গিয়েছে। সুতরাং নওশেরওয়া তাদের ধর্মযাজকদের একত্র করলেন। উক্ত ঘটনা অবগত করান তাদের। সুতরাং রঈছ মুযীবান বললেন : আমার ধারণামতে আরবের কোথাও কোন বড় ধরনের নতুন ঘটনা ঘটেছে।

সুতরাং নওশেরওয়া নোমান ইবনে মুনযিরকে একটি চিঠি লিখলেন— 'আরবের অবস্থা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত ব্যক্তিকে শীঘ্রই আমার নিকট প্রেরণ করবে!' নুমান তখন আবদুল মসিহ ইবনে আমর গাস্সানীকে তার নিকট প্রেরণ করেন। লোকটি অনেক বয়স্ক ছিল। সে কেসরার নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে বললেন : আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তা ঠিক জানতো? প্রবীণ লোকটি বলল– আপনি কী জানতে চান, বলুন। সে-সম্পর্কে আমার জানা

থাকলে আমি নিশ্চয় বলব। কেসরা বললেন– আমি এমন ব্যক্তিরই সন্ধান করছি, যে আমার বলার পূর্বেই বলে দিবে আমি কী জানতে চাই। আব্দুল মসিহ বলল, এ জ্ঞান তো আমার মামা ছাতিহ অর্জন করেছেন। তিনি শাম দেশের পূর্বাচলে বাস করেন। নওশেরওয়া বললেন : বেশ! তোমার মামাকে গিয়েই জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং আবদুল মসিহ শাম দেশে রওয়ানা হল। কিন্তু মসিহ শাম দেশে পৌঁছে দেখতে পেলেন, ছাতিহ অন্তিম শয্যায় শায়িত। আব্দুল মসিহ তাকে সালাম প্রদান করেন; কিন্তু সে উত্তর দিতে পারল না। এবার আব্দুল মসিহ তাকে উচ্চঃস্বরে ডেকে বলল:

اصم ام يسمع غطريف اليمن * يا حاجب الخطة اعيت من ومن

"হে ইয়ামানের নেতা! তুমি কি বয়রা হয়ে গেলে, না-কি শোনছ? হে গুপ্তভেদ প্রকাশক! তুমি কি জান, আমি কে এবং কোত্থেকে এসেছি?'

এ কথা শ্রবণ করে ছাতিহ চোখ খুলল। বলল, তুমি আবদুল মসিহ। তুমি এমন এক উটনির উপর সওয়ার হয়ে এসেছ, যার উরুতে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ছাতিহের নিকট তুমি এমন এক সময়ে এলে, যখন তার পা কবরে ঝুলছে। তোমাকে পারস্য সম্রাট কেসরা প্রেরণ করেছেন। যাতে তুমি কেসরার রাজপ্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি এবং ন্যায়বিচারক নওশেরওয়ার স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে যাও। তার স্বপ্নটি হল, একটি শক্তিশালী উট আরবী অশ্বরাজি তাড়িয়ে নিচ্ছিল আর সেটি দজলা নদী পাড়ি দিয়ে পারস্য দেশে গিয়ে পৌঁছে। হে আবদুল মসীহ! যখন কালামে পাক তেলাওয়াত প্রকাশ পাবে, صاحب هراوه (নবীজীর গুণবাচক নাম) প্রেরিত হবেন এবং সাদা ক্ষুদ্র সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যাবে, তখন 'ব্যাবিলন' আর পারস্যের বাসিন্দাদের আশ্রয়স্থল থাকবে না; কিন্তু শাম/সিরিয়া ছাতিহের জন্য কল্যাণকর থাকবে। কেসরার রাজপ্রাসাদের যতটি গম্বুজ ধসে পড়েছিল, ততজন সম্রাট পারস্য শাসন করবে এবং যা কিছু হওয়ার তা হবেই।

এ ব্যাখ্যা বর্ণনা করার পর ছাতিহ তার প্রাণ স্রষ্টাকে সমর্পণ করল। আব্দুল মসিহ উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে কেসরার নিকট প্রত্যাবর্তন করল। আর যা কিছু সাতীহ বর্ণনা করেছে, সবই কেসরাকে শোনাল। তা শুনে কেসরা বললেন : এখনও চৌদ্দজন বাদশাহ রাজত্ব করার জন্য অবশিষ্ট রয়েছেন। এ সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল প্রয়োজন হবে। জানা নাই সে-সময় পর্যন্ত কি কি আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রকাশিত হবে। কিন্তু বাদশাহদের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে প্রকাশ পেল যে, পারস্যের দশজন বাদশাহ তাদের মেয়াদ চার বছরেই পূর্ণ করে ফেলে। আর বাকি চারজন হযরত উসমান রাযি.-এর রাজত্বের শেষ অবধি খতম হয়ে গেল।

এ ভবিষ্যদ্বাণীতে 'ব্যাবিলন' দ্বারা উদ্দেশ্য ইরাকের 'ব্যাবিলন'। একে ব্যাবিলন বলার কারণ হল, এখানে নমরুদের পাথর পতিত হওয়ার সময় احتلاء السنه প্রকাশিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুফার বন্ধক। কার কার মতে 'দাম্বাউন্দ' পাহাড়কে 'বাবেল' বা 'ব্যাবিলন' বলা হয়।

কেছরার নিজ ঘাতক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ

কেসরাই সেই প্রথম নিহত ব্যক্তি, যিনি নিজের ঘাতক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। যেমন, আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী ' কিতাবুল আযকিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেন : কেসরাকে জ্যোতিষীরা জানিয়েছিল, আপনাকে হত্যা করা হবে। তখন কেসরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও আমার ঘাতক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। সুতরাং সে প্রাণনাশক বিষ নিয়ে একটি ছোট কৌটায় ভরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়। কৌটার উপরে লাগিয়ে দেয় মহর। এরপর একটি চিরকুটে এর কার্যকরিতা (!) লিখে তাতে পেঁচিয়ে লুকিয়ে রাখে। এতে লিখা ছিল—'এ কৌটায় রয়েছে পরীক্ষিত ও উপকারী ঔষধ। এটা যৌনশক্তির জন্য দারুণ কার্যকারী। যে ব্যক্তি এটা সেবন করবে, তার মাঝে এমন যৌনশক্তি সঞ্চার হবে যে, একই মুহূর্তে সে কয়েকজন রমণীর সাথে সহবাস করতে পারবে'। এরপর সে ওই কৌটাকে সযত্নে সংরক্ষিত ধনাগারে রেখে দেয়। সুতরাং জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক যুগ পর যখন তার সন্তান তাকে হত্যা করল ও তার ধনভাণ্ডার হস্তগত করল, তখন সে ওই কৌটাটি ধন-ভাণ্ডারে পেল। আর উপরের লেখাটি পাঠ করে তার পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, তার পিতা এ ঔষধ সেবন করার কারণেই এত বেশি শক্তি রাখতেন। এ ঔষধের সাহায্যেই তিনি বহু রমণীগমন করতেন। সুতরাং সে ওই কৌটা হতে উক্ত ঔষধ (প্রাণনাশক বিষ) বিধিমত সেবন করতেই মারা পড়ল। সুতরাং কেসরা সেই প্রথম নিহত ব্যক্তি, যিনি নিজের ঘাতক থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। 'দাল' পরিচ্ছেদে 'দাব্বা'র আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে, কেসরার অন্দরমহলে ত্রিশ হাজার নারী ছিল।

৪৮৯.আশ-শাকাহতাব (الشقحطب) ভেড়া

سفرجل -এর ওজনে চার শিং বিশিষ্ট ভেড়াকে বলা হয়। এর বহুবচন شقاطب, شقاحط আসে।

৪৯০. আশ-শাকযান (الشقذان) টিকটিকি

الشقذان টিকটিকিকে বলা হয়। যেমন, ইবনে সাইয়িদাহ লিখেছেন : গুইসাপ, গুইসাপ সদৃশ তবে তদপেক্ষা সামান্য লম্বাটে ও চিকন লেজের একটি

প্রাণী, টিকটিকি এবং লালা বিষাক্ত সাপকেও 'শিকযান' বলে। এর একবচন شقذة আসে।

৪৯১. আশ-শিকরাক (الشقراق) একটি অমঙ্গলে পাখি

الشقراق (কবুতর থেকে বড় একটি অমঙ্গলে পাখি): মুহকামের লেখক এবং ইবনে কুতাইবার বর্ণনামতে এর শীনে যবর-যের উভয়টিই পড়া যায়। বাতলেমুছির নিকট যের পড়াই অধিক সাহিত্যপূর্ণ। কেননা ইসমসমূহের ওজনের মধ্যে فعلان(فاء যেরের সাথে) ওজনও আছে। যেমন— طرماح ও شنقار ; কিন্তু فعلان ('ফা'য়ে যবরের সাথে পাওয়া যায় না)। গ্রন্থকারের রচিত 'আল-গরীব' গ্রন্থেও شقراق যেরের সাথে লিখা আছে। তদ্রূপ খলীল হতেও এ যেরই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন : এতে যের, যবর, পেশ তিন শ্রেণীরই ইরাব প্রদান করা যায়। একে شرقراق -ও বলা হয়। এটা একটি ছোট পাখি। একে আখিল (অমঙ্গলে পাখিও) বলা হয়। এটা সবুজ বর্ণের কবুতরের সমান হয়। এর শ্যামলতা বড় আকর্ষণীয়। এর বাহু সামান্য কালচে হয়। লোভ, চতুরতা ও অন্য পাখির ডিম ভাঙা এদের সহজাত প্রবৃত্তি। আরবগণ একে অলক্ষুণে পাখি বলে। রোম, খুরাসান ও শাম প্রভৃতি দেশে অধিক হারে পাওয়া যায়। এটা মানুষ থেকে সর্বদা দূরে অবস্থান করে। বিশেষত পাহাড়ের চূড়ায় থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এরা ডিম পাড়ে এমন উঁচু প্রাসাদে, যেখানে কোন মানুষ যাওয়া দুষ্কর। এদের বাসা অত্যাধিক দুর্গন্ধময়। শারেহে গনিয়াহ ও জাহিযের মতে এটা কাকের এক শ্রেণীবিশেষ। সঙ্গম যথেষ্ট কম করে। স্বভাবগত এরা ফরিয়াদ করতে অভ্যস্ত। কোন প্রাণীর সাথে এর লড়াই হলে এরা তাকে মেরে নিজেই এমনভাবে চিৎকার করে, মনে হয় যেন সে নিজেই আহত।

শরীয়তে শিকরাকের হুকুম

রুইয়ানী ও বগবী বলেন : এটা নোংরা বিধায় হারাম। রাফী আল্লামা সুমাইরী থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। আজলী শারেহ গনিয়াহ ইবনে সিরাজও এটিকে হারাম বলেন। হাবী গ্রন্থে মাওয়ারিদি এটিকে এবং عقعق (কাক সদৃশ একটি প্রাণী) হারাম বলে বর্ণনা করেছেন। হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন, এ দুটি পাখিই আরবদের নিকট নোংরা-ঘৃণ্য পাখি বলে গণ্য। এটাই অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক এটাকে হালালও বলেন।

শিকরাকের উদাহরণ

আরবগণ কোন কিছুকে অমঙ্গল হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলে বলে : فلان اشام من الاخيل —'অমুক ব্যক্তি আকিল অপেক্ষা অমঙ্গলজনক'।

আখিল ও শিকরাক একই পাখি; কেবল নাম দুটি।

চিকিৎসায় শিকরাক

স্বর্ণ উজ্জ্বল কম হলে তা গলিয়ে তাতে শিকরাকের পিত্ত ছিটিয়ে দিবে। এতে স্বর্ণ অসাধারণ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যেমনি খেঁকশিয়ালের জিল্লি দ্বারা স্বর্ণের উজ্জ্বলতা একদম হ্রাস পায়। এর পিত্ত খেযাব হিসেবে চুলে ব্যবহার করলে চুল সম্পূর্ণ কালো হয়। এর গোশত অত্যন্ত গরম ও দুর্গন্ধময় হয়। কিন্তু এর ব্যবহার পাকাশয়ে আটকানো তীব্র গ্যাস/ বায়ূ নির্গত করে।

স্বপ্নে শিকরাক দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে শিকরাক দেখার ব্যাখ্যা করা হয় 'সুন্দরী নারী'।

৪৯২. আশ-শামছিয়াতু (الشمسية) লাল চকচকে সাপ

الشمسية : একে 'শামছিয়াহ' নামকরণের কারণ হল, এর বয়স বৃদ্ধি পেলে এর চক্ষুতে ব্যথা সৃষ্টি হয়। ফলে এটা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। সে-সময় এটা পূর্বমুখী কোন প্রাচীরের সন্ধান করে। সুতরাং এটা পূর্বমুখী কোন প্রাচীরের সন্ধান পেলে তার উপর উঠে সূর্যমুখী হয়ে বসে। কিছুক্ষণ এভাবেই বসে থাকে। যখন সূর্যের আলো পরিপূর্ণভাবে এর চক্ষুতে লাগতে থাকে, তখন এর অন্ধত্ব ও চোখের জ্বালাপোড়া দূর হয়ে যায়। এ কাজটি সে যথারীতি সাত দিন পর্যন্ত করে। আর সাত দিন পর এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এ ছাড়া অন্য সাপ অন্ধ হয়ে গেলে গুয়ামৌরী গাছের পাতায় গিয়ে নিজের চক্ষু ঘষে। এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

৪৯৩. আশ্-শানকাব (الشنقب) এ) একশ্রেণীর পাখি

الشنقب : এটা قنفذ -এর ওজনে ব্যবহৃত। প্রসিদ্ধ এক পাখি।

৪৯৪. শাহ (شه) একপ্রকার পাখি

ইবনে সাইয়িদাহ লিখেন : شه শাহিনের মত একটি পাখি। এটা কবুতরকে পাকড়াও করে। এ শব্দটি অনারবী।

৪৯৫. আশ-শাহাম (الشهام) তূত-পেত্নী

এর আলোচনা 'সীন' পরিচ্ছেদে سعلا শিরোনামে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৯৬. আশ-শাহরুমান (الشهرمان) একটি সামুদ্রিক পাখি

এটা সারস থেকে সামান্য বড়; পা ছোট আর রং সাদা-কালো মিশ্রিত।

৪৯৭. আশ-শাওহাতু (الشوحة) চিল

এর আলোচনা الحاء পরিচ্ছেদে الحداة শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে।

৪৯৮. আশ-শাওফু (الشوف) শজারু

এর পরিপূর্ণ বর্ণনা 'কাফ' পরিচ্ছেদে قنفذ শিরোনামে আসবে।

৪৯৯. আশ-শাওশাব (الشوشب) উকুন, বিচ্ছু, পিপীলিকা

৫০০. আশ-শাওতু (الشوط) একশ্রেণীর মাছ

الشوط : একশ্রেণীর মাছ। এর মাথা ছোট আ মধ্যভাগ বড় হয়।

৫০১. শাওতু বারাহ (شوط براح) শৃগাল

এটা কুকুরের চেয়ে একটু ছোট ও শিয়ালের চেয়ে একটু বড় হয়।

৫০২. আশ-শাওয়ালু (الشول) দুধহীন উষ্ট্রী

যেসব উষ্ট্রীর গর্ভ ধারণ বা গর্ভ খালাসের পর সাত-আট মাস কেটে গেছে এবং দুধ শেষ হয়ে এদের স্তন শুকিয়ে গেছে। এর একবচন شائلة আসে এবং شول কিয়াসের পরিপন্থী বহুবচন।

শাওয়ালুর উদাহরণ

কথিত আছে, لا يجتمع فحلان فى شول —'দুটি নর উট (ষাঁড়) উষ্ট্রীর সাথে একত্র হতে পারে না'। খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান যখন আমর ইবনে সাঈদ আশদাককে হত্যা করেছিল, তখন সে এ উদাহরণটি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এক রাষ্ট্রে দুই বাদশাহর হুকুম চলতে পারে না। الفاء পরিচ্ছেদে فحل শিরোনামে শাওয়ালের বিশদ বর্ণনা আসবে।

৫০৩. শাওলাহ (شولة) বিচ্ছু

শাওলাহ প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছুর পিঠের খাঁড়া খাঁড়া হুলকে বলে। এরই ভিত্তিতে বিচ্ছুকে শাওলাহ বলা হয়। বিচ্ছুর বর্ণনা আইন পরিচ্ছেদে عقرب শিরোনামে আসবে।

৫০৪. আশ-শাইখুল ইয়াহুদী (মানুষ সদৃশ এক প্রাণী)

الشيخ اليهودى (মানুষ সদৃশ এক প্রাণী) : আবু হামেদ উন্দুলুছী এবং কাযবিনী সরচিত 'আজাইবুল মাখলূকাত' গ্রন্থে লিখেন : এটা মানুষ সদৃশ চেহারার একটি প্রাণী। এর দাড়ি সাদা। বাদি দেহ ব্যাঙ সদৃশ। এর চুল গাভীর লোমের মত। আকারে বাছুরের সমান। এটা সমুদ্র হতে শনিবার রাতে বের হয় এবং রবিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাইরে অবস্থান করে। ব্যাঙের মত ডাকাডাকি করে। এটা পানিতে প্রবেশ করলে নৌকা-তরী এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

শায়খে ইয়াহুদীর শররী হুকুম

এটাও হারামের অন্তর্ভূক্ত।

চিকিৎসায় শায়খে ইয়াহুদী

এর চামড়া পায়ের গ্রন্থি ব্যথায় রাখলে তাৎক্ষণিক ব্যথা বন্ধ হয়ে যায়।

৫০৫. আশ-শিযমান (الشزمان) বাঘ

৫০৬. আশ-শিছবান (الشيصبان) নর পিপীলিকা

৫০৭. আশ-শাইহু (الشيح) সিংহ শাবক

الشيح (সিংহ শাবক): এটা بيع ওজনে পঠিত হয়। আলিফ পরিচ্ছেদে اسد শিরোনামে এর বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে।

৫০৮. আশ-শীম (الشيم) মাছ

الشيم : একশ্রেণীর মাছ। জনৈক কবি বলেন–

قل لطغام الازو لا تبطورا * بالشيم والجريث والكنضد

"ইযদ গোত্রের অধিকাংশ বাজকে বল! যেন তারা মাছ, কেঁচো আর ব্যাঙের উপর আক্রমণ না করে।"

৫০৯. আশ-শায়হাম (الشيهم) নর শজারু

কবি আ'শা বলেন–

لئن جدا سباب العداوة بيننا * لتر تحلن منى على ظهر شيهم

"যদি আমাদের মধ্যে শত্রুতার কারণ নতুন করে জন্মে, তবে আমার থেকে শজারুর পৃষ্ঠে গমন করবে।"

আসমাঈ বলেন– شهام শব্দটি شيهم তথা 'ভূত' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কবি আবু যুয়াইব হাযলীর বলেন : আমি যখন জানতে পারলাম, রাসূল সা.

অসুস্থ, তখন আমার এত কষ্ট হয়েছে যে, রাতে আর ঘুম হয় নি। রাত পার করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। সকাল বেলা আমার চক্ষু সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন ভেসে আসে জনৈক আহ্বানকারীর আওয়াজ। কে যেন বলছে—

خطب اجل ناخ بالا سلام * بين النخيل ومعقد الاطام

"নখীল ও মা'কাদাতাম-এর মধ্যে অর্থাৎ মদীনা শরীফ এবং ইসলামের মধ্যে মারাত্মক এক বিপর্যয় ঘটে গেছে।"

قيض النبى محمد فعيونتا * تذرى الدموع عليه بالا سلام

"অর্থাৎ নবী করীম সা.-এর মৃত্যু হয়ে গেছে। যার দরুন আমরা অধিক হারে অবিরাম অশ্রুপাত করছি।"

আবু যুয়াইব বলেন : আমি এ আওয়াজ (পংক্তিগুলী) শ্রবণ করে ভয়ে আতকে উঠলাম। তাকালাম আকাশপানে। তখন শুধু সা'দুজ জাবেহ নামক তারকাটি ছাড়া আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হল না। সুতরাং আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, আরবে রক্তপাত হবে কিংবা হয়তো রাসূল আকরাম সা.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে বা এ মৃত্যুশয্যায়ই তিনি ইহধাম ত্যাগ করবেন। সুতরাং আমি এ ভাবনায় নিজের উটনির পিঠে চড়ে অব্যাহত চলতে থাকি। এভাবে সকাল উদিত হলে আমি নিজ উষ্ট্রীকে দ্রুত দৌড়ানোর জন্য একটি চাবুকের প্রয়োজন বোধ করি। সুতরাং আমি চাবুক খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম, একটি শজারু সাপকে ধরে রেখেছে আর সে সাপ তাকে পেঁচিয়ে রয়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরে শজারু সাপটিকে গিলে ফেলল। আমি এ থেকে একটি পূর্বাভাষ গ্রহণ করলাম—এ শজারু দ্বারা অন্ধকার উদ্দেশ্য আর সাপটি শজারুকে পেঁচিয়ে ধরা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ অর্থাৎ লোকেরা রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের পর সত্য বিমুখ হয়ে কোন প্রতিষ্ঠিত বাদশাহর বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবে। এরপর শজারু সাপকে গিলে ফেলার অর্থ, পরিশেষে ওই প্রতিষ্ঠিত বাদশারই বিজয় হবে। এরপর আমি নিজ উষ্ট্রীর গতি তীব্র করলাম। 'গাবাহ' নামক স্থানে পৌঁছে আমি একটি পাখি হতে পূর্বলক্ষণ গ্রহণ করলাম। সে আমাকে নবী করীম সা.-এর মৃত্যুর বেদনাদায়ক সংবাদ প্রদান করল। তারপর একটি কাক আমার বাম পার্শ্ব দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। এর থেকেও আমি একই ফল গ্রহণ করলাম। অবশেষে আমি মদীনায় পৌঁছা মাত্র মানুষের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি বুঝে গেলাম, রাসূল সা. আর এ ধরায় বেঁচে নেই। এরপর আমি মসজিদে নববীতে গমন করে তা জনশূন্য পেলাম। সুতরাং সেখান থেকে নবী কারীম সা.-এর ধনাগারে হাজির হলাম। দেখলাম সেটির দরজা বন্ধ। মানুষকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সাহাবায়ে কেরাম বনী সাঈদের মিলনায়তনে গিয়েছেন। সুতরাং আমিও ওই মিলনায়তনে পৌঁছাই। দেখলাম ওখানে হযরত

আবু বকর রাযি. হযরত ওমর রাযি., হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহসহ কুরাইশদের একটি জামাত উপস্থিত রয়েছেন। আমি সেখানে আনসারগণকেও দেখলাম। তাঁদের মধ্যে আছেন হযরত সা'দ ইবনে উবায়দা এবং আনসার কবিদের মধ্যে উপস্থিত আছেন হযরত হাসসান বিন সাবেত, কাব ইবনে মালেক রাযি.। আমি কুরাইশদের দলে গিয়ে বসে পড়লাম। আনসারগণ দীর্ঘ বক্তব্য দিলেন। প্রমাণ পেশ করলেন খেলাফতের উপযুক্ততার পক্ষে।

এরপর হযরত আবু বকর রাযি. সংক্ষিপ্ত এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করলেন। তাঁর ভাষণ ছিল সাজানো গোছানো। যারাই তাঁর ভাষণ শ্রবণ করেছেন তারাই বিমোহিত হয়েছেন। অবশেষে হযরত ওমর রাযি. সামান্য বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনার পর হযরত ওমর রাযি. আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বললেন, আপনার হাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করুন! আমি বাইআত গ্রহণ করব। সুতরাং হযরত আবু বকর রাযি. হাত বাড়িয়ে দিলেন আর হযরত ওমর রাযি. বাইআত গ্রহণ করলেন। এরপর সকল সাহাবী রাযি. তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে আসেন আর আমিও তাদের সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমি রাসূল সা.-এর জানাযা এবং দাফনেও অংশগ্রহণ করেছি।

৫১০. আবু শাবকুনাহ (ابو شبقونة) একটি পাখি বিশেষ

ابو شبقونة : একটি পাখি বিশেষ। এটা সাধারণত গাধা এবং চতুষ্পদ জন্তুদের পার্শ্বেই অবস্থান করে এবং এদের মশা পাকড়াও করে খায়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত